গোপাল হালদার সম্মান-সংখ্যা

পরিচয়

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

৪৯ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যা

পরিশিষ্ট : পুনর্মুদ্রণ ও তথ্যপঞ্জি

প্রচ্ছদ : লিপি—সত্যজিৎ রায় ; স্কেচ—যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দেবেশ রায়

পরিচয়-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয় পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থমালা

পঞ্চাশ বছরের 'পরিচয়' থেকে নির্বাচিত, বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, রচনা

বই মেলায় 'পরিচয়'-এর স্টলে বিক্রি শুরু হবে।
একটি বই-এর দাম ৫০ পয়সা। পাঁচটি বই-এর
সেটের দাম ২ টাকা।

১. হিরণকুমার সান্যাল — রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে
২. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র — কয়েকটি কবিতা
৩. স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য — মন্ত্রশক্তি (গল্প)
৪. ননী ভৌমিক — সলিমের মা (গল্প)
৫. সুলেখা সান্যাল — সিঁদুরে মেঘ (গল্প)

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬·০০

মস্তক বিনিময় (Thomas Mann-এর Transposed Heads-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—ক্ষিতীশ রায় ৪·০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫·০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—নৃপেন ভট্টাচার্য ৪·০০

বেনিটের চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪·০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০·০০

গোবিন্দ সামন্ত (লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants' Life'-এর বঙ্গানুবাদ) সাধারণ ৪·৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪·৫০

'পরিচয়'-এর

আগামী সংখ্যা মার্চে বেরবে

'মার্কসবাদ ও সাহিত্য'—আলোচনা-সংকলন ঃ
থিওডর অ্যাডরনো-র 'কমিটমেন্ট'

অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প, পুস্তক-পরিচয় ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ভূমিকা

এমন একটি উপন্যাস ভাবা যায়—যার ঘটনা শুরু ১৯০৫-এ, এ শতাব্দীর শুরুতে, আর শেষ? দেখা যাক, শেষ কোথায় হতে পারে?

তা হলে তো সেই নায়ককে হতে হয় এই শতাব্দীর সমবয়স্ক। আর, শতকব্যাপী সারাটা জীবনের অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার প্রতীকে তার জন্মভূমি তো সেই পুববাংলা—নদী যেখানে পাড় ভাঙে, গ্রামপতনের শব্দে যার ঋতু বদলায়। তার গায়ে লাগে সেই নতুন চরের জলধোয়া শ্যাম, নতুন সবুজের শ্যামল।

তার বাল্যের প্রাচীনতম স্মৃতিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি আর 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-এর গুঞ্জন। সে শিশুটি জানত না, যেমন কোনো শিশুই জানে না, ভালোবাসা কি আর দেশ কি। আলো, হাওয়া আর মাটি—এই তো সব শিশুর আদি জন্মভূমি। ভালোবাসার হাসি আর অভিমানের কান্না এই তো সব শিশুর আদি ভাষা। সে শিশু জানত না, তার এই আদি ভাষার পাঠে মিলে গেছে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ কবির ভাষা। সে শিশু জানত না, তার এই আদি জন্মভূমির পরিচয় শুরু হয়েছে পরাধীন এক দেশের লক্ষ্মীহীন অঙ্গন থেকে।

দেশকালহীন সেই শৈশবের শেষে তার কৈশোরকের ভ্রূ-প্রান্তে এসে লাগে সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠির ছোঁয়া। তার সেই কবি তাকে এই নিখিলে জাগায়—সেই কিশোরের মুখের ভাষাকে তার কবি ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময়, সে ভাষায় বেদনা আর অশ্রু আজ চরাচরব্যাপী আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যেতে পারে। সদ্য-জাগ্রত সেই কিশোর তার নবীন বাতায়নে উন্মুখ পৃথিবীকে প্রতীক্ষায় দেখে। তারই জন্য। কিন্তু সেই পৃথিবী আর সেই কিশোরের মাঝখানে লোহার গরাদ। কিশোর সেই মুক্তির পৃথিবীতে যেতে চায়। কিন্তু পথ বড় ঘোরানো, অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ ও জটিল। কিশোর পথ খোঁজে। আর-এক কিশোর তখন জন্মান্তরে তাকে চিনে নেবার অভিজ্ঞান জানিয়ে গাইছে, 'গলায় দেখো ফাঁসি'। আর-এক সন্ন্যাসী তখন ক্ষুধার বিরুদ্ধে কর্মময় সন্ন্যাসে চণ্ডালকে ভারতবাসীর অভিজ্ঞান দিয়েছেন। আর্ত সেই কিশোর কবিতা আর কর্ম আর আত্মবলির ভেতর মুক্তি খুঁজে ফেরে।

কখনো-কখনো যেন এগুলো আর বিকল্প না-থেকে এক হয়ে যায়।

বিশের কোঠায় পৌঁছবার আগেই সেই তরুণ দেখে, তার কবি ভারতবাসীর রক্তের ঋণে ফিরিয়ে দেন অর্ধপৃথিবীর সম্রাটের খেতাব। আর, যেন তার সেই সন্ন্যাসীর আহ্বানেই, 'কটিমাত্রবস্ত্রপরিবৃত' হয়ে আর-একজন মানুষের আহ্বান—সেই মুক্তির দিকে। সেই তরুণ, তখন তার যৌবনে জাগছে আর জাগছে ভারতবর্ষে।

বোম্বাই-আমেদাবাদে, গুজরাটের বরদৌলি, বিহারের চম্পারনে—সেই যুবক দেখে তার মহাভারত, অজস্র অজ্ঞাত মানুষের বীরত্বলাঞ্ছিত পদক্ষেপে অবান্তর হয়ে যায় সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের মহাভারতের কবিতা সত্য হয়ে ওঠে জেলখানায়-জেলখানায়।

কেন্দ্রীয় আইনসভার ভেতরে ভগৎ সিং-এ আর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে সূর্য সেন-এ সেই মহাভারতের কোরাস। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল জুড়ে তখন সেই কোরাসেরই আরেক সুর—'সারে হিন্দুস্থান উথাল-পাথাল'।

সারাটা যৌবন এই ভারত-সন্ধানে কাটিয়ে, মহাযুদ্ধের বিশ্বে সেই অনতিতরুণ আবিষ্কার করে রণক্ষেত্র প্রস্তুত, অক্ষৌহিনী সারিবদ্ধ আর তাতে সেও একটি সারিতে দাঁড়িয়ে। তার নিজেরই অজ্ঞাতে, তার নিয়ন্ত্রণের অতীত ইতিহাসের কার্যকারণ, তারও জন্য এক ভূমিকা তৈরি করে রেখেছে। আর, সে দেখে, মানব-সভ্যতার ভবিতব্য নির্ধারিত হচ্ছে পৃথিবীর নবীনতম রাষ্ট্রের দুয়ারে, সভ্যতার তরুণতম পরীক্ষাভূমির অঙ্গনে। ইয়োরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে মস্কো-লেনিনগ্রাদ-খার্কভ। স্তালিনগ্রাদে মানুষের সভ্যতার প্রাক্-ইতিহাস আর ইতিহাস সে লড়াইয়ে মৃত্যুপণবদ্ধ। সে দেখে, মানব-সভ্যতা তার নতুন উত্তরণের পথে এসে দাঁড়িয়েছে—অল রোডস লিড টু কমিউনিজম। তার বাংলাদেশ, তার ভারতবর্ষকে নিয়ে সে জাগে তার বিশ্বে, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ বিশ্বে।

এই পর্যন্ত হতে পারে সেই উপন্যাসের প্রথম ভাগ—'উত্থান' বা 'উত্তরণ'।

—

কিন্তু, তারপর? কী নিরন্ধ্র পতন! যে-বাঙলা তাঁর বিশ্বের কেন্দ্র, তার সত্তা হয় লাঞ্ছিত, খণ্ডিত। প্রায় অর্ধশতক ধরে যে-বাঙালিত্বের সাধনা, যে-সার্বভৌমের সন্ধান, যে-রাবীন্দ্রিক সম্পূর্ণতার ধ্যানকে লালন করে তিনি তাঁর বিশ্বকে পেয়েছিলেন, সেই সাধনা-সন্ধান-ধ্যানে লাগে ভস্মলোচনের দৃষ্টি। ভেঙে যায় বাংলাদেশ, পুড়ে যায় নোয়াখালি-বিহার, খাক হয়ে যায়

কলকাতা। 'আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার'—প্রবল আত্ম-আবিষ্কারের এ-উচ্চারণ শেষ হয়ে যায় ক্লাউনের আত্মশ্লেষে। সেই শৈশবে বাতায়নবর্তী যে-মুক্তিকে তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশ, তা যে আসলে প্রেতভূমি, পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ!

দশক না-পেরতেই এসে যায় ইতিহাসের আর-এক নিদান। তাঁর আত্ম-আবিষ্কার-অভিযানের পরাক্রান্ত বীর স্তালিন প্রমাণিত হয়ে যান ইতিহাসের এক কুণ্ঠিত অধ্যায়েরও নায়ক। ইতিহাস যাঁর ভেতর মূর্তি পেয়েছিল, এই বিংশ শতাব্দী যাঁর ভেতর হয়ে উঠেছিল নতুন সভ্যতার ধাত্রী তাঁর মাটির পা বেরিয়ে যায়, কমিউনিস্টদের প্রত্নপ্রতিমা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন গ্রীক-পুরাণের অ্যানটিউসে—মাটি থেকে যেন পা না ওঠে, দেখা গেল তাঁরই পায়ের তলায় মাটি ছিল না। সেই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে প্রায় ঢাকা পড়ে যেতে যায় মাত্র ক-টি বৎসর আগের গৌরব, গর্ব।

দশক না-পেরতেই এসে যায় ইতিহাসের আর-এক নিদান। তাঁর স্বপ্নের মহাচীন আর তাঁর বাস্তবের ভারতবর্ষের সীমান্তের মাটি রক্ত কলঙ্কিত হয়ে যায়। যে-বিশ্ব সৌভ্রাত্রের ধারণার এক প্রত্নপ্রতিমা তিনি পেয়েছিলেন চীন আর ভারতের সহস্রাব্দব্যাপী সপ্তপদীতে, চীন তাতে হানে মরণবান। রাবীন্দ্রিক সুন্দরের সন্ধান তার বলিষ্ঠতম ঐতিহাসিক সমর্থন থেকে চ্যুত হয়। যৌবন জুড়ে উন্মাদ হয়ে ছোটা, যন্ত্রণায় পাথরে মাথা কোটার মীমাংসা জুটেছিল বিপ্লবী সংগঠনের যে-প্রতিশ্রুতিতে তাও মুহূর্তে খানখান হয়ে যায়।

হায়! সেই নায়ক তার আধার—তার পার্টিকে হারায়, তার বাংলাকে হারায়, তার ভারতবর্ষকে হারায়, তার বিশ্বকে হারায়।

এই পর্যন্ত হতে পারে সেই উপন্যাসের মধ্যভাগ—'পতন' বা 'পরাভব'।

—

ইতিমধ্যে তো আমাদের নায়কের বয়স বেড়েছে। এখন তো তাঁকে বৃদ্ধই বলা চলে। বার্ধক্য তো সেই অভিজ্ঞতা—বিশেষকে যা সার্বজনীনে টেনে সান্ত্বনা নিতে পারে। তাঁর শারীরিক কষ্টগুলো এখন বাড়তে পারে। তাঁর জেদ আর অহঙ্কার তো হতেই পারে বেশ স্তিমিত। চিরকালই তো তিনি অক্ষৌহিনীর একজন—এখন সে-ভূমিকায় আর-কোনো সতর্ক আত্মসচেতনতাও নেই, এমনই অভ্যস্ত। এখন তো সচ্ছন্দেই উচ্চারণ করে দেয়া যায় কোনো বিশ্বাসের কথা, আস্তিক্যের কথা, যার জন্য আর প্রমাণও দাবি করবে না কেউ। এমন-কি মনের গভীরের

কোনো অবিশ্বাসকেও লুকিয়ে রাখা যায়। নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবার সঙ্গত দাবিই তো তখন থাকে।

কিন্তু যে-নায়ককে আবারও তাঁর পথসন্ধানে দাঁড়াতে হয়—যা তাঁর আবাল্যের অভ্যাস, যা তাঁর স্বভাব। পার্টিতে যাঁরা ছিলেন তাঁর সহকর্মী, নেতাও-বা, সংগঠক—তাঁদের অনেকের থেকেই তাঁকে আলাদা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই বৃদ্ধ তাঁর সমগ্রকে ছাড়েন না, ছাড়েন না বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূলধারাকে। নদীর সন্তান তিনি, মূলস্রোত চিনতে তাঁর দক্ষতা তো পুববাংলার মাঝিমাল্লার মতোই।

সে নায়ককে আবারও তো তাঁর বাঙালি-রাবীন্দ্রিক-কমিউনিস্ট বিশ্বের নবীনতর রণভূমিতে বিশ্বাসের শেকড় চাড়িয়ে দিতে হয়। চৈতন্যের লালন রেখে যায় ভিয়েতনাম। মানব-সভ্যতার লড়াই প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত চলছে। ফিনিক্স পাখির মতোই তার অগ্নিশুদ্ধি, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর—লেনিনগ্রাদ থেকে চীন থেকে কিউবা থেকে ভিয়েতনাম। আমাদের নায়কের বিশ্ব তার সংহতি ফিরে পায়।

আর, তারপর বাংলাদেশ। বাঙালির দলিত নিষ্পিষ্ট সংস্কৃতি সাধনার বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহের পতাকায় রবীন্দ্রনাথের নাম। সে বিদ্রোহের রণসঙ্গীত তো সেই নায়কের আদিতম ভালোবাসার গান—'আমি তোমায় ভালোবাসি।' সেই বাতায়ন, সেই মুক্তি, সেই কবিকে নিয়ে সেই নায়ক তাঁর বয়স্ক মননে আর-একবার তাঁর শৈশবে জাগেন, তাঁর স্বদেশে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়, আরেক বৃত্তের শুরুতে।

আপাতত এখানেই থাকতে পারে আমাদের উপন্যাস—'উদ্ধার' বা 'উদ্বোধন'।

—

এই আমাদের গোপাল হালদার—যে-উপন্যাস আমাদের ভাষায় লেখা হয় না, লেখা হয় নি, সেই উপন্যাসের সম্ভাব্য নায়ক।

তাঁর শরীরে বা স্বভাবে কোথাও নেই নায়কের বাইরের লক্ষণ। কোথাও তাঁর প্রতিশ্রুতি নেই অসাধারণের। নেহাতই বাংলার মফঃস্বলের ছেলে, কলকাতারও মানুষ। তাঁর আত্মকথায় মনে হয় যেন আড্ডায়-আড্ডায় কাটিয়ে দিলেন বাবার বৈঠকখানার বাল্য থেকে এখন নিজের বৈঠকখানার প্রায়-অশীতি। মাঝখানের কারাবাসগুলিও যেন সেই আড্ডারই স্থানান্তর। আর, 'প্রবাসী' থেকে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ও তারপর 'স্বাধীনতা',

'পরিচয়', যেন সেই আড্ডারই সম্প্রসারণ। কোথাও কোনো কাজ দিয়ে যেন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে মাপতে চান না—সব সময়ই আড়ালে চলে যেতে চান নিজেকে নিয়ে কৌতুকে। সে কৌতুক সব সময়ই স্মিত নয় —দু-একসময় উচ্চকিতও। নিজের চেহারা নিয়ে, কণ্ঠস্বর নিয়ে, গবেষণা নিয়ে, লেখালেখি নিয়ে গোপাল হালদার সবচেয়ে ত্বরিত রসিকতায় চলে যেতে পারেন। নিজের কোনো কিছুই তাঁর কৌতুকের লক্ষ্য-বহির্ভূত নয়। আর, অন্যের কোনো কিছুতেই তাঁর শ্লেষ নেই। এমন মানুষকে তাঁর প্রায় আশি বছর বয়সে নায়ক হতে ডাকাটা যেন আর-এক-রসিকতা। তাঁর দীর্ঘ জীবনে গোপাল হালদার নিজেকে মাপার কোনো নিরিখের পাশে দাঁড়ান নি, ভিড়ে মিশে গিয়েছেন, সমষ্টিতে নিজেকে মিলিয়েছেন। যে-নিরিখ দিয়ে সেই ভিড়, সেই সমষ্টি, সেই সমাবেশকে মাপা যায় না, সে-নিরিখ গোপাল হালদারের ক্ষেত্রে অচল। এ তো সাও কথিত জলের ভেতরের সেই মাছ ও সে মাছ পিপাসার্ত নয়, পূর্ণতৃপ্ত। ইনি আর-যাই হোন, নায়ক নিশ্চয়ই নন।

অথচ সারা জীবনই তো গোপাল হালদারের বিপরীত রীতি—ভাঁটির সময়ে উজানে বৈঠা আর জোয়ারের সময় ভাঁটিতে। বিবেকানন্দ থেকে বিপ্লবী সন্ত্রাস থেকে কমিউনিস্ট পার্টি—এই গতি আমাদের হয়ত কিছু জানা। আবার, বিদেশে—এক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে—সভ্যতার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পাঠ থেকে, বিশ্বরাজনীতির শক্তিসমাবেশ দেখে কমিউনিস্ট পার্টি—এই গতিও আমাদের বেশ চেনা। গোপাল হালদারের চৈতন্যের বিকাশে এই দুই গতি মিশে গেছে আর সেই গতিকে একেবারে মূলে বদলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বিবেকানন্দের কর্মসন্ন্যাস রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সন্ধানের সঙ্গে মিশে তাঁর স্বদেশ-আবিষ্কারকে করে তোলে একই সঙ্গে কর্মের লক্ষ্য ও শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা। আবার, সভ্যতার ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতিতে শক্তি-সমাবেশের নিবিষ্ট অধ্যয়ন রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের সঙ্গে মিশে হয়ে উঠতে চায় এক আস্তিক্যপ্রস্থান। তাই কর্মী সতীর্থদের কাছে গোপাল হালদার হয়তো একটু বেশি লেখক। বুদ্ধিজীবী সহকর্মীরা তাঁকে ভাবেন হয়ত একটু বেশি স্বদেশী বাঙালি। 'বামপন্থী'দের ভেতর রাবীন্দ্রিক, 'রাবীন্দ্রিক'দের কাছে কমিউনিস্ট। সাহিত্যিকদের মধ্যে 'পণ্ডিত', পণ্ডিতদের সভায় স্বাধীন লেখক। সাংবাদিকদের সমাজে বুদ্ধিজীবী আর গবেষকমহলে যেন একটু চঞ্চল বহুবিষয়সন্ধানী।

আর গোপাল হালদারও যেন এ সব মেনে নিতে সামান্য দেরিও করেন না। 'মেনে নেয়া' বলতে তো বোঝায় কথাটা অপর পক্ষের, আসলে, কথাটা তো তোলেন তিনি নিজেই। উপন্যাস লেখেন বিরাট পরিকল্পনায় অন্তত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে। উপন্যাসিকের পদবী মেনে নেন না। কথ্যভাষার ওপর প্রথম গবেষণা করেন, পথিকৃই তো বলা চলে তাঁকে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকের বিশেষজ্ঞতা স্বীকার করেন না। সংস্কৃতির ইতিহাসচর্চায় বাংলা ভাষার প্রথম গবেষক তিনি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর পদ তাঁর নয়। সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন—তেমন চেষ্টা তো সেই প্রথম, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নের অন্বয়ে। কিন্তু সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ গবেষক তিনি নন। ক্লাসিকসের সম্পাদনা করেছেন কিন্তু যেন সম্পাদনা তাঁর প্রধান কাজ নয়।

আর, এই সরে-সরে যাওয়াটাই কি তাঁর আত্মরক্ষারও একটা উপায়। মানবিক যে-কোনো বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এতটাই ক্ষিপ্র ও সে-বিষয় অধিগত করার ক্ষমতা তাঁর এতই স্বাভাবিক—তিনি যদি আটকে যান কোনো একটি বিশেষ কাজে, তবে যে বন্ধ করে দিতে হয় মনের অন্যান্য জানলা-দরজা, তবে যে তাঁকে এমন একটা নিরিখ বেছে নিতে হয় যা তাঁকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে দেবে।

তাইই বুঝি তাঁকে সবসময়ই খুঁজতে হয় কৃতী বন্ধু বা অগ্রণী—তাঁকে নির্দ্বিধ স্বীকৃতি দিয়েই গোপাল হালদার যেন দায়মুক্ত হতে চান। তাঁর অজস্র লেখায় তো তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর 'গুরু' বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোথাও একবারের জন্যও উল্লেখ করেন না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে হিন্দু মিশনে সুনীতিকুমারের কাজাকর্ম বা বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি প্রস্তাবে সুনীতিকুমারের মতের সঙ্গে তাঁর তীব্র প্রবল পার্থক্য। কোথাও জানান না, তিন ভাষার নীতি নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে তাঁর সঙ্গে লড়াই।

কারণ, এই লড়াইগুলিতেই গোপাল হালদারকে যেন বাধ্য হয়েই তাঁর পুরো মাপ নিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর তাতে যেন হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে তাঁর নিরিখ, তিনি আলাদা হয়ে যেতে পারেন তাঁর চারপাশ থেকে, ভিড় থেকে, তাঁর জল থেকে।

উপন্যাসের জন্য তো আমাদের এমন নায়কই দরকার—এমন চঞ্চল কর্মী অথচ এমনই স্থিতপ্রাজ্ঞ, এমন গোপন সশস্ত্র অহঙ্কারী অথচ এমন প্রবল বিনয়ী। তা হলে সেই নায়ক তার চারপাশকে নিয়েই নায়ক হয়ে ওঠে,

যেন, চারপাশের জন্যই নায়ক হয়ে ওঠে। তা হলে সেই নায়ক তার সাধারণ-হওয়ার সাধনায় অসাধারণ হয়ে ওঠেন।

গোপাল হালদার তাঁর এই বাঙালি-চারপাশ থেকে মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন না, হন নি। এই বাঙালিয়ানাই তাঁর সত্তা। কবে যেন 'প্রবাসী'-র আড্ডায় তাঁর ধুতি-চাদরের পোশাক নিয়ে রসিকতার উত্তরে বলেছিলেন— 'বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালি হতে চাই'। বিশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালি হতে হলে, গোপাল হালদারের মতো কমিউনিস্ট-বাঙালি হতে হয়। তাই বিশ শতক শেষ হতে যখন আর-মাত্র দুই দশক বাকি, তখন বাঙালি-ভারতীয়ের সাগার নায়ক হতে হয় গোপাল হালদারকেই—তাঁর ব্যক্তিত্বের আপাতমৃদুতায় ও প্রসারতায়, তাঁর সেই সাধারণ-হওয়ার সাধনায়, তাঁর সেই নিরন্তর অজ্ঞাতবাসে, আত্মগোপনে।

কিন্তু এতে আটাত্তর বছরে বয়সে গোপালদার ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদের দেশে গোপাল হালদার যেমন ঘটে না, আমাদের ভাষায় সেই সাগাও তেমনি লেখা হয় না!

তার বদলে থাক, এই আমাদের ভালোবাসা, তাঁকে। তাঁর সময়কে। তিনি যেমন কাটান তাঁর এই এতগুলো বছর, সেই কর্মকে। তাঁর ভেতর জমা হয়েছে যে-প্রতিনিধিতা, তাকে।

'পরিচয়'-ই তো এই ভালোবাসার প্রকৃত বাহন হতে পারে। এই কাগজের সম্পাদক গোপালদা প্রায় তেইশ বৎসর। এই কাগজে বেরিয়েছে তাঁর কত প্রবন্ধ, কত গল্প, কত সমালোচনা, কত বিতর্ক। গোপালদা সম্পাদক হিসেবে 'পরিচয়'-এর অন্যতম প্রধান লেখকও। আমরা আজ যারা 'পরিচয়'-এর কর্মী, তারা তো অনেকেই তাঁর সঙ্গে কাজের সুযোগ পাই নি। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন—যাঁদের বয়স সবে বিশ পেরিয়েছে, তাঁরা অনেকে তাঁকে চোখে দেখেন নি। তাঁর খ্যাতিমান, প্রতিষ্ঠিত সহকর্মীরা আছেন, কিন্তু এই খণ্ডটি প্রকাশের দায়-দায়িত্ব আমাদেরই ওপর যে-বর্তাল তা হয়ত একদিক থেকে ভালোই। গোপালদার সঙ্গে ব্যক্তিগত সঙ্গ-অনুষঙ্গের চাইতে তাঁর কর্মের ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকারীদের দিকে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ এই সংখ্যাটির অধিকাংশ রচনার অবলম্বন হয়ে উঠেছে। তাতেই যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, গোপালদার কাজকর্মকে তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করাটাই প্রধান কাজ।

বলা বাহুল্য, আমাদের ত্রুটিই বেশি। প্রথমে যে ভাবা গিয়েছিল

গোপালদার কর্মক্ষেত্রগুলো নিয়ে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আলোচনা, তাতে বিষয়টিরই প্রাধান্য থাকবে—সব লেখা তেমন হল না। বরং বেশির ভাগ লেখা গোপালদার কাজকর্মেরই আলোচনা। হয় তো আরো কিছু সময় নিয়ে করলে তেমন লেখা সম্ভব হয়। বিষয়ও হয়তো আরো প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। তেমন উদ্যোগ যোগ্যতর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই নেবেন। কিন্তু একটি কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করতে পারলে কিছু আনন্দ তো হতেই পারে। সেই আনন্দেই আমরা গোপালদার দীর্ঘ দীর্ঘতর সক্রিয় আয়ু আকাঙ্ক্ষা করি।

দে. রা.

সঙ্গ-অনুষঙ্গ

মনীষী গোপাল হালদার

৭৩তম জন্মদিনে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃতিসাধনসিদ্ধ স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্ত বিপ্লবী,
স্বজাতি-স্বদেশ-বিশ্ব সমসূত্রে দীপ্ত চেতনায়
বিধৃত রেখেছ চিত্তে। হে মনীষী, হে প্রেমিক কবি,
প্রবুদ্ধ অহংমুক্ত লোকপ্রেম তোমার সত্তায়
দেখেছি কী সুসংহত! শ্রেণীদ্বন্দ্বে ভয়াল অটবী
শান্তিহীন এ সমাজে অবিচার অসত্য অন্যায়
কখনো করোনি সহ্য। কী জ্বলন্ত জীবনের ছবি
এঁকেছ মননশিল্পে বুদ্ধিদীপ্ত রসব্যঞ্জনায়।

তিয়াত্তরে এসে আজ সুদীর্ঘ অর্জিত যোগক্ষেমে
উজ্জ্বল করেছ বঙ্গসংস্কৃতির নবরূপায়ণ,
আগামীর প্রাণোল্লাসে মুক্তিকাম লোকসংঘে নেমে
রেখেছ ঐতিহ্যনিষ্ঠ তন্দ্রাহীন অখিল বীক্ষণ।
বোধিসত্ত্ব জীবনের বহুবর্ণ আলোকঝঙ্কারে
প্রার্থনা: শতায়ু হও, জানাই বিনত নমস্কারে।

বাহাত্তর উত্তরিতে

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

[পাঁচ বছর আগে গোপালদার ৭২ বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় পাঠ করার উদ্দেশ্যে নীচের লেখাটি লেখা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠ করা হয়নি। 'পরিচয়ে'র সংবর্ধন সংখ্যায় এটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে কৃতার্থ বোধ করব। সুকুচ]

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট—বাঙলায় সংখ্যা গুনতে গেলে প্রতি দশকের ঘরে এই সংখ্যাগুলির আদ্য ধ্বনি উচ্চারিত হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম 'দুই'।

যেমন : এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দ…
একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ…
একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ…
একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ ইত্যাদি।

সহজেই নজরে পড়ে, এক, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ঘুরে ঘুরে আসছে, কিন্তু দুই-এর কোন হদিশ নেই। 'দুই'-এর আদ্যধ্বনি 'দু'কে কেন বাদ দেওয়া হল, ভাষাতত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা জানা নেই, এবং 'দু'-এর জায়গায় কি করে কোথা থেকে একটা 'ব' এসে জুড়ে বসল, তাও বোঝা ভার। কিন্তু 'দু' থাকলে ক্ষতি ছিল কি?

'দারো, দাইশ, দত্রিশ, দুয়াল্লিশ, দুয়ান্ন, দুষট্টি'…বলতে নিশ্চয়ই আমাদের দাঁত ভাঙত না; বরঞ্চ শিশুরা যে বয়সে 'গুনতে শেখে তখন তাদের উচ্চারণে 'ত' বর্গের উপর স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে বলে 'দারো' 'দাইশ' তারা সহজেই উচ্চারণ করতে পারত।

সমস্যাটা ভাববার মতো। এই ভাবনায় সংখ্যাচক্র পরিক্রম করতে করতে সাতের ঘরে গিয়েই সমস্যাটা প্রাঞ্জল হয়ে গেল। বুঝলাম কি কারণে 'দুই' এর 'দু'কে পরিহার করা হয়েছে।

'সত্তরের' ঘরে পৌঁছিয়ে তাহলে 'বাহাত্তর'কে 'দুয়াত্তোর' বা 'দুত্তোর' বলতে হয়।

যে শিশু সদ্য ধারাপাত শিখছে সে যদি সুর করে দুলে দুলে পড়ে 'সাতের

পিঠে এক—একাত্তর' 'সাতের পিঠে দুই—দুত্তোর' এবং নামতা আওড়ায় 'আট আষ্টে—চৌষট্টি, আট নং দুত্তোর'—আপনজনদের কাছে নিশ্চয় তা মধুর শোনাবে না। হয়ত, এই কারণেই গুরুমশাই ও গুরুজনেরা 'দুই'-এর সংস্কৃত দোসর 'দ্বি' 'দ্বৌ' এর পিঠে অকারণে যে 'ব'টা চেপে রয়েছে, সেটাকে সেখান থেকে ধার করে এনে 'দুত্তোরের' 'দু'এর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন, এবং তার ফলে শিশুকুলের সংখ্যা-বোধ অনাবিল হল এবং গুরুকুলের দুর্ভাবনার অবসান হল। এবং 'বাহাত্তরের' সঙ্গে পূর্বাপর সঙ্গতি রাখার জন্যে 'দারো' 'দাইশ' ইত্যাদি 'বারো' 'বাইশ' হল।

তাহলে 'দ' এর এই 'ব'তে রূপান্তরের পিছনে প্রচ্ছন্ন যে-কারণটা আছে —তা সরলমতি শিশুর ধারাপাত শেখার প্রয়োজন। কিন্তু বেঁচে থাকা আর ধারাপাত শেখা এক নয়। অনেক ঠেকে, অনেক ঠকে, অনেক লড়ে, অনেক ছেড়ে, জীবনটাকে আঁকড়ে থেকে এক-একটি বছর কাটানো—সোজা কথা নয়। তাই, 'দুত্তোর' বলার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে যিনি সত্তরের কোঠায় পড়ে বাহাত্তর পার হয়েছেন।

বাহাত্তরকে দুত্তোর বলার লোক পৃথিবীতে দারুণভাবে বেড়ে চলেছে। মার্কিন মুলুকে যে হারে বাড়ছে তাতে আর শ-খানেক বছরের মধ্যে ও দেশটা না পুরোপুরি 'দুত্তোর' দেশে পরিণত হয়। ১৯০০-তে যেখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৬০-৮৯ বছর বয়সের লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩, সেখানে ১৯৫০-এ তাদের সংখ্যা ৩৫[১]। আরেক হিসেবে বলে ঐ পঞ্চাশ বছরে ওখানকার লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১০০ ; অথচ ৬৫ ও তদূর্ধ বয়স্কদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা প্রায় ৩০০।[২] ১৯৫০ এর পর আরও পঁচিশটা বছর পার হতে চলল। এর মধ্যে তথাকথিত বৃদ্ধদের জয়যাত্রা নিশ্চয় থেমে নেই এবং দেশের আরও কিছু স্থান তাঁদের কবলস্থ হয়েছে। শুধু মার্কিন দেশই নয়, দুনিয়ার সব দেশেই বৃদ্ধরা বাহাত্তরকে এবং সেই সঙ্গে বার্ধক্যকে দুত্তোর বলে জীবনমুখী হচ্ছে, কোথাও কম কোথাও বেশি। ১৯০১ থেকে ১৯৫১ এই পঞ্চাশ বছরে ফ্রান্সে তাদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১২·৪৫ থেকে ১৬·৬৬, ইংলণ্ডে শতকরা ৭·৪৫ থেকে ১৫·৬৯, সুইডেনে শতকরা ১১·৯২ থেকে ১৪·৯৭।[৩] বয়োবৃদ্ধদের বয়স ও সংখ্যার প্রায় সমহারে বৃদ্ধির ফলে একটিই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বার্ধক্য আর অমৃত (মানে মরণোত্তর) লোকে যাবার ইস্টিশন নয়—যেখানে নুয়ে পড়া সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে ট্রেনের প্রতীক্ষায় বসে থাকা ছাড়া করার কিছু নেই।

জগৎ জুড়ে আজকাল তরুণরা যেমন একসঙ্গে ক্ষেপে উঠছে এবং ক্ষেপা না হলে তরুণ বলে গণ্য হচ্ছে না, অথবা বিচ্ছিন্ন হতে হতে নিজেরা কে, কি, কোথায়—তার হদিশ দিতে পারছে না, তেমনই কি বৃদ্ধরাও এক জাগতিক ভীমরতির তাড়নায় একসঙ্গে উল্টোপথে চলতে শুরু করেছে? তাদের এই মতিগতি স্বাভাবিক না অত্যন্ত অস্বাভাবিক—এ ভাবনায় ভাবিত হওয়া বিচিত্র নয়। অতএব ভাবনা নিরসনের জন্য বার্ধক্য-বিশারদদের মতামত প্রণিধান করতে হয়। এক বিশেষজ্ঞের মতে,

Aging is not a natural process of decline alone ; there is also implied the element of growth. Thus growth, development and maturation are just as much consequences of the occult processes of aging as are the atrophier and the degenerations of senility."[8]

অতএব জীর্ণ দেহকাণ্ডের ভিতরে ভিতরে নবজীবনের অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকে।

শরীরটা না হয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিঁকে রইল, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি মানসিক শক্তি তো বিকল হতে পারে। এ বিষয়েও এক বিজ্ঞানী ভরসা দিচ্ছেন,

That deterioration of the mental faculties with advancing years is inevitable, as some think, is a myth so to say, without any foundation, and such deterioration may be avoided altogether if one has a will to do so.[৫]

তাহলে ইচ্ছা থাকলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি একই সঙ্গে চলতে পারে। এইরকম ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কয়েকজন কীর্তিমান পুরুষের কথা তো এখনই মনে পড়ছে। গ্রীক নাট্যকার সফক্লিস সম্পর্কে কিংবদন্তি, তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটক 'আউদিপাউস' (আমাদের পরিচিত 'ইডিপাস') রচনা করেন, যখন তাঁর বয়স ১০০ বছর। ৯৮ বছর বয়সে বিখ্যাত শিল্পী টিটিয়ান তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দি ব্যাট্‌ল্ অফ লেপান্টি' ছবিটি আঁকেন। ইংরেজ দার্শনিক পিটার হব্‌স্ ৮৪ বছর বয়সে লাতিনে তাঁর আত্মজীবনী লেখেন, ৮৫-তে ৪ খণ্ডে 'ওডিসি'র অনুবাদ করেন ৮৭তে 'ইলিয়ড ও ওডিসি'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমাদের এই বাংলাদেশের স্বনামধন্য দার্শনিক জগন্নাথ তর্কালঙ্কার তাঁর দর্শনচিন্তার শ্রেষ্ঠ

গ্রন্থ 'বিবাদভঙ্গার্নব' যখন শেষ করেন, তখন তাঁর বয়স ৯৮ বছর। কবি গ্যয়েটে ৮২তে পৌঁছিয়ে 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। বলতে পারেন, এ তো সেকালের কথা, তখন খাদ্যে ভেজাল ছিল না, ধোঁয়া ধুলো ও নানা ধরনের দুষ্পাচ্য ও মারাত্মক বৈজ্ঞানিক অপদার্থ পরিবেশ কলুষিত করেনি এবং স্থানাভাব অর্থাভাব বিশ্রামাভাব জীবন-ধারণ এত দুর্বিসহ করেনি। জীবন যে এ সব গ্রাহ্যই করে না, এবং ইচ্ছার জোর থাকলে একালের দীর্ঘায়ুরা যে সেকালের নির্ভেজাল দেহধারীদের লজ্জা দিতে পারেন, এমন দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। যেমন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রকাণ্ড দুই খণ্ডে তাঁর দীর্ঘ আত্মজীবনী লেখা শেষ করেন ৯৭ বছর বয়সে। উইনস্টন চার্চিল রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিন খণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস লিখে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার পান তাঁর ৮০ বছর বয়সে। এঁদের সঙ্গে নাম করা যায় ৯৪ বছরের ক্ষুরধার বুদ্ধি বার্নার্ড শ, ৮৩ বছর বয়সেও মানুষের অবচেতন মনের ডুবুরি সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ৮৫ বছরেও কনডিশণ্ড রিফ্লেক্সের উপাদান দিয়ে দেহ-মনের সেতুবন্ধ রচনায় অক্লান্ত কর্মী পাভলভ, এবং ৮০ পেরিয়ে পরকালে পা দেবার আগে পর্যন্ত সুন্দরের প্রেমিক, সাধক ও শিল্পী পাবলো পিকাসো। আমাদের এই গরিব দেশেও, যেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু 'নেই নেই' শুনতে শুনতে এবং কী পাইনি তার হিসেব নিতে নিতেই শেষ হয়ে যায়, সেখানেও প্রবল ইচ্ছা-শক্তি যে এই দেউলিয়া জীবন থেকে তার প্রাপ্য পুরো আদায় করে নিতে পারে তারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথই তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। সত্তর পার হয়ে সম্ভবত বাহাত্তরেই বা চুয়াত্তরেই বার্ধক্যের 'ভস্ম শয্যা ছাড়ি' 'বীরের তনুতে তনু' গ্রহণ করতে অতনুকে ডাক দেবার দুঃসাহস তাঁর ছিল, তাই ৮০তে নিদারুণ রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাব্য রচনার প্রবাহকে তিনি অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। তিনি তো সব বিষয়েই অসামান্য ছিলেন। তাঁর মত অনন্য না হয়েও দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত মননশক্তি অটুট রাখার নজির রেখে গেছেন স্যর যদুনাথ সরকার—৮৮ বছর বয়সেও মোগল ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপর গবেষণা চালিয়ে এবং শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ ৮০ বছর পার হবার পর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ শুরু ও শেষ করে। সূর্যকে কতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে

গেল সেদিকে একবারও ভ্রূক্ষেপ না করে ৮০।৯০এর কোঠা পার হয়েও এখনও যাঁরা অদম্য উৎসাহে নিজেদের কাজের মধ্যে ডুবে আছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন গান্ধীভক্ত শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। ৯৫ বছর বয়সেও তাঁর অসাধ্য সাধনার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন বাঁকুড়ার বন্ধ্যা পাথুরে জমিতে। এই অহল্যাভূমির নীচের পাথরস্তর ডিনামাইট দিয়ে বিদীর্ণ করে, তার নীচের জল দিয়ে উপরের জমি সেচ করেন এবং সেখানে অভাবিত ফসল ফলিয়ে দেখিয়ে দেন প্রবল ইচ্ছশক্তির কাছে শুধু বার্ধক্যই পরাস্ত নয়, প্রকৃতিও মাথা নত করে। ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বহুদিন ৮০ পার হয়ে এসেছেন কিন্তু ইতিহাস গবেষণায় এখনও তাঁর বিরাম নেই। এমনি কত শত মানুষ ৮০।৯০ পার হয়েও কর্মে আসক্ত ও শক্তসমর্থ হয়ে সানন্দে জীবন যাপন করেছেন—তাঁদের আমরা না জানলেও তাঁরা যে আছেন উপরের তথ্যই তার প্রমাণ।

কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন সামনে উপস্থিত তখন তথ্য-আহরণের আর দরকার কি? গোপালদার আজকের এই সংবর্ধন উৎসব যাঁর আশীবাদ ধন্য হচ্ছে, গোপালদার এবং আমাদের সবাকার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উপস্থিতি এবং তাঁর সবল ও সক্ষম দেহমন ও অতন্দ্র জ্ঞানসাধনার মধ্যে বার্ধক্য ও তারুণ্যের এমন সুষম অবস্থান দুর্লভ। গুরুশিষ্যের সম্মিলিত কণ্ঠে আজকের এই উৎসবের যোগ্য স্বস্তিবাচন:

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বী নাবধীতমস্তু……

আমরা যেন সমভাবে বাঁচি, সমভাবে ভোগ করি,
সমান সামর্থ অর্জন করি, আমাদের অধীত বিদ্যা যেন সফল হয়—

এই সব তথ্য ও নজির থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে মানুষ একটা বয়সে পৌঁছিয়ে নতুন করে দম নিয়ে জীবনপথে যাত্রা করে, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বাহাত্তরের সঙ্গে দুয়াত্তরের মিল দেখে এই বয়সটাকেই সেই সন্ধিকাল অনুমান করেছিলাম। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও যে আমার অনুমানকে সমর্থন করে তা জানিয়ে রাখা দরকার। তাঁরা নিশ্চিত যে ৭২-এ পৌঁছলেই জীবনের চাকাটা শৈশবের দিকে ঘুরতে থাকে।[৬]

অতএব বাহাত্তরকে দুয়াত্তর বলে গোপালদার নবজীবনের যাত্রাকে অভিনন্দন জানাই।

শেষে একটা কথা বলার আছে। আমার মত যারা তাঁর কাছে আসার যোগ্য নই, তাঁর সরলতার সুযোগে এসে জুটেছি, আমাদের জ্ঞানে, কর্মে ও মর্মে দেশের মাটি ও মানুষকে কতখানি তাঁর মতো মেলাতে পেরেছি তার হিসেব নিতে গেলে বোঝা যাবে যতখানি তাঁর প্রশ্রয় পেয়েছি, বোধহয় সেই অনুপাতে তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হইনি। আমার ও আমাদের ব্যর্থতার দায় গোপাল-দাকেই নিতে হবে এবং তাঁর উত্তরসাধকদের সঙ্গে তাঁকেই যোগসাধন করতে হবে। আমরা বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হই, না, বিচ্ছিন্ন হই বলেই আমাদের বয়স হয়—এর জবাব বোধহয় দ্বিতীয় উক্তি। এবং বিচ্ছিন্ন না-হবার বা যোগ না-রাখার ত্রুটি আমরা বয়সের উপর চাপিয়ে স্বেচ্ছায় নিঃসঙ্গ হই। যে-ইচ্ছার তাগিদ থেকে পর আপন হয় তাই তারুণ্যকে চিরঞ্জীব করে। আমাদের পারিবারিক জীবনে পুত্র পিতা হয়ে, পরে পিতামহ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে যখন পৌত্রের 'দাদা' ডাক শুনে তার হাতে হাত মেলায়, তখনই জীবনে আসে পরিপূর্ণতার আনন্দ।[৭]

গোপালদার এখনও আমাদের উত্তর তৃতীয় পুরুষের কণ্ঠে 'দাদা' ডাক শোনা বাকি আছে। গোপালদাকে ভবিষ্যতে তারাই নিয়ে যাবে। আমাদের প্রথম যৌবনে যে-সহজ অন্তরঙ্গতার আধার ও আশ্রয় হয়ে আমাদের তিনি 'দাদা' হয়েছেন, এ-কালের ও আগামীকালের তরুণদের কাছে হয়ত সেই অন্তরঙ্গ আশ্রয়ের প্রয়োজন আরো বেশি, এবং আমরা জানি, তরুণদের এই প্রাণস্পর্শই গোপালদার সঞ্জীবনী, তাদের সহযাত্রী হয়েই তিনি পাবেন সার্থকতার আনন্দ।[৮]

সংযোজন

*গোপালদার ৭২ বৎসর পূর্তি-উৎসবের পরে এই কয় বছরের মধ্যে কীর্তিমান দীর্ঘজীবীদের মধ্যে তিনজন মনীষী আর জীবিত নেই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

*গোপালদার সেই সংবর্ধন সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে, শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র সেই সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি কারও শতায়ু কামনা করার বিপক্ষে, যেহেতু বেশিদিন বাঁচলে কর্মক্ষমতা লোপ পায়, দেহ পঙ্গু হয়ে যায়, এবং এ অবস্থায় বেঁচে থাকা মানে জীবন্মৃত হয়ে থাকা। জীবন যতদিন বলিষ্ঠ, কর্মঠ, ততদিনই জীবনধারণের সার্থকতা। তাঁর মতে ৮০ বছরের পরে এই অবস্থা আর থাকে না।

দুই

আনন্দের কথা, শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্র নিজেই নিজের উক্তি খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন, দীর্ঘায়ুর সঙ্গে কর্মক্ষমতা হ্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং আমরা কামনা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল নিজেকে অপ্রমাণ করে চলুন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৪। এই বয়সেও ইতিহাসের সূত্রসন্ধানে বা অশক্ত, ও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর থেকে বয়সে ছোট, বন্ধুদের খবরাখবর করতে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দৈনিক ২০।৩০ মাইল যে-রকম অক্লেশে বাসে, ট্রামে, তা না পেলে, পায়ে হেঁটে, বেড়াচ্ছেন, তাতে অন্তত তিনি স্বীকার করবেন, কর্মক্ষমতার মাপকাঠি সব সময় বয়স নয়।

এছাড়া যে-৮০ বছরে তিনি জীবনের ছেদ টানতে চেয়েছিলেন, সেই আশি বছরই শ্রদ্ধেয় মিত্রর নবজীবনের সূচনা করেছে। যারা তাঁর পূর্ব পরিচিত, তাদের কাছে তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি ও বাগ্মিতার জন্য অনেক আগে থেকেই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই পরিচয়ের পরিধি ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তাঁর মনীষার পরিচয় সাধারণ বাঙালি পাঠক পেতে আরম্ভ করল যখন থেকে তিনি নিয়মিত কলম চালনা শুরু করেছেন, এবং তা করেছেন তাঁর ৮০ বছর বয়স পার হবার পর। ৮০ থেকে ৮৪—এই কয় বছরের মধ্যে এখন তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন সুপ্রতিষ্ঠ পুরাবিদ্ ও লেখক, তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে—এবং 'কলিকাতা দর্পণ' নামে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফল শীঘ্রই বই হয়ে বার হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে কথা না রাখা যে কত বাঞ্ছিত শ্রীরাধারমণ মিত্র তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যারা বয়সে তরুণ তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বলিষ্ঠ তারুণ্যের কাছে নিষ্প্রভ ও নির্জীব।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Confrey and Goldstien (1960), 'Health Status in Aging People' in 'Handbook of Social Geroutology'. ed. C. Tibbitts P. 37.

২. তদেব p. 32

৩. Desai and Naik, 'Problems of Retired People in Greater Bombay', Quoted from 'U. N. Population Studies' : p. 2

৪. Breen. L, Z, 'The Aging Individual' in ed. Tibbitts' op. cit. p. 148.

৫. Pal. R, 'Biology of Senescence' p. 37

৬. তদেব : p. 72 Especially at the age of 72, there is a tendency of shift towards childish mentality.

৭. Peter Townsand (1959), 'The Family Life of Old People', London. Routledge and Kegan Paul p 210.
"It (the extended family) continues to provide a natural, if conservative, means of— self fulfilment and expression, as the individual moves, from the first to the third generation, learning, performing and teaching the functions of child, parent and grand parent.'

৮. Summons. L. W., 'Aging in Pre Industrial societies' in ed. Tibbitts op cit. p. 87.
' A secret of success for most people facing old age is to find for themselves places in society in which they can age with participation and fulfilment and 'te keep on participating tactfully and strategically up to as near the end as posslible. Aging must be gamy to the end to be very good.'

গোপাল হালদার ঃ স্বনামা পুরুষো ধন্য

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এমন একজন ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে অক্লেশে বলা যায় : hōs kharien est' anthrōpos, hotan anthrōpos ē (i)—'how charming a thing is man when he is man'. অবিশ্যি এদিকে-ওদিকে দু-চারজন হয়তো আছেন যাঁরা ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলবেন, কিন্তু বড্ড বেশি রাবীন্দ্রিক, শত্রুর বিরুদ্ধে যথোচিত ঘৃণার অভাব আছে! সন্দেহ নেই, গোপাল হালদার রাবীন্দ্রিক, আর যেহেতু তিনি মানবধার্মিক, সেই কারণেই তিনি কমিউনিস্ট।

কমিউনিস্ট? কেমন? যেমন সহপাঠী সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসুর **Gopal Haldar : A friend with a difference,** তেমনি **Gopal Haldar is a communist, but with a difference**। এই **difference** টুকুই কিন্তু একজন খাঁটি কমিউনিস্টের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রগতির শত্রুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশে গোপাল হালদার চিরদিন অকুণ্ঠ ও মুক্তকণ্ঠ, কিন্তু সে ঘৃণার প্রকাশে ঘৃণার প্ররোচনা নেই, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—কমিউনিজমের উৎস **humanism,** ঘৃণা তার প্রেরণা নয়। দীক্ষিত হয়েও গোপাল হালদার তাই **orthodox church**-এর গোঁড়া নন। 'আরভি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদ্ অপি গরীয়সী'—একথা তিনি মানেন না। তিনি শাস্ত্রী, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি শাস্ত্রগ্রস্ত নয়। কার্লমার্কস্ তাঁকে দিয়েছেন দর্শন, কোনো বীজমন্ত্র দেননি জপ করবার জন্যে। গোপাল হালদার দলে থেকেও তাই 'দলছুট', অস্থির **non-conformist**—বরাবরই।

গোপাল হালদারের প্রথম গুরুকুল নোয়াখালির 'সবুজ সঙ্ঘ'—যে গুরুকুলের বৃহস্পতি ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আর 'কর্তা' গোপাল হালদারের দাদা রঙ্গীন হালদার। ঘরে-বাইরে অনুকূল পরিবেশে গোপাল হালদারের বয়স বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনেরও বাড় হতে থাকে —যে 'মন নামক বিচিত্র জিনিস এসে জুটে মানুষ নামক জীবটার জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, যে-মন বিনা মনন অসাধ্য, আর মানুষ তো বাঁচে মননেই।

নোয়াখালি থেকে ইস্কুলের পড়া শেষ করে গোপাল হালদার আসেন কলকাতায় (১৯১৮), যেখানে আগে থেকেই তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর দাদা রঙ্গীন হালদার। দাদার সহচর হয়েই তিনি কলকাতা দর্শন শুরু করেন, '...কলকাতার এই বহুমুখী ও বহির্মুখী জীবনধারার সামনে তখন এই কুতূহলী মানুষ আমাকে জীবনের বহুমুখী জিজ্ঞাসার দিকেও এগিয়ে দেন—অর্থাৎ শাদা কথায়, দাদা আমার মাথাটি খেলেন।' এই 'দাদা'-ই ছিলেন গোপাল হালদারের যৌবনে তাঁর **Friend, Guide & Philosopher**—কাছে থেকে, কাছে না-থেকেও।*

গোপাল হালদারের কর্মজীবন শুরু হয় কলকাতা আসবার আগেই—নোয়াখালিতে থাকতেই। সে-কর্ম হল, শাদা কথায়, দেশের কাজ। চোদ্দ বছর বয়সে, '১৯১৬ থেকে বিপ্লবী দলে ঢুকেছি, বিবেকানন্দ তাকে বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ শোধন করেছেন।' দেশের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কাজ গোপালবাবু নোয়াখালিতে শুরু করেছিলেন -সে হল আড্ডা দেওয়া, ইস্কুলের অ-পাঠ্য বই-পত্রিকা পড়া। কলকাতার ছাত্রজীবন তাঁর কর্মজীবনে ব্যাঘাত ঘটায় না, তিনি বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের ধারায় ছুটতে থাকেন। '১৯২১-এর শেষে' যখন জানতে পারলেন 'স্বরাজ আসতে দেরি নেই' তখন বি.এ. পরীক্ষা এক বছর মুলতুবি রাখাই উচিত মনে করে কলকাতা ছেড়ে নোয়াখালি চলে যান, 'মাস তিন পরে পরীক্ষা। এ কি পরীক্ষার সময়? মুখ দেখাব কি করে—এমন বৎসরে স্বরাজের থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি?' কিন্তু প্রত্যাশিত স্বরাজ আসে না, গোপাল হালদারকে কলকাতা ফিরে আসতে হয়, প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে স্কটিশ-চার্চ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. পাশ করতে হয়। স্বরাজ না এলেও তার সাধনা চলতে থাকে, গোপাল হালদারও রাজনীতি ছাড়েন না। যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে গোপাল হালদার ইংরিজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে (১৯২৪)

*১৯১৮ সালের শেষ থেকে পাটনাবাসী হলেও, অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার কলকাতাকে কখনো ছাড়েন নি, নিজের সঙ্গে কলকাতাকেও নিয়ে গিয়েছেন পাটনায়, পাটনা থেকে বারবার এসেছেন কলকাতার আড্ডায়। পরিণত বয়সে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নেবার পরে পাটনায় থেকে গেলেও অধ্যাপক হালদার মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে কিছুদিন কাটিয়ে গিয়েছেন। এইতো গত বছরও (১৯৭৮) কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন আড্ডা জমিয়েছিলেন। আবারও আসবেন, আশা ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এই সেদিন, ৯ ডিসেম্বর (১৯৭৯) রবিবার রাতে, অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার ৮৭ বছর বয়সে পাটনায় জীবনের আড্ডা থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

সংসারসমরাঙ্গনে এসে দাঁড়ান। আইনের পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন (১৯২৫)।

অতঃকিম? অধ্যাপনা? 'কিন্তু সে দিনে (১৯২৪-২৫) কলেজ ছিল কয়টি? আঙুলে গোনা যেত। তাতে কর্মখালি কদাচিৎ ঘটত, আরও কদাচিৎ কারও তা জুটত—।' নোয়াখালির গোপাল হালদার এম. এ, বি.এল অতঃপর নোয়াখালিতে স্বগৃহে ফিরে যান। সেখানে 'উকিলের ছেলে' উকিল হয়ে কিছুদিন আদালতে যাওয়া-আসা করেন, বন্ধুগোষ্ঠীতে আড্ডা দেন, লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করেন, স্থানীয় সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী'-তে কলম চালান, 'আর কলকাতার ইংরেজি-বাঙলা কাগজে কখনো বা গল্প-প্রবন্ধ' লেখেন, 'অর্থাৎ সেই সাংবাদিকতা, নামমাত্র দক্ষিণায়।' 'দেশের বাণী'-তে তাঁর লেখা সরকারের বিষনজরে পড়ে, সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী 'সিডিশনের ও ক্লাস হেটরেড প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত' হন, মামলায় তাঁর অর্থদণ্ড আর কারাদণ্ড হয়। এই সময়েই নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সঙ্গে গোপাল হালদারের প্রথম সাক্ষাৎ আর আলাপ হয়। গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রাবীন্দ্রিক গোপাল হালদার গান্ধীজীব চরকা-কাটার সূত্রটি গ্রহণ করতে পারেন না। তখন নোয়াখালিতে যে-অবস্থা তাতে তাঁর 'দম বন্ধ' হয়ে আসছিল। 'মনের এই অশান্তিতেই' তিনি নোয়াখালি ছাড়েন, বুঝতে পারেন 'অন্ততঃ বাইরের বৃহৎ জীবনে আমার মনের বায়ু পরিবর্তন প্রয়োজন। কলকাতায় সে অবকাশ আমার মিলবে। আর শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আড্ডার আসরে আমরও প্রবৃত্তি।'

বছর দেড়েক নোয়াখালিতে কাটিয়ে গোপাল হালদার তাই আবার চলে এলেন কলকাতায়। 'মনে করছিলাম গবেষণার কাজ করব।' কিন্তু 'একশটা দিকে যার ঝোঁক কিসে সে গবেষণা করবে?—ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, না, সমাজতত্ত্বে, না, ভাষায়, সাহিত্যে?' এই মানসিক অবস্থায় তাঁর দাদা অধ্যাপক রঙ্গীন হালদারের সঙ্গে গোপাল হালদার যান অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। (আগেই সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর একদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল প্রমথ চৌধুরী মশায়ের বাড়িতে)। সুনীতিকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শেষে স্থির হয়, গোপালবাবু সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার কাজ করবেন। এতদিনে গোপাল হালদার তাঁর যথার্থ গুরু পেয়ে গেলেন—'গবেষণার গুরু ছাড়া তিনি আমার অনেক বিষয়ে শিক্ষার গুরু, অনেক জিজ্ঞাসার উদ্বোধক,' যে-গুরু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আর স্বামী বিবেকানন্দের মতো 'জেনে, না-জেনে আমাকে এই কমিউনিজমের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।' সত্যি, এ বড় কৌতুক! কমিউনিজমের সঙ্গে যাঁর কোনোকালেই সম্পর্ক ছিল না, তিনিই গোপাল-বাবুকে নিয়ে যান কমিউনিজমের দিকে; আর যে-গোপাল হালদার কমিউনিস্ট তিনি শেষ পর্যন্ত মানবিকী বিদ্যায় অ-কমিউনিস্ট সুনীতিকুমারের একমাত্র উত্তরসাধক।

যাইহোক, ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের কাছে গোপাল হালদার ভাষাতত্ত্বে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন ('১৯২৬-২৭ থেকে গবেষণার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর গৃহে পাঠ নিই'), ভাষাতত্ত্ব ছাড়া অন্য বিষয়েও—'সমাজ-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে'। এই সময়ে 'সাহিত্যের হুজুগ ও সাহিত্যের সাংবাদিকতা'ও তাঁকে পেয়ে বসে। 'শনিবারের চিঠি'-র সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই যোগ ছিল। নতুন যোগ হল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের ছেলে 'অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব সন্তান', 'প্রবাসী-প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি সাপ্তাহিক' 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকার সঙ্গে, আর সেই সুবাদে 'মডার্ন রিভিয়্যু-প্রবাসী' পত্রিকা দুটির সঙ্গেও। '…প্রবাসীর লেখাতে আমি আবাল্য পুষ্ট, ও-প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে তাই আগ্রহ ছিল।' '…প্রবাসীতে অবশ্য আমি আগেও লিখেছি। মডার্ন রিভিয়্যুতে খুচরো এক-আধ লাইন লিখেও তবু কম গর্ব বোধ করতাম না।' 'প্রবাসী' আর 'ভারতবর্ষ'-এ 'দু-একটা গল্প-প্রবন্ধ' 'আগে বেরিয়েছে', 'এক-আধটি লেখা 'সবুজপত্রে'-ও বেরিয়েছে।' 'প্রবাসী-মডার্ন রিভিয়্যু'-র (আর তার অন্তর্গত 'শনিবারের চিঠি'-র) আড্ডাতেই সেকালের বাঙালি সুধী সমাজের সঙ্গে গোপাল হালদারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ভাষাতত্ত্বের চর্চাও চলে, সাহিত্যের চর্চা আর সাংবাদিকতাও চলে, সবই চলে রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখেই।

কিন্তু আবার তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হল। 'রাজনীতির নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে' গোপাল হালদার তাঁর 'বাবার নির্দেশে (প্রায় আদেশে)' নোয়াখালি হয়ে ফেনীতে গেলেন ফেনী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের কাজ নিয়ে (জুলাই, ১৯২৯)। 'তারপর সুনীতিবাবুর ও দাদার সঙ্গে ১৯২৯-এর বিজয়ার পরে গেছলাম দক্ষিণভারত (তামিলদেশ) প্রদক্ষিণে—সে এক গভীর অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা। কয়েক মাস পরে কলেজ থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাই (১৯৩০, জুন) সুনীতিবাবুর রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।' সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে গোপালবাবু ভাষাতত্ত্বের

গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'বলতে বাধা যে এ কর্মে [গবেষণায়] যা তিনি [সুনীতিকুমার] আশা করেছিলেন আমি তখন তা পূরণ করতে পারি নি।...ত্রিশের সেই দিনগুলিতে একদিকে আইন-অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী আন্দোলনের যে জোয়ার নেমে আসে আমার সাধ্য ছিল না তার থেকে দূরে থাকি--গবেষণা-কর্মই তাই পিছনে পড়ে রইল। সুনীতিবাবু তাতে দুঃখিত হলেও আমাকে নিবৃত্ত করতে চান নি।' সুনীতিকুমার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে একদিন (১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে) সকালে পথ থেকে পাকড়াও করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। ভাষাতত্ত্বের গবেষক যুবকটির 'বিশেষ পরিচয়' জানতে পেরে কবি তাঁর কাছে দেশের বিপ্লবী যুবকদের মনের কথা জানতে চান, এ-প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কিছু বাক্যালাপও করেন। কবিগুরুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আর আলাপ গোপাল হালদারের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর মাস আটেক পরেই গোপাল হালদারের উপর নেমে এল ব্রিটিশ রাজের রুদ্র রোষ—তিনি হলেন রাজবন্দী (জুলাই, ১৯৩২)।

গোপালবাবু লিখেছেন, তিনি সুনীতিকুমারের আশা পূরণ করতে পারেন নি। সুনীতিকুমারও বহুবার বলেছেন, গোপালের অনেককিছু করবার ছিল, করতেও পারতো. কিন্তু । কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের গবেষণায় গোপাল হালদার যে-কাজ করেছিলেন, যে-কোনো গবেষক তাই নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট থাকতে পারেন। ভাষাতত্ত্বে গোপাল হালদারের গবেষণার প্রথম কাজ *A Brief Phonetic Sketch of the Noahali Dialect of South-Eastern Bengali*—সুনীতিকুমারের উদ্যোগেই নিবন্ধটি ছাপা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্নালে (JDL), ১৯২৯ সালে। নিবন্ধটির কয়েকটি ছাপা কপি সুনীতিকুমার পাঠিয়ে দেন গ্রীয়রসন, ঝুল ব্লক, টার্নার, শ্রীসিদ্ধেশ্বর বর্মা প্রমুখ কয়েকজন দিকপাল পণ্ডিতের কাছে। তাঁরা নিবন্ধটি পড়ে নবীন গবেষকের কৃতির তারিফ করেন। গোপালবাবু সুনীতিকুমারের পরামর্শে আর সহায়তায় ভাষাতত্ত্ব ছাড়া অন্য বিষয়েও গবেষণা করেন—এমন দুটি বিষয় গোপীচাঁদের উপাখ্যান আর মৈথিল কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ স্থগিত থাকে, কিন্তু গোপীচাঁদের উপাখ্যান নিয়ে গবেষণা এগিয়ে চলে। এই গবেষণার ফল **Gopichand Legend**—সুনীতিকুমারের পরামর্শে

গোপালবাবু এই নিবন্ধটি ১৯৩০ সালে পাটনায় ষষ্ঠ নিখিল ভারত প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ সম্মেলনে উপস্থিত পণ্ডিতজনদের সামনে পড়েন। নিবন্ধটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয়; পরে, ৯৩৩ সালে, সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে এটি ছাপা হয়। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে তাঁর একটি ইংরেজি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত **Gopichand Legend**-এর উল্লেখ করেন একাধিক-বার। ভাষাতত্ত্বে গোপাল হালদারের দ্বিতীয় গবেষণামূলক নিবন্ধ ***A Skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengal***—জেলে যাবার আগেই এটি তৈরি হয়। কিন্তু সুনীতিকুমার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে এটি ছাপাতে দেন, তখন গোপালবাবু জেলখানার অতিথি। সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধটি ছাপা হতে থাকে, সুনীতিকুমার নিজেই প্রুফ দেখে দেন। নিবন্ধটি ছাপা হয়ে বেরোয় ১৯৩৩ সালে—লেখক তখনো জেলে। জেলে যাবার আগেই গোপালবাবু অন্য-একটি বড় গবেষণার কাজে হাত দেন—***A Comparative Grammar of East Bengali Dialects.*** কিন্তু ইংরেজ-রাজ তাঁর হাত ধরে তাঁকে জেলে নিয়ে পোরে। জেলের মধ্যে গবেষণার সুযোগ না পেলেও গোপালবাবু তাঁর কাজ চালিয়ে যান। তাঁর গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার বাইরে থেকে তাঁকে বইপত্র পাঠিয়ে, চিঠিতে নির্দেশ দিয়ে, মাঝে-মাঝে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে বন্দী ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করে তাঁর কাজে সাহায্য করেন। এইভাবে সাহায্য পেয়ে গোপালবাবু জেলের মধ্যে তাঁর আরব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ করেন। সুনীতিকুমারের আগ্রহ আর প্রযত্ন সত্ত্বেও, এই সন্দর্ভটি আজও পর্যন্ত বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়নি—ছাপার জন্য প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়ে আছে। সুনীতিকুমারের ইচ্ছা ছিল, এটির প্রুফও তিনিই দেখবেন, আর এই বইয়ের একটি ভূমিকাও তিনি লিখবেন। সে-ইচ্ছা তাঁর পূরণ হল না। সুনীতিকুমারের প্রুফ-দেখা মানে নিছক কপির সঙ্গে মিলিয়ে ছাপার ভুল সংশোধন করা নয়—মূল পাঠের পরিমার্জন আর পরিবর্ধনও বটে। বই হয়তো ভবিষ্যতে ছাপা হবে—এখনো সে-আশা ছাড়িনি—তবে সুনীতিকুমারের কলমের স্পর্শ তাতে থাকবে না। এ-আফসোস কেবল গোপালবাবুর ব্যক্তিগত নয়, বাঙালি মাত্রেরই। 'রূপনারানের কূলে'-র প্রথম খণ্ড পড়ে সুনীতিকুমার বলেছিলেন, **Gopal is a fine scholar,** একটু থেমে, **at the same time a creative artist।** তিনি এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। সাহিত্যশিল্পী গোপাল হালদারকে বিশেষভাবে

সংবর্ধনা জানাবার জন্য একটি ইচ্ছা জেগেছিল তাঁর মনে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড যখন বেরুল (১৯৭৮), সুনীতিকুমার তখন নেই।

বন্দিশালায় গোপালবাবুর পক্ষে নতুন গবেষণার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশ্বসাহিত্যে নিষ্ণাত গোপাল হালদার তাই মাতৃভাষার গবেষণা ছেড়ে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় হাত দেন। জেলে বসে লেখেন 'একদা'—বাংলা ভাষায় নতুন টেকনিকে অভিনব উপন্যাস 'একদা'। বিদেশী সাহিত্যের উদ্গার নয়, বিদেশে উদ্ভাবিত নতুন টেকনিক আয়ত্ত করে মাতৃভাষায় তার সার্থক প্রয়োগে সৃষ্ট জাতীয় সাহিত্য। 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'—তিনখানি উপন্যাসেই জেলে বসে লেখা—'একদা' বিদেশী রাজের জেলে, অন্য দুখানি স্বদেশী রাজের জেলে। সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক 'একদা'-কে বলেছেন বাংলা ভাষায় 'অভিনব রাজনৈতিক উপন্যাস'। **Psychological** উপন্যাসও কি নয়? 'একদা', 'অন্যদিন' জাতীয়তাবাদী বাঙালি মধ্যবিত্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর সার্বিক চেতনার রূপান্তরের সাহিত্যরূপ-কথা। 'আর একদিন' তার পরেকার জীবনের একটুকরো কথা। তিন-খানির মধ্যে সাহিত্যকর্ম হিসাবে প্রথমখানি উত্তম, দ্বিতীয়খানি মধ্যম, তৃতীয় খানি অধম। (বলাবাহুল্য, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। অন্য ব্যক্তি এ মতে সায় নাও দিতে পারেন।) গোপাল হালদার আরো দশখানি উপন্যাস লিখেছেন। ঔপন্যাসিক গোপাল হালদারকে দাবিয়ে রেখেছেন মনীষী গোপাল হালদার। গোপাল হালদারের উপন্যাসগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক আলোচনার খুবই দরকার। কে এগিয়ে আসবেন এ-কাজে? জেলে যাবার আগেই 'ধূলিকণা'-র মিষ্টি গল্পগুলি (গল্প, আবার গল্পও নয়) লেখা হয়। এই বইখানি অনেকেই দেখেননি, লেখক নিজেও সম্ভবত ভুলে গিয়েছেন তাঁর এই সন্তানটিকে। জেলের মধ্যে গোপাল হালদার রচনা করেন তাঁর আশ্চর্য সুন্দর 'বাজে লেখা'-র (নতুন সংস্করণে নাম 'স্বপ্ন ও সত্য') রমণীয় প্রবন্ধগুলি—পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি ভাবতে শেখায়। এ হালের রম্যরচনা নয়। অনেকদিন ধরে দস্তুরমতো সেচ-সার প্রয়োগে মন আবাদ না করলে মননে এমন ফসল জন্মে না। এ লেখার মেজাজ, এর স্টাইল লেখকের নিজস্ব। নিজে যিনি ভাবতে পারেন, বলবার কথা তাঁর-ই থাকে। বলবার কথা নিজের মতো করে সবাই বলতে পারেন না। 'বাজে লেখা'-তে আর পরবর্তীকালে 'আড্ডা'-তে গোপাল হালদার

তাঁর বলবার কথা নিজের স্টাইলে বলেছেন। 'বাজে লেখা'-র মতো লেখা গোপালবাবু আর লেখেননি, হয়তো এমন লেখার কালও চলে গিয়েছে। জেলের মধ্যে কী আনন্দে তিনি ছিলেন যে এমন আনন্দরস তিনি নিজে উপভোগ করে অন্যদেরও পরিবেষণ করেছেন! গোপাল হালদার কবিতাও লিখেছেন—তাঁর 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী' পুলিশের হাতে পড়ে নিরুদ্দেশ হলেও, পরবর্তীকালের 'নীপারের বাঁধ' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সাপ্তাহিক 'অরণি'-র পাতায় বাঁধা পড়েছিল।

সাহিত্যজিজ্ঞাসার সঙ্গে বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে কৌতূহলও গোপালবাবুর প্রথম যৌবন থেকেই। জাতীয় আন্দোলনে ব্যস্ত থেকেও তিনি আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলি পড়তে পড়তে মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদের ঘোর কাটতে থাকে, দেশের আভ্যন্তর মূল সমস্যার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, বহির্জগতে বিশ্বসংসারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়। জেলে যাবার আগেই মার্কসীয় সাহিত্যের সঙ্গে গোপালবাবুর কিছুটা পরিচয় হয়েছিল, রুশদেশের নভেম্বর বিপ্লবের বিশ্বজনীন তাৎপর্য তিনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একটা 'অস্পষ্ট ধারণা' —ন্যাশনালিজম আর সোশ্যালিজম-এর এক 'জগাখিচুড়ি'—তাঁর মাথায় তৈরি হয়েছিল। জেলে গিয়ে গোপালবাবু যেমন নিভৃতে সাহিত্যসাধনার অবসর পান, তেমনি সুযোগ পান বন্ধুদের সহবাসে আলাপ-আলোচনার, অধ্যয়নের, অনুশীলনের, আত্মনিরীক্ষার। বন্দিশালাতে অনেক 'বিচার-বিতর্ক সমালোচনা' চলেছে দিনের পর দিন। বাইরে থাকতেই মধ্যবিত্ত বিপ্লবীর চেতনার রূপান্তরের যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, এর ফলে তার পরিণতি ঘটে বন্দিশালায়। 'একদা'-র অমিত 'ইতিহাসের মহাসত্যকে' জানতে পারে—সে 'অন্যদিন'।

> 'ইতিহাসের মহাসত্যকে তুমি জানিতে চাহিয়াছ, অমিত ; তাহাই তোমার পরিচয়। মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছ, অমিত ; তাহাতেই তোমার মুক্তি- তোমার নিঃসঙ্গ সত্তার সম্পূর্ণতা। এই মুক্তি, এই সম্পূর্ণতা সঙ্গে লইয়া তুমি জীবনের মধ্যখানে গিয়া আজ আবার দাঁড়াইবে—ইতিহাসের আকাশ জুড়িয়া যখন বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নিভরা প্রলয়ের মেঘ সাজিতেছে, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে যখন নবজন্মের প্রসব-বেদনা। 'অন্য দিন আজ, অন্য দিন, অমিত।'

অন্যদিনে গোপাল হালদার বেরিয়ে আসেন জেল থেকে—'এ যুগের দৃষ্টি, নিয়ে, মার্কসীয় দর্শন নিয়ে (জুলাই, ১৯৩৮)।

বন্দিশালা থেকে ছাড়া পেয়ে গোপাল হালদার 'ঘোরাপথে' আবার 'সাংবাদিকতায় গিয়ে' পৌঁছান—বছর দুয়েক (১৯৪০-৪১) তাঁর কলম চলে সুভাষচন্দ্রের 'Forward Bloc'-এ, 'Hindusthan Standard'-এ। তারপর তিনি পাকাপাকি ভাবে স্বগৃহে থিতু হয়ে বসেন।

কমিউনিস্ট পার্টিতে গোপাল হালদারের প্রথম কাজ ঠিক হয় কৃষক ফ্রন্টে। তিনি সোৎসাহে কৃষক ফ্রন্টের কাজে লেগে যান। পরে চলে আসেন পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে। কৃষক ফ্রন্টে কাজ করবার সময় কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাঁর কমিউনিস্ট দায়িত্ব ভোলেননি। আবার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে এসেও তিনি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব এড়িয়ে যান না। আদর্শের প্রতি, দেশের প্রতি, পার্টির প্রতি আনুগত্যে তাঁর কখনো চিড় ধরেনি। গোপাল হালদার কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন কৃতীর খ্যাতি নিয়ে (যেমন এসেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন পার্টির হাতে। পার্টিকে তিনি সিঁড়ির মতো ব্যবহার করেননি নিজের স্বার্থে। পার্টি যখন যে-কাজে দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছে, তিনি সেই দায়িত্ব সানন্দে সাগ্রহে মাথা পেতে নিয়েছেন—'এ কাজ আমায় নাহি সাজে' বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। মনে আছে, খ্যাতনামা বাঙালি বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদার আমাদের মতো অর্বাচীন কর্মীদের সঙ্গে মিলে শেয়ালদা ইস্টিশনের সামনে—হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে বউবাজার মোড় পর্যন্ত—রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' ফেরি করেছেন। গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ে একটি চরিত্রের ভূমিকাতেও তাঁকে একবার মঞ্চে দেখেছিলাম, মনে পড়ছে।

কমিউনিস্ট হলেই মিছিলে সামিল হতে হবে তা অবিশ্যি নয়, কিন্তু কোনো-না-কোনো ভাবে নিপীড়িত মানুষের জীবনের শরিক হতেই হবে, কর্মে আর কথায় সত্য আত্মীয়তাও অর্জন করতে হবে। গোপাল হালদার জীবনে জীবন যোগ করবার সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, এত বড় কথা বলব না, তবে একথা মানতেই হবে প্রথম যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত এই সাধনাতেই তিনি তৎপর আছেন। তাঁর অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সৌখিন মজদুরির নালিশ

কেউ তুলতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, গোপাল হালদার কমিউনিস্টদের সহযাত্রী মাত্র নন, তিনি কমিউনিষ্ট অভিযাত্রীদেরই একজন।

পার্টির ভ্রান্তি বুঝতে পেরেও পার্টির তিনি প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, উচিত কথা বলেন পার্টির ভিতরে থেকেই। একসময় আমরা প্রায় সকলেই 'প্রগতি সাহিত্যের 'আত্মসমালোচনা'-র তাড়নায় বিকারের ঘোরে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'সব ঝুট হ্যায়' বলে উন্মার্গগামী হয়েছিলাম, গোপাল হালদার কিন্তু তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'কালচার ও কমিউনিস্ট-দায়িত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্যেই অবিচল ছিলেন।* পার্টির বামাচারে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সত্যি, ক্ষোভ প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি—কিন্তু ভিতরে থেকে। গোপাল হালদারের এ-এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

গোপাল হালদারের কমিউনিস্ট জীবন-পর্বের কর্মকাণ্ডের কথা আশা করি যোগ্য ব্যক্তিরাই বলবেন—আমি বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলতে পারি, তবে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক, পরে অনন্য নায়ক। সংঘ কার্যত না থাকলেও নায়ক তাঁর কাজ যথারীতি করে চলেছেন।

ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন আর গণনাট্য আন্দোলন তথা এ-যুগের বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন আর মুক্তিসংগ্রামে গোপাল হালদারের নিরলস কর্মতৎপরতার কথা বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আশা করি যোগ্য ব্যক্তিরা সে-কাজটি করবেন। আমি কেবল তাঁর স্মরণীয় একখানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

মার্কসবাদী গোপাল হালদারের সর্বপ্রথম মহৎ কীর্তি তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১)—যা বাংলা ভাষায় এখনো মার্কসীয় সাহিত্যের একখানি অনন্য ক্লাসিক। ১৯৪০-৫০-এর দশকে বহু তরুণ এই বই পড়ে মার্কসীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। প্রকাশের পরেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে সরোজকুমার দত্ত যে-কথা লেখেন তার যৌক্তিকতা এখনো অনস্বীকার্য,

---

* অনেক কাল আগে লেখা হলেও এই প্রবন্ধটি এখনো কালোপযোগী। প্রবন্ধটি আজকের দিনেও কমিউনিস্টদের ডাইনে-বাঁয়ে পদস্খলনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।—লেখক

'…একদিকে যেমন দায়িত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভাবে উগ্র বামপন্থীগণ অতীতকে স্বল্পবিদ্যায় বিকৃত করিয়া একেবারে বর্জনই করিতে চাহিয়াছেন এবং 'নূতন সংস্কৃতির' দিবাস্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই একদল অতিপণ্ডিত অতীতকে নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া নির্বোধ আসক্তির সহিত আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছেন। এই দুই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার মোহ হইতে শিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রয়াসী বাঙালিমনকে মুক্ত করিবার জন্য বাংলার প্রখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুত গোপাল হালদার এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।

'…গ্রন্থকার গোপাল হালদার এই বিহ্বল কোলাহলের মধ্যে সংস্কারমুক্ত সহজ সাহস লইয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন, ধারাপথ নির্ধারণ করিয়াছেন, বর্তমানের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছেন। নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে তিনি আলোচনা করিয়াছেন সংস্কৃতির, উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহার বহু বিভিন্ন রূপ, বিজ্ঞানের কঠিন ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া নির্দেশ দিয়াছেন, 'সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া মানুষ হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।'…ভারতীয় সংস্কৃতির এই সমাজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বাংলাদেশে গোপাল বাবুকেই একরূপ প্রথম পথপ্রদর্শক বলা চলে। এ ক্ষেত্রে ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের গবেষণা ও আলোচনা বিশেষ মূল্যবান হইলেও, শৃঙ্খলা ও সংহতির অভাবে উহা এখনও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।…যে পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম, সংযম, সঙ্গীত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচারপদ্ধতি নিরভিমান প্রাঞ্জলতায় এই আড়াইশত পৃষ্ঠার গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন, সাম্যবাদীগণ দায়িত্বহীন ও পাণ্ডিত্যহীন 'পলিটিক্যাল এজিটেটর' মাত্র নহেন, তাহাদেরও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়, এবং বড় বেশি প্রয়োজন হয়।'

[অরণি, ১৭ অক্টোবর, ১৯৪১]

গোপাল হালদার এই রকমই একজন কমিউনিস্ট—যাঁর সম্পর্কে বিনা

দ্বিধায় বলা যায়, কৃতবিদ্য হলেও তাঁর বিদ্যার অভিমান নেই, কৃতকর্মা হয়েও তিনি কৃতিত্বের বড়াই কখনো করেন নি ; তাঁর ঈর্ষা নেই, অসূয়া নেই, বিদ্বেষ নেই। কিন্তু তাঁর একটি মহৎ ত্রুটির কথাও এখানে বলা দরকার, তাঁর নির্বিচার স্নেহ—অনেক ক্ষেত্রে অপাত্রেও, তাঁর শিশুর মতো সরল বিশ্বাস—যা কখনো কখনো তাঁকেই প্রতারণা করে। তাঁর মহৎ ত্রুটির কথা যখন বললাম তখন তাঁর একটি মহৎ গুণের কথাও বলা দরকার। তিনি জ্ঞানী—যেহেতু তিনি শ্রদ্ধাবান। কিন্তু এই শ্রদ্ধা তাঁর কর্তব্যপালনে কখনো অন্তরায় হতে পারে নি। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে তিনি প্রকাশ্যে নিজের গুরুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর এই সৎসাহসের জন্য সুনীতিকুমারও শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্টই হয়েছিলেন।

'সাহিত্য ও রচনা-রহস্য নিয়ে আমার মনে গত পঁচিশ বৎসর ধরে নানা প্রশ্ন জেগেছিল ; পাঠকমাত্রই দেখবেন এখনো তা শেষ হয় নি ; এবং আরও পঁচিশ বছরেও তা শেষ হবে না।' একথা গোপালদা লিখেছিলেন ১৯৫৬ সালে 'বাজে লেখা'র দ্বিতীয় সংস্করণ 'স্বপ্ন ও সত্য'-র নিবেদনে। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর পার হতে চলেছে, সত্যি এখনো গোপালদার প্রশ্নের শেষ হয় নি। আরও পঁচিশ বছর চলে যাবে, আমরা আশা করি গোপালদা তখনো এই একই কথা বলবেন।

সম্পাদনা ও শ্রুতিলিখন : ধনঞ্জয় দাশ

সমগ্রের সত্য

সিদ্ধেশ্বর সেন

সেদিন গোপালদা আটাত্তরে পা দিলেন—ফেব্রুয়ারির ১১, ১৯৮০। দিন গিয়েছে আমার কাজে, রাত করে, বেশ রাত করেই গোপালদার বাড়ি হাজির হয়েছি।

সারা দিন ধরেই, সেই সকাল থেকে গোপালদা তাঁর জন্মদিনে অতিথি-অভ্যাগত-দর্শনার্থীদের নিয়ে মশগুল হয়েছেন। জন্মদিনের উপহার গ্রহণে আর হাসিমুখে। নানা বিষয়ে, নানান সাহিত্যিক-জাগতিক প্রশ্নে-প্রসঙ্গে সদাজাগ্রত আর সর্বদা ভাবুক এই মানুষটি—শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার—যিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। অত রাত করে, শীতের রাতে দশটারও পর তাঁর ক্রিস্টোফার রোডের ফ্ল্যাটে তবু গিয়ে দেখি গোপালদা তখনও বসবার ঘরেই। দরজা খুলে আমাকে দেখেই বললেন ভেতরে অরুণাদিকে ডেকে, মুখে তাঁর সেই অনাবিল হাসি—ছাখো এতো রাত করে কে আর আসতে পারে—সেই সিদ্ধেশ্বরই এসেছে। আমি তো 'পরিচয়' ঘুরে-টুরে গিয়েছি। ওজর দিলুম। অরুণাদি (অরুণা হালদার) স্মিতমুখে বললেন, ও-সব রাখ। রাত করেছ তো কী! এইতো তোমার পক্ষে স্বাভাবিক সময় হল। না হলেই বরং অবাক হতাম। বোসো। তোমাদের দাদার জন্মদিনের পায়েস খেয়ে যাও।

তারপর আবার কি—নতুন গুড়ের পায়েস-সন্দেশ সহ আরও কত শিল্প-সংস্কৃতির নতুন নতুন সন্দেশে গোপালদা আমাদের সঙ্গে জমে গেলেন। যেমনটি গোপালদার সঙ্গ পেলে হতেই হবে। আরো রাত করে তারপর উঠলাম।

এই দিনে গোপালদার আলাপচারিতার কথায় মনে পড়ে গেল, আরও বছর পনেরো আগে—গোপালদা তখন আরও অপেক্ষাকৃত তরুণই—আর-এক ঘরোয়ায় যে সব প্রসঙ্গ আমায় বলেছিলেন, আর যা আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

একটু থেমে থাকেন গোপালদা। তারপর, শুরু করেন:

আমরা যে কালে, যে পরিবেশে জন্মেছি, গড়ে উঠেছি, তারই স্বাভাবিক

পরিণতিতে পার্টি জীবনে এসেছি।

'স্বাভাবিক পরিণতি' একথাটা যেন বিশেষ ভাবেই ধরিয়ে দিয়ে তিনি বলে চলেন। ১৯০৫ সালের বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার ডেকেছিল। স্বদেশীর গুরুদের দেখিনি। তবু পুব বাংলার ছেলে আমাদের কাছে পরাধীনতা মোচনের, দেশের স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্বপণের ডাক পৌঁছেছিল। একটি জিনিস আমি জেনেছি আর তা ধরে রেখেছিলাম। সেই উনিশ শতক থেকেই বাঙালির দুটি সাধনা—সাহিত্য ও স্বাধীনতার সাধনা।

একে বলব আমাদের 'ন্যাশন্যাল সেল্ফ-এক্সপ্রেশন' (জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্ম-প্রকাশ)। আমরা তার 'টিপিকাল' দৃষ্টান্ত মাত্র।

গোপালদা বলছিলেন, দু-টি বিশেষ প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল। একদিকে বিবেকানন্দের দেশ ও গণসেবার প্রেরণা আর-একদিকে রবীন্দ্র-সাধনা। বিশেষ করে রবীন্দ্র-অবদান, অর্থাৎ সামগ্রিকতার একটা বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সমগ্রের, বৃহতের এক চেতনা। তাই স্বদেশীতেই যাই, আর সাহিত্যই করি—এই বৃহৎ বিশ্ববোধের আঙিনায় দাঁড়িয়েই তা করি। কিন্তু ভুল-ত্রুটি সব সময় এড়াতে পারি? অনেক সময় বৃহৎকে খণ্ড করেও তো দেখেছি। যেমন আমাদের হয়েছিল স্বাধীনতার প্রশ্নে।

কথায়-কথায় খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে সেই 'স্বাভাবিক পরিণতি'র কথায় ফিরে আসেন গোপালদা, আগের কথার খেই ধরেন। বলেন, এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই আসে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। তাই, জাতীয় মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগেও বোধ করেছি যে, যদি জনসাধারণই সক্রিয় ভূমিকা না নিতে পারল, তবে রাজনৈতিক আন্দোলনও তো হল না। রবীন্দ্রনাথ যে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথা বলেছিলেন, জনশক্তির বোধন ছাড়া তা হয় না। আমাদের, বাঙালির, কাছে গান্ধীজীর আগেও তাই এ কথা পৌঁছে গেছে। 'অফ দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল' (জনগণের, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্যে), গণতন্ত্রের এই যে সংজ্ঞা, তার র‍্যাডিক্যাল, প্রাগ্রসর ধারণাই গিয়ে পৌঁছয় কমিউনিজমে।

গোপালদা বলে যাচ্ছিলেন, রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের কথা এসে পৌঁছল আমাদের কাছে। তারপর, তাই নিয়েই ভাবনাচিন্তা, ১৯২৩ থেকে এই বোধ আমার মনে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে—একে প্রেরণাও বলতে পারো, সোভিয়েত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্ত কিছুর প্রতিই

পরম আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকি। অজস্র মানুষ একসঙ্গে গতিশীল হয়ে চলেছে। ঠিক এই জিনিসটা হল না বলেই, আমাদের দেশে যখন অসহযোগ ব্যর্থ হল, তখন আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। তবে গান্ধীজী সম্পর্কে একটি কথা। গান্ধীজী যত 'অব্‌সক্যুরানটিস্ট' (দুর্জ্ঞেয়তাবাদী) হোন না কেন, তিনিই প্রথম আমাদের দেশের আন্দোলনে 'ম্যাস কন্টেন্ট' (গণ-রূপ) আনতে পারলেন।

সেজন্য গান্ধীজী সম্পর্কে শ্রদ্ধা আমার বরাবরের, তা হারায়নি। যদিও এ কথাও জানি যে কংগ্রেসে যে অন্য সমস্ত প্রভাব এসে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তাতেও গান্ধীজীর সায় থেকেই যায়। এই সব অস্থিরতা তখন আমাদের মনে।

গোপালদা খানিকটা যেন আত্মগতভাবেই বলে চলেছিলেন। তাঁদের সে সময়কার অবস্থা, সমগ্র দেশের ও ব্যক্তি-মনের। তিনি বলছিলেন, অন্যদিকে কমিউনিস্টদের কথা ভেবে দেখছি। একটা কথা কিন্তু বরাবর আমার মনে হয়েছে। কমিউনিস্টদের একটা বড় ভুল হল বুঝি খণ্ড সত্যকে বড় করে দেখায়, সমগ্রকে নয়। আর সেই একই সাথেই মনে হতো কংগ্রেসেরও বড় ভুল হবে শ্রমিক-কৃষককে না পেলে। কমিউনিস্ট পার্টিরও তেমনি জাতীয় পটভূমিটি না পেলে। জওহরলালের কথা এই প্রসঙ্গে আসে। এই দিকটির ভাবনায় জওহরলালের অবদান কম নয়।

এ কথা বলতে বলতে এইভাবে গোপালদা ১৯৩১-৩৭-এর যুগে চলে আসেন। বলেন, সে হল আমার বন্দী জীবন। জেলে রয়েছি, প্রেসিডেন্সিতে, বক্সায়। জেলের মধ্যে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে উঠেছে, আমি তাতে যাইনি। মনে করছি, তা হলে হবে বুঝি জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। ধরা পড়েছি বিপ্লবী আন্দোলনে, জেল খাটছি। এখানে ছিলেন আবদুর রেজ্জাক খাঁ সাহেব। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই যে বিপ্লবী ধারার পরিণতি, তার সবচেয়ে বেশি পরিচয় সে সময় পেয়েছিলাম খাঁ সাহেব আর ধরণী গোস্বামীর মধ্যে।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে যেখানে কাজের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছি তা হল কৃষক সভা, গোপালদা বলে যাচ্ছেন। কারণ, আমি আগে-ভাগে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি না। দেখছি গণ-সংগঠনের কাজের মধ্যে দিয়ে কী দাঁড়ায়, কার্যক্ষেত্রে কী হয়ে ওঠে। পার্টিতে যোগ দিচ্ছি না, যদিও ভাল করেই জানি কৃষক সভা কমিউনিস্ট পরিচালিত। কাজের

মধ্যে দিয়েই দেখি না কী সম্পর্ক দাঁড়ায়। ১৯২১ সাল থেকে রয়েছি কংগ্রেসে, ১৯২৬-এ এসে তার একজন পদাধিকারীও হলাম। কংগ্রেসের মধ্যে এই যোগ রইল একেবারে সেই ৪০ সাল পর্যন্ত, যতদিন না সুভাষবাবু কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। তারপর, ১৯৪১ সালে এসে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিলাম। কৃষক সভায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজের মধ্য দিয়েই দেখলাম বুঝলাম এই পার্টিই আমার। যোগ দিলাম পার্টিতে।

বলতে বলতে গোপালদা এই সময়ে একটি ছোট্ট ব্যক্তিগত গল্প বলে নিলেন। এর ভেতর দিয়ে তাঁর মেজাজেরই একটা দিক বেরিয়ে আসে। বললেন, ঠিক করলুম তো পার্টিতে যাব। ১৯৪১ সালে ১লা জানুয়ারি, একেবারে নতুন বছরের শুরুতে পার্টির কাছে সদস্যের আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। ভবানীবাবুকে (কমরেড ভবানী সেন) সেই সঙ্গে একথাও শুনিয়ে রাখলাম, দেখবেন নিজেকে নিয়েও যেমন হাসতে চাইব, তেমনি নিজের পার্টিকে নিয়েও। হাসিঠাট্টা কিন্তু আমি ছাড়তে পারব না। ভবানীবাবুও তাতে হেসেই সায় দিয়েছিলেন।

গোপালদা বলছিলেন, যোগ তো দিলাম পার্টিতে। জেলের মধ্যে থেকেই মার্ক্সবাদের চর্চা চলছিল। সেই তখন থেকেই, গোড়ার থেকেই, একটি কথা মনে মনে বোধ করতাম। আজ তা বলেই ফেলি। বলেন যে, ডক্‌ট্রিনেয়ারিজম (মতসর্বস্বতা) শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনোদিনই মেনে নিতে পারিনি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব দিয়ে সব সাহিত্যেরই ব্যাখ্যা হয়, তা বুঝতে অসুবিধে হয়েছে। এই নিয়ে আলোচনা চলেছে রেবতী বর্মণের সঙ্গে। আজ যদি সত্যি করে উদার দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে আমার সংজ্ঞা হল, কমিউনিজম এ যুগের মানবতাবাদ।

তারপর আবার শুরু করলেন: এবার বলি কর্মপদ্ধতির মধ্যে কি দেখেছি। দেখলাম, খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, আবছা-আবছা এটা বুঝতে পেরেছি যে, ভারতের স্বাধীনতা শুধু তার নিজের জন্যেই নয়, একার ভোগের নয়। অন্যদের স্বাধীনতা, মুক্তির প্রশ্নও তার সঙ্গে জোড়বাঁধা। এ হল একটা দায়িত্ববোধ, তা পালনের জন্য দায়বদ্ধতা।

তারপর ভেবে বলতে থাকেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ঔদ্ধত্যবোধও কি মিশে থাকে না?

জিজ্ঞেস করি : গোপালদা, 'কমিটমেন্টে'র সঙ্গে ঔদ্ধত্যবোধ-এর যোগ ঠিক কোনখানে ?'

গোপালদা বলেন : একটু মোচড় দিলেই কি দায়িত্ববোধের মধ্যে ঔদ্ধত্যবোধের মিশেল চড়ানো যায় না ? 'অ্যান্টি-থিসিসকে'ই সর্বস্ব করে, বড় করে দেখতে দেখতে কি 'হার্মনি' নষ্ট হয় না ? আমি তাই মন্ত্র জপি 'কমিউনিজম ইজ দ্য হিউম্যানিজম অব দ্য পিরিয়ড।'

কথা প্রসঙ্গে গোপালদা-র প্রথম দিকের রাজনীতি-দর্শনের লেখার কথা এসে পড়ল। প্রশ্ন করাতে বললেন, হাঁ, যতদূর মনে পড়ছে তাতে ১৯২৫ সালেই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলি ছাপা হয়েছিল 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকায়। তাঁর 'একদা'র প্রসঙ্গও এই সঙ্গে মনে পড়ে যায়। প্রশ্ন করায় গোপালদা বলেন, 'একদা'য় অমিতের ভাবনার মধ্য দিয়ে এই কথাই ভেবেছি, এই পৃথিবীতে বঞ্চিতরাও আছে, আর সর্বদেশে একটা সর্বব্যাপী 'র‍্যাঙ্ক অব ফাইটারস'ও আছে। ভারতের স্বাধীনতাকেও আমি তাই বিচ্ছিন্ন করে কখনও দেখতে পারিনি।

এরপরে গোপালদা চলে আসেন পার্টিতে ও তার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথায়। দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি আন্দোলনের দান কী, কতখানি তার প্রভাব ? গোপালদার কথায় তা হল, একটা দৃষ্টিভঙ্গির, খুব বড় মৌলিক এক রূপান্তরের দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা। গোপালদা বলেন, পার্টি ও সে সময়কার সর্বভারতীয় পার্টি নেতা পূরণচাঁদ যোশী সংস্কৃতি জগতে এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই 'অ্যাটিটুড'-এর ওপর কত বড় জোর দিয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি হল বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অথচ সর্বাঙ্গীণভাবে জাতীয়-মানসের কাছে যাওয়া।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক দিকটি হল এই : জনগণের জন্য সংস্কৃতি। কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অবদান বিরাট। সংস্কৃতি শুধু 'সংস্কৃতিবিদ'দের সামগ্রী নয়। জনগণের জন্যই যদি না হল তবে তা কিসের সংস্কৃতি, কার জন্য ? এই কমিউনিস্ট সংস্কৃতি আন্দোলন সারা দেশকে নাড়া দিয়েছে, অন্যান্য দলকেও। কংগ্রেসও সাহিত্য সঙ্ঘ গড়তে চেয়েছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'রিপোর্টাজ', কমিউনিস্ট লেখক-সাংবাদিকদের কম অবদান হয়ে নেই। সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ, মানুষের সমগ্র জীবন নিয়েই শিল্পের কাজ। যদি তালিকা দিই তাহলে দু-একটি দৃষ্টান্তেই বলা যায় : জ্যোতিরিন্দ্রের নবজীবনের গান, গণনাট্যের গান ও শিল্পকৃতি, বিজন

ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটক ও তার অভিনয়—বাংলার থিয়েটার আন্দোলনকেই তা নতুন দিশা এনে দিয়েছিল। সাহিত্যে মানিক, সুভাষ, সুকান্ত, আরও অনেকে। আমরাই করেছি বলব না, হয়তো সবটা ঠিকমতো করতেও পারিনি, কিন্তু সাধারণ মানুষকে এনে বসিয়েছি সাহিত্যের কেন্দ্রে। বৃহৎ সমাজবোধ, বিশ্ববোধ এইসব আমরা ধরে দিতে চেয়েছি। সমস্ত ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট লেখকরা 'পরিচয়'-এর মতো সাহিত্য-পত্রিকা চালিয়ে যেতে পারেন, এটাও কি কম?

ব্যাপকভাবে এই জীবনদৃষ্টি, সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন, পার্টির রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, এই যে ব্যাপক জীবনদৃষ্টি, এর মূল্য বিরাট; জনসাধারণের সঙ্গে থেকে, বিশ্বস্ত থেকে, তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই যে সাধনা এ কি কোনও 'চক্রান্ত' করে? একথা কে বলবে? সাধারণের কাছে কমিউনিস্ট সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাই মর্যাদাবান। এই সর্বজনীন সংস্কৃতির সঙ্গে আসে সর্বজনীন শিক্ষার কথা। কমিউনিস্ট সংস্কৃতিকর্মীরা এটিকেও ভোলেন নি। মনে রেখেছেন।

পার্টিতে বর্তমানে কী দেখছেন সে প্রসঙ্গে গোপালদা বললেন, বর্তমানে পার্টিতে যে সংকট এসেছে, তা আমার মতে শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রাঞ্জল করে, পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারিনি বলেই নয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও এতবড় সংকট কখনও আসেনি। যুদ্ধান্তে তা ছিল না, তার দেড় দশক পরে এসেছে। একে কি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক পর্যায়ের 'ডিপ্রেশন' বলব? জাতীয় পরিস্থিতিতেও নানান ছন্দহীন, তালহীন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু সব থেকে যা বড, তা হল স্বাধীনতার পরে দেশে যে এক 'ভ্যাকুয়াম' সৃষ্টি হয়েছে, জাতীয় পরিস্থিতিতে সেই কথাটি বোঝা। এই ভ্যাকুয়ামের ধাক্কায় কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারসাম্য রাখতে না পেরে থাকে, তবে কি অন্যদলও পেরেছে? কংগ্রেস দলের মধ্যেই বা কী দেখছি! আর এই সংকট বাড়াতে যদি-বা গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত বিরোধগুলি বড় হয়ে দেখা দিয়ে থাকে, তবে তা এই ভ্যাকুয়াম না থাকলে নিশ্চয়ই বাড়ত না, তাই আজকের সব থেকে প্রধান কাজ হল ভ্যাকুয়াম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে কাজ, তাই। দেশের যে যুবশক্তি, তা সব জোর খুইয়ে বসে আছে মনে করি না, তাকে এই ভ্যাকুয়াম থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখানোও দরকার। মনে হয় বর্তমানে সেই পথটুকুই আমরা ঠিক করে তুলে ধরতে পারছি নে। যদি ঠিকমতোও বুঝে থাকি তো এই 'ডিপ্রেশন'

কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। হয়তো দেরি বেশি, অনেক বেশি হয়ে যাবে যদি না আমরা এখনই কাজ শুরু করে দিই। এর জন্যে ছোটখাটো সব কাজকেই সমান মূল্য দিয়ে শেষ করতে হবে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে আজ নতুন যুগের কথা বলা হচ্ছে, গোপালদা সে প্রসঙ্গে বললেন, আসলে একে আমরা এখনও সবটা ধরতে পারছি না। হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি। আমি মনে করি আজকের যে এই সংকট দেখছি তা হল আসলে বাড়তির পথেরই সংকট, 'ক্রাইসিস অব গ্রোথ'। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়েও কি আমরা জাতীয় আন্দোলনে সুভাষ-সেনগুপ্তের দ্বন্দ্ব দেখিনি, সুভাষ-হাইকমাণ্ডের দ্বন্দ্ব? কিন্তু, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কি তার ভিতর দিয়েও নব নব শিখর জয় করে এগোয় নি?

আর, গোপালদা যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন এই কথারই তো আবৃত্তিতে **'Say not the struggle naught availeth ..'** ('বোলো না সংগ্রাম অসার্থক')।

আটাত্তরের জন্মদিনে

শ্রীগোপাল হালদার শ্রদ্ধাস্পদেষু

অসাধারণে-সাধারণে, মেলানো ধারায়

কোরাল পাখির ডাকে, গ্রামবৃদ্ধেরা জানতেন,
এই জন্ম

শতাব্দীর শুরু, প্রায়,
বছর দু'য়েক পরে হবে

তোমরা কি জন্মের মুহূর্ত
মানো

তাই এক দীর্ঘায়ু জীবনে, উপকথার মতন,
অজস্র মারের মধ্যে বেঁচে

বেঁচে যান 'ক্ষণজন্মা'—
'অনাসৃষ্টি'!
—তাঁরই আত্মস্মৃতির সরস কৌতুকে

কৌতুক-ই তো বলব, তবে,
কতো ঘাট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দেখা, শোনা,

নামেও আসেন কবি, সেই অঙ্গীকারে, রূপনারানের
সত্যে
দেশ-কালেরই সত্য বৈকি, সে-ও

তাই তো, জীবনে
জীবন দিয়ে শেখায়, বর্জনে নয় গ্রহণে, কেবলই সজাগ গ্রহণে
বাঙলার, বাঙালির মতো

হয়তো—কেন নিশ্চিত—
নবজাগৃতি স্মৃতিতে

উভবলি বাঙলার কোলে
নোয়াখালি-কল্‌কাতায়

• স্বদেশী-স্বরাজী সাধনে, অসহযোগীর যৌবনে
অগ্নিষ্টোমে

আত্ম-চেতন চিত্তের ধর্ম. খোলে,
সাম্যবাদীর কৃতজ্ঞতায়

আপামর ভারতীয়ে মেতে মুক্তির অন্বেষণে
সংযুক্ততায়
সাহিত্য-ও সহিত-এর দেশী উপমানে

সংস্কৃতির শুচিস্নানে
রূপান্তরের চিন্তন

বিবেকানন্দে তাই এ দায়ের শেষ কোথা—লেনিনেই মেলে
বিবর্তন

অসাধারণে-সাধারণে, পাখির ওড়ার পথ ধ'রে, পৌঁছে-যাওয়া
মেলানো ধারায়।

ফ্যাসিবিরোধী দশক, বাংলায়

অবন্তীকুমার সান্যাল

১৯৩২ থেকে ৩৮ গোপাল হালদার জেলে ছিলেন—প্রধানত প্রেসিডেন্সি-বকসায়। স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাঁর যে যোগ গড়ে উঠেছিল জেলখানায় পান তার পুনর্বিবেচনার অবকাশ। সেই পুনর্বিবেচনায় ছিল পরবর্তী কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিত।

জেলখানা থেকে বেরিয়েই সেই কাজের দায়-দায়িত্ব তিনি পূর্ণ-প্রস্তুতিতে স্বীকার করেন। সেখানে ছিল না আর তাঁর সেই প্রাক্-তিরিশ বয়সের দ্বন্দ্ব। মত ও পথের, কর্ম ও উদ্দেশ্যের তর্কে-সংগ্রামে ভারতীয় রাজনীতি তখন মীমাংসার জন্য অস্থির। কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শক্তির স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই গোপাল হালদার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন।

এই ১৯৩৭ থেকে ৪৭, দশটি বছর গোপাল হালদারের কর্মজীবনের প্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল। আবার বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গতিতে প্রগতিশীল এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই সময়েই বিকশিত হয়। সেই রাজনীতি আর সংস্কৃতির বিকাশের অব্যবহিত ছিল যা সব দর-বিরোধী আন্দোলন ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এই বিশেষ সময়ের একটি স্বতন্ত্র আখ্যান তাই এই ইশতেহার পক্ষে দরকারি গোপাল হালদারকে তাঁর দশকাংশে দেখতে। এই লেখাটি ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথাও নয়—বলা যায়, একজন কর্মীর অভিজ্ঞতার বিবরণ: আমরা যখন নিজেদের ইতিহাসের একেবারে গর্ভে আবিষ্কার করে বসি। সম্পাদক, 'পরিচয়'।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনার প্রখর উন্মেষ আমাদের প্রজন্মে স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও জাপানের চীন আক্রমণের পর্বে—যখন সংগঠিত আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ প্রকাশ্য যুদ্ধের ময়দানে নেমেছিল। এর আগে পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমাদের বোধ ছিল সাধারণভাবে কৌতূহলের পর্যায়ভুক্ত। ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা তো দূরের কথা, বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণারই অভাব ছিল। জন্মকাল থেকেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে যে-প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, কারণ যাই হোক, এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার তেমন কোনো ছাপ পড়ে নি। জার্মান ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের মুহূর্ত থেকে বিরোধিতার সংকল্প স্পষ্ট উচ্চারিত হলেও, আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের মানসিকতায় বিশেষ কিছু আলোড়ন ঘটাতে পারে নি। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চেতনার এই সীমাবদ্ধতায় যিনি কখনো আটকে থাকেন নি তিনি রবীন্দ্রনাথ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ ও বুদ্ধিজীবীকে আমরা একটি শিবিরে সমবেত হতে দেখেছি সংগ্রামের শেষ পর্বে। কিন্তু মানবতার প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় যাঁরা

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান করেছিলেন, প্রাণ-মন-আত্মা নিয়ে সেই সংগ্রামকে সংগঠিত করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা স্বল্প। রবীন্দ্রনাথ সেই স্বল্পসংখ্যকদেরই একজন। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে রমঁ্যা রলাঁর পাশেই রবীন্দ্রনাথের স্থান। এ আমাদের পরম গর্ব।

তিরিশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানিতে হিটলারের আবির্ভাবের আগে দীর্ঘ দশ বছর ফ্যাসিবাদের নায়ক ও প্রবক্তা ছিলেন মুসোলিনি। আত্মপ্রকাশের প্রথম যুগে তাঁকে মনে করা হয়েছিল ইতালির ত্রাণকর্তা, পশ্চাদ্‌পদ একটি জাতির জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি। তখনকার দিনের পত্রপত্রিকা ঘাঁটলে মুসোলিনি সম্পর্কে আমাদের সশ্রদ্ধ উক্তি, স্তুতিবাদ ও প্রশস্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন চোখে পড়ে। মুসোলিনির রাষ্ট্রীয় দর্শন ফ্যাসিবাদকে গান্ধীবাদের সঙ্গে তুলনা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছিল; তাকে প্রায় ভগবদ্গীতার বাণীর সমপর্যায়ে তোলা হয়েছিল। মুসোলিনি হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পর্যায়ে উন্নীত। গান্ধীবাদ বা এদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামকৌশল ত্যাগ করে ফ্যাসিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইতালির 'ব্ল্যাক-শার্ট' ঠেঙাড়েদের কৌশল অবলম্বন করার জন্যে জাতীয় নেতাদের উপদেশও দেওয়া হয়েছিল।[১] এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট শাসনের প্রতি ধিক্কারের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ এবং তার পরের ঘটনাবলি নিয়ে যত বিতর্ক থাকুক না কেন, যা তর্কাতীত তা এই যে, রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ও চিন্তাধারার নিন্দা করেছিলেন দ্বিধাহীন ভাষায়, যা তখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বহু বহু শুভবুদ্ধির মানুষ, মানবতাপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী করার কথা ভাবতেও শুরু করেন নি। বিশ্বভারতীর জন্যে মুসোলিনির বিপুল উপহার ও আগ্রহকে রবীন্দ্রনাথ একটি মহান প্রাচীন জাতির ঔদার্য ও বদান্যতার প্রকাশ হিশেবে গণ্য করেছিলেন। ইতালিতে পা দিয়ে তার বহিরঙ্গের সাফল্যের ও সমৃদ্ধি কিছু কিছু চিহ্ন দেখে খুশিও হয়েছিলেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে তার প্রকৃত চরিত্রটি বুঝতে পেরেছিলেন সেই মুহূর্তেই তিনি মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সি. এফ. এণ্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে (২১ জুলাই, ১৯২৬) তিনি লিখেছিলেন:

> ...ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে আমার আদর্শের বিরোধী উপাদান আছে, তার সাফল্যের বিপরীতে আছে নির্যাতিত জীবন, নির্বাসিত

আশা-আকাঙ্ক্ষা—তা বিষাক্ত হয়েছে গোপন ষড়যন্ত্রে, ইউরোপের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকে তা এক প্রকাশ্য বর্বরতায় ঠেলে দিয়েছে।[২]

যে মুহূর্তে আমি জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ আসক্তিই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যস্থল সেই মুহূর্তেই তার প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি আমি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে হাঙ্গারি, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশও ঘুরেছিলেন, হোর্থি-এ্যান্তোনেস্কুর বলকান ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হয়েছিলেন। তিনি যে ফ্যাসিবাদের ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ ১৯২৭ সালে আঁরি বারব্যুসের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আবেদনে তাঁর স্বাক্ষর। বারব্যুস রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর সম্পর্কে এই কথাটি লিখেছিলেন **'your name is one of those which impose themselves in a league of great honest people who would stand up to oppose and fight the invading barbarity of Fascism.**[৪] বারব্যুসের এই প্রতিবাদ সংগঠনের ফল ১৯২৯ সালে বার্লিনে প্রথম যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী বিশ্বসম্মেলন।

ফ্যাসিবাদ দানবীয় পূর্ণ কলেবর লাভ করে জার্মানিতে হিটলারের আবির্ভাবে। ফ্রান্সেও একই সময়ে ফ্যাসিস্ট বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ততদিনে পরিণত হয়ে উঠেছে প্রতিরোধ আন্দোলনে। আমস্টারডামে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বার্লিনের রাস্তায় ফ্যাসিস্টদের বই-পোড়ানোর উৎসব শুরু হয় বারব্যুসের বই দিয়ে।[৫] আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠস্বর—তা যত ক্ষীণই হোক—তখন থেকেই কানে আসতে থাকে। জার্মান ফ্যাসিবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৩৩ সালে প্রবন্ধ লেখেন সুশোভন সরকার। সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি বই, **Hiterism or Aryan rule in Germany**। 'পরিচয়' পত্রিকায় 'দেশ-বিদেশ' অংশে প্রায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হতে থাকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী নিবন্ধাবলি।

এই সময়েই রম্যাঁ রলাঁ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারফতে ভারতীয় তরুণদের কাছে পাঠিয়েছিলেন (২৭ নভেম্বর) ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। তরুণদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন,

> ...ইউরোপ ও আমেরিকায় যেমন, তেমনি আপনাদের দেশের উপরেও এ (ফ্যাসিবাদ) আজ থাবা বাড়িয়েছে। আপনারা এর বিড়াল-তপস্বী আকর্ষণে ধরা দেবেন না! আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার, প্রগতির পথে একটা জাতির অগ্রগতির এমন বেশি মারাত্মক শত্রু আর নেই। এ নিজেকে মিথ্যার মুখোশে চেপে রাখে; সেই মুখোশকে প্রতিটি জাতির মুখোশের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। আত্মগর্ব, ভুল-বোঝানো আদর্শবাদ, জাতের সহজ প্রবৃত্তি, জাতীয়তাবাদ—জাতিগুলোর সামনে প্রতিটি মিঠে সুরই সে খুব ভালো করে বাজাতে জানে; এমন কি, সময়ে সময়ে সে নিপীড়িত জনগণের সমর্থক ও রক্ষক বলে নিজেকে দেখাবারও স্পর্ধা রাখে। আসলে, এ হচ্ছে সর্বত্র ধনতন্ত্রী ও সমরতন্ত্রী প্রতিক্রিয়া। অতীতের অন্ধকার ও শ্বাসরোধী শক্তিগুলোর গলা-ফাটানো যন্ত্র...এই মুহূর্তে জগতের জাতিগুলোর মাথার উপরে সাম্রাজ্যবাদী ডিক্টেটরবাদের জাল ঝুলছে। বিপদগ্রস্ত জাতিগুলো হাত বাড়িয়ে দিক! কখনো ভুলবেন না যে আপনাদের দেশের স্বাধীনতা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারে না: এরা একসঙ্গে বাঁধা। আজ যে লড়াই শুরু হয়েছে তা একটা জাতির নয়, তা সমস্ত জাতির।[৬]

এর পর ১৯৩৫ সালের অক্টোবরে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ, ফ্যাসিবাদের দুনিয়া জয়ের প্রথম প্রকাশ্য অভিযান। এই বছরের সেপ্টেম্বরে পারির শান্তি-কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে বারব্যুসের নিমন্ত্রণ এসেছিল রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বারব্যুসের মৃত্যুতে রমাঁ রলাঁর নেতৃত্বে বিশ্বশান্তি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসেলসে। পারিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-সংস্কৃতি রক্ষার সম্মেলন উপলক্ষে প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারে প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সুস্থ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারাটি ইতালির ফ্যাসিবাদের বিপদ বুঝতে দেরি করেনি। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, 'The Congress...considers Abyssinia's fight as part of the fight of all exploited nations for freedom. ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির

স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার ঘটনা ও অর্থ সাহায্যের আবেদন। ইতালিয় পণ্য-বর্জনও শুরু হয়েছিল। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল জার্মানি ও ইতালির সহযোগিতায় স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ (জুলাই, ১৯৩৬)। স্পেনের পাশে দাঁড়াবার জন্যে রমঁ্যা রলাঁর সেই সুবিখ্যাত আহ্বান বাণীটি এসে পৌঁছয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ব্যাপক প্রচারের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচারিত হয় ১৯৩৭ সালের ৩ মার্চ ইউনাইটেড প্রেস মারফত। এদেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গঠিত হয় ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী লিগের ভারতীয় কমিটি, যার সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। স্পেনের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে 'স্পেন' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। তারপর একে একে চীনের জাপান আক্রমণ (জুলাই), হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল (মার্চ ১৯৩৮) এবং চেকো-শ্লোভাকিয়া গ্রাস। ১৯৩৬ সালেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি এবং রোম-বার্লিন-টোকিওর কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি। সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট শক্তির সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

এই পর্ব পর্যন্ত ফ্যাসিস্টবিরোধী চেতনা বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক প্রসারিত যদি নাও হতে থাকে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ফ্যাসিবাদ বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি কিংবা তার অনুকূলে কোনো সরব গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেনি। যদিও তা করার জন্যে ইতালি-জার্মানি-জাপানের অবশ্যই চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রথম যুগে মুসোলিনি বিশ্বভারতীতে পাঠিয়েছিলেন বিপুল উপহার এবং দুজন পণ্ডিত গুপ্তচর। তাঁদের অপকীর্তি ফাঁস হওয়ার পর, রবীন্দ্রনাথের ধিক্কারবাণী সারা বিশ্বে প্রচারিত হবার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্যাসিস্ট ইতালির গুণগান করে বই লিখেছেন। প্রবাসী-প্রেসে তা ছাপা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তার সপ্রশংস সমালোচনা লিখেছেন।[৭] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশের জন্যে বোম্বাই থেকে ইতালির কনসাল স্কার্পা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।[৮] কিন্তু এদেশে কোনো সক্রিয় গোষ্ঠি তৈরি হয়নি। জার্মান কনসালও অনুরূপ চেষ্টা করেছেন। রমঁ্যা রলাঁর দিনপঞ্জি থেকে জানতে পারি, জার্মান কনসাল বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে জার্মানিতে আমন্ত্রণ জানানোর ফন্দি এঁটেছিলেন।[৯] কিন্তু মুসোলিনি ডঃ তারকনাথ দাস এবং পি.

রায়ের মতো দু-একজন গুণমুগ্ধকে পেলেও হিটলার কোনো বুদ্ধিজীবীকে পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। জাপানের গুণমুগ্ধ দু চার জন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে 'নিপ্পন ক্লাবে'র কথা শোনা যায়। কিন্তু তার কোনোরকম প্রভাব ছিল এমন প্রমাণ নেই। ফ্যাসিবাদের জন্ম-মুহূর্ত থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত রমাঁ রলাঁ সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন; সেই সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার করতে আসা ছোটো-বড়-মাঝারি বহু ভারতীয় ও বাঙালির সঙ্গে অকপট আলোচনার কথা তিনি তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখে গেছেন। কিন্তু একমাত্র 'শ্রীমতী এম. ডি. জি.' নামে জনৈকা বাঙালি মহিলা ছাড়া কারুর মুখেই তিনি ফ্যাসিবাদের প্রতি টান বা '(রাশিয়া সমেত) ইউরোপকে এশিয়া থেকে খেদিয়ে তাড়াবার জন্যে ভারতবর্ষকে অবশ্যই জাপানের সঙ্গে গাঁটছড়া' বাঁধার কথা বলতে শোনেননি।[১০] রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অক্ষশক্তি অন্যান্য দেশের মতো এদেশে কোনো সমর্থক গোপন বা প্রকাশ্য সক্রিয় গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেনি। এদেশের বিপ্লবীদের কোনো একটি গোষ্ঠীর ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে থাকলেও শুরুতেই তার ইতি ঘটেছিল।[১১] তিরিশের দশকের গোড়ার দিকেও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকে রোমের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংস্কৃতির সংস্থার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও তাঁদের কেউ, যেমন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার কিংবা অমিয় চক্রবর্তী কখনো ফ্যাসিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এমন অপবাদ অতি বড় শত্রুতেও দেবে না। (মুসোলিনির আমন্ত্রণ বারংবার প্রত্যাখ্যান করেছেন দুজন—একজন জওহরলাল নেহেরু, অপরজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী জগদীশচন্দ্র বসু।) জাপানের প্রতি আমাদের টান ছিল এই শতাব্দীর গোড়া থেকে। তুলনামূলকভাবে সে টান অনেক বেশি হলেও জাপানী সমরতন্ত্রের অনুরাগী কোনো গোষ্ঠী বা লবি ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি পর্বে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও পরে অক্ষশক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন ইত্যাদির পেছনে জাপান, জার্মানি বা ইতালির অর্থ ও সহায়তায় দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সক্রিয়তা ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। অথচ ইউরোপ ও এশিয়ার সর্বত্র তা ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিশ্বমানবতার বিবেকে যেন তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত। মানুষের

ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী ও শুভবুদ্ধির মানুষেরা এমন বিচলিত আর কখনো হয় নি। এ যে নিছক গৃহযুদ্ধ নয়, একটি জাতির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লাভ করা ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নস্যাৎ করে দিতে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ ফ্যাসিবাদের প্রকাশ্য অভিযান তা বুঝতে সেদিন কারুর দেরি হয় নি। ফ্রাঙ্কোর মুরবাহিনীর সঙ্গে জার্মান বিমান ও ইতালীয় ট্যাংকবাহিনী। কিন্তু তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে স্পেনের শ্রমিক কৃষক, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, এ্যানার্কিস্ট, গণতন্ত্রীদের গড়া পপুলার ফ্রন্ট : স্পেনকে বাঁচাতে হবে, স্পেনের মাটিতেই ফ্যাসিবাদের ঢেউকে রুখতে হবে, প্রতিরোধের বাঁধ দিতে হবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দিন শেষ হয়েছে, এবারে সশস্ত্র প্রতিরোধ।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সেদিনকার গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা রমাঁ রলাঁর সেই আহ্বান-বাণীর শিরোনামটি আজও যেন চোখের সামনে জলজ্বল করে : 'প্রজ্জ্বলিত স্পেনের সাহায্যার্থে অগ্রসর হও'। প্রথম মহাযুদ্ধের কালের 'ইউরোপের বিবেক' আবার ডাক দিলেন : 'মানবতা! মানবতা! আমি মিনতি জানাচ্ছি তোমাকে। আমি মিনতি জানাচ্ছি ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষকে। এসো, স্পেনকে সাহায্য করো। তোমাদের সাহায্য করো। আমাদের সাহায্য করো। কেননা, তুমি আমি আজ সকলেই বিপন্ন'।[১২] এবার আর শান্তিবাদীর করুন অনুনয় নয়, প্রতিরোধের আহ্বান। এই একই কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন :

> আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রুখতেই হবে। স্পেনে যে-তামসিকতা যে-জাতিগত কুসংস্কার, যে-লুণ্ঠন ও যুদ্ধের গৌরব প্রতিষ্ঠার অমানুষিক পুনঃপ্রচেষ্টা চলেছে তাকে চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতে স্তব্ধ করতেই হবে। বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতেই হবে। স্পেনের জনগণের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মুহূর্তে মানবতার বিবেকের কাছে আমি আবেদন করছি।
>
> 'স্পেনে গণফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন—'প্রতিক্রিয়া দূর হও'! লাখে লাখে এগিয়ে আসুন গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষায়।[১৩]

সেদিন স্পেনের সঙ্গে আমাদের ভাবনায় বিদ্ধ ছিল চীন। বলতে গেলে, স্পেনের চেয়ে চীনের বেদনাই যেন আমাদের বেশি স্পর্শ করেছিল। চীন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ। তার নেতৃত্বে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। জাপান থেকে প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এদেশের জাপান-বিরোধী, চীনের সমর্থনে প্রচার-আন্দোলন বন্ধ করাতে। কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে তীব্র নিন্দা করে, জাপান-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ৮ম রুট আর্মির সদর দপ্তর থেকে সক্রিয় সাহায্যের জন্যে জওহরলাল নেহরুর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এগনিস স্মেডলি এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল চু তে। চীনের জন্যে অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন জহরলাল নেহরুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। এদেশে সর্বত্র পালিত হয়েছিল 'চীন-দিবস'। রবীন্দ্রনাথ নোগুচির চিঠির জবাব দিয়েছিলেন কঠোর ভাষায়; জাপানী বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাতে লিখেছিলেন : "...**wishing your people, whom I love, not success, but remorse.**"[১৫] রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চীনে যাত্রা করেছিল ডাঃ অটলের নেতৃত্বে ভারতের মেডিকেল মিশন।

মাদ্রিদের পতন হল ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে। ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষের কবরের উপরে উড়ল ফ্যাসিবাদের বিজয়ধ্বজা।[১৬] পরাজিত, ক্লান্ত আন্তর্জাতিক ব্রিগেডগুলো ফিরে গেল নিজের নিজের দেশে, দেশের মাটিতে প্রতিরোধের সঙ্কল্প নিয়ে। স্পেনের রণক্ষেত্র থেকে ডাঃ নরমান বেথুন গেলেন সুদূর চীনের রণক্ষেত্রে। ফ্যাসিস্ট স্পেন স্বাক্ষর দিল কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে : তারা ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাবে। ফ্যাসিবাদের জন্ম মুহূর্ত থেকে একটানা তোষণের ইঙ্গ-ফরাসী নীতি স্পেনের গৃহযুদ্ধের শেষ পর্বে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল মিউনিক চুক্তিতে। ক্ষুব্ধ, ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'প্রায়শ্চিত্ত',

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

মাদ্রিদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিটলার দখল করেছিল প্রাগ। তার ছ মাসের মধ্যে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি আক্রমণ করল পোল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হল জার্মানির বিরুদ্ধে। মুসোলিনি ও হিটলারকে লালিত করেছে যে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের আগ্রাসী প্রয়াসকে চালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, ভাগ্যের পরিহাসে তাদেরই দাঁড়াতে হলো জার্মানির মুখোমুখি। এ যুদ্ধ ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। যুদ্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন :

> দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপঙ্‌ক্তির দ্বারা চীনকে খুবলে খাওয়া।...দেখলুম ঐ স্পর্ধিত নির্বিকার চিত্ত এবিসিনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের মধ্যে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইনটারভেনসনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে—দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা সই সংগ্রহ করে অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ঈমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছু হলো না—পদে পদে শত্রুর শক্তিকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হলো দারুণ যুদ্ধে।[১৭]

কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই বিরাট এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল ফ্যাসিস্ট বিরোধী শুভবুদ্ধির শিবিরে। যে-সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৩৪ সাল থেকে যৌথ নিরাপত্তা ও শান্তির পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিল, ফ্যাসি-বাদের চরম শত্রু বলে যে সর্বজন স্বীকৃত, যার প্রমাণ সে দিয়েছে স্পেনের যুদ্ধে, যুদ্ধ বাধার এক সপ্তাহ আগে সে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করল জার্মানির সঙ্গে : জার্মানি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ডের কর্জন লাইন পর্যন্ত দখল করল ; বালটিক রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত করে নিল ; তারপর নভেম্বরের শেষে আক্রমণ করল ফিনল্যাণ্ড। অচির ভবিষ্যতে প্রতিটি কাজের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই মুহূর্তে অসংখ্য সৎ মানুষের কাছে এইসব অত্যন্ত হতবুদ্ধিকর ও পীড়াদায়ক মনে হয়েছিল। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী প্রচার সে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

বিশ্ব ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি আলোড়ন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাদের আন্তরিকতা তর্কাতীত সেই ফরাসী কমিউনিস্টরা সাময়িক ভাবে প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল; কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করা হয়েছিল, কমিউনিস্ট প্রচার দেশদ্রোহিতা বলে ঘোষিত হয়েছিল। জোলিও কুরি, পল লাঁজভ্যাঁ, জ্যঁ পেরাঁ, ভিক্তর বালের মতো একনিষ্ঠ ফ্যাসিবিরোধী গণতন্ত্রীরা প্রকাশ্যে এই রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির নিন্দা করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরিত্র নির্ণয়েই গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। চুক্তি সম্পর্কে রম্যাঁ রলাঁ চুপ করে থাকলেও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ বলে সমর্থন করে দালাদিয়েকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।[১৮] রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন :

> 'জার্মানির বর্তমান শাসকের উদ্ধত দুর্বৃত্ততার সর্বশেষ প্রকাশে বিশ্বের বিবেক প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে।...এই যে অমানবিকতা, যা একজন ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অসার আত্মশ্লাঘাপূর্ণ খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। তাকে ধিক্কার জানিয়ে আমাদের দেশের কণ্ঠ ইতিমধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত। আমাদের কণ্ঠস্বর সম্ভবত জার্মানির ক্ষমতাসীন চক্রের কানে পৌঁছুবে না, কেননা এই কণ্ঠস্বর উচ্চ বিস্ফোরক গোলার ডানায় বাহিত নয়। আমি শুধু এইটুকুই আশা করি, মানবতা জয়ী হবে এবং এই ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ বিশ্বে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে নির্যাতিত জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার সৌষ্ঠব।[১৯]

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ তাঁকে পীড়িত ও ব্যথিত করেছিল। তার সাক্ষ্য আছে 'সানাই'-এর 'অপঘাত' কবিতায়। রাশিয়ার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাতে যে আঘাত লেগেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। রাশিয়া জিতলেও এ লজ্জা সে মুছে ফেলতে পারবে না।[২০]

যা হতে পারত তা হল না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সর্বাত্মক ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ হয়ে উঠতে পারল না। প্রথম দিকে চলল 'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা'। জার্মানি নরওয়ে-বেলজিয়ম দখল করল। বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ফ্রান্সের পতন হল।

চার

জার্মান আক্রমণের তীব্রতম মুহূর্তে ফরাসী সেনাপতি ওয়েগাঁ ট্যাংক-বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে এলেন পারীর সম্ভাব্য 'লাল' অভ্যুত্থানের আশঙ্কায়। বাস্তিই-ভাঙা পারি, কম্যুনের পারি বিনা প্রতিরোধে 'খোলা শহর' বলে ঘোষিত হল। তারপর একে একে গেল যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, আলবেনিয়া বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া গোটা ইউরোপ চলে গেল জার্মানি-ইতালির বুটের নীচে। একা ইংল্যাণ্ড আত্মরক্ষায় ও সাম্রাজ্যরক্ষায় দিশেহারা; গোটা ইউরোপের কাঁচামাল ফ্যাসিস্টদের হাতের মুঠোয়; বাধ্যতামূলক শ্রমশক্তি ফ্যাসিস্ট যুদ্ধোপকরণে নিয়োজিত; সর্বত্র কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাসচেম্বার আর ইহুদিদের চিতাচুল্লি—ফ্যাসিবাদের নগ্ন বীভৎসতা ইউরোপে আদিমতার কালো যবনিকা টেনে দিল। পরাজিত দেশগুলোর রাষ্ট্রকর্ণধাররা ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে একটি করে কাগুজে সরকার গড়ে বসে রইলেন। কিন্তু সেই অন্ধকার দিনে ইউরোপের প্রতিটি দেশে গড়ে উঠতে লাগল সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ—নরওয়ের বরফ-ঢাকা পাহাড়ে-জঙ্গলে, গ্রীস-যুগোশ্লাভিয়ার পাথুরে প্রান্তরে, পশ্চিম ইউরোপের শহরে-বন্দরে, কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে। জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়ে উঠল ইউরোপের প্রতিটি দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, স্পেনে যার পাগলা-ঘণ্টি বেজেছিল। অঁাদ্রে মালরো আবার তুলে নিলেন বন্দুক, কলম ফেলে পিস্তল হাতে তুলেন রণে শার, কর্ণেল ফাবিয়ঁা (পিয়ের জর্জ) প্রথম ছুঁড়লেন প্রতিরোধের বুলেট, রল-তাঁস্তাই হলেন 'মাকি'। আরাগঁ ও এলুয়ারের কবিতায় বাজল গাণ্ডীবের টংকার। সবচেয়ে বড় ঘটনা: ১৯৪১ সালের ২২ জুন ইউরোপ বিজয়ী ফ্যাসিষ্ট জার্মানি আক্রমণ করল সোভিয়েত রাশিয়াকে। ফ্যাসিবাদ স্বাক্ষর দিল তার মৃত্যুদণ্ডে।

২২ জুন, ১৯৪১। ১২৯ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে নেপোলিয়ন করেছিলেন রাশিয়া অভিযান। এই দিনটিকে বলদর্পী রাইখ ফুরহার বেছে নিয়েছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ীর গৌরব-মুকুটের লোভে। পোল্যাণ্ড থেকে ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত মূর্ছিত ইউরোপের সমস্ত সম্পদ তাঁর হাতের মুঠোয়; অব্যাহত যোগাযোগ, আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সমুজ্জিত ২ কোটি সৈন্য (ইতালীয়, স্পানিশ, হাঙ্গেরীয়, রুমানীয় তাঁবেদার বাহিনীগুলো

সমেত)। আক্রমণ শুরু হল বালটিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ২ হাজার মাইল সীমান্ত জুড়ে। কী ভয়ানক তার গতিবেগ, কী প্রচণ্ড তার আঘাতের শক্তি! রুশবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে চলল নিজের হাতে খেতখামার গ্রামজনপদ পুড়িয়ে, কলকারখানা গুঁড়িয়ে, 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করে, দুর্ধর্ষ পার্টিজানদের পেছনে ফেলে রেখে। তারপর উত্তরে লেনিনগ্রাদ, মাঝখানে মস্কো, দক্ষিণে স্তালিনগ্রাদে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লালফৌজ। শুরু হল ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী, ভয়াবহ, সবচেয়ে মহিমান্বিত সংগ্রাম। ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন শক্তি রাশিয়াকে মিত্র বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল অনেক রক্তের খেসারত দিয়ে। এতদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিণত হল প্রকৃত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে।

দুনিয়া জুড়ে সেদিনকার মানুষের চাঞ্চল্য, উত্তেজনা, আশা ও উদ্বেগের প্রবল ঢেউ লেগেছিল আমাদের দেশেও। ইউরোপের সঙ্গে দুনিয়ার যোগাযোগ সেদিন বিচ্ছিন্ন, আজকের মতো সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও সেদিন এত দ্রুত ও বহুমুখী ছিল না। প্রধান অবলম্বন রয়টার, প্রতিদিন খবরের কাগজের জন্যে কী অধীর প্রতীক্ষা—রাশিয়ার খবর কি?

অক্টোবর বিপ্লবের রক্তে জন্ম নেওয়া রাশিয়া যে জয়ী হবে এ বিশ্বাস করাটাই ছিল সেদিন প্রবল মানসিক শক্তির পরিচয়। সৎ, সাধু, শুভবুদ্ধির মানুষেরা প্রশ্ন করেছেন উদ্বেগে উৎকণ্ঠায়: পারবে তো? রাশিয়া পারবে কি? আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখেছি সাত দিন ধরে একটানা চণ্ডীপাঠ করতে, রাশিয়ার কল্যাণ-কামনায় প্রতিদিন শিবের মাথায় একটি করে ১০৮টি বেলপাতা চড়াতে। সুদূর রুশের মাটিতে মানুষের সভ্যতার ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে: রাশিয়া কি জিতবে? রাশিয়া কি পারবে? সেদিন রাশিয়া সম্পর্কে কত কৌতূহল, কত আগ্রহ, কত প্রশ্ন। অতি দ্রুত গড়ে উঠেছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'।

সেই পশ্চাদপসরণের অন্ধকার দিনগুলোয় মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস আগে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের কথা আমরা জেনেছি। রাশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ তাঁকে পীড়িত করেছিল সন্দেহ নেই, পীড়িত হওয়াটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরে নি। শেষ জন্মদিনে ইংরেজ শাসনকে অভিশাপ দিতে গিয়ে তিনি রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার প্রতিতুলনা না দিয়ে পারেন নি। ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথ তবু আশা করেছিলেন, মহামানব আসবে। কিন্তু তার পরই

জার্মানির রাশিয়া-আক্রমণ তাঁকে কতখানি উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল করে তুলেছিল সে কথা আমাদের জানিয়েছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ :

> রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও বারে বারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, 'সবচেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে'। সকাল বেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ মনে হত মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : 'রাশিয়ার কথা বলো।' বললুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে।'[২১]

সেদিনকার সেই উদ্বেগব্যাকুল দিনে একটি সংস্কৃত শ্লোক যেন প্রত্যয়ের মন্ত্রবাণীর মতো আমাদের কানে এসে পৌঁছেছিল, হাজারিবাগ জেল থেকে সেই বাণী পাঠিয়েছিলেন মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ :

> যত্র স্তালিন মহাজ্ঞানী যত্র রক্তা চ বাহিনী।
> তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতি মতির্মম॥

কিন্তু প্রশ্ন জেগেছিল, বিশ্বব্যাপী এই ফ্যাসিস্টবিরোধী কুরুক্ষেত্রে আমরা কি কেবলই দর্শক, না কি আমরাও সেই মহাসংগ্রামের সৈনিক। সচেতন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর এই আন্তরিক প্রশ্নটি সেদিন উত্থাপিত হয়েছিল স্পষ্ট ভাষায়। আনন্দবাজারের এক রবিবারের পাতায় গোপাল হালদার লিখেছিলেন :

> ...গত চব্বিশ বৎসরে পৃথিবীর সম্মুখে সোভিয়েত রাশিয়া যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা মানুষের বিজয়তোরণ। সন্দেহ নাই সোভিয়েতের তরুণদল সেই মহাতোরণের সম্মুখে প্রাণবলি দিবে সগর্বে সানন্দে সচেতন চিত্তে। কিন্তু সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর সপ্তসৈকত হইতে সেই মহাযজ্ঞের সমিধ সংগৃহীত না হইলে কোথায় এ জীবনের সার্থকতা?'[২২]

যাঁরা চক্ষুষ্মান তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন মানুষের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজিত হতে চলেছে। ফ্যাসিবাদ কোণঠাসা ধনতন্ত্রের ভয়ংকর মারমুখা

রূপ। সে শুধু অস্ত্রবলেই ইউরোপকে পদানত করেনি, প্রতিটি দেশের শিল্পপতি, ব্যাংক মালিক, সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিভূদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে। জার্মান-ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়ার শক্তি। বিভিন্ন দেশে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে নিজের নিজের দেশের প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। প্রতিরোধ আন্দোলন হয়ে উঠবে সমাজ-বিপ্লবের অগ্রদূত। ফ্যাসিবাদের পতন ঘটাবে যে বিপুল জাগ্রত জনশক্তি তা আর পুরনো প্রভুদের গদিতে বসতে দেবে না। ফ্যাসিবাদের পতনে ধনতন্ত্রের বিষদাঁত ভাঙবে; উপনিবেশ আঁকড়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে আর-কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না, যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন। দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি, উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা—সবকিছুর ভাগ্য জড়িত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের জয়পরাজয়ের সঙ্গে। আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তা আজ একসূত্রে গাঁথা পড়েছে। ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে ককেসাসের দ্বারপ্রান্তে। এই যুদ্ধে তাই আমাদের অংশ আছে, দায়িত্ব আছে।

নাৎসী ফ্যাসিস্টবাহিনী যখন মস্কোর সামনে গতিরুদ্ধ, ঠিক তখনই (৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১) জাপান আক্রমণ করল পার্ল হারবার, ফিলিপাইন, যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকার বিরুদ্ধে। জাপানী ফ্যাসিবাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, তার লক্ষ ভারতবর্ষ, যেখানে মিলিত হবে ইউরোপ ও ও এশিয়ার ফ্যাসিস্ট বিজয় বাহিনী। ভারতের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সেই জানুয়ারিতেই পাটনা সম্মেলনে ঘোষণা করেছিল,

> **The total destruction of Hitlarite Fascism and safeguarding the Socialist state against the Nazi onslaught are the main aim which the present war keeps in view. Viewed that way, this war is a just war—a people's war...As such, there can be no distinction made between this war and India's fight for freedom.**

মার্চ-এপ্রিল মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছিল,

> **The Congres has repeatedly stated, since the commencement of the war in September 1939, that the people of India will line themselves with the progressive forces**

of the world, and assume full responsibility to face the new problems and shoulder the new burdens that had arisen, and it asked for necessary conditions, to enable them to do so, to be created.'

যে মাসে কংগ্রেস বুলেটিনে কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, জাপানি আক্রমণ ঘটলে আক্রমণকারীদের সঙ্গে অ-সহযোগিতা করতে। সে নির্দেশে বলা ছিল,

Not to put any abstacle in the way of British forces will often be the only way of demonstrating our non-cooperation with the invader.'

এলাহাবাদের নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল,

'There is imminent peril of invasion by Japan : Only a slave mind could imagine that Japan would give India freedom. National self-respect demands that we should not think in terms of change of masters. We should resist the Japanese aggression, notwithstanding our differences with British.

বিভিন্ন জাতীয় নেতা, বিশেষ করে জওহরলাল নেহরুর সেদিনকার বক্তৃতাগুলোয় এ সম্পর্কে দ্বিধা-অস্পষ্টতার কোনো অবকাশই ছিল না ; জাপানি ফ্যাসিবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে, জগৎজোড়া প্রতিরোধ সংগ্রামে আমাদের অংশ নিতে হবে।

প্রতিরোধ কথাটির মধ্যেই কী যেন জাদু আছে, সচেতন শিল্পীর মনকে চুম্বকের মতো টানে। প্রকাশ্য শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিল্পীর কাছে তাৎক্ষণিক বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের সামগ্রিকতায় চৈতন্যের বর্শামুখ হয়ে ওঠে। তখন যে-কাব্যের, যে-কবিতার সৃষ্টি হয়, এলুয়ার তাকেই বলেছেন, 'পয়েজি দ্য কমাঁদ' (Poésie de commande) ; তখন বাইরের পরিপার্শ্বের সঙ্গে ভিতরের পরিপার্শ্ব সমাপতিক হয়ে 'তা সত্য হয়ে ওঠে প্রেমের আবেগের মতো, বসন্তের ফুটে-ওঠা ফুলের মতো, বেঁচে থাকার জন্যে গড়ার মতো' ; কবি শিল্পী তখন নিজের ভাবকে নিয়ে যান 'মানব প্রগতির বাঁকে খোদাই করে রাখতে'।[২৪] স্পেনের যুদ্ধে যা করেছিলেন

নেরুদা, এলুয়ার, আরাগঁ, পিকাসো। যত দূরগত হোক, সেই চেতনার ফুলকি এসে পড়েছিল আমাদের চিত্তেও। কবি-শিল্পীদের নিখিল ভারত সম্মেলন হয়েছিল কলকাতায় ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রগতি' নামে একটি মূল্যবান সংকলন। তাতে প্রকাশিত হয়েছিল বহু প্রবন্ধ, বহু কবিতা। সেই সময়ের অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার' শ্লোগানের মতো বেজে উঠেছিল তরুণদের চিত্তে,

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো !
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ—
ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)
যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার।[২৫]

স্পেন ও চীন তরুণতম কবির চিত্তে আলোড়ন তুলেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চীন ১৯৩৮' আনন্দবাজারের শারদীয় সংখ্যাতে বিস্ময়কর সাড়া জাগিয়েছিল। সেদিনের তরুণতম 'পদাতিক' তিনি। মার্কসীয় বুদ্ধিজীবী ও কবিশিল্পীরা ১৯৩৯ সালে প্রকাশ করেছিলেন 'অগ্রণী' পত্রিকা। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চিন্মোহন সেহানবীশ, সরোজ দত্ত, সুধী প্রধান, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (ত্রিশঙ্কু) প্রতি সংখ্যায় ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্যব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে জন্ম হয় মার্কসীয় বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'অরণি'। আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে 'অরণি'-র দান অসামান্য। এই সাপ্তাহিকটিকে ঘিরে উঠেছিল একই সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত প্রবীণ ও তরুণ কবি-গল্পকার-প্রবন্ধকারের এক অতি সবল ও বলিষ্ঠ গোষ্ঠী। গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, অনিল কাঞ্জিলাল, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতিরা ছিলেন নিয়মিত লেখক। 'অরণি'-তে প্রকাশিত বহু উৎকৃষ্ট কবিতার মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় কবিতা অরুণ মিত্রের 'কসাকের ডাক',

আজবের মাথার উপরে ঝাপট,
ডনের স্রোতে ডাক :

সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও...

এ কবিতা আরামকেদারায় বসে পড়ার কবিতা নয়, ময়দানে-মিছিলে হাঁক দিয়ে পড়ার কবিতা। হাঁক দিয়েই পড়া হত সেদিন। ওয়েলিংটন স্কোয়ার কি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হাজার হাজার মানুষের সভায় শম্ভু মিত্রের কম্বু কণ্ঠে 'কসাকের ডাক' শোনাটা আমাদের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

কিন্তু জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান সেদিন এদেশের কিছু লোকের কাছে উষ্মা ও ক্রোধের কারণ হয়েছিল। ঢাকা শহরে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন ফ্যাসিস্ট প্রতিরোধের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ প্রগতি লেখক সংঘের পতাকার নীচে তরুণ এক লেখকগোষ্ঠী। তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন 'ক্রান্তি' ও 'প্রতিরোধ', তাঁদের অনেকেই ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ফ্যাসিবিরোধী এক সম্মেলনের দিনে প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার ফ্যাসিস্ট-অনুরাগীরা খুন করল তরুণ সোমেন চন্দকে, লেখক হিসেবে যাঁর সম্ভাবনা ছিল বিরাট। এই ঘটনায় সেদিন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সেদিন সমস্ত মতের ও পথের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা একবাক্যে ধিক্কার দিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিপদ যে আর কোনো তত্ত্বগত ব্যাপার নয়, সে বিপদ শুধু বাইরে থেকে নয়, দেশের মধ্যে থেকেই মাথা চাড়া দিতে পারে—এটা স্পষ্ট ধরা পড়েছিল সকলের কাছেই। সোমেন চন্দের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সেদিন যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে এই বিপদেরই হুঁশিয়ারি ছিল, তাকে প্রতিরোধের অভিপ্রায় ছিল। এই সূত্রেই সেই মার্চ মাসেই সমস্ত মত ও পথের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় (২৮ মার্চ)। সেই সভাতেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিয়ে জন্মলাভ করেছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। এর শুভানুধ্যায়ী ও সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, যামিনী রায়, ইন্দিরা দেবী, আবু সৈয়দ আইয়ুব, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হিরণ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীর মতো অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক, এমন কি প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত দাস, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষের মতো মানুষেরা; আর ছিলেন 'কমিটেড' লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা—গোপাল

হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, চিন্মোহন সেহানবীশ, সমর সেন প্রভৃতিরা, যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দলমত নির্বিশেষে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে এমনটি হওয়াই ছিল যেন স্বাভাবিক। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় ঘটনা। আর সেবারই রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্মৃতিবাসরে আমরা যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ফ্যাসিস্ট বিরোধী রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়, তাঁর নাটকে নতুন দিগন্ত খুঁজে পেলাম: এত আশা, এত উদ্দীপনা, সংগ্রামের এত প্রবল প্রেরণা! কথায়, ছন্দে, সুরে, তালে সেদিনকার প্রজন্মের চেতনায় রবীন্দ্রনাথ মশাল হয়ে উঠেছিলেন। সেদিন যে কী মহিমান্বিত রূপে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে ধরা দিয়েছিলেন তা আজ হয়তো বোঝানো কঠিন। মানুষের সভ্যতার চরমতম সংকটের দিনে সংগ্রামের তুঙ্গ মুহূর্তে তাঁকে চিনেছিলাম রণগুরু রূপে; আমাদের মন্ত্র দীক্ষা তাঁরই হাতে।

ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ জন্মমুহূর্ত থেকেই তৎপর হয়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রচারে। বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং লিখেছিলেন 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম (সাহিত্যিকের জবানবন্দি)'। রাজনৈতিক সংস্পর্শহীন আত্মমগ্ন কবি-সাহিত্যিককে ফ্যাসিবাদ সেদিন যে কী গভীরভাবে বিচলিত করেছিল এই রচনাটিতে তার পরিচয় আছে। এটি নিঃসন্দেহে সেদিনকার বাঙালি সাহিত্যিকের ভাবনার দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রতিভা বসু লিখেছিলেন 'ফ্যাসিজম ও নারী', বিজন রায় (সুশোভন সরকার) লিখেছিলেন 'জাপানী শাসনের আসল রূপ', 'অরণি' গোষ্ঠীর উদ্যোগে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা'—বিনয় ঘোষের 'জাপানী সমাজ ও শাসন', হিরণকুমার সান্যালের 'জাপানের স্বাক্ষর', সুধী প্রধানের 'জাপ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ', মণিকুন্তলা সেনের 'জাপানের মেয়েরা' ইত্যাদি। সংঘবদ্ধভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা বাঙালি কবিদের যে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রমাণ মিলবে সোমেন চন্দের স্মৃতিতে দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের প্রকাশিত 'প্রাচীর' সংকলনটিতে। ভূমিকায় শিরোনাম ছিল: NO PASARAN। এতেই প্রকাশিত হয়েছিল অমিয় চক্রবর্তীর 'ভূমিকা' কবিতাটি:

গড়ি প্রাচীর।

ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির

প্রাণখড়্গ

গান ধরগো

"ঐ কালোপন্থী কেউ টিকবে না, না, না।"

বিষ্ণু দে-র 'ইতিহাস :

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ারে
তবু আমি এই দধীচির হাড়ে, এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ কেটে দেব পাতা, লিখব বিজয়ভাষ্য।

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রতিবাদ' :

পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা।

এই সংকলনে ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'সম্পাতির গান', সমর সেনের 'নববর্ষের প্রস্তাব', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বেচ্ছাবাহিনীর গান'—জনযুদ্ধের প্রথম গান, 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ, রুখবো দস্যুদলকে আজ।'

কবিতা আর গান, সেদিন এই দুটির উৎসমুখ যেন খুলে গিয়েছিল। এমন কোনো কবি সেদিন ছিলেন কি না সন্দেহ, যাঁকে কোনো না কোনো ভাবে এই চেতনা সংক্রামিত করেনি। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের বছর শেষ না হতেই প্রকাশিত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র কবিতার বই '২২শে জুন'—ভাবের স্বচ্ছতায়, ভাষার সারল্যে, আবেগে দীপ্ত এক গুচ্ছ নিটোল কবিতা। হঠাৎ গানের জোয়ার এসেছিল, স্কোয়াডে গান, মিছিলে গান, জনসভায় গান—রঙ্গলালের, রবীন্দ্রনাথের, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, নজরুলের গান, জানা গান শোনা গান, তরুণতরুণীর কণ্ঠে বারবার গাওয়া গান। গান লিখতে কলম ধরেছিলেন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গান লিখেছিলেন উত্তরবঙ্গের ভাষায় বিনয় রায়, লোকগীতের সুরে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ট্রামের শ্রমিক, গ্রাম্য কবি, অখ্যাত অজ্ঞাত গীতকারেরা। গানের সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল, বিক্রি হয়েছিল হাজারে হাজারে।

জাপানীরা তখন এগুচ্ছে দ্রুত গতিতে, সিঙ্গাপুর গেছে, রেঙ্গুন গেছে, ওদিকে জার্মানি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে স্তালিনগ্রাদে, ককেসাসের দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করছে, আফ্রিকার মরুভূমিতে চলছে ভয়াবহ ট্যাংকের লড়াই—

দুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিস্ট দানবের তাণ্ডবের চরম অংক। তার প্রতিরোধে ভারতের সহস্র কণ্ঠে দাবি : হাতিয়ার চাই। কবিতায় গানে সেই দাবিরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু হাতিয়ার হাতে লড়বার জাতীয় নেতাদের দাবি অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ৮ আগস্ট বন্দী করল নেতাদের, জাতীয় কংগ্রেস নিষিদ্ধ করল। নেতৃত্ববিহীন সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠল জনতার স্বতস্ফূর্ত ক্রোধ ও ক্ষোভের। ফ্যাসিস্ট বিরোধী ভারতের জনগণের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি হল। প্রকৃত ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের কাঁধে পড়ল গুরুতর দায়িত্ব, ফ্যাসিস্ট-প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল জাতীয় নেতাদের মুক্তির আন্দোলন, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সরকারের আন্দোলন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা প্রয়োজন হল, ভারতের জাতীয় মুক্তি আজ আর বিচ্ছিন্ন কোনো আন্দোলন নয়, সারা পৃথিবীর মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। জার্মানি-জাপানের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে সে মুক্তি আসবে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাধ্য নেই সেই ভবিতব্য রোধ করার।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের পর দেশে সৃষ্টি হয়েছিল এক প্রবল নেতি-বাচক মানসিকতা। দমননীতি, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ, ভ্রান্ত দেশপ্রেমের ক্ষোভ ও হতাশা, বার্লিন-টোকিও রেডিওর প্ররোচনা সবকিছু মিলে জমে উঠেছিল অবিশ্বাস ও বিরূপতার কুয়াশা। সেদিন সেই কুয়াশার প্রাচীর হটাতে প্রাণমন সঁপে দিয়েছিলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীরা। সেই সময়ের কাব্যকবিতার দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা বিস্ময়কর, পরিমাণও প্রচুর। সে বছর বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল ঢাকার 'প্রতিরোধ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাটি। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুইদিনব্যাপী (১৯ ও ২০) ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত 'একসূত্রে' সংকলন। এটিকে নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সংকলন বলা চলবে। অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে তরুণতম কবিদের রচনা পর্যন্ত ভাবনার এক সূত্রে গাঁথা পড়েছিল। সম্মেলনে এসেছিলেন ঢাকা থেকে, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, ময়মনসিংহ থেকে প্রতিনিধিরা। ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হবিবুল্লা বাহার, বুদ্ধদেব বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ; উদ্বোধন করেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হিরণকুমার সান্যাল। সেদিনকার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে ছিল দ্বিধাহীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী অকপট স্পষ্টতা। তিনি বলেছিলেন,

> ......ভারতের জনগণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সে-ভুলের মাশুল দিতে আবার সেই ভুল আমরা করব না। একদল মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে—আমরা গোলামী করতে আছি, গোলামী আমরা করব। হয় এর, নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য থেকে বিলুপ্ত হোক। এদেরই সমগোত্রীয় একদল সুবিধান্বেষী কৌশলতান্ত্রিক আছে, যারা বলে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। ......মুষ্টিমেয় ক্লীব এবং সুবিধাবাদীদের যুক্তির প্রতিবাদে অধিক কথা বলার প্রয়োজনও আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে যে বিক্ষোভ উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের ভ্রান্ত দম্ভভরা শাসন পদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় সেই বিক্ষোভই একমাত্র অন্তরায় হয়ে উঠেছে জনশক্তির সংহতি গঠন ও প্রেরণা উদ্বোধনের পথে। কেমন করে উন্মত্ত জনশক্তিকে তাণ্ডব থেকে সংহত করে আজ এই বিশ্বমানবের এবং মানবতার বিরুদ্ধবাদী ধ্বংসকামী আসুরিক শক্তির বিপক্ষে উদ্যত করা যায় সেই হয়েছে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যার বিষয়।'[২৬]

সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল :

> '...যে সরকারী দমন নীতি আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করতে চাইছে তাতে যে রাজনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে তা ফ্যাসিস্টশক্তি ছাড়া আর কাউকে সাহায্য করছে না ; পৃথিবীব্যাপী প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দেশের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্যে এই সংকটের অবিলম্বে সমাধান চাই।'

সম্মেলন শেষ হবার কয়েক ঘণ্টা পরেই কলকাতায় হয়েছিল প্রথম জাপানী বিমান আক্রমণ।

ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অফিস হয়েছিল ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে। ওয়েলিংটন-ধর্মতলার মোড়ের বাড়িটির চারতলায় একখানা বড় ঘর, ছোট্ট একটু ছাদ, আর তিনটে খুপরি, চেয়ার টেবিলের বালাই নেই, বিরাট এক শতরঞ্চ পাতা। বটুকদার ভাষায়, 'ছেচল্লিশ নম্বর ছিল

তখন প্রকৃত অর্থেই কমিটমেন্টে বিশ্বাসী শিল্পসাহিত্যের মহাযজ্ঞ ও কর্মশালা।'২৭

ফ্যাসিস্টবিরোধী বিশ্বসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব তখন। দুনিয়ায় মানুষের রুদ্ধ-শ্বাস দৃষ্টি তখন কেন্দ্রীভূত স্তালিনগ্রাদে। সত্যিকারের লড়াই শুরু হয়েছিল বিয়াল্লিশের বসন্তকালে ভলগার এই শহরটিকে ঘিরে, হিটলার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন স্তালিনের নামের শহরটিকে দখল করতে, ককেশাসের পথ উন্মুক্ত করতে। এমন প্রতিরোধ পৃথিবীর ইতিহাস কখনো দেখেনি। বিস্মিত স্তম্ভিত জগৎ দেখতে পেল, অবশেষে জার্মান বাহিনী পরাজিত হল, ৯০ হাজার সৈন্য সমেত জেনারেল ভন পলাস স্তালিনগ্রাদে আত্মসমর্থন করলেন। স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধ সেদিন ছিল কোটি কোটি মানুষের দুর্জয় সংকল্পের বজ্রমুষ্ঠি। সেদিনের কবিতায় গানে স্তালিনগ্রাদ নামটি ধ্রুবপদের মতো বেজে উঠেছিল। স্তালিনগ্রাদ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আরও কত কবি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন একাধিক কবিতা, স্তালিনগ্রাদের বিজয়ে তিনি লিখেছিলেন,

ফেরে লুব্ধ পশু
মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা ;
প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু-আতঙ্কিত,
স্তালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর ;
তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ স্বাক্ষর।

স্তালিনগ্রাদে জার্মানির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেনিনগ্রাদ অবরোধ মুক্ত হল, মস্কোর সামনে থেকে জার্মানরা হটে গেল আরও আড়াইশ মাইল ; কুর্কসে জার্মান অক্রমণ প্রতিহত হয়ে গেল, কিন্তু শুরু হল খার্কভের সেই মহাযুদ্ধ, যার প্রতিধ্বনি বিষ্ণু দে-র 'খার্কভ' কবিতায় :

শয়ান রয়েছি স্থির
শুভ্র স্তব্ধ কাফুনের মাঝে।
আমার নিঃশ্বাস ধীর
শুধু কি আমারই কানে বাজে ?

সে যুদ্ধেও জার্মানবাহিনী প্রতিহত হল, সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল মস্কো থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত জার্মানবাহিনীর পশ্চাদপসরণ। সেই শীতেই বোঝা গেল জার্মানির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের সামনে তখন ঘোর দুর্দিন।

একাধিক বিমান আক্রমণ ঘটেছে চট্টগ্রামে, বিশাখাপত্তনে, কলকাতায়; শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ, বিদেশী আমলাতন্ত্রের ভ্রান্তনীতি, এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের লোভের ফলে, যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি ইতিহাসে যার নাম 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। গোটা গ্রামবাংলা সেদিন আছড়ে পড়েছিল খিদের জ্বালায় শহরে শহরে, কলকাতার ফুটপাথে; শুধু হাহাকার, মৃত্যু আর কঙ্কালের মিছিল। সেই মন্বন্তর, সেই বীভৎসতার অন্ধকার দিনে ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রাণের আবেগে, আক্ষরিক অর্থেই রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনকার কাব্যকবিতায়, গানে, গল্প-উপন্যাসে, ছবিতে ধরা পড়েছিল জীবনের প্রত্যয়ে অবিচল বাঙালি কবিশিল্পীর এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ প্রত্যয়। দেশ-মাটি-মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের এমন নিবিড়তা আর কখনো এমন ব্যাপক হয়ে দেখা যায় নি। তাৎক্ষণিকতা কখনো এমন করে স্থায়ী সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি। তেরশ পঞ্চাশের কালেই বিস্ময়কর আবির্ভাব সুকান্ত ভট্টাচার্যের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রবদলের ঘোষণা। তেরশ পঞ্চাশেরই সৃষ্টি জয়নাল আবেদিন-চিত্তপ্রসাদের ছবি; সুনীল জানার ফটোগ্রাফি; বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান', 'মধুবংশীর গলি কবিতা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'নবজীবনের গান'গুলোর একমাত্র তুলনা চলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের গানের সঙ্গে—কথায় সুরে সেই প্রত্যয়। সেই প্রতিবাদ, সেই রণধ্বনি,

না না না।
মানবো না মানবো না।
কোটি মৃত্যুকে কিনে নেবো প্রাণপনে
ভয়ের রাজ্যে থাকবো না।

জনসভায় মিছিলে তাঁর নিজের কণ্ঠে, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, প্রীতি সরকারের কণ্ঠে যখন বেজে উঠত :

পথে পথে শংকা
মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয়-ডঙ্কা।
ধনগৌরবে মাখা যুদ্ধের অঙ্গ।
আমরা ত সৈনিক
বুভুক্ষু দৈনিক
আমরা কি দেবো রণে ভঙ্গ।

তখন মানুষের পেশী হয়ে উঠত ছিলা-টানটান ধনুকের মতো। শহরে, গ্রামে হাজার-হাজার স্তব্ধ মানুষের সভায় শম্ভু মিত্র দিনের পর দিন আবৃত্তি করতেন 'মধুবংশীর গলি',

> স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে
> স্টালিনগ্রাডে, মস্কোভায়,
> টিউনিসিয়ায়, মহাচীনে
> মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে
> দুর্দমনীয় ঝড় উঠছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।

সেই দিনে সেই পরিবেশে সেই আবৃত্তি যারা শুনেছে তারা ভাগ্যবান, সে যেন আবৃত্তি নয় মহা আশ্বাসের দিব্যবাণী, কালের কণ্ঠস্বর।

ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫-১৭ তারিখে ভারত সভা হলে। সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহমেদ, গোপাল হালদার এবং শচীন দেববর্মন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সম্মেলনের ভাষণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর চোখে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ প্রথম থেকে ভালো ঠেকেনি; শিল্পের বিশুদ্ধির নামে তাঁরা এর প্রতি বিরূপ ছিলেন; বিয়াল্লিশের আগস্টের পর থেকে তাঁরা গায়ে চাপিয়ে-ছিলেন জাতীয়তার নামাবলি। তাঁদের নেতা ছিলেন এক মাসিকের জবরদস্ত সম্পাদক-লেখক, এক দৈনিকের বেতনভুক কতিপয় লেখক। ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে, কুৎসায় তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল সেদিনকার ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে হেয় করার, তুচ্ছ করার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে ছিল তাঁদেরই জবাব। বিরোধীরা ধুয়ো তুলেছিল ফ্যাসিবাদবিরোধিতা একটা নেতিবাচক বস্তু এবং তা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী। তাঁদের অভিযোগ খণ্ডন করে তারাশঙ্কর বলেছিলেন: ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা কোনো নেতিবাচক অবস্থান নয়, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাই আমাদের স্বাধীনতার ইতিবাচক সংগ্রাম, আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অস্তিত্বের সংগ্রাম। ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে যে শক্তি—তার সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য সহায়কদের বিরুদ্ধে, মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের ফলে ফুলে ফেঁপে ওঠা মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ইতিবাচক সংগ্রামই ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা; নিপীড়িত

পদদলিত আমাদের মহান জনগণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার সংগ্রামই ফ্যাসিবাদবিরোধিতা।[২৮]

সম্মেলনের সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষণও ছিল একই কারণে মূল্যবান। তিনি বলেছিলেন: সমাজে বিশেষ স্থানের জন্যে শিল্পীসাহিত্যিকরা এক ধরনের গর্ব পোষণ করেন। কিন্তু আজ তাঁদের সেই গর্ব পরিহার করতে হবে, বিনীতভাবে জনগণের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। এবং তাঁদের ফ্যাসি-বাদকে ধিক্কার দিতেই হবে, কারণ ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অসূয়া, নিষ্ঠুরতা, পীড়ন, সমস্ত প্রকারের অদাক্ষিণ্য—যা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত আছে, তারই নামান্তর। এই যে অসূয়া আজ বহু দেশের শুভ বুদ্ধিকে অভিভূত করেছে তার দায়িত্ব কোনো শিল্পী-সাহিত্যিক এড়িয়ে যেতে পারেন না, আর এই জন্যেই আজ আমাদের কর্তব্য হবে সেই ভাবনার বাহক হওয়া যা সরল, যা করুণাপূর্ণ, যা কল্যাণময়; শূন্যগর্ভ বাকচাতুরি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে চলবে না।

মাত্র দেড় বছরের মধ্যে আন্দোলন জনজীবনকে যে কতখানি স্পর্শ করেছিল সেবারকার সম্মেলনই ছিল তার প্রমাণ। সেবার শতাধিক প্রতিনিধি এসেছিলেন দূর-দূরান্ত থেকে—রংপুর, জলপাইগুড়ি, সিলেট, ময়মনসিং, ঢাকা, মালদা, খুলনা, যশোর, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, বরিশাল থেকে। আর সেবারই ঘটেছিল সাংস্কৃতিক জগতের অভিনবতম ঘটনা—প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা মঞ্চে হাজার-হাজার মানুষের সামনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেদিনই প্রমাণ হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন কতখানি ইতিবাচক। ময়মনসিং-এর পাঁচালি গায়ক নিবারণ পণ্ডিত, লোকগীতির যাদুকর হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, উত্তরবঙ্গের পানু পাল, রংপুরের কীর্তনীয়া অমূল্য সেন, মালদহের গম্ভীরা গায়েন সতীশ মণ্ডল, খুলনার হরিপদ চক্রবর্তী, যশোরের কবি-গায়ক নেপাল সরকার, হুগলির দয়ালকুমার কলকাতা ময়দানে সেদিন গ্রামবাংলার সেই প্রাণরসের অমৃতাস্বাদ বিতরণ করেছিলেন, শাসনশোষণ সামীমন্বন্তরের দাবদাহেও যার উৎস কখনো শুকোয় না। সেই অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও ছিলেন অভিনব—বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, শিক্ষিত অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত, মজুর, বেকার, হকার, পথচারীর দল। ঘাসহীন পার্কের মাটিতে, কাগজ বিছিয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত নাচ-গান অভিনয়। পরদিন (১৭ জানুয়ারি) মিনার্ভা থিয়েটারে হয়েছিল কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার উদ্বোধন করেছিলেন

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। সেদিন অভিনয় হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে উনিশশো চুয়াল্লিশের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা 'নবান্ন' নাটক। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেরই উদ্যোগে অভিনীত হয়েছিল 'নবান্ন'। সংঘ গান ও নাট্যাভিনয়ের যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে পৃথক শাখা গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে তৈরি হয়েছিল হরীন্দ্রনাথ ও বিনয় রায়ের নেতৃত্বে 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। তাতে ছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি ভাদুড়ি, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ট্রাম শ্রমিক দশরথ লাল, রেখা জৈন, প্রেম ধাওয়ান প্রভৃতি। পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, লাহোর, বোম্বাই ঘুরে অনুষ্ঠান করে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্যে তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। তারপর গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বোম্বাইতে পি সি যোশীর তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে সেন্ট্রাল ট্রুপ। তাতে যোগ দিয়েছিলেন উদয়শংকরের আলমোড়ার দক্ষ শিল্পীরা—রবিশংকর, শান্তিবর্ধন, শচীন শংকর। উদয়শংকরের ঐতিহ্য লোকজীবনের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। সেন্ট্রাল ট্রুপের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া'।

'নবান্ন' প্রথম দিনেই ঝড় তুলেছিল কলকাতার রঙ্গমঞ্চে। প্রচলিত দৃশ্যপট নেই, মঞ্চসজ্জার আতিশয্য নেই, চট টাঙানো নিরাভরণ মঞ্চে গ্রামের মাঠ, শহরের রাজপথ, ছিন্নমূল জীবনের দৃশ্যাবলি। আর অভিনয়? সে তো চোখে দেখার, কানে শোনার জিনিস। যারা দেখেনি তারা কী করে বুঝবে তা, কী করে অনুভব করবে প্রথম দিনের রোমাঞ্চ। 'নবান্ন' সেদিনকার সংগ্রামী শিল্পীর অন্বেষার পরম প্রাপ্তি।

১৯৪৪ সালের গোড়াতেই আমরা বুঝেছিলাম ফ্যাসিবাদ চূর্ণ হতে চলেছে। সারা রুশফ্রন্ট জুড়ে জার্মানরা পশ্চাদপসরণ করছে। মার্চ মাসে প্রচণ্ড আক্রমণ করে জাপান ঢুকে পড়েছিল ভারতের মাটিতে ইম্ফল পর্যন্ত, কিন্তু চার মাসের মধ্যে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। উত্তর চীনে জাপান প্রচণ্ড ঘা খেল চীনের হাতে। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নৌ-কর্তৃত্ব আর রইল না। সেই জুনে মিত্রশক্তিবাহিনী অবতরণ করল নরম্যাণ্ডিতে, সিসিলি দখল হল আগস্টে। মিত্রশক্তি পৌঁছবার আগেই মুক্তিবাহিনী প্যারী মুক্ত করল ২৪ আগস্ট, জেনারেল লেফলের্কের ট্যাংক-

বাহিনীর পাশাপাশি পারীতে ঢুকলেন মুক্তিবাহিনীর জেনারেল রল-তাঁস্যাই। মিত্রশক্তি বাহিনী নামল ইতালিতে। সেই সেপ্টেম্বরেই রাশিয়ার মাটির প্রতিটি ইঞ্চি জার্মান শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। জার্মানির শহরগুলো গুঁড়িয়ে যেতে লাগল বিমান আক্রমণে। পূব থেকে পশ্চিম থেকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে দুই বাহিনী বার্লিন লক্ষ্য করে। ইউরোপের মুক্তিযুদ্ধের কতো কাহিনীই না আমাদের কানে আসছে। আমরা জেনেছি যুগোশ্লাভিয়ায় টিটো আর তাঁর পার্টিজানদের কথা, গ্রীসের দুর্দ্ধর্ষ গেরিলা ও মারকোসের কথা। আমরা দেখেছি স্তালিনগ্রাদের সেই যুদ্ধের ছায়াচিত্র। কতো উপন্যাস, কতো গল্প, কবিতা, কতো সংবাদ: ভ্যাসিলেভ্‌স্কায়ার 'রামধনু', এরহেনবুর্গের 'পারীর পতন', ভেরকরের 'সমুদ্রের মৌন'। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে সবকটি। 'সমুদ্রের মৌন' অনুবাদ করেছিলেন তিন জন—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে। আমরা পড়েছিলাম আরাগঁর সেই কবিতা, যা গ্যাব্রিয়েল পেরির মৃত্যুতে লেখা: 'যদি আবার চলতে হয় / আমি চলব এই পথেই / কারাগার থেকে বাঙ্‌ময় হয়েছিল আগামীকাল।' এলুয়ারের 'স্বাধীনতা' (বিষ্ণু দে'র অনুবাদ), সিমোনভের 'আমার জন্যে প্রতীক্ষা করো / আমি আসব আবার', 'স্মলেনস্কের সেই পথ—মনে আছে আলিওশা?' আমাদের হাতে হাতে ঘুরত এরহেনবুর্গের 'রাশিয়া এ্যাট ওয়ার'। মিছিলে ময়দানে আমরা গাইছি 'নবজীবনের গান'; গল্পে-কবিতায় ধরতে চেষ্টা করছি যুগের বাস্তবতা, দেশ ও মানুষের মর্মকথা; 'নবান্ন' অভিনীত হচ্ছে কলকাতায়, মফঃস্বল শহরে, খোলা ময়দানে হাজার হাজার দর্শকের সামনে।

১৯৪৫ সাল শুরু হল। জার্মানি-জাপানের নাভিশ্বাস উঠেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছে পার্টিজান গেরিলারা—ইন্দোচীনে ভিয়েতমিন, ফিলিপাইনে হুকবালাহাপ, ইন্দোনেশিয়ায় মারদেকা; মালয়ের রবারের জঙ্গলে মরণ ফাঁদ পাতছে গেরিলারা, অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছেন তরুণ আউং সান, থান টুন, নাক্কিন সোয়ে। এমনই পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক ও শেষ সম্মেলন।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩—৮ মার্চ ছয় দিন ধরে মহম্মদ আলি পার্কের বিরাট প্যাণ্ডেলে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন বিশাল সাংস্কৃতিক সম্মেলন আগে কখনো হয়নি। শহর ও গ্রামের সংস্কৃতির মেলবন্ধন,

যা চিরকালের অন্বিষ্ট, তা এমন করে আগে কখনো ঘটে নি। সেবারকার সভাপতিমণ্ডলীর চেহারা ছিল অভিনব: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ধীরেন সেনের পাশেই একই আসরে গ্রাম্যকবি শেখ গোমানি এবং পশুপতি ভট্টাচার্য—যিনি জাতে বামুন কিন্তু বৃত্তিতে মৃৎশিল্পী—কুমোর। সম্মেলন উপলক্ষে ছাপা হয়েছিল ১৮৬০ সাল থেকে এতাবৎ স্বদেশী গানের সংকলন। খোলা হয়েছিল বিরাট ছবির প্রদর্শনী—'এই আমার দেশ'। তাতে ছবি দিয়েছিলেন অতুল বসু, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, জয়নাল আবেদিন, সতীশ সিংহ, শৈল চক্রবর্তী, গোবর্ধন আশ, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত, মুরলিধর টালি, মণি রায় প্রভৃতি। উদ্বোধন করেছিলেন অসিতকুমার হালদার। আর ছিল ঢাকাই মসলিন, কৃষ্ণনগরের পুতুলের প্রদর্শনী। টগর অধিকারীর দোতারা, সাহেব আলির বাউল গান, ব্রজেন বিশ্বাসের পল্লীগীতির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পরিচালনায় একই আসরে স্বদেশী গানে গ্রাম ও শহরের ঐকতান বেজে উঠেছিল। সারারাত ধরে হয়েছিল কবিগান—এক পক্ষে চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও তাঁর সহকারী ফণি বড়ুয়া, অন্য পক্ষে শেখ গোমানি ও তাঁর সহকারী লম্বোদর। সে কবিগানের জাতই আলাদা—পক্ষ-প্রতিপক্ষ দেবদেবী নয়, কোনো কেচ্ছাদার কাহিনী নয়, পক্ষ-প্রতিপক্ষ সমাজের দেশের শত্রু আর সংগ্রামী মানুষ, শাসন-শোষণ ও সংগ্রামের কাহিনী।

এই সাংস্কৃতিক মহোৎসবে উদ্দীপ্ত হয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগকম্পিত কণ্ঠে সম্মেলনে বলেছিলেন: দুর্ভিক্ষ ও শতদুর্গতি বাংলার শিল্পীর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি, বাঙালি শিল্পীর কণ্ঠে আরও বেশি করে ধ্বনিত হয়েছে আমাদের জনগণের আবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমরা থামবো না যতো দিন না আমরা গাইতে পারি মুক্ত ও মহান জীবনের গান। আমাদের গাইতে হবে যাতে মৃত ও মুমূর্ষুরা জেগে উঠে তাদের অপেক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছিলেন কুৎসাকারী, নানাবেশধারী প্রতিক্রিয়াশীলদের। তিনি বলেছিলেন: ওরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আন্দোলন ও প্রগতিকে ভয় পায়। ওরা মানুষের অগ্রগতির শত্রু, তাই ওরা বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীদের সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। সে সময়ে বিক্ষিপ্ত বিরোধীরা সংগঠিত হবার

ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' নামে সংগঠনের নামে। জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উড়িয়ে, উচ্চবিত্ত সমাজের সৌখিন গাইয়ে বাজিয়েদের দিয়ে 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া'-র নকলে 'অভ্যুদয়' নামে একটা দৃশ্য ও শ্রব্য বস্তু মঞ্চস্থও করেছিলেন। তাঁদের কুৎসা প্রচারের সীমা ছিল না। এক মাসিক পত্রের এবং দৈনিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন তাঁদের সহায়, পাতায় পাতায় শুধুই ছাপা হতো কুৎসাকাহিনী, রাজনৈতিক আক্রমণ। একদা প্রগতিবাদী এক শক্তিমান লেখক লিখেছিলেন সংঘের ম্যানিফেস্টো, লিখেছিলেন এক অসূয়াবিদ্বেষভরা উপন্যাস, কালের ঝাঁটায় যার স্থান হয়েছে ইতিহাসের ডাস্টবিনে ;

সম্মেলন শেষ হয়েছিল 'নবান্ন' ও 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। সেদিনকার মতে এতো দর্শকের সৌভাগ্য কলকাতার ইতিহাসে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কখনো হয়নি। সেবার প্রতিনিধি এসেছিলেন প্রায় দুশো, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের শাখাই গড়ে উঠেছিল চোদ্দটি। বৃদ্ধ আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এসেছিলেন সুদূর চট্টগ্রাম থেকে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি থেকে, দৌলতেন্নেসা খাতুন রংপুর থেকে। সম্মেলনে বাণী পাঠিয়েছিলেন সিয়ান ও-কেসি। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয় সংঘের নাম পরিবর্তনের। প্রগতির চরমতম শত্রু ফ্যাসিবাদের সমাধি রচিত হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহাসিক পর্ব শেষ হতে চলেছে। এখন থেকে সংগ্রামী শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব হবে জাতীয় স্বাধীনতার, সমাজবিপ্লবের অগ্রবাহিনী গড়ে তোলার। এবার তুলতে হবে স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির পতাকা। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হলো পরিবর্তিত নাম হবে : প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। সম্মেলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ডাক দেওয়া হলো সমস্ত দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার ভেঙে পড়া সমাজজীবনকে পুনর্নির্মাণ করতে ; একমাত্র ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে পারে, স্বাধীনতার পথে দেশকে নিয়ে যেতে পারে। সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। মানুষের ইতিহাসের চরমতম দুর্দিনে, এ দেশের ইতিহাসের প্রবলতম দুর্যোগের দিনে রবীন্দ্রনাথের বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিলেন নিষ্ঠাভরে, এই তাঁদের গর্ব। এই সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার দাবিতে ও নজরুলকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে।

তারপর? তারপর—'উঠেছে কালের খড়্গ / থর থর বলির পশুরা'। রাইন পেরিয়ে লাইপজিক মুখে ছুটেছে মার্কিন বাহিনী, ফরাসী বাহিনী ছুটেছে মিউনিক লক্ষ করে, ব্রিটিশবাহিনী সপ্তমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নেদারল্যাণ্ডসে, ব্রেনার গিরিসংকট পেরিয়ে ব্রিটিশ-মার্কিনবাহিনী ঢুকছে অস্ট্রিয়ায়, আর পূব থেকে ধেয়ে আসছে সাতটি বর্শাফলকের মতো লাল ফৌজের সাতটি বাহিনী—হাঙ্গেরির মধ্যে দিয়ে, চেকোশ্লোভাকিয়া ভেদ করে, পোল্যাণ্ডের সীমান্ত পেরিয়ে। বার্লিন ঘেরাও হয়ে গেল, লাল-ফৌজের মুঠোয় আটকা পড়লেন নাৎসী নায়ক। এলবের ধারে টোরগোতে মিলিত হল মিত্রপক্ষ ও রুশবাহিনী। ২৬ এপ্রিল দুনিয়ার মানুষ জানল মুসোলিনির পরিণাম। রক্ষিতাকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন গ্যারিবল্ডি বিগ্রেডের হাতে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তিনি। মিলানের পার্কে পড়ে থাকা পায়ে কলা থ্যাঁতলানো সে মৃতদেহের ছবি দেখেছি সংবাদপত্রের পাতায়। তার চার দিন পর ৩০ এপ্রিল মাটির তলায় বাংকারে আত্মহত্যা করে ফাঁসির দড়ি এড়ালেন হের হিটলার, রাইখের ফুরহার।

পরদিন ১ মে। ১৯৪১ সালের ৭ নভেম্বর—যেদিন জার্মানবাহিনী মস্কো থেকে পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে, সেদিন রেডস্কোয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্তালিন, ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতার মতো। ঐতিহাসিক নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'একটি ফ্যাসিস্ট, একটি বুলেট।' আজ তিনি ঘোষণা করলেন: 'ফ্যাসিবাদ পরাজিত, গণতন্ত্র ও শান্তির পতাকা এবার তুলে ধরতে হবে।' সেবারে 'মে-দিন' লিখলেন বিষ্ণু দে:

> মে দিনের গানে আসন্ন তানে
> হে লাল কমল হে নীলকমল
> স্বর্ণলঙ্কা চূর...
> মে দিনের গান কালবৈশাখী
> ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি
> মরণই মরণাতুর

৪ মে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বার্লিনের পতন উৎসবে কলকাতায় কী বিশাল শোভাযাত্রা। ২৫ হাজার ছাত্র মজুর বুদ্ধিজীবী, পুরুষনারীর সেই শোভাযাত্রা ঘুরল পথে পথে। লালঝাণ্ডা হাতে পুরোভাগে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মুজাফ্‌ফর আহমদ, ভবানী সেন, রেজ্জাক খান, নীরেন্দ্রনাথ

রায়। সেই শোভাযাত্রায় কংগ্রেস নেতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মুসলিম লিগ নেতা লাল মিঞা। লাল পতাকায় সাজানো ট্রাম ছুটল গুমটি ছেড়ে, সামনে স্তালিনের বিশাল প্রতিকৃতি। রিক্সায়, সাইকেলে লাল পতাকা: লালফৌজ জিন্দাবাদ! কমরেড স্তালিন জিন্দাবাদ! ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনি: **'Hitler has gone, Amery must go', 'If Nehru in prison, who is India's Representative at San Fransisco ?'** শিল্পীদের কণ্ঠে গান: 'ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়…', মজুরের কণ্ঠে ইনটারন্যাশনাল: 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড…'। রাস্তার দুপাশে, বারান্দায়, ছাদে কাতারে কাতারে মানুষ, জিপ থামিয়ে হুড়মুড় করে নামছে মার্কিন, ব্রিটিশ, নিগ্রো সৈন্যরা, বুকে জড়িয়ে ধরছে মিছিলের মানুষকে।

৯ মে আত্মসমর্পণ করল জার্মানি, জাপানের আত্মসমর্পণে সময় আরও তিন মাস। ইতিহাসের নতুন অধ্যায় শুরু হলো। বাঙালী কবিশিল্পীর চোখে সেদিন নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত। গভীর প্রত্যয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন: 'আগে চলো, আগে—

বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে—
আকাশে আকাশে ফোটে আরক্তিম আভা।
লক্ষ কণ্ঠে হুংকারিত জয়ে
ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্ত পদচিহ্ন তার
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়।[২৯]

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১ ১৩৩৩ সালের প্রবাসী (শ্রাবণ); ১৯২৬ সালের মডার্ন রিভিউ (মে-জুন) প্রভৃতি সংখ্যা এবং তারকনাথ দাসের প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

২ রমাঁ রলাঁ—ভারতবর্ষ, পৃ ১৫৭।

৩ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, পৃ ৯।

৪ **Anti-Fascist Traditions of Bengal,** পৃ ৪।

৫ ***Antltae Vidal-Henri Burbusse Soldat de la Paix,*** পৃ ২৮০।

৬ আবেদনটি এদেশে প্রচারিত হয়েছিল কিনা তার কোনো তথ্য আমার

চোখে পড়েনি। পূর্ণ বয়ানের জন্যে দ্রষ্টব্য রমঁ্যা রলাঁর 'ভারতবর্ষ' পৃ ৪৩৯-৪০।

৭ P. Roy—Mussolini and the cult of Italian youth, প্রবাসী প্রেসে ছাপা, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই এই বইয়ের সমালোচনা করেন 'মডার্ন রিভিউ'-তে।

৮ রমঁ্যা রলাঁ—ভারতবর্ষ, পৃ ৪৫৯-৬০।

৯ তদেব, পৃ ৪৩৬।

১০ তদেব, পৃ ৪৪৬-৪৮।

১১ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস ; পৃ ১৬৪-৬৫।

১২ International Solidarity with the Spanish Republic—19.6-39, পৃ ১৩৮।

১৩ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, পৃ ১৫।

১৪ Pablo Neruda—Memoirs, পৃ ১২৮।

১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, (১৩৬৩ সং), পৃ ১৪০।

১৬ La Guerre D'Eespagne (Historia), পৃ ১৯২।

১৭ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠি। বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য-এ উদ্ধৃত। পৃ ৩৮-৩৯।

১৮ ২০ নভেম্বর, ১৯৩৯ রলাঁ রিলার ব্লককে লিখেছিলেন : '(তাঁর) এই সহজ বিশ্বাস যে আজ পথের নির্দেশ স্পষ্ট : হিটলারবাদকে ধ্বংস করো। Delanda est'—J. Albertini—Romain Rolland : Textes Choisis, ভূমিকা, পৃ ১০১।

১৯ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, পৃ ৩৯।

২০ অলকা পত্রিকায় প্রকাশিত, চিন্মোহন সেহানবিশের 'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক চেতনা' বইতে উল্লিখিত।

২১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০।

২২ উদ্ধৃতিটি চল্লিশ বছর আগের স্মৃতি থেকে।

২৩ সমস্ত উদ্ধৃতি Anti-Fascist Traditions of Bengal থেকে নেওয়া, পৃ ৫৮, ৪৮, ৪৯, ৫১।

২৪ **Paul Eluard : La poesie de circonstance (Oeuvres Completes),** পৃ ৯৪২।

২৫ এই স্মরণীয় কবিতাটি বহু মুদ্রিত। এ যুগে অনেকের ধারণা 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। স্বয়ং কবিই এটির প্রকাশের তারিখ ভুলে গেছেন। ১৯৩৯ সালের বাংলা কবিতার সংকলনেই এটি স্থান পেয়েছিল।

২৬ এই ভাষণের পূর্ণ বয়ান ছাপা হয়েছিল শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিবাদন' পত্রিকার ১৩৪৯ পৌষ-মাঘ সংখ্যায়।

২৭ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—আমাদের নবজীবনের গান ; কমিউনিস্ট, পৃ ২২০।

২৮ দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষণ এবং তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের মূল পাঠ হাতে পাইনি, 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকার প্রতিবেদনের বাংলা ভাবানুবাদ।

২৯ বর্ষশেষ—চিরকুট।

'ত্রিদিবা'-র আধুনিকতা

কার্তিক লাহিড়ী

পৃথিবীতে যাবতীয় কথা বলা হয়ে গেছে, নতুন কিছু বলার নেই, আমরা কেবল সেই পুরনো কথা বলে যাই মাত্র—এমন সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হতে পারলে ঝামেলা অনেক মিটে যেত সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তব এমন নিরেট নৈর্ব্যক্তিক যে কোনও সিদ্ধান্তই তার প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ চাপে একঠায় থাকে না। হয়তো সমাজ-সংসার বিযুক্ত অবচ্ছিন্ন (abstract) স্তরে এই চাপকে লুপ্ত করা চলে, অথচ মানুষ তেমন অবচ্ছিন্ন জড় নয়, তার নিজের কিংবা বাইরের চাপে তাকে এগুতে পিছুতে বা খানিক থেমে থাকতে হয়, তাই তার বলার কথা পাল্টাতে থাকে কখনো অলক্ষ্যে ও অচেতনে কখনো সচেতনে বা, সময় সময় পুনরাবৃত্তি চলে যখন দেশ ও কালের মাত্রা আপাতত স্থির থাকে, আপাতত, কেননা সমাজের কোথাও না কোথাও অস্থিরতা থাকেই থাকে যার অন্তঃশীল আবেগ টের পান আশুচেতন মানুষ, এবং এই অস্থিরতা পরিপক্ক হতে থাকলে চলিষ্ণুতাকে ক্ষয়িষ্ণুতা দিয়ে ঠেকানো যায় না, বলার কথা তখন নতুন ধরনে স্ফারিত হতে চায় কিংবা নতুন ভঙ্গির মধ্যে আন্দোলিত হয় আর সব নতুন কথা।

সেজন্য সমাজ-সভ্যতার নানা পর্বে বা একই অধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ে মানুষ ঠিক একই কথা একই ভাবে বলে না, সময় সময় হয়তো পুরনো কথা নতুন ভাবে বলে এমন মনে হয়, কিন্তু যে কথা নতুন ভাবে বলা হয় সে কথা তার আদি তাৎপর্যে অটুট থাকে কিনা তা আমাদের বিবেচ্য হয়ে ওঠে। বোধহয় বলার কথা ও তার ধরন স্থিতিস্থাপকধর্মী নয়, তাই একটি বিষয় বিভিন্ন ভাবে বললে সেই বিষয়টির তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়, যেমন বিভিন্ন ধরনে বলার মধ্যে একই বিষয় প্রতিফলিত করা যায় না, কারণ বলার কথা তরল পদার্থের মতো নয়; তরল পদার্থ পাত্রের আকার ধারণ করে, এবং তাতে তরল পদার্থের প্রকৃতিগত কোনও পরিবর্তন হয় না, অথচ বলার কথা তেমন করলে তার প্রকৃতি পাল্টে যায়, ফলে ঠিক কথার জন্য ঠিক ধরন বা ঠিক ধরনে ঠিক কথা বলা সমস্যার বিষয় হয়ে পড়ে,

বিশেষত শিল্পী-সাহিত্যিককে এই সমস্যার জট উন্মোচনে প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে হয়।

গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা' আলোচনায় বলার কথা ও তার ধরনের বিষয় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, এই জন্য 'ত্রিদিবা'-র বিষয় ও তার উপস্থাপনা-রীতি শুধু গতানুগতিকই নয়, বাংলা উপন্যাসের নাতিদীর্ঘ পরিসরে সেই প্রয়াস দুঃসাহসিক মনে হয় অন্তত 'ত্রিদিবা'-র প্রথম পর্ব 'একদা'-র রচনা ও প্রকাশকালের কথা মনে রাখলে, অন্যদিকে 'একদা' বাংলা উপন্যাসের মাত্রা বাড়ায় রাজনৈতিক চেতনার এক নতুন সুর যোজনা করে ; এর আগে আমাদের অনেক সৎ (সিরিঅাস্) উপন্যাস রাজনীতি বর্জন করে নি—একথা সত্য হলেও সরাসরি আধুনিক সাম্যবাদী রাজনীতির কথা এতাবৎ অপাংক্তেয় ছিল গল্প-উপন্যাসে, গোপাল হালদার সেই নিষিদ্ধ (?) বিষয় নিয়ে এলেন প্রত্যক্ষ ভাবে বাংলা উপন্যাসে, তারপর অবশ্য এ ধারা প্রবল হয়েছে সন্দেহ নেই।

একজন উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত তার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে শেষে "All roads lead to Communism. মানবমুক্তির দিকে, ভালোবাসার রাজ্যে" (ত্রিদিবা পৃ ৫২৭) প্রবেশ করে, "ইতিহাসের পথ, জীবনের পথ, মানব-তীর্থের পথ—" (পৃ ৫২৭) তার জীবনের অনিবার্য পরিণতি হয়—সাদামাঠা ভাষায় এই হচ্ছে 'ত্রিদিবা'-র বিষয়বস্তু, এবং তা রূপায়ণের জন্য ঔপন্যাসিক বেছে নিয়েছেন তিনটি স্বতন্ত্র দিন। মোটামুটি হিসেবে বলা যায় 'ত্রিদিবা'-র কাহিনীকাল প্রায় আঠারো বছর, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮, যে সময়ের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার শৈশব অতিক্রম করে পূর্ণ যৌবন-সম্ভব হয়ে ওঠে। 'একদা'-য় নির্বাচিত হয়েছে "আটাশে অগ্রহায়ণ, তেরোশো সাঁইত্রিশ সাল", 'অন্যদিন'-এ গৃহীত হয় ১৯৩৭-৩৮ সালের একটি দিন, এবং ১৯৪৮ সালের "একটি বিশেষ দিনকে অবলম্বন করিয়া" উদ্ঘাটিত হয় 'আর একদিন'-এর কাহিনী। তিনটি বছরের তিনটি বিশেষ দিন যেন ঐ বছরগুলি ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মানচিত্রে তিনটি বিশেষ অবস্থান—অমিতেরও সাম্যবাদী ভাবধারায় অভিষিক্ত হওয়ার তেমন তিনটি অধ্যায়।

'ত্রিদিবা'-র বিষয়বস্তু যে আধুনিক—এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব, যেহেতু সামাজিক রাষ্ট্রিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ এখনও পর্যন্ত সর্বাধুনিক ধারণা হিসেবে চিহ্নিত, এবং একজন মানুষের সেই

সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার কাহিনী তাই নিঃসন্দেহে আধুনিক হিসেবে বিবেচ্য। আর এই আধুনিক ও নতুন বিষয়কে প্রকাশের জন্য দরকার হয়ে পড়ে অনুরূপ রীতি ও করণ-কৌশল, তাই 'ত্রিদিবা'-র কাহিনী অবিচ্ছিন্ন কথকতার ও প্রথাসিদ্ধ ধরনে সরলরেখায় ঔপন্যাসিক ভাষ্যে উপস্থাপিত হয় নি, এবং তার অবলম্বিত রীতিকে কোনোক্রমে প্রাচীন বা তার পুনরাবৃত্তি বলা চলে না।

সংবিৎ-প্রবাহ, আন্তর মনোকথন (interior monologue), স্মৃতি, অর্বাচীন সংলাপ বা মনের কোনও স্মরণীয় ভাবনাগুচ্ছে অকস্মাৎ আত্মিক উজ্জ্বলন (জয়েসের ভাষায় যা এপিফ্যানি (Epiphany) রূপে চিহ্নিত) বা উজ্জ্বল আকস্মিকের উন্মেষ প্রভৃতি করণ-কৌশল হুবহু অনুসৃত না হলেও অমিতের কাহিনী চলে এই সব রীতি আত্মস্থ করে। আবার আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের (যার সূত্রপাত প্রুস্তের 'রিমেম্‌ব্রেন্‌স্ অব থিংকস্ পাস্ট', জয়েস-এর 'এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট এজ এ ইয়ং ম্যান' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রকাশ থেকে ধরা হয়) কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 'ত্রিদিবা'-য় অনায়াসে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক এবং এই সব উপন্যাসে কাব্যভাষা ব্যবহৃত হয় অকুণ্ঠে আর যাত্রা যেন এমন উপন্যাসের একটি বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রা কিন্তু তা মানসযাত্রা, যে যাত্রা ঘটে চেতনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ঔপন্যাসিক আন্তর অভিজ্ঞতা কিংবা অভিজ্ঞতার অন্তর্মুখিনতা উপজীব্য করেন উপন্যাসে, কিন্তু এই অন্তর্মুখিনতা ঔপন্যাসিকের মাধ্যমে বিবৃত হয় না, ঔপন্যাসিক চরিত্রের আন্তর অভিজ্ঞতা সরাসরি চরিত্রের সাহায্যেই প্রকাশিত করেন, এবং নিজেকে ও নিজস্ব উপস্থিতি যথাসম্ভব বিলুপ্ত করতে সচেষ্ট হন।

স্বতন্ত্র তিনটি দিন, কিন্তু সাধারণ দিন নয়—বিশেষ তিনটি দিন, যেমন 'একদা'-য় অমিতের দিনের কাজ শুরু হয় সুনীলকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার তাড়ায়, যে সুনীল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং যাকে বিশেষ কারণে কেবল ঠাঁই বদল করতে হয়। অমিতের এই কাজ থেকে স্পষ্ট হয় যে সে নিরাপদ জীবনযাত্রা বেছে নেয় নি—সরকারি চাকরি ভালো মাইনে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মোহ তাকে তৃপ্তি দেয় না, সে গ্রহণ করে রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা, যদিও তখন সে লক্ষ্য সম্পর্কে যথেষ্ট নিশ্চিত নয়। 'একদা'-য় অমিত ক্রমে ক্রমে এক একটি সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রমে প্রয়াসী, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে হয়তো, তবু এই

পর্বে সে যত আবেগে উত্তপ্ত ঠিক তত পরিমাণে কর্মে উদ্দীপ্ত নয়, অর্থাৎ মানসিক ভাবে অনেক এগিয়ে থাকলেও কর্মজীবনে যেই অনুপাতে অগ্রবর্তী হয় নি, এবং তা এক্ষেত্রে খুব অ-স্বাভাবিকও নয়, এটা যেন তার রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যুষ অধ্যায়—আলো স্পষ্ট না ফুটলেও অন্ধকার কাটার আবেগ আছে, কতকটা হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা।

চিন্তা ও কর্মের মধ্যে আমরা একটা বিরোধের আভাস পাই সাধারণভাবে, অমিতও মনে করে "চিন্তা প্রাণের ধর্মই নয়, বরং প্রাণবেগের বিরোধী। প্রাণ চায় স্ফূর্ত হতে অর্থাৎ মূর্ত হতে। প্রাণ মূর্ত হয় একমাত্র কর্মে। যখন কর্মে তা ফুটতে পায় না, তখন কখনও কখনও সে নিজের পুঁজির খোঁজ নেয়, বুঝে দেখতে চায়, কেন ফুটতে পাচ্ছে না। তারই নাম চিন্তা—"(পৃ ১০৮)। কিন্তু চিন্তাকে অবদমিত কর্ম মনে করলে চিন্তা-কর্মের মধ্যে স্থিত প্রাচীরকে অগ্রাহ্য করা চলে, তবু যে কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়, সেই অমিত 'একদা'-য় চিন্তা করেছে অনেকে বেশি, সে অনুপাতে তার কর্মক্ষেত্র নিতান্ত সংকুচিত, সে কেবল একের পর এক একজনের সঙ্গে দেখা করে চলেছে এবং তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে অনেকের, কারুর সঙ্গে হয়তো অপ্রত্যাশিত ভাবে। এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলে তার চিন্তা-ভাবনার স্রোত, কিন্তু ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার চিন্তার হুবহু প্রতিলিপি তুলে ধরেন না উপন্যাসে, যা চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাসে সচরাচর করা হয়ে থাকে। 'একদা'-য় কখনো স্মৃতির সাহায্য নেওয়া হয়, তবু ঐ স্মৃতির অনুষঙ্গে অমিতের আত্মচিত্রণ সর্বদা মুখ্য হয়ে ওঠে না। বাসে শৈলেনকে দেখে শৈলেনের পূর্বজীবন অমিতের স্মৃতিপটে ভাসে অনেকটা চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশ-ব্যাক ধরনে যা অনেক উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ত্রিদিবা'-য় ঐ ফ্ল্যাশ-ব্যাক নতুন মাত্রা পায় অমিতের আন্তর-মনোকথন মধ্যে মধ্যে ঐ রীতির মধ্যে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য, আবার অন্যদিকে সুনীলের কথা ভাবতে ভাবতে "অমিতের চোখে সুনীলদের বাড়ির ছবিটা ফুটিয়া উঠিল..." (পৃ ৩১) কতকটা সিনেমার মন্‌টাজ ধরনে, যেমন—

"পূজার আকাশে সোনার রোদ, ভরা খালের জলের ছল-ছল ধ্বনি, রূপার মতো ঝিকমিক-করা জলধারা...লোকের মুখে উৎসবের হাসি, কুশল-বার্তা...সুনীলের উদ্‌ভ্রান্ত মন যেন আজন্মপরিচিত জীবন-কক্ষে আবার ফিরিয়া আসিল।" (পৃ ৩১)

অথবা "অনিলের স্ত্রী ললিতা...ললিতা...এই শীতের কলিকাতার পথে

আলো যেন চৌদিকে হাসিয়া ঝলসিয়া পড়িতেছে। কি হাস্যমুখর আলো!" (পৃ ৩১)

অথবা "অসিত দেখিল, শীতের নিষ্প্রভ রৌদ্রে যেন একটা আগুনের তীব্র স্ফুরণ ফুটিল..." (পৃ ৩৭)

এই সূত্রে স্মৃতির অনুষঙ্গে মনে পড়ে এক-একজনের কথা—হয়তো ললিতার কথা এবং তার জের টেনে এসে যায় সুনীল-মনীশের আখ্যান, যে আখ্যানে মন্‌টাজ ও প্রাণিতকরণ (animation)-এর রীতি উঁকিঝুঁকি দিয়ে পাঠককে ভুলিয়েই দেয় যে অমিত এই আখ্যানে ক্যামেরা হাতে নিয়ে দর্শকের ভূমিকায় অবস্থিত এবং তার পক্ষে সুনীল-মনীশ উপাখ্যান বিবৃত করা সম্ভব নয়, কারণ সে সর্বজ্ঞ ও সর্বত্রগামী ঔপন্যাসিক নয়; কিন্তু উপাখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে অমিতের মন্তব্যসহ উপস্থিতি ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক সেই ত্রুটি মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন—

"সেই ফটোটা—আবক্ষ ফোটো...অমিতের চোখে এই গির্জার চূড়ার উপরে যেন সেই দীর্ঘ আবক্ষ মূর্তি রৌদ্রভরা আকাশের পটে ফুটিয়া উঠিতেছে।" (পৃ ৩২)

অথবা "শরতের জ্যোৎস্না ঘাটের উপরে, পুকুরের জলে, অশ্রান্ত লুটাইতে লাগিল।

* * *

শীতের সকালে, কলিকাতার ফুটপাতের উপরেও যেন সেই জ্যোৎস্নাময় ধারা।..."(পৃ ৩৪)

অথবা "মাথাটার দাম আছে—যে মাথাটা ওই গির্জার উপরে এখনও রৌদ্রে মণ্ডিত—অমিত দেখিতেছে।" (পৃ ৩৪)

অথবা "শিকার ও শিকারী...The hunted deer—haunted?—অমিত চোখের সম্মুখে দেখিতেছে যেন।..." (পৃ ৩৬)

অথবা "অমিতের চোখে ফুটিল পূর্ব-আকাশের পটে সেই মাতৃমূর্তি, অমিতকেও তিনি এমনই করিয়া খাওয়াইতেন।" (পৃ ৩৯)

অথবা "ললিতা—অমিতের চোখে যেন এখনও সে স্পষ্ট—প্রভাতের একটি উজ্জ্বল কিরণরেখা—স্বচ্ছ, সহাস্য, চপল,—জীবনের ছন্দে যেন উপচিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটি মানুষ হইয়া উঠিয়াছে...।" (পৃ ৩৯)

ইত্যাদি আরও উদাহরণে ফাঁকে ফাঁকে অমিতের উপস্থিতি, কখনো বা প্রাণিতকরণ ও মন্‌টাজ্ রীতির আভাস অমিতের সুনীল-মনীশ আখ্যানে

অনুপস্থিতির ফাঁক ভরাটই কেবল করে না, করণ-কৌশলের ('টেকনিক') মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়, এবং এই মাত্রা বাড়িয়ে ঔপন্যাসিক অমিতের নিজস্ব গণ্ডিবদ্ধ জগৎকে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত করতে কিংবা কাছাকাছি আনতে সক্ষম হন।

অমিত জীবনকে বীরের মতো না হলেও পুরুষের মতো স্বীকার করতে চায়, তাই তার কাছে "পৃথিবীকে বাস্তবদৃষ্টিতে দেখিবার মতো বুদ্ধি ও সাহসই বড় কথা।" এবং এভাবে সে সব কিছু দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু দর্শক হিসেবে সে যতখানি সক্রিয়, কর্মক্ষেত্রে সে অনুপাতে উদ্যোগী না হওয়ায় কিংবা সঠিক কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত হয় না বলে তার চিন্তা-ভাবনায় হ্যামলেটীয় সংশয়ের দোলা লাগে। সংশয় ও সংশয়-উত্তীর্ণ হওয়ার আকুতি মনে মনে—এমন চরিত্র-চিত্রণের জন্য গোপাল হালদার যথার্থ রীতি গ্রহণ করেন, আর সে রীতি যে-কোনো মানদণ্ডে আধুনিক রীতি তা বলা বাহুল্য।

অন্যদিকে আত্মসনাক্তকরণ ও আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি আধুনিকতার অন্তর্গত হয়ে যায় আধুনিকতার নিজস্ব স্বাভাবিকতার নিয়মে, 'ত্রিদিবা'-র বিষয়বস্তু ঐ বিষয়ী (subjective) মানেও আধুনিক মাত্রা পায়; কেননা আজকের আত্মজীবনী কেবল আর জীবনের প্রাজ্ঞতা বা পরিপক্ক অভিজ্ঞতা দেখানোর ক্ষেত্র না হয়ে আত্মপরিচয় আবিষ্কারের সত্তা নির্ধারণের মাধ্যম ও কৌশল হয়ে ওঠে, অমিতের কাহিনী তেমনই এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের কাহিনী, যেমন আফ্রিকার উন্মেষশীল দেশের কিংবা আমেরিকান নিগ্রো লেখকদের আত্মজীবনীমূলক লেখায় ঘটে আজকাল। অমিতের সংকট তার সত্তার সংকট, এই সংকটের মধ্যে নিজের অবস্থান ঠিক কোথায় তার সন্ধানে ঘোরে ফেরে অমিত—তার জীবন যে শৈলেন, সাতকড়ি-র জীবন নয়, তা সে বুঝে ফেলেছে, তবু সঠিক পথ খুঁজে পেতে তাকে বহু পথ পরিক্রমা করতে হয়, যদিও 'ত্রিদিবা'-র শেষে সে পেয়ে যায় পথ, তবু 'একদা' পর্বে তার চিহ্নটি মাত্র খুব স্পষ্ট ধরতে পারে না বলে দ্বিধা সংশয় তাকে আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সম্মুখীন করে, ফলে তার আত্মানুসন্ধানে আমরা প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করি।

অথচ এই উত্তাপ হ্রাস পেতে থাকে 'একদা'-র পর থেকে। হয়তো অমিত তার স্থির লক্ষ্য ততক্ষণে ভেদ করতে না পারলেও যাত্রাপথের যে চিহ্নে এসে পা রাখে সেই চিহ্নিত বর্ত্ম তাকে ঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যাবে তা সে বুঝে ফেলে, তাই তার দ্বিধা সংশয় কাটে অনেকখানি, এবং সে ভারমুক্ত হয়ে সরলভাবে

পথ অতিবাহনে অভ্যস্ত হয়, আর এখান থেকে ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের দুর্বলতা বুঝি বা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

হয়তো অমিত খুব সহজে বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেই জন্য কিংবা রূপান্তরের কাহিনী যা ধীরে ধীরে পাঠক অমিতের মাধ্যমে উন্মোচিত হতে দেখছিলেন, কোনো কোনো সময় সে রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে অমিতের মারফৎ যা বলা হয় তা ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়— এমন কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন নায়ককে ছাড়িয়ে যায় ঔপন্যাসিকের অভীপ্সা—

"অমিত মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছে,...আর, আরও ভালোবাসিয়াছে মানুষকে। ভালোবাসিয়াছে সেই মানুষদের...যাহারা দিনে দিনে ক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু ক্ষুদ্র হয় নাই...।" (পৃ ১৭৮)

অথবা "মানুষ আজ শিখিতেছে নিজেকেই রচনা করিবার বিদ্যা। ইহাই এ যুগের দৃষ্টি, ইহাই এ যুগের সৃষ্টি। আর এই মানুষের পরিচয়-রচনাতেই তোমাদের পরিচয়। এ দায়িত্ব হাতে তুলিয়া লও তোমরা, অমিত।" (পৃ ১৯৪)

এবং আরো উদ্ধৃতিতে দেখানো যায় যে অমিত খুব সহজে একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, এসব তার নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ হলেও তা বকলমে ঔপন্যাসিকের সিদ্ধান্ত, এমন কিছু আমরা বুঝতে পারি, অবশ্য বুঝতে পারলেই যে ক্ষতি আছে তা বলা চলে না, যদি অবশ্য অমিতের অগ্রসৃতি ও ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় সম লয় ও গতি বিশিষ্ট হয়। অমিত নিজেকে "মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, অমিত; তাহাতেই তোমার মুক্তি— ..." স্মরণ করালেও কোথায় সে মানুষের রূপ দেখেছে এবং তার স্বরূপ কি—এ-বিষয়ে আমারা সামান্য তথ্যও সংগ্রহ করতে পারি না উপন্যাসটি নিবিড়-পাঠের পরও।

আবার "মানুষকে...ভালোবাসো বলিয়াই তাহাকে জানিতে চাও," ব্যাপারটি যেন বক্তব্যের স্তরে থেকে যায়, আর উক্তিটি প্রমাণ করার জন্য যেন রঘু কিংবা ঐ জাতীয় আখ্যান উপস্থাপিত হয় এবং এ রকম উপাখ্যান সময় সময় অতি পল্লবিত হয় বলে উপন্যাসের শরীরে তা জারিত হয়ে ওঠে না, যেন এগুলি মন্তব্য প্রমাণের জন্য সংযোজিত হয়। এ রকম আরও আত্মসংলাপে আবেগের চেয়ে ভাবালুতার স্পর্শ অতিরিক্ত হলে 'একদা'-য় যে রীতি ও ধরন ভারসাম্য বজায় রাখে বিষয়বস্তুর সঙ্গে, সেই রীতি ও ধরন বেশ টাল খায় 'অন্যদিন', 'আর একদিন অধ্যায়ে'। 'একদা'-য় অনুসৃত রীতির সম্প্রসারণ অন্য দুটি পর্বে সুফল ফলায় কি না তা আমাদের সংশয়িত করে তোলে নিশ্চিতভাবে।

'একদা'-য় ছিল অমিতের স্ব-গণ্ডি অতিক্রমের চেষ্টা, না-ঘরের না-ঘাটের ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তর দ্বিধা সংশয় ও সংকটের মধ্যে হ্যামলেটীয় দ্বিধার পরিচয় মেলে, তেমন এক মনোভঙ্গি সম্বন্ধে অবশ্য অমিত সচেতন, এবং সে তা অতিক্রম করতে নিরন্তর যুধ্যমান, কিন্তু ঐ উৎক্রমণে তবু হ্যামলেটীয় মনোভাবের অবশেষ থেকে যায়—"...তু একটা জেনারেশনকে আপনারা বলি দিন, **Time is out of Joint**..." (পৃ ২১), ফলে ঐ পর্বে সংবিৎ-প্রবাহ, স্মৃতি, আন্তর-মনোকথন প্রভৃতির আংশিক বা মিশ্র প্রয়োগ ঔপন্যাসিকের দক্ষতারই পরিচায়ক, কারণ এই করণ-কৌশল আন্তর-বিদারণ চিত্র চেতন-অবচেতন উদ্ভাসনে দারুণ সহায়ক হয়। কিন্তু অমিত যে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায় বা পৌঁছয়, তাতে উপনীত হতে গেলে নিছক বাস্তবের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠার কথা, কেবল মানসপটে ঐ অভিঘাতের চিত্রলিপি এঁকে গেলে সেই চিত্রের অনেকটাই অনুক্ত থেকে যায়, আর ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য তখন ঔপন্যাসিককে অন্য কৌশলের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু উপরিউক্ত রীতিগুলির সবদিকের যথোচিত সদ্ব্যবহার না করলে অন্যরীতি অনুসরণ সব সময় ঔপন্যাসিককে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। আবার বিষয়কে উপযুক্তভাবে ধরে রাখার শক্তি থাকা চাই নির্বাচিত রীতির, নাহলে বলার কথার চাপে আধার বিদীর্ণ হতে পারে, নয়তো কথার ন্যূনতায় আধার যথোপ-যুক্ত ব্যবহৃত হয় না, তাই যে তীব্র তীক্ষ্ণতায় অমোঘভাবে বলা লেখকের উদ্দেশ্য তা সেই অনুপাতে উদ্দেশ্যের মর্ম বিদ্ধ করতে পারে না। 'অন্যদিন', 'আর একদিন'-এর কাহিনী মনে হয় 'একদা'-র মতো উপযুক্ত রীতিকে আত্মস্থ করে নি, এজন্য ঐ কাহিনী যত তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত ছিল তা হয়ে ওঠে না। অমিত তার স্ব-গণ্ডির সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে ক্রমে সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়তে চায়, কারণ সাধারণ্যে সে খুঁজে পায় "নানা মানুষের বড় 'আমি'র তপস্যা" এবং এই পথ হচ্ছে "শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মজীবীর পথ; কবিতার পথ, বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ, জীবনের পথ..." (পৃ ৫২৭) আর তাই "সারা দিনের মানুষের মুখচ্ছবি অমিতের মনের পটে চমকিয়া উঠিতেছে।"

ছোট-আমি থেকে বড়-আমির তপস্যায় নানা ধরনের মানুষের মুখচ্ছবি ভেসে উঠলেই কি সিদ্ধিলাভ করা যায়? ছোট-আমি থেকে বড়-আমি-র অভিজ্ঞানে উপনীত হতে গেলে কেবলমাত্র দর্শক-চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে চলে না, যা অমিতের ক্ষেত্রে ঘটে। অমিত দেখেছে আন্তরিক ভাবে

তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তার আবেগের সততারও কোনো খাদ নেই, কিন্তু যে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপার এক্ষেত্রে আবশ্যিক ছিল, তেমন আবেগের অভাব লক্ষ করা যায় অমিতের মধ্যে, তার ফলে সে পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট ভাবালুতার শিকার হয়ে পড়ে। আসলে এই দুই পর্বে ঔপন্যাসিক বিষয়ী ও বস্তুমুখী দৃষ্টিকে যথোচিত সমন্বিত করার দিকে সর্বদা নজর রাখেন নি, 'একদা'-য় গৃহীত রীতির কিছু পরিবর্তন ঘটলেও ঐ দুই পর্বে উপন্যাসের বিষয়বস্তু যে প্রায় গুণগত ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তা খেয়াল রাখেন নি। হয়তো। উৎসে নদীর প্রকৃতি একরকম, সেই নদী যখন সমতলে গভীর দাগ কেটে সমুদ্রগামী হয় তখন সে নদী-ই থাকে, তবু ঝর্ণার সঙ্গে তার তফাৎ প্রায় তেমন আমূল হয়ে যায়—'একদা'-র পর শেষ দুটি অধ্যায় 'অন্যদিন', 'আর একদিন'-এ যেমন হয়ে থাকে, সেজন্য অমিতের অন্তঃচারী মনে সাধারণ্যের বিপুল আলোড়ন জাগানোর কাহিনীতে বলার ধরনও পরিবর্তিত হওয়া উচিত ছিল বলে আমাদের মনে হয়।

অন্যদিকে 'একদা'-র অন্তঃস্থলে নিহিত দুর্বলতা এই দুই পর্বে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ভাষা-ব্যবহারে গোপাল হালদারের অহেতুক প্রাচীনতা-প্রীতি আমাদের কিছুটা বিমূঢ় করে। যে নায়কের আবেগ স্ব-গণ্ডি অতিক্রমে অভিলাষী এবং যে সাধারণ্যে পায় মুক্তির আস্বাদ, সে নায়কের চিন্তা ভাবনা চায় স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ ভাষা, সাধুভাষার আড়ষ্টতা ঐ সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে যথোচিত প্রতিফলিত করতে পারে না। আবার 'একদা'-র বিষয়বস্তুও আধুনিকই কেবল নয় আমাদের সাহিত্যে অভিনবও বটে, তাই ভাষা প্রয়োগে আরও দুঃসাহসিক হওয়াই ছিল ন্যায়সম্মত, কারণ আধুনিক বিষয় প্রকাশের জন্য আধুনিক ভাষারই প্রয়োজন।

কিন্তু এসব ত্রুটির উল্লেখ হয়তো সমালোচকের ব্যাসকূট মাত্র। একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালি কি ভাবে তার স্বরচিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে "নানা মানুষের বড় 'আমি'-র তপস্যা"-য় "এক-একটি মানুষের মধ্যে প্রতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও এখন সেই বিচিত্র বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর"-এর সন্ধান পায় 'ত্রিদিবা' সেই ক্রমপরিণতির ইতিহাস, অমিতের কাহিনী একজন বাঙালি তরুণের সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার মানস-দলিল হয়ে ওঠে। সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার কাহিনী বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম সচেতনভাবে উপজীব্য করা হয়, সে হিসেবে 'ত্রিদিবা' নতুন রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও

'ত্রিদিবা'-র তাৎপর্য এখানে নিহিত, অন্তত *'একদা' বাংলা* উপন্যাসের গতানুগতিকতার ক্রম ভঙ্গ করেছে—একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না আর।

উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি 'ত্রিদিবা', সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৮ থেকে গৃহীত হয়েছে।

স্বগত-নিবন্ধ ঃ গোপাল হালদার

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

'আড্ডা'র কৈফিয়তে গোপাল হালদার লিখেছেন, "এ-কালের সম্পাদক ও সমালোচকরা একেও 'রম্যরচনা' বলবেন কিনা জানি না। আমি কিন্তু মনে করি, যে-সাহিত্যে কমলাকান্ত ও পঞ্চভূত সর্ব-পরিচিত সে সাহিত্যে 'বেল্-লেতরস্' কথাটার এরূপ অপপ্রয়োগ অমার্জিত ও অমার্জনীয়। আমি হয়তো এই বিশেষ ধরনের লেখাকে 'লঘুরচনা' বলব। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 'পার্সোনাল এসে'র বাংলা নাম দিতে চেয়েছিলেন 'অ-বন্ধ'। কথাটায় কবন্ধের একটা ছায়া দেখে আমি শঙ্কিত হই। নিবন্ধ বললে হয়তো আমরা আশ্বস্ত বোধ করতাম, কিন্তু অর্থটা মামুলিয়ানায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। 'পার্সোনাল এসে' জাতীয় লেখাকে 'স্বগত নিবন্ধ' বা অনিবন্ধ রচনা বলা চলে না? আর 'রম্য রচনা' কথাটি শুধু 'বেল্ লেতরস্' বোঝাবার জন্য নির্দিষ্ট রেখে। এ জাতীয় লেখার সাধারণ নাম 'রসনিবন্ধ'—'রসরচনা' নয়—রাখলে ক্ষতি কি?" গোপাল হালদারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই অংশটুকুতে প্রতিফলিত। প্রচলিত গড্ডলিকার স্রোতে ভাসেন না, মামুলিয়ানার অভ্যাসগত আলস্যেও মজেন না—আবার নতুন পদসন্ধানে, শব্দ-সন্ধানে এক ধাক্কাতেই চূড়ান্ত কথা বলছেন, এমন গোঁড়ামিও নেই। নানা অনুমানে যুক্তির পথ খোলা রাখেন। যে মজ্জাগত রসবোধ বা হিউমরে তিনি ভাস্বর, তাও ধরা পড়ে অ-বন্ধ ও কবন্ধের উল্লেখে। সব থেকে বড় কথা আত্ম-সচেতনতা। আর সঠিক আত্মসচেতনতা যে সমাজ-পরিবেশ-ইতিহাস-প্রকৃতিচেতনার সঙ্গেই যুক্ত সেই ১৯৩০-এর দশকেই গোপাল হালদার বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই ধীরে ধীরে মার্কসীয় বীক্ষার আকাশে ধরেছিলেন উপন্যাসের কাঠামো, ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, সংস্কৃতির রূপান্তর বোঝাবার চেষ্টা, রাজনৈতিক চেতনার, প্র্যাক্‌সিস-এর বিরল ঔজ্জ্বল্য—আর এর সব কিছুরই রসায়ন তাঁর স্বগতনিবন্ধ। উপন্যাসে প্রবন্ধে রাজনীতিতে (বলাই বাহুল্য, এখনকার রাজনীতি-অর্থে যে বিকারকে বোঝা হয়, তাতে নয়) একটি নির্দিষ্ট পারম্পর্য, কাঠামো রাখতেই হয়, একটি বিশেষ রূপবন্ধনের আদরা মনে রেখে চলতে হয়। কিন্তু স্বগতনিবন্ধে এদের

মিশ্রণ, অল্পক্ষণের জন্য বিষয়ান্তরে চলে যাওয়া, মুখের আলাপের স্রোতে বহমান থাকার স্বাধীনতা থাকে। ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গোপাল হালদার যে স্বগতনিবন্ধগুলি লেখেন তাতে ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক—তাঁর সব সত্তাগুলি মিলে যায় ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণে। আর এক্ষেত্রে কমলাকান্ত ও পঞ্চভূতের উত্তরাধিকার তিনি স্বীকার করেন। একদা ধূর্জটিপ্রসাদ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা বুদ্ধদেব বসু এই স্বগতনিবন্ধ লিখেছিলেন। পরে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে'-র থেকেই রম্যরচনা লেখা শুরু হয়, যার সঠিক উদাহরণ 'যাযাবর', পরবর্তীকালের খবরে-কাগুজে 'নিবন্ধ' জাতীয় বস্তুগুলি। সৈয়দ মুজতবা আলীও মুখোপাধ্যায়দ্বয় ও বসুর মতো পরিশীলিত মন ও রুচির মানুষ ছিলেন, 'দেশে বিদেশে' বইটির আপাত তারল্যের অন্তরালে যে 'ডীপ-স্ট্রাকচার'—ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক আধুনিক মন—তা বইটির চিত্রকল্প-উপমা বিশ্লেষণ করলে, রেটরিক-এর দিকে নজর দিলেই ধরা পড়ে—কিন্তু পরবর্তীকালে মাঝে মাঝেই তিনি তরল উচ্ছ্বাসে ভেসেছেন, উপন্যাস লেখার রম্যরচনীয় চেষ্টা করেছেন। গোপাল হালদারের স্বগতনিবন্ধ এর থেকে অনেক দূরে। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, একটি ঐতিহ্য ও নবযুগের দ্বন্দ্বজনিত বীক্ষা তাঁর এই নিবন্ধগুলিকে তাৎপর্যান্বিত করেছে—বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাসবোধের আকাশ থেকে লিখেছেন বলেই, হাল্কা সুরের মাঝেমধ্যেই স্পর্শ ঘটেছে যন্ত্রণার, আমাদের অস্তিত্বের পঙ্গুতার জন্য।

'বনচাঁড়ালের কড়চা'র 'প্রগতির গতি' নামক নিবন্ধে গোপাল হালদার জনৈক যুবক সম্পর্কে লেখেন: "দেখলাম উনি জীবনযাত্রায় আমাদের মতো হিন্দু অর্থাৎ মুর্গীতে রুচিবান—মনে মনে উনি আমাদের মতোই হিন্দু অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কেও উদাসীন, এক কথায় শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক।" গোপাল হালদারের যে ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বগত নিবন্ধাবলীতে ধরা পড়ে, তাও কিন্তু এই ভদ্রলোকের; তবে তা 'হিন্দু' ভদ্রলোকের ঠিক নয়, বাঙালি ভদ্রলোকের। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগরীয় মানবিক ঐতিহ্যের, মানবিকতার যে যুক্তিবাদী, কর্মনির্ভর ধারা, গোপাল হালদার তাকেই আত্তীকৃত করেন। সৎ কমিউনিস্টের সঙ্গে সৎ ভদ্রলোকের যে বিরোধ আছে, একথা গোপাল হালদার মানবেন না। দেশজ বাঙালিয়ানার মূলেই সাম্যবাদী বীক্ষা এখানে জল সিঞ্চন করে—তাঁর জিজ্ঞাসাও আবর্তিত হয় বাংলা ও বাঙালিকেই কেন্দ্র করে। বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি রসিকতা, বাঙালি আড্ডা, বাঙালি খাদ্য—

এসব উপলক্ষ করেই এই সাম্যবাদী বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর বিশ্ববিহার করেন। বাঙালি রসিকতার স্বরূপ নিয়েই কথা বলতে বলতে গোপাল হালদার ওডহাউস সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করে ফেলেন—বাংলায় এত ভালো এ বিষয়ে আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক উপস্থিতির ফলে গোপাল হালদারের স্বগত-নিবন্ধ হয়ে ওঠে যে আধুনিক মনের কাছে উপাদেয় ভোজ্যের মতো, যার পিছনে থাকে শিল্পের কারিগরি যা উপভোগ্য, রসনা ও রসের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। 'বনচাঁড়ালের কড়চা'র নিবন্ধগুলি লেখা ইংরেজের বন্দিশালায়—এই ব্যক্তিগত নিবন্ধগুলিতে যা আছে, তা লেখকের ভাষায়, "প্রায় নৈর্ব্যক্তিক, মনের কাছে মনের প্রশ্ন। বিষয় ছড়িয়ে তার আরও অর্থ হয়তো আছে—বন্দীশালার মাটিজলের আলো-আঁধারের আভাস, বনচাঁড়ালের চিৎ-স্পন্দনের অলক্ষিত একটি ইতিবৃত্ত।". আমার বলার কথা এটাই, ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিক করা আবার নৈর্ব্যক্তিককে ব্যক্তিগত করা এই যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, বীক্ষা, তাতেই গোপাল হালদারের স্বগত নিবন্ধাবলী তাৎপর্যময়। নিবন্ধগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায় নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধের কাঠামো এদের মধ্যে নেই—মাঝে মাঝেই সুষেণ, সিতাংশু, সুনীলেরা চরিত্র হিসাবে এসে হাজির হয়। বাস্তব 'সত্য' ব্যক্তি রঙ্গীন হালদার বা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর রচনায়। আবার এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই সর্বজনীন হয়ে ওঠে নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্নকে অবলম্বন করে। 'আর্ট ও অসঙ্গ' শীর্ষক রচনাটির শুরু নিতান্তই ব্যক্তিগত আলাপনের ঢং-এ—"সেদিন নিতু জানিয়েছিল, দাদা সায়েন্স কংগ্রেসের সভায় 'আর্ট ও আনকনশাস' নামীয় এক প্রবন্ধ পড়েছেন, কলকাতার সব কাগজে তা বেরিয়েছে, আমি যেন পড়ে দেখি।" এ বক্তৃতা স্টেটসম্যান ছাপে নি—এ সূত্রে ব্যক্তিগত নিবন্ধের স্বগতভাষণের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নেন। কিন্তু ক্রমশ বোঝা যায় স্বগতভাষণটি মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু ভঙ্গিটি সম্পূর্ণ স্বগত নিবন্ধের—যিনি ভাষার যাথার্থ্য সম্পর্কে এত সজাগ, কালচার শব্দের যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ অন্বেষণে এত সতর্ক, তিনি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের মুখের কথার মতোই ব্যবহার করেন অনর্গল ইংরেজি শব্দ—অথচ এই স্বগত নিবন্ধেই জানা যায় ১৯৩০-এর দশকে ফ্রয়েড কিভাবে গৃহীত হচ্ছেন বাঙালির মানসরাজ্যে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কারাগারের অন্তরালে একটি সজীব মনের জিজ্ঞাসায় বিশ্বের তাবৎ বিষয় স্পর্ষ্ট হয়—শুধু পণ্ডিতি প্রবন্ধ হলে আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর

পরে এদের হয়তো বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকত না। কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, প্রাণময় জিজ্ঞাসা এমন শুদ্ধ স্বগতভাষণের ঔজ্জ্বল্যে এখানে ধরা দিয়েছে যে, এরা আজও পঠনীয়, আজও আনন্দ দেয়, বাইরে থেকে বন্দী কিন্তু অন্তরে মুক্ত মানুষের ব্যক্তিগত উষ্ণতায়।

যথার্থ স্বগত নিবন্ধকারের মতোই অনাবিষ্কৃত বৈশিষ্ট্য, অঞ্চল আমাদের সামনে তুলে ধরেন গোপাল হালদার। আড্ডাতেই তিনি খুঁজে পান বাঙালির অন্যতম অভিজ্ঞান-বৈশিষ্ট্য। আড্ডার ইতিহাসেই ধরে দিতে চান বাঙালির ইতিহাস। বাঙালি যে নিয়মবাঁধা প্রতিষ্ঠানে বদ্ধ হতে চায় না, তার কারণেই প্রত্যক্ষ মানুষী হয়ে উঠতে পারে না এই প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিক হিমশালতায় বাঙালি স্বাচ্ছন্দ্য পায় না। তাই সে খোঁজে তেমন জায়গা যেখানে কাজের সঙ্গে অন্তত থাকবে আড্ডার উত্তাপ, সীমাটা সেখানে রচিত হয় কোনো পলিসির প্রাতিষ্ঠানিকতায় নয়, পার্সোনালিটির, ব্যক্তিত্বের নিয়মে, প্রত্যক্ষ স্পর্শে। ব্যক্তিকে ঘিরে বলেই দলাদলি, দলভাঙার এত প্রাবল্য—গোপাল হালদার-এর এই সিদ্ধান্ত আমাদের জাতীয় জীবনে কত সত্য, এখন আরও বোঝা যায়। তবে গোপাল হালদার যখন লিখেছেন, তখন মাননীয় ব্যক্তিত্ব ছিল, এখন সবই নীতিহীন পঙ্গু ব্যক্তি। আড্ডার ক্ষেত্রেও গোপাল হালদার তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন, ইংলণ্ডের আড্ডার ইতিহাসের সূত্রেই দেখান এলিজাবেথীয় বৈপ্লবিক উদ্দামতার যুগ শেষ হয়ে আসে বুর্জোয়া যুগের স্থিরতা, মাত্রা ও তালজ্ঞানের যুগ। ভিক্টোরীয় যুগের আড্ডার অবসান ঘটে। ক্লাবের জন্ম হল পাকাপাকি ভাবে। যখন বিজনেস হয় দেবতা, যখন মন্ত্র হয় টাইম ইজ মানি, তখন আর আড্ডা থাকে না। মজলিসের আলস্য ও গাছতলার নৈরাজ্য, এর মাঝখানে আড্ডার জন্ম, মধ্যবিত্তর জন্মের সঙ্গেই। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব এখানে হয় নি, শত মার খেয়েও বিপর্যস্ত হয়েও বাঙালি এখনও আড্ডাকে ধরে রেখেছে, তার সাহিত্যের মতোই। এ আড্ডা ইংরেজের কলেজের আর কেরানিশালার দান। চমৎকার লেখেন গোপাল হালদার—সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই, স্বপ্ন আছে কিন্তু সাধনা নেই—বাঙালি মধ্যবিত্তের এই বিধিলিপি। এর জীবন্ত পরিচয় বাঙালির আড্ডা—তার স্বপ্নপ্রয়াণ, তার বাস্তববিমুখতা। জমিদারতন্ত্রের আওতায় গড়া বাঙালি মধ্যবিত্তের আওতায় ঢিলেঢালা জীবনই পারে এ আড্ডা দিতে। তবে যে পঙ্গু আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এখানে টিঁকে থাকে বা টিকিয়ে রাখা হয় তাতে আড্ডা থেকে ক্লাব আসে না, আসে আসর। এই আসরই

কখনও কখনও পিপলস রিপাবলিকের বৃহত্তর সীমানায় চলে যায়, যখন দেখি ফুটপাথে ফুটপাথে জেগে হাজার হাজার গানের আসরিয়া।

বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কেমন করে গোপাল হালদারের স্বগত-নিবন্ধের ব্যক্তিগত স্টাইল, উত্তাপ গভীর অর্থবাহী নৈর্ব্যক্তিক তাৎপর্য পেয়ে যায় এই ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারে। বাংলায় যাঁরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রায়ই এটা হয় নি, এদিক থেকে গোপাল হালদারকে অনন্যই বলতে হয়।

আড্ডার মতোই ভোজনকেও গোপাল হালদার মনে করেন, বাঙালির অন্যতম অভিজ্ঞান-বৈশিষ্ট্য। সদ্যপ্রয়াত বিরল সংস্কৃতিসম্পন্ন ও রন্ধনশিল্পী রঙ্গীন হালদার যে অনুজের মানস-সংগঠনে অনেকটা ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার প্রমাণ এই স্বগত নিবন্ধাবলীতে স্পষ্ট—মনোবিজ্ঞান ও ফ্রয়েড সম্পর্কে যখন মার্কসবাদী মহলে যান্ত্রিক অবজ্ঞা ছিল, তখন যুক্তিবাহী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় গোপাল হালদার দেন, তাতে রঙ্গীন হালদারের পটভূমিকা নিশ্চয়ই আছে, যিনি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের মনোবিদ্যাগত বিশ্লেষণে যাথার্থ্যে আস্থাবান করেছিলেন। তেমনি খাওয়া ও খাওয়ানো যে শিল্পকলা, এই চেতনাও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের রসায়নে পান অগ্রজের কাছ থেকে। গোপাল হালদার সকৌতুকে বিশ্বাস করেন এই দিব্যবাণীতে, "মানুষের ইতিহাসে নতুন নক্ষত্রের আবিষ্কারের থেকে বেশি কল্যাণকর নতুন খানার আবিষ্কার।" তাঁর ফরাসী ব্যাকরণ বইয়ের উদাহরণ মনে পড়ে: ইংরেজরা একটা মাংসখণ্ডকে বেশ কিছুক্ষণ আগুনে দগ্ধ করে তার নাম দেয় রোস্ট এবং আশ্চর্য হয়ো না, তারা তা খায়। তিনি রন্ধনকে যে শিল্প ভাবেন তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন তিনি বলেন, "খাঁটি ইতালীয়ান বস্তুর রসাস্বাদন থেকে অবশ্য আমি বঞ্চিত। দান্তে বা পেত্রার্কের কবিতা পাই ইংরেজি অনুবাদ থেকে। ইতালীয়ান কনফেকশানরিও আমি খাই সাহেব রেস্টুরেন্ট থেকে। শোনা যায় অনুবাদেও মূলের আভাস থাকে। কেক-পেস্ট্রির অনুকৃতিতেও নাকি ইতালীয় রসের জারক, মৌলিক রসবিদ্‌রা এরূপ সান্ত্বনা আমাকে দিয়ে থাকেন।" জানি না, 'আফটার বেবেল'-এর লেখক জর্জ স্টেইনার এই খাদ্য ও অনুবাদের রসসিক্ত তুলনায় কি ভাববেন, কিন্তু আমরা, অভাজনরা এ সমীকরণে যে পুলকিত হই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরও আনন্দ পাই যখন দেখি বিশ্বসভাতায় বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান সন্দেশ-রসগোল্লা সম্পর্কে লেখক লেখেন, "বাঙালি রসগোল্লা-সন্দেশ

শুধু ক্র্যাফট নয়, আর্ট নয়—সৃষ্টি, অভিনব সৃষ্টি।” বকসার বন্দীশালায় বীরনির্বাচনে যে উপমা তিনি ব্যবহার করেন তাতে বন্দীদের মানসিকতা রসনার সেরা রসেও ধরা পড়ে: “আধ পো ছানার রাজভোগ, সেই অতিবাস্তব রাজভোগ ছুঁড়ে মারলে হাতবোমার মতো শব্দ করবে না অথচ কর্তৃপক্ষ ঘায়েল হবেন, এই ছিল দক্ষিণাবাবুর উদ্দেশ্য। নিরেট নির্ভেজাল ছানার আধ পো ওজনের এক একটি হাতবোমা—এরই নাম বক্সার রাজভোগ।”

যে কথাটা আগে বলেছি, ইতিহাস-সমাজের বোধ বিচ্ছিন্ন করে গোপাল হালদার মানুষ, তার অভ্যাস-আচার-অনুষ্ঠানকে দেখেন না। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, নিবন্ধর স্বগতোক্তিকেও নৈর্ব্যক্তিক করে তোলেন—করে তোলেন বিষয়কে, বিষয়ীর আবেগ কৌতুককে। তাই বাঙালি নিমন্ত্রণের খাদ্য-তালিকাতেই পান তিনযুগের ইতিহাস। প্রস্তাবনায় সেই আদি ও অকৃত্রিম বাঙালি শাক, ঘণ্ট, চচ্চড়ি। তারপর ঝাল ঝোল পেরিয়ে সমাপ্তি দই, রাবড়ি, মিষ্টান্ন। কিন্তু তারই মধ্যে আসবে মোগলাই-বাঙালি পোলাউ, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব আর আসবে তার অ্যাংলোবেঙ্গলি পর্বের চপ-কাটলেট থেকে আধুনিকতম আইসক্রিম পর্যন্ত। বাঙালীর নিমন্ত্রণ নয়তো, বাঙালির ইতিহাস। এখানে সে তার আদিযুগ মুঘলযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেই বাঙালিসত্তার স্বাক্ষর আছে। ঘরের পাশের লতাপাতা, ফলমূল, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরুর দুধ। প্রকৃতির প্রকাশকে করেছে আপনার প্রয়াস মিলিয়ে অপূর্ব—আর্ট, এটাই সৃষ্টি। বাঙালির বিশেষ রোমাণ্টিক অবদান, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের প্রকাশ। বাঙালির মৌলিকতা, ফল থেকে মিষ্টান্ন, এখনও বাঙালির বাড়িতে। তারপর তার মধ্যযুগ: পোলাউ, কালিয়া। তার সঙ্গে অ্যাংলো-বেঙ্গলি সত্তার চপ থেকে আইসক্রিম। আর সব জুড়ে বিলাস তার কলোনিয়াল জীবনযাত্রার—সে কিছুই ছাড়ে না। আদি-গেঁয়ো, আধা-মুসলমান ও আধা-ঔপনিবেশিকতার সংমিশ্রণে এখনকার যে বাঙালি ইতিহাস, তাই ধরা পড়ে বাঙালি মধ্যবিত্তর নিমন্ত্রণের খাদ্য পরিবেশনে। আর এই জগাখিচুড়ির ফলাফল অসুস্থতা—বাঙালির পাকশক্তি থেকে পাকপ্রণালী বিচ্ছিন্ন। আজ বাঙালি বিচ্ছিন্ন জীবনমূল থেকে, খণ্ডিত তার দেহ ও রসবোধের রসনানির্ভর সমন্বয়। রস বিপর্যস্ত, মৌলিকতা নেই। তবে সাহিত্য ও আড্ডার মতোও রন্ধন-কলাও টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ভরসা একমাত্র পারিবারিক শিল্পীরা, যাদের হাতে নিরামিষ মোচার

ঘন্টও অমৃতের স্বাদ আনে, সামান্য উপাদানও অনির্বচনীয় হয়ে উঠে কবিকেই সমর্থন জানায়, সেরা রসের আধার রসনাতেই।

গোপাল হালদারের 'বাজে লেখা' এই স্বগত নিবন্ধাবলি নতুন করে পড়ে শিল্পের স্বাদই পাওয়া যায়—বিশ্লেষণ ও উপভোগ্যতায় এরা অধুনা-রম্যরচনার থেকে অনেক দূরে—রচনার রম্যতায়, স্মৃতির পরিচর্যায়, বর্তমানের বোধে এ নিবন্ধাবলি বারবার পড়ার। আড্ডাপ্রিয়, ভোজনরসিক বাঙালির এ চিত্র আঁকার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বাঙলা উপভাষা চর্চার ত্রিধারা

অনিমেষকান্তি পাল

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহোদয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আজীবন রত রয়েছেন নানা ভাবে। তিনি ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বাঙলার কয়েকটি উপভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণাপত্র রচনা করেছিলেন। এ তথ্যও অনেকেই জানেন। তাঁর এই গবেষণাপত্রগুলির গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝতে হলে বাঙলা উপভাষা চর্চা সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে প্রধানত সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। তাঁর গবেষণার মূল্যায়ন বা বিস্তৃত পরিচয়দানের চেষ্টা এখানে হয়ত প্রাসঙ্গিক হত কিন্তু তা ভাষাবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। এই জন্যই এখানে সে চেষ্টা করা হল না।

১. ত্রিধারা

বাঙলা উপভাষাগুলির চর্চা সম্বন্ধে কিছু একটা করা উচিত - এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি করা উচিত? এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা পরে সাধ্যমত করা যাবে। এখন দেখা যাক এ পর্যন্ত কি করা হয়েছে। বাঙলা ভাষার উপভাষাগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এবং আগ্রহ প্রায় এই শতাব্দীর সমান বয়সী। বাঙলাভাষা এবং উপভাষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রথম একটা সার্বিক এবং সংহত প্রকাশ দেখা গেল গ্রিয়ারসনের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে[১] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বিভিন্ন বাঙলা উপভাষার বিশিষ্ট শব্দের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল একসময়। গোপাল হালদার মহোদয়ই বোধ হয় প্রথম গবেষক যিনি একটি মাত্র উপভাষা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন[২]। দেখা যাচ্ছে স্পষ্টত তিনটি ধারায় বাঙলা উপভাষা চর্চা করার চেষ্টা হয়েছে। গ্রিয়ারসনের পদ্ধতিকে সার্বিক সমীক্ষার ম্যাক্রো পদ্ধতি আর গোপাল হালদার মহোদয়ের পদ্ধতিটিকে সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মাইক্রো পদ্ধতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে বলবার সুবিধের জন্যে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত

শব্দাবলিকে ঐ একই কারণে বলা যেতে পারে আভিধানিক কাজ। বাঙলা উপভাষাগুলির চর্চা কোন কালেই সুসংবদ্ধভাবে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিচালিত হয় নি। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইচ্ছা, সুযোগ, আনুকূল্যের দ্বারাই এই চর্চা এ পর্যন্ত চালিত হয়ে এসেছে। জার্মানিতে বা ফ্রান্সে[৩] যে ভাবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের উপভাষাগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে, ভারতবর্ষে গ্রিয়ারসনের প্রচেষ্টা ছাড়া সেরকম আর কোন প্রচেষ্টা হয়নি।

২. বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসার

উপভাষা কাকে বলে, উপভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা কি, এ নিয়ে আজ আর আলোচনার দরকার নেই। বাঙলা উপভাষাগুলি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও ভালবাসা দেখিয়েছেন দেশের অনেক প্রখ্যাত মনীষী। কিন্তু গোড়ার দিকে ভাষা ও সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভাষাবিচারে শুদ্ধাশুদ্ধের মানদণ্ড নির্ণয়ে মনোযোগ দিয়েছেন অনেক বেশি[৪]। উপভাষা-গুলির ভূমিকা সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ এখনো পুরোপুরিভাবে গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আধিপত্য ছিল সম্ভবত তারই প্রভাবে উচ্চকোটির শিষ্ট সাহিত্য এবং নিম্নকোটির লৌকিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটা প্রবল ভেদজ্ঞান ছিল ; ছিল গ্রাম্য ও শহুরে ভেদজ্ঞান। ভদ্রলোকের ভাষা ও ইতরজনের ভাষা সম্বন্ধেও এই ভেদজ্ঞান নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে স্পষ্টতই একটা উন্নাসিকতার ভাব ছিল। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যেও ইতরজনের ভাষার প্রতি তির্যক মনোভাব গোপন থাকেনি। ভাষার ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি যে ধরনের বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গিপ্রসূত, এখন অবশ্য বাঙলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী, তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই সেই ধরনের মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং একক ব্যক্তি হিসাবে দীনেশ-চন্দ্র সেন মহোদয় গ্রাম্য সাহিত্য এবং গ্রাম্য ভাষার প্রতি শিক্ষিত মহলের শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও এদিকে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনাকালে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার তাগিদেই বাঙলা উপভাষাগুলির একটা সামগ্রিক পরিচয় খাড়া

করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে তখনো পর্যাপ্ত তথ্য আসেনি। গ্রিয়ারসনের সমীক্ষা এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ঔপভাষিক শব্দাবলি এবং তৎসহ যৎসামান্য উপভাষা পরিচয়,—এইমাত্র সম্বল করে তাঁকে একাজে ব্রতী হতে হয়েছিল[৫]। এছাড়া মধ্যযুগীয় পুঁথিগুলির কোনো কোনো সাক্ষ্যও তিনি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। ODBL, পৃ ১৩৭। দেশ ভাগ হওয়ার পরে, রক্তের মূল্যে পাওয়া, ঢাকার বাঙলা অ্যাকাডেমি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে আঞ্চলিক ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রকাশ করেছেন।

৩. উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বাঙলা উপভাষাগুলিকে একটা বিশেষ ছকের মধ্যে এনে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং উপভাষাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার বিকাশের ধারাটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন[৬]। বাঙলা উপভাষাগুলির বিজ্ঞানসম্মত চর্চার পথনির্দেশ পাওয়া গেল প্রথম এইখানে। বাঙলা উপভাষাগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি আজীবন সচেতন ছিলেন এবং আজীবন তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন বাঙলা উপভাষার চর্চায়। কিন্তু উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ লিখবার পর মাত্র কয়েকবার তিনি একাজে নিজে অগ্রসর হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মহাপ্রাণতা লুপ্তির প্রশ্ন[৭] এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাগুলিতে অবরুদ্ধধ্বনির উদ্ভবের প্রশ্ন[৮] নিয়ে তাঁর আলোচনাগুলি। এই ব্যাপারে অনেকে তাঁর মতের বিরুদ্ধতা করেছিলেন[৯] বলেই তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল[১০]। উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থের নব সংযোজিত তৃতীয় খণ্ডে দেখছি শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাগুলিতে এবং অন্য সমপর্যায়ের ক্ষেত্রগুলিতে লুপ্ত মহাপ্রাণতার ক্ষতি পূরণের জন্য উঠতি বা আরোহী স্বরের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন[১১]। বাঙলা ও ওড়িয়া ভাষার সম্পর্কটি উপভাষার স্তরে কী রূপ নিতে পারে এ বিষয়ে উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থেই কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি নিজে এদিকে আর অগ্রসর হন নি। জীবনের সন্ধ্যাকালে এইদিকে আরেকবার তাঁর আগ্রহের কথা জানা যায়। মেদিনীপুরে প্রচলিত দক্ষিণ পশ্চিমবাঙলার একটি উপভাষার তিনি নাম দিয়েছেন সুহ্মক বাঙ্গালা[১২]।

৪. বাঙলা উপভাষা সমূহের উদ্ভবের সূত্র ও শ্রেণী বিভাগ

বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে এবং পরে চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অন্যান্য রচনায় উপভাষা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা আছে তাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ফেলা যায়—১. ইতিহাস, ২ শ্রেণীবিভাগ এবং সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। ১. ইতিহাস সম্বন্ধে পাওয়া যাচ্ছে এই কটি তথ্য—ক. বাঙলা উপভাষাগুলি কোনো একটি মাত্র প্রাচীন ভাষা রূপ থেকে উদ্ভব হয়নি। ODBL, পৃ ১৩৯। খ. বাঙলা উপভাষাগুলির সঙ্গে কিছুটা মিল আছে মৈথিলীর তথা অঙ্গ অঞ্চলের ভাষার। রাঢ় দেশে আর্যভাষার দুটি রূপ প্রচলিত ছিল প্রথম পর্বে। এদের একটিতে ছিল 'অা' এবং 'আছ' ধাতুর ব্যবহার, অন্যটিতে এরকম ছিল না। প্রথম রূপটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল ওড়িয়া এবং দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুরের 'তথাকথিত' বাঙলা উপভাষা এবং দ্বিতীয় রূপটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা উপভাষা, ভাগীরথীর দুই তীরে যার রূপে সামান্য কিছু পার্থক্য ছিল। ODBL, পৃ ১৩৭। গ. অবাচীন মাগধী অপভ্রংশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে বাঙলা উপভাষাগুলি উদ্ভূত হয়েছিল। কতগুলি ক্ষেত্রে অবশ্য পারস্পরিক প্রভাব এবং সংযোগ লক্ষ্য করার মতো। ODBL, পৃ ১৩৯। ঘ. পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে উদ্ভূত বাঙলা উপভাষাগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ধারাতেই দেখা দিয়েছিল এমন কিছু লক্ষণ যাকে বলা যায় সর্ববঙ্গীয়। এগুলি হল—ইল, ইব, ইয়া, এর, কে, রে প্রভৃতি কয়েকটি প্রত্যয় ও বিভক্তি। এই লক্ষণগুলিই বাঙলা উপভাষাগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ODBL, পৃ ১৩৯। ঙ. সর্ববঙ্গীয় লক্ষণগুলির দ্বারাই বাঙলা উপভাষাগুলি বাঙলা সাধুভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণেই বাঙলা সাধুভাষাকে বলা যায় বাঙলা উপভাষা সমূহের যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয়। ODBL, পৃ ১৪২। চ. বঙ্গীয় বদ্বীপ এলাকাটির নিজস্ব কোনো উপভাষা নেই। ভিন্ন ভিন্ন উপভাষাগুলির পারস্পরিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলের বাঙলা ভাষা। এই বদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর লোকদের কথ্যভাষাই বাঙলা সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজীর ক্ষেত্রে যেমন দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের ভাষা। ODBL, পৃ ১৩৯। ছ. গৌড়ীয় বা পশ্চিম মধ্য বাঙলা দেশের ভাষার উপরই গড়ে উঠেছে বাঙলা সাধু ভাষা। এতে স্থান পেয়েছে সবকটি সর্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই সাধু ভাষাকে এক একটি উপভাষা এক এক দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। ODBL, পৃ ১৪২! জ. নানা উপভাষা

এখনো প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বাঙলা ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে তা তুলনামূলক ভাবে আধুনিক কালের ব্যাপার এবং এর মূলে আছে কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণ। ODBL, পৃ ১৪৬।

২. উপভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এই কটি—ক. মধ্যযুগীয় পুঁথিগুলি থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া সম্ভব তার সবটা নেওয়ার পরেও বাঙলা উপভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগ করতে হবে তাদের আধুনিক স্তরের বিচারে। ODBL, পৃ ১৩৬। খ. দেশের প্রাচীন ভূবিভাগ অনুযায়ী বাঙলা উপভাষাগুলিকে চার প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপ। তবে পূর্ব প্রত্যন্ত বঙ্গে, অর্থাৎ সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের উপভাষাগুলিতে এমন সব ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক লক্ষণ দেখা দিয়েছে যা অন্যান্য উপভাষায় নেই। এর কারণ জনগোষ্ঠীগত। ODBL, পৃ ১৩৮। গ. রাঢ় উপভাষা-গুচ্ছের দুই ভাগ--দক্ষিণ পশ্চিমা ও যথার্থ পশ্চিম বঙ্গীয়। দক্ষিণ পশ্চিমার এক শাখায় ওড়িয়া, অন্য শাখায় দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুরীয়া। যথার্থ পশ্চিম বঙ্গীয় উপভাষাগুলিরও দুই ভাগ,—প্রত্যন্ত পশ্চিমা এবং মধ্য পশ্চিমা। প্রত্যন্ত পশ্চিমার অন্তর্গত হল—সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম এবং উত্তর মেদিনীপুরের উপভাষা। মধ্য পশ্চিমার অন্তর্গত হল—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া এবং কলকাতাসহ ২৪ পরগণার উপভাষা। বরেন্দ্র উপভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত হল—উত্তর মধ্য বাঙলার উপভাষাগুলি—মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা এবং বগুড়ায় প্রচলিত উপভাষাগুলি। কামরূপ উপভাষাগুচ্ছের দুইভাগ—পূর্বী এবং পশ্চিমা। পূর্বী শাখায় অসমীয়া এবং পশ্চিমা শাখার অন্তর্গত হল যথার্থ উত্তর বঙ্গীয় উপভাষাগুলি—জলপাইগুড়ি, পূর্ব পূর্ণিয়া, দক্ষিণ দার্জিলিং, দিনাজপুর, কোচবিহার, রংপুর, পশ্চিম গোয়ালপাড়ার উপ-ভাষাগুলি। বঙ্গ উপভাষাগুচ্ছেরও দুই ভাগ—পশ্চিমা ও দক্ষিণ পশ্চিমা শাখা এবং পূর্বী ও দক্ষিণপূর্বী শাখা। প্রথম শাখার অন্তর্গত হল ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, উত্তরপূর্ব নদীয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, সন্দ্বীপ, উত্তর পশ্চিম সিলেটের উপভাষাগুলি। দ্বিতীয় শাখার মধ্যে আছে পূর্ব সিলেট, কাছাড় (মায়াং), ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম (চাকমা)-এর উপ-ভাষাগুলি। ODBL, পৃ ১৪০। ঘ. উপভাষাগুলির দেশিক শ্রেণী

বিভাগের পরেও থেকে যায় অনেক শ্রেণীগত এবং বর্গগত উপভাষা। এগুলি ছড়িয়ে আছে দেশের নানা অঞ্চলে। ODBL, পৃ ১৩৮।

৩. বাঙলা উপভাষাগুলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার সবই হল ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক। আভিধানিক আলোচনা উপভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখানে তা আদৌ উত্থাপিত হয় নি। তথ্যগুলি হল—ক. অপিনিহিত-ই-ধ্বনির ভিত্তিতে দেখলে রাঢ় এবং অন্য সব অঞ্চলের উপভাষার তুলনায় বঙ্গ ও বরেন্দ্র উপভাষাগুচ্ছের স্বরধ্বনি ব্যবস্থা অনেক বেশি রক্ষণশীল। বাঙলাভাষার মধ্যযুগীয় লক্ষণগুলি বঙ্গ উপভাষা-গুচ্ছে বেশী বজায় আছে। পূর্ব রাঢ়ের উপভাষায় তথা চলিত ভাষায় তুলনামূলক ভাবে বেশী অগ্রগতি ঘটার মূলে আছে স্বরসঙ্গতি এবং অভি-শ্রুতির প্রভাব। ODBL, পৃ ১৪১। খ. মধ্য পশ্চিম বাঙলার উপভাষা-গুলিতে আদ্য শ্বাসাঘাত প্রবণতার ফলে শ্বাসাঘাতহীন মধ্যবর্তী অক্ষরে স্বরলোপ ঘটে এবং শব্দগুলি হ্রস্বাকৃতি লাভ করে। ODBL, পৃ ১৪১। গ. পদমধ্যগত মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্তির ফলে বঙ্গ উপভাষাগুচ্ছের ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবস্থায় অনেক নূতন নূতন বিশিষ্টতার উদ্ভব হয়েছে। অন্য উপভাষাগুচ্ছে তা ঘটেনি। ODBL, পৃ ১৪৩। ঘ. পূর্ব তথা দক্ষিণপূর্ব বাঙলার উপভাষা-গুলিতে আদ্য এবং পদমধ্যস্থিত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ব্যাপক উষ্মীভবন এমন একটা বিশিষ্টতা মাত্রাগুলিকে অন্যান্য বাঙলা উপভাষা থেকে স্পষ্টতর পৃথক করে দেয়। ODBL, পৃ ১৪৪। ঙ. শব্দরূপে দক্ষিণ পশ্চিম বাঙলার উপভাষা-গুলির সঙ্গে মিল আছে ওড়িয়ার। ODBL, পৃ ১৪৪। চ. পূর্বী এবং পশ্চিমা উপভাষাগুলির মধ্যে ধাতুরূপে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। ODBL, পৃ ১৪৫। ছ. বাঙলা ভাষা সম্প্রদায়ের পাশাপাশি রয়েছে মৈথিলী, মগহী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া। এর মধ্যে ওড়িয়ার সঙ্গেই বাঙলার ঘনিষ্ঠতা সর্বাধিক। ODBL, পৃ ১৪০।

৫. নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা

ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কার্যকারণ পরম্পরার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে অনেক কাল। ভাষার ব্যাপারেও এই অঞ্চলটিকে কি কেন্দ্র বলে গণ্য করা যায়? এ সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহোদয়ের একটি অভিমত বিচার করে দেখা যেতে পারে। ভাষার যে রূপটি সর্বজনগ্রাহ্য তাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'জাত্য ভাষা'। বাঙলার যে রূপটি

সর্বজনগ্রাহ্য বা 'জাতো' সেটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গের ভাষা মিলিয়ে তৈরি হয়নি। সেটি একটি বিশেষ জায়গার ভাষা। এই জায়গাটিকে তিনি বলেছেন মধ্যরাঢ় এবং বর্তমান হুগলীজেলার পশ্চিমে এর অবস্থিতি। এই মধ্যরাঢ়ের মৌখিক ভাষাকেই তিনি 'জাতো ভাষা'র মর্যাদা দিয়েছেন। এই সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ যুক্তি হল—এই অঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ সকলের ভাষাই এক। বাঙলাদেশের আর কোথাও এরকম নেই। বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ছাত্রপাঠ্য বইগুলিতেও এই আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙলা ভাষার এই রূপটিকে তিনি গণ্য করেছেন 'প্রকৃতি' হিসেবে। অন্যরূপগুলি তাঁর মতে প্রকৃতির বিকৃতি—'Variation from the type'। (ইংরেজি শব্দগুলি তাঁর নিজের)[১৩]। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রায় বিপরীত মেরুতে স্থান পাবে বিদ্যানিধি মহোদয়ের এই অভিমত। বাঙলা ভাষা যে একটা বিচ্ছিন্ন, স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয় বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে সে কথাটা বেশ ভালো ভাবেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে জনগোষ্ঠীগত পার্থক্যের জন্য উপভাষিক পার্থক্যগুলি উদ্ভূত হয়, যেমন দেখা যায় পূর্ব প্রত্যন্ত বাঙলার ক্ষেত্রে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যদিও বলেছেন যে বাঙলা উপভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে তাদের বিকাশের বর্তমান স্তরটিকে আশ্রয় করেই, তবু একথা তর্কাতীত যে তিনি উপভাষাগুলির উদ্ভব এবং তাদের ইতিহাস সম্বন্ধেই আগ্রহ দেখিয়েছেন বেশি। উপভাষা যদিও কোনো একটা ভাষা সম্প্রদায়ের territorial variant বা স্থানিক পার্থক্যজাত রূপ[১৪], তবু পার্থক্যগুলি (Variations) স্থান মাহাত্ম্যের ফল নয়। পার্থক্য হয় ধ্বনিগত (Phonetic), রূপগত (Morphemic) এবং শাব্দিক (Lexemic)। পার্থক্যগুলির মূলে থাকা সম্ভব অন্য ভাষা সম্প্রদায়ের প্রভাব। দেখা যায় প্রত্যন্ত বা fringe অঞ্চলেই পার্থক্যগুলি প্রবলতর হয়ে ওঠে। অন্যভাষার প্রভাবই এর একমাত্র সঙ্গত কারণ। অন্য কোন কারণ থাকলে হয় সেগুলি নিতান্ত পরোক্ষ আর না নয় গৌণ। আদান প্রদানের মধ্যে দিয়েই একভাষার প্রভাব অন্য ভাষায় ঢুকে পড়ে। যে কোন একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে ভূচিত্রে দেখাতে হলে যেমন দেখাতে হবে তার পরিমণ্ডলটিকে তেমনি নির্দেশ করতে হবে তার কেন্দ্রটিকে। কোন রকমের সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রথম যে জায়গাটিতে দানা বেঁধে উঠবে, সেই বিশেষ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের কেন্দ্র বলে গণ্য করতে হ'বে সেই জায়গাটিকেই। আন্দোলনের

ঢেউ কালক্রমে কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্তে পৌঁছোয়। যাকে প্রত্যন্ত বলে ধরা হয় সেখান থেকেও নূতন কোনো আন্দোলন শুরু হওয়া সম্ভব। প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের কেন্দ্রের মতোই সাংস্কৃতিক ভূমিকম্পের কেন্দ্রও নড়াচড়া করে থাকে।

বাঙলা ভাষা সম্প্রদায়ের বিকাশের ক্ষেত্রটিকে যদি আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাব এই ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে আছে পর পর দুটি মণ্ডল[১৫]। দূরবর্তী মণ্ডলটি নব্যভারতীয় আর্যভাষার। ওড়িয়া, মগহী, মৈথিলী, নেপালী এবং অসমীয়া ভাষা দিয়ে গড়া এটি। নিকটতর মণ্ডলটি অনার্য ভাষার—সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরুখ্, লেপচা, ভুটিয়া, বোড়ো, গারো, খাসী, নাগা, মিজো ইত্যাদি ভাষা দিয়ে গড়া। পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব প্রত্যন্তের বাঙলা উপভাষাগুলি এদেরই প্রতিবেশী। প্রত্যন্তের এই উপভাষা-গুলিতেই পারস্পরিক পার্থক্য সব চেয়ে বেশি প্রকট। প্রত্যন্ত থেকে যতই কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যাবে ততই পারস্পরিক পার্থক্যগুলি কমে আসবে। কেন্দ্রের উপভাষাটি এই ভাবেই সকল উপভাষার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়েও আলাদা একটা রূপ নেবে। এই জন্যই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় যখন বলেন বদ্বীপের নিজস্ব কোনো উপভাষা নেই তখন সেটা উদ্ভট বলে মনে হয় না। একই কারণে, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহোদয় মধ্যরাঢ়ের উপভাষাকেই Standard হিসেবে নির্দেশ করতে চাইলে তাঁকেও ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা এবং বাঙলা ভাষার বিবর্তনকে স্বয়ম্ভূ ব্যাপার মনে করাতেই নানারকম আপাতবিরোধী ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এই জন্যই বাঙলা উপভাষার চর্চায় সমাজ বিজ্ঞান তথা Cultural Anthropology-র সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

৬. অন্যান্য গবেষক

এখন দেখা যাক, অন্যান্য গবেষকরা বাঙলা উপভাষা চর্চায় কতদূর এগুতে পেরেছেন। একটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। এখানে একটা প্রাথমিক চেষ্টা করা যেতে পারে। গোপাল হালদার লিখেছেন নোয়াখালি (১৯২৯, ৩৩), পূর্ববঙ্গ (১৯৩৩) এবং চট্টগ্রামের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৪৩)[১৬]। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকি লিখেছেন 'চট্টগ্রামী বাঙলার রহস্য ভেদ' (১৯৪৩)[১৬ক]। কৃষ্ণপদ গোস্বামী লিখেছেন ময়মনসিংহ (১৯৩৯),

চট্টগ্রাম (১৯৪০-৪১), এবং উত্তর পূর্ব বাঙলার উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬১)[১৭]। শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন রঙ্গপুর (১৯৩৯) এবং উত্তর বাঙলার উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৪০-৪১)[১৮]। সুধীর করণ লিখেছেন দক্ষিণ পশ্চিম বাঙলা (১৯৫৫ ৫৬), কাঁথি (১৯৬১) এবং সীমান্ত রাঢ় অঞ্চলের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬৩)[১৯]। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী লিখেছেন সিলেটের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬০)[২০]। মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন ঢাকা (১৯৬৪), চট্টগ্রাম (১৯৬৫) এবং সিলেটের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬৬)[২১]। মুনীর চৌধুরী লিখেছেন পূর্ববঙ্গের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬০)[২২]। পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন দক্ষিণ পূর্ব বীরভূম (১৯৫৫), বীরভূম (১৯৬২) এবং পশ্চিম বীরভূমের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬৪)। এছাড়া তাঁর লেখা আছে বীরভূমের রাণাকামারদের উপভাষা (১৯৫৫-৫৬), সাঁওতালদের ব্যবহৃত বাঙলা উপভাষা (১৯৬২) এবং পশ্চিমবঙ্গের মুচিদের উপভাষা সম্বন্ধে (১৯৬২)[২৩]। এছাড়া আরো কয়েকজনের লেখা চোখে পড়েছে, যেমন—বীরভূম উপভাষার শব্দ নিয়ে সত্যরঞ্জন দাসের লেখা (১৯৬৩)[২৪]। বীরভূম উপভাষার শব্দ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের লেখা (১৯৪৯)[২৫]। বীরভূম উপভাষা নিয়ে হরিনাথ ঘোষের লেখা (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২১শ বর্ষ), বাঙলার একটি মিশ্র উপভাষা নিয়ে প্রণবেশ সিংহ রায়ের লেখা (১৯৬৩)[২৬]। দক্ষিণ পূর্ব বর্ধমানের মুচিদের উপভাষা নিয়ে সুকুমার সেন মহোদয়ের লেখা (১৯৫৫)[২৭]। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার রিদ্‌ম্‌ নিয়ে অমলেশচন্দ্র সেনের লেখা (১৯৪২-৪৪)। এই গবেষকদের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন দুজন বিদেশী। আমেরিকান গবেষক জ্যাক, এ, ড্যাব্‌স্‌ লিখেছেন পূর্ববঙ্গের উপভাষা নিয়ে (১৯৬৫)[২৮]। আর জাপানী গবেষক নরিহিকো উচিদা লিখেছেন চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে (১৯৭০)[২৯]। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য সুগত চাকমার লেখা চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৪)[৩০]। এবং ক্ষুদিরাম মাহাতর লেখা কুর্মালি ভাষাতত্ত্ব[৩১]।

স্থানিক পরিচয়ের দিক থেকে দুই বাঙলাকে মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, কাজ হয়েছে পশ্চিমবাঙলার মেদিনীপুর[৩২] বীরভূম এবং নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং এবং সিলেট জেলার উপর। উত্তরবাঙলার উপর কাজ হয়েছে খুবই কম। জেলা হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে শুধু রঙ্গপুরের। বর্ণ বা শ্রেণীগত উপভাষার উপর কাজ হয়েছে মাত্র দুটি, বীরভূমের রাণাকামার এবং বর্ধমানের মুচি ছাড়া আর কারো উপভাষা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

পত্রিকায় এবং দেশ পত্রিকায় কিছুকাল ধরে ঔপভাষিক শব্দাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান এখন সুপরিচিত[৩৩]। এত বড় না হলেও পশ্চিমবাঙলা থেকে লৌকিক শব্দকোষ নামে এরকম আরেকটি অভিধান প্রকাশ করেছেন কামিনীকুমার রায়[৩৪]। এছাড়া যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা উপভাষা নিয়ে কয়েকটি পি. এইচ. ডি. থিসিস লেখা হয়েছে। শুনেছি সুন্দরবন এবং উলুবেড়িয়া অঞ্চলের উপভাষার আলোচনা করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত উল্লিখিত আলোচনা ও গবেষণাগুলি, বেশির ভাগ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদের কাজ। উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই এইসব কাজ প্রধানত নিয়ন্ত্রিত। ইতিমধ্যে অর্ধশতাব্দী অতীত হলেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব বেশ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। অস্ট্রিক এবং ভোটবর্মী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান না থাকার ফলে উপভাষার ক্ষেত্রে এগুলির প্রভাব পরিমাপ করার নামমাত্র চেষ্টা হয়েছে। মধ্যযুগীয় পুঁথিগুলির মধ্যে ঔপভাষিক লক্ষণগুলি খুঁজে বের করে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পর্যালোচনার চেষ্টাও করা হয় নি। ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা উপভাষার রূপ বা ধ্বনিগুলিকে এখনো নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝে ওঠা যায় নি। অর্থাৎ না হয়েছে যথার্থ ডায়াক্রোনিক কাজ না সিনক্রোনিক। 'যেমন আছে ঠিক তেমনি'—এই ভাবে শুধু তথ্য এবং সাক্ষ্য জোগাড় করা চলে। সেগুলিকে সাজিয়ে বর্ণনা দিতে গেলেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন এসে পড়ে। কোনো উপভাষার ব্যাকরণ তৈরি করতে গিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের মতো পুরোদস্তুর সমাস নির্ণয়ে সময় ও শক্তির অপব্যয় ঘটতেও দেখা গেছে। কিন্তু অন্যদিকে কোনো উপভাষার ধ্বনির সংখ্যা কত? এমন সাধারণ একটা প্রশ্নেরও সদুত্তর পাওয়া যায় না বহুক্ষেত্রে। অবশ্য ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। কিন্তু বাঙলা উপভাষা সম্বন্ধীয় কাজগুলি একত্র করার কোনো চেষ্টা এ-পর্যন্ত হয় নি। কিছু লেখা এখনো অপ্রকাশিত থিসিস আকারে রয়ে গেছে। কাজেই ভালমন্দের তফাৎ করার সুযোগই এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি।

৭. কি করা উচিত?

ক. ধ্বনি, রূপ এবং শব্দের দিক থেকে যেসব কাজ এতদিন ধরে হয়েছে সেগুলির মধ্যে বাছাই করে, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে একসঙ্গে বা কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে টিপ্পনীসহ

একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জি। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিতে পারেন। খ. পূর্ববাংলায় এখন কাজ করবার মতো লোকও কম নেই। দরকার শুধু, আমাদের কাজের সঙ্গে ওঁদের কাজের যোগসূত্র স্থাপন, তথ্য, সংবাদ ও প্রকাশনার পারস্পরিক লেনদেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একাজ খুবই সহজে হওয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনিরুজ্জামানের উদ্যোগে প্রকাশিত নিসর্গ পত্রিকা এবং বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব সমিতি কাজ কিছুটা এগিয়ে রেখেছে[৩৫]। তাছাড়া বাংলা একাডেমি তো আছেই। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাগুলির সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা বিশেষ জরুরি। এই সব উপভাষা সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই দেশবিভাগের আগেকার। ঢাকাই উপভাষা সম্বন্ধে কাজ করার সময় আমি সর-জমিন তদন্তের সুযোগ পেয়েছিলুম ১৯৬০-৬২ সালে। সেটাও দু-দশক আগেকার ব্যাপার[৩৬]। ব্যাপক লোক-বিনিময়ের ফলে উপভাষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে। এই পরিবর্তনের ব্যাপকতা এবং গভীরতা ভালো ভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া হাজং এবং চাক্‌মাদের মতো জনগোষ্ঠীর মুখে বাঙলা ভাষার রূপটি কি দাঁড়িয়েছে সেটা জানাও অত্যন্ত জরুরী। ভোট-বর্মী ভাষাগুলির প্রভাবের পরিমাণ নিরূপণ করার কাজে এটা বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

গ. দেখা যাচ্ছে উত্তরবাঙলার উপভাষাগুলি নিয়ে খুবই সামান্য কাজ হয়েছে। বিশেষ করে মালদহ ও দিনাজপুরের অর্ধাংশে এবং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় ঔপভাষিক তথ্য এবং সাক্ষ্য গ্রহণের কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ। রাজবংশী, কোচ, মেচ, বোড়ো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মুখে বাঙলা উপভাষাগুলির রূপ জানা গেলে এক্ষেত্রেও ভোট-বর্মী ভাষাগুলির প্রভাবের পরিমাণ নিরূপণে সুবিধা হবে। ঘ. পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলাও প্রত্যন্ত অঞ্চলেই। এই জেলা দুটির উপভাষার তথ্য এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করাও বিশেষ জরুরি। তাছাড়া ওরাওঁ, সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মুখে বাঙলা উপভাষার রূপ কি দাঁড়িয়েছে তা জানা দরকার। বিশ্বভারতী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ একাজে অগ্রণী হতে পারেন। তাছাড়া, বাঙলা-ওড়িয়ার এবং মগহী-বাঙলার পারস্পরিক প্রভাবের ক্ষেত্রগুলি থেকেও আরো তথ্য এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষত মেদিনীপুর জেলায় এই কাজের সুযোগ প্রচুর।

৬. তথ্য এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ কঠিন নয়। তথ্য ও সাক্ষ্য কাজে লাগানোর ব্যাপারটাই হল আসল। একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা না থাকলে এই সব সমীক্ষা কোনো কাজেই আসে না। অতীতের অনেক ভালো কাজ থেকেও এই জন্যই আমরা অভীষ্ট ফল পাই নি। পরিকল্পনা খাড়া করতে হলে তার পেছনে সংগঠন থাকা চাই। আর সংগঠনের পেছনে চাই অর্থবল। বেড়ালের গলায় ঘন্টা কে বাঁধবেন জানি না, কিন্তু এখন এমন একটা পদ্ধতি আমাদের বেছে নিতে হবে যা আয়ত্ত করা সহজ এবং সমাজ বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

৮. ভূচিত্রণ পদ্ধতি

ভূচিত্রণ বা ম্যাপিং, পদ্ধতি হিসাবে অর্থনীতি সমাজ-বিজ্ঞানের নানা শাখায় ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপভাষা-চর্চায় গোড়ার পর্বে ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশে Dialect Atlas বা ঔপভাষিক ভূচিত্রাবলি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তবু এই পদ্ধতিকে এখনো out dated বা কালপরিত্যক্ত বলা যায় না। বিশেষত আমাদের দেশে উপভাষা চর্চা যে পর্যায়ে পড়ে আছে তাতে ভূচিত্রণের গুরুত্ব প্রচুর। তথ্যগুলিকে ভূচিত্রের দ্বারা প্রকাশ করার মধ্যে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। আমাদের দেশে প্রতি মৌজাকে (রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম সীমা) নির্দিষ্ট করার জন্যে একটি করে সংখ্যা দেওয়া হয় ভূ-বাসন বিভাগ থেকে। এই সংখ্যাটির নাম হল জুরিসডিক্শন্ লিস্ট নাম্বার, সংক্ষেপে জে. এল. নাম্বার। থানা-নাম সহ এই সংখ্যার সাহায্যে ভূবাসন বিভাগের 'ইঞ্চি-প্রতি-মাইল' মাপের ভূচিত্রে ভারতের প্রায় যে কোনো মৌজার অবস্থিতি জানা যায়। কাজেই কোনো একটি ঔপভাষিক ক্ষেত্রের ছোট মাপের ভূচিত্রে এই সংখ্যাগুলি বসিয়ে মৌজার অবস্থিতি সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যে যে গ্রামে সমীক্ষা করা হয়েছে সেগুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করে এই গ্রামগুলিতে কোনো ধ্বনি বা রূপ বা শব্দের প্রচলন-অপ্রচলন দেখানো যেতে পারে। এই ভাবে সমগ্র ভাষা-সম্প্রদায়ের distribution map বা ভাষাগত উপাদানের স্থানিক বন্টনের ভূচিত্রাবলি গড়ে উঠতে পারে ক্রমে ক্রমে। এগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে তৈরি করা চলে সমগ্র ভাষা-সম্প্রদায়ের ঔপভাষিক ভূচিত্রাবলি। এতে কি সুবিধা হবে? উপভাষাগুলির স্থানিক শ্রেণীবিভাগের পরেও পাওয়া যাবে এমন সব উপাদানের সন্ধান, যেগুলি স্থানিক ভাবে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে প্রত্যন্ত এবং

কেন্দ্রের উপভাষাগুলির সম্বন্ধের স্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া সম্ভব হবে। উপভাষাগুলির সঙ্গে সাধু বা শিষ্ট বা চলিত ভাষার সম্পর্কটি ধরা পড়বে। বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে বাঙলা উপভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগ হয়ে উঠবে **meaningful** বা অর্থবহ। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল মুখের ভাষার একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য বিবরণ ধরা হয়ে থাকবে ভাবীকালের জন্য।

৯ অন্যান্য পদ্ধতি

ঔপভাষিক মানচিত্র রচনাই উপভাষা চর্চার একমাত্র পদ্ধতি নয়। আছে আরো জটিল যান্ত্রিক এবং গাণিতিক পদ্ধতি। ঔপভাষিক বিশিষ্ট ধ্বনিগুলির সঙ্গে চলিত ভাষার ধ্বনিকে তুলনা করে দেখা যেতে পারে অসিলোগ্রাফের সাহায্যে। লুপ্ত মহাপ্রাণতার সত্যি কিভাবে ক্ষতিপূরণ হয়ে থাকে সেটার, কিংবা পূর্ব প্রত্যন্তের ব্যাপক উষ্মীভবনের ফলে স্পৃষ্টধ্বনির পরিবর্তনের ব্যাপারটার দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে এর দ্বারা। অবশ্য বাঙলা চলিত ভাষার ধ্বনিগুলিরই অসিলোগ্রাফিক বিশ্লেষণ হয়েছে মাত্র একবার[৩৭]। সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনার দ্বারা সাংখ্যায়নের সূত্র অনুযায়ী নানা ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঔপভাষিক প্রয়োগের হার সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যেতে পারে। তবে এইসব পদ্ধতিতে কাজ করবার মত কেন্দ্র পূর্ব ভারতে একটিও নেই—এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেতাবি পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষার প্রশ্নগুলি এমনই বস্তাপচা যে আধুনিক শিক্ষণ বা গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগের কথা ভাবা স্বপ্ন দেখার সামিল।

উৎস ও টিপ্পনী

১. Linguistic Survey of India/Sir George Abraham Grierson/Vol. V, Part I/1903

২. A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect of South Eastern Bengali/Gopal Haldar/C.U. Journal of Dept. of Letters/Vol. XIX/Pp 1-38/1929

A skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengali/Gopal Haldar/Ibid/Vol XXIII/PP 1-38/1933

৩. Atlas Linguistiquc de la France/Edmont Edmont of Jules Gillieron/Libraire Speciale pour l'histoire de la France/Paris/1902-10

৪. বাঙ্গালা ভাষা/যোগেশ চন্দ্র রায়/প্রথম ভাগ/১৩১৫ বঙ্গাব্দ

৫. ODBL/S.K.C./Vol I/P 140/

৬. *ODBL/S.K.C./Vol I/Pp 136-149*

৭. বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা/মহাপ্রাণ বর্ণ/সু. কু. চ./পৃ ১৬০-৭৮/১৯৩৬

৮. Recursives in Indo-Aryan/S.K.C./Bulletin of the Linguistic Society of India/Lahore/1929

৯ East Bengali Speech Rythm/Amalesh Chandra Sen/ Indian Linguistics/Vol 8/Pt 4/1942-44

১০. Indo-Aryan and Hindi/S.K.C./Pages 111-119/2nd ed 1960

১১. ODBL/New Edition (Rupa & co)/Vol 3/Page 32/1975

১২. বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে/সুক্ষ্ক বাঙলা/সু. কু. চ/পৃ ২৯০-৯১/১৯৭৩

১৩. কি লিখি/যোগেশ চন্দ্র রায়/পৃ ৫-৬/১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

১৪. Slovar Linguistic´eskich Terminov/Olga Achmanova/ P 131/Moscow/1966

১৫. Bengali Speech Community and its Neighbours/ Animesh Kanti Pal/Language and Society in India/IIAS, Simla /1969

১৬. The Chittagong Dialect of Bengali/Gopal Haldar/ C.U. Journal of the Dept. of letters/1949

A Brief Note on East Bengali Dialects (unpublished)/1933

১৬ক. চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ/ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক/১৯৪৩

১৭. Linguistic Notes on Maimansing Dialect/Krishna-pada Goswami/Indian Linguistics/Vol 7, Pt 1/1939

Linguistic Notes on Chittagong Bengali/ibid/Vol. 8, Pt 2+3/1940-41

Sibilants and Glottal Fricative 'h' in North East Bengal Dialects/Bulln. of the Philological Society of Cal/Vol 2/1961

১৮ Notes on Rangpur Dialect/Shambhuchandra Chowdhury/Indian Linguistics/Vol 7, Pt 1/1939

North Bengali Dialects/Ibid/Vol. 8, Pt 1/1940-41

১৯. South Western Bengali/Sudhir Kumar Karan/Indian Linguistics/Vol 15, Pt 3+4/1955-56

Contai Dialect of South Western Bengali/Bulln. of the Phil. Soc. of Calcutta/Vol II/Pp 15-23/1961/

Some Aspects of Simanta Radhi Dialect/Ibid/Vol./IV, Pt 1/1963/

২০. সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা/শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী/বাংলা একাডেমি/ঢাকা/১৯৬০

২১. A Study of Dacca Dialect/Muhammad Abdul Hai/ Studies in Pakistani Linguistics/Lahore/Pp 105-23/1264

A Study of Chittagong Dialect/Ibid/Lahore/1965

A Study of the Sylhet Dialect/Shahidulla Presentation Volume/W. Pakistan/1966

২২. The Language Problem in East Pakistan/Munier Chowdhury/International Journal of American Linguistics/ Vol 26, No 3, Pt III/Indiana University/1960

২৩. Morphology of South Eastern Birbhum Dialect/ Prithwindra Chakravarty/unpublished M.A. Dissertation/ Viswabharati/1955

The Birbhum Dialect of West Bengal/unpublished D. Phil. Diss /Cal. Univ./1962

The West Birbhum Dialect/Mimeograghed/Univ. Chicago/ 1964

Dialect of the Ranakamars of Birbhum Indian Linguistics Vol. 15/Pp 59-62/1955-56

The Bengali Dialect Spoken by the Santhals/Unpublished/ 1962

Muci Dialect of West Bengal/South Asia Seminar/Univ. of Chicago/1962

২৪. Some vocables from Birbhum Dialect/Satyaranjan Das/Bulln. of the Phil. Soc. of Calcutta/Vol 4, Pt 21 Pp 91-97/ 1963

২৫. Some Vocables from Birbhum Colloquy/Satyendranath Ghosal/Indian linguistics/Vol XI/1949

২৬. A Mixed Dialect of Bengali/Pranabesh Sinha Ray/Bull. of the Phil. Soc. of Cal/Vol 4, Pt 2/1963

২৭. The Caste Dialect of the Mucis of the South East Burdwan/Sukumar Sen/Indian Linguistics/Vol 16/1955

২৮. Spoken Bengali-Dialects of East Bengal/Jack. A. Dabbs/Texas A and M University/1965

২৯. Der Bengali Dialekt von Chittagong Grammatik: Texte; Worterbuch/Norihiks Ucida/Wiesbaden/1970

৩০. চাক্‌মা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব/সুগত চাকমা/রাঙ্গামাটি/বাংলাদেশ/১৯৭৪

৩১. কুর্মালি ভাষাতত্ত্ব/ক্ষুদিরাম মাহাত/পুরুলিয়া/১৩৮০

৩২. Dialects of Bengali Spoken in Midnapore/Animesh Kanti Pal/District Census Handbook/Midnapore/Vol I/ Calcutta/1966/Pp 179-81

Search for the Materials for a Dialect Atlas of Midnapore/ Seminar on Dialectology/Panjabi University/Patiala/1970

Distribution of Some Morphemes of Bengali in the District of Midnapore/Seminar of the Indian Anthropological Society/Calcutta/1971

The Border Dialects in South West Bengal/Bengali-Oriya Seminar/Calcutta University/1976/

বাঙ্গালা-ওড়িয়ার সীমারেখা/বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ/মেদিনীপুর/১৯৭৪

৩৩. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান/মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সম্পাদিত/বাঙলা একাডেমী/ঢাকা/১৯৬০-৬৫

৩৪. লৌকিক শব্দকোষ/কামিনীকুমার রায়/ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্‌/ কলিকাতা/১৯৬৮

৩৫. নিসর্গ/ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা/মনিরুজ্জামান সম্পাদিত/ঢাকা/১৩৮০ বঙ্গাব্দ/

ঢাকাই উপভাষা/বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ/মেদিনীপুর/১৯৭৪

৩৬. Phonemes of a Dacca Dialect of Eastern Bengali and the Importance of Tone/Animesh Kanti Pal/Journal of the Asiatic Society/Vol 7, No 1+2/Pp 39-44/1965

Phonology of a Dacca Dialect/Umesh Mishra Comm. Volume/G.J.R. Institute/Allahabad-2/1970

ঢাকা জেলার একটি উপভাষায় মহাপ্রাণতা এবং স্বর/নিসর্গ / ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা/ঢাকা / ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

৩৭. জর্জ কোস্‌তিৎস্‌ ও রিয়া দাস/বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত খসড়া/ কলকাতা/১৯৬৯

ভাষাতত্ত্ব-চর্চায় গোপাল হালদার

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

যদি সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড় হয়, ভাষার কামড়েও বিষ আছে—মাঝে মাঝে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। এখনো আসে।

১

আমাদের দেশের ভাষা-বিজ্ঞান চর্চা বেশি দিনের ব্যাপার নয় একথা শুনলে আপত্তি উঠতে পারে। যে দেশে পাণিনি জন্মায় সে দেশে ভাষাচর্চা বিজ্ঞান পর্যায়ে উঠে গেছে সুদূর অতীত কালেই। পাণিনি তো খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। কথিত আর্য-ভাষাকে সুস্থির করে তার নানান প্রবণতার মধ্য থেকে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলাকে আবিষ্কার করে, সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও কুশাগ্র বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাকে ব্যাকরণের অন্তর্গত করে তিনি ভাষা সম্পর্কে যে বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা পাওয়া ভার। পরবর্তী বৈয়াকরণরা অনেকেই অষ্টাধ্যায়ীর সংক্ষিপ্ত রূপে, সরলীকৃত রূপে বিশ্বাসী। শেষ পর্যন্ত ঐ ধারায় তো ব্যাকরণের জ্যোৎস্নালোকও বর্ষিত হয়েছে 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'তে।

কিন্তু এই ধারাতে স্থির কতগুলি নিয়ম তার ঐতিহাসিক সূত্র হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলে বহমান ভাষার কোন স্তরে কোন কোন পরিবর্তন সুনির্দিষ্ট প্রতীকের মধ্যে কেন বেঁধে ফেলা হল তার যুক্তিগুলি। তাই ব্যাকরণ হয়ে দাঁড়ায় নীরস সূত্রাবলি। মানে না জেনে মুখস্থ করতে হয় নর+টা=নরেণ।

মুগ্ধপাঠ্য ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা মেনে নিতেই হয়। কিন্তু অধিক কৌতূহল যাঁর আছে তিনি পথ খুঁজে পেতেন না। সংস্কৃত ব্যাকরণ নিজেই দ্বাদশ বর্ষকালব্যাপী পাঠ্য শাস্ত্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু ইতোমধ্যে ভাষার চেহারা পালটে যায়। নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে মধ্য ও নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি তাদের স্বকীয় কালসীমায় কিছুকাল স্থিতি পেয়ে আবার মোড় নিয়ে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। পরিবর্তন তো সর্বকালীন ব্যাপার। ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলী হলে যে তার এই ঐতিহাসিক বিবর্তন-রেখাটি দেখে নিতে হয়—ফলত সেই সূত্রে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক

ঘটনাবলি, জীবন-সম্পৃক্ত আচার-আচরণ সব কিছুই যে জিজ্ঞাসুর জ্ঞাতব্য বিষয় হয়ে ওঠে এই বোধই ছিল না। তাই পথ খুঁজে না পাওয়া।

যেহেতু এই বোধটিই আধুনিক—এ সম্পর্কে সচেতন হওয়াটিই আধুনিক-সেই জন্য ভাষা-বিজ্ঞান-চর্চাও এই অর্থেই আধুনিক।

ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার এই আধুনিক কৌতূহল প্রথম প্রকাশ করেছিলেন স্যার উইলিয়ম জোনস। তিনিই গ্রীক, ল্যাটিন, গোথিক, কেলটিক ইত্যাদি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিল দেখতে পেয়ে তাঁর ধারণাটি শিক্ষিত সমাজকে জানালেন যে এসব ভাষারই মূল এক এবং তা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় তিনি এই যে তাঁর ধারণাটি ব্যক্ত করলেন তা থেকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা **Comparative Philology** একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হয়ে উঠল। ভাষাবিজ্ঞান কেবল ব্যাকরণ-চর্চায় রইল না, তা ব্যাপকভাবে বিশাল জনগোষ্ঠীসমূহের বিভিন্ন ভাষা, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিতব্য একটি শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। জোনস ছাড়া ডেনমার্কের বাস্ক, গ্রীম, বপ এঁদের সমবেত দানে দিনে দিনে শাস্ত্রটি হিউম্যানিটিজ বা মানবিকী বিদ্যার একটি শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পেল।

ভারতীয় আর্যভাষাসমূহে যাঁদের আগ্রহ ছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁদের নাম এক নিঃশ্বাসে করে গেছেন: **Masters of Indo-Aryan philology like Uhlenbeck and Wackernagel, Whitney and Pischel, Beames and Bhandarkar, Hoernle and Grierson.**[১] প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ভাণ্ডারকর ছাড়া সকলেই পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত। আমাদের দেশেও যে বাংলা ভাষাতত্ত্বে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রভৃতি মনীষীদের বিভিন্ন প্রবন্ধাবলি।

ভারতবর্ষে এই নতুন ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় পথপ্রদর্শক যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুদ্ধ পণ্ডিতমাত্র নন। ভারতবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্যার চর্চার গুরু হিসাবে তাঁরা আমাদের নতুন ভারত-আবিষ্কারের কৌতূহলী কর্ণধারও। শুষ্ক পাণ্ডিত্যের চর্চাই এঁদের একমাত্র দান নয়। এঁরা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে প্রাচীন ভারতের মহিমা আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের হীনমন্যতাবোধতাড়িত পরাধীন মানসিকতায় সান্ত্বনাও যুগিয়ে গেছেন।

ভাষাবিজ্ঞানচর্চা সূত্রে তাই তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত নতুন

ভাষাবিজ্ঞান-কৌতূহল, দ্বিতীয়ত ভারত-মহিমা আবিষ্কার এবং তৃতীয়ত স্বদেশপ্রেম।

প্রথম দুটি বিষয় প্রধানত পাশ্চাত্যপণ্ডিতবর্গের গবেষণা ও কার্যাবলির সাধারণ লক্ষণ। ম্যাক্স্‌মূলর, ওয়েবার, গোল্ডস্টুকার এঁদের গবেষণা মূলত ভাষাবিজ্ঞান-কেন্দ্রিক না হলেও এঁদের মধ্য দিয়ে Glory hat was India-র আবেগ সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার প্রেরণা। শুদ্ধ বিদ্যা-চর্চা বা Scholasticism-এর আবেগটিও যে তাঁরা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে সুনীতিকুমার কিংবা পরবর্তীকালেও শুদ্ধ বিদ্যাচর্চাই তার প্রমাণ।

ভারতীয় মনীষী যাঁরা এই ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আগের দুটি বিষয় ছাড়াও নতুন স্বদেশ প্রেম একটি প্রেরণা। সুনীতিকুমার বৃত্তি নিয়ে ১৯১৯ সালে ইউরোপ যান। স্বদেশপ্রেমের আবেগ সম্বন্ধে সরকারী ভাবে কথা বলতে তিনি স্বভাবতই সতর্ক। তবু O.D.B.L.-এর ভূমিকায় যা লিখেছেন তার মধ্যেও স্বদেশপ্রেমের অন্তঃস্রোত সংবেদনশীল পাঠকের কাছে ধরা পড়বেই।

> The idea of systematically investigating the history of my mother-tongue first struck me over twelve years ago when I was at college in my native town of Calcutta reading for the Master of Arts examination in English with Old and Middle English and History of the English Language and little Germanic Philology as my special subjects. The modern methods of linguistic investigation which I saw applied to English filled me with admiration and enthusiasm ; and as the problem of Indo-European is equally connected with my speech, my interests naturally began to turn wistfully in that direction.[২]

আচার্য সুনীতিকুমার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন এল. ডি. বার্ণেটকে যিনি তাঁকে প্রাকৃত পড়তে সাহায্য করেছিলেন ; ডঃ এফ. ডবল্যু. টমাস-কে যিনি তাঁকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন ; প্রোফেসর ড্যানিয়েল জোনসকে, যিনি তাঁকে ধ্বনিবিজ্ঞান পড়াতেন ; এছাড়া স্যার ডেনিসন

রস, এইচ. জি. গ্রাটন, রবিন ক্লাওয়ার এঁদেরকে, যাঁরা তাঁকে পারসী ও প্রাচীন ইংরেজী গথিক ও আইরিশ পড়ায় সাহায্য করতেন। পারিতে যাঁদের সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রোফেসর আঁতোয়ান মেইয়ে,প্রোফেসর ঝুল ব্লক যাঁর Formation de la langue Marathe তাঁর O.D.B.L.-এর প্রেরণা (In preparing the present work, the plan adopted by Professor Jules Bloch in his 'Formation de la Langue Marathe' has given me the dearest notion about what a book on the origin and development of a modern Indo-Aryan Language should contain.)।

তাছাড়া অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভি, পল পোলিও এবং ঝাঁ প্শিলুস্কি (Jean Przyluski) এবং Linguistic Survey of India-র প্রণেতা স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সনের সংস্পর্শেও তিনি আসেন। জর্জ গ্রীয়ার্সনই তাঁর বইয়ের মুখবন্ধ লিখে দেন এবং O.D.B.L.-এ অনুসৃত পদ্ধতি অনুমোদিত করেন।

বিদেশী পণ্ডিতদের এই যে আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান চর্চায় অনুরাগ তার প্রভাব যে এদেশী পণ্ডিতদেরও ছুঁয়েছে সুনীতিকুমার তার একমাত্র প্রমাণ নন। Les Chants Mystique de Kanha et Saraha-প্রণেতা ডঃ মহম্মদ শহিদুল্লার মতো ব্যক্তিরাও রয়েছেন। সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যে এসে যাঁরা ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবল মনোযোগী, প্রকৃতপক্ষে নিবেদিত হলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ সুকুমার সেন অগ্রগণ্য। কিন্তু ঢেউ যে স্বদেশ-প্রেমের আবেগ-তাড়িত হয়ে অন্য কাউকেও ছুঁয়েছিল ভাসিয়েছিল তার প্রমাণ গোপাল হালদার।

২

স্বদেশ-প্রেমের আঁচে তাঁর শৈশব কেটেছিল। কৈশোরের রোমান্টিক ভাবনা—প্রথম কলেজ জীবনও যে বিশিষ্ট রূপ পাচ্ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ 'রূপনারানের কূলে'-তেই গোপাল হালদার দিয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহ কি সেই আশৈশব স্বদেশ-মনস্কতার একটি প্রকাশ নয়?

> লাউন্সবারির ইংরেজি ভাষার ইতিহাস হাতে পেয়েছিলাম, পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে ক্রমে তাতে একটা স্বাদ পেয়ে গেলাম। মজা লাগল—বাঃ রে বাঃ! এত রহস্য শব্দের মধ্যে, তার রূপ ও রূপান্তরের ইতিহাসে! ভাষার ইতিহাস দেখছি জাতির ইতিহাস,

> সংস্কৃতির ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস। একেবারে মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত সব ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাষার ভেলায় মনোবুদ্ধি কোথায় যায় ভেসে ভেসে! বেশ মজা এই নতুন ঘাট পেরিয়ে নতুন দেশ দেখা। আর সেই উপলব্ধিতেই প্রথম মনে হ'ল ইংরেজি ভাষার জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা কী কাজটাই না করেছেন। কিন্তু বাঙলা ভাষার জন্য কী করেছি আমরা বাঙালিরা?[৩]

এই চিন্তা থেকেই সুনীতিকুমারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া দাদা রঙীন হালদারকে নিয়ে। সুনীতিবাবু যে আগ্রহী কাউকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করতেন না সে কথা গোপাল হালদার মশাই কৃতজ্ঞতার সাথে সদাসর্বদা জানান—কি আলাপচারিতায় কি তাঁর আঁকা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্রগুলিতে।[৪] তারই ফলে শুরু হল ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা।

> ও-ডি-বি-এল পড়া শেষ করে কথা হয়েছিল ব্রজবুলি সম্বন্ধে কাজ করবার। বিদ্যাপতি ও মৈথিলী পড়তে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দরকার মতো যাই। সুনীতিবাবুর কথামতো এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে কিনে নিলেম এ. জি. গ্রিয়ার্সনের মৈথিলী ক্রিষ্টোম্যাথি ও গ্রামার।[৫]

এই পড়া থেকে যে কাজটি তাঁর বেরিয়ে এল তা হল **The Language of Vidyapati**। বলা বাহুল্য সমগ্র মৈথিলী ভাষা কিম্বা সম্পূর্ণ ব্রজবুলি সাহিত্য তাঁর বিষয় ছিল না। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর এই কাজটি আমরা যোগাড় করতে পারিনি।[৬] তিনিও স্মরণ করতে পারছেন না কাজটি কোথায় গেল। কিন্তু সমস্যার নানান দিক সম্বন্ধে তাঁর তখনকার চিন্তা তাঁর কথাতেই তুলে দিই:

> বিদ্যাপতির কালে যে মৈথিলী ছিল সে মৈথিলী লোকমুখে এখন অনেক বদলে গিয়েছে—কবিতায় অবশ্য পুরনো ধাঁচই তখন সচল। বাঙালির পক্ষে বিদ্যাপতির মৈথিলী আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়—তাকেই তো গ্রহণ করে বাঙালি বৈষ্ণবরা এক-দিকে বিদ্যাপতির ভাষা আরও কিছুটা বদলে বিদ্যাপতিকে বাঙালি বৈষ্ণব করে ফেলেছিলেন; অন্যদিকে সেই মডেলেই ব্রজবুলি পদাবলী রচনা করতে থাকেন। তখনকার আসামেও ব্রজবুলি পদাবলী আছে বেশ-কিছু, তাও ব্রজবুলি সাহিত্যের মধ্যে গণ্য। এসব অবশ্য আগেই স্বীকৃত, ও-ডি-বি-এল-ও

> পড়েছি। তবে কিছু কিছু তথ্য গ্রীয়ার্সন তাঁর ব্যাকরণে দিয়েছেন। (লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে তার নমুনা রয়েছে)। গ্রায়ার্সন মনে করতেন মৈথিল কেন, সমস্ত বিহার অঞ্চলের ভাষার কথিত রূপ গত ৩/৪ শত বৎসরে এত পরিবর্তিত হওয়ার কারণ সম্ভবত যেখান থেকেই হোক ও অঞ্চলে মুষাহির প্রভৃতি শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত (যাযাবর?) উপজাতিদের প্রবেশ ও বিস্তার। এ তত্ত্ব কে বিচার করবে? আমার দৌড় 'বিদ্যাপতি ও তার ভাষা' পর্যন্তই পৌঁছেছিল।[৭]

বিদ্যাপতির ভাষা গত শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে এই শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্যন্ত বিতর্কিত বিষয় ছিল। জন বীমস্ Extremely Eastern Hindi এবং Old Maithili বলে মনে করতেন এই ভাষা।[৮] গ্রীয়ার্সন ভাবতেন বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলীই, কিন্তু ব্রজবুলি হল: **a kind of bastard language neither Bengali nor Maithili**।[৯]

১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ সুকুমার সেনও মোটামুটি এই প্রকার মিশ্রভাষা (**mischeprache**)-র সপক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন:

Brajabuli is a *mischeprache*, Maithili is the basic part, while Bengali, with oddments of Hindi and Brajabhaka, forms the superstructure, Brajabuli.[১০] কিন্তু পরে তিনি এর মূল বলে মনে করেছিলেন অবহট্‌ঠ ভাষাকে, যে অবহট্‌ঠ ছিল সমগ্র উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গৃহীত কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।[১১] গোপাল হালদারের মতে অবশ্য ব্রজবুলি অবহট্‌ঠ মূল কিন্তু মৈথিল মিশ্র। ডঃ সুকুমার সেনের মতও এখন এইরকম। তার প্রমাণ:

> ব্রজবুলির মূলে আছে প্রধানত দুইটি ভাষা। একটি অবহট্‌ঠ, অপরটি মৈথিল।...ব্রজবুলিতে মৈথিল অংশই বেশি। এ মৈথিল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দের ভাষা। বিদ্যাপতি এই ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ের কথ্যভাষা হুবহু এইরকম ছিল না।[১২]

বিদ্যাপতির ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা বিস্তারিত করা নিষ্প্রয়োজন। গোপাল হালদার বলছেন, 'স্বভাবদোষে গবেষণার অন্য একদিকে দৃষ্টি গেল। বাঙলা উপভাষার দু একটি ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা করতে যাই।...ডায়ালেকটে হাত দিয়েছিলাম।...প্রথমে নিই নোয়াখালির উপভাষা।'[১৩]

এ ব্যাপারে তাঁর প্রকাশিত গবেষণা-নিবন্ধ হল: **A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali District of the South-Eastern Bengali**।[১৪]

নোয়াখালি ছিল শ্রীহালদারের বড় হয়ে ওঠার জায়গা, তাঁর শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবনের স্থান। সে স্থানের উপভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আবাল্য। গ্রীয়ার্সনের **Linguistic Survey of India**-র (**L. S. I. vol. V Pt. I**) পঞ্চম খণ্ডে অন্যান্য উপভাষার সঙ্গে নোয়াখালির কথাও আছে। কিন্তু গ্রীয়ার্সন বিদেশী সাহেব। তাঁকে দু-একটি লোক যেভাবে বুঝিয়েছেন তিনি সেভাবে বুঝেছেন। গোপাল হালদার শুরু করলেন অন্যভাবে। 'মডেল ছিল সুনীতিবাবুর লেখা বেঙ্গলী ফনেটিক রীডার।'[১৫]

কাজটি শুরু হয়েছে ১৯২১ সালের জনগণনায় প্রাপ্ত জনসংখ্যা দিয়ে। সন্দ্বীপের জনসংখ্যা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেই তিনি **L. S. I.**-র সম্পাদকের অর্থাৎ গ্রীয়ার্সনের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন পাদটীকার মাধ্যমে। **L. S. I.**-এর সম্পাদক মনে করেন যে নোয়াখালির সন্দ্বীপের উপভাষা হচ্ছে: **A curious isolated example of the Eastern Bengali spoken in Dacca District**. কিন্তু শ্রী হালদারের অভিমত হল:

> **Speech of the common people of Sandip, as heard on the mainland, forces on us the conclusion that it belongs to the South-Eastern Group of Bengali, and as such it is taken to be until further enquiry and proof make us retreat.**

একটি কথা এখানে বলে রাখা আবশ্যক। তা হল **dialect** বা উপভাষা কী। ইংরেজীতে যাকে ডায়ালেক্‌ট বলে উপভাষা তারই বাংলায় চলতি নাম, যদিও সুনীতিকুমার তার নাম দিয়েছিলেন প্রাদেশিক ভাষা। প্রাদেশিক ভাষা বা উপভাষা আলাদা কিছু ব্যাপার নয়। তা মূল ভাষারই অন্তর্গত এবং অংশবিশেষ। একই ভাষায় বহু উপভাষা থাকে। একসময় যখন সংবাদপত্র, ছাপানো বই, বেতার, টেলিভিশন ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত ব্যাপক ছিল না তখনই মূল ভাষায় ও উপভাষায় পার্থক্য ঘটে যায় স্বাভাবিক ভাবেই। আবার সেই সঙ্গে লক্ষণীয় এই উপভাষায় উপভাষায় পার্থক্য প্রায়ই ধ্বনিগত (**phonetic**), গঠনরূপগত (**morphological**) নয়। ফলত চট্টগ্রামের উপভাষা বা মানভূমের উপ-

ভাষা আলাদা হলেও দুটোই বাঙলা, অন্য কিছু নয়। বিভিন্ন সন্নিহিত জেলা বা অঞ্চলের উপভাষায় আবার কিছুটা মিল দেখেই তাদের বড় বিভাগের মধ্যে ফেলা হয়। বাঙলার প্রাদেশিক বা উপভাষা সমূহের মধ্যে তেমনি পাঁচটি বিভাগ: পশ্চিম-মধ্য (রাঢ়ীয়), পশ্চিম-দক্ষিণ (পশ্চিম রাঢ়ীয়), উত্তরবঙ্গীয় (বারেন্দ্রী), মধ্যপূর্ব (বঙ্গাল বা সমতট), দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব (চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট-কাছাড় প্রভৃতি)।[১০]

গ্রায়ার্সন যে সন্দ্বীপের ভাষাকে ঢাকা জেলার ভাষার উদাহরণ বলেছিলেন তা তিনি অস্বীকার করে নোয়াখালির ভাষা বলে ঘোষণা করলেন ধ্বনিবিচার ও গঠনরূপ বিচার করে। গ্রায়ার্সনের ভুল হবার কারণ কি? তা হল সন্দ্বীপের অধিকাংশ উচ্চস্তরের লোকই নিজেদেরকে ঢাকা-বরিশাল জেলা থেকে আগত বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁর তথ্যদাতাও তাঁকে ভুল সংবাদ দিয়েছে।

নোয়াখালি উপভাষার এই ধ্বনিগত বিচারে ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হওয়াতে বিষয়টি সর্বপণ্ডিতমান্য বৈজ্ঞানিকতার মান লাভ করেছে। এর কৃতিত্ব বহুল পরিমাণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসেরও। স্যার আশুতোষের নির্দেশে ইউনিভারসিটি প্রেস OBDL-এর মতো বইও ছাপিয়েছিল ১৯২৬ সালে। সেইরকম নির্ভুল ছাপার কাজ, দরকার মতো **diacritical marks** ও **international phonetic symbol**-এর হরফ নির্মাণ, তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অতুলচন্দ্র ঘটক, চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট কালিপদ দাস প্রভৃতি বিষয় ও ব্যক্তির প্রশংসা যাবৎ O.D.B.L.-এর মূল্য তাবৎ কালই থাকবে।

নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল **Journal of the Department of Letters (University of Calcutta)**-পত্রে এবং প্রকাশিত হল ১৯২৯-এ। নিবন্ধটির ব্যাপ্তি মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠা, কিন্তু গভীর অনুশীলন, সূক্ষ্ম-বিচার ও পরিশ্রমের স্বাক্ষরবাহী। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-বিশ্লেষ ও ফোনেটিক লিপ্যন্তরে প্রকাশের দ্বারা আসলে বাংলা ভাষা-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্তরের উপকরণ সংগ্রহের কাজের সূচনা হল।

এটি প্রকাশিত হবার পরই ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গুরুস্থানীয় দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের প্রশংসাবাণী চলে এল। গ্রীয়ার্সন পর্যন্ত সন্দ্বীপের ভাষা নিয়ে গোপাল হালদারের বিশেষ অভিমত লক্ষ করে আকৃষ্ট হয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

ধ্বনিবিচারের পর হল নোয়াখালি উপভাষার ব্যাকরণ রচনা। নাম দিলেন A Skeleton Grammar of Noakhali Dialect। কিন্তু ১৯২৬-এ শুরু ধ্বনিবিচারের কাজ ১৯২৯-এ যেমন প্রকাশিত হল তেমনি তখনকার কাজ এই ব্যাকরণ-সার ছাপাখানা থেকে বেরোতে না বেরোতে গোপাল হালদার চলে গেলেন জেলে। দপ্তরখানার হিসাবে তিনি ২৯ এপ্রিল ১৯৩২-এ কারারুদ্ধ এবং ছাড়া পেলেন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮। পড়ে রইল বাইরে যন্ত্রস্থ উপভাষার ব্যাকরণ। কিন্তু আরও কিছু ছিল বাইরে। তা হল গুরু সুনীতিকুমারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহিত শুভানুধ্যান!

> আপনার Grammar of Noakhali Dialect—University Press-এ ছাপা হইতেছে। সমস্তটির তিনটি প্রুফ আমি দেখিয়া দিয়াছি, প্রথম ফর্মার Print order কাল দিলাম। মাস দুই আরও লাগিবে সবটার ছাপা সম্পূর্ণ হইতে। ৫০ খানি off-print-এর ব্যবস্থা করিতেছি। একেবারে তৈয়ারী প্রবন্ধ পাঠাইব। (চিঠি—২১।৫।১৯৩২).
>
> আপনার প্রবন্ধ Noakhali Dialect Grammar এতদিনে Journal of the Department of Letters-এর জন্য ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। আমি প্রায় সমস্তটার দুইটি প্রুফ দেখিয়া দিয়াছি—পূজার পরেই ছাপা হইয়া যাইবে আশা করি। (চিঠি—২০।৯।১৯৩২)
>
> Grammar of Noakhali Dialect শেষ প্রুফ দেখিয়া দিয়াছি, ছাপা হইলে পাঠাইয়া দিব। (চিঠি—২৪।২।১৯৩৩)[১৭]

এমন গুরু এমন বন্ধু থাকলে চিন্তা কি! সুতরাং শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়ে তা বেরোল[১৮]। ধ্বনিবিচারের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর আদর্শ আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত উচ্চারণ-বিশ্লেষণ, এক্ষেত্রে তেমনি চিরায়ত ব্যাকরণ। যেমন Noun, তার inflection ও inflectional cases(Nominative, Dative,Objective, Genitive & Locative)—Case postpositions, Plural, Pronoun—Pronominal Derivatives, Numerals, Verb, তার tenses—Participle (যেমন, Present : আমি খারাৎ হুইনলাম—I heard it standing. Past : হুনা কথা—a story heard), conjunction, Verbal Nouns, Causative, Passive Voice, Duplicated verbs, Substantive verbs, Affixes, Compounds, Syntax ইত্যাদি নিয়ে প্রথাগত 'ব্যাকরণের মধ্যে ফেলে ভাষার আলোচনা। এই তো বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভিত্তির উপকরণের কাজ।

> **The palace of comparative grammar cannot be built without bricks and the bricks are made up of the facts of each particular language.**

একথা গ্রীয়ার্সনের, এবং O.D.B.L.-এর মুখবন্ধে মুদ্রিত। গোপাল হালদারের কাজ ইমারতের সেই ইঁট নির্মাণের কাজ। তুলনাটিকে আর-একটু নির্ভুল করতে গেলে বলতে হয় O.D.B.L. যদি Comparative Grammar-রূপ প্রাসাদের ইঁট হয় তাহলে সেই ইঁটের মশলা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্বের এই বিশ্লেষণমূলক কাজ।

আলোচক হিসাবে এবং গবেষক-ছাত্র হিসাবে গোপাল হালদার একাগ্র-চিত্ত বা একসমস্যাভেদব্রতী নন। একই জিনিসের যে বহু aspect থাকে সেই নানান aspect-এর বা প্রসঙ্গের দিকে তাঁর চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল শিশুর মতো ধাবমান। নিঃসন্দেহে এই প্রবণতা দোষের কেননা এতে গবেষণা-কাজের ক্ষতি হয়। 'স্বভাবদোষে গবেষণার অন্য একদিকে দৃষ্টি গেল' কিম্বা 'ততদিনে স্বভাবদোষে অনেক দিকে চোখ যায়। সাহিত্য, পলিটিক্স ইত্যাদিতে ঝোঁক বাড়ে'—এই জাতীয় পংক্তি 'রূপনারানের কূলে' বইটির পাঠকেরা বারংবারই পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ দোষও গুণে পরিণত হয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে।

তাই তাঁর সংগৃহীত উদাহরণ শুধু ভাষার দিক থেকেই কৌতূহলের কারণ হয় না—তা কখনও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সরলতা, কখনও বা চাতুর্য, কখনও বা হিন্দু-মুসলমান কখনও sophisticated ও unsophisticated-দের মানসিক স্তরের দ্বন্দ্ব—কখনও উভয়ের সংস্কৃতির চর্চার দ্বৈততা ইত্যাদি নানান সমস্যার ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। প্রসন্ন কৌতুকে ভরপুর নিচের উদাহৃত কথোপকথনের অংশটুকু ধরা যাক :

১ বাউ টাউনফলের মইদ্ধে এইডা কি অয় ?

২ আইজ্জা নাডক আছে।

১ তই আমরা চাইতাম হা (ফা) ইত্তাম ন ?

১ ফু (হু) ইছা আইন্‌ছ নি ?

১ ফু (হু) ইছা ত নাই বাউ।

২ হেইলে ফাইত্তা ন'।

> ১ বাবু টাউনহলের মধ্যে এইটা কি হয় (হইতেছে) ?
>
> ২ আজকে নাটক আছে।

১ তবে আমরা চাইতে (=দেখিতে) পারিব না ?
২ পয়সা আনিয়াছ কি ?
১ পয়সা তো নাই, বাবু।
২ তাহা হইলে পারিবে না।

(লোকটি বর্ণনা করছে নাটক-দর্শনের অভিজ্ঞতা)

১ ছমনে নীল ফর্দ্দা। আঁই রেনি রইছি, আচম্বিতে বাশি হুগইচ্ছে, আর ফর্দ্দা উডি গেছে! আইঁত আচানক! ছমনে দেই কি, কি মন্‌জার এক ফর্দ্দা! ইনজিল আছে, বোঁট আছে, জায়াজ আছে, নদির কুলে কি বাক্কা তেমালা দালান! আঁই রেনি রইছি, বাশি হুঅইরল আর ফর্দ্দা হিয়েন উডি গেল। তার বাদে কোনো ফোলা-হগল্ সাজি আই কি গীত গাইল', ফরি-হগলের নাইন নাইচ্‌ল'; কোনো আসল ফরি ন' সাজি আইছিল আরি। তার বাদে আ-আর বাশি হুগইচ্ছে, আর ফর্দ্দা উডি গেছে। দেই, বাউ-হগল সাজি আই কিচ্ছা কইল' জুদ্ধ কইল্ল। বাশি হুআরে আর ফর্দ্দা উডি জায়, আর হেতেনে রা কিচ্ছা কয়।
২ তই বুইবুগা, আসল দেইকৃলা কি ?
১ ফর্দ্দা উডে-য়াল্লামে, ফর্দ্দা উডে-য়া-ল্লামে—আসল দেওনের হিয়েন।
২ কা? গীত হুইন্‌লা না ?
১ আহ্বোড' ন কোনো জুইৎ ধরে ন'। বাউ, হাছা কতা কইত কি; হেইদিন্না জেন জাত্রা অইল, উকিল বিনদ বাউর বাইৎ, রেবতীর দলের, আহেঙ্গা ত' ন হিয়েন্-এ ভালা লাইগ্‌জে।
২ কা?
১ বাউ, জুম লাইগ্‌জিল হিয়েনে। আমনেগো ইন্দুগো কতা-আরি—আমরা কিছু বুঝি ন, ত-ও, বাউ, জুম লাইগ্‌জিল হিয়েনে।

… … … …

ইয়েনে তো কেওল ফর্দ্দা উডে-য়া-ল্লামে, উডে-য়া-ল্লামে, এই-এ। তও মাইন্নে ইয়েনে কিল্লাই টেঁআ-হুইছা দি আই-এ—আঁই তাইজ্জব।

১ সামনে নীল পর্দা আমি তাকাইয়া রহিয়াছি; আচম্বিতে বাঁশী শব্দ করিয়াছে আর পর্দা উঠিয়া গিয়াছে। আমি ত চমৎকৃত। সামনে

দেখি কী মজার এক পর্দ্দা। ইঞ্জিন আছে, বোট আছে, জাহাজ আছে, নদীর কূলে কি সুন্দর তিনতলা দালান। আমি তাকাইয়া রহিয়াছি, বাঁশী শব্দ করিল, আর পর্দ্দা সেখানে উঠিয়া গেল। তারপর ছোকরারা সাজিয়া আসিয়া কি গীত গাহিল, পরীদের ন্যায় নাচিল, কিন্তু আসল পরী নয়, সাজিয়া আসিয়াছিল মাত্র। তারপর আবার বাঁশী শব্দ করিয়াছে, আর পর্দা উঠিয়া গিয়াছে। দেখি, বাবুরা সাজিয়া আসিয়া কথা কহিল, যুদ্ধ করিল। তা বাঁশী শব্দ করে আর পর্দ্দা উঠিয়া যায় আর তাঁহারা কথা কহেন।

২. তা বুড়া, আসল দেখিলে কি?

১. পর্দ্দা উঠে আর নামে, পর্দ্দা উঠে আর নামে, আসলে দেখিবার ইহাই।

২. কেন? গান শুনিলে না?

১. আমাদের নিকট যেন সুবিধার লাগিল না। বাবু, সাঁচ্চা কথা কহিতে কি, সেইদিন যে যাত্রা হইল, উকীল বিনোদবাবুর বাড়ীতে রেবতীর দলের, আমাদের নিকট সেইখানেই ভাল লাগিয়াছে।

২. কেন?

১. বাবু আমোদ পাইয়াছিলাম সেইখানেই। আপনাদের হিন্দুদের কথা বটে—আমরা কিছু বুঝি নাই। তবুও, বাবু, আমোদ পাইয়াছিলাম।

... ...

এইখানে কেবল পর্দ্দা উঠে আর নামে, উঠে আর নামে, এই-ই। তবুও মানুষ টাকা পয়সা দিয়া কি জন্য এখানে আসে—আমি অবাক হই।

এ কি কেবল ভাষাতত্ত্ব চর্চা, নাটক বনাম যাত্রার বিতর্কের একটি নমুনা ক্ষেত্র-সমীক্ষাও কি একে বলা যায় না?

৩

কারারুদ্ধ হবার পর শ্রীযুক্ত হালদার অনেকগুলি ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুনীতিকুমার বারে বারে লিখছেন:

বিক্রমপুরের ভাষা সম্বন্ধে থিসিসটি পুরা করিতে হইবে। তারপর পূর্ব-প্রস্তাব মত পূর্ববঙ্গের তাবৎ উপভাষা লইয়া বড় Thesis, Ph. D-র জন্য লিখিয়া ফেলিতে হইবে। (চিঠি—২১।৫। ১৯৩২)[১৯]

প্রাদেশিক ভাষার নমুনা সংগ্রহকার্য কি রকম চলিতেছে, কাজ কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে, আমায় সময়মত জানাইবেন। (চিঠি—১২।৭।৩২)[২০]

আমি আপনার জন্য যে Instruction for research লিখিয়াছিলাম, সেটী এতদিন খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সেটী এখন পাইয়াছি, এই সঙ্গে পাঠাইতেছি, আশা করি সরকার বাহাদুর একটী আপনাকে দিবেন, কারণ ইহাতে কেবল আপনার research work in the philology of the Bengali Dialects-লইয়াই কথা আছে। আপনি যথা সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন এবং অনালোচিতপূর্ব dialects-এর সম্বন্ধে তথ্য লউন। Linguistic Survey-র পিছনে যে প্রশ্নাবলী আছে সেটির অনুবাদ যতগুলি সম্ভব অনালোচিতপূর্ব ভাষায় পান করিয়া লউন। (চিঠি—২০।৯।৩২)[২১]

Down-hearted থাকিবেন না—কর্মবাদী হিন্দুর কাছে সব suffering-এর অর্থ আছে। আরব্ধ গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করুন। (চিঠি—৪।১২।৩২)[২২]

Noakhali Vocabulary এখন পাঠাইবেন না, পরে লইব। (২।২।৩৩)[২৩]

এ তো গেল কাজের তাগাদা ও নির্দেশ। সেই সঙ্গে সহযাত্রী গবেষকদের উষ্ণ প্রশংসাবাক্যে উৎসাহিতও করে তুলছেন:

এবার ইউরোপে অল্প কয়েক সপ্তাহ মাত্র ছিলুম, কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর। সব বিষয়ে 'প্রবাসী' বা অন্য কাগজে লিখেছি। প্রচুর self-confidence নিয়ে ফিরেছি। আমাদের Calcutta Group of Indian Linguistician-এর নাম বাইরে হয়েছে। বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন—তিন জায়গায় বেশ পরিচিত আপনি, মনোমোহন ঘোষ, সুকুমার সেন। R. Wagner, Jules Bloch, R. L. Turner সকলেই আপনাদের কাজের সুখ্যাতি করলেন। (চিঠি—৩।১০।৩৫)[২৪]

বিলাতে এবার মাত্র দুইমাস সাতদিন ছিলাম।…আমার কাজের সঙ্গে অনেকে পরিচিত—তাহা অবশ্য আমার পক্ষে আনন্দের কথা—কিন্তু আরও বেশী আনন্দের কথা সুকুমার, আপনি ও মনোমোহন ঘোষ—আপনাদের অনেকে চেনে, আপনাদের গবেষণার আদর করে।

বের্লিনে ভাগনর, পারিসে ব্লক, লণ্ডনে টার্নার—উঁহারা প্রশংসার সহিত সুকুমার ও আপনার গবেষণার উল্লেখ করিয়াছেন। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—আপনি মুক্তি পাইয়া আবার পূর্ণ উৎসাহে কাজে নামিবেন, আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবেন, আমরা এই আশায়ই আছি। (চিঠি—শ্রীপঞ্চমী, ১৩৪২)[২৫]

এই তাগিদে, উৎসাহে, আনুকূল্যে দুটি কাজ তাঁর সম্পূর্ণ হল, অন্তরীণ অবস্থায়। একটি হল **A Short Study of the Bikrampur Dialect of East Bengal.**[২৬] শুধু বিষয়সূচিটি তুলে দিই:

1. Introduction. 2. Phonetic Sketch. [A] Sounds: I. Consonants. II. Vowels [B] Sound Attributes: I. Length II. Stress III. Intonation 3. Outline Grammar [A] The Nouns: *Case Inflexions, Case Postpositions, Case* [B] The Pronouns. *six classes, Pronominal Derivatives, Post positions.* [C] The Numerals [D] The Verb. I The Tenses II The Participles, III The Verbal Nouns, IV Causatives, V Denominatives, VI Duplicated Verbs, VII Compound Verbs, VIII Verbs substantive, IX Regular and Irregular Verbs, X Voice. [E] Afiixes: I Sufiix: *Nominal, Verbal,* II Prefix [F] Compounds: I Tatpurusa etc. [G] Syntax 4. Specimens 5. Some Village Names 6. Appendix I. Some literary compositions, II Songs, III Maps[২৭]

দ্বিতীয় বৃহৎ কাজটি হল **A B :f Note on East Bengal Dialects।** এরও বিষয় তালিকাটি এইরকম *art I* **Phonetics. A. Sounds & their characteristics. 1. Vowe . 2. Consonants. 3. Semi-vowels 4. Combinations of Vowels & Consonants. B. Stress. C. Intonations. D. Sound changes.**

Part II **Grammer. A. Notes on Vocabulary B. Noun: Case & Case inflexions, Number of ways of expressing plurality, Declension Tables. C. Adjectives. D. Articles and Noun modifiers. E. Numerals. F. Pronouns. 1.**

Declension 2 Pronominal Derivatives G Verbs, Conjugational Types, Classes, Simple, Constituted and Compound Verb roots. 2. Tenses and Canjugation Tables. 3. Non-finite Verbs. 4. Pleonastic Aflixes. H. Passive Voice. I. Adverbs and Adverbials. J. Formative Afl xes and Compounds. 1. Nominal Aflixes 2. Verbal Aflixes 3. Prefixes 4. Compounds. K. Auxilliary Words 1. Post positions 2. Conjunctions 3. Participles 4. Interjections. L. Onomatopoeies and Echo Words M. Syntax

এ কাজ ১৯৩২-৩৮-এ জেলে বসে করা হলেও এতে পরবর্তীকালে অধুনা বাংলাদেশ-এ যে সব উপভাষা সংক্রান্ত কাজকর্ম হয়েছে (১৯৭০-এর পর) সেগুলিও দেখা হয়েছে এবং সর্বাধুনিক করে তোলা হয়েছে। যে সব অঞ্চল বিভাগ করা হয়েছে তা LSI এবং OBDL-এর বিভাগ অনুযায়ী করা। ফলত ঢাকা, মৈমনসিং, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, শ্রীহট্ট কাছাড়, করিমগঞ্জ ও ত্রিপুরা রাজ্যের মোট ১১টি উপভাষা এতে আলোচিত হয়েছে। সাদৃশ্য অনুসারে ঢাকা বা মধ্য গোষ্ঠী, পূর্বে মৈমনসিং পশ্চিমে সিলেট নিয়ে উত্তর-মধ্য গোষ্ঠী, সিলেট ও কাছাড় নিয়ে উত্তর-পূর্ব গোষ্ঠী ও চট্টগ্রাম নোয়াখালির ভাষা নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব গোষ্ঠী এই চারটি গোষ্ঠী আলোচিত।

শ্রীযুক্ত হালদার নমুনা সমীক্ষায় দেখেছেন যে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার মধ্যে ৫% তৎসম, ৭০% তদ্ভব, ১২% আরবী-ফারসী, ইংরেজি ১·২৫% (মনে হয়ে ১% হবে নইলে ১০০·২৫ হয়ে যায় যোগে—লেখক), দেশী ও অজ্ঞাতমূল ১২% শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। সরল এবং সর্বজন ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য, যেমন রোজা, নামাজ, পূজা, প্রসাদ ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুস্থানীর প্রচলন গোটা কুড়ি শব্দের বেশি নয়। 'পানি' কথাটি মুসলমানদের মধ্যেই ব্যবহৃত, যদিও হিন্দুরাও ব্যবহার করে কিন্তু কম। আইনসংক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলি উভয় সম্প্রদায়েই সমান। জাতি, পেশা, অঞ্চল অনুসারে ব্যবহার-তারতম্যের পরিমাণ কম।

বিষয়সূচি থেকেই শ্রীযুক্ত হালদারের কাজের ব্যাপ্তি, তাঁর অভিনিবেশ ও পরিশ্রমের পরিমাণ বোঝা যাবে—তথাপি প্রতিমুহূর্তে তিনি একে যে

আধুনিক করে চলেছেন তার প্রমাণ আধুনিক বাংলাদেশের মহম্মদ আবদুল হাইয়ের বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান[২৮]-এর আলোচনাকে তিনি যথোচিত পরীক্ষা সহকারে ব্যবহার ও উল্লেখ করেছেন।

পূর্ববঙ্গের ভাষায় **stress** ও **intonation** নিয়েও তাঁর সিদ্ধান্ত :

> **Stress is not a prominent element in the Bengali Language....Compared to other prominent languages the stress system in East Bengal is of no significance,**

Intonation নিয়েও তিনি যা জানাচ্ছেন তা হল এই :

Intonation or pitch of the voice is not a significant element in Bengali and in East Bengali, as a rule, though, as is known, in the neighbouring Tibet-Burman Languages it is of significance.

সুনীতিকুমারের চিঠি থেকে (২৪।২।১৯৩৩) জানতে পারছি এ বিষয়ে তাঁদের আলোচনা চলছিল :

> আপনার প্রথম জিজ্ঞাস্য···**Initial Stress**-এ স্বর দীর্ঘীকৃত হয় কিনা। আমার প্রথম ধারণা ছিল যে স্বর দীর্ঘীকৃত হয়। কিন্তু লণ্ডনে **Experimental Phonetics** বিভাগে আমার উচ্চারিত "রামা, রাধা, দাদা" প্রভৃতি শব্দগুলির চিত্রলিপি গ্রহণ করিয়া হিসাব করিয়া স্বরাঘাত সত্ত্বেও 'রাধা'ও 'রামা'র 'রা' বা 'দাদা' শব্দের প্রথম 'দা'-অক্ষরটি, দ্বিতীয় অক্ষরের চেয়ে হ্রস্ব, বেশী নয়, অল্প হ্রস্ব। শেষ অক্ষরটাই দীর্ঘতর। আমার ধারণা যে ভুল তাহা যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণিত হইল। স্বরাঘাত থাকিলে স্বরটি পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়—ব্যস্ এই পর্যন্ত, স্বরধ্বনির দীর্ঘ হইবার আবশ্যকতা নাই। ঢাকা ও অন্যান্য পূর্ববঙ্গীয় জেলায় স্বরাঘাত উপান্তে পড়ে বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু এ বিষয়ে ও প্রাদেশিক **Intonation** বিষয়েও অনুসন্ধান এ তাবৎ হয় নাই। "চলিত ভাষার" **Intonation** লইয়া আমার **Bengali Phonetic Reader**-এ অল্পকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। যে পথে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে সে পথের কিছু সন্ধান মিলিবে **Palmer**-এর **Spoken English**-এর মত বইয়ে—যদি বলেন তো ঐ বইখানি পাঠাইয়া দিই। দীর্ঘত্ব স্বরাঘাতজনিত নহে ;

স্বরাঘাত প্রভাবের ফল মোটামুটি বিদিত। "প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষায়ও চলিত ভাষায় স্বরাঘাতের কার্যকলাপ অবস্থান ইত্যাদি ভালো করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু।[২৯]

গোপাল হালদারের আলোচনায় এ ব্যাপারে সাধারণ ভাবে লক্ষিত বৈশিষ্ট্য জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে।

> **The point has however to be noted that in East-Bengali as in other branches of Bengali, West, Central-West etc. each dialectical variety or type is popularly distinguished from the other, or even from its next neighbour, not so much by their differences in the phonetic or grammatical marks, as, according to the speakers of each dialect, by their difference in what they call 'tan' 'flow' or 'Sur' i.e, 'tone'. A tonal variation can really be perceived between the Groups of dialects…**

সত্যিই তো, শিষ্ট কথা বলার সুরেও তো ধরে ফেলি কার বাড়ি সিলেটে, কার বাড়ি মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা বা চট্টগ্রাম।

Syntax সম্পর্কিত আলোচনাতেও দু-একটি কৌতূহলোদ্দীপক পর্যবেক্ষণ আছে। **Use of verb *in perfect tense in complete form in the negetive sentences* over the wide area mainly covered by Mymansing, Sylhet, Kachar and Kommilla**—যেমন : যাইনি অর্থে 'গেসি না'। অথবা চট্টগ্রামী উপভাষায় 'না' শব্দটি 'ন' হয়ে ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহৃত হচ্ছে : **Precedence of arrangement given to the negative word 'na' (Pan-Bengalinā)**, যেমন 'করি না' অর্থে 'ন করি'।

মূল্যবান গবেষণা, কিন্তু এখনও অপ্রকাশিত। সম্প্রতি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এই অতীব মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। এতে সমগ্র বাঙালাভাষী, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সবাই শুধু নয়, সমস্ত ভাষা-বিজ্ঞানপ্রেমী পণ্ডিতজনেরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে উঠবেন সোসাইটির কর্তৃপক্ষ।

ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে গোপাল হালদার আর ওরকম গবেষণায় লিপ্ত হন

নি। গবেষণার ফল প্রকাশে বাধা, মুদ্রণ ব্যাপারে এত কষ্ট, নানান আয়ত্ত-বহির্ভূত বাহ্যশক্তির শৈথিল্য ও বাধা—এ সব তাঁকে নিরুৎসাহ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁর এই গবেষণা পরিত্যাগের হেতু তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল। আগেই বলেছি তিনি প্রসঙ্গান্তরচারী। স্বদেশপ্রেমের টানে ভাষা-গবেষণা, এমনকি সুনীতিকুমারের রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে নিযুক্ত হয়ে কাজ করা—জেলে বসেও কাজ করা। কিন্তু সেই টানেই তিনি নানান দিকে এগিয়ে যান, রাজনীতির কাজে, সাংবাদিকতায়। ভাষাতত্ত্ব ফেলে লোকশব্দ-সংগ্রহের কাজে—সেখান থেকে লোকজীবনের নিরীক্ষায়, শেষে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যান। এর বিবরণ 'রূপনারানের কূলে'-তে দিয়েছেন তিনি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে কথাটি তিনি বলেন নি তা হল এই যে গুরু সুনীতিকুমারের ছিল যা কিছু মানবিক তাতেই আগ্রহ—**Homi sum, humani nil a me alienum puto—I am a man, nothing human is alien to me**—এ তো শিষ্য গোপাল হালদারকেও প্রভাবিত করেছিল। তাই সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে, ভ্রমণে, সংস্কৃতির জিজ্ঞাসায় তাঁর অবাধ বিস্তার। থাক না পড়ে ভাষাতত্ত্ব গবেষণার ফল।

সূত্র-নির্দেশ

১ **Origin & Development of Bengali Language, / Suniti Kumar Chatterjee / George Allen and Unwin ed, 1970, preface, p. XI**

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ IX

৩ রূপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড / গোপাল হালদার। পৃ ১৯২

৪ পরিচয় শ্রাবণ ১৩৮৪, শারদীয় ১৩৮৪

৫ রূপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ ২০১-২। উল্লিখিত বইটি হল: **An Introduction to the Maithili Language of the North Bihar containing a Grammer, Chrestomathy and Vocabulary by Sir George Abraham Grierson.**

৬ এই বিষয়টির manuscriptটি যদি কারও সন্ধানে থাকে তবে তা উদ্ধার করে ছাপানো একটি উচিত কাজ হবে। কাজটির উল্লেখ

করে সুনীতিকুমার লিখছেন: ‘বিদ্যাপতি ও গোপীচাঁদ বোধহয় যেন ইউনিভারসিটিতেই দিয়াছি, এ বিষয়েও তত্ত্ব লইয়া লিখিতেছি।’ দ্রঃ পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৮৪, আগস্ট ১৯৭৭, সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা, পৃ ১৪। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘জীবনকথা’ (সংকলন ও সম্পাদনা: অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯ পৃ ২৪৭)-এ বিষয়ে শ্রীকাঞ্জিলালের টীকা সহ দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গোপীচাঁদ অর্থে গোপাল হালদার কৃত গবেষণা **Gopichand Legend**—এটি ১৯৩০ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত **All India Oriental Conference**-এর ৬ষ্ঠ সম্মেলনে পঠিত ও ১৯৩৩-এ **Proceedings & Transactions of VIth Conference of AIOC**-তে প্রকাশিত হয়।

৭ রূপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ ২০২

৮ **The Early Vaishnava poets of Bengal / John Beames. / Indian Antiquary, Feb., 1873. / On the Age and Country of Bidyapati / John Beames. I. A., October, 1975.**

৯ গ্রন্থনাম পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

১০ **A History of Brajabuli Literature / Dr. Sukumar Sen C. U., 1935, p 1.**

১১ বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড / ডঃ সুকুমার সেন।

১২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ ১০৪-৫ (৪র্থ সং, ১৯৬৩)।

১৩ রূপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ ২০২

১৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি **A Short Sketch of Noakhali Dialect. of SE Bengali** লিখেছেন। স্মৃতিচারণে অল্প কিছু পার্থক্য হতেই পারে।

নিবন্ধ হিসাবে এটি যাতে প্রকাশিত হয়েছে তা হল **Journal of the Department of Letters vol. XIX, C. u. p 1-40**

১৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২০২-২০৪। এছাড়া শ্রীহালদার তাঁর গবেষণা-নিবন্ধে জানাচ্ছেন:

> **The plan for the present paper has been borrowed from that set out by Prof. S. K. Chatterjee in his own study of phonetics of Standard Bengali Colloquial. (A brief sketch of the Bengali Phonetics, International Phonetic**

Association, University College, London, 1921, also, A Bengali Phonetic Reader, London University Press, 1928).

১৬ দ্র. ভারতের ভাষা / গোপাল হালদার / লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ ১০। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গবেষণা-নিবন্ধ না হলেও এটি গোপাল হালদার কৃত ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। অন্যান্য প্রবন্ধ তো তাঁর আছেই।

১৭ পরিচয়, সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ ১১

১৮ **A Skeleton Grammar of Noakhali Dialect of Bengali / Gopal Haldar / Journal of the Department of Letters, Vol. XXIII, Calcutta University Press, 1933.**

১৯ পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৮৪, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃঃ ৩

২০—২৩ ঐ, পৃ ৪, ১৮, ১১, ১৪ যথাক্রমে। এছাড়া, জীবনকথা, পৃ ২৪৭।

২৪ ঐ, পৃ ২১। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে উল্লিখিত অপর দুজনের মধ্যে ডঃ সুকুমার সেনের কথা সবাই জানেন। তবু তাঁর আর মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'রূপনারানের কূলে', দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২০২, ২০৯—২১২।

২৫ পরিচয়, ঐ, পৃ ২৩।

২৬ এ নিবন্ধের **manuscript**-এর ওপর নীল পেনসিলে লেখা **20.10.33, Presidency Jail**।

২৭ প্রস্তাবিত মানচিত্র দুটি হল : (১) **Present day Area** (২) **Renell's Survey**

২৮ দ্র. (ক) **A Phonetic and Philological Study of Nasals and Nasalization in Bengali, 1960, / Md. Abdul Hai.**

(খ) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব—মহম্মদ আবদুল হাই, ১৯৬৪। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই' এই নামে শ্রীহালদারের লেখা প্রবন্ধটি। (পরিচয় ,সমালোচনা সংখ্যা, ১৩৮৩)। সেখানে তিনি আবদুল হাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নূতন নূতন দিগন্ত সম্পর্কে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন।

২৯ পরিচয়, ঐ, পৃ ১৩-১৪

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও 'প্রবাসী'র হাওয়া : গোপাল হালদারের চোখে

অভ্র ঘোষ

বাড়ির আবহাওয়ায় 'তপ্ত স্বাদেশিকতা'র 'বেহিসাবী উদ্দীপনা' না থাকলেও যুগটা ছিল পুরোমাত্রায় স্বদেশীর যুগ। স্বদেশী মানে চলতি কথায় যাকে আমরা বলি সন্ত্রাসবাদ বা টেররিজম। গোপাল হালদার তাঁর কৈশোর-যৌবনে এড়াতে পারেন নি সেই তপ্ত স্বাদেশিকতার হাওয়া। বাড়ির বৈঠকখানায়, মোকামা জংশনে প্রফুল্ল চাকীর আত্মবলিদানের কাহিনী শুনেছিলেন বড়দের আড্ডায় মাত্র ছ বছর বয়সে, আর ওই টুকরো-টুকরো কথার ঝাপসা আলোচনাতেই তাঁর মনে জন্মে যায় স্বদেশী চেতনা। ক্রমে কিশোর বয়সেই নোয়াখালির গুপ্ত সমিতির উষ্ণ আঁচ পেতে শুরু করেন তিনি আর সে-আঁচ আরও নিবিড় হলে নাম লিখিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন স্বদেশী দাদাদের গোপন আড্ডায়। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এইভাবে টেররিজমেই প্রথম হাতে খড়ি হয় গোপাল হালদারের।

স্বদেশী আন্দোলনের এই পর্যায়কে সন্ত্রাসবাদী বা টেররিজম্ বলে আখ্যা দিতে অবশ্য আপত্তি করেছেন গোপাল হালদার পরবর্তী জীবনে। একথা ঠিকই যে ডাকাতি-হত্যা ইত্যাদি বিশেষ ধরনের কর্মপদ্ধতিই ছিল বিপ্লবীদের নানা উদ্যোগ। গোপাল হালদার লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় যে, এমনকি অরবিন্দও নাকি এ-জাতীয় টেররিস্ট উদ্যোগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সবাই কি তা চাইতেন? পি. মিত্র জাতীয় গোঁড়া অনুশীলনবাদীরা তো এ জাতীয় কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কোনো-কোনো দল তো গুপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলে প্রথমে বিদ্রোহ এবং ক্রমে গেরিলা যুদ্ধের কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ডাকাতি-গুপ্তহত্যার পাঁকে সব বিপ্লবী দলগুলিকে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও এই জাতীয় স্বদেশী গুপ্ত আন্দোলনের কোনো কেন্দ্রীয় সমিতি তখন্ গড়ে ওঠেনি ভারতবর্ষে, এমনকি বাংলাদেশেও না। ফলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নানা পর্বে নানা বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও চরিত্র নিয়ে। তাদের আদর্শও বিবর্তিত হয়েছে। গোপাল হালদার

বলেছেন, "রিভোল্যুশনারি ন্যাশনালিজম থেকে সোসালিজম-এর দিকেই এই বিবর্তন—মোটামুটি। কাজেই শুধু 'টেররিজম' বললেও তার নীতির প্রতি সুবিচার হবে না। এ আন্দোলনের কথা বলতে হলে—বলা উচিত—'জাতীয় বিপ্লববাদ','মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম,' 'বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন', এরূপ কিছু বলাই সমীচীন—'টেররিজম' নয়।" '

বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলনের এই মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে সেযুগের অদ্বিতীয় পুরুষ বিবেকানন্দের 'দুর্জেয় যোদ্ধরূপ', তাঁর 'বীর্যবান স্বাদেশিকতা' ও 'নব্য-হিন্দুত্বের উন্মাদনা' ছিল আর-এক প্রবল কারণ। গোপাল হালদার লিখেছেন, "সেই বারো বৎসর বয়সে বাঙলা লেখার মধ্য দিয়েই প্রথম পেলাম বিবেকানন্দের স্পর্শ—আগুনের পরশমণি।'[২] আর্তের সেবা, নির্ভীকতা, ত্যাগ, সংযম ও বীর্যবান অপরিমেয় স্বদেশানুরাগ—এসবের সম্মিলিত আদর্শে বিবেকানন্দ উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন সেকালের যুবমানসকে। রামকৃষ্ণ মঠের নিছক ধর্ম-চেতনা নয় নিবেদিতার বিবেকানন্দ, রঁলার বিবেকানন্দ-ই ছিলেন বিপ্লবী যুববদের সক্রিয় অনুপ্রেরণা। রাজযোগ-জ্ঞানযোগ নয়, তাঁর কর্মযোগ-স্বদেশপ্রীতি ছিল সে-যুগের বিপ্লবীদের উন্মাদনার প্রধান উৎস। গোপাল হালদারের পক্ষে অবশ্য এই উন্মাদনার সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটা ছিল আরও প্রত্যক্ষ। কেননা বাড়ির অন্দরমহলে ছিল রামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের এক ভক্তিপূর্ণ আবহাওয়া আর সেই সূত্রে উদ্বোধন-প্রকাশিত বিবেকানন্দের বাংলা রচনা ও নটেশন্-প্রকাশিত ইংরেজি বক্তৃতাবলির স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন কৈশোর থেকেই।

রক্তের ফোঁটা কপালে না এঁকে, কালীপুজো না করেই গোপাল হালদার দীক্ষা নিয়েছিলেন নোয়াখালি শহরের বিপ্লবী গুপ্তদলে। এই দল বিশ্বাস করত যে, 'অনুষ্ঠান দিয়ে মানুষকে বাঁধা যায় না। বন্ধন—স্বদেশ-প্রীতির, নীতিবোধের, ধর্মবোধের। অবশ্য তা বলে উনিশ শতকের হিন্দু-জাতীয়তা-বাদের আবহাওয়াকে এড়িয়ে এই গুপ্ত সমিতি একটা সেক্যুলার চরিত্র পেয়েছিল সে-কথাও বলা যায় না। বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর শঙ্কর মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই সমিতি। আর তার সান্নিধ্য-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে গোপাল হালদার বলেছেন, "ধর্মের ঝোঁক এ দলেও ছিল প্রবল, দেবদেবীতে অনাস্থা নেই, পূজা-হোমেও না। কিন্তু স্বামিজী অদ্বৈতবাদী, 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ। তাঁর শিষ্যরাও ওই কারণেই অনেক আনুষ্ঠানিক উৎকটতায় আস্থাহীন।"[৩] কৈশোর আর

যৌবনারম্ভের কাল এই 'অগ্নিস্পর্শে'ই কেটে গেছে গোপাল হালদারের। পড়ার ঘরের আলমারিতে পাঠ্য বই-এর পেছনে সযত্নে লুকনো থাকত তখন সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', মাৎসিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনী, অক্ষয় মৈত্রের সিরাজদ্দৌলা আর স্কুল-লাইব্রেরি থেকে চুরি করে আনা গেরিলা-যুদ্ধের নানা বই। রডা কোম্পানির চোরাই মাল একটি 'মশার পিস্তল'ও ছিল বহুদিন এসব বই-এর সঙ্গে ঐ আলমারিতে।

একই সঙ্গে গোপাল হালদারকে আবিষ্ট করে রাখত সে-যুগের সাহিত্য-কৃষ্টি। বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে তাঁর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হয়ে উঠত। "সাহিত্যসাধনা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম—মূলত একই সত্যের দু-পিঠ"—এ-রকম এক বিশ্বাস তাঁকে বরাবরই আত্মশক্তি উদ্বোধনে সাহায্য করেছে। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, "প্রথম থেকেই সাহিত্য আমার কাছে স্বাধীনতার প্রেরণার বড়ো পরিপোষক। তাতে যেমন স্বপ্নে মেতেছি, তেমনি অনুভব করেছি পরাধীনতার গ্লানি। তাই যতই এগিয়ে চলেছি ততই এই ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠেছে--আত্মপ্রকাশই হচ্ছে জাতির ও মানুষের সাধনা, তাতেই তার আত্মবিকাশ। সেই আত্মবিকাশেরই একটা পথ সাহিত্য। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে যতই নাগপাশে বাঁধা থাক কোনো জাতি, একবার যদি সে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তা হলে সে নিজে পায় আত্মবিশ্বাস, আর পৃথিবীতে তার পরিচয় হয়ে যায় প্রতিষ্ঠিত। তারপরে রাজনীতিতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রাখা যায় কতক্ষণ?"[৪]

এই আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদেই গোপাল হালদারকে আকৃষ্ট করেছিল সেযুগের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, গুপ্ত সমিতির বিপ্লবাত্মক পরিবেশে যে-কিশোরের দেহ-মন নেচে উঠেছিল এক তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়, সেই কিশোরের আত্মিক মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং ক্রমে 'প্রবাসী'র বিচিত্র ধ্যান-ধারণা। 'প্রবাসী' ছিল প্রায় সে-যুগেরই নাম। বাড়ির অন্দরমহলেও বইত তার স্বচ্ছন্দ হাওয়া। 'প্রবাসী'র কথা স্মরণ করতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন, "মুক্তির এই ব্যাপক আদর্শ আমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হত না—যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শকে পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্দেশ্য তাতে থাকত। রবীন্দ্রনাথের সুস্থ সবল ভাবনা ও আচরণ আমাদেরকে কতকটা সুস্থ রাখল। সমগ্রভাবে জীবনকে বুঝতে শেখাল। সেদিকে 'প্রবাসী'র

সহায়তাও ছিল আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। 'প্রবাসী'র সর্বাঙ্গীন প্রয়াস যতই চোখে পড়ল ততই বুঝলাম 'প্রবাসী' মহাবিদ্যালয়। অন্তত বিশ বৎসর আমরা বাড়িতে তার ছায়ায় পালিত, বর্ধিত, সেও এক অদ্ভুত নেশা। বাঙলা মাসের তেসরা তারিখে দু-ভাই বাদামতলায় ডাক পিয়নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। জানতাম পয়লা তারিখে 'প্রবাসী' কলকাতায় ডাকে দেওয়া হয়েছে, তিন তারিখে তা এখানে আসবেই। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। দিনরাত্রির মতোই নিয়মবাঁধা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা পরিচালনা।"[৫]

সেকস্পীয়র-মিলটন থেকে শুরু করে বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ হালদার-পরিবারের সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। গোপাল হালদারের বাবার আকর্ষণ ছিল সাহিত্যের দিকে, তাঁর আলমারিতে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের বিচিত্র বই। আর রবীন্দ্র সাহিত্য তো নিত্যসঙ্গী। আর সেই সঙ্গে 'প্রবাসী', 'মর্ডান রিভিউ' ছাড়া পাবলিক লাইব্রেরির বিলিতি পত্রিকা 'রিভিউ অব রিভিউজ' ছিল তাঁর অবশ্যপাঠ্য। সাত-আট বছরের বড় দাদা রঙ্গীন হালদারও ছিলেন গোপাল হালদারের সাহিত্যের গুরু। ছাত্রাবস্থা থেকেই রঙ্গীন হালদারকে লোকেরা জানত 'রবিঠাকুরের ভক্ত' হিসেবে। 'বড়ো বড়ো চোখ, ভাবব্যঞ্জক মুখ, আর উদাত্ত কণ্ঠস্বর' নিয়ে তিনি মাতিয়ে রাখতেন আবৃত্তি করে, ছবি এঁকে আর সাহিত্যের তর্ক তুলে। একবার বন্ধুর সঙ্গে তর্ক উঠেছিল "চোখের বালি কেমন বই। সকলে বলছেন, ভালো নয়; হিন্দু বিধবাদের আদর্শ ছোট করা হয়েছে। আর দাদা বলছেন 'না। এতে আঁকা হয়েছে মানুষের চরিত্র,—সাইকোলজি-ক্যাল উপন্যাস"।[৬] এই উৎসাহী দাদার সাহচর্যে গোপাল হালদার অতি অল্প বয়স থেকেই বাংলা সাহিত্যের পাঠ নিয়েছেন বাবার পড়ার ঘরের বই চুরি করে, ক্রমে দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে—ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদও গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন অদম্য উৎসাহে। আর এই দাদার দৌলতেই তিনি অল্প বয়সেই আস্বাদন করেছেন প্রবাসী, সবুজপত্র, নারায়ণ, সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকার বিচিত্র সম্ভার।

স্কুলের মাষ্টারমশাইদের কাছে শুনেছিলেন গোপাল হালদার যে "রবিঠাকুরের কবিতা বোঝা যায় না, আর তিনি 'স্বদেশী'র বিরোধী, হিন্দু সমাজেরও"[৭], কথাগুলি বিমুখ করতে পারত তাঁকে, বিশেষতঃ তখন তিনি স্বাদেশিকতার জোয়ারে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজকর্মে রীতিমতো উৎসাহী।

কিন্তু তা পারে নি। "কারণ—আমার দাদা রঙ্গীন হালদার। আর ও-সব কথার আগেই কানে গেছল বৈঠকখানায় বাবার ও দাদার মধ্যে গল্প আর আলোচনা"।[৮] আলোচনা-তর্ক-পাঠে গোপাল হালদার ক্রমশঃ বুঝে ফেলেছিলেন "স্বদেশীর রূপরসস্পর্শহীন কৃচ্ছ্রসাধনা" একমাত্র সত্য হতে পারে না, "স্বদেশীদলের সংযম, শৃঙ্খলা, নীতিনিয়ম" মেনে নিয়েও শিল্প-সাহিত্যের রূপ-রস-আনন্দের আবেদন অকৃত্রিম, গ্রহণীয়। আর সেই সত্য তিনি আহরণ করেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্য ও দর্শন উপলব্ধি করে। এক জায়গায় বলেছেন, "...বিবেকানন্দের অভীঃ মন্ত্রের সঙ্গে এই আনন্দের আশীর্বাদই আমাদের কালে আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন"।[৯]

রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল সেকালের যুগান্তকারী পত্রিকা রামানন্দের 'প্রবাসী'। 'প্রবাসা' একদিকে যেসব বৃহৎ জগতের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের উদার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনই সেযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সরবরাহ করেছে অকৃপণ ভাবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'-'মর্ডান রিভিউ' প্রসঙ্গে যে কথাগুলি লিখেছিলেন তা এই সূত্রে উল্লেখ করলে 'প্রবাসী'র ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। "বঙ্গদর্শন, ভারতী, বান্ধব, সাহিত্য প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার পরে, এই গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও মডার্ন রিভিউ'র যুগই চলিয়া আসিয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে 'নারায়ণ', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি বিভিন্ন-ধর্মী কয়েকটি পত্র-পত্রিকার উদয় ও অস্তগমন ঘটিয়াছে ; কিন্তু 'প্রবাসী' যেন এতদিন ধরিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে"।[১০] 'প্রবাসীর পঁচিশ বছর পূর্তিতে ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার আরও লিখেছিলেন, "জীবনের নানা দিকে বাঙ্গালী গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তার সব চেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী'ই দিতে পারে। ......আর অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী সে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে নি, পারছে না, বাঙ্গালীর চোখের সামনে 'প্রবাসী' তাও তুলে ধরেছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে উৎকর্ষকামী বাঙ্গালীর সত্য-শিব-সুন্দরের দর্শন, কবি আর শিল্পী বাঙ্গালীর সৃষ্টি, কর্মী বাঙ্গালীর সাধনা ও সিদ্ধি—এক কথায় বাঙ্গালীর ক্যালচর

বা সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে আছে 'প্রবাসী'র দর্পণে" ।[১১]

আবাল্য 'প্রবাসী', মডার্ন রিভিউ', রবীন্দ্রনাথ আর স্বদেশী রাজনীতির আবর্তে লালিত হয়ে গোপাল হালদার কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এলেন নোয়াখালি ছেড়ে কলকাতায়। স্কটিশচার্চেস কলেজে বন্ধু হিসেবে পেলেন সুধীন দত্তকে, পেলেন সজনীকান্ত দাশের সান্নিধ্য। সাহিত্য-রাজনীতি আর আড্ডায় তিনি কলকাতার সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকেও বুঝে নিলেন ধীরে ধীরে। ছাত্রাবস্থাতে তিনি লিখেছিলেন দু-একটি গল্প 'প্রবাসী'র পাতায়, দূর থেকে রামানন্দকে দেখেছেনও কদাচিৎ। প্রায় বিশ বছর ধরে যে রামানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় মাসের পর মাস ধরে চলছিল, যে দুখানি পত্রিকার পাতায় দিনের পর দিন 'অস্ত্র শিক্ষার মন্ত্রলাভ' করে চলেছিলেন তিনি, সেই শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের নিকটে এসে গেলেন গোপাল হালদার "...সম্ভবত ১৯২৭ সালে। যোগাযোগের প্রধান কারণ বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়।...... ১৯২৭-এ সজনী জোগাড় করে দিলে নিয়মিত একটা চাকরি—এই আমার প্রথম চাকরি। 'প্রবাসী' আপিস থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় তখন 'ওয়েলফেয়ার' চালাচ্ছেন। তাতেই আমার আংশিক কাজ"।[১২] ইতোমধ্যে গোপাল হালদার অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যত্বও অর্জন করে ফেলেছেন বাংলা ভাষার ওপর গবেষণা কাজের সূত্রে। আর অচিরেই আড্ডায় জমে গেলেন 'প্রবাসী' আপিসের জমজমাট সাহিত্যের আসরে। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য সাহিত্য-পত্রিকার মতো 'প্রবাসী'র নিজস্ব তেমন কোনো সাহিত্যিক আড্ডা ছিল না। বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ দেখা যেত সেখানে কিন্তু সাহিত্যিক আড্ডার আসর বলতে যা বোঝায় তা তেমন ছিল না। কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকায় চাকুরিরত নবীন সাহিত্যিকদের চেষ্টায় যে 'শনিবারের চিঠি' বাংলা সাহিত্যের আসর মাৎ করে দিয়েছিল তার আড্ডা এই 'প্রবাসী' আপিসেই জমেছিল। গোপাল হালদার লিখেছেন, ওয়েলফেয়ারের "কাজের ফাঁকে ফাঁকে অকাজের আশাতীত অবকাশ থাকত, আর কাজের শেষে বিরামের অমৃতযোগ; অর্থাৎ আড্ডা। কখনও বা অশোক চাটুজ্জের উৎসাহে রাগপ্রধান সংগীতের আসর জমত। চা-এর সঙ্গে চীনেবাদাম হতো চাট, মাঝে-মাঝে ন্যাশনাল হোটেল থেকে আসত ফাউল কাটলেট। নেশা না লাগাই তাই অসম্ভব। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে মিলে যে-

পরিবেশটা সৃষ্টি হল তাতে আমার কাছে 'ওয়েলফেয়ারে'র ঠিকে কাজ প্রাত্যহিক হয়ে উঠল—গবেষণার জন্য লাইব্রেরীতে পাঠের সময়টা কাটা যে পড়ল না তাই আশ্চর্য। সকলের সঙ্গে আমিও জমে গেলাম"।১৩

'ওয়েলফেয়ার' ছিল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দেহচর্চার কাগজ। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দের উৎসাহও ছিল না তেমন এ-কাগজ সম্পর্কে। এমনকি সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহও 'ওয়েলফেয়ার থেকে শনিবারের চিঠিতে' চলে গিয়েছিল। এরকম একটা সময়ে গোপাল হালদার নিযুক্ত হলেন সম্পাদকীয় কর্মে, কাগজটাও হয়ে গেল সাপ্তাহিক। গোপাল হালদার লিখেছেন, "দেহচর্চার কাগজ থেকে আমার নিজের ঝোঁকে ক্রমেই নানা চর্চার কাগজ হয়ে পড়ছিল—সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও শুধু মুষ্টিযোগ নয়, নানা দিকেই ঝোঁক ছিল।......আমার চোখ ছিল সেদিনের 'নেশান এ্যাণ্ড এ্যাথিনিয়মে'র দিকে, আর মার্কিনী সাপ্তাহিক 'নিউ রিপাবলিক'এর দিকে। ভালো লাগত তাদের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক নিবন্ধ, এবং 'এসে' ধরনের লঘু কলমের লেখাও। কিন্তু তা ইংরেজিতে লেখা আমাদের অসাধ্য..."১৪ এবং প্রকৃতপক্ষে সে ধরনের কোনো আশা পূর্ণ করতে পারেন নি, গোপাল হালদার এই 'ওয়েলফেয়ার' কাগজে কাজের সূত্রে। রাজনীতি, সমাজনীতি ছাড়াও সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক রচনাও প্রকাশ পেল সে-কাগজে এবং সব মিলিয়ে তা হয়ে পড়েছিল পাঁচমিশেলি এক সাপ্তাহিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ওয়েলফেয়ারের কোনো লেখা কোনো বিদেশী কাগজে উদ্ধৃত হলে বা উল্লেখিত হলে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে' পাঠিয়ে দিতেন রামানন্দ গোপাল হালদারের কাছে এবং সেটাই ছিল তাঁর বিশেষ পুরস্কার।

'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকার কাজের সূত্রেই গোপাল হালদার খুব কাছ থেকে দেখতে পেরেছিলেন প্রবাসী-মডার্ন রিভিউ সম্পাদনা কাজের নানা খুঁটিনাটি। দেখেছেন, বৃদ্ধ রামানন্দ কি অপরিসীম পরিশ্রম করে প্রস্তুত করতেন 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গের পাতা আর 'মডার্ন রিভিউ'র 'নোটস'। এবং দেখেছেন তাঁর "দু' কাগজের জন্য দু'হাতে সম্পাদকীয় লেখা—নিশ্বাস না ফেলে; এবং নিশ্বাস ফেলার অবসর করে একবার করে অফিসে আসা, আর কিছু না হোক নিজের (ও পরের) লেখার প্রুফ দেখে সেই অবসরটুকুও নিশ্ছিদ্র করে ফেলা"।১৫ সম্পাদকের এই অবিচল নিষ্ঠাতেই 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ' দেশে-বিদেশে খ্যাতি কুড়োতে পেরেছিল। শুধু সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয়, দেশের

অগ্রগণ্য মনীষীদের রচনা সংকলন করে নয়, 'প্রবাসী' হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও এক উল্লেখযোগ্য মুখপত্র। গোপাল হালদার বলেছেন, "...রবীন্দ্রনাথের সে পর্বের লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪ বাং শ্রাবণ), 'পূর্ব ও পশ্চিম' ; 'সদুপায়' (১৩১৩) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তেই প্রকাশিত হয়। তবে সে সব হচ্ছে মূল রাজনীতির আলোচনা যাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টিমূলক রাজনীতি'র বিষয় বলে অভিহিত করতে চেয়েছি। রাজনীতি বা পলিটিক্স বলতে প্রধানত রাষ্ট্রের সাময়িক ঘটনা ও বাস্তব পরিস্থিতির আলোচনা বোঝায় ; দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রের পাতায় তা অপেক্ষাকৃত সুস্থিরতর ও গভীরতর দৃষ্টিতেই করাই সে রাজনীতির নিয়ম। 'প্রবাসী'র সম্পাদকও দেখি সেই বাস্তব কর্তব্যভার অবিলম্বে গ্রহণ করেছেন"।[১৬] জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে 'প্রবাসী'র এই ভূমিকা আরও সফল হয়ে উঠেছে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে 'প্রবাসী'র স্থায়ী বিভাগের সংযোজনায়। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে এই বিশেষ বিভাগে রাজনৈতিক ঘটনা-নীতিকে কেন্দ্র করে নানা মন্তব্য ও গভীর আলোচনা ১৩১৮ থেকেই নিয়মিত ভাবে শুরু হয়। গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন, " 'প্রবাসী'র সমগ্র চারত্রের দিকে তাকালে এখন মানতে হয় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'হীন 'প্রবাসী' অঙ্গহীন 'প্রবাসী'—নিজস্বতা খর্বিত 'প্রবাসী'।"[১৭] 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর মত 'মডার্ন রিভিউ'র 'নোটস্' সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

'প্রবাসী'র আবেদন মূলতঃ স্বদেশেই সীমাবদ্ধ, সে কারণে রামানন্দ ইংরেজি ভাষায় 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশ করার তাগিদ বোধ করেছিলেন। এবং 'মডার্ন রিভিউ'তে রাজনীতির চর্চা ছিল আরও তীক্ষ্ণ, আরও প্রত্যক্ষ। ১৯২৫ সালে আচার্য যদুনাথ সরকার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে 'মডার্ন রিভিউ' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "একজন ঐতিহাসিক সত্যই বলিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসর ইংলণ্ডের ইতিহাস শুধু **Edinburgh Review** ও **English Tory Bureaucracy**-র মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আমার অনেক সময় মনে হয় যে ভারতের গত সাড়ে আঠার বৎসরের ইতিহাস সত্যই মডার্ন রিভিউ এবং ভারতের বিদেশী আমলাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র। এ যুদ্ধে যদি আমাদের সম্পূর্ণ জয় না হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য লোকাচার, দেশের অতীতের জের, এবং জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতাই দায়ী। 'মডার্ন রিভিউ' সম্পাদক **Edinburgh Review**-

এর সম্পাদক হইতে কম করেন নাই" ।[১৮] ভারতের মুক্তি সাধনা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধনে 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী'র ভূমিকা অসাধারণ তাৎপর্যময় হলেও আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্যে যে খানিকটা অতিশয়োক্তি আছে তা ধরিয়ে দেন গোপাল হালদার, "অবশ্য, আচার্য যদুনাথ সরকারের কথায় যে একটু আলঙ্কারিকতা আছে তা মানতেও কোনো বাধা নেই। জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ছোট বড় অজস্র মানুষেই দানেই রচিত হয়, এমন কি শুধু 'জাতির জনকে'র দানে তা সম্পূর্ণ নয়,—এ সত্য হয় তো জীবিত থাকলে 'প্রবাসী' সম্পাদকই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। তেমনি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব কোনো একখানি সাময়িক পত্রের মাত্র প্রাপ্য নয়—'কেশরী'-রও নয়, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'রও নয়, 'মডার্ন রিভিয়্যু'রও নয়। তথাপি মাসিকপত্রের ইতিহাসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন বিভিয়্যু'র মতো ভারতবর্ষে আর কোনো পত্র এই গৌরববের দাবি করতে পারে না। আর ঠিক সে জন্যেই আমাদের ক্যালচর বা শুধু সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের সুবিস্তৃত পরিধির মধ্যে 'প্রবাসী' ও মডার্ন বিভিয়্যু'র এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে দিলে চলে না" ।

জাতীয় স্বাধীনতা ও রবীন্দ্রদর্শন অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' 'গভীর রূপ Committed'-এ কথা জানা থাকলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তায় রামানন্দের পত্রিকাদুটি যে সব সময়ে জনরুচিকর হত তা কখনই বলা যায় না। সম্ভবত রবীন্দ্রভাবনাপুষ্ট ছিল বলেই এটা হত। গোপাল হালদার বিশ্লেষণ করে বলেছেন সেই কথাগুলিই, "গান্ধী যুগ (১৯২১-৪৬) থেকেই 'প্রবাসী' তখনকার উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা-প্রধান রাজনীতির সমালোচক হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান' ও 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি লেখায় বহু লোককে তখন তা অসন্তুষ্ট করে। 'প্রবাসী'র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত হলেও অনেকে মাত্রাতিরিক্ত মনে করেছেন। তার পরে, চিত্তরঞ্জন ও তদনুগামী কংগ্রেস-নেতাদের সমালোচনায় এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতায় 'প্রবাসী'র যুক্তিবাদিতা ও জাতীয়তাবাদ অনেকেরই মনে হয়েছে ব্যবহারিক অর্থে নিরর্থক (আন্-প্র্যাকৃটিকাল) নৈয়ায়িকতা। কিন্তু যে যাই বলুন, খুসী হোন বা রুষ্ট হোন, 'বিবিধ প্রসঙ্গ' তখনো (১৯২০-১৯৩০) সকলের নিকট প্রথম পাঠ্য, গম্ভীর ভাবনার বিষয়।"[২০]

১৯২৬ সালে 'মুসোলিনির দূত' কার্লো ফর্মিচি ও জুইসেপ্পে তুচ্চির চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর ও তৎপরবর্তী ঘটনারাজি যে তীব্র বাদানুবাদের

সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়ে 'প্রবাসী'র ভূমিকা অনেকের কাছেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল। লীগ অব্ নেশন্সের আমন্ত্রণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও জেনেভায় থাকায় 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদনার কাজ করেছিলেন তখন অশোক চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধে অধ্যাপক অবন্তীকুমার সান্যাল লিখেছেন, "সেদিনকার মুসোলিনির গুণমুগ্ধদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে চিহ্নিত হবেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন পত্রিকার 'কর্মপরিচালক'। সামগ্রিকভাবে 'প্রবাসী'র ও মডার্ন 'রিভিউ'র নীতিতে যে এই বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল তা কখনোই বলা চলে না। ......কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের সমকালে প্রবাসীতে শুরু হয় মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট দলের ধারাবাহিক গুণকীর্তন।"[২১] শুধু তাই নয়, ইতালি সফরকালে রঁলার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন বুঝতে পারলেন মুসোলিনির ছলনা, ফ্যাসিস্ট ইতালির স্বরূপ বোঝার পর তিনি যখন জনসমক্ষে জানালেন তাঁর মোহমুক্তির কথা ঐ ইউরোপে বসেই, তখন অশোক চট্টোপাধ্যায় যে-নীতি গ্রহণ করলেন 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'-তে তাও রীতিমতো অস্বস্তিকর। অবন্তীবাবু তাঁর প্রবন্ধে বিস্তৃত লিখেছেন সে-সব প্রসঙ্গ। দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করা যাক তার একটি অংশ, "এণ্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি জুলাইয়ের শেষে বা অগাস্টের প্রথমে পৌঁছাবার কথা। অগাস্টের প্রথমেই 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, ফ্রান্সে তার এক সপ্তাহ পরে, অন্যান্য দেশেও প্রায় একই সঙ্গে সাধারণের গোচরে এসেছে। দুনিয়া জুড়ে সোরগোল উঠেছে। স্বভাবতই প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-র 'কর্মপরিচালক' ও তার 'সাঙ্গোপাঙ্গরা' যে বিচলিত হয়েছেন এটি তারই প্রমাণ। কিন্তু প্রতিশ্রুতিমতো রবীন্দ্রনাথের ফিরে আসার আগে এ বিষয়ে 'কোনো মতামত পোষণ না করা' তাঁরা আর শ্রেয় মনে করতে পারলেন না। তার প্রমাণ মিলল আশ্বিন সংখ্যার 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' বিভাগে। তাতে দীর্ঘ একটি রচনায় 'রবীন্দ্রনাথের ইতালী যাত্রার উদ্দেশ্য', 'রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তন' সম্পর্কে বিস্তারিত সমালোচনায় ইতালি সফরের সমস্ত দায়িত্ব চাপানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মন্ত্রীচতুষ্টয়ের' (ফর্মিচি-তুচ্চি-রথীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র) উপরে, বিশেষ করে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সাঙ্গোপাঙ্গ' রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র সম্পর্কে। লেখকের সবচেয়ে গাত্রদাহ হয়েছে রথীন্দ্রনাথের মতপরিবর্তনে। ......বহু বাগ্‌বিস্তারের পর রবীন্দ্রনাথের

মত পরিবর্তন সম্পর্কে লেখকের মনের কথা স্পষ্ট করে বলা : '...কবি পূর্বে ইতালীয় গভর্ণমেন্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে তাঁহাদিগের যে সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দিগের মনে যে-অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভজনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে'।"[২২]

রবীন্দ্রনাথ বিদেশেই 'প্রবাসী'র এসব টীকা-টিপ্পনী দেখতে পান এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে রামানন্দর (তিনি তখন কবির সঙ্গে ছিলেন) কাছে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন। আজীবন রবীন্দ্রভক্ত সত্যনিষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিরুদ্বেগ ছিলেন না নিশ্চয়ই। তিনি জানান দেশে ফিরে নিশ্চয়ই পুত্রের ভুল সংশোধন করবেন। পুত্র প্রকৃত ঘটনার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল না হয়েই নিশ্চয়ই এসব লিখেছেন। কিন্তু "দেশে ফিরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী-র কর্মভার হাতে নিয়ে পুত্রের 'ভুল' স্বীকার করার সম্পাদকীয় সৌজন্য পালন করেন নি (কিংবা করতে পারেন নি)। রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসার পর পৌষ সংখ্যায় 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' বিভাগে শুধু এই মন্তব্যটুকু করেই তিনি চুপ ক'রে গেলেন, 'রবীন্দ্রনাথের ইটালী-ভ্রমণ। আশ্বিনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের ইটালী ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ আমাদিগকে মৌখিক বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কবির এইবার ইটালী যাত্রার বিরোধী ছিলেন। কবি স্বয়ং আমাদিগকে মৌখিক এইকথা বলিয়াছেন'।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 'সাঙ্গোপাঙ্গদের' প্রসঙ্গে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ও তাঁর সহযোগী শনিমণ্ডলের (শনিবারের চিঠি-র অনেকেই তখন প্রবাসীর কাজে নিয়োজিত) এই বিরূপ মনোভাব যে হঠাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা 'শনিচক্রের বক্রদৃষ্টি'র ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বোধহয় বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের ব্যাপারে 'প্রবাসী'র এসব মন্তব্য যে মূলত শনিমণ্ডলেরই, এ-অনুমান তাই বোধহয় বিশেষ অসঙ্গত হয় না। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় অন্যত্র। তা হল এই যে, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদ বিষয়ে সে সময়ে এত স্তুতি কেন? একটা কথা ভুললে চলে না এ-ক্ষেত্রে যে, ১৯২৬-সালে ফ্যাসিবাদের প্রত্যক্ষ রূপ অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না সুদূর ভারতবর্ষে বসে; এমন কি রঁলার সঙ্গে দেখা হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথও তো সংশয়মুক্ত ছিলেন না।

মুসোলিনি সম্পর্কে। রঁলার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর কবির লিখিত বিবৃতিও তেমন স্পষ্ট ছিল না, সে-কাহিনীও বিবৃত করেছেন অবন্তীবাবু তাঁর বিশ্লেষণপূর্ণ প্রবন্ধে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মুসোলিনি-প্রীতি কিছুটা আলগা ও অগভীর রাজনৈতিক বোধপ্রসূত হলেও, তা যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত—এমন না ভাববার বোধহয় একটা কারণ থাকতে পারে। অন্যদিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশে ফিরে যে 'ভুল সংশোধন করার' কথা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, পুত্রের প্রভাবেই তা তিনি করতে পারেন নি, না কি অনুরূপ সংশয় তাঁর মধ্যেও কাজ করেছিল, না কি এই দুয়ের সম্মিলিত প্রভাবেই তা তিনি করতে পারেন নি—এরকম অনুমানও অসঙ্গত নয়।

১৯৩১ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে গোপাল হালদার কারারুদ্ধ হন। 'প্রবাসী'র কাজ তার আগেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সম্পর্ক ঘোচে নি একেবারে। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শহিদের একখানা ছবির অ্যালবাম প্রকাশনার ব্যাপারে পুলিশ 'প্রবাসী'-প্রেসে খানা-তল্লাশি চালায়। পুলিশের সন্দেহ যে অ্যালবামটি 'প্রবাসী'-প্রেসেই ছাপা হয়েছে, কেননা ওটি প্রকাশের ব্যাপারে গোপাল হালদারের প্রত্যক্ষ সংযোগ বর্তমান। ছাপার কাজ অবশ্য 'প্রবাসী'-প্রেসে হয় নি এবং এই ঘটনায় রামানন্দ রুষ্টও যে হন নি সে-কথা গোপাল হালদার লিখেছেন এইভাবে, "কিন্তু আমার জন্য সে আপিসের দ্বার তখনো তেমনি অবারিত রইল বরাবর। আমাকেই তাঁরা করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রত্যক্ষ বিচার-আলোচনা লিখে পাঠাতে বললেন। আর আমিও তা লিখে পাঠালাম, ছাপাও হল,—দক্ষিণা পেয়েছিলাম একটু বেশি হারেই। পরে আরেকবার—ত্রিপুরী কংগ্রেসের সম্বন্ধেও আমাকে তিনি সেরূপ একটি নিবন্ধ লেখার ভার দিয়েছিলেন। লিখেছিলাম।"[২৪]

জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি '১৯৩৭-এর বোধ হয় ৯ই সেপ্টেম্বর'। কিন্তু তখনও তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ, বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করা নিষেধ। প্রায় পাঁচ মাস পরে তিনি মুক্তি পেলেন। বন্দীদশা ঘোচার পর গোপাল হালদার আবার এলেন 'প্রবাসী'র প্রত্যক্ষ স্পর্শে। এ-সময়টার প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন, "'প্রবাসী'র লেখা থেকেই যেমন আমার প্রথম দক্ষিণালাভ হয়েছিল, 'প্রবাসী' থেকেই আমার বন্দীদশার পরেও দাক্ষিণ্যলাভ প্রথম হয়। আর যে-কাজে আমার উপর লেখবার ভার পড়ল—মাসে মাসে প্রবাসীতে 'বহির্জগৎ' ও মডার্ন রিভিয়ুতে 'ওয়ার্লড এব্রড'—লেখা

চাই। বিষয়টাতে আমারও ঝোঁক তখন। জেলখানায় দেশী কাগজপত্র প্রায়ই নিষিদ্ধ ছিল—প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়্যু তো নিশ্চয়ই। তত কড়াকড়ি ছিল না বিদেশী কাগজ সম্পর্কে—'কারেন্ট হিস্টরি' 'লিভিং এজ্' থেকে সাপ্তাহিক 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', 'লিটারারি সাপ্লিমেন্ট' প্রভৃতি কাগজগুলো সাপ্তাহিক 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', 'লিটারারি সাপ্লিমেন্ট', প্রভৃতি কাগজগুলো গোগ্রাসে গিলতে পেরেছি। প্রস্তুতি একরকম ছিল। এখন পেলাম আরও পড়ার লেখার আমন্ত্রণ। তখন যুদ্ধ আসছে। আমার ধারণা—স্বার্থেরই দ্বন্দ্বযুদ্ধ। অপঘাত তাই অনিবার্য। তবে দ্বন্দ্বটা এবার ফ্যাসিজম্-এর সঙ্গে সোশ্যালিজম্-এরও দ্বন্দ্বে পরিণত না হয়ে যাবে না। তার মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণীর ও শোষিত জাতির মুক্তিটা আয়ত্ত না করলেই নয়। কমিউনিজম্ মানি বা না মানি, চাই তো শোষিতের মুক্তি। এই দৃষ্টিতেই লাগলাম তথ্য বিশ্লেষণে। আমার এই বুদ্ধি, এই দৃষ্টি, এই মূল রাজনৈতিক প্রবণতা—কিছুই অজ্ঞাত ছিল না কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তা তাঁরা উদার চিত্তে পত্রস্থ করেছেন মাসের পর মাস।”[২৫]

বছর দুয়েক এ-কাজে লিপ্ত ছিলেন গোপাল হালদার। জাতীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে শক্ত হাতে লিখে খ্যাতিও অর্জন করলেন, বুদ্ধিমান পাঠকের মন কেড়ে নিলেন। এবং তখনই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র ওই বিভাগ সাময়িকপত্রের দরবারে আন্তর্জাতিক আলোচনা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। ইতোমধ্যে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবন্দীরা মিলে, বিশেষত অতীন্দ্র বসুর আগ্রহাতিশয্যে, বের করে ফেললেন গোপাল হালদার নতুন আরেক রাজনীতি-সচেতন বাংলা সাময়িকপত্র 'ভারত'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সে-কাগজ পৌঁছুলে উৎসাহও দিলেন তিনি। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির কারণে অচিরেই এ-কাগজ লুপ্ত হয়ে গেল।

'প্রবাসী'র আবহাওয়ায় বহু বিচক্ষণ প্রাজ্ঞ বন্ধুর সাহচর্য লাভ করেছিলেন গোপাল হালদার। লেখার গুণে, চরিত্রগুণে তাঁরা সবাই ছিলেন তখন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগলের মতো একনিষ্ঠ একাগ্র গবেষক, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো মেধাবী, 'দুর্জয় বিদ্যার' অধিকারী, বুদ্ধিদীপ্ত আকর্ষণীয় বন্ধু পেয়েছিলেন তিনি 'প্রবাসী'-প্রাঙ্গণেই। বন্ধু নীরদ চৌধুরীর বহুমুখী জ্ঞানের বিস্ময়কর প্রতিভা এবং অন্যদিকে তাঁর 'আপাত নেতিবাদী তীক্ষ্ণতা' গোপাল হালদারকে নানা বিষয়ে ভাবিত করে তুলেছিল, সমাজ-সংস্কৃতি ভাবনার ক্ষেত্রে সংশয়ী করে তুলেছিল। বন্ধুদের সাহচর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, “তাঁর (নীরদ

চৌধুরী) মেধার গুণে তাঁর বিদ্যা হয়েছিল encyclopaedic ও আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ়।...অন্যদিকে তাঁর আপাত নেতিবাদী তীক্ষ্ণতা আমার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে আত্মসংশয়ে খণ্ডিত, আবার আত্ম-জিজ্ঞাসায় উচ্চকিত করে তোলে। দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা স্বীকার, নীরদ চৌধুরীর চোখে, কূপমণ্ডূকের কাজ। দুর্জয় বিদ্যা ও দুর্বার রসনায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ'র কর্মীদের সকলকে তিনি চমৎকৃত করে রাখতেন।...প্রবাসীর আবহাওয়ায় আর নীরদ চৌধুরীর সর্বগ্রাসী বৈদগ্ধ্যের টানে আমাকে তখন পেয়েছিল নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয়, আর ফিরে ফিরে সংশয় ও জিজ্ঞাসা।"[২৬]

রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড়ে, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় আর সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহাওয়ায় ক্রমশ গড়ে উঠেছিল গোপাল হালদারের মনে এই সংশয়, এই জিজ্ঞাসা। এ-দলের সঙ্গে ও-দলের তুচ্ছ ঝগড়া যেমন ছিল রাজনীতির জগতে, তেমনই ছিল তা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। আর সেই পরিবেশ আরও বিষিয়ে তুলেছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঘোলাটে পরিবেশ। সব মিলিয়ে 'জাতীয় জীবন' আর 'রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবাদ-বিসম্বাদ' তৈরি করেছিল গোপাল হালদারের সংশয়পূর্ণ মানসিকতা। সমকালীন বিবাদ-বিসম্বাদের এই জটিল রাজনীতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে গোপাল হালদার বলেছেন, "ক্রিটিকের চক্ষে আমিও দেখি, সে-সব—না দেখে পারি না ; তবু 'প্রবাসী'র চক্ষেও তা দেখতে পারি না। তাই শনিচক্রের বক্রদৃষ্টিতে দেশের নেতাদের বিদ্রূপ করতে চেয়েছি, কিন্তু দৃষ্টির বক্রতা যে দৃষ্টির বিকৃতি, তা অনুভব না করে পারি নি। অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় uncommitted থাকতে চাইতেন। কার্যতঃ, কিন্তু মনোভাবে তিনি গভীররূপে committed ছিলেন অন্তত: দুটি নীতিতে—জাতীয় স্বাধীনতায় এবং সেইরূপই রবীন্দ্রদর্শনে—আন্তর্জাতিকতায়। কিন্তু প্রবাসীর সুরে ক্রমেই এসেছিল 'ক্রিটিকে'র নেতিবাদ..." ।[২৭]

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপের সমাজ-সংস্কৃতিতে এক বিশ্ব-সংকট দেখা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চাকরির সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মনোভাবও গড়ে উঠল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভারতীয় জনমানসের এক জাতিয়ত্বের সাধনাও ক্রমে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জালে ছিন্ন-বিছিন্ন হল। গোপাল হালদার 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ'র সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে গিয়ে, যুগসংকটের ছবি উন্মোচন

করতে গিয়ে এই কথাগুলিই বলেছেন আরও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে : "...কাউকে দোষারোপ করে এখন লাভ নেই—কিন্তু বোঝা যায় ভারতীয় একজাতীয়তা বোধ কোনো সময়েই একটা স্থির প্রেরণারূপে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। প্রথমতঃ, ইতিহাসের মধ্যেই পূর্বাপর অনেক অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, তার সকল মৌলিক প্রয়োজনকে আমাদের ১৯শ-২০শ শতাব্দীর জাতীয় মুক্তি সাধকরাও বুঝতে চান নি। বুঝতে পারলেও আদর্শের নামে আত্মছলনা করেছেন, 'জাতীয়তা'র নামেই অন্য সকল সমস্যাকে চাপা দিতে চেয়েছেন। 'মুক্তি সাধনা'র অভ্যন্তরেও ছিল এই ভ্রান্তির জট। আরও সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—অন্নসংকট, কৃষিসংকট প্রভৃতির তলায় ছিল জমিদারীতন্ত্র ও কৃষক সমস্যা। শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর এবং অজ্ঞ ও অনগ্রসর মুসলমান সাধারণের সেই বিক্ষোভকে আমরা উদারনীতিকরা চাপা দিয়ে এসেছি একজাতীয়তার নামে। ...আর এই ভুলের সুযোগই গ্রহণ করেছে ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষীরা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে, এবং সর্বকালে সর্বদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন করে, তেমনি তারা ভারতবর্ষেও দিয়েছে এই ভেদ-বিভেদে উৎসাহ। ...শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই উদার-নীতির বিপন্নতা 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে তার সম্পাদকীয় বিচারেও অনুভব করা যায়।" ২৮

ওদিকে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েটের কর্মকাণ্ডের নানা খবর স্পষ্ট-অস্পষ্টতার আলো-ছায়ায় এ-দেশে পৌঁছুতে শুরু করেছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েট-নীতির কদর্যতা প্রমাণের জন্য নানা প্রচার-ব্যঙ্গ-রসিকতাও বোধ হয় এদেশের মুক্তবুদ্ধি মানুষের চোখ খুলে দিতে শুরু করেছিল। প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ-ও রাশিয়ার এই নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল না। ১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রবাসীতেই। তাছাড়া রুশবিপ্লবের নানা কাহিনী, সোভিয়েট-ব্যবস্থার নানা খবর সম্পাদকের পরিমিত সহানুভূতিতে প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসী, মডার্ন রিভিউর পাতায়। কিন্তু তথাপি যে নতুন যুগলক্ষণ নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে নতুন বিশ্ববীক্ষণ আর শ্রেণীচেতনার বোধ তৈরি হয়েছিল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ তা ছুঁতে পারে নি। নতুন আদর্শবাদ আর স্বদেশের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের অনিবার্যতা বুঝতে না পারার জন্য প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ ক্রমে হয়ে উঠল রক্ষণশীলতার, পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি একরেখ মানসিকতার

কাগজ। নতুন এই সমাজ দর্শনে আগ্রহী, সাম্যবাদী আন্দোলনের উষ্ণ সান্নিধ্যলাভে উৎসুক এবং এ-দেশের প্রগতিবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃত গোপাল হালদার প্রবাসীর আবেদনের সীমিত-লক্ষ্য বিচার করতে গিয়ে সেজন্যেই লিখেছেন, "শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে তাই দেখি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন বিভিয়্যু'রও অভ্যন্তরে একটা রক্ষণশীলতার ঝোঁক ; সংকটের সদর্থক বিচার ও স্বীকৃতি অপেক্ষা নঙর্থক যুগ-লক্ষণের বিষয়ে স্পর্শকাতরতা, সংশয় ও বিরোধের প্রবণতা"।[২৯]

সূত্র-নির্দেশ

১. রূপনারানের কূলে : গোপাল হালদার ; প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৬

২. ঐ ঐ ১০৬

৩. ঐ ঐ ৯৬

৪. ঐ ঐ ১০৪

৫. ঐ ঐ ৯২-৯৩

৬. ঐ ঐ ১৩৫

৭. ঐ ঐ ১৩৩

৮. ঐ ঐ ১৩৩

৯. ঐ ঐ ১৪৪

১০. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ভারতের সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; প্রবাসী—পৌষ, ১৩৫০

১১. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা : শান্তাদেবী, পৃষ্ঠা-৩

১২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : স্মৃতিরেখা : গোপাল হালদার ; পরিচয়—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

১৩. ঐ

১৪. রূপনারানের কূলে : গোপাল হালদার ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩

১৫. ঐ ২৬৪

১৬. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : 'প্রবাসী' ; সম্পাদক : গোপাল হালদার ; সঙ্কিতা—১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা (পাটনা থেকে প্রকাশিত) এই পত্রিকা।

১৭. ঐ

১৮. শান্তাদেবীর পূর্বোক্ত বই, পৃষ্ঠা-৭৯

১৯. 'সঙ্কিতা'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২০. ঐ

২১. রবীন্দ্রনাথের ইতালি-সফর : অবন্তীকুমার সান্যাল ; এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৮৪

২২. ঐ ঐ

২৩. ঐ ঐ

২৪. পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২৫. ঐ

২৬. রূপনারানের কূলে, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭১

২৭. ঐ ২৭২

২৮. 'সঞ্চিতা'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২৯. ঐ

পরিশিষ্ট

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত গোপাল হালদারের রচনার পঞ্জি

১৩৫৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৫০ সাল পর্যন্ত 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত গোপাল হালদারের রচনাগুলির একটি তালিকা সংযোজিত হ'ল এই সঙ্গে। গল্প, প্রবন্ধ, পুস্তক-পরিচয় ছাড়া গোপাল হালদার একটা পর্যায়ে 'প্রবাসী'র 'বহির্জগত' ও 'দেশ-বিদেশের কথা' বিভাগে একটানা প্রায় দু-বছর ধারাবাহিক কিছু তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণমুখী নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই লেখাগুলি লিখেছিলেন তিনি আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে, কয়েকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও এবং সে কারণে সব লেখাগুলিই যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ বিষয়ক। রচনাগুলির চরিত্র সম্পর্কে গোপাল হালদার স্বয়ং তাঁর অন্য এক প্রবন্ধে বলেছেন, "তখন যুদ্ধ আসছে। আমার ধারণা—স্বার্থেরই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। অপঘাতও তাই অনিবার্য। তবে দ্বন্দ্বটা এবার ফ্যাসিজম্-এর সঙ্গে সোস্যালিজম্-এরও দ্বন্দ্বে পরিণত না হয়ে যাবে না। তার মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণীর ও শোষিত জাতির মুক্তিটা আয়ত্ত না করলেই নয়। কমিউনিজম্ মানি বা না মানি, চাই তো শোষিতের মুক্তি। এই দৃষ্টিতেই লাগলাম তথ্য বিশ্লেষণে" (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৭২)।

'বহির্জগত' বা 'দেশ-বিদেশের কথা'-র রচনাগুলির কোনোটিতেই

শিরোনাম দেন নি লেখক। 'দেশ-বিদেশের কথা' বিভাগের লেখাগুলিতে অবশ্য উপ-শিরোনাম বা Sub-head ব্যবহার করেছেন প্রবন্ধকার। সেজন্য, পাঠকের সুবিধার্থে, এই রচনাগুলির সূচী তৈরি করার সময় আমরা বন্ধনীর ভিতরে এই প্রবন্ধগুলির বিষয়গত আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 'দেশ-বিদেশের কথা'-র লেখাগুলির ক্ষেত্রে মূল লেখকের ব্যবহৃত উপ-শিরোনাম-গুলিই উদ্ধৃত করা হ'ল। এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যে এই সূচী তৈরি করার সময় ১৩৩৪-এর বৈশাখ থেকে আশ্বিন—এই ছ' মাসের 'প্রবাসী' সংগ্রহ করতে না পারায় তা দেখা সম্ভব হয় নি।

গল্প

১৩৩২, ফাল্গুন	কালের কোপ
১৩৩৩, বৈশাখ	করিম
১৩৩৩, কার্তিক	প্রথম চাকরী
১৩৩৩, অগ্রহায়ণ	জয়ন্ত
১৩৩৬, বৈশাখ	তারকার জন্ম

প্রবন্ধ

১৩৫৫, অগ্রহায়ণ	বঙ্কিমচন্দ্র
১৩৩৬, চৈত্র	বর্তমান জার্ম্মেনীর চিন্তাধারা
১৩৩৮, বৈশাখ	নওজোয়ানের রাষ্ট্রচিন্তা
১৩৪৬, বৈশাখ	ত্রিপুরীর মন্ত্র
১৩৪৬, শ্রাবণ	সালোঁর প্রদর্শনী
১৩৪৭, অগ্রহায়ণ	ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্য
১৩৪৭, পৌষ	ভারতীয় কারু-শ্রমিকের শিক্ষা

পুস্তক-পরিচয়

১৩৪৬, আশ্বিন	সাহিত্য-কথা, মোহিতলাল মজুমদার
১৩৪৭, বৈশাখ	রাজনীতি—মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক : মনোরঞ্জন গুপ্ত
১৩৪৭, পৌষ	জাগৃহি, রেজাউল করীম

অন্যান্য

১৩৪৪, চৈত্র — বহির্জগত

(আসন্ন যুদ্ধ ও দেশের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসের চিন্তাধারা; ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি; হিটলার-মুসোলিনির জয়যাত্রা; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী শক্তির প্রতিষ্ঠা—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী)

১৩৪৫, বৈশাখ — বহির্জগত

(হিটলারের আগ্রাসী নীতি)

১৩৪৫, জ্যৈষ্ঠ — বহির্জগত

(ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি)

১৩৪৫, আষাঢ় — বহির্জগত

(চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ইতালী ও জার্মানীর সম্পর্ক)

১৩৪৫, শ্রাবণ — বহির্জগত

(চীনে জাপানী আক্রমণ; সাতই জুলাই'র চীন-দিবস পালন)

১৩৪৫, ভাদ্র — বহির্জগত

(স্পেন যুদ্ধ ও ফ্রাঙ্কোর জাতীয়তাবাদ; রুশ-জাপান বিরোধ)

১৩৪৫, আশ্বিন — বহির্জগত

(স্পেন থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রস্তাব)

১৩৪৫, কার্তিক — বহির্জগত

(যুদ্ধের আশঙ্কায় ইউরোপ; সুদেতন-জার্মান ও চেক্‌-সমস্যা)

১৩৪৫, অগ্রহায়ণ — বহির্জগত

(যুদ্ধ বাধল না কেন?—তার কারণসমূহ)

১৩৪৫, পৌষ — দেশ-বিদেশের কথা

(কামাল আতাতুর্কের জীবনাবসান; কামাল আতাতুর্ক ও তুরস্কের ইতিহাস)

১৩৪৫, মাঘ — দেশ-বিদেশের কথা
(মুসোলিনি ; ইতালীর টুনিস, জিবুতি ও সুয়েজ-খালের উপর অধিকারদাবী ; হিটলারের উক্রেইন অভিযান)

১৩৪৫, ফাল্গুন — দেশ-বিদেশের কথা
(বার্সিলোনার পতন—ফ্রাঙ্কো-মুসোলিনির জয়)

১৩৪৫, চৈত্র — দেশ-বিদেশের কথা
(বিশ্বপরিস্থিতি ও গণতন্ত্রের তুর্দিন)

১৩৪৬, বৈশাখ — দেশ-বিদেশের কথা
(ব্রিটেনের নূতন অধ্যায় ; চেক্ ধ্বংস ; রুমেনিয়ার সন্ধ্যা ; শান্তিবাহিনী ; সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি ; মেসেল ; নূতন নীতির অর্থ)

১৩৪৬, জ্যৈষ্ঠ — দেশ-বিদেশের কথা
(আলবেনিয়া জয় ; মুসোলিনির যুক্তি ; বল্‌কান্ দুশ্চিন্তা ; শান্তি সংহতি ; সোভিয়েট সংহতি-সূত্র)

১৩৪৬, আষাঢ় — দেশ-বিদেশের কথা
(সোভিয়েট বন্ধুত্ব—ব্রিটেনের দ্বিধা ; ব্রিটিশের সংহতি চেষ্টা ; ফাশিস্ত তৎপরতা ; সোভিয়েট সৌহার্দ্য ; দোটানার মাঝে ব্রিটেন ; আলবানিয়ার কথা)

১৩৪৬, শ্রাবণ — দেশ-বিদেশের কথা
(চীনের ঘটনা ; তৃতীয় পর্ব ; চীনের অবস্থা ; জাপানের অবস্থা, বিদেশীয় যোগাযোগ)

১৩৪৬, ভাদ্র — দেশ-বিদেশের কথা
(যুদ্ধের ঘনঘটা ? ডানজিগের তুয়ারে ; ডানজিগের কর্তৃত্বভার ; ডানজিগের গুরুত্ব ; পোল্যাণ্ডের প্রয়াস ; চেম্বারলেনের অসহায়তা)

১৩৪৬, কার্তিক — দেশ-বিদেশের কথা
(ইতিহাসের পুনরাবর্তন ; যুদ্ধের নানা দিকে ;

যুদ্ধের গতি ; পোল্যাণ্ডের পতন ; সোভিয়েট আবির্ভাব)

১৩৪৬, অগ্রহায়ণ — দেশ-বিদেশের কথা

(আড়াই মাসের ফল ; সামগ্রিক যুদ্ধ ; যুদ্ধের বর্তমান প্ল্যান ; জার্মান জয় ; জার্মান পরাজয় ; জয় কাহার ?)

১৩৪৬, পৌষ — দেশ-বিদেশের কথা

(ইউরোপে যুদ্ধ ; জার্মানীর মাইন-যুদ্ধ ; শান্তির শেষ স্বপ্ন ? কুটনীতির যুদ্ধ ; সোভিয়েটের নীতি ; ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ)

১৩৪৬, ফাল্গুন — দেশ-বিদেশের কথা

(জাপানের সঙ্কট ; সঙ্কট কিরূপ ; চীনে অচল অবস্থা ; জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ; প্রাচ্য-মিউনিখ ; ইউরোপীয় ও জাপানী পররাষ্ট্রনীতি)

১৩৪৬, চৈত্র — দেশ-বিদেশের কথা

(ছয় মাসের শেষে ; ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাহুগ্রাস ; ফিন্‌ল্যাণ্ডে ব্রিটেনের সাহায্য ; সোভিয়েট আক্রমণ ; বল্‌কানী আয়োজন)

১৩৪৭, বৈশাখ — দেশ-বিদেশের কথা

(যুদ্ধ-প্রসারের পথ ; সোভিয়েট রুশিয়া ; স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ; ইতালী ও বলকান রাষ্ট্র ; মলোটোভ ও চেম্বারলেনের বক্তৃতা) ।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা, যুগ-বিভাগ, গোপাল হালদার

রমেন্দ্র বর্মণ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বহতা স্রোতস্বিনী, যার উৎস ও বিকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বভাবতই নিরতিশয় মতবিরোধ এবং যার স্রোত বন্ধুর পন্থায় এঁকেবেঁকে মহাসমুদ্রের অভিমুখে বহমান, সে বিষয়ে সজাগ অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা ঊনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতেই সংলগ্ন স্পষ্টতা পায়। অবশ্য ইতিহাসবোধ বা চৈতন্য আধুনিক কালের সামগ্রী এবং বলাই বাহুল্য, বঙ্কিম-পূর্বজদের মধ্যে এই বোধ চকিতে প্রকাশমান, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না'।[১] এই বিবেকার্তিতেই ধরা পড়ল প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা। প্রসঙ্গত বঙ্কিম নির্দেশ করলেন, 'ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড় প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত।......এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত; পুরানেতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।[২] এবং ইতিহাস রচনার জরুরি বঙ্কিমীসূত্র: 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই'।[৩] ইতিহাসকে ধ্যানের বস্তু করে তোলার খাতিরে ইতিহাস কল্পনার অবাধ চারণভূমিতে পরিণত হোক এও বঙ্কিমের উদ্দিষ্ট নয়। বস্তুত ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ বিচারে আমরা যেমন বাস্তব ঘটনা বা ফ্যাক্ট নির্ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করি তেমনি ঘটনা বা সংগৃহীত তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্যবিচার, বিচ্ছিন্ন তথ্যের মধ্যে যোগসূত্রের অন্বেষণও একান্ত প্রয়োজন, আর এ প্রসঙ্গেই ঐতিহাসিকের

সজাগ দৃষ্টিভঙ্গির কথাটি ওঠে ; সর্বোপরি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও শৃঙ্খলায় বহুধা দৃষ্টিভঙ্গির আপেক্ষিক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াও ঐতিহাসিকের কার্যক্রমের অন্তর্গত। কিন্তু তাবলে আজকের ঐতিহাসিক অধ্যাপক বিউরির মতবাদকেও ('History is a Science, no less, no more') একান্ত-গ্রাহ্য সত্য বলে মনে করেন না। ঐতিহাসিক যুক্তি ও ন্যায়বুদ্ধি অনুসরণ করে আবেগনিরপেক্ষ ভাবে সংগৃহীত তথ্য এবং ঘটনার যোজনাবিন্যাস-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনাবলির কেন্দ্রস্থিত মানুষের সদাচঞ্চল জায়মান প্রাণধারার রূপরেখাটিই অন্বেষণের পক্ষপাতী।

ইতিহাস রচনার এই দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারের নিকটও নিশ্চয় প্রত্যাশিত। গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের কর্মঠ বিকাশের এক উজ্জ্বল রেখাচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। কারণ, গোপাল হালদার বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আদ্যন্ত সজাগ রাখেন—'রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোনো ধারাই সেদিক থেকে অবজ্ঞা করবার মতো নয়। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসও বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা। প্রধানত, সেই জিজ্ঞাসা ও এই দৃষ্টিক্ষেত্র থেকেই আমি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলাম।'[৪]

আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পারস্পরিক সম্বন্ধপাতের মধ্যে গোপাল হালদার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের শিকড় সন্ধান করেছেন আর তাতে ধরা পড়েছে তাঁর পরিচ্ছন্ন মার্ক্সীয় ধ্যান-ধারণাপ্রত্যয়প্রতিজ্ঞা। গোপাল হালদারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি এই কারণে যে বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি মার্ক্সীয় তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগকে এড়িয়ে গেছেন সযত্নে। ফলে তাঁর রূপরেখায় মার্ক্সীয় চৈতন্যের জ্যা টান টান থাকে সবসময় অথচ অল্লাধিক পাঁচশ পৃষ্ঠার দু খণ্ড রূপরেখা সর্বাংশে সুখপাঠ্য, পরিশীলিত পরিশ্রমী কর্ষণার এক আশ্চর্য অকপট সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

গোপাল হালদারের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-চর্চায় জরুরি প্রসঙ্গ প্রায় সব কটিই রয়েছে। তাঁর লোকায়ত আসক্তিতে যথার্থই ধরা পড়েছে 'বাঙালী জাতটাও আসলে বড় বেশী কুলীন জাত নয়'।[৫] এবং

'প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের পরিবেশ' এবং 'সামাজিক বনিয়াদে'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন বাঙালী সংস্কৃতি 'প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হুবহু বহন করে নি—বাঙালী জাতির বর্ণসংকর উদ্ভব এবং আর্যেতর ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের সংযোগের ফলে 'বাঙলার এই জন-শ্রেণী জীবনযাত্রায়, আচারে-নিয়মে, ভাবনায়-কল্পনায় নিজেদের প্রাচীনতর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যথেষ্টই বহন করে চলেছিল। এমন কি, পরবর্তীকালের লোক-সংস্কৃতির মধ্যেও সে-সব জীবিত ছিল—যেমন, রূপকথায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, প্রবাদ-প্রবচনে। এই লৌকিক ধারা, এটি বাঙালীর দ্বিতীয় উত্তরাধিকার।'[৬]

'বাঙালীর দ্বিতীয় উত্তরাধিকার' বিষয়ে সুস্পষ্ট চেতনা ও আগ্রহ গোপাল হালদারের ঈষৎ পূর্ববর্তীকালে জাগলেও মার্ক্সীয় বোধবিশ্বাস অনুযায়ী গোপাল হালদারই লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকপুরাণের পুনর্বিন্যাস করলেন, কিছু কিছু ভ্রমনিরাশও যে না করেছেন তাও নয়। লোকজীবনধারা ও লোকপ্রেমের প্রত্যয়ে গোপাল হালদার বলেছেন,—'মঙ্গলকাব্যের সেই সব কথা ও কাহিনীই হল বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর নিজস্ব বাঙলা বিষয়—হিন্দ্-আর্য-সভ্যতা থেকে ধার করা বিষয় নয়। কিন্তু প্রাচীন যুগের বাঙলা সাহিত্যে সেই বাঙলা বিষয়ের কোনো দৃষ্টান্ত আমরা পাই নি; অত পুরাতন 'মঙ্গল-কাব্য', 'বিজয় কাব্য' বা 'পাঁচালী' পাওয়া যায় না।' কিংবা 'মঙ্গল কাব্যেই বাঙলার জনসাধারণের নিজস্ব কাহিনী ও জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছিল।'[৮]

বলা বাহুল্য, কেউ গোপাল হালদারকে একচক্ষু বিশিষ্ট হরিণের অর্থাৎ পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনার জন্য সোপরদ্দ করতে পারবেন না। প্রায় সমপরিমাণ আবেগ ও নিষ্ঠা নিয়ে গোপাল হালদার চর্যাপদ, চৈতন্য জীবন কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্যায়ন করেছেন, বিশেষত 'পদাবলীর কাব্যরস' (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০০-১০৬) সম্পর্কে তিনি যে নিবিড়তন্নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন তাঁকে অভিবাদন জানাতে আমরা বাধ্য। সেদিক থেকে প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত মুকুন্দরাম বিষয়ক আলোচনাটিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—'মুকুন্দরামের কবিচিত্ত আপনার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় ও সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছে তার মূল সত্য—মানুষের চরিত্র, আর মানবরস।......দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসেও তাই মুকুন্দরাম মানব-মাহাত্ম্যই কীর্তন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে তিনি তাই স্ফুটনোন্মুখ মানবতার প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি—যখন আধুনিককাল অনাগত,

যখন মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা অনাবিষ্কৃত।' * —সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে মুকুন্দকাব্যের সারাৎসার পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য বৈকি। তদুপরি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে উজ্জ্বল ঝকঝকে আলোচনার সঙ্গে মাঝে মধ্যে তুখোড় মন্তব্য জুড়ে গোপাল হালদার ইতিহাসচর্চা ও আলোচনার প্রথাবদ্ধ ধারণার মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন।

২

'তাঁর উদ্দেশ্য প্রধানতঃ সাহিত্যিক, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নয়; তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি গতানুগতিক পথে চলেন নি। তথ্যের দিক থেকে যা নির্ভরযোগ্য ও যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাই অবলম্বন ক'রে তিনি জাতীয় ভাববিকাশের আনুষঙ্গিক পরিবেশের মধ্যে সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন,…কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়লব্ধ বিবরণের মধ্যে যেমন অনুসন্ধানের অভাব নেই তেমনি স্বকীয় চিন্তাশীলতার সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান। অশেষ স্নেহভাজন গ্রন্থকার ভাষাতত্ত্বে পারংগম, কিন্তু তত্ত্বান্বেষণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসজ্ঞতা ক্ষুণ্ণ করেনি। বৈয়াকরণের মনোভাব নিয়ে তিনি সাহিত্য বিচারে বসেননি এবং সর্বদাই মনে রেখেছেন যে, জাতির আত্মচেতনার যা বৈশিষ্ট্য তারই উপর তার ভাষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত।' —আচার্য সুশীলকুমার দে-র মনোজ্ঞ ভূমিকার শেষ কয়টি বাক্য গোপাল হালদারের কীর্তিগাথাকে প্রায় সর্বাংশেই উদ্ঘাটিত করে। কিন্তু ভূমিকা লেখার আড়াই দশক উত্তীর্ণ হবার পর গোপাল হালদারের 'ঐতিহাসিক' উদ্দেশ্যটিই তাৎপর্যবহ হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

গোপাল হালদারের ইতিহাসচর্চা সুবিন্যস্ত আকার নিয়েছে সম্ভবত রূপরেখার দ্বিতীয় খণ্ডে। অবশ্য প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ও সপ্তম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে তিনি তুর্ক বিজয়ের রাজনৈতিক পটভূমি সামাজিক আবর্তন-বিবর্তন, নবাবী আমলের রাজনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক পরিবেশ ও জমিদারের উৎপত্তি, পলাশীর প্রেক্ষাপট, ফারসি প্রভাবের বিস্তার, 'নাবুবী আমলে'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলে যে-অধ্যায়কে তিনি নির্দেশিত করেছেন এর রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির উন্মোচনও নিশ্চয়ই তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত, যে-কোনো কারণেই হোক এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয় বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। আসলে বহুবিতর্কিত হলেও

উনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কে আলোচনায়ই আমাদের মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীরাও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ফলে গোপাল হালদারও দ্বিতীয় খণ্ডের গোড়াতেই ঔপনিবেশিক পরিবেশের দীর্ঘ জটিল আবর্তকে এক সুস্থির বিন্যাস দেন অনায়াসে। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনার শীর্ষগুলির প্রতি বিহঙ্গাবলোকনেই তাঁর দৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসার ও প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই ইতিহাস স্রোতস্বতীর সঙ্গে মিলিয়ে "ইং ১৮০০ থেকে ১৮৫৭, বাঙলার ইতিহাসের এই কালটির দিকে এমন সমগ্র ভাবে একবার তাকিয়ে দেখলে, পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় যে বাঙালী জীবন কত গতিমান, পরিবর্তমান হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারি। আধুনিককালের প্রধান যুগলক্ষণ এই গতি। যতই কাল এগিয়ে চলে ততই সেই গতির মাত্রা (tempo) ক্ষিপ্রতর হয়। ততই জটিল ও বিচিত্র ঘটনা ও ভাবধারায় জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশও কেবলই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট। ...সকলের দানে বাঙলা গদ্য জন্মলাভ করছে, বাঙলা পদ্য পথ খুঁজছে, বাঙলা নাটক প্রতিভাকে আহ্বান করবার জন্য উদ্‌গ্রীব—এককথায় বাঙালী সমাজ ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত।"[১৬]

গোপাল হালদারের দৃষ্টিক্ষেত্রের অনন্য বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ-এ। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'-এ রামগতি বাংলা-সাহিত্যের যুগবিভাগের প্রথম চেষ্টা করেন। 'আদ্যকাল', 'মধ্যকাল' এবং 'ইদানীন্তন কাল'—এ তিনভাগে রামগতির যুগবিভাগের প্রস্তাব। প্রথম থেকে প্রাক্-চৈতন্য পর্যন্ত আদ্যকালের সীমা, চৈতন্যদেব থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যকালের অন্তর্গত, আর ভারতচন্দ্র কবিওয়ালা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ইদানীন্তন কালের অন্তর্ভুক্ত। রমেশচন্দ্র দত্ত **'The Literature of Bengal'**-এ বাংলা সাহিত্যকে ত্রিধাভাগে বিভক্ত করেছেন—গীতিকবিতার যুগ, সংস্কৃত প্রভাবের যুগ ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যুগ। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'বাংলা দেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন ইতিহাস বনস্পতিকে' (রবীন্দ্রনাথ) 'হিন্দুবৌদ্ধযুগ', 'গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব'যুগ, 'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ', 'সংস্কারযুগ', 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ', অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ,—এ

যুগ বিভাগে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলতে চাইলেন। দীনেশচন্দ্রের যুগ-বিভাগে কালের মাত্রা তেমন প্রবল নয় বরং 'যুগের প্রবৃত্তি' অনুযায়ী এ নামকরণ। 'Bengali Literature' গ্রন্থে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ যুগ বিভাগে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দীনেশচন্দ্র সেন উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে গৌড়যুগ, নদীয়া যুগ, কলিকাতা যুগ এই স্থান নাম অনুসারে যুগ বিভাগ করলেও স্থাননামের সঙ্গে কালের সময়সীমাও নির্দেশিত হয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন 'বৌদ্ধ', 'শৈব', 'ব্রাহ্মণ্য', 'ঐস্লামিক' ইত্যাদি যুগ বিভাগকে 'একেবারে কাল্পনিক' বলে মনে করেন এবং কোনরূপ সুস্পষ্ট যুগবিভাগ তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (চার খণ্ড) পাওয়া যায় না। আচার্য সেন অবশ্য বৎসর ধরে শতাব্দীর সীমায় বাংলা সাহিত্যকে চিহ্নাঙ্কিত করতে আগ্রহী।

গোপাল হালদার বরাবরই জানেন স্থানকালপাত্রের সংমিশ্রণে ইতিহাসের অবয়ব গঠিত। ফলে তাঁর পরিকল্পিত যুগবিভাগে স্থানকালের মাত্রা, রাষ্ট্রিক-সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের 'যুগপুরুষদের নাম' ধরে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ তাঁর যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। গোপাল হালদারের যুগ বিভাগের একটি ধারণা পাশের ছবিটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। গোপাল হালদারের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা 'প্রস্তুতির পর্বে', বস্তুত, নবযুগের দ্বার-প্রান্ত পৌঁছেই আপাতত ছেদ টেনেছে। 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মত্ত হয়ে 'ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ। 'দীপ্তগীতে' এবং 'মানব অভ্যুদয়ের বাণী'তে মুখরিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গোপাল হালদারের পরিচর্যা লাভ করে নি। অথচ গিনজবার্গ কথিত 'দৃষ্টিভঙ্গি'র (সমকালীন সাহিত্যের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা থেকে আমরা একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অতীত ইতিহাসের বিচার করি। বড় সাহিত্য-সমালোচক যে বড় সাহিত্য-ঐতিহাসিকও হয়ে ওঠেন—এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।"[১১]) দৌলতে এ পর্বের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা নির্মাণই বোধ হয় গোপাল হালদারের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। সহজ কাজকে হেলাভরে উপেক্ষা করাই সম্ভবত প্রতিভার স্বভাব ধর্ম।

গোপাল হালদার-পরিকল্পিত বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ>

- প্রাচীন যুগ (খ্রী ৯০০–খ্রী ১২০০)
- মধ্যযুগ
  - প্রথম পর্ব : যুগসন্ধিকাল, খ্রীঃ ১২০০—খ্রীঃ ১৩৫০
  - দ্বিতীয় পর্ব : প্রাক্‌চৈতন্যযুগ, (খ্রীঃ ১৩৫০-খ্রীঃ ১৫০০)
  - তৃতীয় পর্ব : চৈতন্যযুগ, (খ্রীঃ ১৫০০-খ্রীঃ ১৭০০)
  - চতুর্থ পর্ব : নবাবী আমল, (খ্রীঃ ১৭০০-খ্রীঃ ১৮০০)
- নবযুগ
  - ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার যুগ (১৭৫৭—১৯৪৭), এর মধ্যে ১৭৫৭—১৮৫৮ পর্যন্ত ব্রিটিশ 'বণিক পুঁজির শাসন পর্ব', ১৮৫৮—১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ 'শিল্প পুঁজির শাসন পর্ব।'
  - ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের যুগ 'প্রস্তুতির পর্ব' (১৮০০—১৮৫৭), 'প্রকাশের পর্ব' (১৮৫৮—১৮৯৩), 'অভিযানের পর্ব' (১৮৯৪—১৯৪২)।
  - প্রথম, 'রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ', (১৮০০—১৮৫৮), দ্বিতীয়, 'মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ' (১৮৫৯—১৮৯৩), তৃতীয়, 'রবীন্দ্রনাথের যুগ' (১৮৯৪—১৯৪২)
  - 'ঊনবিংশ শতকের বাঙলা'— (১) 'প্রস্তুতির পর্ব' (২) প্রকাশের পর্ব' 'বিংশ শতকের বাঙলা'

উল্লেখপঞ্জি

১. 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', পৃ ৩৩৬ (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬ সংস্করণ)

২. 'বাঙ্গালার ইতিহাস', পৃ ৩৩০ (ঐ খণ্ড, ঐ সংস্করণ)

৩. 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ', পৃ ৩৪০ (ঐ খণ্ড, ঐ সংস্করণ)

৪. 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (১ম খণ্ড), নিবেদন দ্রঃ (১৩৬৩ সংস্করণ) (পরে বাঃ সাঃ রূঃ বলে উল্লিখিত)

৫. বাঃ সাঃ রূঃ (১ম খণ্ড), পৃ ৫

৬. তদেব, পৃ ১১

৭. তদেব, পৃ ৩১

৮. তদেব, পৃ ১০৯

৯. তদেব, পৃ ১২১—১২২

১০. বাঃ সাঃ রূঃ (২য় খণ্ড), পৃ ৬৪-৬৫

১১. 'সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সাহিত্য-বিচারের স্থান', লিদিয়া গিনজবার্গ, (পরিচয়, কার্তিক ১৩৮৬ সংখ্যা)—প্রমীলা মেহ্‌তা অনূদিত পৃ ৫ দ্রষ্টব্য।

আত্মকথা : দেশকালকথা

আশীষ মজুমদার

১

'উহারা বন্দেমাতরম্ বলে না; বলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আর বলে কৃষক আন্দোলন করিবে, মজুর আন্দোলন করিবে। দু-একজন বিলাতফেরতা ব্যারিস্টার উহাদের নেতা—মনু তাহাদের নাম করিল। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি সব তাঁদের মতে ভুয়া ফিউডাল প্রিন্‌স ও বুর্জোয়াদের বজ্জাতি। অমিত তাহাদের নাম জেলে শুনিয়াছে—শুনিয়াছে তাহারা কমিউনিস্ট।'

উদ্ধৃতিটি গোপাল হালদার রচিত 'অন্যদিন' উপন্যাস থেকে। ঘটনাকাল ১৯৩৭-৩৮। তখন কমিউনিস্টদের সম্পর্কে এমন ধারণাই প্রবল—প্রায় এ সময় থেকেই গোপাল হালদার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর আগে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, মত ও পথের নানা সংশয় সত্ত্বেও, গণ আন্দোলনের প্রয়োজনবোধে। ১৯২১-এর প্রারম্ভ থেকেই সমাজতন্ত্রের সমর্থন মনে দৃঢ় হয়ে উঠছিল।

'বুঝতে কষ্ট হয় না—বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণিত ভাবধারা থেকে কোন ঘাটে এসে (সেই ১৯২১-এর প্রারম্ভে) আমার সাহিত্যলিপ্ত স্বদেশীভাবনা পেয়েছে তার জিজ্ঞাসার উত্তর : নামহীন ভারতই মুক্তিপথের আশ্রয়।' ('নতুন দিন পুরনো কথা')। গোপাল হালদার বাঙালি ঐতিহ্য ও বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমেত কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সক্রিয় ও পরিচিত। বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও রূপান্তর, ভারতের সনাতন সামাজিক বিন্যাস ও ধর্মভাবনার সঙ্গে জড়িত বৈষম্যের জটিলতার স্বরূপ এবং সে-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গভীরভাবে ভেবেছেন ও লিখেছেন। রাজনীতি-সাহিত্যচর্চা-সমাজচিন্তাকে তিনি দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে নেন—তাঁর উপন্যাসের নায়ক অমিতের মতোই। বাঙলাদেশের রাজনীতি ও চিন্তার জগতে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কূলে' বাঙালির কর্ম ও চিন্তার জগতে উল্লেখযোগ্য [illegible]

২

আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা জাতীয় রচনা যিনি লিখেছেন, তাঁর মধ্যে যে কোনো ভাবেই হোক, নিজের জীবন বা নিজের কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভূমিকা, বা অন্তত সেই কালের সঙ্গে অভিযোজনে তাঁর অভিজ্ঞতাটা গুরুত্বপূর্ণ এই বোধ থাকতেই হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি সমগ্র দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে এক ধরনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিজাত বিনয় না থাকে, প্রকট বা ছদ্মবেশেও যদি আত্মকীর্তনের মোহ প্রকাশ পায়—পাঠককে তা বিরক্ত করে, আধুনিক মানুষের হাসিও পায়। বিশ শতকের সমানবয়সী বেশ কিছু মানুষের আত্মজীবনী প্রকাশ হতে শুরু করেছে, অধিকাংশ রচনায়, কেউ বিনয়ের অভিনয়ে কেউবা মাজাঘষা চাতুরিতে শেষ পর্যন্ত অহমিকাই জ্ঞাপন করেন—যা ঘটেছে গোপাল হালদার সে বিষয়ে সচেতন হয়ে বলেন 'আত্মার এই অত্যাচারে আত্মজীবনী থেকে জীবন চুঁইয়ে বেরিয়ে যায় আমিই হয় সর্বস্ব।'

গোপাল হালদারের ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশ তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কাজ-কর্মে তাকেই ভূগোল-ইতিহাস সমেত স্পষ্ট হতে দেখা যায় তাঁর দু-খণ্ডের আত্মজীবনীতে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে অদ্যাবধি, পত্র-পত্রিকায় বিশেষত পরিচয়ের পৃষ্ঠায় নিরলসভাবে ও নিয়মিতভাবে তাঁর রচনা নানা ওলোট-পালোটের মধ্যেও ধ্রুববস্তু। অথচ সে-সব রচনার কোথাও কখনও এতটুকু চমকে দেওয়ার লোভকাতরতা খুঁজে পাওয়া যায় না, কখনও মনে হয় খুব বেশি ব্যালান্সড্, কিন্তু কখনও একপেশে তীক্ষ্ণতায় তীব্র নয়। অবশ্য দুটি প্রসঙ্গে তিনি অস্থির ও ক্রুদ্ধ হন—সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে এবং বাঙলাদেশ বা বাঙালি সংস্কৃতির অবমাননার প্রশ্নে। কিন্তু সর্বত্রই একধরনের সিরিয়াসনেস, রসবোধবঞ্চিত নয়, কিন্তু বিনয়ী কর্মীর দুর্লভ সততা স্পষ্ট। আত্মজীবনীতে ব্যক্তিত্বের সেই অনন্যতাই খুঁজে পাই—সমস্ত মত ও পথের প্রতি যোগ্য মনোযোগ দিয়ে নিজের অবস্থানকে দেশকালের পটে বিনয়ের সঙ্গে হাজির করেন। নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাতেও তিনি অকৃপণ, নিজের সীমাবদ্ধতা ও তার কারণ জ্ঞাপনেও অকপট, এবং যাঁদের সান্নিধ্যলাভে তিনি উদ্বুদ্ধ তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁর চোখ এড়ায় না—প্রকাশ করেন অবশ্য এদেশে কদাচিৎ-লভ্য সূক্ষ্মতায়।

। মত ও পথের বৈচিত্র্য

অনুরাগ-বিরাগ-সংঘাত-সংঘর্ষ-সমেত মানুষের মুখ। নিজের কাল সম্পর্কে ভেবেছেন, 'অথচ আমাদের কাল শান্ত জীবনের কাল নয়।...মানুষের বিশ্বাস না হারানো এ যুগে দুঃসাহসের কথা। কিন্তু আমরা যাদের অত সাহস নেই, তারাও—বিশ্বাসই বা হারাই কি করে যখন পৃথিবীর ঘরে ঘরে দেখি এই অদ্ভুত কাণ্ড অপরূপের রূপলীলা? মানুষের জীবন ঘরে-বাইরে যে ষড়ৈশ্বর্যে এখন ভরে উঠছে তেমন কি আর কোনো কালে সম্ভব হয়েছে? আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর হচ্ছে পৃথিবী সে কি তাহলে মরবে বলে?'

'সাধারণ মানুষের অসাধারণতা আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা আমাদের এ শতাব্দীর একটা বড় আবিষ্কার। তাই আমার কাছে পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয়েছে মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের, অসাধারণ মানুষের, সকল মানুষের।'

৩

ঢাকা জেলার বিদগাঁও গ্রামে ১৯০২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কোনো ঘড়ি ছিল না বলে গোপাল হালদারের জন্মসময় কোরালপাখির ডাক থেকে আন্দাজ করা হয়েছিল। আশৈশব কাটিয়েছিলেন সদর শহর নোয়াখালির বাদামতলা অঞ্চলে। গৃহপরিবেশে আইনজীবী, সাহিত্যানুরাগী, নিয়মানুবর্তী, শান্ত সংযত জীবনে বিশ্বাসী পিতা তাঁর আদর্শ মানুষ। আর ছিলেন জ্যাঠতুতো দাদা রঙ্গীন হালদার, বেশ কিছু বয়সে বড় নানা বিদ্যায় পারঙ্গম, যাঁর হাত ধরে তিনি জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁর ওপর এই মানুষটির প্রভাব দীর্ঘদিন প্রবল ছিল। নোয়াখালিতে বাল্যের কৈশোরের স্মৃতি বর্ণনায় জ্যেঠামশায়, জ্যাঠাইমা, মা কিংবা মুসলমান ফকির মামু বা পথের মানুষ রাধানাথ সাধুর পরিচয় জ্ঞাপনে প্রকাশ পায় তাঁর মানুষকে দু-চোখ ভরে দেখার একাগ্রতা—পরবর্তীকালেও যা বজায় আছে শুধু নয়, তীক্ষ্ণ হয়েছে। নোয়াখালির প্রাকৃতিক পরিবেশ, বর্ষাপ্রধান জলময় ভূখণ্ড তাঁর বর্ণনায় আকর্ষণীয় রূপ পেয়েছে। জলছিঁড়া নদীতে বান আসত না, আসত শর—সেই শরের বর্ণনা দেন আশ্চর্য তীক্ষ্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খতায়, নিকটবর্তী মানুষজনের আচরণ সমেত। তার আগে নদীতে শর আসার প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল মেটান—বান আর শর তো সমার্থক, কিন্তু শর তো তৎসম শব্দ নোয়াখালির মুসলমান-প্রধান সাধারণ

মানুষ কি করে আমদানি করল-লোকশব্দের ভাণ্ডারে—সংশয় থেকে গেছে তাঁর শব্দটার ব্যুৎপত্তিতে। লেখার ভঙ্গিটা প্রায়শ এমনই। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে স্বচ্ছন্দ আসা-যাওয়া, লোকজীবনের প্রতি আগ্রহটা সাধারণভাবে থাকেই।

কিন্তু নোয়াখালির পেতিবুর্জোয়া শহরের, উকিলমোক্তারডাক্তার-কেরানী-দারোগাদের আড্ডার চারপাশে তাঁর দিনযাপন। মুসলমানপ্রধান সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় প্রকট নয়। বঙ্গবিদ্যালয় ও ইংরেজিবিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহপাঠীদের পারিপার্শ্বিকেই আবদ্ধ। একমাত্র ব্যতিক্রম যজ্ঞেশ্বরদের কর্মকার পরিবার, অবশ্য সেখানেও একটা 'সহজ আটপৌরে সদাচারের ছাপ' তাঁকে তৃপ্ত করে। বাল্য-কৈশোরের গৃহপরিবেশ ও স্বদেশীসাধনার অভিজ্ঞতা অন্যত্র বিবৃত হয়েছে 'পূর্ব বাঙলায় স্বদেশী সাধনাকে প্রথম যে রূপে চিনলাগ তার সবটা মঙ্গলের নয়। বিদ্রোহে তা দৃপ্ত সবল, কিন্তু বিক্ষোভেও তা বক্র বিসর্পিত। অথচ আমার গৃহের আবহাওয়ায় উগ্রতা ছিল না, বক্রতাও না।' উকিলের বৈঠকখানার বিশ্রম্ভালাপে-দেশবিদেশের রাজনীতির সঙ্গে পরিচয়, সে-পরিচয় পরিবেশানুসারে গভীর-ব্যাপক নয়, অস্থির উন্মাদনাও ছিল না তাতে।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, কার্জন-রমেশ দত্ত-গোখলের বিতর্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংসের ইমপিচমেন্ট বিষয়ে বার্ক শেরিডেন ফকসের বক্তৃতা। আর সে-আড্ডার বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেত বাঙলা ইংরেজি কবিতার আবৃত্তিতে। ফলে রঙ্গলালের স্বাধীনতা-হীনতা সংক্রান্ত বাণী থেকে স্বরাজে জন্মগত অধিকার-সচেতন টিলকের উক্তি মিলে 'সাহিত্যিক-স্বাদেশিক' ছাপ পড়েছিল মনের ওপর মোটাদাগে। এই সাহিত্যপ্রীতি ও স্বাদেশিকতার বোধ পারস্পরিক পরিপোষক বলে মনে হয় তাঁর। 'বাঙলাসাহিত্যের পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে বুঝেছি ও বলেছি সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম মূলত একই সত্যের দুপিঠ। বিশেষ করে আমার এ অনুভূতি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথেরই দান। আমাদের সাহিত্যিকরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, আমাদের রাজনীতিকরাও সাহিত্যের উজ্জীবনে প্রবুদ্ধ হতেন। উদ্বোধন সঙ্গীত ছাড়া আমাদের রাজনীতিক সভাও হয় না, কংগ্রেসও না।'

নিজের মধ্যেও এই প্রবণতা অনুভব করেছেন যুগ-প্রভাবেই। কিন্তু ব্যাপারটা হাজির করেন নিজের ক্ষেত্রে দুধ ও তামাক খাবার গড়াঢরচন্দ্রীয় সাধ হিসাবে। কিংবা অন্য রচনায় এ যুগের আরেক মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ

করতে গিয়ে বলছেন 'সব কিছুতেই জিজ্ঞাসা, সব কিছুরই পিপাসা, সব কিছুর জন্য চাই মনন, সব কিছুর জন্যই চাই অনুভূতি—কালের তখন এই দাবি।'—আর নিজের সর্ববিদ্যাজ্ঞানে আগ্রহ বারবার চিহ্নিত হয় 'পল্লবগ্রাহিতা' নামে। দুটি উদাহরণই একটা অ্যাটিচ্যুডকে প্রকাশ করে। যে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবেশে জন্ম ও জীবনচর্যা সেখানে এমন সুযোগ পেয়েও আত্মকীর্তন পরিহারের সাধনা কোথাও ছিল না, কিন্তু অদ্ভুতভাবে নিজে বর্জন করে ফেলেন বাঙালি মধ্যবিত্তের বহু লালিত অহমিকা-আত্মপ্রচার, যার স্পর্শে জনৈক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিরই এ-আত্মজীবনী অনন্য হয়ে ওঠে—যিনি কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালির বহু মূল্যবোধে আস্থাশীল—প্রকাশও করেন নির্দ্বিধায়।

অবশ্য তাঁর আত্মকথনে বারবার উল্লেখ করেছেন এক ধরনের হীনমন্যতার কথা, সঙ্কোচ দ্বিধার কথা, যা নাকি সারাজীবনই তাঁর সঙ্গী। গৃহপরিবেশে পিতার ইমেজ কিংবা কৈশোরে যৌবনারম্ভে রঙ্গীন হালদারের ব্যক্তিত্বের আশ্রয়, তিন থেকে সাতবছর বয়সে 'একান্নবর্তী বাড়ির বড়দের ছায়ায় ঢাকা আবার রূপে গুণেও চাকচিক্যহীন' এসব থেকে গজিয়ে ওঠে। তারই কখনও তির্যক কখনও প্রত্যক্ষ প্রকাশ লক্ষ করেছেন আপন আচার-আচরণে। এ প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন 'তাতেই কি বাড়ে অনুভূতির জোর ও বিচারবুদ্ধির ঝোঁক।' বাঙলাদেশের বহু কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকেও নিজেকে গুণ্ঠিত করার প্রবণতা আত্মজীবনীতে আছে, প্রমাণ আছে বিচারবুদ্ধির ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতার।

সম্ভবত সেই বিচারবুদ্ধি অনুভূতি ও কর্মসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি রাজনীতি ও কর্মোদ্যোগে মধ্যবিত্তসুলভ বহু চাঞ্চল্য ও হতাশ অধৈর্য জয় করে হয়ে ওঠেন অ্যাননিমাস ইণ্ডিয়ার সাধক! ১৯১৬তে প্রথম তৎকালে প্রচলিত 'স্বদেশী', যাকে তিনি অ্যানার্কিস্ট বা টেররিস্ট নাম দেওয়ার বিরোধী, নাম দিতে চান মিলিট্যাণ্ট ন্যাশানালিস্ট, তার সঙ্গে যোগাযোগ।

তারপর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসেরই লোক, কিন্তু প্রশ্নাতীত আত্মসমর্পণে নয়। অহিংস-সহিংস পথের বিরোধে, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েনে দীর্ণ বাঙলাদেশের সে-আন্দোলনের বর্ণনায় এবং তাঁর প্রশ্নময় অংশগ্রহণে—বাঙালিরই মূর্ত ছবি। ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণ এমনভাবে হাজির করেন যে তাতে ব্যক্তিবুদ্ধির উজ্জ্বল চমক অলক্ষ্য হয়ে যায়, হয়ে ওঠে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত সংগ্রামী বাঙালিরই মনোভঙ্গি।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত খেলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন এমনকি স্কুল কলেজ বয়কটের সিদ্ধান্ত কতখানি গ্রাহ্য সে সম্পর্কে সংশয় নিয়েই এগিয়ে যাওয়া। স্বীকার করে নেওয়া গান্ধীজীর তৎকালীন নীতির আপেক্ষিক সার্থকতা। 'এক সক্রিয় কর্মনীতি (প্রোগ্রাম) জনভিত্তিক (পপুলার) প্রতিষ্ঠান আর সত্যিকারের একটা জীবন্ত সংগঠন—গান্ধীজীর আবির্ভাবের পরে এক বছরেই জাতীয় রাজনীতিতে এল এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গান্ধীজীও কি এ অর্থে unconscious instrument of Revolution নন—যতই হোন তিনি conscious instrument of non Revolution?' সেই পথেই হিন্দুমুসলমান প্রশ্নের জোড়াতালি সত্ত্বেও বাঙলার লক্ষ মানুষের সক্রিয়তা, কারাবরণ, স্বাদেশিকের চেতনা, শত উপেক্ষা অবহেলা রাজদণ্ড লাঞ্ছনা সয়ে অগ্রগমন লক্ষ করে প্রশ্ন করেন 'তখন এক একবার মনে হয়—সত্যই আমরা বাঙালিরা শুধু রোমান্টিক, আবেগসর্বস্ব মানুষ তো নই। আবেগকে দৈনন্দিন কাজের কঠিন চক্রে বেঁধে আমরা স্বাধীনতার স্বপ্নকে কর্মে রূপ দিতেও পারতাম। দুর্ভিক্ষ বন্যায় নানা সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই ১৯০৭-এর অর্ধোদয় যোগের দিন থেকে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের গ্লানির মধ্যেও —এ পরীক্ষা তো আমরা কম দিই নি। ভারতের অন্য জাতিদের থেকে বেশিই দিয়েছি। দেশকে তো সেবার মধ্য দিয়ে আপনার করতে কম চেষ্টা করিনি—যেমনটি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ, চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু কেন এ দশা হল—দেশের মানুষকে এক করতে পারলাম না—বাঙালিই গেল দু'ভাগ হয়ে।'

চরকা, অহিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে, প্রশ্ন জেগেছে একদিকে রামরাজ্য ও অন্যদিকে মুসলিম জহান সম্পর্কে, কিন্তু জন-আন্দোলনের, জন-অংশগ্রহণের ইতিবাচক দিকে জোর দিয়ে সে প্রশ্ন মুলতুবি রেখে এগোনো। চরকাতেই যে স্বরাজের প্রেরণা এমন কথা যুক্তিতে সয় না, অহিংসা তত্ত্ব কি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা ও পালন করা সম্ভব?—সাধারণ মুসলমানের কাছে এ তত্ত্ব হতভম্বকারী নয়? কৌপীন-শিখায়-রামরাজত্বে কি অর্থোডক্স হিন্দু-ঐতিহ্যকেই জাঁকিয়ে তোলা নয় যা নাকি প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির পরিপোষক? জিন্নাহ-র টু নেশন তত্ত্বের সমর্থক?

লক্ষ করেন দিল্লীর জুমা মসজিদের বেদিতে ১৯১৯ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনশ বছরে অভূতপূর্ব ঘটনা জুমা মসজিদের বেদির তলায় দাঁড়িয়ে উপদেশ দেবে অ-মুসলমান। পরে ভোলানাথ

সেনের হত্যা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা বুঝিয়ে দেয় ধর্মান্ধতা শুধু একটা মধ্যযুগীয় পাপ নয়। সব আন্দোলনের মধ্যেও বারবার দেশ হয়ে উঠেছে ধর্মধ্বজীদের প্রেতভূমি। কোন ভ্রান্তির চর্চায়? গান্ধীজী তো নয়ই, বাঙালি স্বরাজী নেতারাও হিন্দুমুসলমান প্যাক্টকে মনে মনে মানেন নি। চিত্তরঞ্জনের অবর্তমানে তাতে জলাঞ্জলি দেওয়া হল। অন্যদিকে জনজাগরণকে জনস্বার্থের ভিত্তিতে গঠন করার লক্ষ্য ছিল না কারও—কৃষক বা খাতকের পক্ষে দাঁড়ান নি কেউ। চিত্তরঞ্জনের শতকরা ৯৫ জনের স্বরাজ দেশের শতকরা ৫ জনের ক্ষমতা লাভের ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। ১৯২৮ সনে বাঙলা ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংশোধনের ভোটাভুটি প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তকে উদ্ধৃত করেন, 'বাংলার আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়।' তবু যখন ১৯৩০এ গৃহীত হল পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প, সংশয়ান্বিত মনেও তার তরঙ্গ স্পর্শ অনুভূত হয়েছে। লবণ সত্যাগ্রহের ডাকে সব প্রশ্ন ছাপিয়ে গ্রাহ্য হয়েছে তার কার্যকারিতা, জনআন্দোলনের সম্ভাবনা এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত শক্তির মিলিত সংগ্রাম।

গান্ধীজীর সামনে হাজির করেছেন চরকাসংক্রান্ত প্রশ্ন, নির্মলকুমার বসুকে করেছেন সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীশ রায়চৌধুরীদের সঙ্গেও ঘটেছে পথ ও মতের অমিল। রবীন্দ্রনাথের সামনে হাজির করেছেন 'অল্পের আত্মদানে সকলের মুক্তি'র যুক্তি। কিন্তু মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিস্টদের জনসংযোগহীন দুঃসাহসিকতা ও আত্মদান, শ্রদ্ধা কাড়লেও, আকর্ষণ করে নি 'কিন্তু রোম্যান্টিক অধীরতায় আদর্শবাদী আত্মদানে তো দীর্ঘপথ খাটো হয় না; চোরাগলিতে শুধু পথ হারাতে হয়।'

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কবির সুদূর অর্থপ্রসারী উক্তি 'বড়ো সমস্যার বড়ো করেই উত্তর দিতে হবে'—তার অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিল। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ তার জটিল স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতালাভ সেইভাবেই দেখতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্যায়নের চেষ্টা করেন গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসেন তখন বলেন: ক্ষমতালাভ কংগ্রেসের হলেও কংগ্রেসের একার জোরে তা হয় নি, পুরোপুরি অহিংসার জোরেও নয়, হিংসার জোরেও নয়, বরং দেশীয় নৌ সৈনিক, বিমান সৈনিক, আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রভৃতিরই তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের জন্যই বোধহয় বেশি সম্ভব হয়। অথবা শুধু এসব ভারতীয় শক্তির প্রস্ফুরণেও নয়, বরং আন্তর্জাতিক

আবর্তনের অনিবার্য ফলেই।' প্রশ্ন করেছেন 'সে-যুগের আবর্তনে স্রোত না থাকলে এখানে এলাম কি করে? তার মধ্যে ফাঁকি না থাকলে এত আবর্জনা স্বাধীন ভারতে এলো কোথা থেকে?'

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে, মনোবলে জয়ের সাধনায়, দেখেছেন দুঃসাহস, ব্যক্তি-গান্ধী সে দুঃসাহসের আধার হলেও, আসল দুঃসাহস সেই কালটার—গান্ধীজী যে-কালের ফসল। গান্ধীজীর অহিংসা স্বদেশে নয়, মানুষের সভ্যতার ধারাতে এক পয়েন্ট অর্জন করেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। 'হয়তো গান্ধীজীর পূর্বে মার্কস লাভ করে থাকবেন ১ পয়েন্ট, লেনিন এক নতুন পয়েন্ট, লীগ অফ নেশনস করেছে শূন্য। অবশ্য পাশের মার্ক পেতে মানুষের চাই অন্তত মোট আরও ৩০।৪০ পয়েন্ট লাভ। অহিংসা বা চরকায় তা হয় নি।'

'এক পয়েন্ট লাভ,—এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কথা শুনে কেউ খুশী হবেন না, গান্ধীজীর শিষ্যরাও না, মার্কসবাদী লেনিনবাদী বন্ধুরাও না, আর মাওবাদীরা আরও না।'

গান্ধীজীর ব্যর্থতা প্রসঙ্গেও বলেন 'মহৎ ব্যর্থতা, মহান প্রাণের জীবন-টীকা। অথবা শুধু তাও নয়। যে-মহান আদর্শই কর্মে রূপান্তরিত করতে যাওয়া যায়, কার্যক্ষেত্রের আবর্তে পাক খেতে খেতে সে-আদর্শের বিশুদ্ধতা আর থাকে না। বেঁকেচুরে সে মানুষের সমাজে মানুষের মতো হয়েই কতকটা সার্থক। তা দেখি খ্রীস্টধর্মের বেলা, তা দেখি বৌদ্ধ ধর্মের বেলা। আর তাই কি দেখি না পঞ্চাশ বছরেই গান্ধীজীর আদর্শের ইতিহাস, কিংবা মার্কস-লেনিনের আদর্শের বিবর্তনে? অথচ, এই ব্যর্থতাই কি চরম হিসাব—খ্রীস্টের, বুদ্ধের, গান্ধীজীর? এমন কি মার্কস লেনিনের?' দৃষ্টিভঙ্গিটা দ্বন্দ্বময় অগ্রগমনে বিশ্বাসী বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের।

৪

রাজনীতি পড়া আত্মজীবনীতে সাহিত্যচর্চা ও ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার পরিচয় গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতায় যেমন আছে সতীর্থদের সঙ্গলাভজনিত অনুভূতির নানা কৃতজ্ঞ প্রকাশ, তেমনি অধ্যাপক ও বিদ্যায়তনের বিষয়ে একটু সমালোচনামূলক এবং হতাশ মনোভাব। কিন্তু সর্বত্রই মানুষকে দেখতে চেয়েছেন, অবজ্ঞায় নয়, শ্রদ্ধায়-মর্যাদায়।

জীবনে যার সান্নিধ্যে যেটুকু পেয়েছেন তার স্বীকৃতি গ্রন্থখানিতে সব থেকে বেশি করে চোখে পড়ে।

নোয়াখালির 'দেশের বাণী' পত্রিকায় যে কলম চালনার সূত্রপাত, কলকাতায় সজনীকান্ত দাসের সান্নিধ্যে, 'প্রবাসী'র ছত্রচ্ছায়ার তার প্রতিষ্ঠা, বাঙলা ভাষার অগণ্য পত্র-পত্রিকায় বিস্ময়করভাবে বিচিত্র বিষয়ে তার ব্যাপ্তি। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষে', 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগেই লিখেছেন। পরে 'মডার্ন রিভিয়ু'তে লিখেছেন, 'ওয়েলফেয়ারে' চাকরি করেছেন। আত্মজীবনীর কোথাও সেসব রচনার নামোল্লেখ নেই, বিষয় বা কৃতিত্বেরও। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে একবার উল্লেখ করেছেন, আর গোপীচন্দ্রের গান বিষয়ক রচনাটির ক্ষেত্রে আরেকবার। সাহিত্যে সহকর্মীদের উল্লেখ করেছেন রথারোহী অশ্বারোহী হিসাবে আর নিজেকে পদাতিক প্রমাণে সদাব্যস্ত।

সহপাঠীদের মধ্যে সজনীকান্ত-সুধীন্দ্রনাথ বেশি মনোযোগ পেলেও, অন্যান্যদের কাছেও যেটুকু পেয়েছেন উল্লেখ আছে তার। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পিতার কাছে পাওয়া আভিজাত্য আর পিতৃব্যসূত্রে প্রাপ্ত নাটকীয়তার সংমিশ্রণ হিসাবে অঙ্কিত চিত্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ছাত্র সুধীন্দ্রনাথ-অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের সংঘর্ষের বিবরণে। যদিও এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রদত্তীয় আচার-আচরণ তাঁর অনুমোদন পায় নি। বরং তিনি সজনীকান্তের গ্রাম থেকে এসে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি সপ্রশংস। সাহিত্যচর্চার সূত্রে সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কাছাকাছি এসেছেন—প্রকাশ করেছেন তাঁদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের কণামাত্র গুণও যে-যে-বিষয়ে ছিল, গোপাল হালদারের আত্মজীবনীতে তার মর্যাদাবান উল্লেখ আছে। আর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ছাত্র হিসাবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। এই মনীষী তাঁর কাছে তেমনিই একজন নিকটতম মানুষ 'যারা আমার ব্যক্তিসত্তার পক্ষে অপরিমেয়।'

মত ও পথের গোঁড়ামির চেয়ে মানবিক সম্পর্ক, সৌজন্যবোধ, অন্যের প্রতি যোগ্য মর্যাদাদান তাঁর কাছে মূল্যবান। তাই বুঝি রাবীন্দ্রিক হয়ে, সবুজপত্রের দলের হয়েও, মানবিক সম্পর্কের সূত্রেই প্রবাসী শনিবারের চিঠির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। আর সেই মনোভাব থেকেই ১৪নং পার্শিবাগানের গিরীন্দ্রশেখর-রাজশেখর বসুর গৃহের আড্ডা আলাদাভাবে স্মরণীয় হয়ে

থাকে। 'মধ্যবিত্ত জীবনের তিক্ততাহীন একটা রূপ'। 'বিলুপ্ত বাঙালি ভদ্রলোকের প্রতীক।'

কিন্তু তাই বলে ছাড়েন নি কাউকে। 'রূপনারানের কূলে' কোনো-মতেই সাধারণ-অসাধারণ মানুষের মিছিলে অভিভূত-মুগ্ধ কোনো ব্যক্তির মুক্তকচ্ছ উচ্ছ্বাস নয়। রাজনীতি-সাহিত্য প্রসঙ্গে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করেছেন অন্যের ক্ষেত্রে যেমন, নিজের বেলাতেও তেমনি। অন্যের বেলায় সূক্ষ্মতায়, চাপা অভিব্যক্তিতে। গান্ধী নীতি বা গান্ধীশিষ্যদের প্রতি কটাক্ষ হয়ত সর্বদা চাপা থাকে নি, বিশেষত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন যখন জড়িত থেকেছে। কিন্তু এ ছাড়া সে-অর্থে আক্রান্ত হন নি কেউ।

মোহিতলাল মজুমদারের শেষদিকের হতাশাজনিত ক্ষ্যাপামি ও ডগমার প্রতি মনোভাব গোপন থাকে না। সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত শেষ প্রবন্ধে নানা চমকদারি দায়িত্বহীন উক্তিকে 'নাটকীয়তার দুর্বুদ্ধি' বলতেও ছাড়েন না। রামমোহন-বর্জনের যে বুদ্ধি পরিশীলিত সুশীলকুমার দে মহাশয়দের ছিল তাকে নির্বুদ্ধিতা বলেন বা যে বাঙালি তত্ত্বে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সমেত তাঁদের গোষ্ঠীর বিশ্বাস ছিল সেখানে যে তাঁরা নিজেরাই একমত ছিলেন না এটা লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছেন। সজনীকান্ত দাস তাঁর পরমাত্মীয় সুহৃদ কিন্তু তাঁর সাহিত্যধারণার গণ্ডগোল বোঝাতে বিষ্ণু দে কথিত ঠিকানার গল্পটাই দিয়েই শুরু করেন, গরঠিকানা কল্লোলী, নিজেই বলেন এক-আধবার। আর নীরদচন্দ্র চৌধুরী, তাঁর 'ভূরিদ সুহৃদ' যাঁর কাছে বারবার ঋণ স্বীকার করেন, গুণমুগ্ধ হন, একই গৃহে থাকার সূত্রে তাঁর চিত্তচমৎকারী কর্মকলাপ ও মতামত জানতে পারেন ও পঞ্চমুখ হন। যদিও মানেন না মতামতের এক-দশমাংশও। সব কিছু বাদ দিয়ে সমরকুশলীর দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে নীরদবাবুর স্বভাবসুলভ উক্তি অন্তত দুবার উল্লিখিত হয়ে ধূলিসাৎ হয়।

সব মিলিয়ে ফুটে বেরোয় জীবনাগ্রহ। যে-জীবনকে তিনি কোনো-মতেই কোনো লেবেল আঁটা দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেন না, বিচারও করেন না। 'জীবন চিরদিনই জীবন। রামের যুগে এবং সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের দুর্যুগেও।' গড্ডলিকার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'জগৎ প্রপঞ্চেও প্যাটার্ন আছে, কিন্তু উলে কুলোয় না। মানুষকে দিয়ে জাগতিক পশমে

মহাগৃহিনী লিখিয়ে নেন—দি ক্যাট, তারই নাম দর্শন।' এই মনোভাব নিয়ে জীবনকে দেখাতেই এসেছে একটা সামগ্রিকতা।

সুতরাং গোপাল হালদার বাঙলা ভাষায় একটি অনন্য আত্মজীবনীর রচয়িতা। আত্মকথন যেখানে ছলে বা বলে অত্যাচার হয়ে ওঠে নি। নিজের ভূমিকা এবং মতামত যেখানে অন্যদের সঙ্গে সমমূল্যে হাজির করা হয়েছে, পক্ষপাত বা অপক্ষপাত যা প্রকাশ পেয়েছে তাকে সহমর্মীর বা সহকর্মীর বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না—কোনো জ্ঞানতপস্বী বা কর্মবীর বা মহাবিপ্লবীর নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাপন করে অবশেষে প্রমাণ করার চেষ্টা নেই যে, সে-জীবন জঘন্য।

'রূপনারানের কূলে' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের নাম কৈশোরক, দ্বিতীয় খণ্ড যৌবনের জয়টীকা—গোপাল হালদারের জীবনকথা এখানে সম্পূর্ণ নয়। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় সম্পূর্ণ করার দায় থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। এমন ব্যক্তিত্বের এমন অনন্য আত্মজীবনী সম্পূর্ণ না হওয়ার আক্ষেপ আমাদের সকলের থেকে যাবে।

উপন্যাস ও আত্মজিজ্ঞাসা

দেবেশ রায়

গোপাল হালদারের পাঠক, এখন, 'রূপনারানের কূলে'-র দু-খণ্ডই বেরিয়ে যাওয়ার পর, মিলিয়ে নিতে পারেন তাঁর উপন্যাসমালাগুলির কোনো কোনো অংশের সঙ্গে আত্মজীবনীকে। তেমনি হয়ত, আরেকটু অস্পষ্টতায়, মিলে যায় মন্বন্তর নিয়ে তাঁর নানা ধরনের লেখার সঙ্গে তাঁর মন্বন্তর উপন্যাস-ত্রয়ীটি।

এই মিলটা খুব আপতিক নয়, যেমন ঘটেই থাকে জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসের। আবার, এই মিলটা নয় শুধু অভিজ্ঞতারই প্রসারণ, যেমন ঘটে থাকে উপন্যাসের শিল্পে ব্যক্তি থেকে সর্বজনীনে।

যেন মনে হয়, তাঁর উপন্যাসমালাগুলিও আত্মজীবনী। বা, এখন, বিপরীতে, তাঁর আত্মজীবনীটিও উপন্যাস। উপন্যাসগুলি লিখে ওঠার এতগুলো বছর পরে কেন তাঁর আত্মজীবনীরও প্রয়োজন? এই দুই-এর ভেতর কি কোনো ধারাবাহিকতা আছে? বা, অন্বেষণের মিল? সেই অন্বেষণ থেকে অনুমান প্রসারিত করা যায় কি তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট কোনো নির্মাণে?

১

'রূপনারানের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে ১৯৩২-এ, 'সেই এপ্রিলের প্রত্যূষে (২৪শে এপ্রিল, ১৯৩২) পরোয়ানা নিয়ে এসে গেল পুলিশ,—আমার যৌবন পেল রাজটীকা'। এর পর তাঁর ছ-বছর কারাবাস। তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবেও শোনা যায়, জেলে গিয়ে মনে হচ্ছিল, যে-রাজনীতি আর-আন্দোলনের ভেতর থেকে তাঁকে উপড়ে আনা হলো জেলখানার বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতায়, এখন তার অভিজ্ঞতাগুলোকে একটু যাচাই করা দরকার। আর লেখা ছাড়া তো যাচাই হয় না—উত্তপ্ত এক আবেগে, প্রায় ঘোরের মধ্যে মাত্র সাতদিনে 'একদা' উপন্যাসটি লেখা হল—আগের সংস্করণগুলিতে রচনাকাল উল্লিখিত থাকত, 'ত্রিদিবা'-সংস্করণে নেই।

'একদা'-র ঘটনাকাল ১৯৩০-এর ডিসেম্বরের একটি দিন। অমিত রাজনীতির ঘূর্ণির ভেতরে বটে কিন্তু সব কিছু থেকে সে একটু আলগা। সমস্ত বিপ্লবের সংগঠন, অহিংস অসহযোগের আন্দোলন, সাহিত্যিক নানা

প্রয়াস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র চর্চা, এই সব কিছুর ভেতরে আপাদমস্তক লিপ্ত অমিত মনে মনে যেন এই সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন। তাই প্রত্যেকেই অমিতকে ভালোবাসে, কিন্তু কেউই অমিতকে তার নিজের মনে করে উঠতে পারে না। যাঁরা তার সবচেয়ে নিজের সেই মা-বাবা-ভাইবোন থেকে অমিতের বিচ্ছিন্নতা যেন এই ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতারই রূপক হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু পরাধীন দেশের এ যুবক তো তার এই বিচ্ছিন্নতার বোধকে জীবনের পরিচয় হিসেবে মেনে নিতে পারে না। সেখানে তো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সব প্রয়াসেরই ভেতর থাকে কোনো এক মিল। সে মিলের পক্ষে অমিতের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের বহুস্পর্শিতা বড় এক অবলম্বন। তাই, সব আত্মচিন্তা সত্ত্বেও রাত্রিশেষে 'সবুট পদধ্বনি' অমিতেরই 'দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গেল।' অমিতের যৌবন পেল রাজটীকা। 'রূপনারানের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ডের আর 'একদা'-র সমাপ্তি, ঘটনায় তো একই, যেন প্রায় ভাষাতেও এক। আত্মজীবনীর দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—'রাজপথ-জনপথ'—যেন মনে হয় 'একদা'-রই একটি খশড়া। অথচ দুই-এর রচনাকালের পার্থক্য তো প্রায় অর্ধশতকের।

কি সেই ধারাবাহিক জিজ্ঞাসার তাড়না—সেদিনের ত্রিশ থেকে আজকের অশীতিপ্রায় পর্যন্ত অর্ধশতকের?

২

'ভাঙন' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ও 'ভাঙনী কূল' উপন্যাসের বাংলাদেশ-সংস্করণে লিখেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগত আলাপেও জানা—ঐ জেলখানাতে এই 'একদা' লেখার আগে তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ ও ধ্বংসের ইতিহাস লিখবেন। জেলখানার এই ভাবনা সেখানকার বিশেষ পরিস্থিতি থেকে তৈরি হয় নি। বাংলার সামাজিক ইতিহাস চর্চার একটা তাড়া বোধহয় ভেতরে-ভেতরে ছিল। থাকারই কথা। একটি সুসংবদ্ধ মধ্যবিত্ত পরিবারে উদার পিতা ও সুহৃদ অগ্রজের প্রশ্রয়ে মনের যে-বিকাশ ঘটেছিল, তার নিয়মেই চেতনার অনেক গভীরে চারিয়ে গিয়ে থাকতে পারে দেশ ও জাতির বিকাশের প্রশ্ন, সমাজ ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্ক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে যুগান্তর দলের বিপ্লবী দাদারা পর্যন্ত, নোয়াখালির ক্ষিতীশদা, 'দেশের বাণী'

থেকে শুরু করে ডাণ্ডি অভিযানের গান্ধীজি পর্যন্ত তো শুধু জিজ্ঞাসারই শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে সেই তরুণ মনে। সে-কাহিনীই তো 'রূপনারানের কূলে'—দু-খণ্ড জুড়ে লুকনো।

জেলখানায় বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশের সামাজিক ইতিহাস লেখার উপাদান-উপকরণের অভাব মেটাতে লেখককে তাঁর পরিচিত পরিবেশকেই বাছতে হয়। তা থেকেই নানা ভাবে আকার নেয় তাঁর বিরাট উপন্যাস-কল্পনা, ১৮৫৭ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত বিস্তৃত বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের সাগা। এ উপন্যাসের প্রাথমিক খশড়া চলতে থাকে জেলখানাতেই। ১৯৩৮-এ জেল থেকে বেরোবার পর প্রথম প্রকাশিত হয় একদা (১৯৩৯)। আর ঐ পরিকল্পিত উপন্যাসমালা বেরতে শুরু করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে, সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত হয়ে।

একটু খতিয়ে দেখা যাক, কোন ক্রমে উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ লেখা হয়ে উঠছে ও বেরচ্ছে। ভাঙন (১৯৪৭), স্রোতের দীপ (১৯৫০), উজান গঙ্গা (১৯৫০) এই তিনটি উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯২৫ থেকে ১৯৩০। এই তিনটি বেরোতে বেরোতে তাঁর প্রাথমিক ছকের বদল ঘটে গেছে। 'ভাঙন'-এর ভূমিকাতে জানান—এখন এই ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ের দুটি ভাগ, 'ভদ্রাসন' ও 'লোকালয়'। 'ভদ্রাসন' পর্বের শেষ উপন্যাস 'ভাঙন'। ছাপার সুবিধের জন্যই 'ভাঙন' তিনটি আলাদা বই হয়েছে। তখন সে তিনটির প্রস্তাবিত নাম 'গ্রহ-বিগ্রহ', 'শতাব্দীর স্রোত', 'উজান গাঙ'। আমরা শেষতম ছাপায় অবশ্য পাই, 'ভাঙনী কূল', 'স্রোতের দীপ', 'উজান গঙ্গা'। 'লোকালয়'-পর্বের উপন্যাস আর লেখা হল না। আর তাই বোধহয় পরে, নতুন সংস্করণে 'ভদ্রাসন'-এর উল্লেখও নেই। 'ভদ্রাসন'-পর্বের শেষ ভাগ 'ভাঙন', তাহলে তার প্রথম ভাগ কি? 'ভূমিকা', 'নবগঙ্গা', 'জোয়ারের বেলা'। ১৮৫৭ থেকে ব্রাহ্ম-আন্দোলন পর্যন্ত, উনিশ শতকের প্রায়-শেষার্ধ, এই তিনটি উপন্যাসের ঘটনাকাল। লেখা শেষ ও প্রকাশিত হচ্ছে যথাক্রমে ১৯৫২, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪-তে।

তাঁর এই সমগ্র বিষয়কে বা সময়ের এই সমগ্রতাকে গোপাল হালদার লক্ষ করছেন কোন ধারাবাহিকতায়? প্রথমে ১৯৩০-এর সংক্রান্তিকাল ('একদা')। তারপর একটু পেছিয়ে 'একদা'-র পিতা-পিতৃব্যের মধ্যকাল ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ ('ভাঙনী কূল', 'স্রোতের দীপ', 'উজান গঙ্গা')। তারপর, আরো পেছিয়ে দু-পুরুষ আগের কাহিনী ১৮৫৭ থেকে ১৯০০

—'ভূমিকা—মধ্যগঙ্গা-জোয়ারের বেলা'। মাঝখানে ফাঁক থেকে গেল ১৯০৫ থেকে ২৫ সাল—স্বদেশী আন্দোলন থেকে প্রথম অসহযোগ। সে কাহিনী আর লেখা হয়ে ওঠে নি।

৬

বর্তমান থেকে অতীতে এই ধীরে-ধীরে চলে যাওয়া কোনো সরল গতিতে ঘটে নি। দুটি উপন্যাসের মাঝখানে এসে গেছে মন্বন্তর নিয়ে লেখা তাঁর তিনখণ্ড বড় উপন্যাস—'উনপঞ্চাশী-পঞ্চাশের পথ-তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৬) ও 'একদা'র পরবর্তী দুই খণ্ড—'অন্যদিন-আর একদিন' (১৯৫০-৫১)।

যুদ্ধ ও মন্বন্তর বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে সক্রিয় অভিঘাত। কিন্তু গোপাল হালদার-এর এই উপন্যাস-ত্রয়ী তার একমাত্র ক্রনিকল। হয়তো এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ-মন্বন্তরের বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাস রচনা। তখনকার খবরের কাগজ খুঁজলে এ-উপন্যাসের অনেক ঘটনা পাওয়া যাবে। সেদিন যাঁরা দুর্ভিক্ষবিরোধী কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন তাঁদের কাছেও অনেক ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় যা এ উপন্যাসে আছে। এর অনেক চরিত্রের বাস্তব আদর্শ চিনে নিতে আজও খুব কষ্ট হয় না। আর এই সব কারণেই হয়ত তখন এই উপন্যাসকে অনেকের মনে হয়েছিল—যেন সাংবাদিকতা, একটু বেশি পার্টিজান, সাহিত্য হিসেবে একটু ন্যূন।[১]

১৮৫৭ থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ ও ধ্বংসের কাহিনীর অতীতের ভেতর ১৯৪৩-এর বর্তমানের এই প্রক্ষেপ ঘটে যায়। আবার প্রক্ষেপ ঘটে —'একদা'-র অমিতের ১৯৩৯-এর ও ১৯৪১-এর কাহিনী লেখা হয় ১৯৫০ ও ৫১-তে। সেই যে যুবক জাতীয় আন্দোলনের এক সংক্রান্তিতে তার অবাধ্য মন ও স্বাধীন মন নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসার যাত্রা শুরু করেছিল, সে সেই জিজ্ঞাসার মোহনায় পৌঁছয়—যেখানে বিশ্বইতিহাসের অনিবার্য গতি

১। তার কোনো উপন্যাসেরই, শিল্পবিচার এই রচনাটির বিষয় নয়। তবু, একটু আঁচ করতে ইচ্ছে হয়—এই উপন্যাসত্রয়ীর সমতুল্য প্রয়াস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর না-ঘটা সত্ত্বেও শিল্পকর্ম হিসেবে এটি যে সম্পূর্ণ সংহত হয়ে উঠতে পারে না তা কি উপন্যাসের কর্মটি নেয়ার ফলেই—যে-কর্মে ব্যক্তির দাবিই সবার ওপরে। সাংবাদিকতা তখন যদি আজকের মতো সাবালক কর্ম হয়ে উঠত তবে হয়ত এই ক্রনিকলের প্রয়োজনই হত না গল্প-কাহিনি-চরিত্রের ছদ্মবেশে, যেমন হয়নি আধুনিক পেন্টাগন পেপার্স, ওয়াটার-গেট পেপার্স, বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কতকগুলি লড়াইয়ের সাম্প্রতিক সোভিয়েত-আখ্যানে। কিন্তু তাতে উপন্যাসত্রয়ীর ক্রনিকল-হিসেবে মূল্য অপরিবর্তিতই থাকে।

আর তার নিজের ভূমিকার ভেতর সে কার্যকারণের অবিচ্ছেদ্য যোগ আবিষ্কার করে ফেলে—অল রোডস লিড টু কমিউনিজম। সমকালীন ইতিহাসের বর্তমানতম পর্যায়ের এক কাহিনীর পর গোপাল হালদারের উপন্যাস প্রকল্পের প্রাচীনতম সময়ের (১৮৫৭-১৯০৩) কাহিনী প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস রচনার শুরুতেই তাঁর পুরো প্রকল্পের ছক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অতীত আর তাঁর রক্তাক্ত সমকালীন একই কালে, প্রায় একই সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কর্মের প্রবল শপথ আর রক্তকণিকার ইতিহাস-পরীক্ষা হয়ে ওঠে এতই সম্পৃক্ত যেন একটি ছাড়া অপরটির কোনো অর্থ নেই। শতাব্দী জুড়ে নিজেকে ছড়িয়ে আত্মপরীক্ষার এ কোন চেষ্টা?

৪

সময়ের ব্যবধানে আজ তাঁর রচনাবলির সমগ্রতাকে দেখা সম্ভব। তাতে তাঁর রচনাগুলির হয়ে ওঠার একটি ছন্দ ধরা পড়ে—সমকালীনকে ইতিহাসে স্থাপন। এই হয়ে ওঠাটি আবার তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন-আন্দোলনের লয়ে বাঁধা। তাঁকে সারাজীবন নানারকম লেখাই লিখতে হয়েছে। সেই লেখাগুলির কোনোটির বিচ্ছিন্ন বিচার সম্ভব নয় এই কর্মের লয় আর এই রচনার ছন্দ থেকে সরিয়ে। তেমন বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় হয়ত দেখা যাবে—ঐ লয় আর ছন্দে বিশিষ্ট কোনো লেখা হয়তো রচনা হিসেবে তত গুরুত্ব পেয়ে উঠতে পারছে না। গোপাল হালদারের ক্ষেত্রে রচনার সমগ্রতাটি সবচেয়ে গুরুত্বের।

এখন, তাঁর এই রচনার ছন্দের—সমকালীনকে ইতিহাসের কাছে নিয়ে যাওয়া—হয়ে ওঠার একটা পদ্ধতিও আন্দাজ করা যায়। মনে হয়, বিশ্লেষণের পদ্ধতি সেটি নয়, নয় যেমন নিছক মিলিয়ে দেবার পদ্ধতি। তাঁর ব্যক্তিত্বের গড়নটা ধরা পড়ে যখন দেখা যায়, তিনি বিশ্লেষণ করেন—কিন্তু তার সমাধান নিশ্চিত করেন না, যেমন, মেলানোর জন্য ঘটান না কোনো এক সর্বজনীনের আরোপ।

সামাজিক-রাজনৈতিক কাজ, যাকে দর্শনের ভাষায় বলে প্র্যাকসিস, আর রচনার কাজ, সৃষ্টি—একই সঙ্গে ঘটে বলে, তাঁর ক্ষেত্রে অব্যবহিতকে তার বাস্তবতা থেকে নিষ্কাসিত করার কাজ চলে বোধহয় সেই অব্যবহিতের লগ্ন থেকেই। সেই নিষ্কাসনের জন্য সেই অব্যবহিতে ঘটে

যায় ইতিহাসের সংক্রমণ। সেই সংক্রমণে অব্যবহিত আর ইতিহাসের কার্য-কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মিলেমিশে যায়, গ্রহণ-বর্জনের প্রচলিত ছক ভেঙে যায়। যা বর্জনীয় ঠেকে প্রথম দেখাতেই, তার ভেতর গ্রহণযোগ্য উপাদানের খোঁজ পাওয়া যায়। আর, আপাত-গ্রহণযোগ্যও হয়ে ওঠে কতক অংশে বর্জনীয়।

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে এই মিশ্র প্রক্রিয়ার ফলে, তাঁর কাছে খুব নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আশা করে অনেক সময় হতাশ হতে হয়। কখনো মনে হতে পারে তিনি যেন অতিবিস্তারের আড়ালে আত্মরক্ষা করছেন। আবার, কখনো মনে হতে পারে একটি কোনো নন্দনের নিরিখ তিনি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যান।

তাঁর আত্মজীবনীতেও এরকম বারবার ঘটে। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে-কাহিনী আছে, তা ছায়ায় আলোতে অনতিস্পষ্ট। বোঝা যায় না, সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর কতখানি পছন্দ আর কতটা অপছন্দ, সজনীকান্তের কোন ধরনটিতে তাঁর যেন একটু আপত্তি, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসের ভেতর কি লুকনো থাকে প্রত্যাখ্যান, বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের প্রতি অনুরাগের অবাধ প্রকাশে চাপা থাকে একটু অভিমান, তাঁর 'গুরু' সুনীতিকুমারের প্রতি নির্দ্বিধ আনুগত্যেও কি নিহিত কোনো আপত্তি।

এই ব্যক্তিত্বকে একটু অতিমাত্রায় প্রশংসামুখর, একটু কৃতজ্ঞতাপ্রবণ মনে হয়ে যেতে পারে। মনস্তত্ত্বের বিচারে 'কমপ্লেক্স'-এর সরলীকরণও কেউ করতে পারেন।

কিন্তু এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। সমর্থন ও বিরোধিতা, গ্রহণ ও বর্জনের কোনো সরলীকরণ তাঁর ধাতে নেই। তাঁর ব্যক্তিত্বে অব্যবহিত ও ইতিহাস এতই একাকার যে সেই ঘটনার সঙ্গে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিটি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে।

ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই পদ্ধতি হয়তো ঔপন্যাসিক-ব্যক্তিত্বের সহজাত। সেখানে কোনো গ্রহণই শেষ হয় না, কোনো বর্জনও শেষ হয় না আর ঘটনামাত্রেই বহুমাত্রার অন্বয় পায়। একটি উদাহরণ নেয়া যাক।

গোপাল হালদার যখন উপন্যাস লিখছেন না, কাজ করছেন—তখনো তাঁর এই পদ্ধতি সক্রিয়। তাই কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হতে তাঁর

কিছু দেরি হয়—যদিও পার্টির সন্নিহিত তিনি বহুদিনই। নিজের জীবনের পক্ষে এই প্রায় সবচেয়ে গুরুত্বের সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়ে গেলেই সঙ্গে-সঙ্গে ঘটনাটি থেকে সত্য নিষ্কাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি 'সংস্কৃতির রূপান্তর' রচনা শুরু করেন। তাঁর ব্যক্তিগতকে যাচাই করতে চান সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের নৈর্ব্যক্তিক নিরিখে। এই সংখ্যারই আরেক প্রবন্ধে 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর সেই সূত্রগুলি চয়িত হয়েছে, যেখানে দেখা যায় গোপাল হালদার মার্ক্সবাদের তত্ত্বে কি ভাবে বিচার করছেন বাঙালি সংস্কৃতির আদি ও মধ্যন্তরকেও। যা ছিল তাঁর নিজেরই এক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, তার সমর্থনে এই ভাবেই সামাজিক ও সার্বজনীন এসে পড়ে। আর, তার ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের গতি হয়ে উঠতে চায় ব্যক্তি থেকে প্রতিনিধি।

৫

বিশিষ্ট থেকে নির্বিশেষে যাওয়ার এই পদ্ধতি সবচেয়ে স্পষ্ট তাঁর উপন্যাসগুলিতে ও 'রূপনারানের কূলে'—দুই খণ্ডে। মেলালে দেখা যায় তিনি তাঁর পরিবারের কয়েক পুরুষকেই এই ধারাবাহিক উপন্যাসগুলির আধার করেছিলেন। অথচ তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন নির্বিশেষে। তাই তাঁর উপন্যাস আত্মজীবনীর বকলম হয়ে উঠতে পারে না।

ঢাকা আর নোয়াখালির ভেতরে হালদারগোষ্ঠী যখন বিভক্ত, তার আগের কাহিনী 'রূপনারানের কূলে'-তে খুব বেশি নেই। 'উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে···বিদগাঁয়ে এসে নতুন বাড়ি গড়েছেন।' এই হালদার-গোষ্ঠীর ভূমির লড়াই, রচনার ক্রম অনুযায়ী নয়, উপন্যাসের কাল-অনুযায়ী, এই উপন্যাসমালার প্রথমতমটি, 'ভূমিকা'-র, বিষয়। প্রথমতম অর্থেও 'ভূমিকা', 'ভূমি' থেকে বলেও 'ভূমিকা'। চিত্রিসারের চৌধুরী-পরিবার সেখানে তাঁর কাহিনীর আশ্রয়। হালদারগোষ্ঠীর বরদাকান্ত হালদার এই 'ভৌমিকত্বের খোলস' ছাড়েন প্রথম, 'নর্ম্যাল-পাশ করা বরদাকান্ত হালদারও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—অর্থাৎ 'খ্রীষ্টান' হয়ে গেছেন।' 'বাড়ির কর্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা'র হুকুমে বুড়িগঙ্গার ঘাটে বরদাকান্ত 'আততায়ীদের হাতে একদিন লাঠিপেটা হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন।' উপন্যাসে ('নবগঙ্গা-জোয়ারের বেলা') চৌধুরী-পরিবারের রাজীব চৌধুরী ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে চিত্রিসারের চৌধুরীদের থেকে আলাদা হয়ে যান। বরদাকান্ত হালদারের পুত্রকন্যাদের গোপাল হালদার রেখেছেন, 'তার

থেকেও কিছুটা বুঝেছি এই অদেখা মানুষটিকে।' সেই ছেলেমেয়েরাই পরে 'উজান-গঙ্গা'-য় ফিরে আসে সত্য চৌধুরীর পরিবারে।

'ভাঙনী কূল-স্রোতের দীপ-উজান গঙ্গা'-য় সেই মানুষটিই নায়ক, জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী, 'রূপনারানের কূলে'-তে যাঁকে চিনে নেয়া যায় লেখকের পিতা সীতাকান্ত হালদারে। ১৯৪১-এ—উপন্যাসত্রয়ী-প্রকাশের আগে—'সংস্কৃতির রূপান্তর' বইটি লেখক তাঁর পিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন, 'বাংলাদেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে তাহার সংস্কৃতির শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম…'।

'রূপনারানের কূলে'-র প্রথম খণ্ডের পরিবেশ-পটভূমির পরোক্ষ নায়ক গোপাল হালদারের পিতা। যেখান থেকে গোপাল হালদারের জীবনের ইতিহাস শুরু, সেখানকার সময়বিন্দু কিন্তু এই চরিত্রটির ভেতরেই লেখক চিহ্নিত করে রেখেছেন। 'রূপনারানের কূলে'-র আরম্ভ ও শেষ, লেখকের পিতার প্রসঙ্গ দিয়েই, যেমন ঐ উপন্যাস-ত্রয়ীও, জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর কর্ম-জীবনের মধ্যপর্বে শুরু ও শেষ তাঁর মৃত্যুতে।

মাঝখানে, এই তিনটি উপন্যাস জুড়ে, যেমন 'রূপনারানের কূলে'-র দু-খণ্ড জুড়েও—জেলা সদরের মধ্যবিত্ত সমাজ, তার ডেপুটি-মুন্সেফ-কেরানি-উকিল-ডাক্তার, উকিলের বৈঠকখানার আড্ডা, সাহিত্যে আগ্রহ, শেক্সপীয়র-মিলটন, দেশের বাড়ি ও বাসাবাড়ির ভেতর বিভক্ত আনুগত্য, আত্মজীবনীতে বাদামতলার হালদার, উপন্যাসে অচিনতলার চৌধুরীদের এই বেশ বড় ছড়ানো পরিবার।

তাতে এসে পড়ে খিলাফত ও গান্ধিজীর অসহযোগ, চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য পার্টি, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেসের নানা অধিবেশন, রবীন্দ্রনাথ-গান্ধিজী মতপার্থক্য।

তারই ভেতর দেশের বাড়িতে পরিবারের প্রধান মহিলা এই মধ্যবিত্ত পরিবারটির বংশগত ঐতিহ্যরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ, কিন্তু জীবনের অনিবার্যতা তাঁকেও স্রোতে টেনে আনে, আবার, মধ্যবিত্ত ছোট পরিবারের আর-এক বৌয়ের প্রাণপণ চেষ্টা এই নানা পরিবর্তন ও স্রোতের ভেতর নিজের বাড়িটিকে রক্ষা করা, বাড়ির ভেতরে জাতিভেদ-প্রথা আর টিঁকে থাকতে পারে না, ছেলেরা মেয়েরা বাইরে বেরোয়, রাজনীতি করে।

এই উপন্যাসগুলি আর স্মৃতিকথার এই অংশটি পড়লে—জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী ও সীতাকান্ত হালদারের চরিত্রসাম্য একটু বেশি স্পষ্টভাবেই

ধরা পড়ে। যেন মনে হয়, ভবিষ্যতে স্মৃতিকথার জন্য পিতৃ-চরিত্রের কোনো অংশ উপন্যাসের বাইরে রাখেন নি। আর, সে-কারণেই, এই একই চরিত্রের দুটি আখ্যানের তুলনায় ধরা পড়তে পারে সমকালীনকে ইতিহাসে নেয়ার প্রক্রিয়াটি—যে-প্রক্রিয়ার মূল তাঁর ব্যক্তিত্বের ভেতরই নিহিত, যে-প্রক্রিয়ার ওতপ্রোত তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়াসও।

যেন পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এই দুটি রচনা—উপন্যাস ও আত্মজীবনী—তাদের প্রচলিত ধরন পরস্পর বদলে নিয়েছে। আত্মজীবনীর প্রচলিত ছকে তো ভিড় করে আসতে চায় অসংখ্য ছোট-ছোট কাহিনী, অসংখ্য ছোট-ছোট মানুষ আর আত্মজীবনীকারের বিকাশই সেই কাহিনী ও ব্যক্তিদের প্রাসঙ্গিতার একমাত্র সূত্র বুঝি। কিন্তু গোপাল হালদারের পিতৃস্মৃতিতে পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একটি গল্পও নেই। পিতার মুখের কথার যে-দুটি-একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাও তাঁর চরিত্র বিবরণেরই প্রসঙ্গে—মানুষটিকে তুলে ধরতে। আর আছে দীর্ঘ দুটি উদ্ধৃতি, গোপাল হালদারের পুরনো দুটি লেখা থেকে। তার একটি লিখেছিলেন তাঁর পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। এই দুটি উদ্ধৃতির শেষ হয় আধুনিক প্রাসঙ্গিতা বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান,

> …এ শুধু ব্যক্তিচরিত নয়, কতকাংশে যুগাভাস ; মুখ্যতঃ ইং ১৮৭০ থেকে ১৯৩০ অবধি যাঁদের জীবনকাল তাঁদের একটু পরিচয়।… সবাই মিলে তাঁরা একটা যুগ। অথবা যুগাংশ। যুগটা আমার মতে ১৮১৭-তে আরম্ভ হয়ে ১৯১৮-তে শেষ হয়ে যাচ্ছিল—'শিক্ষিত ভদ্রলোকের যুগ।' (পৃ ১৬।১৭)

উপন্যাস-ত্রয়ীতে এই মানুষটিই কেন্দ্র। কেন্দ্র, কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র নন। কারণ তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই এমন, পারিপার্শ্বের ওপরে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না অথচ নিজেদের সবসময়ই আবিষ্কার করে চলেন, সারাজীবন ধরেই, পরিবর্তিত পরিধির কেন্দ্র হিসেবে। তাই আদি বসতবাড়ি আর চাকরি-পেশার বাসাবাড়ির ভেতরে খণ্ডিত আনুগত্য যখন চারপাশে প্রবল—জ্ঞানশঙ্কর দেখেন চৌধুরী বাড়ির শেষ কর্তা হিসেবে তাঁর ওপরই সেই বাস্তুভিটা রক্ষার দায়। আবার চাকরি-পেশার জিলা সদরের সঙ্গে কলকাতার বিরোধ যখন বাধে জীবনের আরেক পর্যায়ে কিন্তু একই সময়ে তখনও তিনি আবিষ্কার করেন তাঁরই ওপর দায় চাপছে—মধুখালি ছাড়ার বা না-ছাড়ার। অথচ যে-ঘটনাগুলোর

ফলে এইসব ঘটছে তার কোনোটির জন্যই তিনি দায়ী নন। চৌধুরী বাড়ির একছেলে ব্যবসা শেখে, এক ছেলে আধুনিক উদারনীতির শিক্ষায় ব্যক্তিমর্যাদায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, এক ছেলে গুপ্ত সমিতি-কংগ্রেস হয়ে কমিউনিস্ট হতে চলে, এক ছেলে খেলোয়াড় ও প্রেমিক, একটু-আধটু নকলও করে, এক ছেলে সরকারি চাকরির বাঁধা সড়কে। অথচ এই সব চরিত্র তো জ্ঞানশঙ্করের পরিবার থেকেই বেরিয়েছে। তাই তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তিত পরিধি জ্ঞানশঙ্করকেও প্রভাবিত করে। ফলে উপন্যাস-ত্রয়ীটি হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞানশঙ্করকে কেন্দ্রে রাখা পরিধির কাহিনী। এঁদের সম্পর্কেই 'রূপনারানের কূলে'-তে 'কালগ্রস্ত' শব্দটি গোপাল হালদার ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসে তিনি তাঁর পরিবার আর পারিবারিক-চরিত্র ও ঘটনার ভেতর থেকে নিষ্কাসিত করতে চাইছেন ইতিহাসের নকশা। উপন্যাসে এই নিষ্কাসনের পদ্ধতি—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের বিবরণ। আত্ম-জীবনীতে তিনি ইতিহাসের নকশার ভেতর থেকে নিষ্কাসিত করছেন পরিবারের ও পারিবারিক চরিত্র ও ঘটনার ভূমিকা। এই নিষ্কাসনের পদ্ধতি সমাজ-সম্পর্কের বিবরণ।

৬

বাদামতলার হালদার, অচিনতলার চৌধুরীদের এই নতুন বংশধররা রঙীন হালদার-গোপাল হালদার-প্রফুল্ল হালদার এবং আরো অনেকে, অমর-অশোক-অরুণ ও আরো অনেকে, জীবনে ও উপন্যাসে প্রধান ভূমিকায় চলে আসতে থাকে। নতুন শিক্ষা ব্যক্তিকে মর্যাদাবান করে তোলে, পরিবারের সঙ্গে মূল্যবোধের একটা দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে। আবার, পরাধীন দেশের সমষ্টির আত্মমর্যাদা লাভের পথ কি, এই প্রশ্নের উত্তর এত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের গর্বও তুচ্ছ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে সমষ্টির প্রশ্নই, রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন। তার নানা পথ নানা মতের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তের এই প্রতিনিধির—তিনি জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীই হোন আর সীতাকান্ত হালদারই হোন—জীবনবোধের সবচেয়ে বিরোধী হয়ে দেখা দেয় কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রথম সঞ্চার,

ইহা তো শেলি ও গডুইনের মানব-মাহাত্ম্যের স্বপ্ন নয়, সেই

> চিরকালের সত্যযুগের আশা নয়—ইহাতে সেই উজ্জ্বল আদর্শবাদ কোথায়?...ইহারা বিশ্বাস করে মানুষের নিকট বৃত্তির উদ্দীপনায়—হিংসার, লোভের, অকল্যাণের।...হাস্যকর বটে, যাহারা বলে স্বার্থের খোঁজ না পাইলে মানুষ কোনো কাজই করে না, ইহাই মানুষের স্বভাব; তাহারাই আবার বলিতেছে মানুষ স্বার্থপর নয়—মানুষ সর্বত্যাগ করিবে সমাজের মঙ্গলের জন্য।
>
> ...অশোক কি হইতে চলিয়াছে? সে শ্রদ্ধাহীন—জাতিতে শ্রদ্ধাহীন, ধর্মে শ্রদ্ধাহীন, গৃহধর্মেও শ্রদ্ধাহীন। আর শ্রদ্ধাহীনো বিনশ্যতি।

এইখানেই কি গোপাল হালদারের আত্মজিজ্ঞাসার উৎস? তাঁর কমিউনিস্ট পরিণতিকে মধ্যবিত্ত বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা থেকেই কি উৎসারিত তিরিশের দশকের এক যুবকের রাজনৈতিক পথসন্ধান, উনচল্লিশে সেই যুবকের রাজনীতির আরো নির্দিষ্ট আবিষ্কার ও উনপঞ্চাশে রাজনীতি আর জীবনের কমিউনিস্ট অঙ্গীকার? আর, আবার, তার পরে এক পুরুষ পেছিয়ে ভারতীয় রাজনীতির প্রথম গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের 'ভাঙন'? আর, আবার, তার পরে দু-পুরুষ পেছিয়ে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সুবাদে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রথম সামন্ত-অভিজ্ঞতা? আবার, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গায় বাঙালি মধ্যবিত্তের চরম ভাঙনের মধ্যে সেই মধ্যবিত্ত-সমাজেরই আর-একটি অংশের শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরিয়ে আসা বৈপ্লবিক সংগঠনের নতুন উজ্জীবন?

কমিউনিস্ট জীবনবোধ বাঙালির মধ্যবিত্তচৈতন্যে মূল্যবোধের চরম সঙ্কট তৈরি করেছিল। এর আগে পর্যন্ত সহাবস্থান সম্ভব ছিল—বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিগিরির ও ডেপুটিগিরির সঙ্গে সমাজ-ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কারের, ওকালতি-ব্যারিস্টারির সঙ্গে রাজনীতির। এই সব আপাত-বিপরীতকে মিলিয়ে দিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় নিশ্চিত উপার্জন, প্রায় অনড় সমাজ-বিন্যাস। জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধিজী যখন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে হাজার প্রশ্নে খণ্ডিত, কমিউনিস্টরা তখন শ্রেণী-সংগঠনের ও বিপ্লবের এমন এক জীবনের আদর্শ নিজেদের আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, লেখাপত্রে, আন্দোলন-সংগঠনে উপস্থিত করেছিল, যার সঙ্গে ভারতীয়-বাঙালি জীবন-ধারণার ছিল সর্বাঙ্গীণ ও সর্বাত্মক বিরোধিতা।

বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকরি ও ভূমিভিত্তিক পরিবারে তিরিশের দশকে যে-ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছিল সে যে শুধু এক ধরনের স্বদেশীতে মাতছিল তা নয়, সে তার জীবন দিয়ে ও আন্দোলন দিয়ে পরিবারের মূলকেই নাড়িয়ে দিতে চাইছিল। নাস্তিকতা, শ্রেণী-সংগ্রাম, জাতীয় সংস্কৃতির সীমা ভাঙা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, শ্রমিক শ্রেণীর জীবনাদর্শ—বাঙালি-ভারতীয় জীবনাদর্শের সযত্ন রক্ষিত প্রকারে ভাঙন ধরিয়ে দিচ্ছিল যেন।

এর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও ছিল। জাতীয় রাজনীতিতে প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই নেতৃত্বের ফলে কমিউনিস্টদের হয়ে যেতে হচ্ছিল একঘরে। ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর দায়িত্ব আসে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার। চল্লিশের দশকে কমিউ-নিস্টদের সেই লড়াই শুরু হয় মহাযুদ্ধ, অগাস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, তেভাগার মধ্য দিয়ে নানা এগনো-পেছনো পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায়।

এই চল্লিশের দশকের গোড়াতেই গোপাল হালদার তাঁর কমিউনিস্ট জীবন শুরু করেন—বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন ধারার প্রবাহে কমিউনিস্ট তত্ত্ব-বিশ্বের অনিবার্য সংস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা দিয়ে। তিনি তাঁর মধ্যবিত্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি—তেমন অস্বীকারে অনেকসময় সমাধান জটিলতর হয়েছে। তাঁর পক্ষে সে-অস্বীকার সম্ভব ছিল না তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার কারণেই। তাই তাঁর পক্ষে খোলা ছিল একটিমাত্র দুরূহ পথ। বাঙালি মধ্যবিত্তের যে-চৈতন্য রামমোহন থেকে শুরু করে এই শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত দেশ, সমাজ ও বিশ্বের ইতিহাস প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে সচেষ্ট থেকেছে, সেই চৈতন্যই স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে, বিশ্বইতিহাসের শিক্ষা থেকে কমিউনিজমের তত্ত্ববিশ্বকে গ্রহণ করতে পারে কি না তার সন্ধান।

এখানেও, এটি ছিল প্রথমত তাঁর ব্যক্তিত্বেরই আত্ম-আবিষ্কারের দায়। এখানেও, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিকরণ ঘটান। তাই তাঁর নিজের পারিবারিক কাহিনীকে প্রসারিত করে দেন প্রায় শত বৎসরের দেশকালে।

তারপর তো অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। ভারতের স্বাধীন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোতে স্থিতু হয়েছে। সেই কাঠামোর ভেতর কমিউনিস্টদেরও একটি স্থান আছে ও ভূমিকা আছে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোনো-কোনো রাজ্যে কমিউনিস্টদের শাসকদল হিসেবেও দায়িত্ব নিতে

হয়েছে ও হচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন বাঙালি-ভারতীয় জীবনে কমিউনিস্টদের জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু ১৯৬২-তে একবার, ১৯৬৯-এ আবার, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুটো বড় ভাঙন দেখা দিল। দু-বারই কিন্তু প্রশ্ন ছিল—মার্ক্সবাদের তত্ত্ববিশ্বের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সঙ্গতি নিয়ে। চীন-ভারত সংঘর্ষের জন্য চীনকে অভিযোগ করা কি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব? একটি রাজ্যের শাসনক্ষমতায় এসে কমিউনিষ্ট পার্টি কি কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রামের বৈপ্লবিক তৎপরতাকে খাটো করতে পারে?

এই দুই প্রশ্নের কোনোটিরই কোনো তাত্ত্বিক উত্তর হয় না, যেমন হয় না কোনো কৌশলগত উত্তর। বাঙালি ও ভারতীয় মধ্যবিত্ত মার্ক্সবাদের তত্ত্ববিশ্বকে নিজের জীবনের সমগ্রতায় গ্রহণ করার যে-সংগ্রাম গত প্রায় অর্ধশতক করে আসছে তারই ভেতর এই প্রশ্নের মূল হয়তো নিহিত আছে। এই ধরনের ঘটনা সেই সংগ্রামের তাৎপর্যই যেন বদলে দিতে চায়। তাই তার আপাত-মীমাংসা ঘটে ভাঙনে।

সেই ভাঙনে, সেই সর্বনাশে গোপাল হালদার আর-একবার পরিক্রমা শুরু করেন তাঁর নিজেরই জীবন—সে-জীবন ভারতীয় মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে জীবন ভারতের কমিউনিস্ট সংস্কৃতিরও অপরিহার্য উপাদান। সেই বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রায় শতবর্ষব্যাপী স্বদেশজিজ্ঞাসায়, সেই মধ্যবিত্তের নানা ধরন-ধারনে, বিচিত্র কর্মোদ্যোগে ও সাহিত্য প্রয়াসে, তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ও সংগঠনে তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করতে হয় ইতিহাসের যুক্তি যা শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট চৈতন্যে মুক্তি পেয়েছে।

এবারও তাঁর অবলম্বন কিন্তু তাঁর নিজেরই সেই পরিবার ও তাঁর নিজেরই জীবন। ব্যক্তিগতের সেই দায় থেকে আরো-একবার নৈর্ব্যক্তিককে খুঁজতে হয় ইতিহাসে তাঁর নিজের, তাঁর শ্রেণীর, তাঁর তত্ত্ববিশ্বের ভূমিকার সন্ধানে। সেই ব্যক্তিগত কাহিনী হয়ে ওঠে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের এক বিশেষ কালের কাহিনী। তাই তাঁর আত্মজীবনী উপন্যাসের বকলম হয়ে ওঠে না।

ভূমিকা-নবগঙ্গা-জোয়ারের বেলা', 'ভাঙন-স্রোতের দীপ-উজান-গঙ্গা'—গোপাল হালদার নদীর প্রাচীন উপমাতেই তাঁর উপন্যাসগুলোকে গেঁথে-ছিলেন। এখন, অনেক দিন পর, তিনি আবার নদীর উপমাতেই ফিরে এলেন—'রূপনারানের কূলে'। বহতা স্রোত, ভাঙন, জোয়ার আর

উজানে প্রথম উপমায় নদী যেন প্রাণবান। দ্বিতীয় উপমায় এই সব ইতিহাস নিয়েই নদী যেন সমগ্র এক 'জগৎ'। তখন যদি ছিল উথাল-পাথাল সেই স্রোতে ইতিহাসের 'স্বপ্ন', এখন তবে এই জাগরণে সেই 'জগতে' 'রক্তের অক্ষরে' 'আপনার রূপ' চিনে নেয়ার কঠিন কাজ—'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

উপন্যাস রচনা থেকে শুরু করে আত্মজীবনী গোপাল হালদারের সত্তা-আবিষ্কারের সেই কঠিন ব্রত।

নতুন সংস্কৃতি, নতুন নিরিখ

'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর কয়েকটি উক্তির অনুস্মৃতি

অরুণ সেন

গোপাল হালদারের রচনাপঙ্‌ক্তিতে সামান্য চোখ দিলেই দেখা যায় তাঁর বিচিত্র-বিষয়ের বহুপ্রসূ রচনার ভিতরও প্রধান প্রসঙ্গ সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা—ভারতের, বিশেষত বাংলার সংস্কৃতির সন্ধান। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' তো প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজও তাঁর সবচেয়ে সমাদৃত ও আলোচিত বই। তিনি নিজেই কৃতজ্ঞচিত্তে বলেছেন, "সংস্কৃতির রূপান্তর প্রথমাবধি পাঠকের নিকট যে সমাদর লাভ করিয়াছে, এদেশে অতি অল্প বাংলা গ্রন্থের ভাগ্যেই তাহা ঘটে।" তারপর বিভিন্ন সময়ে 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ', 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি' পর পর বেরিয়েছে। 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সূচনায় নতুন উপলব্ধির প্রেরণায় যে আবেগ তীব্র ও উচ্ছ্বসিত, চল্লিশের দশকের শেষভাগে 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ'-এ বাঙালি জীবনের দুর্যোগ ও সংস্কৃতির সংকটের নিখুঁত সালতামামিতে সে-আবেগ অনেক তির্যক ও হিসেবী। এইভাবে গড়ে ওঠে, যাচাই হয় তাঁর সংস্কৃতি-বিষয়ক ভাবনার কাঠামো—তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের পারস্পরিক নির্মাণ।

গোপাল হালদারের সংস্কৃতি-ভাবনা শিক্ষিত বাঙালির কোনো কোনো অংশকে অন্তত আত্মসচেতনতা অর্জনে সাহায্য করেছে। তাঁর সংস্কৃতি-আলোচনার কিছু কিছু প্রস্তাবনা এখন বৃহত্তর বাঙালি পাঠক সমাজের, জিজ্ঞাসু সংস্কৃতি-কর্মীর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত—এখানে তার কোনো কোনো উক্তির ইতস্তত অনুস্মৃতি পাঠকদের ঐ পরিচিত অভিজ্ঞতার জগতকেই আরেকবার হাজির করবে মাত্র।

সংস্কৃতির নতুন ভাবনা

> এ গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইং ১৯৪১-এর মধ্যভাগ—নাৎসি-বাহিনী তখন মস্কোর দুয়ারে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকেরই নিকট মনে হইয়াছিল অনিশ্চিত। বিশ্বসংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় আমরা এ গ্রন্থেই

গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় বিকাশের মূল-ধারাও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি নাই।

('লেখকের নিবেদন'। 'সংস্কৃতির রূপান্তর', ৭ম সংস্করণ, ১৯৬৫)

'সংস্কৃতির রূপান্তরে'র শুরু নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান সোভিয়েতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের গৌরব ও আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণে। "কমিউনিজম্ এ-যুগের মানবতার নাম" এই ঘোষণায়। ভারতের ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মানসিকতা বিশ্বের এই নতুন অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে যে নতুন উপলব্ধির শরিক হল, তারই উত্তেজনা, 'সংস্কৃতির রূপান্তরে'র প্রতিটি ছত্রে।

অথচ লেখক গোপাল হালদার, আমাদের সকলেরই জানা, কমিউনিজমের এই তীর্থে পৌঁছেছেন উনিশশতকী মানবতার, জাতীয়বাদী আন্দোলনের পথ ধরে ধরে—সেই সব অভিজ্ঞতার গরিমাকে বর্জন না করে, সেই সব সামানায় আটকে না থেকে। বাংলা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি যখন তাঁর বিষয় হয় এই বইতে—বস্তুত তাঁর সমগ্র জীবনেই তো সংস্কৃতির এই ইতিহাস ও স্বরূপ অনুসন্ধানই লক্ষ্য—তিনি সেই চর্চার অংশীদার হন একজন 'ভেতরের মানুষ' হিসেবেই, সারস্বত-সাধনার বাঙালি ঐতিহ্যের বিনয়েই। কিন্তু সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বাগর্থে তিনি যে নতুন দ্যোতনা আনেন, সে এই নতুন পরাক্রান্ত 'মানবতার ধর্ম'-এর উপর ভর করেই। যার নাম মার্কসবাদ। 'আউটসাইডারে'র আরোপে নয়, 'ইনসাইডারে'র মগ্নতাতেই কিন্তু ঘটে যায় এই উত্তরণ।

সংস্কৃতির স্বরূপ ও উপকরণ

মূল একটি কথা স্পষ্ট—সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধু মাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবনসংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সে জীবনযাত্রারই ঘাতপ্রতিঘাতে রূপ ও রঙও পরিবর্তিত হয়।

('সংস্কৃতির গোড়ার কথা'। স রূ)

সংস্কৃতির উপকরণের এবং তার পরিধির ব্যাপকতা সকলেই জানেন এবং মানেন। এবং তার তিনটি অঙ্গ বা অবয়ব, এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক—ভিত্তি ও সৌধের বা বৃক্ষমূল ও ফুলের উপমায়—এও আজ

আর নতুন কথা নয়—যদিও ১৯৪১-এ বাংলা ভাষায় তার প্রচার ও পথিকৃৎ ব্যাখ্যার গুরুত্ব সীমাহীন—আর গোপাল হালদার তো স্বেচ্ছায় প্রধানত এই ব্যাখ্যাতা ও পপুলারাইজারের ভূমিকাই নিতে চান। কিন্তু সংস্কৃতিকে নিথর সংজ্ঞার চৌহদ্দি থেকে বের করে এনে ঘটনাবহুল, কর্মচঞ্চল ও সংঘাতময় জীবনের মঞ্চে দেখা ও দেখানো এবং তারই আলোকে সংজ্ঞারও যাচাই ও অর্থবিস্তৃতি—সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস ও বাস্তবতার জমিতে সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরের সন্ধান—শুধু উপলব্ধিতেই নয়, রূপ-রেখার অঙ্কনে—এরকম আয়োজন বোধহয় আগে পরে কখনো ঘটে নি। বোধহয় এরকম ফল লাভও আগে হয় নি। এখনো একটি অবয়বের মধ্যে যেভাবে বিশ্বের, ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত পাই, এবং তাতে সংস্কৃতির বিশেষ এবং নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে সংস্কৃতির ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের নকশা গড়ে উঠতে থাকে পাঠকের মনে, সেই উচ্চাভিলাষ আর কোন বাংলা গ্রন্থের অন্বিষ্ট? বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে এত বড় একটা কাঠামোর মধ্যে চিনে নেওয়ার এই দুঃসাহস আর কোথায়?

সংস্কৃতির ধারা

> ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য। তাহার ছন্দের মিল পংক্তির অভ্যন্তরে; সূক্ষ্মতর নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট ছন্দের সঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দটিই মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাসের এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাচাই করিতে হইবে এইরূপ বাস্তব-দৃষ্টিতে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কোন্ নূতন রূপ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তর কেমন করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—আমাদেরও সংস্কৃতি সকল জাতির সংস্কৃতির মতো কি করিয়া এক বিশ্ব-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতেছে।
>
> ('ইতিহাসের ছন্দ', 'ইতিহাসের ভূমিকা'। স রূ)
>
> যে বাঙালী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে, সেই পল্লীপ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এখনো তাহা লুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমরা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন ভাবিতে কুণ্ঠিত হই।

('বাঙলার লোক-সংস্কৃতির রূপ', 'বাঙলার সংস্কৃতি : পূর্বকথা'। স ক্র)

বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোচনার সূত্রপাত তো প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ থেকেই হবে—যদিও সে-ইতিহাসের উপকরণ, বিশেষত প্রাচীনযুগে, এত অপ্রতুল যে ইতিহাসের ছন্দ-আবিষ্কার বারবার বিঘ্নিত হয়। গোপাল হালদারের ব্যাপক দৃষ্টির আয়োজনেই সম্ভব সেই ছন্দের অনুমান শুধু নয়, পর্বভাগ ও পাঠ। মধ্যযুগের আলোচনাতে তিনি বারবার উদ্ধৃত করেছেন 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে বর্ণিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বাঙলার সংস্কৃতির দিগদর্শনী"—আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতির একটি দীর্ঘ তালিকা—"অমূল্য তালিকা", কিন্তু আংশিক—তাই সুনীতিকুমারের সমালোচনা করতেও পিছ্‌পা হন নি : "এই অমূল্য তালিকায় মানস-সম্পদের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও উল্লেখ আছে, উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন-প্রথার, সমাজ-সংস্থানের।" লোক-সংস্কৃতির উপকরণ নিয়ে এর পরে আরো অনেক প্রশংসনীয় ও ব্যাপক কাজকর্ম হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু গোপাল হালদার যেভাবে তাকে গ্রথিত করেছেন সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে, বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের উপকরণের পারস্পরিকতায় এবং পরবর্তী কালের গ্রহণবর্জনে বা শুভ-অশুভ মিশ্রণে, তাতে প্রমাণিত হয় তাঁর উৎসাহ অতীতের গবেষণায় শুধু নয়, সংস্কৃতির স্বরূপ আবিষ্কারে ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে ও আমাদের আধুনিকতায় তার প্রাসঙ্গিকতার বিচারে।

তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা যখন তিনি আঁকতে বসেন, তখন তিনি সেই ইতিহাসকে সংস্কৃতির ইতিহাসের পটেই উপস্থিত করে প্রথম সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন। উপস্থিত করেন মধ্যযুগীয় সাহিত্যের গতানুগতিকতা ও মানব-স্বীকৃতির প্রকৃত কার্যকরণ।

অবশ্যই মধ্যযুগীয় বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিভিন্ন শ্রেণীর যে বিরোধ প্রচ্ছন্ন তার আলোচনাকে তিনি বাদ দেন না, মধ্যযুগীয় ধর্ম বা দেবদেবীর উদ্ভব ও রূপান্তরে যে সেই বিরোধ এবং অনার্য উপাদানের প্রতাপ, তাও লক্ষ করেন—হয়তো একটু কম জোর দেন—যে কারণে সুনীতিকুমারের

দিগদর্শনীতে লৌকিক উপকরণের পাশে টোল-চতুষ্পাঠীর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির তুল্যমূল্য বিরোধহীন উপস্থাপনাকে সমালোচনাহীনভাবে উদ্ধৃত করেন, কিংবা বলেন, "বরাবরই বাঙালী সংস্কৃতি আসলে ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ ধারা। তার অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে তাই বলে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দেখা চলে না।" এতে বাঙালি সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বৈততা বিষয়ে মনোযোগের পরিমাণ কম থাকতেও পারে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় গ্রাম্যজীবনের বিচ্ছিন্নতা বা বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির বা হিন্দু-মুসলমানের অবস্থান ও বিরোধ-মিলনের ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন তিনি। সমাজবাস্তবতার পটে বাঙলার এই ইতিহাসের ছন্দ অনুসরণই তো এনে দেয় বাংলার সংস্কৃতির বা বাংলার সাহিত্যের প্রথম সার্থক 'রূপরেখা'।

'বাবুদের পুচ্ছ রেনেসাঁস'

> ইহারই মধ্যে গড়িয়া উঠিল যাহা তাহারই নাম বাঙলার ভদ্রলোক। তাহার জন্ম ও ইতিহাসই 'বাঙলার কালচারে'র জন্ম ও ইতিহাস। তাঁহাদের শিকড় পূর্বে ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাজাদের সভায় এবং আসরে। এইবার তাঁহাদের নূতন শিকড় আঁকড়াইয়া ধরিল নূতন মুনিবের নূতন সৌভাগ্যকে; কুঠিতে, কাছারিতে, আপিসে, আদালতে এবং জমিদারিতে বা জমিদারের অধীনে নানা মধ্যস্বত্বে ইহাদের আশা ও আশ্রয় মিলিল।
> ('মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ', 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা: অর্ধ-আধুনিক রূপ'। স র)
>
> একবার বাঙলার কালচারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিব—ইহা তাঁহাদেরই কালচার যাহারা ইংরেজী বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আসনও আমাদের বাঙলার অর্ধসামন্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক ঐশ্বর্যের জন্যই অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান হইল সেই সম্মানিত পংক্তিতে। ('পাশ্চাত্য মানস-সম্পদ', ঐ। স. র)

মধ্যযুগীয় বাংলার সংস্কৃতিতে সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও মোটামুটি যে অখণ্ডতা

ছিল, ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক যুগে যা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, ইংরেজি বুর্জোয়া শিক্ষা পাওয়া বা না-পাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠল আর্থিক ও মানসিক দূরত্ব—মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, সেই বিচ্ছিন্নতার কথাই প্রধানত আধুনিক বাংলার সংস্কৃতির আসল কথা। একদিকে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনাদৃত ও ভঙ্গুর, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিত বিচ্ছিন্ন মানুষের বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি। গোপাল হালদার এই শিকড়হীন বিচ্ছিন্ন মানুষের সংস্কৃতির জন্য একটা আলাদা নাম দিয়েছেন—'কালচার'। মধ্যযুগীয় 'সংস্কৃতি' এবং আধুনিক 'কালচার'-এর বৈষম্য ও বিচ্ছেদ তাঁর আধুনিক সংস্কৃতি-আলোচনার প্রধান সূত্র।

গোপাল হালদার যাকে বলেছেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক রূপ', সেই উনিশশতকী-বিশশতকী সংস্কৃতির গরিমা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আমরা এখন একটু-আধটু ভারসাম্যে বোধহয় পৌঁছচ্ছি। উল্টোপাল্টা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে আমাদের মূল্যায়নের যে দিশাহারা ভাব তার অনেকটার প্রতিষেধক ছিল গোপাল হালদারের সংস্কৃতি-চর্চা, যদি অবশ্য তাঁর গৌরববোধ ও আত্ম-সচেতনতায় শরিক হতে পারতাম আমরা। এ-যুগের কৃতি সম্পর্কে তাঁর বলতে বাধেনি: "জীবনে এত ঐশ্বর্য আর ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি সেই পর্বে দাবি করিতে পারে না। তাহার মধ্যেও যে আধুনিকতার তপস্যা চলিতেছে, তাহাও তাই সত্য।" কিংবা: "আমরা বাঙলা সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু একেবারে অন্ধভাবে গর্ব করি না। গর্ব করার মতো বেশ কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে। খুব কম করে হলেও একবার আমরা মনে করতে পারি এই সোয়া শত বছরে আমরা যা সৃষ্টি করেছি কোনো পরাধীন জাতি সম্ভবত এমন সৃষ্টি এত অল্প সময়ে তা করতে পারেনি।" এই গৌরববোধ কখনই বিসর্জন দিতে গোপাল হালদার রাজি নন—কারণ উনিশশতকী 'মহা-মহারথী'দের লেখা ও কর্মের সঙ্গে জীবনব্যাপী অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ও ইতিহাসের ছন্দের মাত্রাজ্ঞানে কোনো নায়েকপনাই জমে না। আবার এই মাত্রাজ্ঞানেই তিনি জানেন তার সীমাবদ্ধতাও। এই কালচারের বন্ধ্যতা ও পরিহাসের দিকটি শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত নন, ঔপনিবেশিক জন্মদোষের সূত্রে সমাজ ও অর্থনীতির যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জটিল হয়ে ওঠে, "জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন-প্রথার, সমাজ-সংস্থানের" সেই বাস্তবতাকে তিনি যথোচিত গুরুত্ব দেন, কারণ তাঁর দায় তো মানব-ইতিহাসের ছন্দের সঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দকে মেলানো। 'বাঙালী কালচারের ভাবী ভিত্তি' প্রসঙ্গে তিনি তাই

বলেন: "এমন কি এই 'বাবু কালচারের' বাবুদের চক্ষেও তার সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতা গোপন রইল না। দিনের পর দিন বাঙালী সংস্কৃতি তাই সচেতন হচ্ছে তার সেই উনিশ শতকের ত্রুটি সম্বন্ধে, বুঝেছে…এই সংস্কৃতি সমস্ত বাঙালীর সংস্কৃতি নয়, শুধু মাত্র শতকরা পাঁচজন বাবুর সংস্কৃতি হয়েছে—'ভদ্র' সংস্কৃতি হয়েছে, বাঙালীর লোকজীবন থেকে তা বিচ্ছিন্ন।"

সংস্কৃতির বিলাস ও বিচ্ছিন্নতা

> ঔপনিবেশিক মার্কা মারা বাঙালীর কাল্‌চার-বিলাস কৌতুক-ব্যঙ্গের বিষয়…। উহা আমাদের স্বাভাবিক ও জীবন্ত অভ্যাস নহে, কৃত্রিম 'কৃষ্টি-চর্চা'—ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র আর নাই, তাহা এই প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই পল্লীপ্রাণ 'বাঙলার কৃষ্টি' বাঁচিয়া উঠিবে না।
>
> ('বাঙলার কাল্‌চার-বিলাস', 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা: অর্ধ-আধুনিক রূপ'। স রূ)

সংস্কৃতি ও কালচারের দ্বৈততা, মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক মানস এ দুয়ের ছিন্ন ধারাবাহিকতা কোনো শর্টকাট পদ্ধতিতে ঘোচানো সম্ভব নয়, তাও গোপাল হালদার বলেন। রেডিওতে ভাটিয়ালী শুনিয়ে কিংবা শহরের সিমেন্টের মেঝেতে আলপনা এঁকে কিংবা ঘরের কোণে বাঁকুড়ার ঘোড়া বসিয়ে এ-দূরত্ব যে ঘোচানো যায় না, এ-দূরত্ব যে আমাদের ইতিহাসেরই বাঁকা গতির পরিণাম, সেই বোধকে চারিয়ে দেন তিনি তাঁর আলোচনার ঐ অংশে।

ইতিহাসের এই পর্বে আমাদের একটি প্রধান ব্যর্থতা বাঙালির যৌথ সংস্কৃতি গড়ে তোলায়। মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনে, হয়তো বাংলা দেশের গ্রামীণ পরিবেশের ব্যাপকতর স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যই, হিন্দু ও মুসলমানের যে ঐক্য ও নৈকট্য ছিল তা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চক্রান্তে অলীক হয়ে গেল। 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এ আভাস মাত্র থাকলেও, পরবর্তী বহু রচনাতেই গোপাল হালদারের একটি স্থায়ী প্রসঙ্গ ছিল 'উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান' বা 'মুসলমান বাঙালীর কালচার'। তাঁর মতে যৌথ সংস্কৃতির ব্যাপারে অবহেলাই "একালের বাঙালীর জীবনের ও সংস্কৃতির ট্র্যাজেডি"। তিনি দেখান কিভাবে বিচ্ছেদের কোন পরিণামে 'বাবু কাল্‌চারে'র প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে 'মিঞা কাল্‌চার'।

এটা অবশ্য একটি দিক। আরো নানা দিক দিয়েই আমাদের ভেতরকার দূরত্ব—খাড়াখাড়ি এবং পাশাপাশি দু-দিক দিয়েই এই দূরত্ব—বাড়িয়েই যায় মধ্যবিত্ত ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি। আর তখনই তাদের কাল্‌চার হয়ে ওঠে 'বিলাস'—"অবকাশের বিলাস"।

আজকের সমস্যা: সংস্কৃতির সংগঠন

> ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট আসিল বাঙলায় বিরোধ ও বিভাগের লিপি লইয়া,—এবং এই মধ্যবিত্ত ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের মৃত্যুলিপি লইয়া। বাঁচিতে হইলে তাহাকে এখন নতুন জনশ্রেণীর দানে নতুন জনশ্রেণীর সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে।
>
> ('পাশ্চাত্য মানস সম্পদ'। স রূ)

মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা এবং 'ভদ্রলোকের' সংস্কৃতির গণ্ডীবদ্ধতা যদি ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণাম হয়ে থাকে, তবে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে সেই বিভেদ-মোচনের প্রত্যাশা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের পরেও তার ইঙ্গিত কই? তাই 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর স্বাধীনতা-পূর্বযুগের আলোচিত অধ্যায়ের শেষ শিরোনাম 'ভদ্রলোকের রুদ্ধ বিকাশ', আর ১৯৬৫-এর সংস্করণে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা শেষ হয়েছে 'অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি' শিরোনামে।

কাজ যেটুকু হয়েছে তা খুবই কম—এবং এই বুর্জোয়া মিশ্র অর্থনীতিতে তা অনিবার্যও বটে। বারং মাঝে মাঝে মনে হয়, নানা পরিকল্পনা ও অর্থ-ব্যয় সত্ত্বেও সংস্কৃতির বিভেদ হয়তো বেড়েই যাচ্ছে। সদিচ্ছাটাও ঠিক বোঝা যায় না—এমনকি রাজ্যস্তরেও ইংরেজি ভাষা প্রাথমিক স্তরে বর্জন ও সঙ্গে সঙ্গে কার্যত সরকারী নির্বিকারতার প্রশ্রয়ে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের প্রসার ও প্রলোভন সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদকে দূর করার বড় প্রতিবন্ধক হিসেবেও আরো দীর্ঘদিন থাকতে চায়।

গোপাল হালদার অবশ্য আমাদের দায়িত্বের কথাই বলেন। কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবেও আমাদের দায়িত্বের কথা। আমাদের লক্ষ্য ও স্বপ্নের কথা। "বাঙালী সংস্কৃতির আসল কাঠামো (form) হওয়া চাই বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সেই যৌথ সংস্কৃতি; বাঙালী হিন্দু-মুসলমান জনগণের সমসূত্রে গাঁথা লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতি হওয়া চাই তার ভিত্তি; আধুনিক কালের জাগ্রত জীবন হবে তার উপকরণ (content); আর নতুন বাঙলার সংস্কৃতির প্রাণ হবে—শুধু বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়—আধুনিক

বিপ্লবী মানবতাবাদের নতুন প্রেরণা ও সত্য।” প্রবন্ধটির নাম: ‘বাঙালী কালচারের ভাবী ভিত্তি’।

এ ব্যাপারেও আমাদের সাম্যবাদী আন্দোলনের গৌরবজনক প্রচেষ্টা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভেদের ফলে খানিকটা ব্যর্থ হতে বসেছে কিনা ভেবে স্তব্ধ হতে হয় ঠিকই, কিন্তু গোপাল হালদারের মতো লেখক-কর্মীর সময়োচিত সতর্কীকরণের মূল্য তাতে কমে না: “শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের সচেতনতা—এ হল তাই সংস্কৃতির দাবি। এ সচেতনতা অবশ্য জীবন-ক্ষেত্রের সাক্ষ্য থেকেই তাঁদের পক্ষে লাভ হতে পারে। কিন্তু জীবন ক্ষেত্রের সে সাক্ষ্য তাঁদের নিকটে তুলে ধরার দায়িত্ব হল সংস্কৃতির কর্মীদের।” এই হল তাঁর ‘সংস্কৃতির সংগঠনে’র কথা। গোপাল হালদার নিজেকে এই সংস্কৃতির সংগঠনের কর্মী বলেই মনে করতে ভালোবাসেন, নিজেকে বলেন ‘লেখক-কর্মী’। সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনাকে এই গরজেই তিনি যুক্ত করেন সংস্কৃতির সংগঠনের আলোচনার সঙ্গে। সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা, সংস্কৃতিকে বদলানোর দায়িত্ব ছাড়া সংস্কৃতির আলোচনা তাঁর কাছে অনাবশ্যক।

‘চিন্তাই ক্রিয়া কর্মই মনন’

সংস্কৃতি বিষয়ে কোনো আপাত মৌলিক ও চমকপ্রদ সংজ্ঞা নির্দেশ বা পৃথক কোনো সংস্কৃতিতত্ত্ব নির্মাণ গোপাল হালদারের কখনই লক্ষ্য ছিল না। তাঁর সংস্কৃতিচিন্তার অনন্যতা এখানেই যে ভারতীয় বা বঙ্গীয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিন্তা ও অনুসন্ধানকে তিনি মিলিয়েছেন একালের সর্বব্যাপক মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষার সঙ্গে। সমন্বয় করেছেন, পরীক্ষা করেছেন ঘরোয়া ও জাতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রত্যক্ষতাকে আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরোক্ষতার আলোয়।

হয়তো কারো কারো মনে হতে পারে দেশীয় মনীষায় ঐতিহ্যকে যে তিনি অনুসরণ করেন, তা আরো ব্যাপক হতে পারত, শুধু সুনীতিকুমারকে অবলম্বন করেই শেষ না হলে ভালো ছিল—মনে হয় সুনীতিকুমারের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা তাঁকে গুরুর বিষয়ে যতটা সহনশীল ও উদার করেছে, অন্যত্র কি তিনি ততটা উৎসাহী নন? তাই কি ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ তাঁর এ গ্রন্থে আলোচিত হন না, পরবর্তী সংস্করণেও?

অবশ্য প্রথম আলোচনায় দায়ে তাঁকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে,

যার জন্য তিনি নিজেই পরে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর অধ্যায়গুলি সব সময় হয়তো ততটা অবিচ্ছিন্ন ও সংলগ্ন নয়, যতটা হতে পারত প্রথম প্রচেষ্টার অসুবিধা পার হয়ে এলে। তিনি নিজেই বলেছেন, "হয়তো একাধিক খণ্ডে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর সম্মিলিত চেষ্টায় এখন এ জাতীয় বিশদ গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। ততক্ষণ পর্যন্ত এই গ্রন্থ একদিন যেমন পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছিল তেমনি যদি এখনো জিজ্ঞাসা জাগাইতে পারে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।" জিজ্ঞাসার এই জাগরণ আজকের পাঠকের কাছে একটুও কমেনি শুধু তাই নয়, আমরা এখনও বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে স্মরণ করি তাঁর পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও মহৎ দুঃসাহস।

আরো বিস্ময় এই কারণে যে, গোপাল হালদারের কর্মময় জীবন যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে তাঁর অন্যান্য নানাবিধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে মননক্রিয়ার এই ব্যাপকতা ও মাহাত্ম্য প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকে। আমাদের সামনে গোপাল হালদার কর্ম ও তত্ত্বের অখণ্ডতার সেই প্রতীকপুরুষ, যাঁর সামনে বিনীত হওয়াই কেবল সাজে। তাঁর সংস্কৃতিচিন্তা ও কর্ম সেই অখণ্ডতারই একটা বড় দিক।

অনন্য 'ত্রিদিবা'

রণেশ দাশগুপ্ত

১

'একদা', 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন'—গোপাল হালদারের এই তিনটি উপন্যাসের একত্রিত নাম 'ত্রিদিবা'। 'একদা'-র প্রথম প্রকাশ তিরিশের দশকের শেষের দিকে। 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকে। 'ত্রিদিবা'র প্রকাশকাল ৭৮ সাল।

'ত্রিদিবা'র এই প্রকাশ গোপাল হালদারের উপন্যাসের শিল্পরূপকে একটি নতুন আয়তন দিয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় 'একদা' তার প্রথম প্রকাশের সময় যেজন্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, 'ত্রিদিবা'র প্রথম খণ্ড হিসেবে তার সেই বৈশিষ্ট্য আর থাকছে না। 'একদা' আলাদা ভাবে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের দাবিদার ছিল বিশেষ করে শৈলীর দিক দিয়ে। স্মৃতি ও চেতনার জঙ্গম পটে অতীত ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বহুলতাকে গোপাল হালদার তাঁর 'একদা' উপন্যাসে একটিমাত্র দিনের কাঠামোর মধ্যে ধরেছিলেন বহুমাত্রিক চলচ্ছবির পদ্ধতি প্রয়োগ করে। 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' উপন্যাসেও নামকরণের মাধ্যমে 'একদা'-র শিল্পী একই ধারাকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু 'ত্রিদিবা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গিয়েছে, আধুনিকতার ধারা ধ্রুপদীতে মিশ্রিত হয়েছে। 'একদা'তেও এর অবকাশ ছিল। 'একদা' বাংলা উপন্যাসে সময় এবং অবস্থিতিকে একটি মাত্র ঘটনায় কেন্দ্রীভূত করেছিল। ত্রিদিবা বড় করে তুলেছে পরিব্যাপ্তিকে। এতে সমস্ত ঘটনাকে প্রবাহিত হতে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিপ্লবী সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে। 'ত্রিদিবা'র লেখক পূর্ব-বাংলার ভাঙন ও পুনর্বাসন এবং ৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে ধ্রুপদী ব্যাপক বিষয়ীভূত ধারায় যে দুটি তিনখণ্ডের উপন্যাস লিখেছেন, 'ত্রিদিবা'কেও তার অনুষঙ্গী বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' কিংবা ইউরোপীয় উপন্যাসে যেমন পঞ্চম খণ্ডকেও অপ্রতুল মনে হয়, 'ত্রিদিবা'র তিনখণ্ডের ব্যাপারেও সেই ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে।

বস্তুতপক্ষে, 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' উপন্যাসদ্বয়ের আধুনিকতার কাঠামোর মধ্যে লেখক তাঁর নায়ক অমিতের মার্কসীয় বক্তব্যকে প্রবাহিত

করতে গিয়ে যে ক্রুপদী চরিত্রাবলী ও ঘটনা ও বাস্তবের পরিব্যাপ্তি নিয়ে আসেন, তাতেই তিনি অতি-আধুনিক শৈলীর মধ্যে ক্রুপদী উপন্যাসের সমস্ত মালমশলা জড়ো করেছিলেন। 'ত্রিদিবা'র সামগ্রিকতা এই ঘটনাকে প্রকট করে দেখিয়েছে। তবু, 'ত্রিদিবা' ঠিক ক্রুপদী উপন্যাস নয়। একে বরং বলব, একটি অনন্য ধারা। প্রথমত, 'একদা'-র লেখক তাঁর মন্তাজ বা সংযোজনের পদ্ধতিকে 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন' উপন্যাসেও বারংবার ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মনঃস্রোত বা চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়েই ঘটনা ও চরিত্রাবলীকে উদ্ভাসিত করার ধারার প্রাবল্য বজায় রয়েছে সমগ্র 'ত্রিদিবা'তে।

এইভাবে গোপাল হালদারকে 'ত্রিদিবা' এক ধরনের জটিলতাপন্থী শিল্পী হিসেবেও উপস্থাপিত করেছে। শিল্পী হিসেবে তিনি এখানে খুব বেশি কর্মিষ্ঠ, খুব বেশি সজাগ। 'রূপনারানের কূলে' কিংবা পূর্বোক্ত অপর দুটি উপন্যাস-মালার সহজ সরল গাল্পিক লেখক 'ত্রিদিবা'তে প্রাধান্য দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক আধুনিকতম উপন্যাসের শিল্পরূপকেও। 'ত্রিদিবা' পড়ে একটা প্রশ্ন জাগে। এই তিনখণ্ডের উপন্যাসটির লেখক একটা তৃতীয় ধারা তৈরি করতে চেয়েছেন কি?

২

বিষয়বস্তুতে 'ত্রিদিবা'র আধুনিকতা ও ক্রুপদী পদ্ধতির মিশ্রণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই উপন্যাসটি আগাগোড়া রাজনৈতিক আখ্যান। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলার অগ্নিযুগ থেকে শ্রমজীবী-বিপ্লবের যুগে উত্তরণের কুশীলবদের চরিত-কথাকেই 'ত্রিদিবা'র পরপর তিনটি উপন্যাসে প্রাধান্য ও বিস্তার দেওয়া হয়েছে। পরাধীনতার শিকলভাঙার এবং এই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার বস্তুসত্তা নির্ণয় করার জন্যে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে উৎসর্গিত অসংখ্য নরনারীর জীবনসাধনা হচ্ছে 'ত্রিদিবা'। যুবা-নায়ক অধ্যাপক অমিতকে এইজন্যেই লেখক এমনভাবে বেছে নিয়েছেন যে, মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গিত এই যুবা অজস্র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলতে চলতে নিজেকে যতটা প্রকাশ করেছে, তার চেয়ে বেশি দেখাতে পেরেছে সংগ্রামী সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের।

এই কারণে, 'ত্রিদিবা' বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে যত বেশি সংখ্যক নরনারীর চরিতকথাকে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছে, তেমনটি এর আগে

অনেক সার্থক ঔপন্যাসিকের লেখাতেও হয়নি। নায়ক সব সময় চলমান। তার সান্নিধ্যে যারাই এসেছে বিপ্লবের দ্বন্দ্বাত্মক বহুসংখ্যক স্রোতধারার টানে, তারা কখনও গৌণ হয়ে যায়নি। ইন্দ্রাণী, সুধীরা, সবিতা ও সুরো অমিতের হৃদয়রাজ্যের নারীচরিত্র। বিশেষ করে 'ত্রিদিবা'র লেখক এই চারটি নারী-চরিত্রের চেতনা ও অবচেতনা এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের নিরিখে এঁকেছেন বলে এরা অত্যন্ত সজীব। অগ্নিযুগের বিপ্লবী যুবা সুনীল কিংবা চটকল শ্রমিকদের সাম্যবাদী নেতা মোতাহারকে ঔপন্যাসিক দিতে পেরেছেন পরিপূর্ণ মর্যাদা। 'অন্যদিন' হচ্ছে একদিক দিয়ে তিরিশের দশকের কারাগারে যে বিপ্লবীরা যন্ত্রণার্ত হয়েছে এবং অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে মার্ক্সবাদকে স্বাধীনতা ও সাম্যের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের মনের বহুকৌণিক চলচ্ছবি। 'আর একদিন' উপন্যাসে এসেছে শ্রমিককৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী কুশীলবেরা। ট্রামের মজুর এবং ক্ষেত-খামারের শ্রমজীবী মানুষের অন্তরঙ্গ চরিত্র-চিত্র সামনে এসে গিয়েছে। এরা সকলেই মুখ্য। এরা কেউ অপ্রধান নয়। অবশ্য, গোপাল হালদার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকেও নরনারীদের নিয়ে এসেছেন স্বাধীনতা ও সাম্যের অবিশ্রান্তভাবে পরিব্যাপ্ত হতে থাকা বিক্ষোভ ও সংগঠনের আওতায়।

এই জন্যেই নায়ক অমিতের সান্নিধ্য অথবা চৌম্বকচক্রকে 'ত্রিদিবা'তে যত বড় করা হয়েছে, অমিতকে তত বড় করা হয়নি। অমিত অত্যন্ত সাধারণ মুখচ্ছবির অধিকারী। তাঁকে কোনদিক দিয়েই বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী করা হয়নি। বিপ্লব বা সাম্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলার ক্ষমতা ও মুক্ত মন অমিতকে দিয়েছে সেই পরিধি, যার মধ্যে উল্কার মতো নারী ইন্দ্রাণী কিংবা কোমলা সুরো স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে।

'ত্রিদিবা'র লেখক অবশ্য বাংলা উপন্যাসের শিল্পীদের একটা বড় গুণকে কাজে লাগিয়েছেন। সেটা দরদ। এই দরদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোষ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ রাজনৈতিক বিপ্লবের একটা নিষ্ঠুরতার দিক আছে যেখানে হৃদয়দৌর্বল্যকে ক্ষমা করা হয়নি। 'ত্রিদিবা'র লেখক তাঁর সহানুভূতির ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছেন। তিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের শত্রুদের প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা প্রকাশ করেছেন তো অবশ্যই। সঙ্গে সঙ্গে যারা বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের মধ্যে উটপাখির মতো ঝড়ের সময় বালিতে মুখ গুঁজে থেকেছে, তাদের নিস্তার দেননি তিনি।

সুতরাং নায়ক অমিত কোনো সময়েই নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা নেয়নি। অমিত যেমন দুহাত বাড়িয়ে বিপ্লবের সমস্ত বলয়ের দাবীকে গ্রহণ করতে পেরেছে, তেমনি যে সুখের পায়রারা অমিতের সান্নিধ্যে এসেছে, তাদের সে বর্জন করেছে একেবারে অনায়াসে। বর্জনের কারণগুলি যেহেতু বোধগম্য হওয়া দরকার, সেইজন্যে অমিত যাদের বর্জন করেছে, তাদের চরিত্রচিত্রও আবছা থাকে নি।

'ত্রিদিবা'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এত অসংখ্য নানামুখী সুস্পষ্ট চরিত্র অনেকাংশে নায়ক অমিতের চিন্তাস্রোতের বহুমাত্রিক আয়নায় প্রতিফলিত। রাজনৈতিক উপন্যাসে এটা নিশ্চয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত।

৩

'ত্রিদিবা'র মনস্তাত্ত্বিকতাবাদী শিল্পী কি করে মনঃস্রোতের বহুমাত্রিক আয়নাতেও এভাবে এত অসংখ্য চরিত্রকে সামনে আনতে পারলেন?

অমিতের চিন্তাধারাই এটা সম্ভব করেছে বলে মনে হয়।

নায়ক যখন মার্ক্সবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি, তখন বিশের ও তিরিশের দশকের সন্ধিক্ষণে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এবং আধুনিক চিন্তা ও শিল্পসাহিত্যে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অমিত ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষার অবচেতনার ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছিল। বাস্তব পক্ষে এইজন্যেই সুরো কিংবা সুধীরা কিংবা সবিতা কিংবা ইন্দ্রাণীর মনের গহনে সে দৃষ্টিপাত করতে পেরেছিল এবং মনের গহনকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যৌন বিকার বা মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের বিশ্লেষণের যৌনতার আধিক্যকে অমিত গ্রহণ করেনি। এই কারণেই অমিতের মনঃস্রোত বা চিন্তাপ্রবাহ তার সমস্ত জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও ঘোলাটে হয়ে যায়নি। অমিতের চিন্তাকে কোনো অবক্ষয়ী বিকার প্রভাবিত করতে পারেনি।

তিরিশের দশকে যখন 'একদা' লেখা হয়, তখন মনস্তাত্ত্বিকতা ও আধুনিকতার শৈলীতেও কেন যৌনতা প্রবল হল না, তার কারণ উপরোক্ত ঘটনা।

অমিতের মতোই গোপাল হালদার ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

পরে যখন 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' লেখা হয়, তখন এদের লেখক

মার্ক্সবাদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, তখন তাঁর পক্ষে মনঃস্রোতের মধ্যেও সমস্ত কুশীলবকে সুস্পষ্ট করে তুলবার কাজটা সহজতর হয়েছে।

এখানে অবশ্য মানবতাবাদ কিংবা সাধারণ মানবমানবীর প্রতি সহানুভূতিও 'ত্রিদিবা'র শিল্পীকে সাহায্য করেছে।

'ত্রিদিবা'তে নরনারীর সম্পর্কের চলচ্ছবিতে ফ্রয়েডীয় বর্ণবিভা না থাকাতে কিছুটা রক্তহীনতা এসেছে বলে কেউ প্রথমেই ধারণা করে নেবেন না আশা করি।

'একদা', 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' উপন্যাসে—উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানের অভাব নেই।

ভারততত্ত্ব ও মার্কসীয় তত্ত্বের ছড়াছড়ির মধ্যে নরনারীচিত্ত পাশাপাশি সজীব রয়েছে।

এর একটা কারণ নিশ্চয় বিস্ময়কর। 'ত্রিদিবা'র লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ধারাকে আধুনিকতম রীতির মধ্যে প্রয়োগ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ধীরে রজনী ধীরে।

গোপাল হালদার কয়েকবার এই ধরণের কথা বলেছেন। বিশেষ করে বিধবা সবিতার চরিতকথা লিখতে গিয়ে 'ত্রিদিবা'র শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন।

ধ্রুপদী বিষয়-প্রধান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নারী চরিত্র যে 'ত্রিদিবা'র পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছে, তার মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব কিছুটা রয়েছে বলে মনে হয়।

রূপকলা প্রসঙ্গে গোপাল হালদার

অশোক ভট্টাচার্য

১

আমাদের সমকালের এক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিবান পুরুষ হলেন গোপাল হালদার। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি তাঁর লেখনীকে বিভিন্নখাতে বহিয়ে আসছেন। যখন তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বাংলা সাহিত্যকে নতুন নতুন রচনায় সমৃদ্ধ করছিলেন কথা-সাহিত্যের সেই সুবর্ণ সময়ে উপন্যাস লিখে তিনি নিজস্ব এক আসন অনায়াসেই দখল করেন। অথচ সৃজনশীল সাহিত্যের সেই সমুচ্চ আসন ছেড়ে সাহিত্যকর্মীর ভূমিকা নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। হয়তো এই দ্বিতীয় ভূমিকার সূত্রেই—নানান তাৎক্ষণিক রচনার তাগিদেই—বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, তার সংস্কৃতির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠতে হয়েছিল তাঁকে। সাংবাদিকতা একই সঙ্গে তাঁকে করল জীবনমুখিন ও বহুদর্শী। তার কারণ অবশ্য তিনি যে-সময়ে সাংবাদিকতা করতেন সে-সময় সেটা বৃত্তি ছিল না, ছিল ব্রত। আর সেই ব্রতে তখন যাঁরা স্বনিযুক্ত তাঁদের অনেকেই কি জ্ঞানে কি স্বাদেশিকতায় ছিলেন বিশিষ্ট মানুষ। তাঁদের সম্পর্কে এসে, এবং বিশেষ করে মার্কসবাদী যুক্তিবিজ্ঞানের শিক্ষায় সমকালীন প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখেই বাঙালি সংস্কৃতির ভাঙাগড়ার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাকেই তিনি জীবনের অভীষ্ট করে নেন। তাঁর আগ্রহ তাই বাঙালির সকল সৃজনকর্মের প্রতিই প্রসারিত হয়। সম্ভবত এই ভাবেই, কিংবা মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার আগেই, অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'নব্য-ভারতীয় চিত্রকলা'র প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। তারপর মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষনের দৃষ্টি নিয়ে দেশ ও বিদেশের রূপকলার বিকাশ সম্পর্কেও তাঁর মন সপ্রশ্ন হয়ে ওঠে। বিশেষত, এই শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে য়ুরোপীয় রূপকলার জগতে যে আলোড়ন দেখা দেয় সে-বিষয়ে নিস্পৃহ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তারপর, অক্টোবর বিপ্লবের সূত্রে দুই মহাবিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যে নতুন শিল্পভাবনা জন্ম নেয় সে সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই দানা বাঁধে। তাই দেখি পশ্চিমের এই নতুন শিল্পভাবনার সঙ্গে এদেশের শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের পরিচিত করার প্রয়াসে

তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি Revolutionary Art : A Symposium[১] নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদনা করছেন।

এই সংকলনের লেখক-তালিকায় রয়েছেন হার্বার্ট রীড, এফ. ডি. ক্লিন্‌জেণ্ডার, এরিক গিল, এ. এল্‌. লয়েড এবং এ্যালিক ওয়েস্ট। আর এঁদের আলোচিত বিষয় হল যথাক্রমে 'বিপ্লবী শিল্প কী?', 'বিষয় ও আঙ্গিক', 'সব শিল্পকর্মই প্রচার', 'আধুনিক শিল্প ও আধুনিক সমাজ' এবং 'নির্বস্তুক সমালোচনা'। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রকাশিত *On Revolutionary Art* নামক একটি সংকলনেরই ভারতীয় সংস্করণ হল উল্লিখিত বইটি। লেখকেরা সকলেই মার্ক্সবাদী না-হয়েও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্প ও প্রাসঙ্গিক সামাজিক দায় নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন। আজকের শিল্প-আলোচনার ক্ষেত্রেও সেগুলির গুরুত্ব কিছু কম নয়। কিন্তু আমাদের বিচার্য এই প্রবন্ধগুলি নয়; বরং সংকলনের ভারতীয় সংস্করণের জন্যে লেখা গোপাল হালদার মহাশয়ের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা। কেননা এই ভূমিকা-প্রবন্ধের আলোচনায় আমরা সরাসরি রূপকলা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা কী তা জানতে পারব।

২

গোপাল হালদার মহাশয় আলোচ্য ভূমিকাটি লেখেন এমন এক সময় যখন য়ুরোপে হিটলার সবে পরাভূত, আর সে-কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বিক সামর্থ্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সমাজবাদী চিন্তাভাবনার সম্প্রসারমাণ ভবিষ্যতের প্রতিও তখন অনেকেই আস্থাশীল। তাঁর লেখায় মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার প্রতি সেই পরিমণ্ডলগত প্রত্যয় তাই সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর কালকে বিপ্লবের কাল বলে চিহ্নিত করে বলছেন, অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকে যে বিপ্লবী শক্তি সক্রিয় তার দ্বারা অধিকাংশের জীবন ও ধ্যান-ধারণা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনিবার্যভাবে বিপ্লবের দিকেই এগিয়ে চলেছে। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে ও সমাজতন্ত্রের জয়ে এশিয়া-আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে। আর এক কথায়—

---

১ *Revolutionary Art : A Symposium*, **Progressive Forum, 24/3A College Street, Calcutta.**

> **The common man has grown in political and intellectual stature through his own experience, and he finds in Marxism an intelligible explanation of the era and a sure guide to his theory and action in that era of revolution.**

মার্ক্সবাদের বিরোধীরাও কিন্তু নিশ্চুপ নয়। জাগতিক, অর্থাৎ অর্থনৈতিক-সামাজিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী ভাবনার গুরুত্বের কথা মেনে নিয়েও তাঁরা তখন দর্শনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নান্দনিক বিচারে তার প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কথা বলে চলেছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, মার্ক্সবাদ কি সৃজনশীল কল্পনাকে তার চিরন্তন সৌন্দর্যসৃষ্টির ব্যাপারে পথ-নির্দেশ করতে পারে? কেননা শিল্প যে চূড়ান্ত বিচারে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা বহুলাংশেই নিয়ন্ত্রিত এই মোটা কথাটা তাঁরা মেনে নিতে পারেন নি। শিল্পকলার জগতে যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা যাঁরা নান্দনিক নিঃসঙ্গতায় অভ্যস্ত তাঁরা শিল্পের সামাজিক মূল্য না মেনে তাকে বরং আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গেই যুক্ত করতে জানে। তাঁর ভাষায়—

> **"Art" is held out to be the last mysterious universe of spirit which defies all science and all "class analysis".**

সহিষ্ণু লেখক গোপাল হালদার বিরোধীদের বক্তব্যকে নস্যাৎ না করে তার আপাত উৎস সম্পর্কে পাঠককে ওয়াকিবহাল করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে বাস্তব জীবনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবী শিল্পজগতে এসে সহসা খেই পান না। কেননা শিল্পের জীবন তো সরাসরি বাস্তব জীবন নয়, সেটা হল রূপকল্পের জীবন বা প্রতিভাসের জীবন। ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণও এখানে একইভাবে কার্যকরী হয় না। আর যেহেতু মার্কস বা এঙ্গেলস শিল্প-সাহিত্যের কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রেখে যান নি, সেই কারণে সামাজিক কাঠামোর উপর-তলার ক্রিয়াকর্ম যে শিল্প-সাহিত্য, সে বিষয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যেও বিমত অনুপস্থিত নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন কেমনভাবে বিখ্যাত মার্কসবাদী প্লেখানভের 'সমাজতাত্ত্বিক অপেক্ষবাদ' (sociological relativism)-এর দুর্বলতাকে পরিহার করে লেনিন তাঁর টলস্টয়-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লেখেন। তাছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পভাবনার সঙ্গে ফরাসী

মার্কসবাদী শিল্পীদের শিল্পভাবনার পার্থক্যের কথাও তিনি বলেছেন। তবে নান্দনিক বিচারে মার্কস ও এঙ্গেলস যে তাঁদের বিভিন্ন রচনায় সমাজের 'অর্থনৈতিক ভিত্তি' ও 'শ্রেণী সংঘর্ষে'র ভূমিকার ওপরই সমধিক জোর দিয়েছেন, সে কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। শিল্পকর্ম যে তার নিজের মতো করে সমকালে শ্রেণীবিরোধকে অভিব্যক্ত করে, এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবকে, মানুষের ও প্রকৃতির ও বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে সে বিষয়ে তিনি যথার্থ মার্কসবাদীর মতোই নিঃসন্দেহ। এইভাবে, শিল্পে প্রতিফলিত পরিবর্তন-কামনা অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার পক্ষে, না বিপ্লবী শক্তির পক্ষে, তার নিরিখেই তার চরিত্র নির্ধারিত হয়। শিল্পের মার্কসবাদী বিচার যে সহজ কাজ নয় সে কথা তিনি অস্পষ্ট রাখেন নি। তবু বিশ্বাসের সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন :

> Of course, the phiiosophy of historical materialism would yield the answers, but it would yield them only to students who had proper understanding of the question ; who knew their Marxism and were serious students of art too ; knew the connection between the history of the people and the history of their art, and knew the relation between the "structure" and the "superstructure" of social life.

আলোচ্য প্রবন্ধ-সংকলনের লেখকেরা এই ইতিহাসবোধের ভিত্তিতেই য়ুরোপের আধুনিক রূপকলার বিকাশকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের কেউ 'বিপ্লবী শিল্প কী ?' এই প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছতে সচেষ্ট হয়েছেন, কেউ বা বিষয় ও করণকৌশলগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষত পশ্চিমের রূপকলা 'সুররিয়ালিজম' ও 'অ্যাবস্ট্রাক্‌সনিজমে' বিভক্ত হয়ে পড়লে এই আলোচনা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সমকালীন যুদ্ধোন্মুখ পৃথিবীর পরিবেশে। তবে যেহেতু এই সব রচনায় এ ধরনের আলোচনা সূত্রপাত মাত্র, তাই সকল প্রশ্নের সমান উত্তর আশা করা যায় না। তবে সব কিছুই যে ঐতিহাসিক বিবর্তনবোধ নিয়ে বিচার্য তা তিনি বলেছেন :

> No answer again could have any value unless the western art movements could be seen in their concrete

relation to the western socio-economic developments of the present age; and the aesthetic theories too of western critics could be seen in the proper historical persepective. In other words, both called for an examination of the socio-economic interpretation or of the "class" explanation of arts in the concrete.

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ভারতীয় মার্কসবাদীদের শিল্প-আলোচনায় কত কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। বিদেন পক্ষে আড়াই হাজার বছরের ভারতীয় ইতিহাস রচনার কাজ আজও অসম্পূর্ণ। বিশেষ করে বিভিন্ন যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ও শ্রেণী-সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা তো তাঁর ঐ ভূমিকা লেখার সময় প্রায় শুরুই হয়নি। তাই তিনি কুণ্ঠাহীন ভাবেই বলেছেন :

Historical evolution of Indian Art as the Marxists must desire is possible only when the history of the Indian peoples is known. The true meaning of Indian literature or of the Indian aesthetic theoris also can be understood then.

আমাদের সান্ত্বনা, ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস রচনার যে প্রাথমিক শর্ত, সেই ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজ গত পঁয়ত্রিশ বছরে অন্তত কিছু এগিয়েছে। আর তাই আমাদের আশা, অদূর ভবিষ্যতে নিষ্ঠ শিল্প-ইতিহাসের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ভারতের শিল্পের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার কাজও শুরু হবে।

৩

কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃত প্রেক্ষিত অনুপস্থিত বলে সমকালীন শিল্পকর্মের প্রতি যে উদাসীন থাকতে হবে এমন মনে করেননি গোপাল হালদার। তাই ওপরে আলোচিত ভূমিকাতেই তিনি ভারতীয় রূপকলার প্রসঙ্গ তুলেছেন। ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের মহান ঐতিহ্যের অবসান কেমন করে বিদেশী শাসনে ঘটল, কি করে পরম্পরাগত ভারতীয় শিল্প তার কারু ও চারু শিল্পের বৃত্তি থেকে চ্যুত হল, সে কথা উল্লেখ করে তিনি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয়

শিল্প আন্দোলনের সূত্রপাতের কথা বলেছেন। তারপর সে শিল্প নন্দলাল বসুর হাতে আরও সম্প্রসারিত হয়ে কি ভাবে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়ল, তাও বলেছেন তিনি। আর বলেছেন যামিনী রায়ের হাতে এক নতুন চিত্র-বাক্‌ভঙ্গির সূত্রপাতের কথা।

Revolutionary Art : A Symposium. "গ্রন্থের ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা ছাড়াও গোপাল হালদার মহাশয় রূপকলা প্রসঙ্গে কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছিলেন চল্লিশের দশকে—যেমন, 'নব্য ভারতীয় চিত্রকলার সূচনা', 'বাঙলার শিল্পপ্রদর্শনী', 'রাজসিক 'চিত্রপ্রদর্শনী', 'নন্দলালের কংগ্রেসের চিত্রমালা', 'যামিনী রায় ও জাতীয় চেতনা'[২]। এই নিবন্ধগুলি সমালোচনা-মূলক ; এবং নিঃসন্দেহেই সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর যে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা এগুলিতে তা নেই। বরং একজন সমাজ-সচেতন চিত্ররসপিপাসু সাধারণ দর্শকের অবস্থান থেকেই এই আলোচনাগুলি তিনি করেছেন। অথচ বিস্ময়ের কথা, প্রতিটি প্রবন্ধেই রূপকলায় তাঁর যে স্বাভাবিক অধিকার তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবেই ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধগুলি তাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুভার না হয়েও, একজন পরিণত মার্কসবাদীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এমন এক স্বচ্ছতা অর্জন করেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। আর যা লক্ষণীয় তা হল, ব্যক্তিগত অভিরুচির চেয়ে সমাজবস্তুবাদীর মননই তাঁর এই আলোচনায় কাজ করেছে বেশি। তাই একদিন যেমন তিনি নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার অবদানে উৎফুল্ল, অন্য একদিন তার ক্ষয়িষ্ণু পুনরাবৃত্তিতে ব্যথিত। অপর দিকে তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই শিল্পী নন্দলালের অদ্বৈতবাদী শিল্পভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য আঁকা তাঁর লোকধর্মী গ্রামজীবনের চিত্রাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে পেরেছেন। স্বতস্ফূর্তভাবে তিনি লিখেছেন : "ভারতবর্ষ তো পল্লীবাসীই, তার সাতলক্ষ গ্রামে সে তার আসন বিছিয়ে দিয়েছে। কত রাজা এল, গেল ; কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লী-কেন্দ্রিক সেই জীবনযাত্রা অব্যাহত রয়েছে—সেই ফল ফুল গাছ, সেই গরু আর ছাগল, সেই পাতার আড়ালে পাখি,—তার সব রয়েছে তেমনি। সেই ঘরের বধূ সহজ প্রসাধন করছে, সেই চাষী করছে চাষ, তাঁতি বুনছে

---

২ প্রবন্ধগুলি বাঙলাদেশে মুক্তধারা প্রকাশিত গোপাল হালদারের 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৪-১৯৪৬)' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

তাঁত, কোদালি চালাচ্ছে গাঁয়ের মজুর; ধুবুরি তুলো ধুনছে, বুটী তুলছে বুড়ো ওস্তাদ চোখে চশমা এঁটে, গাই দুইছে আহিরিণী গোয়ালিনী, ধান কুটছে গ্রামের বউ, দঙ্গল হচ্ছে কুস্তীগীরে কুস্তীগীরে, সেই পুরনো দিনের লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালারা খেলা দেখাচ্ছে, বাজনা বাজাচ্ছে,—ঢোল, একতারা, সারঙ্গী আমাদের পল্লীর শিল্পী। এই তো ভারতবর্ষ, এই তার চিরদিনের জীবন-যাত্রা—যার উপরে ইংরেজের মার্কা পড়ে নি, শহরের ছাপ নেই, শিল্পযুগের কোনো দাগ লাগে নি। এই ভারতবর্ষই গান্ধীজীর প্রিয়, এই ভারতবর্ষকেই নন্দলাল তুলির টানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সৈনিকদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলতে যত্ন করেন হরিপুরায়।"

আর এই কথা লিখতে লিখতে হয়তো নিজের অজ্ঞাতে গোপাল হালদার পৌঁছে যান ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামীর কাছাকাছি।

সমকালীন বিচার

'পরিচয়' বৈশাখ ১৩৪৭

'একদা'

মণীন্দ্র রায়

১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে এবং তারপরে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ, বিশেষভাবে বাংলায়, সন্ত্রাসবাদ আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় আন্দোলনের সেই করুণ, ব্যর্থ অধ্যায়ের কথা সর্বজন-বিদিত। হালদার মহাশয়ের 'একদা' সেই সময়েরই পারিপার্শ্বিকতায় গঠিত ও লিখিত। সাধারণ বাঙালি পাঠক পুস্তকখানিকে উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলতে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবেন হয়ত। কিন্তু আসলে বইখানি উপন্যাসই। এর প্রধান কারণ অবশ্য চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের দক্ষতা; বর্ণনাকৌশলে বইখানির নায়ক অমিত (এবং আরো কয়েকজন) বই শেষ করবার পরও পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।

অমিত মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবক, ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র। তার জীবনে অদূর ভবিষ্যতে অধ্যাপকত্ব লাভের পর যে মসৃণ আরামপ্রিয়তা এবং গতানুগতিক স্থাণু স্বভাবের আবির্ভাব এক-রকম অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী ছেলের ও মেয়ের সাহচর্যে এসে তার মোড় গেল ঘুরে। প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদী দলে না মিশলেও সে যে একজন অন্তর বাহির বিপ্লববাদী হয়ে উঠল তাতে আর সন্দেহ রইল না। তারই আশেপাশে নানা রকম চরিত্রের ভিড় দেখা গেল—তাদের কেউ বা স্বার্থপর, কেউ আত্মত্যাগী, কারো ভিতর দিয়ে বা বুর্জোয়া-সভ্যতা প্রতিনিধিত্ব জানাচ্ছে এবং অন্য কয়জন যথেষ্টভাবে প্রগতিসম্পন্ন। বস্তুত বইখানিতে আয়তন অনুসারে চরিত্রের ভিড় যেন একটু বেশি মনে হয়। অনেক চরিত্রের কথাই শেষ পর্যন্ত ভুলতে হয়—যদিও বইখানির আঙ্গিকের দিক থেকে এবং এই ধরনের একটি বিরাট আন্দোলনের পট-ভূমিকাসৃষ্টিতে, তাদের সকলেরই বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় দান আছে।

'একদা' পড়তে পড়তে সাবধানী পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর কথা স্মরণ না করে পারবেন না। অনেক বিষয়ে অনেক পার্থক্য এবং

রচনারীতির স্তর-বৈষম্য সত্ত্বেও মূল সুরে এবং প্রতিপাদ্য বক্তব্য বিষয়ে উভয়তই এক সন্ত্রাসবাদে অনাস্থা। হালদার মহাশয় লিখছেন,—'জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এসব প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেকদিন। অথচ ইহার রোমান্টিক আপীল মধ্যবিত্তদের পাইয়া বসিয়াছে। প্রকাণ্ড পৃথিবীর ভিত্তি তাহাতে বিন্দুমাত্রও নড়িবে না। ছেলেটাই শুধু পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। এই সব অমিতের ভাল লাগে না। তাহার বুদ্ধি, চেতনা, অতীত অভিজ্ঞতা দিয়া সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে—সুনীলের কোথাও সুযুক্তি নেই, আছে একটা দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা—নিজেকে নিঃশেষে ডালি দিবার নেশা।' (১৬৫ পৃ)

আঙ্গিকের দিক থেকে বইখানি বিলাতি জয়েস-উলফ সংস্কৃতির এবং ধূর্জটিপ্রসাদের দেশীয় ঐতিহ্যের অনুগামী। যদিও ধূর্জটিপ্রসাদ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি, তবু তিনিই প্রথম এ পথে যাতায়াত করবার চেষ্টা করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ অবজেকটিভ হয়ে পড়ে যে শিথিলতা দেখিয়েছিলেন, হালদার মহাশয়ের জমাট সাবজেকটিভ রচনা-রীতি তাকে এড়িয়ে চলতে পেরেছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষত যখন জানা যায় যে বইখানি লেখা হয়েছে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ের পক্ষে এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এ বিষয়ে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ আছি। বর্তমানে বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'পরিক্রমা' ছাড়া এ-ধরনের কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বাংলায় বোধহয় আর বেরয় নি, যাতে একটি লোকের একটি দিনের ক্রিয়া ও চিন্তাকে অবলম্বন করে কাহিনী রচনা করা হয়েছে। তবে বুদ্ধদেবের চেয়েও হালদার মহাশয়ের রচনার গতি বেশি মনে হয়। অমিতের সমস্ত চিন্তার মধ্যেও সে যে সর্বদাই চলিষ্ণু এবং চিন্তা ছাড়াও অন্যকিছু কাজে ব্যাপৃত আছে তা সুস্পষ্ট ভাবে ফোটানো হয়েছে।

লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাভঙ্গিকে বর্তমান পুস্তকে শ্রদ্ধা করে উঠতে পারেন নি।—'কিন্তু তাঁর লেখার style এমনি বিশ্রী যে তাঁর কথা বুঝে ওঠা শক্ত।' (২২১ পৃ) এ অভিযোগ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত না জানিয়ে সবিনয়ে একথা নিবেদন করতে পারি, হালদার মহাশয়ের রচনাভঙ্গিও ধূর্জটিপ্রসাদেরই প্রসাদপুষ্ট, তবে বক্তব্য বোঝবার কোনো কষ্ট হয় না, (যা ধূর্জটিপ্রসাদের লেখায় নাকি হয়ে থাকে,) তবে একটু বিশৃঙ্খল, (যা ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা কখনোই নয়)।

আরও একটা ত্রুটির উল্লেখ না করাও অন্যায় হবে। সেটি শ্রীযুক্ত প্রমথ

চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের পার্শ্বমন্তব্য সম্বন্ধে। 'প্রমথ চৌধুরী—চিন্তা ও লেখার ধার গেছে ক্ষয় হয়ে—অথচ কথা বলবার লোভ যায় নি' (২০৭ পৃ) এবং 'কেউ হন বীরবল—pun এর সস্তা শব্দ গাঁথেন।'...বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাকে কোনো কৃষ্টিবান চরিত্রের মুখ দিয়েও এইভাকে অস্বীকার করবার চেষ্টা কখনো প্রগতিশীল লেখকের লক্ষণ হওয়া উচিত নয়। প্রতিভার উন্মেষ যেমন আছে, তার ক্ষয়ও আছে তেমনি—এ নিয়ে রহস্য অর্থহীন এবং অমানবিক। যে-কথ্য ভাষায় আজ আমরা সমস্তরকম রচনাকেই রূপ দিতে সাহসী হচ্ছি, ভুলে গেলে চলবে না, সেটা চৌধুরী মহাশয়েরই অবিরাম প্রচেষ্টার ফল।

অবশ্য, এইসব ছোটখাট ত্রুটি সত্ত্বেও আমি বলতে কুণ্ঠিত নই, বইখানি আমার ভালই লেগেছে। অমিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক দলের একতার উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক যা বলেছেন, প্রত্যেক প্রগতি পন্থীরই তা ভেবে দেখা দরকার।

লেখক আশ্বাস দিয়েছেন ভবিষ্যতে আরো দুখানি বই এরই অনুসরণে প্রকাশিত হবে। আশাকরি তখন অধিকতর পরিণতির প্রমাণ পাব আমরা।

বইখানির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

'পরিচয়', পৌষ, ১৩৫৩

'পঞ্চাশের' পথ-উনপঞ্চাশী-তেরশ পঞ্চাশ'

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

তিনখণ্ডে সমাপ্ত গোপাল হালদারের এই উপন্যাসখানি সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস থেকে ভিন্নতর। ১৯৪২-৪৩ অব্দের মন্বন্তর-এর পটভূমি। এই দুই বছরের দুটি প্রধান যুগান্তকারী ঘটনা হল ১৯৪২-অব্দের তথাকথিত কংগ্রেসি বিপ্লব ও ১৯৪৩-অব্দের সাংঘাতিক মন্বন্তর যাতে বাংলার প্রায় ২০-৩০ লক্ষ লোক উজাড় হয়। এর মধ্যে প্রধানত শেষেরটি অবলম্বন করেই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তিনটি খণ্ডের তিনটি ভূমিকায় গ্রন্থকার উপন্যাস-রচনার মুখবন্ধ-স্বরূপ বলেছেন যে ইতিহাসের মর্যাদাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন,

এর বর্ণিত ঘটনাবলীর তিনি নিজেই জীবিত সাক্ষ্য। তাঁর রচনায় ঘটনাই মহানায়ক, তবে চিত্র ও চরিত্র প্রতিফলিত করবার জন্য তিনি এমন এক লোককে বরণ করেছেন নায়কের পদে যে, শিক্ষিত বাংলার কোনো মতামতের স্পর্শে আসেনি; অর্থাৎ পলিটিকসে সে কতকটা নিরপেক্ষ। গোপালবাবু সুপরিচিত লেখক, বিশেষত কমিউনিস্ট দলের মধ্যে। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা বাংলার বহু দৈনিক-সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করেছে। কিন্তু উপন্যাস লেখা তাঁর এই প্রথম বললেই হয়। তবু ১০৪৩-পৃষ্ঠা ব্যাপী এই দীর্ঘ উপন্যাসটিতে তিনি যে-কৃতিত্বের ভাগী হয়েছেন তা পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন না এটি আদ্যোপান্ত না পড়লে। আমার উপলক্ষ ছোট সমালোচনা, তা থেকে বইটির একটা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি লাভ হবে মাত্র।

নায়ক বিনয় মজুমদার ডাক্তার ও জাপান-কর্তৃক বর্মাদখলের পর বর্মা-প্রত্যাগত। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে, নায়ক সাধারণ বাঙালি। তিনি কোনো বিশেষ দলের মতামত পোষণ করেন না, কিন্তু কংগ্রেসকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। দেশের জন্য কিছু কাজ করবেন, কিছু ত্যাগ স্বীকার করবেন —এটা হল তাঁর নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। নায়িকা সুধা গুপ্তা স্কুলটিচার ও রাজনৈতিক কর্মী; কমিউনিস্ট অমিতের শিষ্যা। সুধা গুপ্তার সঙ্গে বিনয়ের আলাপ হয় অমিতের রোগশয্যাপার্শ্বে। বিনয় গিয়েছিল আপন গ্রাম সোনাকান্দিতে। সেখানে হুকুম জারি হয়েছে: 'জমি ছাড়াও, নৌকা কাড়ো'; এরই জন্য গ্রামবাসীর পক্ষে ক্ষতি পূরণের ফিকিরে এইখানে কার্যসূত্রে এসে অমিত অসুস্থ হওয়ায় সহযোগী বীরু সেন সদ্যপ্রত্যাগত বিনয়কে ডেকে আনে। এই সূত্রে অমিতের সঙ্গে হয় আলাপ। অমিত বিনয়ের কাছে বর্মা-ইভ্যাকুয়েশনের গল্প শোনে; বোমা বর্ষণের, ফিরতি-পথের অশেষ লাঞ্ছনার কথা, এমন-কি বর্মীরা যে ভারতবাসীদের চায় না, তাও শোনে। অমিতের শয্যাপার্শ্বেই সুধার সঙ্গে আলাপ। সুধার কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসে চাঁপাডাঙ্গায় যাবার, সেখানেও মানুষ সরানো হচ্ছে। এইখানে সুধার সঙ্গে কাজের সহযোগিতার অবসরে তার কর্মনিষ্ঠা, কাজ, হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তি ও মানসিক দৃঢ়তা বিনয়ের মনে গভীর রেখাপাত ও প্রেমসঞ্চার করে। চাঁপাডাঙ্গা যাবার আগে বিনয়ের রফা হয় সুধার সঙ্গে যে বিনয় 'পলিটিকসে নেই', কিন্তু সুধা 'পলিটিকস্ ছাড়া আর কিছুতে নেই।' বিনয়ের পরিচয় হয় বাংলাগ্রামের যুদ্ধকালীন সমস্যার সঙ্গে; একদিকে হতভম্ব নিঃস্ব অক্ষম চাষী ও

গ্রামবাসী আর একদিকে সর্বশক্তিময় মিলিটারি ও গভর্নমেন্টের পদস্থ অফিসারবৃন্দ। এরই মধ্যে জাপানীদের আসাম ছেড়ে দেবার আয়োজন। বিনয়ের বর্মার অভিজ্ঞতা সদ্য ও আপনলব্ধ, তার মতে জাপানীদের সঙ্গে ভারতবাসীর ঝগড়া নেই। অমিতদের মত, হোক না জাপানী, কেন ইংরাজ প্রভুদের বেদখল স্থানে তাদের বসাব! তর্ক হয়, মীমাংসা হয় না। কলকাতায় আছে বিনয়ের ভগ্নী হেনা; শচীপ্রসাদ ভগ্নীপতি, ব্যবসায়ে সিদ্ধহস্ত! শচীপ্রসাদ বিনয়কে মন্ত্রণা দেয় একটা ডাক্তারি ওষুধ তৈরির কারখানা স্থাপন করতে; বিনয় রাজি হয় তার টেকনিক্যাল দিকটা দেখবার ভার নিতে। মিস্টার মিত্তির বড় সরকারি চাকরে, শচীপ্রসাদের বন্ধু। চিত্রা তার বোন, কলেজের ছাত্রী। সে অতি সুসংযত, নম্র। এই নম্র, সংযতবাক্, কৃশাঙ্গী নারীটিকেও বিনয়ের বড় ভালো লাগে। হেনার কাছ থেকে প্রস্তাব আসে ও অনেকবার বিনয়েরও মনে হয় যে সে ঠিক এই চায়! এই রকম সাধারণ নারীকে জীবন সঙ্গিনী করতে, যে হবে গৃহের গৃহিণী, শিশুর জননী। বিনয়ের সঙ্গে আলাপ হয় আরো অনেকের, ব্যবসায়ীদের, কংগ্রেসকর্মীদের— মেহ্‌রা, মথুরাদাস, হরসুল রায়, ইব্রাহিম ভাই; ভদ্র ইত্যাদি। ড্রয়িং রুমে, পার্টি মিটিঙে নিমন্ত্রণ আসে। সুধাদের দল থেকেও আমন্ত্রণ আসে তাদের কাজে যোগ দেবার জন্য। বিনয় দেশে যায় তার বাড়ি দখল হবে তারই ব্যবস্থা করতে। কিছু টাকাও পায় সে, আর আলাপ-পরিচয় হয় নূতন নূতন লোকদের সঙ্গে—মজিদ, ইদ্রিস মিঞা, শাহেদ, জাহেদ, শিবুদা, মুকুন্দ পাল, বাঈ আম্মা, কীন সাহেব ইত্যাদি ও মিস সীতা রায়, হেড মিস্ট্রেস। কেউ কমিউনিস্ট, কেউ ব্যবসায়ী, উকিল, কেউ পুরাতনপন্থী, কেউ নূতন-পন্থী কংগ্রেস-সেবক, কেউ লিগ-মেম্বর, কেউ চোরাকারবারি। এই সময়ে কংগ্রেস-ক্রীপস-মিশন আলোচনা ভেঙে যাবার খবর আসে। গ্রাম ছেড়ে যাওয়া ও খোসারতের সমস্যা গ্রামে, অপরদিকে সারা দেশময় অগাস্ট আন্দোলনের দুন্দুভি বেজে ওঠে। বিনয়ের মনেও উন্মাদনার আঁচ লাগে; সে ভাবে সুধাদের দল কেমন করে আজ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; ক্ষেত শূন্য, গ্রামবাসী গৃহহারা, দিশাহারা, কাজ নেই, বাড়ি নেই, খাবার নেই, নৌকো নেই, দেশ শ্মশান—এই কি তথাকথিত 'জনযুদ্ধ'? বিনয় আবার এসেছে কলকাতায়; মিলিটারির গুলিতে আহত নীরদকে নিয়ে। আবার সুধার ডাক আসে, বিনয়কে মিছিলে যোগ দিতে। আবার তর্ক হয়; সুধা বলে ঐ-জনশক্তির জাগরণ, এই যে গ্রাম-ছাড়ানো ব্যাপারে

ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধতা, এই যে কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষে গভর্ণমেন্টের আদেশ পরিবর্তন—এ সবই গভর্ণমেন্টের হার জনশক্তির কাছে। ক্ষুব্ধ হয় বিনয়—মানুষ খুন হয়, তাকে ভিটা বাড়ি নৌকো গাড়ি ছাড়তে হয়, সে কাপড় তেল কুইনিন পায় না, তবু যুদ্ধে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করতে হবে—এই কি জনশক্তির সংগঠন? বিনয় দেখে সহস্র লোকের মিছিল, রক্ত-পতাকা লক্ষ সহস্র, শোনে সহস্র কণ্ঠের তুমুল জয়ধ্বনি; কমিউনিস্ট পার্টির আইনসঙ্গত হবার উৎসব। সে ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওদের কাজে লাগাবার জন্য এই দাক্ষিণ্য; কই, ছেড়েছে কি গভর্ণমেন্ট চট্টগ্রাম বন্দীদের? না, না, সে এত বিমূঢ় ভ্রান্ত নয়। শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধীর ও সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতার-সংবাদ প্রকাশিত হয়, সারা দেশবাসীর মুখেচোখে এক কথা খেলে যায়—"ডু অর ডাই", "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—তুমি কি করবে বিনয়?

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া; শচীপ্রসাদ, মেহরা, মথুরাদাস ইত্যাদি সকলে অনেক আস্ফালন করেন সব রকম দিক থেকে সমস্ত কাজ বন্ধ করবার জন্য, কিন্তু তাতে মুনাফায় হাত পড়ার শঙ্কা, কিছুই হয় নি। অসংবদ্ধ জনতা ট্রাম চালানো বন্ধ করে, তার কাটে, আগুন লাগায়, এসিড ঢেলে দেয় ট্রাম-যাত্রীদের ওপর। পুলিশ মিলিটারি এসে বেপরোয়া গুলি করে, গ্রেপ্তার করে। কমিউনিস্ট দলের ওপর সকলের সন্দেহ, ওরাই গুপ্তচরের কাজ করে বিপ্লব পণ্ড করে দিচ্ছে। চিত্রার বিষয়ে বিনয়ের মনে পরিষ্কার হয়ে যায়, না সে তাকে বিবাহ করে স্বচ্ছন্দ গৃহীর জীবন চায় না, সে চায় কাজ করতে; মানুষের, সাধারণ মানুষের পথ করতে। সুধার কাছে সে আবার আসে কিন্তু সেবারেও সুধার কাছে তার প্রণয়-নিবেদন ব্যাহত হয়। ফিরে আসে সে দেশে, সেখানে দেশের নানা সমস্যায় ও পীড়িতের চিকিৎসায় সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করে। সহজ আনন্দ ও সৌহার্দ্যের ঔদার্য নিয়ে হাস্যময়ী সীতা বিনয়কে সকল কাজে উৎসাহিত করে। এখানকার রাজনৈতিক কর্মী—প্রমথ, মজিদ, শিবুদা প্রভৃতির প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা কংগ্রেস-কর্মীদের চেয়ে কম নয়। বিনয় ভাবে ওরা কমিউনিস্ট হতে গেল কেন; তাদের সঙ্গেও হয় তর্কযুদ্ধ। এদিকে তার প্রতি প্রমথর যেন এক তির্যক মনোভাবও সে মাঝে মাঝে লক্ষ করে; সে কি সীতার জন্য?

'রেশন প্রবর্তিত কর'—রব ওঠে কমিউনিস্টদের তরফ থেকে। কেরোসিনের রেশন শুরু হয়; বিনয়কে তদারকের ভার নিতে হয়, কিন্তু লোভ ও চোরাকারবারের তাগিদে রেশন সুব্যবস্থা পণ্ড হয়। গ্রামে গ্রামে

চাল কেনা শুরু হয়। চাল যাবে কলকাতায়, বিদেশের জন্য, যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য রপ্তানি হতে। ইব্রাহিম ভাইয়ের চররা চারিদিক থেকে চাল কিনে চালান দেয়; মেদিনীপুরের ঝঞ্ঝাপ্লাবন এই সময়ে সমস্যা আরো ঘনীভূত করে তোলে। আবার আসে সুধার ডাক—মেদিনীপুরের কাজের তলব। বিহ্বলচিত্ত বিনয় ছুটে আসে কলকাতায়। স্থির হয়ে বিনয়ের বর্মার পরিচিত গণ্যমান্য অবস্থাপন্নদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে হবে। রেঙ্গুনের অ্যাডভোকেট মিঃ চাটার্জির কাছে যাবার পথে সুধার কাছে বিনয়ের আত্মনিবেদন প্রগাঢ় ঐকান্তিক হয়ে ওঠে; বিনয় যেন সুধার সাড়া পায় ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে চাটুয্যে সাহেবের কাছে সুধার পরিচয় করিয়ে দেয় 'মাই ফিয়াঁসে' বলে। সুধার মুখের উপর রক্তিম ছটা সম্মতি জানায়। কিন্তু নিয়তির নির্দেশ অন্যরকম। কলকাতায় বোমা পড়ে, জনশূন্য প্রায় হয়ে যায় কলকাতা—লোক পালায়। সুধারা চায় এর প্রতিরোধ, বিনয় বর্মার অভিজ্ঞতাবশে চায় চলে যাক্ লোক, বাঁচুক মানুষ। মতপার্থক্য উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করে। বিনয় ফিরে যায় দেশে।

দেশে এসে বিনয়ের যে অভিজ্ঞতা হয় কালের অতি দ্রুত চক্রপরিবর্তনের তা এক অদ্ভুত আবিলময় অভিজ্ঞতা। গ্রামে, হাটে, দোকানে চালের ক্রমশ দাম বৃদ্ধি,—এমনকি দুষ্প্রাপ্যতা; এদিকে চালের চালান কলকাতায়, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক চাল কেনার এজেন্ট নিয়োগ, কলকাতা ছাড়া অন্যত্র সংগৃহীত রাখা নিষেধ—এ সবের ফলে উত্তরোত্তর গ্রামে গ্রামে চালের অভাব, বিরাট চোরাকারবারের জাল, রাজনৈতিক দল ও তাদের লিডারদের দলাদলি। অবশেষে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ যার সাক্ষাৎ পরিচয় সকল বাঙালিই পেয়েছেন। কাপড়, তেল, কয়লা, এমনকি, কাগজের দুর্ভিক্ষ ও চোরাকারবার। আর এক দিকে জেলা বোর্ড-কাউন্সিলের নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতির গ্রন্থি। শ্যামাপ্রসাদ-ফজলুল হক-সোহরাবর্দির রিষ ও মিতালি আবার চালের কারবারের প্রসাদে মারোয়ারি-বাঙালি-ভাটিয়া যেমন, খোজা ফজলভাই ইব্রাহিমভাই—তথা লীগ-কংগ্রেস-মহাসভার ইউনিটি। কলকাতায় দুর্ভিক্ষের করাল রূপ, লঙ্গরখানা, নাজিমুদ্দিন-সোহরাবর্দির পুরাতন ও নূতন মন্ত্রীদের ঘুঁটির চাল। সোনাকান্দিতে জাপানী বোমাবর্ষণ, সেবা সমিতি, মেয়ে ইস্কুলের অচল অবস্থা, সীতার নীরবে হাস্যমুখে দুর্ভোগবরণ। স্কুলের প্রেসিডেন্ট বৈকুণ্ঠবাবুর সীতার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি এবং তাকে নির্যাতন, শাসনের ভয় প্রদর্শন। বীরু সেনের পত্নী ও

শ্যালিকা সমস্যা ; ইদ্রিস মিঞার কন্যা ও জামাইঘটিত সমস্যা। শিবুদার অ্যারেস্ট ও বিচার, পরে অসুখ ও মৃত্যু। শচীপ্রসাদের চোরাকারবার ও প্রকৃষ্ট ওষুধের নামে ভেজাল চালানোর প্রচেষ্টা, হেমার শিশুকন্যার মৃত্যু, বোধহয় ভেজাল ওষুধের কল্যাণে। সুধার সঙ্গে বিনয়ের পুনরায় আলাপ-আলোচনা ও তজ্জনিত আশা ও নিরাশা। সীতার প্রহেলিকা—সকলকে ছাপিয়ে ক্ষুধার ক্রন্দন 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' রব, সেই সঙ্গে অনাহারী দলের নিরুদ্দেশ যাত্রা, ক্ষুধিত রমণীর আত্মবিক্রয় ; ছবির পর ছবি বিনয়ের সামনে রূপায়িত ও রূপান্তরিত হয়। সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল বিনয় দেখে, প্রমথ পার্টির কাজ ত্যাগ করে ব্যবসায়ে লিপ্ত, প্রমথই সীতার প্রণয় দেবতা ; তাকেই সীতা বিবাহ করে। আর ওদিকে সে চিনতে পারে যে পার্টির কাজই সুধার ইষ্টদেবতা ; তার বিভ্রম যায় দূরে। সে সুধার প্রতি যেমন এক শ্রদ্ধা, তেমনি 'সাধারণ মানুষের কাজে' এক মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

আগেই আমরা বলেছি লেখকের এই বই তিনটি সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস থেকে একটু ভিন্ন। আমরা এখানে এই প্রভেদের লক্ষণ নির্দেশের প্রয়াস করব। নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও প্রেমের বিকাশ, পার্শ্বচরিত্র, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক, লৌকিক বা রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সমাবেশ, এগুলির মধ্যে যোগাযোগ ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির চরিতার্থতা প্রদর্শন হল সাধারণ উপন্যাসের লক্ষ্য। কিন্তু বিপ্লবী যুগের উপন্যাস সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস থেকে হয় ভিন্ন। এর কারণ শান্তিময় যুগে অন্তর্লৌকিক শক্তি মন্দীভূত তেজে কাজ করে, সামাজিক পরিবর্তন ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বিপ্লবী যুগে এসব শক্তি ও পরিবর্তন প্রচণ্ড ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অনেক জিনিস যা ছিল নির্জীব, হয়ে ওঠে জাগ্রত আর ঘটনা সংক্রামিত হয় একদিক থেকে অন্য দিকে বা একস্তর থেকে অন্য স্তরে বিদ্যুৎ-বেগে। বহু মানবীয় যোগসূত্রে এসময় টানও পড়ে, আবার দৃঢ়তাও আসে। এ সময়ের কথাচিত্র সার্থক হয়, যদি তা বহুমানবীয় যোগসূত্রে, বিভিন্ন স্তরের আলোড়ন ও পরিবর্তনের শীঘ্রগতি প্রতিফলিত করতে পারে। আমাদের বর্তমান যুগকে বিপ্লবী যুগ বললে বোধকরি অন্যায় হবে না। আমাদের যত কিছু ব্যবস্থা ও সংস্কার—ধর্ম অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বর্তমানে বিপ্লবের সম্মুখীন। আর একদিন এসেছিল একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবের দিন, বঙ্গ বিচ্ছেদের যুগে। সে সময় হয়েছিল আমাদের প্রথম জাগরণ। 'গোরা'-র সেই

জাগরণের আকৃতি স্বরূপ লাভ করেছিল; যদিও "গোরা" প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবেষ্টনীতেই আবদ্ধ। বর্তমানে বিপ্লবপন্থী যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে গোপালবাবুর বই তাদের মধ্যে একটা বৃহৎ উৎকর্ষ লাভ করেছে। বহু মানবীয় যে-যোগসূত্রের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি সে-যোগসূত্রের সন্ধান দিতে গোপালবাবু ত্রুটি করেন নি। পঞ্চাশটির ওপর চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এ উপন্যাসে, নিতান্ত সংখ্যা গরিষ্ঠের বা রকমারির তাগিদে তারা উপস্থাপিত হয় নি। তারা আসন করে নিয়েছে নিজেদের জন্য উপন্যাসটিতে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কংগ্রেসসেবী, লীগসেবী, কমিউনিস্ট, চাষী, মজুর, উকিল, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, গভর্নমেন্টের চাকুরে, গ্রাম্য কন্‌ট্রাক্টর, আই. সি. এস, চোরাকারবারী, সাধারণ গ্রামবাসী, দুর্ভিক্ষপীড়িত, বোম্যহত, ক্ষুধায় জর্জরিত আত্মবিক্রয়ী রমণী—উপন্যাসটির আসরে এরা সকলে স্বস্থানে উপস্থিত। সামাজিক নানা বিভাগ, নানা শ্রেণী ও নানা স্তরের যোগাযোগ, তাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রভাব ও গ্রন্থের চরিত্রগুলির সঙ্গে এই সবের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। উচ্চস্তর নিম্ন-স্তরের মধ্যে কেমন ভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, শহর কেমন করে গ্রামকে শিল্প-বাণিজ্যে শোষণ করছে ও গ্রাম কিভাবে শহরকে সবল করে তার সন্ধান আছে এ গ্রন্থে। শহরের নানা কূটকৌশল আবার গ্রামের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে ঈর্ষা-আত্মকলহ সেই সঙ্গে সংঘবদ্ধতা ও কর্তব্যপরায়ণতা অবয়ব লাভ করেছে। এ-সবের সুষ্ঠু পরিবেশনে যদি বিপ্লবী উপন্যাস সার্থক হয় তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে গোপালবাবুর বই সার্থক হয়েছে।

তবু আমাদের যেটুকু নালিশ আছে সেইটুকুর এখানে উল্লেখ করব। নায়ক-নায়িকা ও প্রধান চরিত্রগুলি গ্রন্থের মধ্যে মানসিক কোনো গূঢ় পরিবর্তন উত্থাপন করতে পারে নি। এ রকম পরিবর্তনই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। মাংস অস্থি ত্বক ইন্দ্রিয় সবই উপস্থিত, শুধু প্রয়োজন কোনো এক মন্ত্রবলে তাতে প্রাণ সম্পাদন করা; সেই প্রাণ সম্পাদনে কোথায় যেন ব্যর্থতা আছে। বিনয় প্রবহমান স্রোতে ভেসে চলেছে কিন্তু তার চিত্ত দ্রাবক থেকে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। নায়িকা সম্বন্ধেও একথা খাটে। আর একটা জিনিস আমরা দেখব আশা করেছিলাম কিন্তু খুঁজে পাই নি, সামাজিক ও লৌকিক কোনো বিভাগে কোনো চিরপ্রথাগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা তুলে ওঠে নি—পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বের লেখা 'গোরা'তেও সে বিদ্রোহের সুর কত সুতীব্র!

লেখকের ভাষা নিজস্ব, প্রাঞ্জল, কিন্তু কোথাও কোথাও একটু খিঁচ লাগে।

'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৫৪

'বাঙালি সংস্কৃতির রূপ'

রাধারমণ মিত্র

সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতি, গোপালবাবুর একান্ত আপনার জিনিস—প্রাণের জিনিস। তার জন্য শুধু যে তাঁর দরদই আছে তা নয়, মাথা ব্যথাও আছে। আর লেখার অধিকার? সে তো আছেই। প্রমাণ, 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। গভীর চিন্তা করে অত্যন্ত দরদ দিয়ে পাকা হাতে লেখা এই বইখানি পড়ে যতখানি আনন্দ পেয়েছি, শিক্ষা তার চেয়ে কিছু কম পাইনি। জানার মধ্যে যে সব ফাঁক ছিল তা অনেকখানি ভর্তি হয়ে গেছে—দৃষ্টি হয়েছে আগের চেয়ে পরিষ্কার। আমার বিশ্বাস এটা আমার একারই অনুভূতি নয়। এই বইখানি যিনি মন দিয়ে পড়বেন তাঁরই আমার মতো অভিজ্ঞতা ও উপকার হবে। তাই বাঙালি সংস্কৃতির যাঁরা দরদী, বিশেষ করে যাঁরা সংস্কৃতির কর্মী, তাঁদের এই বইখানি পড়বার জন্য অনুরোধ করতে আমার আদৌ সংকোচ নেই।

লেখক এই বই-এ বাঙালি সংস্কৃতির সম্ভাব্য সব দিকই—কি তাত্ত্বিক, কি ব্যবহারিক—অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। বর্তমান বাঙালি সংস্কৃতি কি, তার থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ও মধ্য যুগে (বৌদ্ধ-হিন্দু ও মুসলমান যুগে) এই সংস্কৃতির রূপ কেমন ছিল, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বাঙালি সংস্কৃতির (মধ্য যুগে ও বর্তমানে) পার্থক্য কোনখানে, দরবারী সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতি, মুসলিম কালচার বলে কিছু আছে কিনা, না দেশ-ভেদে এ কালচারের রূপ-ভেদ হয়েছে, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ, 'ধর্মীয়' সংস্কৃতি ও 'জাতীয়' সংস্কৃতি, মুসলমান বাঙালি সংস্কৃতি, মধ্যযুগে এ সংস্কৃতির স্বল্পতা ও তার কারণ, বাঙালি মুসলমানের কাব্য সাধনা, হিন্দু-মুসলমান বাঙালির যৌথ সংস্কৃতি, তার এক পাশে হিন্দু সংস্কৃতি বা 'বাবু' কালচার অন্য পাশে মুসলিম সংস্কৃতি বা 'মিঞা' কালচার, মুসলমান মধ্যবিত্তের নবঅভ্যুদয়, 'ভদ্র' সংস্কৃতি ও 'লোক' সংস্কৃতি, ভাবী ভারতবর্ষে বাঙালি সংস্কৃতির দান ও স্থান

পর্যন্ত কোনো কিছুই বাদ যায় নি প্রথম ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে। আর তত্ত্বের দিক দিয়ে যে সব সিদ্ধান্তে লেখক পৌঁছেচেন এই অংশে, শেষ ৮০ পৃষ্ঠায় তারই পটভূমিতে তিনি বিচার করেছেন বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত কতকগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা ঘটনাকে, যেমন যামিনী রায় ও নন্দলাল বসুর চিত্র প্রদর্শনী, গণনাট্য সংঘের নৃত্যাভিনয়, ইত্যাদি। এই অংশের সমগ্রভাবে লেখক নাম দিয়েছেন 'বাঙালি সংস্কৃতির চলতি হিসাব'।

গ্রন্থের কথাবস্তুর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল, তা থেকে কারুরই বুঝতে বাকি থাকবে না যে লেখকের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। কিন্তু ব্যাপকতাই তাঁর একমাত্র বিশেষত্ব নয়। তার চেয়ে আরো বড় কথা হলো তার গভীরতা। সে দৃষ্টি এত গভীর যে সংস্কৃতির উপর তলাতেই, অর্থাৎ মানসিক সৃষ্টির ক্ষেত্রেই, তা সীমাবদ্ধ নয়। তা গিয়ে পৌঁছেচে একেবারে নীচের তলার চোরাকুঠুরিতে আর তারও নীচে যে অদৃশ্য অথচ মজবুত বনিয়াদ আছে সে পর্যন্ত। সে বনিয়াদ হচ্ছে বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি (যা বৈজ্ঞানিকেরা ও শ্রমিক-কৃষকেরা মিলে করে) আর এই সম্পদের উপর গড়ে তোলা মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী। বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে আর যে দু একখানি বই আছে তাদের লেখকদের থেকে গোপালবাবুর বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, সংস্কৃতিকে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন নিজের মনগড়া ধারণা দিয়ে নয়, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব মন নিয়ে। তাই তাঁর চোখে সংস্কৃতি অর্থাৎ মানস-সৃষ্টি স্বয়ম্ভুও নয়, সনাতনও নয়। সে যেমন একদিকে আকাশ থেকে টপকে পড়ে না মাটিতে বরং মাটি থেকে উঠেই এগিয়ে যায় আকাশের দিকে, তেমনি অন্য দিকে সে একই ভাবে একই অবস্থায় থাকে না বেশি দিন। সে সচল, তার গতি আছে, পরিবর্তন আছে, এক কথায় তার জন্ম বিকাশ পতন ও মৃত্যুও আছে। বিশিষ্ট অবস্থার, বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে তার উৎপত্তি ও বিকাশ। সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও হয় পরিবর্তন। অনুকূল অবস্থায় সে বাড়ে, প্রতিকূল অবস্থায় সে মরে। এ অবস্থা খানিকটা বদলায় আপনা আপনি, খানিকটা বদলায় মানুষের চেষ্টায়। কিন্তু মানুষের চেষ্টা নিষ্ফল হয় যদি না সে ধরতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত গতির ঝোঁকটা কোন দিকে, মানুষ যদি সজ্ঞানে সেই দিকে চেষ্টা করে—গতির বেগ বেড়ে যায়, পরিবর্তন দ্রুত হয়। কিন্তু উল্টো দিকে চেষ্টা করলে সাময়িকভাবে মানুষ সে গতিকে হয়তো রোধ করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতেই হয়।

তাই সংস্কৃতি বা মানসিক-সৃষ্টিও বাস্তব অবস্থাকে অনুকূলে বা প্রতিকূলে প্রভাবান্বিত করতে পারে। সেই জন্যেই সংস্কৃতিকে যাঁরা বদলাতে চান তাঁদের পক্ষে জানা একান্ত প্রয়োজন যে পরিবর্তন কোন্ পথে আর কি ভাবে হচ্ছে। তাই শুধু সংস্কৃতির বর্তমান চেহারার খুঁটিনাটি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই যথেষ্ট হয় না। জগৎ, জীবন, সমাজ, জীবনযাত্রার প্রণালী—এ সবের সম্বন্ধেও বাস্তব জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তব জীবন থেকে সংস্কৃতিকে আলাদা করে দেখলে বড় জোর একটি সংস্কৃতি-দর্শন খাড়া করা যায়, কিন্তু সেটা সংস্কৃতি-বিজ্ঞান হয় না। গোপালবাবু এ বই-এ দার্শনিকের মতো উপর থেকে সংস্কৃতিকে দেখবার চেষ্টা করেন নি। তিনি তাকে তলিয়ে দেখবার অর্থাৎ তলা থেকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন তার গতির ছন্দ ধরার জন্যে। তাই এই বইয়ে শিল্প-সাহিত্যের কথা যত আছে, তার চেয়ে কম নেই আর্থিক জীবনের কথা। প্রকৃতপক্ষে তিনি সংস্কৃতিকে খুব ব্যাপক অর্থে, কালচারের অর্থে, নিয়েছেন বাস্তব ও মানস-সৃষ্টির অখণ্ড সমগ্রতায়। ইতালীর রিনেসান্সের হেরফের থেকে আরম্ভ করে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে হেরফেরের পরিচয় দিয়ে সেই শ্রেণীর সৃষ্ট-সংস্কৃতির সংকটে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন পাঠকদের এনে। এই সংকট হল বাঙালি সংস্কৃতির বর্তমান রূপ ও বর্তমান সমস্যা। সংস্কৃতির-নায়ক হিসাবে এই হল গোপালবাবুর বড় সমস্যা। এই বেড়া ডিঙোতে পারলে বাঙালি সংস্কৃতি আরো উন্নত স্তরে পৌঁছে অনেক কাল বাঁচতে পারে। আর যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তাহলে খোঁড়া হয়ে তার অপমৃত্যু অবধারিত।

কি করলে এই সংকটকে কাটিয়ে ওঠা যায়? না বুঝলে যায় না। তাই বর্তমানকে বোঝবার জন্য অতীতের উপর চোখ বোলাতে হয়েছে গ্রন্থকারকে আর ভবিষ্যতের দিকেও তাকাতে হয়েছে সমাধানের জন্য। কি সমাধান তিনি পেয়েছেন? তাঁরই মুখে শোনা ভালো—"বাঙালির মুমূর্ষু 'লোক'-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে আর তার প্রকাশকে করতে হবে আরো উন্নত, বিকশিত। আর 'ভদ্র' সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে 'লোক' সংস্কৃতির বিষয়বস্তু দিয়ে আর তার প্রকাশকে করতে হবে সহজ ও লোকবোধ্য। দুই সংস্কৃতিকে স্থাপন করতে হবে সমন্বয়।"

এ তো হল লক্ষ ও কর্তব্য। কিন্তু করবে কে? সচেতন সাহিত্য-

কর্মী, না সচেতন শিল্পী? 'আমরা সচেতন হয়েছি বলেই আমরা শিল্পী হয়ে উঠেছি তা মনে করা হবে হাস্যকর। সচেতন কর্মীর কাজ হবে শিল্পী ও লেখকদের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করা। সচেতন হলে সেই জীবন-সত্যকে কিভাবে শিল্পসাহিত্যে রূপ দিতে হবে তা তাঁরা নিজেরাই ভালো জানেন। আমরা শুধু শিল্পী ও লেখকদের জোগাব সত্য—তাহলেই হবে।' অন্যত্র: 'যুগ-সমস্যা সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের সচেতন করে তুলতে পারলেই সাহিত্যের দিকে আমাদের কর্তব্য সহজ হয়ে ওঠে। সচেতন সাহিত্যিক সচেতন সৃষ্টিতে আপনা থেকেই অগ্রসর হবেন। তাঁর চেতনাকে কি ভাবে রূপ দেবেন তা তিনিই জানেন—সংস্কৃতিকর্মীরা নয়।' অন্য দিকে এই নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে শিল্পীসাহিত্যিকদের পক্ষে শুধু সৃষ্টি-প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে সঙ্গে 'লোক-জীবন ও লোক-মনের সঙ্গে সংযোগ রাখা—এ যুগের সৃষ্টিশালী শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে প্রাণের মনের কর্মের যোগ সাধনও দরকার।' সৃষ্টি-প্রতিভা ও জীবন-চেতনা এ দুয়ের সমন্বয়ে হয় নতুন জীবন-সত্যের প্রকাশ শিল্পে ও সাহিত্যে। আর দুয়ের বিচ্ছেদে হয় অতীতকে আঁকড়ে থাকবার নিরর্থক চেষ্টা কিংবা নতুন সত্যের স্থূল প্রচার। 'সৃষ্টি প্রকাশ—প্রচার নয়।'

এ কথা বলা দরকার যে আলোচ্য গ্রন্থটি ধারাবাহিক রূপে লেখা একখানি বই নয়, বিভিন্ন সময়ে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ মাত্র। তা সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু পুনরুক্তিও ঘটেছে অনেক বিষয়ে। আর, কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের আশা মেটেনি। আদি ও মধ্য-যুগের বাঙালি সংস্কৃতির রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আরো বেশি জানবার সাধ ছিল। কিন্তু অতীতের অভাবকে তিনি ভবিষ্যতের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিয়েছেন, 'ভাবী ভারতবর্ষ ও বাঙালী সংস্কৃতি' দিয়ে। এই প্রবন্ধটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এটি এই সংগ্রহের মধ্যমণি। গ্রন্থের ভূমিকাটিও মূল্যবান।

এই বইয়ে যা দিয়েছেন তার জন্য গোপালবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ এই বইয়ের প্রকাশককে। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সবই উৎকৃষ্ট—মলাটটি অতি সুদৃশ্য। খরচের তুলনায় দাম বেশি নয়। কিন্তু এই বইটির যেমন বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, সে দিক থেকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দামটা একটু বেশি নয় কি?

পুনর্মুদ্রণ ও তথ্যপঞ্জি

১ কয়েদির আকাশ

১৯৩৪-এ প্রেসিডেন্সি জেলে লেখা

২ **It was his city**

১৯৪১-এ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়

৩ সংস্কৃতি, না বিকৃতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'মেঘনা'র সাহিত্য সংকলন (বৈশাখ, ১৩৫৪) সংখ্যায় প্রকাশিত

৪ **Rabindranath Tagore**

বিশ্ব শান্তি সংসদ-এর বুলেটিনে জানুয়ারি ১৯৬১-তে প্রকাশিত

৫ রবীন্দ্র শতবর্ষ শান্তি উৎসব-এর আবেদনপত্র

৬ রবীন্দ্রনাথের মানবতা

৭ তথ্যপঞ্জি

প্রেসিডেন্সি জেল
১৯৩৪

কয়েদীর আকাশ

আমাদের ছোট আঙিনার দুয়ার বিকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খোলা থাকে। আমরা সামনেকার বড় আঙিনায় একটু হাওয়া খেতে বেরোই—যে হাওয়া আসে গোটা তিন-চার পাঁচিল টপকে, একটা দোতলা হাসপাতালের রোগীদের শ্বাস দান করে ও নিশ্বাস বহন করে; আর একটা লম্বা দোতলা মণ্ডলের কয়েদখানার ফাঁকে গলে, পাশ কাটিয়ে, গরাদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু হাওয়া তবুও আসে। আর আমাদের বড় আঙিনাটা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। ওর মধ্যস্থলে আছে একটি পুকুর। তার জল ময়লা, কিন্তু পুকুরটি খুব ছোট নয়, মাঝারি গোছের। তার চারপাশে পথ, খানিকটা করে বসবার ও বেড়াবার জায়গা, আর একটু দূরে চার কোণে আছে চারটি অশ্বত্থ গাছ। আগে গাছের গোড়াগুলো বাঁধানো ছিল, বসা চলত, কিন্তু এখন তার বাঁধান তলা স্তূপে পরিণত হয়েছে। আগে 'স্তূপমূলে' বসতাম, এখন আমরা 'স্তূপ' প্রদক্ষিণ করি, কিন্তু এখন আর গাছতলায় বসতে পারি না। দু-ঘণ্টার মতো এই আঙিনার তিন পার আমাদের অধিকারে আসে—ইচ্ছা হয় আমরা বেড়াই, ইচ্ছা হয় খেলি, ইচ্ছা হয় আঙিনার কোথাও বসি। শেষের ইচ্ছাটাই আমার বেশি হয়—সুস্থ দেহকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন আমি দেখি না, আর দেহ অসুস্থ হলে তাকে ব্যস্ত করাই তো নিষিদ্ধ। অবশ্য কেউ কেউ উল্টো মত পোষণ করেন। তিন পারের সরু পথে পরস্পরে ঠোকাঠুকি না খাবার কসরৎ করতে করতে তাঁরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন—সুস্থ দেহকে তাঁরা রাখতে চান সচল, অসুস্থ দেহকে তাঁরা করতে চান সবল। আবার কেউ কমাতে চান অম্বল। আমারও অবশ্য সঙ্গী জুটে যায়; আর না জুটলেও বাইরে সময়টা ভালোই কাটে। উপরের আকাশের অনেকটা দেখা যায় ওখান থেকে। অনুমান করা যায় কোনখানটায় গঙ্গার ওপারে মিল্-এর পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পেছনকার পূব আকাশ থেকে একটু একটু করে যখন সূর্যের অস্ত-আভা সরে-সরে মাথার ওপরে আসে, সামনে এগিয়ে যায়, একে একে নানা

রঙ দেখা দেয়, একটু একটু করে রঙ হয়ে আসে ম্লান—তখন হঠাৎ শুনি "টাইমস্ আপ্"। হয়ে গেল; এবার আমাদের ব্যারাকে বন্ধ হওয়ার সময়। কেউ খেলা ছেড়ে, কেউ ধূলা ঝেড়ে, কেউ ভ্রমণ শেষ করে 'ঘরে' ফেরেন।

এই দু-ঘণ্টার জন্য সারাদিন আমরা বন্ধ দুয়ারটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। এ সময়টা যেন ছাব্বিশ ঘণ্টার মতো ধরাবাঁধা নয়। মানতে হবে, আমার চোখেও এ সময়টা একটু স্বতন্ত্র। পুকুরের জল, পাড়ের ঘাস, ওপরকার খানিকটা খোলা আকাশ, আর সর্বোপরি চারিদিকে একটু ফাঁকা—দেয়াল অবশ্য আছে, আর তা-ও এক আধটা নয়। তাছাড়া চারিদিকেই উঁচু বাড়ি-ঘরও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবু এই প্রাঙ্গণের হাত কয়েক দূরে তো সে-সব। খানিকটা ফাঁকা তাই এরই মধ্যে,—দেয়াল ও বাড়ি-ঘরের মধ্যেই—ঘেঁষাঘেঁষি করে একটু স্থান করে নিয়েছে। এই ফাঁকা আঙিনাটুকু বড় কিছু নয়, কিন্তু অনেকখানে অনেক দিন তাও মিলবে না। মেলে না, সত্যই মেলে না। অবশ্য তার জন্য আমাদের কেঁদে ভাসাতে হয় না, কেউ দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না। কিন্তু হঠাৎ যখন ঘরের বাইরে পা ফেলেছি—যেমন ভবানীপুর থানায় যখন কলে জল পান করবার জন্য আমি যেতাম বাইরে—তখন মন চমকে উঠত। হঠাৎ থানার উপরের সেই একফালি আকাশকে মনে হত পরম আত্মীয়। আর সামনেকার হাত কয়েক খোলা জায়গা—সেপাইরা যেখানে বসে চারপাইতে আড্ডা জমাচ্ছে, কিম্বা ধুলোর উপরে যেখানে করছে কুস্তি, অথবা সকালবেলা যেখানে তারা বসে দাঁতন করছে, সামনে রয়েছে সুমার্জিত লোটা, কানে রয়েছে তৈলমলিন পবিত্র যজ্ঞসূত্র ;—নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত তারা, পৃথিবীতে কোনো তাদের তাড়া নাই, কোনো তাদের অস্বস্তি নেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি বসে একমাত্র দাঁতন কাঠিটাকে ঘষে নিঃশেষ করাই তাদের দায়িত্ব—যখন সেই আঙিনাটুকুর মধ্যে আমি এসে দাঁড়াতাম কল থেকে আঁজলা করে জল পান করবার জন্য, দেখতাম ওপরের আকাশ আর কয়েক হাত ফাঁকা সেই জায়গাটুকু, তখন আমার বুক থেকে বেরোত এক অপূর্ব প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—ওই আকাশে আর আঙিনায়! সেই ফাঁকা জায়গাটা আছে তা আমি জানি ; আকাশ ওপরে রয়েছে তা-ও আমি জানি ; আর তার জন্য এমন নিজেকে ভাগ্যবান

মনে করবারই বা কি আছে? পৃথিবীর সমস্তটাই দেয়াল, সব হাজতখানা—'সেলে'র ভিতরে বসেও এমন ভুল আমার হত না। আর আকাশও জানি কেউ কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে পারবে না। পৃথিবী নিক, সমুদ্র নিক, কিন্তু আকাশকে পারবেনা কেউ দেয়াল তুলে নিজের বলে ঘিরে নিতে,—এও আমি জানি, তবু আমি ওই থানার ফাঁকে দেখা ছোট্ট আকাশ চোখ ভরে পান করতাম, ওখানকার ছোট্ট ফাঁকা আঙিনাটুকু বুক ভরে গ্রহণ করতাম। আর আমার মনে একটা নতুন হাওয়া লাগত। তাতে এই কথাই যেন জেগে উঠত—কোন চেতনাপারের সুপ্ত স্মৃতির মতো—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—এই আকাশে আর আঙিনায়!

কলের জল পান করবার অজুহাতে আমি দিনে দু-তিনবার করে মিছিমিছি বেরিয়ে আসতাম। সব সময় দাবিটা তখন-তখন পূরণ হত না। দেরি করতে হত—কখনো সেপাইয়ের মর্জি হত না; কখনো বা আমার সঙ্গে যে 'পাহারা' থাকবে, সে উঠি-উঠি করেও দোস্তদের গল্পটা শেষ পর্যন্ত না শুনে উঠে আসতে পারত না। তবু বারবার আমি জলপান করতাম। তখন বৈশাখের দিন, বন্ধ ঘরে আমি সেদ্ধ হতাম—সত্য; তবু অতবার জল না খেলেও চলত,—ওই আকাশ আর ফাঁকা আঙিনাটুকু না হলেও যেমন দিন কাটত,—আসলে ওই আকাশ আর আঙিনাতেই ছিল আমার লোভ। একটুখানি আকাশ আর খানিকটা ফাঁকা আঙিনা, আর তারই মাঝখানে এক-একবার দাঁড়াতে পেয়ে আমার প্রাণ ভরে উঠত, মনে হত—এইতো আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম!

ভবানীপুর থানা কিন্তু তেমন ভয়ানক জায়গা নয়। বরং থানাজগতে তা শুনেছি কুলীন। তাকে নগণ্য বলা ঠিক হবে না। চমৎকার সুন্দর ইমারত। তার ভেতরে ছিল সিপাই ও দারোগা আর প্রচুর মশা ও ছারপোকা। তারা কেউ আমাকে পেয়ে খুশি হয় নি। তাতেই বোধহয় আমার ওপর কীটজগতের ও কোতোয়ালজগতের অশ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। আমাকে তারা দেখলে নীরস। ওর দারোগা-সেপাই আমাকে জানলে আমি তাদের দায় মাত্র,—'এস্, বি'র আসামী। ছারপোকারা বুঝলে—আমি তাদের ঠকিয়েছি, আমার 'রুধির' সামান্য; তবু আমাকে নিয়ে তাদের বাঁচতে হবে। পাহারাদারেরা হুঁশিয়ার হল—আমাকে আগলে তাদের রাখতেই হবে, দিনে 'এস্. বি'র জন্য আর রাতে ছারপোকার জন্য। আমি

ছিলাম ঐ দুই দলের উপজীব্য। আর তখন বৈশাখ মাস। বদ্ধ হাজতের দেওয়াল উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বদ্ধ ঘর হয়ে উঠছে উনুনের মতো, গরমে আর মশায়-ছারপোকায় রাত কাটত। বাইরেও বাসের ডাক শুনতে পেতাম ভোর চারটে থেকে। শুনতে শুনতে মন পাল্লা দিত 'শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া'। ট্রামের ঘর্ঘর শোনা যেত। তারপর বেলা বাড়ত। গ্রীষ্মের সকাল বেলার রোদ বাড়তে থাকত, রসা রোডের ট্রাফিকের যৌবন উদ্দাম হয়ে উঠত। অফিস-মুখো ট্রাফিক গর্জে উঠছে, লাফিয়ে উঠছে—আপনার উচ্ছ্বাসে আপনি যেন ফেটে পড়ছে,– হাজতের ছোট্ট ঘর থেকে আমি তা বুঝতে পারতাম। শুনতে পেতাম জীবনের স্রোতধ্বনি। সেই স্রোত থেকে আমি অবশ্য তখন একটু দূরে এসে ঠেকেছি ; তাই যেন বুঝছি কত প্রচণ্ড সেই স্রোত। কত প্রচণ্ড আর কত খরধার। দূরে না হলে এই স্রোতে রোজকার মতো আমিও আজ ভেসে যেতাম, একে এমন করে বুঝতে পারতাম না। আবার, শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়তো আমি ঐ স্রোতের ঠিক রূপ অনুভব করতে পারতাম না। তার জন্য ট্রাফিকের কলরোলও শুন্‌তে পাওয়া দরকার। সেখানে আমি তা পেতাম—এইটাই ভবানীপুর থানার ছিল সব চেয়ে বড় দান।

সে দান যে কত মূল্যবান তা বোঝানো সহজ নয়। বাস হাঁকছে—'শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া, ডালহৌসি-ডালহৌসি'—সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা দৃশ্য যেন চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কলকাতার গাইডবুক নিয়ে বসেছি—যা কলকাতার থেকে কম সুন্দর নয়। কারণ কলকাতায় আমি ডুবে থাকি রাতদিন। আমার চেতনার উপরে সে ভেঙে পড়ছে। আমার চেতনা তারই প্রায় একটা খণ্ড। 'প্রায়'—সম্পূর্ণরূপে সে নয়, তাও সত্য। কিন্তু অদূরে হাঁক শুনছি যখন 'শ্যামবাজার, বাগবাজার' আর 'ডালহৌসি-ডালহৌসি' তখন আমার চেতনা কলকাতাকে তৈরি করবার অবসর পেয়ে গেল। কলকাতা তখন তাকে গড়ে তুলল না, আমার মনই কলকাতাকে গড়ে তুলতে লাগল। গড়তে থাকল নতুন করে নিজের খুশি-মতো, মনের মতো করে। যে মন অনেকাংশে কলকাতারই গড়া, তা-ই আবার গড়ে চলল অনেকাংশে কলকাতাকে। থানায় ছাড়া এ সম্ভব হত না—আর ভবানীপুর থানায় ছাড়া এ কাজের উপাদান সর্বত্র মিলত না। হাজত-বাস না হলে এমন সুযোগ পাওয়া যেত না। অমন ভবানীপুর থানার সেই ছোট্ট আঙিনায় বেরোতে পারলেও

তবু মনে হত—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আত্মীয়ের মুখ দেখলাম!

একটুখানি আঙিনা আর একটুখানি আকাশ, দিনে ওইটুকু দেখতে পারলেই মনে হত—আমি আছি, পৃথিবী এখনো রয়েছে। অথচ এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ:—আমার মনের সামনে তো ছিল সমস্ত কলকাতা আর সমস্ত পৃথিবী, অতীত ও ভবিষ্যৎও। এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ—তাও আবার থানার আবহাওয়া-ঘেরা আঙিনা আর আকাশ,—তার দিকে আমিই কি ফিরে তাকাতাম বাইরে কোনোদিন? সত্যিকারের আকাশ এই থানার আবহাওয়ায় নেই—তা কে না জানে? এখানে আকাশ আর আঙিনা দুইই কেউ প্রত্যাশা করে না, কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। এখানে প্রাচীর ও অন্ধকারই জয়ী, আমিও তা জানি। আর তা মেনে নিতেও আমার বিশেষ প্রয়াস পেতে হয় নি। আমার মনের সামনে ছিল কলকাতা, পৃথিবী আর নিখিল বিশ্বের পারাবার। তবু হঠাৎ যখন কলের জল পানের জন্য বাইরে এসে দাঁড়াতাম মনে হত—এ কি বিস্ময়! সেখানটায় দেয়াল গায়ের উপরে এসে হুড়মুড় করে পড়ে নি—একটুমাত্র সরে দাঁড়িয়েছে হাত কয় দূরে;—আর মাথার উপরে দেখা দিয়েছে খানিকটা আকাশ—চারদিককার বাড়ি-ঘরের শাসন এড়িয়ে যতটুকু দেখা যাওয়া সম্ভব ততটুকু আকাশ; আর অমনি মনে হয়েছে আশ্চর্য, আশ্চর্য এই পৃথিবী!

শুধু 'মনে হয়েছে' বললে কিন্তু সবটুকু বলা হয় না, ও জিনিসটা মন দিয়ে বোঝবার দরকার হয় না। ও দেহ দিয়ে, সর্ব অঙ্গ দিয়ে অনুভব করা যায়। প্রত্যেক রোমকূপের মধ্য দিয়ে যেন ওর অস্তিত্ব দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। এ দেখা-চোখ দিয়ে দেখতে হয় না; এ বাতাস বুকে নেবার জন্য নাকে নিঃশ্বাস টানবার দরকার নেই। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ আপনা থেকেই বিস্ফারিত হয়ে পড়ে, আর নাক বাতাসের খোঁজ পেয়ে আপনা থেকে নিঃশ্বাস নেয়,—শ্বাসযন্ত্রকে একেবারে বায়ুস্রোতে ভরে নিতে চায়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে সঞ্চয় করে নেয় অক্সিজেন। চোখ ও নাক এসব স্বতঃপ্রণোদিত কাজ না করলেও দেহ তার আবেষ্টন সম্বন্ধে এক মুহূর্তেই সচেতন হয়। প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে আমরা অনুভব করি বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আঙিনা ও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আকাশ, বহু বহু জন্ম পূর্বে আমার যে বেদনা-বোধ

ছিল এখনো আমি একেবারে তা হারাই নি, তখন আমার চক্ষুর কোষগুলি এতটা নিপুণ, এতটা বিশিষ্ট (specialised) হয়ে ওঠে নি। তখন সমস্ত দেহকোষের মধ্য দিয়ে আমি গ্রহণ করতাম আলো আর উত্তাপ। বলতে গেলে, সেদিন সূর্য দেখতাম আমি সারা অঙ্গ দিয়ে। সেদিনকার দেখা এমন তীব্র নয়, এক কেন্দ্রে সংহত এই বেদনা নয়। তা একটা মাত্র ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ারূপে স্বতন্ত্র (differentiated) হয়ে ওঠে নি। তা ছিল (undifferentiated)—সারা দেহে পরিব্যাপ্ত একটি অনুভূতি। আজও পৃথিবীতে তেমন প্রাণী বেঁচে আছে, কিন্তু আমি আর সমস্ত দেহ দিয়ে দেখতে পাই না, আমার সে শক্তি এক কোষ-কেন্দ্রে একত্র হয়েছে। আশ্চর্য সে ব্যাপার, এই একটু একটু করে আমাকে আমার এই চক্ষুদান, (miracle of miracles)! কিন্তু তবু দেখছি আমার দেহ এখনো হঠাৎ ফিরে পেতে পারে সেই স্মরণাতীত কালের শক্তি। হঠাৎ যখন আমি একবার একটু মুক্ত আঙিনা ও আকাশ পেয়েছি—খানিকক্ষণ দেয়ালের আর আঁধারের কবলে জীর্ণ হওয়ার পর যেই আমি পেলাম একটু মুক্ত বাতাস ও মুক্ত আকাশ—অমনি আমার সমস্ত দেহে যেন সেই অতি-আদিম অতি-পুরাতন বেদনা-বোধ ফিরে এল—আমার সারা শরীর বেয়ে এই আঙিনা ও আকাশ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল,—স্নায়ুতে, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসার সঙ্কোচে জাগতে লাগল তাদের অস্তিত্ব-বোধ। আর এই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক জটিল প্রক্রিয়ার যদি কোনো নাম দিই,—যে একটি মাত্র সহজ কথায় তা প্রকাশ সম্ভব—সে বাণী উচ্চারিত না হতে পারে, হয়তো মনও তা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে না; কিন্তু এই দেহগত অনুভূতির সঙ্গে জাগে তেমনি অতি প্রাচীন, অতি আদিম একটি বোধ—ভাষায় যার নিকটতম প্রতিধ্বনি বহন করে এই অনুচ্চারিত প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি কতদিনকার আত্মীয়ের দেখা পেলাম!

আকাশ আর প্রশস্ততাতে আমরা মুক্তির স্বাদ পাই—যে মুক্তি মানুষের অনাদিকালের কামনা। কেন সে মুক্তি মানুষের মনে কোন্ আত্মীয়ের কথা জাগিয়ে তোলে? ফ্রয়েড বলবেন, জীবন মানেই বন্ধন—Life is hard to endure! প্রকৃতির বন্ধন আর মানুষের গড়া বন্ধন। এই সব বন্ধন দিবানিশি কেটে কেটে আমাদের অস্থিমজ্জায় বসছে। আমাদের অস্থি-মজ্জা তাই চায় মুক্তি, চায় সহজ আনন্দ,—যার সামাজিক রূপ ও নাম হবে 'বীভৎস

ভোগ'। কিন্তু মানুষ সামাজিক মানুষ, সেই বীভৎসতা থেকেও সে নিজেকে বাঁচাতে চায়। তাই সেজন্য তার আশ্রয়- কল্পনা, illusion ; এই কঠোর বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সে সৃষ্টি করেছে কাব্য, সৃষ্টি করেছে স্বপ্ন, সৃষ্টি করেছে এক কালের সব চেয়ে বড় সৃষ্টি—পরমাত্মা। তাতে তার মুক্তির স্বপ্নও খোরাক পেয়েছে। অথচ জীবনের আধিভৌতিক-আধিদৈবিক নির্যাতন তার কাছে আর নির্যাতন হয়ে থাকে নি ; হয়েছে পরীক্ষা, হয়েছে লীলা, হয়েছে রহস্য। জীবনের বন্ধন বড় কঠিন, তাই যেখানেই আমরা ব্যাপ্তি পাই, অবকাশ পাই, সেখানেই আমাদের মনে জাগে বিস্ময় ও বিশালতা—**awe and adoration** ! মোতি মসজিদ দেখে চোখ মুগ্ধ হয়, মনেও একটা রসানুভূতি জাগে, স্নায়ুতে জাগে স্নিগ্ধতা। কিন্তু শাজাহানের জামা মসজিদে দাঁড়িয়ে চোখ আর দিশা পায় না। হঠাৎ জীবনের প্রাচীরগুলির ভিৎ ধ্বসে যায়, একেবারে দিগ্‌দিগন্তের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এত ব্যাপ্তি, অবাধ আকাশ,—কোথায় বন্ধন, কোথায় সঙ্কোচ, কোথায় আবেষ্টন ? আমি না বিশ্বাস করি মসজিদে, না রাখি তার মালিকের খোঁজ। এক নিমেষে তবু আমারও মনে হয়েছিল,—দুনিয়ার মালিক হমে নস্তু, হমে নস্তু, হমে নস্তু। তুমি এখানে, এখানে, এখানে - দেওয়ানী খাসে নেই, দেওয়ানী আমে নেই- আছ মুক্ত আকাশে আর মুক্ত আঙিনায়। আর দিন কয় অন্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকলে অত দূরে যেতে হয় না—দিল্লী দূরন্‌অশ্‌ত্‌—দিল্লী দূরের পথ—ভবানীপুর থানার ছোট্ট আঙিনায় ও ছোট্ট আকাশের তলে বেরুতে পারলেও তখন দেহমন সাড়া দেয়, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরতে যে রেখাপাত হয় তাকে বলি,—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে ; আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম !

মোটের উপর, আকাশ এবং ব্যাপ্তি এসবের সঙ্গে আমাদের মনের একটা আত্মীয়তা থেকে গেছে। সে আত্মীয়তা খুব সহজ, নাড়ীর টান। তাই যতক্ষণ তা অটুট থাকে ততক্ষণ তা আছে বলেই মনে হয় না। তাতে বাধা পড়লেই তখন সমস্ত চৈতন্য টন্‌টন্ করে ওঠে। সুস্থতার লক্ষণ এই যে, তা স্বচ্ছন্দ —অচেতন আমার হৃদ্‌পিণ্ড যতদিন স্বচ্ছন্দ ছিল ততদিন তার খোঁজই পেতাম না, জানতাম না যে ও-বালাই আছে। হঠাৎ যখন সে মুসড়ে গেল, উত্যক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল, তখন সমস্ত দেহমন তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পথ পায় না, নাস্তিকের বিভীষিকায় কাতর হল, তার সঙ্কোচ-প্রসার আমার

সমস্ত চেতনার উপর তখন দাগ রেখে যেতে লাগল। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেকটির যোগ নিবিড় অথচ অচেতন; সে যোগে বাধা পড়লেই আমরা তার দাম বুঝি। যতক্ষণ আকাশ আমার কাছে সুলভ ছিল ততক্ষণ তার দিকে চোখ তুলে দেখবারও আমার ফুরসুৎ ছিল না। অবশ্য, ব্যক্তিগত ভাবে আমার সম্পর্কে এই কথাটা খাটে না—আকাশ না দেখতে পেলে আমার মনের আকাশও আচ্ছন্ন হয়ে যেত। তবু, যতক্ষণ ইচ্ছা করলেই লাভ করা যেত একটু ফাঁকা, একটু ব্যাপ্তি,—সে গড়ের মাঠেই হোক্ আর হেষ্টিংসের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরেই হোক্,—ততক্ষণ আমার কাছে তার দাম তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে পায় নি। তার পর তিন দিন যেই আমি হারালাম সেই স্বাস্থ্য—মানে স্বাধীনতা (স্বাধীনতা আর স্বাস্থ্য একই কথা; যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার দিকে নজরই পড়েই না। কিন্তু একবার যে-ই তা খোয়া যায় তখন সাধ্য কি মানুষ আর অন্যদিকে দেখে, অন্য কথা ভাবে? পরম অস্বস্তিকর সে অবস্থা। তখনকার সমস্ত কাজকর্ম হয় অত্যন্ত বেতালা, অস্থির ও অসুস্থ,—আয়র্লণ্ডের যেমন হয়েছিল, আমাদের যেমন হয়েছে),—আমি যেই হারালাম স্বাস্থ্য, আমার জীবনগতির স্বচ্ছন্দতা, অমনি ভবানীপুর থানার সেই সিপাহিরক্ষিত বদ্ধ আঙিনা আর বাড়ির বেড়ায় ধরা বদ্ধ আকাশ, তাও আমার কাছে মনে হল বিধাতার আশীর্বাদ, স্বাস্থ্যের মতো স্বাধীনতার মতো তাঁর অকুণ্ঠ দান। একাদিক্রমে 'প্রবাসী' আপিসে দেড় বছর কাজ না করলে সেবার আমাকে পেয়ে বসত না নোয়াখালির জন্য সেই **nostalgia**—সেই নদীর জন্য, ঝাউসারের জন্য, নারিকেল বাগানের জন্য আকুলতা। ভবানীপুর থানায় সে কটা দিন আবদ্ধ হয়ে না কাটালে আমার কাছেও হয়তো অমন পরিষ্কার হত না এই আত্মীয়তা—আকাশের সঙ্গে, আলোর সঙ্গে, সেই নদীর সঙ্গে, মাঠের সঙ্গে, ঝাউসারের সঙ্গে আর নারিকেলের বনের সঙ্গে। ভাবতাম—ওটা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'নিশ্চিন্দিপুরী'র একটা স্মৃতি—যা তাঁর পক্ষেও আট-আনা খাঁটি, আট-আনা মেকি—আট-আনা অভিজ্ঞতা থেকে উজ্জীবিত, আর আট-আনা নোট বই থেকে উদ্ধৃত;—আর আমার পক্ষে ষোল আনাই নকল। কিন্তু ক-দিন দেখলাম না নদী আর মাঠ, তারা আর জলধারা, আর রেলওয়ের কামরায় বসেও আমার মনে হল আমি যেন নতুন করে ডব্লু. এচ্. হাড্সনকে পাচ্ছি, তাঁর ভাষাতেই আমার মন কথা কইতে পারে—

The blue sky, the brown soil beneath, the grass, the trees, the animals, the wind, the rain, and stars are never strange to

me ; for I am in, and of, and am one, with them ; and my flesh and soul are one, and the heat in my blood and in the sunshine are one, and the winds and the tempests and my passions are one.

'The winds and the tempests and my passions are one'. কত সত্য তা, আর কত সত্য আরও সেই গম্ভীর প্রশান্ত আকাশের নির্বাক ঔদাসীন্য, কঠিন গাম্ভীর্য—এই আত্মীয় আকাশের ক্রূর রহস্য,—হিমালয়ের গাম্ভীর্য আর অটল স্থৈর্য! কত সত্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, জানতাম কি তা—যদি বক্‌সায় কাঁটাতারের ঘরে বন্ধ না থাকতে হত—ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের চোখের তলে কোন বন্দী শিকারের মতো? যদি পাহাড়ে ঝর্ণার গর্জন না পৌঁছত কানে? আর মৃত্যু আর নিস্পন্দ পর্বত আর মৌন অন্ধকারের সঙ্গে সেই পাহাড়ের কোলে আমার মুখোমুখি করতে না এত রাতের পর রাত? বুঝতাম আমি কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে—যাঁর মধ্যে ছিল অত সত্য—আর অত মিথ্যাও?

> Low breathings coming after me,
> Of undistinguishable motion......

আর—

> The sounding cataract
> Haunted me like a passion : the tall rock,
> The mountain, and the deep and gloomy wood,
> Their colours and their forms, were then to me
> An appetite,......

প্রকৃতির এত নিকটে আমি পৌঁছুতে পারতাম না,—দেখতাম শুধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বলা প্রকৃতির নীতিবাগীশতা কবির কত মন-গড়া কথা, বুঝতাম না প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই নিগূঢ় আত্মীয়তাও কত সত্য; আমারও এই আত্মীয়তা কত বাস্তব : যদি অনেক-অনেক দিন আমাকে কয়েদখানার আড়ালে আবদ্ধ না থাকতে হত—প্রকৃতির সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক আমার বন্ধ হয়ে না যেত। বোঝে না তা মানুষ—যতক্ষণ এই সম্পর্ক থাকে একান্ত। একান্ত সে, তাই সে তখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মও। তা বন্ধ হলে অস্বচ্ছন্দ সে নিজের সম্পর্কে, প্রকৃতির সম্পর্কেও। অপ্রাকৃতিক তার কাছে তখন প্রকৃতিও।

অথচ আকাশ ও ব্যাপ্তি আমরা পাই না, এই বিশালতা থেকে আত্মবঞ্চনা করার চেষ্টাও আমাদের জীবনে অভ্যাসগত হয়ে উঠেছে। অনেকাংশে প্রাণগতও। অনাবৃত আকাশ আর প্রসারিত দিগন্তন—এর বিপুলতা থেকে নিজেকে আমাদের বাঁচাতে হয় বাঁচার দায়ে। আমরা বাধ্য হয়ে বন্ধন সৃষ্টি করি; আড়াল আমাদের মেনে নিতে হয় প্রকৃতিরই আদেশে। আকাশকে আমাদের মাথার উপর থেকে বাদ দিয়ে নিজেকে আমরা নিই ঘিরে। আমরা ঘর বাঁধি, তার ওপরে আচ্ছাদন চাই-ই, আর তার চারদিকে আবেষ্টন না হলেও চলে না। আমাদের দেশের মতো দেশে যেখানে প্রকৃতি মোটেই করালী কালী নন, সেখানেও ঘর চাই-ই, নইলে প্রাণ-ধারণ অসম্ভব। আমাদের দেশের আকাশের মতো আকাশ আর এদেশের শ্যামল প্রশস্ততা, তাও অস্বীকার করতে হয়। আর যেখানে প্রকৃতি সন্ন্যাসিনী কিম্বা ভীমা রুদ্র শক্তি—সেখানে তো প্রকৃতির পরাক্রম থেকে প্রাণ আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমনই হোক, আশ্রয় আমাদের চাই—পাতার, খড়ের, কাঠের ইটের, পাথরের, টিনের, কংক্রিটের, ইস্পাতের, কাচের—যা কিছুর হোক। একটা আবরণ মাথার উপর না পেলে, একটা বেড়া নিজের চারদিকে না সৃষ্টি করতে পারলে, প্রাণ বাঁচে না। মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই চাই। একদিন পর্বতের গহ্বরে আমরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছি, আকাশের তলায় বাঁচতে পারি নি বলে। শেষে যাযাবরের তাঁবু ছেড়ে আমরা হয়েছি গৃহস্থ। আমাদের সমস্ত সভ্যতা এই আশ্রয়-রচনার ইতিহাস—আকাশকে আড়াল করার ও দিগন্তকে আবৃত্ত করার চেষ্টা! নইলে আমরা বাঁচতে পারতাম না। এই আমাদের ঘরের ভিত্তি যেদিন গাড়লাম সেদিন থেকেই আমরা পেলাম প্রকৃতির দাক্ষিণ্য—অর্থাৎ সেদিন থেকে প্রকৃতিকে আর একটু হার মানতে হল। আর সেদিন থেকে হারাতে লাগলাম আকাশের ঔদার্য আর ভূমার প্রসার। হারালাম মাথার ওপর থেকে, চোখের সুমুখ থেকে, আর ঠিক তাই আমাদের মনের তলায় সেই বিরহ সেদিন থেকে একটু একটু করে জমে উঠতে লাগল। আমরা যতই গৃহ বাঁধছি ততই মুক্তির বেদনা জমে উঠছে। যতই আমাদের আকাশ মুছে ফেলছি কলের ধোঁয়ায় আর পৃথিবীর ধুলোতে, ততই আমরা দেখতে চাই আকাশের মুখ। পৃথিবীর বুক যতই আমরা খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি বাড়ি তুলে, প্রাচীর তুলে, ইমারতের আশ্চর্য বোলতার চাক রচনা করে, ততই আমরা

খুঁজছি পৃথিবীর নিরাবরণ উদাস-করা ব্যাপ্তি। তাই, উঠছে আমাদের স্কাই-স্ক্রেপার—আমাদের আকাশ-চাওয়া গোপন-কামনার সাক্ষী। উড়ছে আমাদের উড়োকল—আমাদের ব্যাপ্তিকামী উদার স্বপ্নের প্রতিমূর্তি। তাই, আমরা পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরোই, গ্লোব-ট্রটার হই, আউটিং ও হাইকিং আমাদের নেশা হয়ে ওঠে। অনেক আড়াল সৃষ্টি করেছি, আপনাকে অনেক বঞ্চিত করেছি, তবে আমাদের জীবনযাত্রায় ফুটেছে এই অপেক্ষাকৃত নির্ভাবনা। অথবা অপেক্ষাকৃত কম দুর্ভাবনা। কারণ সত্যই কতটুকু আমরা পেয়েছি? পৃথিবী পায়ের তলায় দু-ইঞ্চি ধ্বসে গেলে আমরা বুঝি কত অসহায় আমরা—দু-সেকেণ্ডে আমাদের সমস্ত ধর্ম ও সভ্যতা হয়ে যায় ভূমিসাৎ। তবু আমরা খানিকটা অধিকার পেয়েছি। খানিকটা সহনীয় হয়েছে আমাদের ভাগ্য। কিন্তু অনেক হারিয়ে, অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে। অথচ ভিতরে-ভিতরে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি। তাই ওপরে চাপাচ্ছি আরো বাড়ি, আরো ইমারৎ, যেন কোথাও আর ফাঁক না থাকে। ঘরের আড়ালে, দেয়ালের আড়ালে আমরা নিজেদের সুরক্ষিত করে নিচ্ছি।

অবশ্য আকাশ ও ব্যাপ্তি কোনোটাই আমরা এখনো অতটা হারাইনি—আমরা, মানে আমাদের দেশে 'আমরা'। এখনো আমরা প্রকৃতিকে অতটা দূরে সরিয়ে দিতে পারি নি—এখনো আমরা প্রকৃতি থেকে অত দূরে সরে যাই নি। এখনো আমাদের কাছে আকাশ নিকটের—অচেনা নয়, ধোঁয়াটে তামাটে আচ্ছাদন নয়, আমরা ইমারতের আড়ালে তাকে আড়াল করে ফেলি নি। আমাদের শহর মাত্র দু-চারটি, গ্রাম অসংখ্য। আমাদের মাঠ অবারিত ; দেশ গাছ লতাপাতায় শ্যামল, আকাশে গিয়ে ঠেকে তার সীমানা। এখনো আমাদের কাছে গঙ্গা-যমুনা প্রাণময়ী, হিমালয় যেন ভারতবর্ষের শিয়রে জাগ্রত কোন অতন্দ্র গৃহকর্তা, সমুদ্র যেন আমাদের কাছে এক আশ্বাস ও এক আড়াল।

না, আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাই নি। আর তার মানে আবার আমরা প্রকৃতিকেই পাই নি। এখনো আমরা প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিনি—আর তাই জানিও না প্রকৃতিকে। প্রকৃতিকে আমরা যতই আয়ত্ত করি, ততই আমরা জানি প্রকৃতির মূল্য, আর জানি নিজেদেরও প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির যত কাছে, প্রকৃতির সম্বন্ধে আবার ততই আমরা অচেতন ; কারণ, তখন আমরা আর প্রকৃতি একাত্ম। আমরা আজ প্রকৃতির তত কাছে তো আর নেই—একেবারে অসহায় ভয়ে-বিস্ময়েও আর তাকে দেখি না। সে

যুগ পার হয়ে এসেছি আমরাও। সে ছিল মানুষের আদিম একটা যুগ। তখন **nature mythy**-ই ছিল মানুষের সহজ কল্পনা, হয়ত বেদে পুরাণে তার চিহ্ন রয়েছে। সাঁচির তোরণে জীবচিত্রের সহজ স্ফুরণে রেণে গ্রসে তারই সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের কাছে পশুপাখি বরাবর কথা কয়—মানুষের মতো, মানুষের ভাষায়, মানুষের ছাঁচে তারা ঢালা। ইউরোপ 'হিতোপদেশে'র এই বিস্ময়কর কাণ্ড ভুলতে পারে না ; **Jungle Bcok** কিন্তু আমাদের কাছে একেবারে সহজ গল্প। তার কারণ আমরা প্রকৃতির থেকে বেশি দূরে সরে যাই নি। অবশ্য জীবনে আমরা বনানীর ছায়াও কাটিয়ে উঠেছি। গুহা-গহ্বরের যুগও পার হয়ে এসেছি—প্রকৃতির সেই প্রথম পরিচয় আমাদের কাছে আজ বিস্মৃত না হলেও জীবন্ত নয়। আমরা প্রকৃতিকে খানিকটা আয়ত্ত করেছি—এসে গেছি কৃষির যুগে। তাই গঙ্গা-যমুনা হয়েছে আমাদের কাছে দেবী ; তাদের নিয়ে আর আমরা নতুন গাথা রচনা করি না। মেঘ আর 'ইন্দ্র' বা 'বৃত্র' হয়ে ওঠে না ; —দেবতার দান অবশ্য তা থেকেই। আমরাও অনেকটা প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র হতে পেরেছি—প্রকৃতির রূপ আমাদের চোখে তাই রূপক হয়ে উঠেছে। নেই সেই শিশুমনের ভয় আর বিস্ময়—**awe and adoration**—আর ভাবি না সে দেবী, ভাবি না সে দানবী ; দেখি না 'সাবিত্রী'কে দেখি না 'সোম'কে। কোথায় সে প্রচণ্ড রুদ্র, কোথায় সে প্রবল মরুৎগণ? কোথায় সে কালী করালী, কোথায় বা সে দয়াময়ী জননী? না, আমাদের ইতিহাসের সে যুগও চলে গেছে—গঙ্গা-যমুনাও আর আমাদের শুধু দেবতা হয়েই নেই। আমরা তার পরেও আরও এগিয়ে গেছি—তাই প্রকৃতি আমাদের আর ততটা কাছে নেই। সেই আদিম প্রকৃতি-কাহিনী রচনার যুগ শেষ হলে আর তো মানুষ প্রকৃতিকে তেমন প্রাণময়ী রূপে কল্পনা করে না। **Lilies of the field** দেখে তখনো হয়তো সে মুগ্ধ হতে পারে ; কারণ, বিধাতার রূপ-সৃষ্টির আশ্চর্য শক্তি তাতে সে দেখে, তা প্রকৃতি-প্রেম নয়। মেঘকে দূত করে, সখা করে ; কিন্তু জানে সে ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের সমন্বয়, তার প্রাণ নেই। তাই রূপ হয়—রূপক। আজও আমরা প্রকৃতির কতকটা কাছে আছি—নন্দলাল হিমালয়ের রূপে দেখেন শিবশম্ভু রূপ ; আমরাও তা মেনে নিই। হিমালয় নিজরূপে আর দেবতাত্মা নেই, আজ সে পরমাত্মার এক রূপক। আধ্যাত্মিক যুগ এলে প্রকৃতির নিজ যুগ ফুরোয় —তখনকার গাছলতাপাতা শুধু পরমাত্মার **advertisement** :

Character of the great Apocalypse

The types and symbols of eternity,
Of first and last, and midst and without end.

অবশ্য তা থেকেই আবার তার একটা মর্যাদাও আসে। কারণ বিশ্বাত্মা অনলে অনিলে সর্বত্র ঠাঁই নেন; আর তাই অনল অনিলেরও আবার একটা মর্যাদা লাভ ঘটে। কিন্তু সে নিতান্ত সেই বিশ্বাত্মার ছায়া বলে, রূপক বলে—নিজের গৌরবে নয়, তাঁর বিজ্ঞাপন হিসেবে। হিমালয় হিমালয় হিসেবে আমাদের কাছে আসে নি—এসেছে দেবাদিদেবের এক প্রতীক হিসেবে।

আসলে, সভ্যতা আরও না এগোলে প্রকৃতির আসল রূপও আমরা আবিষ্কার করতে পারব না। যতই প্রকৃতিকে আমরা আয়ত্ত করব, ততই আমরা দেখতে পাব তার প্রকৃত রূপকে। **Man was born in chains : he is trying to be free.** মানুষ জন্মেছিল শিকলে বাঁধা, এই হল সত্য, রুশো যাই বলুন। তাই সমাজের দীর্ঘদিনের কবিতায় চিত্রে সেই প্রকৃতি-প্রেমের সামঞ্জস্য ছিল না। আমরা 'মেঘদূত' লিখেছি—কিন্তু সহজ 'প্রকৃতি-দৃশ্য', 'ল্যাণ্ডস্কেপ্' এঁকেছি কোথায়? প্রাচীন ইউরোপেই বা তা কোথায় বেশি? চীনা চিত্রে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তা কই? রাজপুত চিত্রকলায় এসে দেখলাম সে দৃশ্য। সঙ্গীতেও দেখলাম তখন প্রকৃতির ধ্যানরূপ,—মল্লার কি দীপক, ভৈরবী কি পূরবী। তাও যেন রূপক। 'রাগমালা'র চিত্রে প্রকৃতির থেকে বড় প্রতিকৃতি। আর কাব্যে গানে সবখানেই সেই 'শাঙন ঘন গহন মোহ' আমাদের মানুষের জীবনের শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট। খুব সহজ আর স্বাভাবিক তা, আমরাও প্রকৃতিকে তাই এভাবেই দেখছি---হয় প্রতীক, নয় প্রেক্ষাপট। এমনই তো চলেছিল যতদিন আমরা আবার ইংরাজি কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নতুন সত্তার না পেলাম। কিন্তু ইংরাজি কবিতাই বা সেই সত্তার সংবাদ পেল কবে? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে—অর্থাৎ বিলাতের শিল্পবিপ্লবের দিনে, যন্ত্রশক্তির সহায়তায় যখন থেকে মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে শুরু করেছে—সত্যই দূরে যেতে শুরু করেছে তখন থেকে অমন এলিজাবেথীয় কবিতায় কোথায় সেই প্রকৃতিপ্রেম? মামুলি জিনিস সেখানে প্রকৃতি—কাব্যের একটা মামুলি উপকরণ। অষ্টাদশ শতাব্দী এল, ওদের শহুরে সভ্যতা বেড়ে উঠল—একটু একটু করে প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতনতাও দেখা দিল। এল সেদিনের সমাজ-বাঁধনে বদ্ধ রুশো আর তাঁর দল। সমাজ তখন বেচাল; তাঁরা ঠাওরালেন—প্রকৃতিতেই বুঝি ছিল মুক্তি, আছে পরিত্রাণ। অতএব, 'ফিরে চলো বনে'—'**Back to Nature**'। প্রকৃতি আর মন-গড়া প্রাকৃতজনের স্বপ্ন হল তাঁদের সম্বল। রুশোর পর

থেকে শুরু এই অপ্রাকৃতিক স্বপ্ন—সবাই ভাবলে সভ্যতাই বুঝি ব্যাধি। কে জানে ফরাসী বিপ্লবের মর্মকথা বুঝলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর অমন 'প্রকৃতি-প্রেমিক' থাকতেন কিনা? না, শিল্প-বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হতেন? বিপ্লবের স্রোত থেকে যত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দূরে সরলেন ততই প্রকৃতির কোলে আশ্রয় খুঁজলেন; জীবন থেকে যতই বিদায় নিলেন ততই প্রকৃতির ঘরে প্রতিষ্ঠা করলেন এক মন-গড়া জীবন। সে-প্রকৃতি অতি-প্রাকৃতিক, তিনি আরাধ্যা হলেন, হলেন নিশ্চলা নীতি। ততক্ষণ শিল্প-বিপ্লবের ব্রিটেনের সৌভাগ্য রচিত হচ্ছে—হয়ত সেই গ্রামের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রক্তময় কল-কারখানা দেখেই কবিরা আরও প্রকৃতিমুখী হয়ে উঠলেন, আর ততক্ষণে রুসো-গড্‌উইনের আকাশচারী ছাত্র শেলি বিপ্লবের ব্যর্থতায় শূন্যে পাখা ঝাপটাতে লাগলেন। তাঁর চোখে প্রকৃতি হলেন মুক্তা, স্বাধীনা - প্রোমিথিউসের প্রেমিকা। জীবনে তাল রেখে এগুতে না পেরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে দেখলেন অবিচলা নীতি হিসেবে। জীবনের তালে আর কল্পনার তালে খাপ খেল না বলে শেলি প্রকৃতিকে দেখলেন প্রগতি হিসেবে। আর এই দুই দেখা শেষ হতে না হতেই ডারুইনের দিন এল—প্রকৃতির রক্ত-নখর-দন্ত-নয়নও আর কারো চোখ এড়িয়ে গেল না।

না, প্রকৃতিকে তেমন যুগের মতো আর আমাদের আপনার করে নেওয়া চলে না। চলে না বলেই আমরা এদিনের নাগাল পেয়েছি—আমরা মানুষ হয়েছি, মানুষ হতে চলেছি। শুধু 'প্রকৃতির সন্তান' আমরা নই, সেই **natural piety** আমাদের নেই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যা-ই বলুন, প্রকৃতির ও মানুষের মধ্যে সেই মমতা নেই—তিনি আমাদের মাতৃরূপা, হয়তো বা ধাত্রী-স্বরূপা। কারণ, আমাদের মানব-প্রকৃতিও আসলে বিশ্বপ্রকৃতিরই তো একটা প্রকাশ আর পরিণতি। কিন্তু আমরা প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এসেছি—আমাদেরও একটা স্বতন্ত্র সত্তা আমরা আবিষ্কার করেছি। ওখানেই আমাদের আসলে নিজস্বতা—মানব-প্রকৃতি হিসেবেও বটে, জীব হিসেবেও বটে। প্রকৃতির কোলে শিশু কে? তারই দেহে দেহ মিশিয়ে আছে—জন্মে নি, বাড়ে নি, দেখে নি আপনাকে, দেখে নি প্রকৃতিকেও। প্রকৃতির কোলে শিশু থেকে যায় গাছ আর লতাপাতা—অচেতন প্রাণী। তারা তো জীবনের প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র—কয়েকটা পরীক্ষা। জীবন তাদের মধ্যে ফুটে উঠতে পায় নি—শুধু পথ খুঁজেছে; ভ্রূণের মধ্যে মানুষ যতটা আছে ওদের মধ্যে ততটাও নেই জীবনের প্রকাশ। শুধু শিশুতে কি মানুষের কোনো পরিচয়

আছে? কিছু নেই। শিশু আর শিশু থাকে না বলেই তো আর মূল্য। সে মায়ের কোল ছেড়ে একটা নতুন মানুষ হয়ে উঠবে বলেই তো মায়েরও তাতে মর্যাদা। তাহলে 'প্রকৃতির পুত্র' আমরা থাকি না বলে দুঃখই বা কি? আমরা বড় হই, বড় হচ্ছি—প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি। শিশু তো এখনও আছে অসংখ্য জীব আর অগণিত প্রাণী। তারা এখনও প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি—সামান্য পরিবেষ্টনীর একটু অদল বদল হয়েছে কি তারা জাতকে জাত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিরও কোনো মায়া নেই তাদের জন্য, কোনো মমতা নেই সেই জীবপ্রকৃতির জন্য। আকাশ উদাস চোখে তাদের জন্ম-মৃত্যু দেখে, একটি নিঃশ্বাস ফেলে না তাদের জন্য বাতাস। আমাদের জন্যই কি ফেলে চোখের জল? কতবার আমাদের জীবন আর ছাড-পাওয়া ফুৎকারে উড়ে যায়—একবার সে মাথা নাড়লে আমাদের হাজার প্রাণ ধুলোয় লুটোয়। বিহার ধ্বসে গেল একটি সামান্য কাঁপুনিতে, এক সামান্য ফুঁতে প্রশান্ত মহাসাগরের দু-তীরে শহর গ্রাম উড়ে গেল, তার অগ্নিশ্বাসে ছাই চাপা পড়ে গেল পম্পেই; তার মরু-গ্রাসে তলিয়ে গেল খোটান আর মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ-জগৎ। হয়তো আমরাও আবার তলিয়ে যাব কোনো দিন—যুগ যুগ পরে কোনো বরফ-স্রোতে, কিংবা যাব পুড়ে শুকিয়ে কোনো উষ্ণযুগের তরল অগ্নিধারায়। কোন্ নিয়তি আমাদের জন্য রচনা করছে প্রকৃতি, কে জানে—কে বলবে?

হয়তো আমরা প্রকৃতিকে জয় করছি শেষ পর্যন্ত এমনি পরাজিত হব বলেই। তবু প্রকৃতিকে আমরা জয় করছি বলেই আমরা প্রকৃতিকে পাচ্ছি—তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। আবার, প্রকৃতিকে জয় করেও আমরা সে জয়ের ফল ঠিকমত ভোগ করতে পারছি না। আজ তাই সেই 'প্রকৃতি-প্রেম', সেই 'প্রকৃত-বোধ' আমাদের নতুন ভাবে আলোড়িত করছে। জীবনকে ঠিকমত সাজিয়ে নিতে পারছি না, সংহত করে নিতে পারছি না, তাতে বিকৃতি থেকে যাচ্ছে। আর তাই রুশোর ধারাতেই ভাবি ফ্রয়েডীয় ভাষায়। ভাবি আমাদের এই প্রকৃতির উপর আধিপত্য-লাভ বুঝি একটা অভিশাপ। ভাবি, সেদিন যদি ফিরে পেতাম যেদিন আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ ছিল নিবিড় এবং সহজ! আসলে, সে 'সহজ যুগ' শেষ হয়েছে যেদিন থেকে আমরা প্রকৃতির বন্ধন কাটিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি,—গুহা ছেড়েছি, গহ্বর ছেড়েছি, হয়তো যেদিন থেকে মানুষ হতে আরম্ভ করেছি—সেদিন থেকেই। মানে, সহজ আমরা

আর নেই যেদিন থেকে প্রকৃতিকে চিনতে আরম্ভ করেছি সেদিন থেকেই। কিন্তু সহজ আমরা হচ্ছিও আবার—বাধা কাটিয়ে;—যতই চিনছি নিজেদের, ততই চিনছি প্রকৃতিকে বেশি করে; সহজে ততই প্রকৃতিকে আপনার করে নিচ্ছি। এই সত্যটাই সভ্যতার এই বিকৃতির মধ্যে আমরা ভুলে যাই—প্রকৃতির মধ্যে আর আমরা মিলিয়ে যেতে পারব না, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। ডি. এচ্. লরেন্স যত চেষ্টা করুন—তেমনি **life of nature** বা **life of instinct**-এ আর ফেরা স্বাভাবিক নয়। আসলে, তাঁদেরও এটা প্রকৃতি-প্রেম নয়, যুগের বিকৃতির প্রতিক্রিয়া—জীবনের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সত্য তাতে আছে জীবনে প্রাণ-বেগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ চাই,—যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আছে জীব-জগতের। কিন্তু মিথ্যাও তার তাই এত মারাত্মক। মানুষ আর জীব সম্পূর্ণ এক নয়—আমার মধ্যে প্রাণবেগ ব্যাপকতর প্রকাশের পথ চায়—মানব প্রকৃতি শুধু সেই মূল প্রকৃতিরই প্রতিধ্বনি নয়, পুনরুক্তি নয়;—একটা নতুন প্রকাশ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার সহকারী, একটা আবির্ভাব।

সহজ আমরা হব যখন আমাদের আর প্রকৃতিকে সহজ করে নিতে পারব, বুঝব এই কথাটা—আমি প্রকৃতিকে জয় করেই তাকে চিনছি, আর প্রকৃতিও সেই জয়-পরাজয়ের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মানব প্রকৃতিকে চেনবার পথে আমাকে এগিয়ে দিচ্ছে। যত আমরা প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত হব, তত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মিলনের পথ নিকট হবে, সহজ হবে; অপ্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃতের মোহ থেকে তত মুক্ত হব—আর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবে তত সহজ ও সচ্ছন্দ। যত আমরা বন্ধনমুক্ত হব, জানব,—এই আকাশ কত অসীম, এই ব্যাপ্তি কত দিগ্‌দিগন্তব্যাপী; জানব, সূর্য আর দেবতা নয়, চন্দ্র শুধু মড়া পৃথিবী; জানব গাছ-লতা-পাতার নিয়ম,—চিনব প্রকৃতির গতি। আর ততই বুঝব—এই সূর্য আমার প্রাণকে জীইয়ে তুলছে, এই পৃথিবীর সামান্যতম পরিবর্তনে আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায়; বুঝব প্রকৃতি আমার জীবনের কত বড় পরিবেশ, কত সক্রিয় তার দান আমার মনের ওপর। আর কত সত্য নারিকেলের ছায়াবোনা সেই ছোট শহরের দান, নদী-ধোয়া মাঠ-ঘাটের রূপ, শিশির-ভেজা ঘাসের ফুলের চাহনি, ঝাউ-এ ছাওয়া লাল সড়কের ডাক, বাদাম-তুলার ঘনছায়ার স্মৃতি, বান-ডাকা নদীর বিপুল উচ্ছ্বাস,—বুঝব হাড্‌সনের **Far Away And Long Ago**-র চেয়ে কম নয়

সেই ছোট্ট নোয়াখালির স্মৃতি আমার মনে—**sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart**—আর বুঝব সে বিমূঢ় বিস্ময় কত সত্য বক্‌সার নিদ্রাহীন রাত্রে যখন মনে হত হিমালয় আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আছে, বর্ষণস্নাত অপর্যাপ্ত বনানীর জলধারা ঝরছে, আর দু-দিকে ঝর্ণার জলের প্রচণ্ড কলরোলে আমার চেতনা মথিত হচ্ছে। বুঝব সেদিন প্রকৃতি কত সক্রিয় আমারই জীবনের পক্ষে, কত তার দান; বুঝব সেদিন—আকাশ আমাদের কত আত্মীয়।

আমরা প্রকৃতির থেকে দূরে গেছি বলেই প্রকৃতিকে চিনেছি। সমুদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছি বলেই বুঝি—সমুদ্র আমাদের কত বড় সান্ত্বনা। সেক্‌স্‌পীয়রকে পেয়েছি বলেই আবার জানি—সমুদ্র আর সেক্স্‌পীয়র জোগায় কত বড় মুক্তির প্রেরণা। **Magnitogorsk** গড়তে পেরেছি বলেই আবার নতুন করে গড়ছি **garden city**। বুঝছি, কত স্বাস্থ্যকর অরণ্যের রূপ। ছুটি তাই সমুদ্রোপকূলে, ছুটি পর্বত-শৃঙ্গে, ছুটি যেখানে মাঠ অবারিত, আর আকাশ অখণ্ডিত। প্রকৃতিকে আর প্রতীক করে তুলছি না—তুলছি আমার সক্রিয় সঙ্গী করে। যেই বাঁধা পড়ি কয়েদখানার ছোট ঘরে অমনি বুঝি আঙিনাও কত সত্য আমার কাছে, আকাশ আমার কত আত্মীয়।

আকাশ আর আঙিনা, এ দুয়ের মর্যাদা তাই আমরা এখানে ঠিক বুঝতে পারি। দিনে মাত্র দু-ঘন্টা তো। কাল আবার একটু গোলমাল বাধে। ফলে আমরা ওই দু-ঘন্টার এই বেড়ানোর স্বাধীনতা হারিয়েছি—অন্তত কিছুদিনের মতো। এতটা আকাশ, এতটা আঙিনা, সবখানে মেলে না; তাই ও নিয়ে আমাদের দুঃখ নেই। আর কিইবা এই আকাশ আর আঙিনা? দেয়ালের আড়ালের সামান্য কয়েক হাত জমি আর তার ওপরকার কতটা আকাশ—দিনশেষে দু-ঘন্টার জন্য—এই তো। ভিতরের সঙ্কীর্ণ আঙিনায় ও ঘরে অতএব দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের খেলা জমেছিল, গল্প জমেছিল। আর চলেছিল দ্বিগুণ তেজে ঘরের ভিতরেই ভ্রমণ। সন্ধ্যাটা বেশ কেটে গেল।

যখন অনেক রাতে শুয়েছি, মনে হল—কাকে যেন আজ দেখি নি।

'মেঘনা'-সাহিত্য সংকলন
সম্পাদক বিমলচন্দ্র ঘোষ
বৈশাখ ১৩৫৪
১৯৪৭

সংস্কৃতি, না বিকৃতি ?

আমি 'নোয়াখালির গোপাল হালদার'—ষোলই আগস্টের সকাল বেলায় কলকাতায় আমার হিন্দুস্থান এলাকায় নিরাপদে বসেও তাই শিউরে উঠছিলাম—সমস্ত পূর্ব বাংলার ভয়াবহ ভবিতব্য যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, ফুটে উঠছিল আমার জন্মভূমি ঢাকার গ্রাম ও শহরের সম্ভাব্য রূপ, ফুটে উঠছিল আমার আশৈশব আত্মীয় নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের অগ্নিগর্ভ নিয়তি। সে কারণে সেই আগস্টের অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বেই চিন্তা না করে পারিনি 'মুসলিম কালচারে'র কথা (দ্রঃ যুগান্তর, শারদীয় ১৩৫৩), 'বাংলার মুসলমান কালচার'-এর সত্যকার বিকাশ-পদ্ধতির কথা (দ্রঃ দৈনিক বসুমতী, শারদীয় ৫৩)। সে কারণেই ষোলই আগস্ট সকালবেলা থেকেই শিউরে উঠছিলাম পূর্ববাংলার, বিশেষ করে নোয়াখালি চট্টগ্রামের হিন্দুদের ভয়ঙ্কর বিপদের কথা ভেবে—কারণ আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার—শতকরা আশিজন মুসলিম প্রতিবেশীর সমাজে শতকরা বিশজনের একজন হয়ে জন্মেছি, বেড়ে উঠেছি ; বুঝেছি কত কম চিনি আমার প্রতিবেশীকে, আরও বুঝেছি কত পর সেই প্রতিবেশীর চোখে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সৃষ্টি এই বাঙালি কালচার। আমার পক্ষে তাই 'বিচার'-সুলভ স্থূলতা বা হিন্দুয়ানির কাগুজে হুঙ্কার ছিল অসম্ভব। অথচ সেদিনও পেশাদারি হুঙ্কারের দিন। তবু এ যুগের ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে সেদিন আমার পক্ষে না বুঝে উপায় রইল না—যুগান্তরের সেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনই সেদিন, ষোলোই, আগস্ট, হয়েছে প্রথম 'ক্যাজুয়েলটি' (দ্রঃ ছাত্র অভিযান, সেপ্টেম্বর)। কলকাতার রাস্তায় রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে এক বিশেষ ধরনের গাড়ির আর বিদেশী সৈনিকের (স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা)। ভোলবার পথ দেখলাম না—ভ্রাতৃহত্যার এই অধ্যায় কেন বাংলায়, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীয় প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরেই। ব্রিটিশ বণিক ও আমলাতন্ত্রের এবং হিন্দুস্থান মালিক গোষ্ঠীর ও পাকিস্তান মালিক গোষ্ঠীর

মুনাফার মৃগয়া এই ভ্রাতৃঘাতী চক্রান্তে উদ্ঘাটিত হওয়াই ত অনিবার্য (দ্রঃ ইস্টার্ন এক্সপ্রেস, শারদীয় সংখ্যা)। তবু যুদ্ধান্তের ভারতীয় জনতার অভিযানকে মিথ্যা মনে করতে পারলাম না, ভুলতে পারলাম না '২১শে নভেম্বর থেকে ২৯শে জুলাই'। সমস্ত প্রতিক্রিয়ার এই ঝড়ের মধ্যেও 'সোনার ভারতের' মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছে নূতন ভারতের রাজপুত্র—জনসমুদ্রের তল থেকে যে এবার এক ডুবে তুলে আনবে এই রাক্ষসী-শাসনের প্রাণের কৌটা, ছিঁড়ে ফেলবে তার প্রাণ-ভোমরা (দ্রঃ শতাব্দীর লেখা, 'সোনার ভারত')—এই আশার স্বপ্নও চোখে জাগল সেই আগস্টান্তের শারদীয় দিনে, যুদ্ধান্তের ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর-প্রান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

তাই ষোলই আগস্টের ভ্রাতৃরক্তও আমার চোখ থেকে একেবারে মুছে দেয়নি উনত্রিশে জুলাই-এর কলকাতা। জগৎজোড়া জনজীবনের বিপুল অভিযান আমার দেশে ভ্রাতৃরক্তের পিচ্ছিল পথে নিমজ্জিত না-হয়ে এগিয়ে যায়—এ সত্যটাই আমি দেখছি, নোয়াখালির গোপাল হালদার, দেখছি আগস্টের কলকাতায়, দেখছি অক্টোবরের নোয়াখালিতে, আর দেখছি আজ, নভেম্বর-ডিসেম্বরের বিহারে।

নোয়াখালির সাক্ষ্য

ঝটিকাহত পক্ষীর মত নোয়াখালি থেকে ফিরছিলাম। পথে বারে বারে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম—ভারতের স্বাধীনতা কি এবারের মত 'ক্যাজুয়েলটিই' হয়ে রইল? শুধু নোয়াখালির হিন্দু, পূর্ববাংলার হিন্দু, বাংলার হিন্দুর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি ভারতের ভাগ্যও অন্ধকার হয়ে গেল না?

তখনো ব্রিটিশ বেয়নেট বা স্বদেশী পুলিশের রাইফেলের প্রায় দর্শন মেলে না; উপদ্রুত অঞ্চলের লৌহ-বেষ্টনী ভেদ করবার কোনো আয়োজন নেই, অনুপদ্রুত অঞ্চলের জীবনও বিভ্রান্ত জনতার হাতে, বেতসপত্রের মত কাঁপছে শহরের গ্রামের ত্রাসগ্রস্ত নরনারী—মন্ত্রী ও লাটেরা, রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস নেতারা, তখনো পর্যন্ত শূন্যাবলোকনের অপেক্ষা বেশি কর্মদক্ষতার পথ নোয়াখালিতে দেখছেন না; আর নোয়াখালির বণিক ব্যাঙ্কাররা তখনো কলকাতায় আসেনি—সুব্যবস্থায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন, কাগজে কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে উপদ্রুত নানালোকের ভীতি-ভ্রান্তিবিকৃত বিবৃতি—অসহায় ও অসুস্থ হয়ে আমি ছাড়ছিলাম নোয়াখালি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে,

তার তলায় চাঁদপুর ঘাটের মুক্ত প্রাঙ্গনে ঘর-ছাড়া সহস্র সহস্র নরনারী শিশু বালক-বালিকা; ক্ষুদ্র শহরের বন্দরে, গুদামে, ঘরে-বাইরে আরও বহু সহস্র তেমনি গৃহহীন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল অধিবাসী। রেলপথের স্টেশনে স্টেশনে ভিড়, স্টিমার ঘাটের চারদিকে সর্বত্র অপেক্ষমান যাত্রী সকলের চোখে শঙ্কা ও ত্রাস, অসহায়তা ও ব্যাকুলতা, সমস্ত পূর্ববাংলার হিন্দু পথ না জেনে, গন্তব্য না বুঝে, ভবিষ্যৎ না ভেবে বেরিয়ে পড়েছে বাইরের পথে। হিন্দু বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছেন যুবক মুসলমান দোকানি, সলজ্জ দুঃখে বলছেন, 'কি করে থাকতে বলি আর? আমার নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা চোখের সামনেই দেখছি আপনাদের ঘর দুয়ার ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নানা উপদ্রব করছে?' জানি, এমনি যুবকেরা সংখ্যায় অল্প, তবু তাঁরা আছেন। আছেন বলেই নোয়াখালির সংবাদ দুর্বৃত্তদের দেয়াল ভেঙেও বাইরে এসে পৌঁছায়। বাঙলার সরকারি বাধা যতদিন নোয়াখালির সংবাদ কলকাতায় আমাদের কান থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে, নোয়াখালির দুর্বৃত্তরা কিন্তু ততদিন সে সংবাদ নোয়াখালির সাধারণ মানুষের সরকার কর্মচারীর নিকট থেকে দূরে রাখতে পারে নি। নোয়াখালির সাধারণ মুসলমানের সদিচ্ছা একেবারে পরাহত হয় নি—মাঝে মাঝে গোপনে বা সুকৌশলে তারা প্রতিবেশী হিন্দুকে রক্ষা করেছে। আর গোপনে বা চতুরতার সঙ্গে অবরুদ্ধ এলাকা থেকে সংবাদও তারা বহন করে মাঝে মাঝে উপদ্রুতদেরও কারো কারো বহির্গমনের উপায় করে দিয়েছে। কিন্তু যতটুকু এ সদিচ্ছা সার্থক হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরাভব স্বীকার করতে তা বাধ্য হয়েছে। কারণ তার পিছনে প্রথমত এসে দাঁড়ায়নি তার দেশের শাসক শক্তির অকুণ্ঠ সমর্থন, কিংবা তার পিছনে মুসলমান সমাজের সাধারণ নৈতিক সমর্থনও সে সংগ্রহ করতে পারে নি।

মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি

এই মানবতার পরাজয়ই বাংলার মুসলিম লিগের চরম গ্লানি ও চরম কলঙ্কের কথা। দেখলাম, কি কলকাতার মুসলিম নেতা কি নোয়াখালির লিগ নেতা কারো মুখে এমন নির্মম ও শোচনীয় ঘটনার জন্য যথোচিত লজ্জাবোধ বা বেদনার দাগ নেই; আছে নালিশ—হিন্দু সংবাদপত্রের অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে। এইসব মুসলমান নেতাদের দিক থেকে অনুপদ্রুত অঞ্চলে শান্তিরক্ষার চেষ্টা আছে, উপদ্রুতদের উদ্ধারের কিন্তু সক্রিয় চেষ্টা

প্রায় নেই, বেষ্টনী ভাঙবারও চেষ্টা নেই। অথচ তাঁরা প্রবলভাবে চেষ্টা করছেন তখন সে জেলায় ফৌজ বা অস্ত্রধারী পুলিশ আগমন বন্ধ করবার জন্য, ফৌজপুলিশ নিতান্ত যদি আসে তাহলে কার্যত সেই পুলিশ ও ফৌজের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখার জন্য। আর এ জন্যই তাঁরা প্রাণপণে সমস্ত ঘটনাকে 'সামান্য' বলে প্রমাণ করতে ছিলেন উদগ্রীব। স্থানীয় লিগ ও স্থানীয় মুসলমান নেতৃত্ব নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য আরো ব্যস্ত ছিলেন এ কথা বোঝাতে যে এই কুৎসিত আচরণের নায়কদের সঙ্গে লিগের কোনো সম্পর্ক নেই; এবং আসলে দুর্বৃত্তদল এ জেলার লোকও হতে পারে না, আর যা ঘটেছে তা হচ্ছে নিতান্তই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের উত্থান।

মামলা সাজাবার প্রয়োজনে যে ওজর-আপত্তিই উত্থাপিত হোক, আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার, আমি জানি, এখানকার শতকরা ৮০টি মানুষের জীবনযাত্রার অনেক সূত্রই আজ অন্যধর্মাবলম্বী এক-আধজন মহাজন ও জমিদারের মুঠোতে, জানি এ জনতার লোকসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য সঙ্কুলান হয় না, মন্বন্তরে মহামারীতে মরেও তারা ক্ষয় হয় নি; জানি এই শতকরা ৮০ জনই এ জেলার কৃষির, এ জেলার শিল্পোৎপাদনের বাহক। ধর্মের গোঁড়ামি উৎকট এখানকার হিন্দুর আচারে আর মুসলমানের জীবনে, মনে, প্রাণে। আমি জানি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি মোল্লা ও মৌলবি তৈরি হয় নোয়াখালির মক্তবে মাদ্রাসায়। এখানকার মুসলমানের জীবনযাত্রার প্রতিটি আচরণ বিচরিত হয় শরিয়তের নিয়ম কানুন দিয়ে; তাদের অভাবগ্রস্ত মনের সম্মুখে গত দশ বছর ধরে চিত্রিত হয়েছে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী, লিগের প্রচারিত এক শরিয়ত-সম্মত 'পাকিস্তান'—আর সেই লিগ মন্ত্রীত্বের সুযোগেই ১৯৩৭ থেকে এই রামগঞ্জের দুর্ধর্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজে লিগ বেলিগ মন্ত্রীদের সমাদরে লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছে এই জেহাদের নায়ক দেহরার পীরের পুত্র, তারপর গত দুমাসে কলকাতা হত্যাকাণ্ডের পরে সে কর্তৃপক্ষের চোখের ওপর গঠিত করেছে গুণ্ডাদের ও প্রাক্তন সৈন্যদের বাহিনী। সমস্ত পথ নিজেকে এই জিজ্ঞাসা করতে করতে এলাম, এখনো যখন এমন মর্মন্তুদ ব্যাপারের অনুরূপ বেদনাবোধ এদের প্রাণে জাগেনি—যখন মুসলমান উকিল বন্ধু বলছেন, 'একে (একডাকশান্) নারী অপহরণ তো বলা চলে না, কারণ, ধর্মান্তরিতা হয়েছে যে নারী তাকে তার নূতন ধর্মানুযায়ীই যখন বিবাহ দেওয়া হয়েছে, তখন তো ব্যাপারটা আইনসঙ্গত বলতে হবে।' যখন রেলের সহযাত্রী-সাথীকে বলতে শুনেছি যে-ইস্তাহার

সোহারাবর্দির নামে আকাশ থেকে বিলি হয়েছে, 'সে ইস্তাহার বিলি করেছে আসলে শরৎ বোস ও কৃপালনী', যখন স্টিমারে শুনলাম ২৪ পরগণাগামী নোয়াখালির মৌলবি গৌরবে ব্যাখ্যা করছেন, 'আসলে আমাদের জিলার মুসলমান ভয়ানক ধর্মভীরু, কাউকে তারা মারতে চায় নি, শুধু বলেছে 'দীন গ্রহণ করতে', যখন রাজবাড়ির প্লাটফর্ম ধ্বনিত হতে শুনলাম, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আর সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন গৃহত্যাগীদের উদ্দেশ্যে—'যা পূর্ববাংলা ছাড়ালাম, পশ্চিম বাংলায়ও তোদের স্থান রাখব না'—তখন বার-বারই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি হিন্দুর বাস আর সম্ভব? আশিজন যেখানে তাদের চায় না, সেখানে বিশজন থাকবে কোন দুঃখে, কোন স্বস্তিতে, কোন ভরসায়? দুর্লভ রাজকীয় বেয়নেট ও বুলেটের সহায়তায়?

ব্রিটিশি বিলাস

কলকাতায় মিতভাষী মিঃ মার্টিনের উক্তি শুনেছিলাম—সব সুনিশ্চিতরূপে (ডেফিনিটলি) থামানো হয়েছে, ঠিক যখন (১৭ই) হাইমচর জলছিল এবং বাজেপ্তি, গোজিন্দিয়া, পাইকপাড়া জলবার অপেক্ষায় রয়েছিল। পরে লেবর লাটের রিপোর্টে পড়েছি—'ব্যাপারটা সামান্য।' দেখেছি লিগ নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকইনার তো নারী হরণের কথাই শোনেন নি! ঘটনা-স্থলে যাবার আগে ব্রিটিশ সেনাপতি বুশার বললেন, 'ব্যাপারটা একটা আর্থিক সংঘর্ষ!' এও দেখলাম! এরপরেও কি বুঝতে বাকি থাকে ব্রিটিশ বেয়নেট ও বণিক এই ভ্রাতৃবিরোধের অধ্যায়ের সুযোগে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে? বাইরের হিন্দু গোষ্ঠীর লোকবল ও ধনবলের ভরসাতেই কি তবে শতকরা ২০ জন নোয়াখালিতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে? নোয়াখালির পথে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম—বাংলার অখণ্ড জীবনযাত্রা এই হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি বিচ্ছেদের ও হিন্দুমুসলমানের রাজনৈতিক আদর্শবিভ্রাটের ফলে কি খণ্ড, আত্মঘাতী দুই বাংলারই সৃষ্টি করবে?

হিন্দুর আত্মহত্যা

কলকাতায় শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়েই বুঝলাম—আরো-এক কঠিন সত্য। হিন্দুর ব্যক্তিগত ত্যাগ আছে, সংবদ্ধ সংগঠন নেই। দিনের পর দিন নোয়াখালি সম্পর্কিত রিলিফ কমিটিগুলির ধনিক-বণিক, স্বামী-সন্ন্যাসী, সম্পাদক-ব্যাঙ্কার মহলের সীমানায় দাঁড়িয়ে বুঝলাম—এক নির্মম মিথ্যা।

নোয়াখালির হিন্দুর হতাশাকে অবলম্বন করেই তার ব্যাঙ্কার, রাজনীতিক ছোট-বড় দল-উপদলের আত্মপ্রসার ও আত্মপ্রচারের আশা ক্রমশ উগ্র ও সবল হয়ে উঠেছে। বিশজনকে আশিজনের থেকে ছিন্ন করে, একক ও একান্ত করে চলেছে তাদের রাজনৈতিক সতরঞ্চ খেলা। চিনলাম এক মূঢ়তাকে—হিন্দুসমাজ। এই ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও কোথায় ভারতীয় হিন্দুর মনে, বাংলার হিন্দুর মনে, নোয়াখালির হিন্দুর মনে সেই বাস্তবতাবোধ, সেই বৈজ্ঞানিক সংগঠন শক্তি, সেই নিষ্করুণ আত্মপরীক্ষা ও সুস্থ নবজীবনের পরিকল্পনা?

যে-বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে কোনো মানব গোষ্ঠী ইতিহাসের পাতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখে তা শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত বুদ্ধিবীর্য, আত্মত্যাগ নয়, তা হচ্ছে তার সামাজিক বোধ, তার সংগঠনশক্তি, সংঘবদ্ধতা। এই সংগঠনশক্তি না থাকলে ইতিহাসের ঝড়-ঝটিকা সে কাটিয়ে উঠতে পারে আর-এক কৌশলে—শুধু বেতসবৃত্তির বলে, আপন সহনশীলতার বলে। ইতিহাসের বহু বিপদ কাটিয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু অবশ্য এই জোরেই বেঁচে রয়েছে। কিন্তু এই প্রণালীতে ইতিহাসে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, করেছে অস্তিত্বরক্ষা। আজকের দিনে মানবেতিহাসে সুদৃঢ় সংঘশক্তির দাবি আরো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, অখণ্ডতা চাই প্রত্যেক জীবন্ত মানবগোষ্ঠীর, অথচ কোথায় হিন্দুগোষ্ঠীর মধ্যে সে চেতনা? হিন্দুর মতাদর্শ গঠিত হয়েছে অধিকার-ভেদকে আশ্রয় করে, ভাগে ভাগে তাকে সাজিয়ে। হিন্দুসমাজ গড়ে উঠেছে বর্ণভেদকে আশ্রয় করে—স্তরে স্তরে তাকে সাজিয়ে। সংগঠন নয়, ভেদ হিন্দুত্বের মতবাদে ও তার দেহবিন্যাসে অপরিত্যাজ্য। সে জানে—সে ছোট জাতি কিংবা বড় জাতি, এই তার পরিচয়, সে জানে—গরুই তার দেবতা, কণ্ঠী, শাঁখা-সিঁদুরেই তার ধর্ম, এই তার অধিকার। যখন সে পরিচয় তার নষ্ট হল, সে অধিকার কেউ কেড়ে নিল, আজ সে ভাবে, তার আর রইল কি? হিন্দুর সংস্কৃতি তার নিজেরই নিয়মে হয়ে রয়েছে বিভেদের সংস্কৃতি—**minority culture**; শ্যামাপ্রসাদ-কিরণশঙ্করের জিনিস। হিন্দু তার দারিদ্র্যকে, নিম্নবর্ণকে—হাইমচরের, লক্ষ্মীপুরার নমঃশূদ্রকে কার্যত বঞ্চিতই রেখেছে—যতই থাক সে হিন্দু সভ্যতার জ্ঞান ও দান। আজ বরং হিন্দু বলেই সে আর মানুষের মর্যাদাকে তার প্রাপ্য বলে ভাবতে পারে না। এই ভেদবোধের ওপরই আবার চেপে বসেছে একালের কাঞ্চন-কৌলিন্যের স্বার্থবোধ। তাই সমবায় ভিত্তিতে পুনর্বসতির

কথা বললেও তা আজ হৃতসর্বস্ব ভাগ্যবানেরা গ্রহণ করবেন না। বাংলার কালচারের কোন দান হিন্দু-সাধারণ লাভ করেছে তবে?

সংস্কৃতির বিকৃতি

মুসলিম সংস্কৃতির ত্রুটি দেখেছিলাম: ইসলামের বাস্তববোধ একদিন আরব কৌমগুলিকে একত্র করে আরব সমাজকে সংগঠিত হবার শক্তি দিয়েছিল; মুসলমান ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও একটা ধর্মগত গণতন্ত্র ও সাম্য স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু সে মুসলিম গণতন্ত্র রাষ্ট্র বা আর্থিক জীবনে বিস্তারিত হয় নি। মানুষকে মানুষ হিসাবে সে মর্যাদা দেয় না, মানুষকে স্বীকার করে মুসলমান হলে—শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে, আর চিরদিনই মুসলমান সংস্কৃতিও রয়েছে উপরতলার **minority culture** হয়ে, নাজিমুদ্দিন, সোহ্‌রাবর্দির কালচার, পাঁচু সেখ ও রহমানের তাতে অধিকার নেই। যতক্ষণ মুসলমান সংস্কৃতি আধুনিক মানবতার সেই সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীন আদর্শে নিজেকে সঞ্জীবিত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেও সৃষ্টি করবে তার সর্বস্তরে শুধু সংস্কৃতির বিকৃতি। নোয়াখালির ও বাংলার মুসলমানদের আজ তাই না এই বিকৃতি?

হিন্দুসভ্যতার শূন্যগর্ভতা দেখলাম—যত বড় হোক হিন্দুর আধ্যাত্মিক বুলি আর যত স্থিতিস্থাপকই হোক হিন্দুর সামাজিক গঠন, মানুষকে সে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করে না, মানুষের মর্যাদা, 'মানুষের অধিকার' তার দৃষ্টিতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় না। 'আধুনিক মানবতার' যে আদর্শকে তাই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ গ্রহণ করে—'বাঙালি কালচারের' বনিয়াদ স্থাপন করেছে তাতেও তাই অধিকার ভেদ দূর হয় নি। বাঙালির কালচারে তাই অধিকার রইল শুধু শিক্ষিত বাঙালির, ভদ্রলোক বাঙালির, 'বাবু' বাঙালির।

'এইখানে, ইউরোপে প্রকাশিত এই 'আধুনিক মানবতার' ক্ষেত্রেই আছে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির একমাত্র মুক্তিক্ষেত্র—এ কথাই যখন সত্য, তখন কেন এ কথা আপনারা বলেন না?' অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নোয়াখালির অন্ধকার আকাশে কোনো আলোকের সন্ধান না পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন। নতুন সংস্কৃতির বন্ধনেই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত হতে হবে। আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার, নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই 'আধুনিক মানবতার' আদর্শকে কি তুমি স্বীকার করনি—তোমার কথায়, লেখায়, কাজে, জীবনে?

তুমি কি রূপ দিতে চাওনি সেই বাণীকে—জাতি নয়, বর্ণ নয়, এমন কি ধনবৈষম্যও নয়—'সবার উপরে মানুষ সত্য'? অন্ধকারে জলে উঠল আলো। প্রথমেই পড়লাম নোয়াখালির 'সন্দীপী' লালমোহনের মৃত্যুর রক্তমাখা লিপি। বুঝলাম বাঙালির বিপ্লবী চেতনা আজও বিপ্লবী মর্যাদায় প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত কি? তবু জানি 'নোয়াখালির লাঞ্ছনা'—ব্যবসায়ীদের নিকট লালমোহনের আত্মদান সহজ মর্যাদা লাভ করবে না। কারণ লালমোহন 'আধুনিক মানবতা'র বোধে প্রবুদ্ধ, ইতিহাসের নতুন শক্তিতে আস্থাবান।

ব্যক্তির একান্ত পথকে এরূপ সমুজ্জ্বল করে তারপর জ্বলল নতুন আলো। নোয়াখালির গ্রামে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজী। মহাত্মাজী একান্ত মানবাত্মার পূজারী; জীবনের চরম পরীক্ষায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সাধনা বিশজনকে আশিজনের সঙ্গে সম্মিলিত করবার সাধনা। তাঁর পুঁজি ও পদ্ধতি ব্যক্তির সাহস, মানবাত্মার অপরাজেয়তা।

আর বহু সাহস, জনতার সহজ মানবতা, সহজ সংঘশক্তির সাধনা হাসানাবাদের। অন্ধকারের ভেতর জ্বলে রয়েছে পূর্বাপর হাসানাবাদ—সাংবাদিকদের ব্যবসায়ে তাও অবজ্ঞাত। হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ মানুষ সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মানুষ হিসাবে—সংগঠনশক্তিতে একত্রিত হয়ে। মানুষের অধিকার আদায় করবার দাবিতে সংঘবদ্ধ হয়ে; হিন্দুর আত্মরক্ষার, মুসলমানের আত্ম-পরিচয়ের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে, সেখানে সংবাদ-ব্যবসায়ী বা বিবাদ-পশারী সচ্ছন্দ বোধ করে না। বুঝলাম—'আধুনিক মানবতার' সেই সংস্কৃতি পথ গড়ছে মূর্খ মানুষেরাই 'মানুষের অধিকারের' সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

স্বীকার করলাম নিজের কাছেই, মানবাত্মার একান্ত যাত্রার পথকে, সাধারণ মানুষ আমি আশ্রয় করতে অক্ষম। আর স্বীকার করলাম একান্ত বেদনায়—হাসানাবাদের মশাল আমরা নোয়াখালির হিন্দু নোয়াখালির মুসলমানের হাতে তুলে দিতে পারি নি; সেই পাপেই আজ জ্বলল নোয়াখালি, জ্বলছে প্রায় সমস্ত বাংলা—জ্বলল না 'আধুনিক মানবতার' নতুন শিখা, জ্বলল না মানুষের মুক্তির আলো—যুদ্ধান্তের সকল দেশের আকাশে লেগেছে যার রক্তিম ভাতি!

নোয়াখালির বদলা

পালিয়ে এসেছিলাম পাটনায়—ভয়ে নয়, লকোদ্ধারের উদ্দেশ্যেও নয়, দেহের তাড়নায়। বসে বসে রাত জাগছি রুদ্ধশ্বাসে, বসে বসে দিন গুণেছি ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে—আর দেখেছি 'নোয়াখালির ওপিঠ'—আত্মঘাতী হিন্দুদের নিষ্ঠুর ঘাতকবৃত্তি—আর ভ্রাতৃবিরোধী মুসলমানেরও ভ্রান্তি ও মূঢ়তা। ভয়ে, আতঙ্কেও, মানবতাকে বিস্মৃত হয়েছে এখানে সহস্র-সহস্র সাধারণ মানুষ আর তাদের উত্তেজনায় ইন্ধন জুগিয়েছে স্বার্থান্ধের দল। অগ্নুৎপাতের শিয়রে দাঁড়িয়ে তেমনি নির্লিপ্ত দর্শকের মতো—সযত্ন হস্তে সমস্ত আবরণ সংবৃত করে রেখেছে বিহারের লাট-বেলাট ব্যুরোক্রাসি। শুধু তফাৎ এই—এই পরীক্ষার দিনে এখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছেন বিহারের ব্যাকুল কংগ্রেস নেতৃত্ব আর সর্বোপরি তাদের সহায় হল গান্ধীজীর আবেদন ও উপবাসের সম্ভাবনা। দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে বিহারের সাধারণ মানুষের প্রাণকে তা একেবারে উদ্বুদ্ধ করেছে—বিহার কংগ্রেসের পাঁচ-টাকা-রোজ জয়প্রকাশী বাহিনী নয়—গান্ধীজীর উপবাস-সম্ভাবনা ও সাধারণ কংগ্রেসীর প্রাণপণ প্রয়াস বিহারকে শান্ত করল। এই 'নোয়াখালির বদলা'র দ্বারা সংখ্যালঘু লিগ-বিরোধী দরিদ্র মোমিনদের, সমস্ত বিহারী মুসলমানকে, আজ তুলে দিয়েছে লিগের হাতে। শুধু বিহারে নয় সমস্ত ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের ঘটেছে এই পরাজয়।

এখানকার আশ্রয় কেন্দ্রকে আশ্রয় করে—তাই সোল্লাসে সমস্ত প্রদেশের মোসলেম লিগ লেগে গিয়েছে তাদের রাজনীতিক শতরঞ্জ খেলায়।

এও সেই নোয়াখালির হিন্দু নেতৃত্বের খেলারই ওপিঠ, তবে আরও জমাট। আর এ খেলা শুধু কংগ্রেসের ও হিন্দুর বিরুদ্ধে তো নিশ্চয়ই নয়। এ খেলা আজ চলেছে বিহারের দুর্গত মুসলমানেরও বিরুদ্ধে তাদের বাংলায় 'চালান' দিয়ে; এ খেলা চলেছে তাদের খাদ্য-বস্ত্র নিয়ে চোরাবাজারে পর্যন্ত; আর এ খেলা চলেছে ভিতরে ভিতরে বিভিন্ন প্রাদেশিক লিগের দল-উপদলের মধ্যেও। রাজা নাজিমুদ্দিন এসেছেন বাংলায় স্থানান্তরকরণের নিমন্ত্রণ নিয়ে। সোহারাবর্দির দালালরা অমনি জানায় 'উজীরে আজমের' নামে বাংলায় এই বিহারী বেরাদরি খেদমতের প্রতিশ্রুতি। বর্ধমানের আবুল হাসেম জানান বিহারের প্রান্তেই তিনি গৃহদ্বার খুলে বসে আছেন। ফজলুল হক আসেন শের-ই-বাংলার মত লাফিয়ে হমদর্দি জানাতে। আর বাংলা সরকারের

বান্দা এন. এম. খাঁ আসেন পূর্ব-পাকিস্তানের পাকি চালে বিহারের দুর্গতদের 'সেবার' জন্য: ফিরোজ খাঁ বসে আছেন—গোরা ফৌজের বন্দুক-বেয়নেটের সাহায্য নইলে আদায় করে কে? আর সর্বোপরি—কয়েদে আজম পেয়ে গিয়েছেন তাঁর পাকিস্তানি পণের নতুন কিস্তির সুযোগ—শুধু পাকিস্তান আর নয়, লোক স্থানান্তর ছাড়াই আর পথ নেই; আর বিহারের পরে রাষ্ট্র-গঠন পরিষদের অধিবেশন এখন অসম্ভব। সহস্র সহস্র দুর্ভাগ্যগ্রস্ত নারী শিশু তাই চলেছে বাঙলার স্বর্গ-সুখের আশায়—কলকাতার গাড়িতে আর স্থান নেই—বিহারের শান্ত এলাকার মধ্যবিত্ত ছুটেছে। বিহারের শান্ত এলাকার গরিবও ছুটেছে—অনুতপ্ত সংখ্যাধিক্যের আহ্বানের অবসরও তারা দেয় না, আহ্বানও তারা চায় না—'সোনার বাংলায়' অভাব কি? অভাব কি, জানি আমরা—যারা মন্ত্রীদের কর্মদক্ষতায় না পাই খাদ্য না পাই বস্ত্র, যারা হাজার হাজার জমির ক্ষুধায় চড়াও হই পূর্ব বাংলা ছেড়ে আসামে; যারা হাজারে কলকারখানায় চাকরি খুইয়ে ঘুরি পথে পথে; যারা 'সোনার বাঙলার' ম্যালেরিয়ার মহামারীতে বছরে বছরে মরি লক্ষে লক্ষে; যারা জানি বাঙলার বাঙলাভাষী মুসলমান ও উর্দুভাষী নাজিমউদ্দিন-ইস্পাহানি-সিদ্দিকিদের মধ্যে রেষারেষিটা কত তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তবু কিন্তু গৃহে ফিরতে চায় না বিহারের গৃহহারা ও গৃহছাড়ারা। নোয়াখালির আশ্রয়প্রার্থীরাই কি ফিরতে চায় নিজ নিজ গৃহে শুধু মহাত্মাজীর নির্দেশে? ভয় ও সংশয় সকলখানকার উপদ্রুতদেরই প্রাণে প্রায় সমতুল্য; অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই—নোয়াখালির বিভীষিকায় অবসন্ন হয়ে হিন্দু ক্রমশই খুইয়েছে তাদের সকল সাহস, আর বিহারের মুসলমান হাজারে হাজারে নিহত হয়েও ক্রমশই ফিরে পেয়েছে তাদের সহজ সাহস। কিন্তু তবু তারা ঘরে ফিরতে চায় না এ মুহূর্তে। নোয়াখালিতে যেরূপ বিহারে সেরূপ দ্বিধা আছে, শঙ্কা আছে; কিন্তু তারও চেয়ে বেশি আছে বিরোধকে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা—শতকরা চোদ্দজনের পক্ষে এ বিরোধ ভয়ঙ্কর মূঢ়তা। তবু সে চেষ্টা এখনকার মতো সার্থক হবারই কথা। যখন মিলনের বাণী প্রচারের অধিকার বিহারের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে পান জয়প্রকাশজী; পায়না কমিউনিস্ট-পরিচিত কোনো ছাত্রদল, কোনো চিকিৎসক দল, কোনো কর্মী দল। ('অধিকার ভেদ'-বাদ কংগ্রেসেও সুস্পষ্ট)। আর, বিহারের রক্তরেখা শুখোতে না শুখোতেই গড় মুক্তেশ্বরের সীমাক্ষেত্র থেকে সর্দার

প্যাটেল যখন হুঙ্কার দিচ্ছেন—'তলোয়ারের বদলে তলোয়ার'—তখন সাধারণ মুসলমান আর ঘরমুখো হতে ভরসা পায় কি সহজে? অন্যদিকে দিল্লীর তখ্‌ত থেকে জিন্না সাহেব যখন ঘোষণা করছেন—'বাসিন্দা বিনিময়েরই আজ প্রয়োজন'; আর বাঙলার লিগ মন্ত্রীদল বিহারের ঘাড়ে, তখন বিহারের সাধারণ হিন্দু ও কংগ্রেসীরাই বা অনুতপ্ত বোধ করবে কেন? এখনো যে নোয়াখালির অপহৃতাদের উদ্ধারও হয় নি।

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব

তলোয়ারের বদলে তলোয়ার? 'আধুনিক মানবতা' নয়, সংস্কৃতির বিকৃতি—ষোলাই আগস্টই কলকাতায় এই নীতির উদ্বোধন দেখেছি। তারও পূর্বে এই পাটনাতেই নববর্ষ উৎসবে দেখেছি এই সম্ভাবনার আভাস; যখন জিজ্ঞাস করেছিলাম প্রবাসী আত্মীয়দের, 'আজ কি আমাদের স্বাধীনতার নববর্ষ? না, আমাদের গৃহযুদ্ধের নববর্ষ? জনতার প্রেরণা ও উদ্যমের দিক থেকে দেখলে মনে হয় স্বাধীনতার। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের দিকে দেখলে মনে হয়—গৃহযুদ্ধের (প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩)।

এখন কি আর সন্দেহ আছে—মন্ত্রীমিশনের ও ওয়েভেল নেতৃত্বের নিকট ধরা দিয়ে কোথায় দেশকে টেনে নামিয়েছেন আমাদের কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেস পলিসি, লিগ নেতৃত্ব ও লিগ পলিসি? সিমলা প্রথম বৈঠক থেকে জাতীয় নেতৃত্বের এই দুই শাখার মধ্যে সেনাপতি ওয়েভেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘনায়িত করে তুললেন—সেদিন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বন্দ্বে পরিণত হতে লাগল। রাষ্ট্রপতি আজাদ, ওয়েভেলের শুভেচ্ছায় সমস্ত কংগ্রেসের আস্থা জানিয়ে ওয়েভেল-নেতৃত্বকেই স্বীকার করে নিলেন। বোম্বাই-এ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন থেকে শুরু হল এই ওয়েভেল পূজা, আর কংগ্রেস-লিগের সংগ্রাম। নির্বাচনের অধ্যায় শেষেও দেশে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেরণার ঝড় বইছে তখন দুই প্রতিষ্ঠান ও তার দুই বিরোধী নেতৃত্ব আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় মন্ত্রিত্বের আশায় পরস্পরকে বানচাল করে চললেন। মন্ত্রীমিশন দেশে এল—দিনের পর দিন কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে তারা মধ্যস্থতার মর্কটলীলা চালাতে লাগলেন। মন্ত্রী-মিশনের সুদীর্ঘ আলোচনায় কংগ্রেস নেতা ও লিগ নেতাদের লাগিয়ে দিলেন আত্মবিরোধ; নিজের নিজের মন্ত্রীমিশনের সামনে প্রকাশ করবার দায়ে

দুই বিরোধী নেতৃদল আবার ঘনিয়ে তুললেন নিজ নিজ অনুচরদলের মনে ভ্রাতৃবিদ্বেষ। ২১শে নভেম্বরের কলকাতায় ছাত্র বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দীপনা, রশিদ আলি দিবসের সম্মিলিত বিদ্রোহ, নৌসেনা ও বিমান সেনাদের বিদ্রোহ—যুদ্ধান্তের জনতার প্রত্যেকটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব বললেন 'গুণ্ডামি', লিগ নেতৃত্ব বললেন 'অন্যায়'—উভয়েই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টিতে উদগ্রীব, উভয়েই প্রত্যেকটি সম্মিলিত আন্দোলন থেকে নিজ নিজ জনতাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। এখানে সেখানে তাই এই বিচ্ছিন্ন-বিদ্বেষ-বিষ-জর্জর জনতা দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গায় অগ্রসর হল। ক্রিপস প্রস্তাবের মতই মিশনের চতুর প্লানে পাকিস্তানও আছে, হিন্দুস্থানও আছে, আছে রাজস্থান—আর যবনিকার অন্তরালে ইংলিশস্তান। তবু এ প্লানের ব্যাখ্যা নিয়ে নেতাদের বিরোধ চলল। সমস্ত প্লান মেনেও জিন্না বঞ্চিত হলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব থেকে—উল্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্ল্যান না-মানা (?) কংগ্রেসের নেতাদেরই হাতে দিলে সে দায়িত্ব। জিন্নার বহুদিনের স্বপ্ন ভেঙে গেল—'ব্রিটিশরা ভদ্রলোক নয়', এতদিনে তিনি তা বুঝতে পারলেন। আর কংগ্রেসের অনুগামীরা বুঝলে—এই প্রথম ভদ্রলোক হচ্ছে, জিন্নাকে আজ সুয়োরাণীর পদ থেকে নির্বাসন করেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুয়োরাণী কংগ্রেস এবার হতে চলেছেন ওয়েভেলের পাটরাণী। অবশ্য কংগ্রেস পক্ষ বললেন, কংগ্রেস পাটরাণী হচ্ছে নিজের শক্তির জোরে, ওয়েভেলের সদিচ্ছায় বটে, লিবর-সুহৃদদের বন্ধুত্বের জোরেও বটে, কিন্তু প্রধানত কংগ্রেসের নিজের জোরেই। অতএব, কাগজে কাগজে কংগ্রেসের ঢাক-ঢোল বাজল, রব উঠল, থামাও রেলের ধর্মঘট, খতম করো ডাক ও তার কর্মচারীর ধর্মঘট, বন্ধ করো মিলিটারি একাউন্টসের কেরানিদের ধর্মঘট, বিনষ্ট করো জাগ্রত ও সম্মিলিত জনতার 'উনত্রিশে জুলাই-র উদ্যম—সংগ্রামের দীক্ষা আর সম্মিলিত ঐক্যের শিক্ষা!' রইল শুধু একদিকে কংগ্রেসের 'প্রত্যক্ষ সহযোগিতা', ওয়েভেলের বন্ধুত্ব ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে, লিগকে ছেড়ে দিয়ে; আর অন্যদিকে লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওয়েভেলের বন্ধুত্ব আশা।—এল ষোলই আগস্ট।

তবু জোর করেই পতাকা ওড়াল কংগ্রেসের অনুগামী দল—পণ্ডিত জওহরলাল ওয়েভেলের মন্ত্রী হলেন, রক্তস্নাত কলকাতায় ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই

উড়ল কংগ্রেস পতাকা, পাল্টা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উড়ল কৃষ্ণপতাকা। সেই রক্তের স্রোতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামীরা এল আবার ওয়েভেলের পরিষদে—ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই উড়ল তাদের সবুজ পতাকা—ওয়েভেল তাদেরও মুরুব্বি। তারপর নোয়াখালি-বিহারের পালা চলছে—অন্যদিকে অমলনের, গোল্ডেন রক্, কোয়েম্বাটুর—আর তারই মধ্যে সাগরপারে নিজের প্রাণের শেষ ব্যাখ্যার অবকাশ হল মন্ত্রীমিশনের। ছ মাস যে কথার ব্যাখ্যায় কংগ্রেস ও লিগ নেতারা দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, একদিনে 'ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করলেন—রাষ্ট্র-গঠন পরিষদের ভিত্তিটুকুও উপড়ে ফেলে দিলেন এবার মন্ত্রীমিশন, আর তাদের এ-সবে দরকার কি—পাকিস্তান পাকা, আর কোনো দল রাজি না হলেই ভারতের স্বাধীনতার এই মিশন-প্ল্যান হবে বানচাল।

আজ ৯ই ডিসেম্বর। দিল্লীতে উদ্বোধন হচ্ছে প্রতিহত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের ভিত্তিহীন সেই 'রাষ্ট্রগঠন পরিষদ'। কোনো ক্ষমতা নেই রাষ্ট্র-রচনার ; জনগণের প্রতিনিধি কেউ নেই এখানকার আসরে—আসছে দোভাজা আইন সভার যত তেভাজা প্রতিনিধিরা ; আসতে পারে দেশী রাজ্যের রাজাদের যত তাঁবেদাররা—তবু একেই ভারতের নেতারা চালাতে চেয়েছেন 'গণপরিষদ' নাম দিয়ে। এখানে এই অর্ধ-পরিত্যক্ত আসরে এখনো তবু তাঁরা ঘোষণা করতে পারেন এ পরিষদকে সার্বভৌম বলে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে। আর মন্ত্রীমিশনের শিকল কেটে নামতে পারেন শেষ সংগ্রামে।

হয়ত কংগ্রেস সেই আশা পোষণ করে—ওয়েভেল-মোহ ও বিলাতি লেবর পার্টির অনুগ্রহের ওপর আর-কতদিন টিঁকে থাকা যায়? কিন্তু এই কংগ্রেস-লিগ বিরোধের অভিশাপ মাথায় নিয়ে কংগ্রেস সেরূপ সংগ্রামে নামলে আজ আর '১৯৪২-এর আগস্ট' হবে না, হবে '১৯৪৬-এর আগস্ট', ভারতবর্ষের সর্বত্র নতুন 'নোয়াখালি', নতুন 'বিহার'। কারণ, কংগ্রেস সংগ্রাম ঘোষণা করলেই জিন্না ঘোষণা করবেন এ হচ্ছে মুসলমানের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত—আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহলে নির্বিবাদে দূরে বসে থাকতে পারবে। তার চালে কংগ্রেস বা লিগ যে কোনো দলের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামই' আজ পরিণত হবে ভ্রাতৃহত্যায়।

জনতা ও গৃহযুদ্ধ

পুরানো পথে আজ আর কংগ্রেসের সংগ্রাম ঘোষণা সম্ভব নয়। সংগ্রাম আজ পরিচালিত হতে পারে একমাত্র হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দাবি আদায়ের জন্য, হিন্দু-মুসলমানের সমান স্বার্থকে আশ্রয় করে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে প্রয়োগ করে। আর সে স্বার্থ, সে দাবি, সে শক্তির মিল আছে একমাত্র জনতার মধ্যে—হিন্দু কৃষকের ও মুসলমান কৃষকের, হিন্দু শ্রমিকের ও মুসলমান শ্রমিকেরই এই যোগসূত্র আছে—এখনো অটুট—কলকাতা জ্বলে যায়, তার ফুলকি লেগে যায় মেটেবুরুজে, জ্বলে উঠেছে কাশীপুর, নারকোলডাঙা খিদিরপুর ও এখানে-ওখানে, কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার শ্রমিক-বেষ্টনী মোটামুটি টিঁকে থাকে—নোয়াখালির পরেও। বিহারের পরেও—আজও চল্লিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান মজুর সেখানে তাদের সম্মিলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করছে। নোয়াখালি-ত্রিপুরা জ্বলে যায়, কিন্তু হাসানাবাদে জ্বলে ওঠে ভ্রাতৃত্বের প্রদীপ। বতুরা তালিমপুর জেগে থাকে মিলনের বাণী নিয়ে। আর তেভাগার আন্দোলন আশ্রয় করে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ থেকে শুরু করে সারা বাংলা হয়ে ওঠে কৃষকের সম্মিলিত অভিযানে প্রাণময়; বেওড়বোই, শেখপুর, গয়ায় খণ্ড জমির সংগ্রামে জনতা হয় জীবন্ত। উত্তর ভারতে ভ্রাতৃহত্যার মাতলামো জাগে, কিন্তু কাশ্মীরে চলে স্বাধীনতার জয়যাত্রা; ত্রিবাঙ্কুরে স্বাধীনতার সংগ্রামে অকুণ্ঠে প্রাণ দেয় সাধারণ নর-নারী; হায়দ্রাবাদের নিজাম-রাজ্যে প্রাণ দেয় গ্রামের অনাদৃত অচ্ছুৎ আর অব্রাহ্মণ মুসলমান! 'মানুষের অধিকারের' সংগ্রাম ভ্রাতৃহত্যার রক্তেও নিবে যায় না।

সংগ্রাম ও জনতা

কিন্তু এ সংগ্রাম কি আর কংগ্রেস পরিচালনা করতে পারে? লিগ ও মুসলমান সাধারণ কংগ্রেসের সে অধিকার মানবে না; লিগেরও সে অধিকার মানবে না কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের হিন্দু শিখ প্রভৃতি। আর এ দু-এরই কোনো শক্তি নেই তাদের রাজা নবাব বা বিড়লা ইস্পাহানিদের প্রভুত্ব ঠেলে ফেলার। এ দু-এরই কোনো অধিকার তাই মানবে না হিন্দুমুসলমান কৃষক ও শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান নৌ-সৈনিক ও বিমান সৈনিক। তারা মনে রেখেছে দিনের পর দিন গণ-জাগরণের বিরুদ্ধে

ওয়েভেল চালিত 'কংগ্রেস' ও 'লিগের' বিরোধিতা, তারা মনে রেখেছে অমলনের ও গোলডেন রক, মনে রেখেছে কোয়েম্বাটুর ও ওয়ার্লি, মনে রেখেছে বার্নপুর ও দার্জিলিং-এর চা বাগানের অত্যাচার, মনে রেখেছে পরিষদে-পরিষদে জগজীবন রামদের শ্রমিক-বিরোধী কানুন, পন্থ-কিদোয়াইদের দমননীতি, প্রকাশম-পট্টভিদের বন্দুক ও লাঠি। তারা জানে—এ সংগ্রাম 'মানুষের অধিকারের' সংগ্রাম ; জনতার স্বার্থে, জনতার স্বাধীনতার জন্যও জনতার বিপ্লবী পদ্ধতিতেই এ সংগ্রাম পরিচালিত হবে, পরিচালিত হবে জনতার নেতৃত্বে, তাদের লালঝাণ্ডার তলায়। তারা জানে এ সংগ্রাম এ পথেই পরিচালিত হচ্ছে—সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও তা পরিচালিত হচ্ছে, ভ্রাতৃহত্যার সমস্ত রক্তপাত সত্ত্বেও তা ধুয়ে মুছে যায় নি। তারা জানে—যুদ্ধান্তের এই ভারতীয় গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধেই তৈরি হয়েছে এই প্রতি-বিপ্লবী রক্তপাত—এই ভ্রাতৃহত্যার চক্রান্ত—তার পরিচালনার নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ লেবরের হাতে, তারই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে ধরা দিয়েছে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব, তার ধনিক নেতৃত্ব ও তার আত্মঘাতী জাতীয় নেতৃত্ব।

সাম্রাজ্যবাদের বেষ্টনী

এ সত্য তো আমার পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল না সেই নববর্ষের দিনেও এই পাটনায়। ওয়েভেলের উপর আস্থাবান হওয়ার মতো আমরা কোনো ঐতিহাসিক কারণও দেখি না, আজ তিনি সাময়িক গবর্নমেন্টে সেই একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দিচ্ছেন বলেও ক্ষুব্ধ হই না। এই তো তাঁর নীতি। সম্মিলিত জাতিসংঘের আসরে শক্রস্-সাট্স-বির্নেসের ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একযোগে চক্রান্ত দেখেও আমি বিস্মিত হই না। এও আগেই জানি—এ আসরে তবু ভারতবর্ষ বন্ধুত্বলাভ করবে তাদের, যারা জনরাষ্ট্র জনশক্তিতে বিশ্বাসী। আমি যে জানি- এ্যাটলি বেভিনসের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পৃথিবীকে নতুন করে শৃঙ্খলিত করার আয়োজন করছে—ব্রিটিশ নীতিই গ্রীসের জনতাকে ব্রিটিশ বন্দুকের তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গ্রীসে স্থাপিত করলে ব্রিটিশের নতুন সামরিক ঘাঁটি। তুর্কিকে তারা চালিত করছে সে উদ্দেশ্যেই ইন্দো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাবীদিনের ঘাঁটিরূপে। মিশরে পনের বছরের 'স্বাধীনতার' প্রহসন চালিয়ে এখনো ব্রিটিশই সমাসীন রইল বুকে ব্রিটিশ সৈন্য আর বাণিজ্য

নিয়ে।" প্যালেস্টাইনে তারা সৃষ্টি করে ফেললে তাদের বিভেদের বলে নতুন আসন। ট্রান্স জর্ডনিয়া, ইরাক দলিত করে ইরানে আজ সবলে স্থাপিত হচ্ছে, ব্রিটিশ বাণিজ্য-রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য; ব্রহ্মে, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়, হংকং-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বাণিজ্য ও সামরিক ঘাঁটি প্রতিদিন নতুন করে স্থাপিত হচ্ছে। আর প্রশান্ত মহাসাগরে তার বন্ধু মার্কিন চীনে, জাপানে দ্বীপে দ্বীপে নিজের অধিকার কায়েম করছে। এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের না-নির্মিত সামরিক বেষ্টনী—যার ছোট বড় ঘাঁটি এখনো নির্মিত হচ্ছে ভারতের দেশীয় রাজ্যেও—আর এই যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি—এর মধ্যে কোথাও কি কিছুমাত্র ফাঁক আছে—বিন্দুমাত্র জনশক্তির প্রতি দরদ? তাহলে মাঝখানকার ভারতবর্ষকেই কি এই সাম্রাজ্য শৃঙ্খল থেকে ছাড়িয়ে এনে ব্রিটিশ লেবর পার্টি (কিংবা জিন্নার মতে চার্চিল-গোষ্ঠী) ভারতবর্ষকে তুলে দেবে ভারতবর্ষের জনতার হাতে? যুদ্ধান্তের পরিবর্তিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বোঝা কি সম্ভব ছিল—এ্যাটলি-ওয়েভেল যে আজ ভারতবাসী ধনিক ও রাজাদের খানিকটা দিয়ে অনেকটা অধিকার নিজেদের হাতে রাখতে চায় তা নিতান্তই নিজেদের সাম্রাজ্য-স্বার্থে। কারণ? না হলে যুদ্ধান্তের ভারতবর্ষ গণ-বিপ্লবের পথে অগ্রসর, একেবারে মূলেই সে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিকার দূর করতে সক্ষম। সেই বিপ্লবের বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদের বাঁধ এই মন্ত্রী-মিশন—তার প্রণীত প্লান, তার সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ, তার প্রতি-বিপ্লবের আয়োজন। আর সেই প্রতি-বিপ্লবকে প্রতিরোধ করেই বিপ্লবের বাহিনী এগিয়ে চলেছে—বাংলার গ্রামে শহরে, বিহারের গ্রামে, ইউ-পির গ্রামে, কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ ত্রিবাঙ্কুরের দেশী রাজ্যে...

আর সংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে আমরা জানি—'মানুষের অধিকারে'র এই বিপ্লবী সংগ্রামের পথেই আমাদের দেশ যখন নিচ্ছে আজ সেই নতুন সংস্কৃতি: আধুনিক মানবতাবোধ; আর তারই বিরোধিতায় প্ররোচিত হচ্ছে প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ—সংস্কৃতির যা বিকৃতি।

সংস্কৃতি, না বিকৃতি?

আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার—যুদ্ধের দিনে বুঝতে পাচ্ছি হিটলার তোজোর মহিমা, ভুলতে পারিনি জনশক্তি অপরাজেয়; যুদ্ধান্তের পৃথিবীতেও দেখেছি, দিকে দিকে জনতার বিজয় যাত্রা আর ভারতের বুকে জনতার

অভিযান, নৌ-বিদ্রোহীদের বন্দনা গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, 'উনত্রিশে জুলাই'-এর বিপুল গণজাগরণে প্রস্তুত হয়েছি, ভুলতে পারিনি মন্ত্রীমিশনের মন্ত্রে, গৃহযুদ্ধের দিনেও স্বীকার করিনি সংস্কৃতির বিকৃতিকে, চিনেছি প্রতি-ক্রিয়ার নবরচিত এই প্রতি-বিপ্লবকে, ভুলিনি অমর কাশ্মীর, অমর উনত্রিশে জুলাই, অমর হাসানাবাদের আহ্বান, ভুলিনি লালমোহনের রক্তের স্বাক্ষর, আর এই '৯ই ডিসেম্বর', আজই বা আমি ভুলি কি করে—বিপ্লবের অভিযান রচিত হচ্ছে ইন্টারিম গবর্নমেন্টের বৈঠকেও নয়, রাষ্ট্রগঠন পরিষদের অর্ধভগ্ন আসরেও নয়—বিপ্লবের অভিযান রচিত হচ্ছে আজ সম্মিলিত জনতার সংগ্রামে লাল ঝাণ্ডার তলায় বাংলায়, বিহারে, ইউ পিতে, বোম্বাইতে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, হায়দ্রাবাদে, ত্রিবাঙ্কুরে,—রচিত হচ্ছে জনতার রক্তে, জনতার নেতৃত্বে—জনতার শক্তিতে।

অমর জনতা—চিরজীবী বিপ্লব আর চিরজয়ী সংস্কৃতি! তবু নোয়াখালির গোপাল হালদার আমি—জানি জনশক্তিতে বিশ্বাসের মত 'ভুলও' আর কিছু নেই! তাই না যুদ্ধের দিনে প্যাট্রিয়টিক-চোরাকারবারীরা প্রত্যেকেই প্রমাণ দিতে পারত—কে 'ট্রেটর'। যুদ্ধ শেষে ও নির্বাচনের মুখে নবোদ্ভিন্ন কংগ্রেসভক্ত প্রফেটিয়ররা ঢিল, লাঠি ও কলম দেগে অনায়াসে প্রমাণ করেছে 'দেশের শত্রু' কে ও কেমন করে করা যায় সাহিত্যের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস আদর্শের সেবা: আর আজ গৃহযুদ্ধের দিনেও সাহিত্যের সমাজ-পতিদের পক্ষে কত না দুঃখের, কত না 'আশ্চর্য্যের বিষয়'- নোয়াখালির সেই লালমোহনরা: 'দেশের কাছে স্বাধীনতার যুদ্ধে যাহাদিগকে নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত চরমতম অসম্মানকে তুচ্ছ করিয়া তাহারাই পলাইয়া বা ধর্মের ভোল বদলাইয়া বাঁচিয়া থাকিল কি করিয়া?'—না আছে তাদের ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স, না আছে তাদের এমনতর 'সংবাদ-সাহিত্যে' ফলাও-করা চোরাকারবার?

তবু আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার বেঁচে রইলুম—এই ৯ ডিসেম্বরে হাঁচছি, কাশছি, হাঁফাচ্ছি, কিন্তু হাসছিও। জানি, 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে', বিকৃতি আপন উলঙ্গতার দ্বারাই সংস্কৃতিকে করে লজ্জিত, তারা প্রতি-বিপ্লব এমনি করেই চোরাগোপ্তা ছুরি মারে বিপ্লবকে, তবু বিপ্লব হয় দীর্ঘজীবী, জনশক্তি হয় অপরাহিত, আর সবার উপরে মানুষই সত্য হয়ে ওঠে।

* * *

'...অতএব বাক্যের দ্বারা দূষিত ব্যক্তি কখন দোষী হইতে পারে না।

দুষ্ট ব্যক্তি যদি বিকৃত বাক্যে কোন বিপরীত বিষয় বলি অর্থাৎ জনসমাজে কোন ব্যক্তি কটুবাক্যে গালি দেয়, তবে ময়ুর যেমন আপন গুহ্যদেশ প্রদর্শন করত নৃত্য করিতে করিতে শ্লাঘা করে, অর্থাৎ আমি উত্তম নৃত্য করিতেছি, এই অভিমানে মত্ত হয়, তদ্রূপ নষ্ট লোক খল, 'আমি সমাজের অমুক মহৎ ব্যক্তিকে দুরুক্ত বাক্য বলিয়াছি' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে, তজ্জন্য লজ্জিত হয় না। লোক-সমাজে যাহার কিছুই আবাচ্য বা আকার্য নাই, পবিত্রস্বভাব-সম্পন্ন মানবের সেই দূষিতচিত্ত খলের সহিত বাক্যালাপ করা বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি সাক্ষাতে প্রশংসা করে এবং পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, কুক্কুরের ন্যায় সেই মানবের জ্ঞান ও ধর্ম নষ্ট হয়। ...অতএব প্রাজ্ঞ পুরুষ সত্থই তাদৃশ পাপচেতা সাধুবর্জ্জিত ব্যক্তিকে কুক্কুর মাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। ...যে ব্যক্তি অন্যের অপবাদ করিতে সতত নিবিষ্ট, সে মনুষ্যাকৃতি কুক্কুর স্বরূপ চীৎকারকারী; উন্মত্ত মাতঙ্গ ও অতিভয়ঙ্কর কুক্কুরের ন্যায় সেই অপ্রশস্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে।"

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ

মহাভারত : শান্তিপর্ব্ব : ১১৪ অধ্যায় : ১৫০৫-পৃষ্ঠা

(বর্ধমান রাজবাটীর সংস্করণ)

[রচনাটির শেষাংশে ও রচনার পরে সম্পাদকের দেয়া মহাভারতের উদ্ধৃতিতে 'শনিবারের চিঠি'র সাম্প্রদায়িক রচনাবিশেষের প্রতি ইঙ্গিত আছে। সম্পাদক]

—

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ৮ অগাস্ট, ১৯৪১-এ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিকপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয়

It was his city

It was his city, his very own, his dear old Calcutta. Here he was born and here he elected to die. Here he saw the light of day and here he willed to see the last of it. Here he journeyed in—a promise yet unknown—to the city and its life; here he reached the journey's end—a fulfilment, noble and majestic—to the city and the entire world. Here he "lisped in numbers, for the numbers came". On the city sky clouds had gathered—as they gathered even on this day. In that backyard of the city's corner it pattered on the leaves of the trees. And the first verse came—*Jol pare, Pata nare.*

A *Kavi* was awakened into life—not in the swaying words of a Tapovana like the First of our Poets, but in this drab, old city of his birth. And as he woke, Calcutta found her voice in him. The broad streets of life claimed him, no doubt—the wide, wide world, with its open roads and warm welcome. He was its music-maker, by the Atlantic and in Indonesia alike. The richest of the crop, however, was gathered nearer home, ever and anon. The waters of the Padma—'his dear own Padma', as he confessed—sent her deep passionate urge into his soul ; and the silent and simple annals of the life by her banks unfolded themselves in his delicate stories. The waving landscape and the road to horizon around Santiniketan was sung out in thousand songs. Yet it was here in the city he woke up to his poetic self and destiny. On the Sudder street the self—same sunshine of Calcutta had broken into unusual beauty on the morning—and the fountain in him was unloosed. The city stood there for him. She was unveiled in her manifold beauty. She was revealed to herself day after day. From a sleeping beauty she turned into a living story in his pages. A new day dawned for her. A poet had come to own her and to speak for her. Calcutta spoke in golden verses, in music and drama, in vibrant notes of a new faith, in agonised accents of humiliation—and spoke finally in the new speech of a new humanity. For, he was her voice, and it was grown into the voice of timeless tradition, and into the voice of chainless humanity.

To the silence he now goes with the kindly adieu song on his lips—

Peyechi chuti bidaya deho bhai,
Sabare ami pronam kare jai.

To that silence he is now consigned with *Pranams* of his fellow-citizens ; and his fellowmen of the rest of the world did have their share in them too. Yet for Calcutta it was a sad parting. But she must bear it worthily as she bore yesterday. In it there was the homage of a humanity that is in the remaking ; there was the gratitude of a nation that is reborn ; and there was also the anguish of a city-mother that has lost noblest of her sons.

—

রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব (নভেম্বর ৩-১২, ১৯৬১) অনুষ্ঠিত হয়। গোপাল হালদার তাঁর অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। জানুয়ারি ১৯৬১-র বিশ্ব শান্তি সংসদ-এর বুলেটিনে তাঁর এই রচনাটি প্রকাশিত হয়।

Rabindranath Tagore

8 May 1861—7 August 1941

Rabindranath Tagore (8 May 1861—7 August 1941) the Indian poet and humanist, is a well-known name to all lovers of peace and progress. The centenary of his birth, which takes place on 7 May 1961 is an occasion which humanity will not pass by without recalling the debt it owes to the poet and the dignity that he has lent to it by his life and work. Lovers of peace and progress will celebrate the day in every country.

A momentous period

Tagore is probably the greatest poet and prose writer too, that India has produced in the three thousand years of her recorded literary activities. He was one of the most outstanding thinkers of the world in his time. It was a momentous period of history, in that of his own country and that of the world in general. It was the era of imperialism and imperialist wars and, later of fascist brutality. But it was also the era of development of the new national liberation movements in colonial countries, and that of the birth of a new international consciousness, of the struggle for social transformation and of the first efforts for international peace and friendship between the peoples. Rabindranath Tagore was a unique exponent of all that was creative and progressive in such a fateful per od of history.

Tagore was born at a time when the 'Indian Renaissance' was well advanced. The 'Tagores of Jorasanko', (Jorasanko —the ancestral residence of Tagore family which has been so often associated with the name of Tagore—ed.) Calcutta, played in that awakening a leading role, and in Rabindranath Tagore that movement reached its most glorious height—though Tagore died at eighty (1941) within sight of the last peak, that of Indian freedom, which was attained six years later in 1947.

A rich life

Rabindranath, the youngest son of Maharshi Debendranath Tagore, a religious devotes and reformer, was the most gifted among his gifted brothers and sisters. No school, however, would suit this sensitive youth. He received his education mostly at home. Efforts at turning him out as a barrister-at-law failed. As a young man he was called upon to manage the extensive land-properties of the Tagore family and the long and frequent residence in the countryside deepened the young poet's love of nature, the Bengali rivers, the villages and the peasants. All the time he was a voracious reader, and careful practitioner of literature and even a tireless editor of more than one literary and cultural monthly. He was in the vanguard of the national movement from his youth and sought to place the Indian movement in vital touch with the people at large, make it self-respecting and self-reliant and essentially a movement that should have no narrowness about it nor any weakness in it. He formed his first school to train students in the spirit of Indian culture and that school was final to develop into Visvabharati in 1920, the international university where 'all cultures were to find their abode.' For Tagore conceived the spirit of Indian culture as one of synthesis and sought to impart to the Indian nationalism the breadth and wisdom of internationalism. The Nobel Prize in literature was awarded to him in 1913 and the imperialist war of 1914—18 made him come out with his condemnation of fanatical nationalism and imperialism and with the plea for freedom and friendship of all people. He linked the peoples closer as he visited China, Indonesia, Indo-China and other countries of Asia and America. But one of the most significant visits was that he paid to the Soviet Union in 1930. It filled him with hopes for humanity just as the rise of fascism in Germany a little later made him take up the fight for humanity against fascism and imperialism. He was an uncompromising critic of all that was sham and inhuman ; and in the gathering crisis, *Crisis in Civilisation* he declared almost from his deathbed his undying faith in Man. So ended a few months later on 7 August 1941, in its eightieth year the

rich and crowded life of the poet and humanist that Rabindranath Tagore was.

Tagore's life is a singular testament of beauty and hope. Summing it up in the Preface to his collected works, he declared in ringing words of grace and vigour :

> "This world I have loved ; Greatness I have saluted ; Freedom I have aspired for and I have believed that Man is true and that Universal Man is ever-living in the heart of the people."

A versatile artist

In the sixty years of his fruitful literary activity, he left no department of Bengali literature untouched and left also whatever he touched, advanced by his art and lighted up by his noble thoughts. As was said by his countrymen, when they celebrated his seventieth birthday in 1931, "He has tried all spheres of literature—couplets, stanzas, short poems, larger pieces, short stories, longer stories, fables, novels and prose romances, dramas, farces, comedies and tragedies, operas, kirtans, palas, and last but not least, lyric poems. His essays are illuminating, cover almost all fields of thought and his criticism of literature is always appreciative and inspiring ; even his grammatical and lexicographical observations are deep and original. In a sense he was one of the last of the great geniuses who 'took all knowledge as his province'.

Outside the Indian world he is naturally known for his later day lectures and addresses in English, and for the translations of a few of his works. No correct estimate of his genius and his literary achievements is however, possible unless his works are read in their Bengali original But the body of them that is available in English is helpful enough to form an idea of the content, the variety, the breadth and depth of his thoughts and outlook of life.

He was versatile even as a creative artist and covered other fields of expression besides literature and histrionic art. He remains the greatest composer of songs, there are more than two thousond songs to his credit. Nearing the biblical age of three score years and ten, Tagore took to drawing and painting as another line of self-expression. There are more than

2,000 pieces .of graphic art which were done in that short period of life.

His genius was predominantly artistic but he did not seek to nurture it like a hothouse plant but allowed it to grow in the broad and open light of his time and world. So Tagore's multifarious activities extended to various fields of national life, notably to that of e 'ucation, social reform, cooperative construction and rural uplift. Seen in this large context of his activities, Rabindranath Tagore appears to have effected a difficult integration between artistic vision and elevated thoughts and between patriotic love of one's country and loyalty to humanist ideals of international cooperation.

National freedom

Tagore was a devoted patriot and advocate of national freedom.

> 'Remember, besides, that in the world your ruination begins exactly where you cease to move. For you alone the world comes to a dead end while others move on.'

His was a call for dynamic patriotism and creative nationalism as opposed to 'prayers and petitions' addressed to foreign rulers. He would have none of that 'beggary', he declared in 1904—1905 :

> 'I will never say that there is no way out for one but to approach our masters in sackcloth and ashes. I believe in my country. I pay homage to the strength that is in all of us.

Yet he never forgot the realities in India, the realities of national subjection :

> 'In India the misfortune of being governed by a foreign race is daily brought home to us not only in the callous neglet of such minimum necessities of life as adequate provision of food, clothing, educational and medical facilities of the people, but in even unhappier form in the way the people have been divided among themselves.'

So wrote Tagore in 1941 as the imperialist game of partitioning the country was taking shape.

He wrote unceasingly all his life on the problems of the multinational country struggling for freedom, and always

wrote with a sense of world perspective. The wrong done to China by the Western powers, particularly that of the opium war, roused young Tagore's indignation even as early as 1881 and whether it be China or Korea or Ethiopia, Congo or the Negro America or the crushing of the Spanish Republic, he would not fail to uphold the cause of freedom and human rights almost to his last breath (1941). One of his greatest poems (1936) was on Africa. It is a sublime admission on behalf of humanity of the shameful wrong done to Africa.

Against Imperialism

Born in India, Rabindranath Tagore was always aware of the nature of imperialists. In two well-known sonnets of 1900, Tagore evinced a sense of the era of imperialist wars and warned that conflict of rival imperialist interests was about and predatory nationalism was about to make a shipwreck of civilisation.

He mercilessly exposed the character of British imperialism as he referred to it in 1904—1905 :

> 'To keep a subject country emasculated, to divide it into parts encouraging disunity, to permit no strength of it to be gathered anywhere, to keep crushed all its forces under their domination . such are the politics of the times when aggressive imperialism regards its expansive net of self-interest as proofs of its greatness, when commercialism replaces heroism and predatory nationalism replaces righteousness.'

In 1916—1917, as the first imperialist war waged on, Tagore went crusading against this predatory nationalism and imperialism in his lectures on Nationalism. Japan rejected it coolly 'as the philosophy of a conquered people.' But Tagore stood unshaken, and his voice was clear and straight in denunciation of all imperialists.

> "No amount of special pleading", he wrote to the Japanese poet Yone Noguchi in 1938, can change the fact that in launching a ravenging war on Chinese humanity, with all the deadly methods learnt from the West, Japan is infringing every moral principle on which civilisation is based...

The rise of fascism he felt, signed the 'Crisis in Civilisation' and made him, old and ailing as he was, rise to his noblest stature as the world's greteast champion of humanism.

> 'Japan was quietly devouring North China'... 'we have also witnessed the destruction of the Spanish Republic. On the other hand, we also noted with admiration how a band of valiant Englishmen laid down their lives for Spain.'

His poetry broke into passionate denunciation of the 'poisonous breath that the serpents (of facism and imperialism) breathed in every direction', and he swore to curse them, even with the last breath, the aggressors and oppressors of humanity. He knew that Buddhas temples and churches were sanctioning the violation of their Masters' message of peace and friendliness sand declared on his 78th birthday :

> 'I will declare before I depart : the foolish gambling and profanity of the monstrous gang will never be a lasting chapter in history.'

Humanism

Tagore's faith in Man burnt brighter as he saw the Soviet experiment in 1930. A new civilisation was being born. He wrote in his *Letters from Russia :*

> 'Without the least discrimination they are awakening all humanity from top to toe.' 'In Russia they are endeavouring to solve this problem (exploitation) at its roots.'

He recalled how the Soviet proposal for complete disarmament had been rejected in the League of Nations ; for imperialists out for aggression, he felt, would never disarm. Tagore was assured to note in USSR :

> Here are the peoples of at least one country in the present day world who think the interests of all peoples over and above that of their own. No one can say if it will last. But the problems of a nation is a part of the problems of humanity taken as a whole, this is the message of this age. This has to be accepted. (*Letter No.* 3).

And the final message of Rabindranath Tagore, delivered on his birthday in 1941, when he read out the famous paper, *Crisis in Civilisation* was an avowal of his faith in Man.

'There comes Man the Great'—he proclaimed. And such is the Testament of Hope and Humanism Tagore has left for all his successors.

—

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব উপলক্ষে
প্রচারিত আবেদনপত্র

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব ভারতীয় সমিতি

এবার পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মের শত বৎসরে আমরা প্রবেশ করেছি। মানুষের ভবিষ্যতে যাঁরা আস্থা রাখেন তাঁদের সকলের পক্ষেই কবির এই জন্মশতাব্দ-পূর্তি এক মহোৎসবের দিন। আগামী বৎসর দেশে ও বিদেশে বহু সাংস্কৃতিক ও মানবকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই সে উৎসব নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযোগ্যরূপে পালন করবেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করেই আমরা স্মরণ করি ১৯৬১ সন জুড়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে কবির জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্বশান্তি সংসদের উদাত্ত আহ্বানের কথা। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যে মহাজাতীয় এই উৎসবে সর্বত্রই যোগদান ও সর্ববিধ সহায়তা করবেন এ বিশ্বাস আমরা রাখি। দেশবিদেশের এই বিচিত্র আয়োজনের মধ্য দিয়েই দেখা দেবে উৎসবের সম্পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হিসাবে আমাদের উপরে এ ব্যাপারে যে বিপুল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে আমরা তা যথাসাধ্য পালনের সংকল্প করেছি।

কবির অভিপ্রেত পন্থায় ভারতের জাতীয় ধারা অনুযায়ী জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনই আমরা সঙ্গত মনে করি। বাঙলা দেশে কবিপূজার স্বদেশীয় ঐতিহ্য—মেলা। প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর ধরে বীরভূমের কেঁদুলি গ্রামে এইভাবে জয়দেবের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মেলায় দেশের সাধারণ মানুষ আপনা থেকেই যোগদান করে, শিল্পীরা নিজেদের শিল্পসাধনার

বিচিত্র সম্ভার উপস্থিত করেন, দেশের বাস্তব ও মানসিক সকল সম্পদের আদান প্রদান সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই ঘটে থাকে। দেশের এই সচ্ছন্দ ও সার্বজনীন উৎসব পদ্ধতি ছিল রবীন্দ্রনাথেরও একান্ত অভিপ্রেত। আমরা তাই রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এক রবীন্দ্রমেলার আয়োজন করতে চাই। সেখানে চিরাচরিত নিয়মে ভারতের সকল রাজ্যের, সকল জাতির সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ নিজ নিজ সংস্কৃতির সচ্ছন্দ আদান প্রদানের জন্য সমবেত হবেন ; আর শান্তি, মৈত্রী ও প্রগতির এই মহাসমাবেশে বিশ্বমনস্বীরাও সম্মেলিত হবেন এ দেশের জ্ঞানী-গুণী, কর্মী ও জনসাধারণের সঙ্গে। আমাদের লক্ষ্য দেশ ও বিদেশের মানুষের সামনে ভারতীয় মহাজাতিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় স্থাপন, আর ভারতীয় ও বিশ্বমনস্বীদের সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণের পরিচয় সাধন।

এই উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক ঐক্য, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানবিকতা বিষয়ক নির্বাচিত রচনাসমূহের এবং শতবার্ষিকীর অর্ঘ্য হিসাবে বিশ্বমনস্বীবর্গের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, গান, চিত্র প্রভৃতির দু'টি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করেছি। সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় সংকলনটির ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি সংসদ রচনাদি সংগ্রহ ও অনুবাদের দুরূহ কাজে সহায়তার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করেছেন। আমাদের পক্ষে বিদেশীয় চিন্তানায়কদের সঙ্গে পরিচয়ের প্রধান বাহন ইংরেজি ভাষা—এজন্য পরিকল্পিত সংকলন গ্রন্থ দু-টি আমরা ইংরেজি ভাষাতেই পরিবেশনের সিদ্ধান্ত করেছি।

শুধু সাময়িক উৎসব নয়, রবীন্দ্র সংস্কৃতি চর্চা ও মানবমৈত্রী প্রতিষ্ঠাকল্পে অন্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ব্যবস্থা সম্ভবপর কিনা তাও নিশ্চয়ই বিবেচ্য। দেশবাসীর পরামর্শ অনুযায়ী ও আমাদের সাধ্যমত তেমন উদ্যোগের কথাও আমরা যথাসময়ে বিবেচনা করব।

আমাদের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব বাঙলা দেশের সহরে ও গ্রামে ভারতের সকল রাজ্যে উদ্‌যাপিত হবে—তাদের যথাসাধ্য সাহায্যদানও আমাদের বিশেষ কর্তব্য। দেশের ও বিদেশের বহুবিচিত্র এই বিপুল আয়োজন কবির প্রতি শ্রদ্ধায় ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ঐক্যসূত্রে সংহত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করুক, দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় তা সম্ভবপর করুক—এই আমাদের কামনা।

এই বিরাট কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব, ভারতীয় সমিতি' নামে একটি সর্বভারতীয় সমিতি (দপ্তরের

ঠিকানা: ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা ১৯, ফোন—৪৪-৫১৫১) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমাদের বিশেষ নিবেদন—আমাদের সংকল্পকে সার্থক করার জন্য দেশের সমস্ত লেখক, শিল্পী, রবীন্দ্র অনুরাগী—প্রত্যেকটি মানুষ অগ্রসর হয়ে আসুন, উৎসব সমিতিতে যোগদান করুন, অর্থে, কর্মোদ্যোগে, সুপরামর্শে, আপন আপন দানে ও রচনায় এই সংকল্পকে রূপায়িত করুন, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সকল রকমে সফল ও সম্পূর্ণ করে তুলুন। ইতি—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭
কলিকাতা

মৈত্রেয়ী দেবী
গোপাল হালদার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

—

রবীন্দ্রনাথের মানবতা

'আমরা রবীন্দ্রনাথের জাতি'—স্বদেশে ও বিদেশে এই আমাদের প্রধান পরিচয়। অন্ততঃ বাঙালির পরিচয় রবীন্দ্রনাথে। ভারতবাসী হিসাবে গান্ধীজীর নামেও নিশ্চয়ই আমাদের পরিচয়—কিন্তু তাও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নয়। আজ যখন দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন হচ্ছে তখন শুধু এ পরিচয় নয়। এ পরিচয়ের সম্পূর্ণ অর্থটাও আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ আমরা তো দেখছি—রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের নয়, সকল মানুষেরই আত্মীয়, তিনি মানুষের মুখপাত্র। আমাদের নিকট রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যে কারণে, শুধু সেই কারণে তো তিনি —পৃথিবীর কেন—ভারতেরও বহু জাতির আত্মীয় হয়ে উঠতে পারতেন না। আমরা জানি, প্রধানত তিনি কবি—অসামান্য কবি। এবং কবিতাকার বলেই কবি নন, 'স্রষ্টা' অর্থেই তিনি কবি। এমন সৃষ্টি-প্রতিভা নিয়ে খুব বেশি লোক আর পৃথিবীতে আসেন নি। আর সে সৃষ্টিও বিচিত্র, বহুমুখী ;— এমন কি, যুগ-চেতনা পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। এই কারণে পৃথিবীতে তাঁর প্রকাশ মানুষেরই মহৎ আত্মপ্রকাশের স্বাক্ষর। এবং সেই হিসাবে তাঁর কবিতায়ও মানুষের পরিচয় প্রকাশিত - যেমন প্রকাশিত প্রত্যেক মহৎ স্রষ্টার সৃষ্টিতে।

মহৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশ-কালের গণ্ডি প্রায়ই ভেঙে পড়ে বা গৌণ হয়ে যায়। গল্প, উপন্যাস এবং নাটক ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়ে বিদেশীয়দের নিকট মূলের প্রাণ-সম্পদ প্রায়ই পৌঁছে দিতে পারে। খণ্ড কবিতার বেলা কিন্তু তা সহজ সাধ্য নয়, কবিতার সঙ্গীত ও ইঙ্গিত ভাষান্তরে পৌঁছানো প্রায়ই দুঃসাধ্য। অন্তত ভাষান্তরিত হলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমৃদ্ধি যে ক্ষুণ্ণ হয়, তা যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, ও যাঁরা তা পাঠ করেন, উভয়পক্ষই সখেদে অনুভব করেন। ভারতীয় অন্য ভাষার পরিবেশনে হয়তো রবীন্দ্র-সাহিত্য অত বিপর্যস্ত হতো না ; কারণ, একই ভারতীয় জীবন ও চিন্তার সূত্রে আমরা সকলেই সমধর্মী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজি অনুবাদ থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্য অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাই এখনো ভাষান্তরিত হয় নি—নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় সেই কারণেও বাঙালি ব্যতীত অন্য ভাষীদের নিকট অসম্পূর্ণ। তথাপি তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আত্মীয় বলে চিনতে পারেন কি করে ?

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' পাঠে একদিন যারা পাশ্চাত্ত্য জগতে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন শুনেছি তাঁরা পরবর্তীকালে আর তত উচ্ছ্বাসত হয়ে ওঠেন নি। কবি ইয়েটস্-এর নাকি উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়েছিল ; এজরা পাউণ্ডের উত্তেজনা যে কোন খাতে চলে গেল, তা জেনেও লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিরের দোহাবলি ইংরেজিতে পরে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের এই সব পাশ্চাত্ত্য ভক্তরা তা পেলে তাঁদের সংশয় দেখা দিল গীতাঞ্জলির মরমীয়া রস সম্পদ অভিনব নয়, রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত নয়, তিনি একটা ভারতীয় ধারারই এ কালের ধারক ও বাহক মাত্র। মূলের সঙ্গীত ও নিসর্গানুভূতি ও রস-বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এতটা মোহভঙ্গও তাঁদের ঘটতনা। নোবেল পুরস্কার যে-সব রচনার জন্য প্রদত্ত হয়েছে সে-সব অনেক রচনা কালের ধোপে টেঁকে নি ; 'গীতাঞ্জলি' সেজন্য অনেক রচনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি' যে রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান নয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের তা আংশিক পরিচয় মাত্র, একথা আমরা বাঙালিরা সকলেই বুঝি। অতএব, পাশ্চাত্ত্য পৃথিবী যে রবীন্দ্র রস-লোকের তখন সন্ধান পেয়েছিল, এমন মনে হয় না, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁদের নিকট অস্পষ্ট ও অনুমান সাধ্যই এখনো থেকে গিয়েছে। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও নাটকও যে সত্যসত্যই পাশ্চাত্ত্য রসিক সমাজে কতটা গ্রাহ্য হয়েছে, তা বলা কঠিন।

ছোটগল্পের জন্যও রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন কিনা সন্দেহ—অথচ আমাদের বিবেচনায় তিনি সেই ক্ষেত্রে অতুলনীয় স্রষ্টা।

পৃথিবীর মানুষ তা হলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয় লাভ করেছে কী আশ্রয় করে? নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকেই, তবে সম্পূর্ণ তার রসাস্বাদন করে নয়, আর তথাকথিত 'ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের' জন্যও নয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা অধ্যাত্ম-রহস্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে নেই তা নয়; কিন্তু সে জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের যা মূল্য তা 'গীতাঞ্জলি' নিঃশেষে আদায় করে নিয়েছে। তারপরে রবীন্দ্রনাথের যে অধ্যাত্ম-দান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-মনস্বীদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে তা 'আধ্যাত্মিকতা' নয়—মানবিকতা বা হিউম্যানিজম। হয়তো প্রায় একই কালের দুটি কবিতা গ্রহণ করলে কথাটা পরিষ্কার হবে। যেমন, 'শেষ সপ্তকের' ২২ নং কবিতা বাংলা ১৩৩৯-এর লেখা

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

এ উপনিষদের আত্মবোধেরই কথা। পাশ্চাত্ত্য পাঠকের পক্ষে এ বোধ দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু তাতে সে পরিতৃপ্ত হয় না; কাব্যে সে যে অভিজ্ঞান খোঁজে মানবসত্যের বা জীবন-সত্যের, যে পরিচয় কামনা করে তা পায় না। অপর পক্ষে ধরা যাক, 'আফ্রিকা' ('পত্রপুট', ১৬ নং ১৩৪৩-এর লেখা)—রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মানবীয় রূপ—২৩ বৎসর পরেও আজ যার তাৎপর্য অম্লান। অবশ্য

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষ কাল ঝঞ্ঝা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস

আর তেমন নয়, এ কবিতার শেষ স্তবকও আফ্রিকাবাসীকেও সর্বত্র পরিতৃপ্ত করে না দেখেছি:

এস যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, ক্ষমা করো,—

হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

তাশখন্দ-এ দেখেছি—আফ্রিকার কবিকন্যা মিসেস সাদারল্যাণ্ড দৃঢ়কণ্ঠে এই কবিতা-পাঠে আপত্তি করলেন (হয়তো সে পক্ষে দুটি অন্য কারণও থাকতে পারে: আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রয়াস সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যিক-নেতৃত্বের তাশখন্দ-এ ঔদাসীন্য; এবং ইংরেজি অনুবাদের সাধারণ ত্রুটি)। 'মানহারা মানবী' এবং দুর্বলা বললে আফ্রিকা ক্ষুব্ধ হয়, আর কোনো কবির ক্ষমা-প্রার্থনাতে সে ধন্য হচ্ছে,—নিজের অর্জিত শক্তি বলে নয়,—একথা ভাবতেও আফ্রিকা অস্বীকৃত। এ কথা জেনেও এ কবিতাটিই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। কারণ এ হচ্ছে কবি ও কবিতাটি সম্বন্ধে আফ্রিকার সেই পাঠকের সাময়িক ভ্রান্তি—কবিতাটির যথার্থ মহিমা তার সম্পূর্ণ অনুভূত হয় নি—না হলে এ কবিতার মহিমা (ইংরেজি অনুবাদেও) প্রায় সর্বস্বীকৃত। কারণ, কবিতাটি মানবতায় সমৃদ্ধ; একালের মানুষের অনুভূতিতে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ও বিশ্বমানবের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নিয়েছে। 'আফ্রিকা' কবিতার এই মানবতাই শিল্প ও সাহিত্যের স্বীকৃত অধ্যাত্ম-সত্য—জীবনের অধ্যাত্ম-চেতনায় সমুজ্জ্বল।

এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী সমাদর; মানবতার এই মহৎ আবেদনের জন্যই তিনি বিশ্বের আত্মীয়। মানুষের ইতিহাসে এই মানবতা বোধ আজ প্রধান মূল্যবোধ রূপে দেখা দিয়েছে; আর, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তার প্রতিফলনও সুস্পষ্ট—এমনকি, স্পষ্ট থেকে তা ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পী-জীবনের পরিণতির সঙ্গে, বিশেষ করে শেষের দশ বৎসরের সভ্যতার সংকটের কালে, তাঁর পরিণত জীবন-বোধের এবং অধ্যাত্ম-বোধের বিশিষ্ট বিকাশে।

কথাটার অবশ্য আলোচনা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অবশ্য পূর্বেও আমি এ কথা আলোচনা করেছি—যে মানবতা-বোধ আজ আমরা স্পষ্ট অস্পষ্টরূপে একটা পরম মূল্যবোধ বলে অনুভব করি, তা-ও ইতিহাসের পরিণতির ফল। মানুষ যখন থেকে নিজেকে মানুষ বলে জেনেছে তখন থেকেই অবশ্য এক ধরনের মানবতা-বোধও তার জন্মেছে। কিন্তু কথাটা তা নয়। একথা আমরা সবাই জানি—পাশ্চাত্ত্য দেশে রিনাইসেন্সের

সময় থেকেই যে-সব চিন্তা ও কর্ম-প্রবাহ চলে তার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় মানুষ ও তার মর্ত্য জীবন—তার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের ভাবনা ছিল, সহজ কথায়, মুখ্যত ভগবৎ-কেন্দ্রিত, পরলোকোদ্দিষ্ট। রিনাইসেন্স থেকে তা হয়ে উঠল মানব-কেন্দ্রিত, ঐহিক-ভিত্তিক। প্রাচীন পৃথিবীতে মানুষের মূল্যবোধ সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিলেন বরং গ্রীকরা; আমরা ভারতীয়রাও অবশ্য দেবতাকে মানব করেছি আর মানবকে এখনো দেবতা করি—কিন্তু তা করি পারমার্থিক চেতনায়, মর্ত্য মমতায় নয়। বড় জোর তা করি মানবাত্মাকে পরমাত্মার বিগ্রহ জেনে, মানবলীলাকে দেবলীলার আধার বোধে। মহিমাটা প্রধানত দেবতার, লক্ষ্যটাও মূলত পারত্রিক। কিন্তু গ্রীক-মানবতাবাদ বা হেলেনিক হিউম্যানিজম মর্ত্য জীবনকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে, মানুষকেও আপনার মহিমায় অভিনন্দিত করেছে। তথাপি রিনাইসেন্সের পরেই মর্ত্য-মানব মানব-সাধনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইরের ব্যবহারিক পৃথিবী তারপর ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে **Rights of Man**-এর ধারণায় রূপায়িত হতে থাকে। ব্যক্তি-সত্তার মহিমা, প্রতি-মানুষের সমাধিকার, এবং বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব (**Liberty, Equality Fraternity**) তখন থেকে জীবন-দর্শনের অঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল। তখন পূর্বেকার পরমার্থ-বোধের সঙ্গে এই মানবতা-বোধও অধ্যাত্মবোধের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষ অধ্যাত্ম-বোধ বলতে আজ এই মানবতা-বোধকে আর বাদ দিতে পারে না। নিজ-নিজ প্রবণতা অনুযায়ী কোনো কোনো গোষ্ঠী মনে করে তাই একমাত্র অধ্যাত্ম-সত্য। অন্য গোষ্ঠী মনে করে পরমার্থিক অধ্যাত্ম-চেতনারও তাই প্রামাণ্য আশ্রয়। ভারতবর্ষের ভাষায় এখনো অধ্যাত্ম-বাদ বলতেই পারমার্থিক সাধনা ও অতীন্দ্রিয় ভাবনা বোঝায়। তবে ভারতবর্ষের ভাবনায় ও এখন আর অধ্যাত্ম-বাদকে সর্বদাই জীবন-বিমুখী—মর্ত্য-মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন—অতীন্দ্রিয় কোনো দর্শন ও সাধনা বোঝায় না। অধ্যাত্ম শব্দটার অর্থ (**semantic**) পরিবর্তিত হবে কিনা জানি না, কিন্তু ভাবনায় নতুন বোধ এসে পৌঁছেছে—স্পষ্ট থেকে তা স্পষ্টতর হয়েও উঠেছে—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও আমরা তার প্রমাণ পাই। আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের থেকে সেই বোধ আবার আমাদের ভাবনায়ও সংক্রামিত হচ্ছে। যে যুগ-চেতনা কবির মধ্যে প্রকাশিত, কবিই আবার সেই যুগ-চেতনাকে তাঁর সৃষ্টিতে রূপায়িত করে আমাদের ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করে তুলছেন—

যে জন্য তাঁকে যুগ-চেতনার স্রষ্টা বলে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমাদের সনাতনী অধ্যাত্ম-বোধকেও তিনি সম্মার্জিত করে মানব-কেন্দ্রিক করতে সহায়তা করেছেন আর আমাদের তথাকথিত অধ্যাত্মবাদকেও তিনি 'মানুষের ধর্ম'রূপে নবায়িত করতে প্রবুদ্ধ হয়েছেন।

সমস্ত রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে মানবতার এই ক্রম-পরিণতির ধারা আমরা লক্ষ না করলে বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র-স্বীকৃতির কারণ সহজে বুঝতে পারি না, এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল তাৎপর্যও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হই। মানুষ রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রেও উপনিষদের সাধনা-ধারায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু কবির সাধনা অরূপ-উপলব্ধির সাধনা নয়, তাই রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধিতে তিনি এ সমস্যার প্রথমত সমাধান খুঁজেছেন—উপনিষদের অপেক্ষাও এদিকে বৈষ্ণব লীলাবাদই হয়তো প্রশস্ত পথ হতো। কিন্তু কোনো বাদকে একান্ত করে আশ্রয় করা ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরোধী। সুদীর্ঘ জীবনে তবু তিনি উপনিষদ-এর আশ্রয় ত্যাগ করেন নি। অথচ তার অধ্যাত্মবাদ পরমার্থ-প্রয়াসী হলেও কবিধর্মের নিয়মেই মূলত ছিল জীবনাশ্রয়ী—জীবন-রসের রসে তা প্রথমাবধি অভিষিক্ত। সেই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' থেকে শুরু করে রূপনারায়ণের কূলের এই ঘোষণা পর্যন্ত, 'এ জীবন স্বপ্ন নয়', 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে 'ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে' পর্যন্ত বিচিত্র কাব্যধারায় যে সূত্রটি লক্ষ্য করা যায়—তা তার গল্প, উপন্যাস বা সামাজিক-দার্শনিক কোনো ভাবনাধারা থেকেই বিচ্ছিন্ন নয় সে সব ক্ষেত্রে যা সুস্পষ্ট তার অন্তর্মুখিতা প্রধান কবিতার ক্ষেত্রেও তাই অনুসৃত। এই সূত্রটি সহজ ভাষায় মূলত রসমুগ্ধ জীবন-মুখিতা থেকে সুদৃঢ় মানব-সত্যের দিকেই ক্রমশ প্রসারিত হয়ে গিয়েছে- এ সত্যই লক্ষণীয়। এবং এই জন্যই বিশ্ব-মানবের কাছে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মূল্য, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষ বিবর্তন এক-আধটি প্রবন্ধের বিষয় নয়। আর এই মানবতা-বোধও একটি গ্রন্থিহীন ভাবনা বা কাব্য-সাধনারও একটানা প্রসার নয়, তা বলাই বাহুল্য। এরূপ অতি-সরলীকৃত সূত্রকারে রবীন্দ্র-প্রতিভার 'স্বরূপ-নির্ণয়'ও বিভ্রান্তির। কারণ সেই প্রতিভার প্রধান অপ্রধান আরও বহু লক্ষণ আছে, তা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়। সে সবকে যথার্থ স্বীকৃতি দিলেই বরং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়—রবীন্দ্র-প্রতিভার মর্মবাণী আধুনিক

মানবতা। যেমন, প্রথম একটি রবীন্দ্র-প্রত্যয়—সুষমাবোধ (harmony), বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দু-এর ক্ষেত্রেই দুয়েকে নিয়েই, এই সুষমা সৃষ্টি হয় 'দ্বন্দ্বের দুঃখে', 'বিপ্লবের আলোড়নে', 'বিপরীতের বিরোধে'; এমনকি, 'সভ্যতার সংকটে'র মধ্যেও তারই আয়োজন। দ্বিতীয়ত, কোনো স্তরে সুষমাই চূড়ান্ত নয়, কারণ চিরচঞ্চলের মধ্যে অচঞ্চল সত্য যা তারও প্রকাশ গতিতেই (dynamism)। অথচ গতি অর্থ শুধু পরিবর্তনশীলতা নয়, তা সৃষ্টিশীলতাও—সৃষ্টিধর্মী সুষমায় (creative unity) তার পরিচয়।

অন্যদিকে দেখি এই সৃষ্টির তাগিদ মানুষের মধ্য দিয়েই সচেতন হয়ে উঠেছে—এইখানেই মানুষের মহিমা। রবীন্দ্র-চিন্তায় অবশ্য এই সৃষ্টিকর্মের উৎস বা আশ্রয় হল ব্যক্তিসত্তা (Personality), আর মানবতাও তাই ব্যক্তিসত্তাশ্রয় মানবতা ('personalitic humanism')। তিনি ব্যক্তি-সত্তার কবি। অন্তর্মুখী কবিপ্রকৃতির পক্ষে এ বোধও স্বাভাবিক ও অত্যাজ্য। 'মানুষের ধর্ম' পর্যন্ত তা তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু ক্রমেই যে মানবসত্যের অনুভূতিতে ব্যক্তি-প্রশস্তি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে তা বিশ্বমানবের সৃষ্টি-স্বরূপের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে—তার পরিচয় দেখি 'ওরা কাজ করে'র মতো কবিতায়, 'ঐ মহামানব আসে'র মতো অভয়-বাণীতে। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তাই মানবতার অর্থ এই সৃষ্টিশীল মানবতা (creative humanism)—যা আপনার সৃষ্টি-নিয়মে আপনাকে বিকশিত করে চলছে। 'জীবনদেবতা'র ভাবতন্ময়তা কোথায় এসে পৌঁছেছে জন্মদিনের এই নমস্কারে—সহানুভূতির এই আন্তরিকতায় ও সততায়:

> আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
> আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি…
> আমার কবিত জানি আমি
> গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
> কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি—
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

'সর্বত্রগামী' না হলেও তাঁর কবিতা সর্বকালগামী এজন্যই—এই মানব-প্রত্যয় মানব-অভীপ্সার জন্য।

রসানুভূতি, রূপ-বিশ্লেষণ প্রভৃতি সাহিত্য-বিচারের রীতিনিয়ম দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়ন নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু সে প্রতিভার মর্মমূল কোথায়, তার তাৎপর্যই বা কী, এ জিজ্ঞাসা তো বাদ দেওয়া যায় না। তা হলে, বুঝতে হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবতার রূপ ও বিকাশের কথা। আমি তার সামান্য ইঙ্গিতই মাত্র উপস্থিত করলাম এই রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর পূর্বক্ষণে।

কয়েকটি বক্তৃতা

বিধান পরিষদ

১. *শিক্ষা প্রসঙ্গে*

১৩ই জুন, ১৯৫৮

শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট আগ্রহশীল, এটাই অন্তত তাঁর গত ২৫।৩০ বছরের পরিচয়। এইরূপেই তাঁকে আমরা জানি। কিন্তু এখানে শিক্ষা বিষয়ে অভিযোগ যখনই আসে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যেমন কোনো প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার তাঁর নায়েবদের পরিচালনা করেন, কিন্তু নায়েবের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শুনতে পারেন না, ঠিক তেমনি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিভাগ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ শুনতে রাজি নন।...আপনার মারফত, সভাপতি মহাশয়, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে বলব, তিনি যে-সমস্ত তথ্য আমাদের পরিবেশন করেন সে সমস্ত তথ্যের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি না। গত অধিবেশনে আমি আপনার মারফত শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে সরকারি রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম যে, তিনি শিক্ষাবৃদ্ধির যে-হিসাব দেন আর ভারতসরকারের যে-সমস্ত কাগজপত্র আছে তা থেকে যে হিসাব পাই, তাতে দেখতে পাই ভারত-সরকারের প্রকাশিত কাগজপত্রে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যয়ের অঙ্ক শিক্ষামন্ত্রী প্রদত্ত হিসাবের চেয়ে অনেক কম। কাজেই হিসাবের যে কারচুপি আছে, হিসাবে যে গোলমাল থাকে, তাতে সন্দেহ নাই। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়দের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে আমরা কোনো আস্থা রাখি না। আমাকে পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করতে হয়, বিদেশীদের সঙ্গেও এসব অঙ্ক নিয়ে কথা বলতে হয়। দুর্ভাগ্যের কথা বলতে হয়, ভারতবর্ষের সরকার পক্ষ যে-পরিসংখ্যান দেন তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বিদেশীদের দিতে পারি না। সরকারের দেওয়া একই কালের পরিসংখ্যানে আজকের পরিসংখ্যানের সঙ্গে কালকের পরিসংখ্যানের মিল নেই, এটা কেন হয় কোনোভাবেই বোধগম্য হয় না। তাছাড়া পরিসংখ্যান যেভাবে সংগ্রহ করা হয় ও পরিবেশন করা হয় তা আমি জানি। কারণ, পরিসংখ্যান বিভাগে ছাত্রস্থানীয় ও মিত্রস্থানীয় অনেকে আছেন।...

আমি প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আজ না বলে শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বলব। এটা গঠনমূলক আলোচনা হবে কিনা তা জানি না। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন—অনেক বৎসর আগে থেকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৬ লক্ষ টাকা স্ট্যাটুটরি গ্র্যান্ট দেওয়া হচ্ছে। তারপর ম্যাট্রিকুলেশন হস্তান্তরিত হওয়ায় ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা বাড়িয়েছেন। কিন্তু যে-কালে ঐ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় সেকালে ৩০ হাজারের বেশি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত না। কিন্তু আজকে ৮৭ হাজার ছাত্র পড়ছে, এই ছাত্রবৃদ্ধির কথা বিবেচনা করবেন।

সরকারি হিসাবমতোই দশটা আর্টস কলেজ পরিচালনা করতে বৎসরে ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ৮৬ হাজার ছাত্র—তাদের জন্য তাঁরা মাত্র ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন, এটা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। মন্ত্রীমহাশয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অনেকদিন ধরে সম্পর্ক রয়েছে, তিনি এসব জানেন। বিশেষ করে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগে পৌনঃপুনিক খরচ এত বেড়ে গেছে যে, গ্র্যান্ট না বাড়ালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেই সব রেকারিং খরচ কুলানো কিছুতেই সম্ভব হবে না। এছাড়া ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের প্রতিশ্রুত অনেক টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য আছে। সে টাকার জন্য সারাহারিভাবে পশ্চিমবাংলা থেকে সাহায্য দেবার প্রশ্নে সরকার 'হাঁ'-ও বলেন না, 'না'-ও বলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় এখনো জানেন না কোন টাকা সত্যই তাঁরা পাবেন, কোন টাকা পাবেন না।···

আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে যে, মন্ত্রীমহাশয় নিজে ২৮শে মার্চ তারিখে বলেছেন যে প্রাইভেট কলেজগুলির অধ্যাপকদের বেতনের পর্যায় বা 'গ্রেড' ভাগ করেছেন। কিন্তু সে বেতন তাঁরা কবে পাবেন? মার্চ মাসেও তা দেওয়া সম্ভব হয় নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের কথা মতো সেই প্রাপ্য টাকা সম্প্রতি ৭৭টি কলেজকে দেবেন বলেছেন। কিন্তু কাল পর্যন্ত সে টাকা পৌঁছোয় নি—এখবর জানি। যেসব তথ্য সরকার জানতে চেয়েছিলেন তার সমস্তগুলোই বিশ্ববিদ্যালয় পাঠিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কালকেও আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা যে টাকা পাননি তাতে শুধুমাত্র আমলাতন্ত্রের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু আছে কিনা তা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে পারেন না।···সমস্ত শিক্ষা ব্যাপারের মধ্যে যা ঘটছে তাতে আমরা শিক্ষার ব্যাপারে কোনো নীতির পরিচয় পাচ্ছি না। মন্ত্রীমহাশয়রা সামগ্রিক

ভাবে শিক্ষা ব্যাপারে আলোচনা করছেন না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনা করা দূরের কথা, যাঁরা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের সঙ্গেও আলোচনা করছেন না।···আপনারা জনসাধারণের উন্নয়ন ও সংস্কৃতির জন্য কী করেছেন জানি না—গঠনমূলক কাজ ও টেকনিক্যাল এড়ুকেশনের কতটুকু উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন, ফ্যাক্টরি ট্রেনিং-এর মধ্য দিয়ে সেরকম করা যায় কিনা, টেকনিক্যাল ট্রেনিং চলতে পারে কিনা—সেরকম কিছু করবেন কিনা- এসব কিছুই জানি না। তাছাড়া যেরকম কাজের দ্বারা শিক্ষার প্রসার হয়, সায়েন্টিফিক এড়ুকেশন সুবিস্তৃত হয়, আজ পর্যন্ত সে রকম কাজেরও পরিচয় পাই নি। টাকা ব্যয় করছেন, টাকা অনেক কাজেই ব্যয় হচ্ছে, ইট কাঠ চুণ সুরকিতে জমিদারের পুরানো বাড়ি ক্রয় করে সরকার টাকা ব্যয় করেন। সেভাবেই টাকা ব্যয় করলে যদি শিক্ষার উন্নতি হয় তাহলে বলব সেভাবেই আপনাদের শিক্ষানীতি চলছে। এর বেশি অন্যরূপ শিক্ষানীতি দেশবাসী দেখতে পাচ্ছে না।

২. *রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে*

২রা জুলাই, ১৯৫৮

কংগ্রেস-উত্থাপিত সর্বসম্মত সংশোধনী

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমরা এই প্রস্তাব আলোচনা করতে অগ্রসর হচ্ছি। আনন্দের এখন কারণ এই যে, আপনার মতন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবৈজ্ঞানিক এই সভা পরিচালনা করছেন। ভারতবর্ষের অন্য কোনো আইনসভায় এই সৌভাগ্য হবে না। আনন্দের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, এই প্রস্তাবটা কংগ্রেসপক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। এবং এতে বাংলাদেশের কংগ্রেস সদস্যদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে এবং তাঁদের নূতন ভাবে চিন্তা করার শক্তি উদ্রেক হয়েছে বলে আমি মনে করি, তার জন্য আমি আরও আনন্দিত। আমি বিশেষ করে অভিনন্দন জানাই এই প্রস্তাব যিনি উত্থাপন করেছেন সেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল সিংহকে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা সকলেই একমত। এই আলোচনা নিম্ন আইনসভায় যেভাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে সেইভাবে আমরাও আজকে সর্বসম্মতিক্রমে

একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারব, এটাও আশা করি। যিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাঁরও সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এতটা মিল থাকাতে আমি আবেদন করব আমাদের যতটুকু সংশোধনী আছে সেটুকু গ্রহণ করতে পারেন কিনা সেই কথাও একবার তিনি যেন বিবেচনা করে দেখেন।

প্রথমত, এটা খুব আনন্দের কথা যে একটা কথা তাঁরা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন—সকল বাঙালিই প্রায় স্পষ্টত তা স্বীকার করেন। আপনি জানেন, সভাপতি মহাশয়, সংবিধানে ৭৩ বনাম ৭২ ভোটে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, দেবনাগরীতে লেখা হিন্দী ভারতবর্ষে কেন্দ্রের ভাষা হবে। সেই প্রস্তাবটা একটা ভ্রান্ত রাজনীতিপ্রসূত, সেটা সুচিন্তা-প্রসূত নয়। দ্বিতীয়ত, সেই ভ্রান্ত রাজনীতিকে অবলম্বন করে ভাষা কমিশন যেভাবে আজকে অগ্রসর হয়েছেন তাতে মনে হয় সে ভ্রান্তি শুধু বাড়ে নি, সে ভ্রান্তিকে আজকে বিপর্যয়ে পরিণত করার উদ্যোগ হয়েছে। আমাদের বন্ধুরা এ বিষয়ে যখন নূতন করে ভাবতে চেষ্টা করছেন তখন আমি বিশেষ আনন্দিত।

সভাপতি মহাশয়, আপনি জানেন যে, আপনার উপদেশ অনুসারে আমরা বহুকাল যাবৎ এ বিষয়ে আলোচনা করে আসছি, কাজেই এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে—দশ মিনিটের মধ্যে—আপনার কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছি সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—এ বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। কাজেই সম্ভব হলে আপনাকে আরো ২।৪ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিতে বলব। ফলে অন্য কারো আলোচনা যাতে সংক্ষিপ্ত না করতে হয় তার জন্য আমি নিজের আলোচনাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করব।

এখন, প্রথমে ভাবা দরকার যে ভাষা কমিশন বলেছিলেন, প্রশ্নটা শুধুমাত্র হিন্দী বনাম ইংরাজি প্রশ্ন নয়, এবং হিন্দী বনাম ভারতবর্ষের অন্য ভাষার প্রশ্নও নয়। আমাদের অনেক তামিল বন্ধু, বিশেষভাবে জ্ঞানী লোক তাঁরা, এখন যা করছেন, ইংরেজি এবং হিন্দী বনাম ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার প্রশ্ন, সত্যই তাও নয়। প্রশ্নটা, প্রস্তাবক যা বলেছেন, সত্যই তা-ই। প্রধানত এ হচ্ছে ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন; এবং বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে ভারতের বহু বৎসরের সাধনা—চিরদিনকার সাধনাও বলতে পারি—আবিষ্কার করা ও প্রয়োগ করার প্রশ্ন। সেদিক থেকে এ প্রশ্ন হচ্ছে আসলে

ভারতবর্ষের সকল ভাষা যাতে বিচিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হয় তার প্রশ্ন। সেদিক থেকে কোনো ভাষাকেই আমরা অন্য কোনো ভাষার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে দিতে পারি না, কোন ভাষাকে অন্য কোনো ভাষা থেকে ক্ষুদ্র বলে মনে করতে পারি না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি ভাবে রাষ্ট্রভাষা ঠিক হবে, তার প্রশ্ন। একথাটার ওপর আমাদের প্রস্তাবক বন্ধু ততটা গুরুত্ব আরোপ করতে চান নি। এই প্রস্তাবের সঙ্গে একটা প্রশ্ন ওঠে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজ্যভাষা কি পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত হবে। প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজভাষা জনগণের ভাষা হবে, দু-চারজনের ভাষা তা হতে পারে না। যাঁরা আজকে আধুনিক রাষ্ট্রের স্বরূপ জানেন, তাঁরা জানেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত দিকেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাসাধারণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, প্রজাসাধারণের ওপর নির্ভরই করে। প্রজাসাধারণ রাষ্ট্রের কাজে সর্বদাই যোগদান করে। আমাদের এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা তো সর্বদাই বলি, প্রজাসাধারণ উদ্যোগী হোন, কাজে অগ্রসর হোন। এই রাজ্যে প্রজাসাধারণই **Sovereign,** চরম কর্তা, আমরা একথা বলি। অর্থাৎ প্রজাই রাজা। তাই যদি হয় তাহলে রাজ্যের রাজ্যভাষা হবে প্রজার ভাষা, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

এখন প্রশ্ন উঠবে রাজ্যের রাজভাষা যখন প্রজার ভাষা, তখন বহুভাষিক দেশে, বহুজাতিক দেশে কোন ভাষা সংঘরাষ্ট্রের রাজভাষা হবে। পশ্চিম-বাংলায় যে বাংলাভাষা রাজভাষা হবে, আসামে যে অসমীয়া রাজভাষা হবে, মহারাষ্ট্র দেশে যে মারাঠী রাজভাষা হবে, তামিলদেশে যে তামিল রাজভাষা হবে, উড়িষ্যায় যে ওড়িয়া রাজভাষা হবে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রে তাহলে আমরা কোন ভাষা প্রচলিত করব? আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে এরও উত্তর—বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য সে নীতিরই মধ্যে এর সমাধান পাব। ইংরাজ শাসনেও এই সমাধানের সূত্র স্বীকৃত রয়ে গিয়েছে। তাঁরা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে সমস্ত ভারতবর্ষের কাজকর্ম একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজি ভাষায় নির্বাহ করবার প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু কার্যত কি তাঁরা তা পেরেছেন? বিরাট ভারতবর্ষ শাসন করতে গিয়ে প্রত্যেকটি বড় আইন প্রত্যেকটি বড় হুকুম ইংরাজ শাসকদের বিবিধ ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। প্রজাসাধারণের ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা বলে কার্যত অনেকক্ষেত্রে তাঁদেরও স্বীকার করতে হয়েছে, যদিও দপ্তরের

ভাষা, সেরেস্তার ভাষা, 'এডমিনিস্ট্রেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ' বলে পণ্ডিত নেহেরু যাকে বলেছেন তা ছিল তখন ইংরেজি, তথাপি কার্যত ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলিকে তাঁদের মানতে হয়েছে। এই নীতি অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই, কেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বীকার্য হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষিক রাজ্য, ভারতবর্ষ বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং তাঁর প্রধান প্রধান ভাষাগুলিকে স্পষ্টত জাতীয় ভাষা—ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ—এই স্বীকৃতিদান করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এজন্যই আমি 'প্রয়োজন' বলতে বাধ্য হব, বিদেশে গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটির এবং 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' শব্দটির এমন অপপ্রয়োগ ঘটেছে যাতে বাঙালি এবং অন্যান্য ভাষাভাষীরা নিজেদের স্বভাষা বলতে গিয়ে বিদেশে বহুসময় অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন এবং বিদেশীরাও বলেছেন 'হিন্দীই তোমাদের ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ'। সেজন্য বিদেশীদের সামনে একথা পরিষ্কার করা দরকার যে, আমাদের ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে শুধু হিন্দী নয় অনেকগুলি ভাষা, যেগুলি অষ্টম সিডিউল-এ উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলি। এই প্রসঙ্গে আমি বলব আপনারা সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন কেন্দ্রের ভাষা কি, ১৩-১৪টি যা সিডিউল-এ আছে তাই হবে? সেখানে অতি পরিষ্কার আমার বক্তব্য, প্রথমত, আজকের দিনে কেন্দ্রকে এই ১৩-১৪টি ভাষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে হবে—যখন ইংরাজিতে কার্য পরিচালিত হচ্ছে তখনও। তারপর কোন পদ্ধতিতে কেন্দ্রের ভাষা ভবিষ্যতে নির্বাচিত হবে তা অনেকটা নির্ভর করবে এই পর্যায়ের পরে, যখন রাজ্যে-রাজ্যে প্রত্যেক ভাষা আপনার রাজ্যভাষারূপে স্বীকৃত হয়ে রাজকার্য নির্বাহিত করবে। সেই পর্যায়েই তখন আমরা দেখতে পাব, কোন ভাষা যোগ্য থেকে যোগ্যতর হয়ে উঠছে, কোন ভাষা যোগ্যতর থেকে যোগ্যতম হয়ে উঠছে। এরূপে রাজ্যভাষার ব্যাপারে নীচ থেকে ওপরে উঠে আমরা জানতে পারব কেন্দ্রের কোন ভাষা বিশেষ উপযোগিতা অর্জন করছে। তার পূর্বে উপর থেকে—

[লাল আলো জ্বলে উঠল]

সভাপতি মহাশয়, আপনি আলো দেখালে আজকে অন্তত আমার পক্ষে বক্তব্য বলা অসম্ভব, তাহলে আমাকে বসে পড়তে হয়। কারণ, আপনি জানেন, আপনার চরণতলে বসে আমি বারো বৎসর এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছি। সেই শিক্ষালাভ করে আমি পাঁচ বৎসর ধরে লেখনী চালনা করে

যাচ্ছি এবং সেজন্য আজকে নির্বাক হয়ে থাকতে পারব না। কি পদ্ধতিতে তাহলে কেন্দ্রের ভাষা স্থির হবে আমি পূর্বেই বলেছি। তার পদ্ধতি হবে—রাজ্য থেকে শুরু করে আমাদের নীচ থেকে ওপরে উঠতে হবে। প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যভাষাগুলি প্রবর্তিত হবার পরেই বোঝা যাবে কোন ভাষা যোগ্যতম হিসেবে কেন্দ্রে গৃহীত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাব যে গৃহীত হবার পূর্বে প্রত্যেকটি রাজ্যের লেজিসলেচার অর্থাৎ আইনসভার মধ্যে দিয়ে সেই প্রস্তাবের আলোচনা করে তবেই কেন্দ্রের ভাষা নির্ধারিত করা ঠিক হবে, এর পূর্বে নয়। কেন্দ্রীয় ভাষা ঠিক করার বিষয়ে এই দুইটি শর্তে আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ও একমত হবেন এবং তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলে ভালো হবে। তৃতীয়ত, আমি আর একটি কথা বলব, লেজিসলেচারের মতামত গ্রহণ করা সম্বন্ধে। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য যা বলেছেন—'সভার তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের মত হলে তবেই তা কেন্দ্রের ভাষা বলে গৃহীত হবে' আমি এটা সমর্থন করতে পারি না। কেন? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের এভাবে ব্যাহত করবার কোন অধিকার আমাদের আছে? আমরা যে ইংরাজিকে স্বাধীন হবার পরও গ্রহণ করেছি, এ কি আমরা আইনসভার তিন-চতুর্থাংশের মত নিয়ে করেছি? কিন্তু তার জায়গায় বা ইংরাজির সঙ্গে ভারতীয় কোনো ভাষাকে গ্রহণ করতে হলে কেন এই নিয়ম করতে হবে যে, আইনসভায় তিন-চতুর্থাংশের মত গ্রহণ করতে হবে! যেভাবে আমরা ইংরাজিকে গ্রহণ করিনি অন্য ভারতীয় ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, সেই অসম্ভব পদ্ধতি আমরা কেন গ্রহণ করব? ভারতীয় ভাষার এমন কি অপরাধ?

আমার আর-একটি কথা সংস্কৃত সম্বন্ধে। আপনারা যে বলেছেন আনুষ্ঠানিকভাবে একে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে গ্রহণ করার কথা তাতে আমরা রাজি আছি। কিন্তু তার বেশি করতে গেলে—যেমন শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক-শেখর সান্যাল মহাশয় বলেছেন—তাতে আমাদের আপত্তি আছে। হয়তো তিনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, অশোকের শাসনও সংস্কৃতের দ্বারা পরিচালিত হয় নি। অশোকের 'প্রাকৃত' ভাষা সংস্কৃত নয়। সভাপতি মহাশয়, আপনার কাছে যা শিক্ষা লাভ করেছি তাতে জানি সারা ভারতে অশোক-অনুশাসন এক প্রাকৃতেও লিখিত হয় নি, অঞ্চল বিশেষে যে প্রাকৃত চলত সে প্রাকৃত দ্বারাই অশোকের অনুশাসন

লিখিত হয়েছে। অতএব, অশোকের নাম করে সংস্কৃতকে ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না।

আমার শেষ কথা সময় অভাবের জন্য বলছি, হিন্দীকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও আমার বাংলাদেশের বন্ধুদের মনে করতে বলব, ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে হিন্দী প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, ভারতবর্ষের শিল্পবিস্তার প্রভৃতি নানা কার্য কারণের মধ্য দিয়ে, জনগণের যোগাযোগের ফলে নানা ভাবে যে ভাবে হিন্দী ভাষা অগ্রসর হয়ে চলেছে তাতে ভারতবর্ষের অধিকাংশের ভাষা না হোক, স্বাভাবিকভাবে হিন্দী বিস্তারই অধিক হচ্ছে। অন্তত অল্প কষ্ট করে সবচেয়ে বেশি লোক যে ভাষা শিখতে পারবে সেটাই ভবিষ্যৎ কালে সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় ভাষা হবার সম্ভাবনা।

শেষ কথা, লেজিশলেচারের সদস্যদের নিয়ে আমি একটি কমিটি করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কেননা আজকে বাংলা ভাষা যেভাবে রাজকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে আমরা উৎসাহিত বোধ করি না। বর্তমান গেজেটে-ও যত লাইন বাংলা লেখা আছে, যদি গেজেট এ ধারাতেই চলে, তাহলে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯ হাজার ৫৮ সাল হলেও বাংলায় বাংলাভাষা রাজকার্যে চালু হবে না। এজন্য আমি চাই, এখানকার লেজিসলেচারের যেন একটি কমিটি থাক যাঁরা এই ভাষা-নীতি-পরিচালনা দেখবার অধিকারী হন—এটাই আমার প্রস্তাবে বলেছি। শিক্ষা ব্যাপারে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বা শিক্ষাবিভাগের লোকেদের অধিকার থাকবে, এক্তিয়ার থাকবে, এটাও আমি স্বীকার করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার আছে, সভাপতি মহাশয়, আপনারও আছে। সেখানে বাংলা ভাষার প্রসার করতে গিয়ে আমাকে কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা বারান্তরে বলতে পারলে খুশি হব। এখানেও আমি বলতে বাধ্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে শিক্ষার ব্যাপার কিংবা উচ্চ-শিক্ষার ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত নই—সেখানেও লেজিসলেচারের সভ্যদের কিছুটা ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করি। আমার বক্তব্য শেষ করে বলব,—আমরা যেন সকলে একমত হয়ে বাংলাদেশের এই সভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি এবং সেজন্য চেষ্টা করি।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৬৪

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত কাউন্সিল একটা কমিটিতে সংগঠিত হবে এবং বিলটি আলোচনা করবে। আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করবার কারণ কি তা সংক্ষেপে আপনার সামনে বিবৃত করতে চাই।

সত্য কথা যেভাবে প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন এবং এখন যা অবস্থা তাতে ইংরাজি চালু করবার জন্য সময় বাড়ানো দরকার। এখন যে অবস্থা তাতে আরও কিছুকাল ইংরাজিকে রাজকার্যে চালু রাখতে হবে। এরূপ আমারও মনে হয়।

এখন যে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে সেই অবস্থা কি অনিবার্য ছিল? কিংবা বাংলাভাষা কি এতই নগণ্য এতই পশ্চাৎপদ ভাষা? পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষার তুলনায় পশ্চাৎপদ হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য কোন ভাষা থেকেও পশ্চাৎপদ? একি এমনই পশ্চাৎপদ যে এতে কাজ চলে না? এমন কি বাংলাদেশের রাজকার্যও বাংলা ভাষার দ্বারা করা যায় না? না, যাঁরা এই বিল কার্যে পরিণত করার ভার নিয়েছেন, সেই কর্তৃপক্ষ নানাভাবে মূল আইনকে কার্যে পরিণত করতে উদাসীন ছিলেন?

এ সমস্ত প্রশ্ন একটু ভাববার জন্য আজ আমার মনে হয় যে, সমস্ত কাউন্সিল একসঙ্গে বসা প্রয়োজন। আর আমার প্রস্তাবের তা-ই উদ্দেশ্য।

স্যার, আপনি জানেন মূল আইনটার একটা ইতিহাস আছে; সহজে সেই আইনটা পাশ হয় নি। বহুদিন পর্যন্ত বাংলাভাষায় কার্যপরিচালনা করা সম্বন্ধে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর খুব বেশি উৎসাহ দেখা যায় নি। সত্য বটে, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলায় রাজকার্য আরম্ভ করেছিলেন, এবং কিছু কিছু কাজও বাংলাভাষায় তখন সেক্রেটারিয়েটে করা হয়েছে। তারপর ডাঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে—আমি বলব নির্বাসিত হবার পরে—যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ডাঃ রায় এলেন, তখন থেকে বাংলার কাজকর্ম সেক্রেটারিয়েটে বন্ধ হয়ে গেল। এবং, যতবার বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা করা গিয়েছে, ততবারই দেখা গিয়েছে বাংলাকে রাজ্যভাষা করা সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের নিজের, অথবা তাঁর দলভুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর, বিশেষ রকম ঔদাসীন্য ছিল—এমনকি আপত্তিও ছিল।

আমরা জানি সাধারণ বাঙালি, ভারত মন্ত্রীমণ্ডলীর অধিকাংশ বাঙ্গালিই যখন অন্তত সেই মনোভাবাপন্ন, তাঁদের বাংলার প্রবর্তন সম্বন্ধে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ডাঃ রায়ের নিজের কোনো উৎসাহ এ ব্যাপারে ছিল না। আর, আমাদের এই কর্তাভজা দেশে যদি কর্তার উৎসাহ না থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের বা অনুচরদের উৎসাহ লোপ পায়। তাই ডাঃ রায়ের দলভুক্ত যাঁরা, তাঁদেরও কোনো উৎসাহ ছিল না।

কার্যকারণ সূত্রে তারপরে বাংলাকে রাজ্যভাষারূপে আইন করার প্রয়োজন এসে পড়ে, এবং তা আইনে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও আমরা চেষ্টা করে দেখেছি যে, কিছুতেই কোনো একটা বিলের মধ্যে, তা দুবছরেই হোক তিন বছরে হোক, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাভাষা এই রাজ্যে রাজকার্য পরিচালনা বিধিব্যবস্থার সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হয়ে উঠবে, এবং বাংলাভাষাদ্বারা, সমস্ত রকম রাজকার্য তখন থেকে পরিচালনা করা যাবে একথা গ্রহণ করতে তখন মন্ত্রীমণ্ডলী স্বীকৃত হন নি। এভাবে বহুদিন চলে গেছে।

তারপরে সেই বিল তিন বছর আগে আইন হয়েছে এবং তারপরেও বহুবার এখানে এই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। আজ যে-সমস্ত বাধাবিপত্তির কথা ও অসুবিধার কথা শুনছি, এই আইন পাশ হবার পর বহুবার তা উত্থাপিত হয়েছে। এবং বহুবার আমরা এখানে তার আলোচনা করেছি। এ সম্বন্ধে বহু কার্যকরী ব্যবস্থার প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়েছে। যদি স্যার, আপনি অনুগ্রহ করে কাউন্সিলের সে সমস্ত কার্যবিবরণী দেখেন, তাহলে দেখবেন বৎসরের পর বৎসর এইসব ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে নানারকম প্রস্তাব এসেছিল, আভাস এসেছিল, আমরা অনেক কথা বলেছিলাম, যার কোনোটাই তাঁরা গ্রহণ করেন নাই। শুধু তা নয়, একটি প্রস্তাব সম্বন্ধেও তাঁরা মুখব্যাদান করেন নি। যা তাঁরা করেছিলেন তা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নীরব থাকা, উপেক্ষা করা, ঔদাসীন্য প্রকাশ করা। এই জন্য তিন বৎসর পরে, আজ যখন তাঁরা আবার বললেন 'আমাদের বড় অসুবিধা হচ্ছে', আমরা তখন তাঁদের স্বভাবত জানাতে চাই যে এই অসুবিধার কথা তো তাঁদের অজানা ছিল না।…

স্যার, পরিভাষার কথা এখানে বারবার উত্থাপিত হয়েছে। পরিভাষা সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা না থাকাতে, এবং সাধারণ ধারণাও রাখতে চাইনা বলে আমরা অনেক সময় পরিভাষা নিয়ে পরিহাস করি। সে সম্বন্ধে এখন আর আমি কিছু বলব না; এখন হয়ত অনেকের সে রকম

পরিহাস করবার ইচ্ছাও নাই। তা থাকলে গেলবার রেজাউল করিম সাহেব যেভাবে সুন্দর ভাবে একথা বুঝিয়ে বলেছিলেন আমি সেকথা আবার আমাদের সদস্যদের স্মরণ করতে বলব। দেখবেন, পরিভাষা সম্পর্কে পরিহাস করবার কোনো কারণ নাই। সকল ভাষাতেই পরিভাষা এভাবে নূতন শব্দ রূপে গড়ে ওঠে এবং বাংলা পরিভাষাও সেরূপে গড়ে উঠেছে।

আসল কথা হচ্ছে আমরা যারা অর্ধশিক্ষিত তারা এই পরিভাষা নিয়ে হাসি সৃষ্টি করতে ভালোবাসি এবং আমাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, আমরা পরিভাষা সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করি না, না হলে এ বিষয়ে অন্তত বাঙালিদের কিছু জানা উচিত ছিল। কারণ বাঙালি অনেক দিন থেকে এই পরিভাষা সম্বন্ধে চিন্তা করেছে। এটা আজকের কথা নয়। স্যার আপনার লিখিত পুস্তিকা থেকে আপনার অনুমতি নিয়ে, আমি উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারি যে, ১৮৭৬ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পরিভাষা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, যে পুস্তিকার কথা আপনি পরে উল্লেখ করেছেন এবং আপনার ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা এখানে আমার হাতে আছে। এখন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৯৫৬ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুস্তিকা পুনর্মুদ্রণ করার প্রয়োজন মনে করেছেন। হয়তো বাংলাদেশের মন্ত্রী-মণ্ডলী তা অবগত নন। তবে তাঁদের পরিভাষা কমিটি একথা জানেন, নিশ্চয় আমি তা আশা করি। দ্বিতীয় কথা যা আপনার পুস্তিকা থেকেই জানি, রাজা রাজেন্দ্রলালের পরে ১৯৫৮ সালে বোম্বেতেও সেখানকার শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেকটার মিস্টার বি. এন. শীল (যিনি আমাদের মহাগুরু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের পুত্র ছিলেন) ভারতের পরিভাষা সম্বন্ধে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাও কৃতিত্বপূর্ণ আলোচনা। এসব কথা উল্লেখ করে ১৯৫৩ সালে পুণাতে যে ভারতীয় ভাষা সম্মেলন—ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ ডেভেলাপমেন্ট কনফারেন্সের অধিবেশন হয় আপনি তাতে পরিভাষা বিষয়ে আপনার অভিভাষণ পাঠ করেন—পুস্তিকা-আকারে তাও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারিত হয়। আমি আমাদের মন্ত্রীদের বহুবার বলেছিলাম পরিভাষা সম্পর্কে বুঝবার জন্য আপনারা সে পুস্তিকার কয়েকটি খণ্ড সংগ্রহ করে পাঠ করুন, সরকার থেকে কিনে অন্তত পশ্চিমবাংলার আইনসভার সদস্য যাঁরা

তাঁদেরকে দিন এক খণ্ড করে। তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে কী নীতি অবলম্বন করে এই পরিভাষা প্রণয়ন করা উচিত।

সেই বইতে সেই রকম নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে কীরকম পরিভাষা প্রণয়ন করা সহজসাধ্য। সেই নীতি জানা থাকলে পর আজ এত বছর পর্যন্ত এই পরিভাষার প্রণয়ন নিয়ে গোলযোগ হতো না। আমি যদি ঠিকমতো বুঝে থাকি তাহলে তার মূল কথা এই: যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভাষায় সম্পূর্ণ ও ব্যাপক পরিভাষা সৃষ্টি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের বক্তব্য বা সাজেশান হচ্ছে এই যে, ইংরাজির পারিভাষিক শব্দের পাশে বাংলায় তার প্রতিশব্দ সাময়িকভাবে, পরীক্ষামূলকভাবে, ব্যবহার করা দরকার। এইভাবে কাজ করার পক্ষে বাধা এখনো নাই, তখনো ছিল না। কিন্তু সেই নীতিকে গ্রহণ করে বাংলাদেশের রাজকার্য পরিচালিত হয় নি, এবং এখনও যে হয় তা নয়। যা আমাদের অনেকের মাথায় আছে তা অন্য জিনিস।

অনেকেরই পরিভাষার নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার জন্য ধারণা এরূপ যে, বাংলাভাষার মধ্যে যদি কখনও আমরা একটি ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করি তাহলে বোধহয় বাংলাভাষার মহাভারত অশুদ্ধ হয়।···

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সুষ্ঠু ধারণা থাকলে এগুলো ব্যবহার করা যায়, ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু যা সহজে করা সম্ভব ছিল তাও আপনারা মন্ত্রীমণ্ডলী করেন নি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে গত তিন বছরে এই মন্ত্রীমণ্ডলী নির্দেশ দিয়ে—যাতে মন্তব্য সেক্রেটারিয়েটে বাংলায় লেখা যায়—তাও কি করেছেন? করে থাকলে তা কবে থেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন? সেই সমস্ত লিখতে গেলে বা বাংলায় লেখার জন্য কোনো পরিভাষার পথ চেয়ে কি বসে থাকতে হয়? তা হয় না। চিঠিপত্রে সরকারী বিভাগে একে অন্যের, বা সেখান থেকে বাইরে প্রেরণ করবার জন্য লেখা চিঠিপত্রে, কত পরিভাষার দরকার হয়? কোনো পরিভাষারই দরকার হয় না এইসব কাজ পরিচালনার জন্য। অবশ্য কোনো কোনো মন্ত্রী চিঠিপত্র আজকাল বাংলায় লেখেন, তাঁরাও দেখেন—এইরকম কাজের জন্য—আমি যে সব কাজের কথা বললাম—তার জন্য পরিভাষার দরকার লাগে না।

এইসব কাজকর্ম বাংলায় করলে তাঁরা দেখতে পারবেন অধিকাংশ জটিল রাজকার্যও বাংলায় করা অসাধ্য নয়। জেনে বুঝে আগ্রহ নিয়ে

বাংলায় কাজ করতে লাগলে কঠিনতর বিষয় বাংলায় বলা লেখা সহজ জিনিস হবে। সে-সব কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজনও বটে। যেমন, যে সমস্ত প্রধান প্রধান আইন আছে সেগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করতে কেন দেরি হচ্ছে তা আমি জানি না। ভূমি-সংস্কারের মতো একটা বড় আইন সরকার থেকে মুদ্রিত হয়েছিল, তারপরে আর মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। অথচ এই আইন যে বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং তার চাহিদা যে সর্বদা থাকবে, জানা কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা দ্বিতীয় মুদ্রণে পাওয়া যায় নি। মুদ্রণের চেষ্টায় শিথিলতা কেন রয়েছে তাও জানি না। এরূপ দেখানো যেতে পারে যে অনেক সময় যা করা সাধ্য তা কর্তৃপক্ষ করেন না। এমন কি পরিভাষা সম্পর্কেও বলা যায় যে, পরিভাষার প্রথম রিপোর্ট ১৯৪৮ সালে বেরিয়েছিল, তা হল প্রথম পুস্তিকা। দ্বিতীয় পুস্তিকা পর বৎসর ১৯৪৯ সালে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার পরে ডাক্তার রায়ের আমলে পাঁচ বৎসর কোনো পুস্তিকা বের হল না। এরপর ১৯৫৫-তে তৃতীয় পুস্তিকা বের হল। চতুর্থ পুস্তিকা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, প্রেসে রয়েছে, তা এখনো বেরোয় নি। এতে ১৩০০ পরিভাষার শব্দ আছে। এই পুস্তিকা বের করার ব্যাপারে আমি যা জানি তা এই যে, বোধহয় দেড় বৎসর কি দু বৎসর প্রেস-এ তা পড়ে রয়েছিল, মন্ত্রীমণ্ডলীর যদি চেষ্টা থাকত তাহলে এত দীর্ঘ দিন তা প্রকাশিত হতে দেরি হতো না—একথা যে কোনো লোকই বলবে। এখনও পঞ্চম পুস্তিকা যা প্রস্তুত আছে, তা প্রেসে যায় নি, বা গিয়ে থাকলেও তা ছাপা আরম্ভ হয়নি। নূতন চতুর্থ ভাগ যা প্রকাশিত হবে তাতে ১,০০০ প্রতিশব্দ বা পরিভাষা আছে, আর পঞ্চম খণ্ডটিতে ১,৫০০ পরিভাষা থাকবে। কাজেই এগুলি যদি মুদ্রণে দীর্ঘকাল লাগে তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মন্ত্রীমণ্ডলীর এদিকে তেমন দৃষ্টি নেই, বা তাদের ঔদাসীন্য বা শিথিলতা রয়েছে। এই পরিভাষা কমিটির যা কাজ হয়েছে তা আমি মোটামুটি দেখেছি, তা প্রশংসনীয় কাজ। সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য রয়েছে তাও এই যে, কমিটির কাজকে প্রয়োগ করবার চেষ্টা দেখছি না। এ বিষয়ে তাদের উপেক্ষা রয়েছে, এটাই আমার বক্তব্য।

স্যার, এখন যা দেখতে পাচ্ছি (চতুর্থ পরিভাষার রিপোর্ট অনুযায়ী), তৃতীয় পরিভাষা পর্যন্ত যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তা আমার মনে হয় যে

সাধারণভাবে বাংলায় কাজকর্ম করবার মতো প্রতিশব্দ লোকের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে এসে গেছে। এর জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। চতুর্থ রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি যে, কারুকর্ম বা সরকারী বিভাগীয় নানা জিনিসের পরিভাষা তৈরি করতে হয়েছে, যেমন ট্র্যাফিক পুলিশ ইত্যাদি বিষয়ে পরিভাষা বেরিয়েছে, এবং উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দাবলীরও নানা পরিভাষা এখানে আছে।

স্যার, এখানে একটা চিন্তার জটিলতা রয়ে গেছে, মনে হয় আধুনিক রাষ্ট্রকে, মডার্ন স্টেট যাকে বলে, পৃথিবীর তাবৎ বিষয় সম্বন্ধে কাজ করতে হয়।··· আমি যতদূর জানি যে এক বৎসরে ঐ পরিভাষা সংসদ যে কাজ করেন সে তুলনায় তা অতি সামান্য। তাঁদের মাসে একটি করে অধিবেশন হয় এবং এক এক অধিবেশনে তারা একশটার বেশি শব্দ ঠিক করতে পারেন না। এইভাবে বৎসরে মাত্র ১২০০ করে শব্দ তাঁরা স্থির করতে পারেন। ১২০০ শব্দ ঠিক করে যে সংসদ তার মুখাপেক্ষী হয়ে আজকালকার যে স্টেট, যার অসংখ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যায় তার কাজ কখনো দেশের ভাষায় চালাবার দিন আসতে পারে না। হাতে পরিভাষার শব্দ নেই বলে বাংলায় কোনো কাজ হবে না, এই যদি নীতি হয়, তাহলে কোনোদিন বাংলায় কাজ হতে পারে না। যদি এই মনোভাবই কর্তৃপক্ষের হয় যে, সংসদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব, অর্থাৎ তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করব, তাহলে বলতে হবে যে বাংলা ভাষার রাজকার্যে পরিভাষা প্রয়োগের ইচ্ছা আমাদের নেই।

অধিকন্তু আমার একটা বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত সরকারী ডিপার্টমেন্ট যা আছে তাদের নিজেদেরও তো নানা শব্দ প্রয়োগ করে এখনো কাজ চালাতে হয়। তাদের প্রত্যেকটি কর্মচারী—নিম্নতম কর্মচারী, তাদের মধ্যে বাঙালি হিন্দুস্থানী, নেপালি ইত্যাদি আছেন, এসব কর্মচারী প্রত্যেকেই ইংরেজি ভাষায় হুকুম বুঝতে পারেন এমন নয়। আজকে দেশী ভাষায় হুকুম দিয়ে তাদের কাজ পরিচালনা করতে হয়। অর্থাৎ ইংরাজির সঙ্গে বাংলা মিশিয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। তাহলে যেভাবে এখন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এই বাংলায় রাজকার্য পরিচালনার জন্য আরও একটু নতুন দৃষ্টি দিয়ে আরও একটু বেশি বাংলা শব্দ ব্যবহার করে তা করবার চেষ্টা করলে কোনোরকম অন্যায় হয় না। কিন্তু তা না করে, সরকারী বিভাগ-কর্তারাও মাত্র সমস্ত

দায়িত্ব পরিভাষা সংসদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যদি নিজেরা নিবৃত্ত থাকবার চেষ্টা করেন, তা হলে হবে না।...

দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটারের অভাব।

আজ ৪-৫ বছরের উপর হলো এই সভায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি—রাজকার্য যদি বাংলায় পরিচালনা করতে হয়, এসব জিনিষ দরকার হবে। এবং এবার বাজেট অধিবেশনে, জিজ্ঞাসা করেছি, আপনারা তার জন্য বাংলা শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন? এই শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটার বাংলায় শেখানোর জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন? স্টেনোটাইপিস্ট অথবা তাঁদের বলা যেতে পারে 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' যাঁরা লিখবেন—তাঁদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা কোনোদিন? বছরের পর বছর এই প্রশ্ন তুললেও এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। একবার সরকার বললেন 'দেখব', আর একবার বললেন 'চেষ্টা করছি'। এ জিনিসের প্রতি আমাদের নজর আছে। সত্যই এ সমস্যাও নূতন নয়। হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছে একথা বলা যেতে পারে না। আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' নামক বই নিজের পয়সা খরচ করে মুদ্রিত ও প্রকাশ করেছিলেন। সে দিনও এ জিনিস নিয়ে বাঙালি ভাবে নি তা নয়—অনেকদিন থেকে ভেবেছে, বই লিখেছে, নিজের পয়সা খরচ করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৯ সালে সেই 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' বই প্রকাশ করেছিলেন। তারপর আরো অনেকে রেখাক্ষর বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছেন। প্রায় ৪০ বছর হলো ইংরেজ আমল থেকে সরকারী বিভাগের, গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টাররা বাংলা শর্টহ্যাণ্ড লিখে বক্তৃতা রিপোর্ট করতেন। তাঁদের রিপোর্টে কংগ্রেসমেন হিসেবে অনেকে জেলও খেটেছেন, অন্তত আসামী হয়েছেন। সেদিনের সেসব কংগ্রেসম্যান এখন আর বেশি নেই। তবু বাংলা শর্টহ্যাণ্ড ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। আর হঠাৎ বাংলা শর্টহ্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের নূতন উদ্ভাবনা করতে হচ্ছে তাও না। নিশ্চয়ই শর্টহ্যাণ্ডের ব্যবস্থা এতদিনে করা যেত, আইনটা যখন প্রণয়ন করেছিলেন। আমরা বরাবর প্রস্তাব করেছিলাম যারা বাংলায় অনার্স পাশ করেছে কিংবা এম. এ. পাশ করেছে এমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তত ১৫-২০টি ছেলেকে মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি দিয়ে কমার্সিয়াল কলেজে, বিশেষ করে বাংলা শর্টহ্যাণ্ড শেখাবার ব্যবস্থা করুন। প্রশ্নও করেছি এজন্য, তার কোনো রকম উত্তর তাঁরা দেন নাই।...

তারপরে হলো বাংলা টাইপরাইটারের কথা। সে বিষয়েও এর আগেও আমরা বলেছিলাম 'বাংলা টাইপরাইটার আপনাদের প্রয়োজন হবে—তার জন্য আপনারা প্রথম থেকে চেষ্টা করুন।' বছরের পর বছর এই প্রস্তাব আমরা উত্থাপন করেছিলাম। বাংলা টাইপরাইটার মেশিন নূতন জিনিষ নয়। যদিও জানি সে যন্ত্র তৈরি করার পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে। সেসব বাধা সত্ত্বেও বাংলা টাইপরাইটার তৈরি হয়েছিল এবং গত ৩০ বছর যাবৎ সে টাইপ-রাইটারে কাজ হচ্ছে। আমি বলতে পারি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান ৩০ বছর যাবৎ তাদের কাজ বাংলা টাইপরাইটারে নির্বাহ করে আসছেন। এবং আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তাই দিয়ে তাঁদের কাজ নির্বাহ করছেন। এমন কি কোনো কোনো বাংলাদেশের লেখক যাঁদের সংগতি আছে বাংলা টাইপরাইটারে নিজেই তাঁদের রচনা টাইপ করে নেন, কিম্বা অন্য কাউকে দিয়ে টাইপ করিয়ে নেন, এও আমি জানি। শুধু এ বিষয়ে জানা ছিল না আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর। অবশ্য তাঁদের দপ্তর থেকেও কিছু কিছু চিঠি বাংলা টাইপরাইটারে টাইপ হয়ে আসে, তা আমরা জানি। তাহলে টাইপ-রাইটারের দুরবস্থা কথা বলবার জন্য তাঁদের এত দেরি হয় কেন? আমরা তো জানতাম বাংলা টাইপরাইটারের সাধারণ যে কী-বোর্ড আছে তা তৈরি করা একটা দুর্ঘট ব্যাপার। রেমিংটন কোম্পানি সেটা তৈরি করেছিল—এবং যেহেতু বাংলা টাইপরাইটারের চাহিদা কম সেহেতু তারা তার উন্নয়ন করে নি। আমি বলেছিলাম যে আপনারা একটা কাজ করুন—কারণ বাংলা টাইপের মেশিন করতেই হবে—আপনারা সব মেশিন কোম্পানিকে বলে পাঠান যে, 'যারা এই বিশেষ রকমের ভালো বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ড তৈরি করে দিতে পারবে তাদের ডিজাইনারকে আমরা এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেব।' এবং সেই ডিজাইন অনুসারে যদি রাজকার্য হয় তাহলে যে একখানি সেই মেশিন তৈরি করবে তাদের বলতে পারেন যে আমরা দুশো কি চারশো কি পাঁচশো মেশিন সরকার থেকেই কিনব। এটা করলে এতদিন অপেক্ষা করবার কোনো দরকার হতো না। আরও একটা জিনিস আপনারা করতে পারেন—যেমন আজ যাঁরা ইনডাস্ট্রি ও টেকনো-লজিতে উন্নত জাত, যেমন পশ্চিম জার্মানী, যেমন আমেরিকা, আর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া এই সব দেশকে স্টেট লেভেলে আপনারা আপনাদের প্রয়োজনের কথা বলুন এবং তাঁদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠান যে, 'এই

হচ্ছে বাংলা অথার—এর জন্য টাইপরাইটার তৈরি করার যে সমস্যা—সেই সমস্যা পূরণ করে, নূতন করে একটা টাইপরাইটারের মডেল তৈরি করার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা জানি যে তারা পৃথিবীতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, বিশেষত কারুবিদ্যায় উন্নত এইসব দেশ—শুধু সমাজতন্ত্র দেশগুলি না, অন্য দেশও কারুবিদ্যায় প্রভূত অগ্রসর হয়েছে। যদি আমাদের ভারত সরকার মারফৎ বিদেশে এই প্রস্তাব উত্থাপন করি, তাহলে বন্ধুভাবাপন্ন এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যারা এই টাইপরাইটার তৈরির বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারবে। প্রথমত আমরা চাই ভালো টাইপরাইটার, কিন্তু সেজন্য আপনারা করেছেন কি? তাও আশ্চর্য ব্যাপার। যে টাইপরাইটার না হলে কাজ হয় না সে টাইপরাইটার ভালো চাই বলে আপনারা ডিজাইন পাঠাবার জন্য নকশাকারদের বললেন এবং এই ডিজাইনারদের সময় দিলেন তিন সপ্তাহ। বাংলায় ভালো টাইপ কী-বোর্ড তৈরি করে দেবে তারা এই তিন সপ্তাহের মধ্যে যে সমস্ত নকশা এল সেই নকশা বিবেচনা করবার জন্য কিন্তু আপনাদের বিশেষজ্ঞরা দেড় বৎসর সময় নিলেন···শেষে কি স্থির করলেন? তা হলো এই যে, এই টাইপরাইটারের সংযুক্ত শব্দগুলি দেখতে বিসদৃশ হয়—এবং এই নিয়ে বেশি কাজকর্ম করা যায় না। কারণ এতে মিনিটে বাংলায় ২০টি শব্দ টাইপ করা যায়, যেখানে ইংরাজির ৬০টি শব্দ টাইপ করা যায়। কাজেই এ যন্ত্রের আরও উন্নতি দরকার। কিন্তু এটা যাঁরা করেছিলেন—তাঁদের হাতেই পাঠিয়েছিলেন—অর্থাৎ রেমিংটন য়্যাণ্ড কোম্পানি তাদের হাতে দিয়েছেন সেই ভার। অবশ্য এটা আমার শোনা কথা—সত্য নাও হতে পারে—জোর করে বলতে পারি না—তবে যতদূর জানি তাদেরই আপনারা এখন ভার দিয়েছেন।···

গোপাল হালদার

জীবনপঞ্জির রূপরেখা

জন্ম

২৮ মাঘ ১৩০৮।১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২, বিজগাঁও বিক্রমপুর পরগনা, ঢাকা।

'...আমি যখন জন্মালাম তখন পাড়ায় একটা ঘড়ি পাওয়া যায় নি। গ্রামবৃদ্ধরা সময় ঠিক করলেন—কতক্ষণ আগে কোরাল পাখি ডাক দিয়েছিল।...বিধাতা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন কোকিলের কণ্ঠ আর ময়ূরের রূপ। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করে আমি পেয়েছি ময়ূরের কণ্ঠ আর কোকিলের রূপ। 'গড্‌স্ ছ্যাট ফেলড' আমার কাছে একটুও নতুন কথা নয়।' (রূ ১। পৃ ৭-৮)

'...আমি জন্মেছি বিক্রমপুরে। আবাল্য কাটিয়েছি নোয়াখালি শহরে...। আমার মতে আমাদের বাঙালীদেরও দুটি করে বাড়ি আছে। একটি দেশ-ঘর, আর একটি কলকাতা। আমি কলকাতার মানুষ।' (রূ ১। পৃ ৩৯)।

পিতা—সীতাকান্ত হালদার।

মাতা—বিধুমুখী দেবী।

পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান।

'আমার কাছে আমার পিতার সমগ্র রূপটা স্পষ্ট হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কালে। ১৯৩২-এর ২৮শে মার্চ কলকাতায় তিনি আমাদের ছেড়ে যান। তখন বোধ হয় তাঁর বয়স বাষট্টি বছর।' (রূ। পৃ ৯)

'আজ উনি চলে গেলেন। পৃথিবীতে তাঁর শূন্যস্থান কারও চোখে পড়বার কথা নয়। বাঙলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক তো এ ভাবেই যায়। সংসারের দশজনকে নিয়েই তাঁদের জীবন। ওঁর বিশেষত্ব কোথায়? কর্তব্য করেছেন স্বচ্ছন্দ আনন্দে, আমাদের কর্তব্যত্রুটিতে দুঃখিত হয়েছেন। দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু হাসি ফুরোয় নি, কৌতুক শেষ হয় নি। এখনো সেই হাসিই মুখে।' (রূ ১। পৃ ১৬)

'...১৩৬৯-এর (ইং ১৯৬২) বৈশাখী পূর্ণিমায় আমার মাও আমাদের ত্যাগ করে যান।...আসলে মা কোনোদিকে অসামান্যা ছিলেন

না।…সাধারণ দশজন বাঙালী মায়ের মতোই তিনি দেখতে-শুনতে। তবু তাঁকে অসামান্যা মনে হত কেন? মা বলে?' (রূ ১। পৃ ৩৫)

'আমি ভরদ্বাজগোত্রের 'আর্য সন্তান'—মুখের সাক্ষ্য অথচ বিপরীত, বাঙাল দেশের 'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ', কৃত্তিবাসের মত 'মুখুটি গাঁই', অন্তত আটপুরুষ ধরে ফারসি পদবীতে চিহ্নিত 'হালদার'। —পাঁচ পুরুষ ধরে পূর্ব ভদ্রাসন পদ্মায় শিকস্তি, দ্বিতীয় ভদ্রাসনও এ পুরুষে তারই সামিল। আমি অনাগরিক, অথবা যথার্থ প্রোলেটেরিয়ান, চাল-চুলো নেই। আমার বংশ-পরিচয় ঐ 'হালদার' পরিচয়েই এখন সুস্থির। ভারত-সমাজের ইতিহাসেরও তো এটি একটি মজার দৃষ্টান্ত: 'ভরদ্বাজ' পরিণত 'হালদারে'—অর্থাৎ—ভারতীয় আর্যভাষার উত্তরাধিকারে এসে মিলেছে আরবী-ফারসীর 'দার' প্রত্যয়'। (রূ ২। পৃ ১৯৮)

স্ত্রী—অরুণা দেবী (হালদার)। আড়িয়াদহনিবাসী ইন্দুভূষণ সিংহের একমাত্র কন্যা। বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। পাটনা উইমেনস কলেজের অধ্যাপিকা (অবসরপ্রাপ্তা)। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

শিক্ষা

নোয়াখালি শহরের আর. কে. জুবিলি স্কুলে শৈশব থেকে পড়াশোনা করেন।

১৯১৮ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

১৯১৮—২২ কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে আই. এ. ও বি. এ. ইংরেজি অনার্স পড়েন।

১৯২২ ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন।

১৯২৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। বি. এল. পাশ করেন।

'…আমরা ইংরেজি পড়েছিলাম কতকটা জীবিকার দায়েও। তখন ইংরেজি ভারতবর্ষে জীবিকার সকল দুয়ারের চাবি, ইউনিভার্সেল কী। আরও একটি গোপন কারণও ছিল—প্রেম। স্বীকার

করতে লজ্জা কি—ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছলাম।' (রূ ২। পৃ ৩৯)

কর্মজীবন ঃ পেশা

১৯২৫-২৬ নোয়াখালি শহরে পৈতৃক সেরেস্তায় বসেন ও ওকালতি শুরু করেন।

'উকিলের ছেলে উকিল হবে, এই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেরও তো স্বভাব আছে? এই স্বভাব কিরূপ? আমি আজও তা ঠিক জানতে পারলাম না! বোধহয় নিজের স্বভাব নিজে জানতে পারে না।··· স্বভাব আমার যাই হোক, বৃত্তি খুঁজে না পেয়ে ওকালতি করতে বসে গিয়েছিলাম।' (রূ ২। পৃ ১৭৩)

১৯২৬-২৮ কলকাতায় 'প্রবাসী'-মাসিকপত্রের কর্মী। ইংরেজি 'ওয়েল-ফেয়ার'-পত্রের সহ-সম্পাদক।

১৯২৬-২৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কাছে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা গ্রন্থ এখনো প্রকাশিত হয় নি। এই বৎসর (১৯৮০) এশিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থ, ইস্টবেঙ্গল ডায়ালেক্টস, ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বর্তমানে প্রেস কপি তৈরির কাজ চলছে।

১৯২৯-৩০ ফেনী কলেজে অধ্যাপনা।

'রাজনীতির নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে প্রথম গিয়েছিলাম বাবার নির্দেশে (প্রায় আদেশে) ফেনী কলেজের অধ্যাপনায় (১৯২৯, জুলাই)।··· কয়েকমাস পরে কলেজ থেকে দুবছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাই (১৯৩০-এর জুন) সুনীতিবাবুর রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে গবেষণা কর্মের সর্বক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ১৯৩০ সাল। পলিটিকসের চাপা পড়া নেশা একেবারে দ্বিগুণ হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল আগুনের দিকে। ঘরটা পুড়ল।'···(রূ ২। পৃ ২০৭)

১৯৩০-৩২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রিসার্চ-এ্যাসিস্ট্যান্ট।

'···পাটনার ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম ১৯৩০-৩১। আমার সেই গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান (গোপীচন্দ্র লিজেণ্ড) বিষয়ে

লেখাটা পড়া হবে।... আমার নিবন্ধ শোনার জন্য সুনীতিবাবু, দাদা ও তাঁর বন্ধুরা কিছু বাঙালীদের একত্র করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় হন সভাপতি।

এই ভাষাতত্ত্বের যাত্রায় আমার পথ ফুরিয়ে এল। বলা ঠিক—পথ না ফুরিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল আমাকে নানা দিকে। লোক-শব্দ, লোক-কাহিনী আমাকে নিয়ে চলত লোকজীবনের দিকে, শেষে সমাজতন্ত্রে। দু-এক সময় কথাটা বলেছি, আবার এখানে বলি—যিনি জেনে না-জেনে আমাকে এই কমিউনিজমের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ নন। আমার গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও। সমাজ-তন্ত্রে যাঁর বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই—ছিলও না। তাঁর কথা-মত, আমি তখন লোক-শব্দ সংগ্রহ করতাম...। আচার-আচরণ বিষয়ক শব্দ থেকে চলে গেছলাম—ভাব-ভাবনা, কল্পনামূলক শব্দে। সুনীতিবাবু তালিকা দেখছিলেন। বললেন—উঁহুঁ। এ ধারা এখন নয়। প্রথম প্রয়োজন সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার শব্দ।... গুরু জানতেনও না—শব্দাভিযান তাঁর ছাত্রকে নিয়ে গেল হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়্যালিজম-এর দিকে।'...(ক্র ২। পৃ ২১৮)

১৯৪০-৪২ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিকপত্রের সহ-সম্পাদক।

কারাবাস

১৯৩২ এপ্রিল—৩৮ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি জেল, বকসা বন্দীশিবির, ডিটেনশন।

১৯৪৯ মার্চ—৪৯ জুন প্রেসিডেন্সি জেল।

১৯৬৯ প্রফুল্ল ঘোষের সরকারের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য।

কর্মজীবন

১৯২৬-২৮ নোয়াখালির 'দেশের বাণী'-র সম্পাদনা-কর্মী।

১৯৩৮-৩৯ কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক। সুভাষচন্দ্র বসু-র সহকারী হিসাবে 'ফরোয়ার্ড ব্লক'-পত্র (ইংরেজি) সম্পাদনা করেন।

১৯৪০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। প্রথমে কৃষক

সভার সম্পাদক ছিলেন। দৈনিক 'স্বাধীনতা' ও 'পরিচয়' মাসিকপত্রের সম্পাদনা কর্মে যুক্ত হন।

১৯৪৪-৪৮, ১৯৫২-৬৭ 'পরিচয়'-সম্পাদনা।

১৯৫২-৫৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সিনেটের সদস্য। বঙ্গবিহার-সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সিনেটে প্রস্তাব তোলেন। সেই সূত্রে সারা বাংলায় বুদ্ধিজীবী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৪-৬৮ বিধান পরিষদ সদস্য।

১৯৫৮ অগাস্ট স্টকহলম শান্তি সম্মেলনে যোগদান। আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন-এর তাসকেন্ত প্রস্তুতি কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সভ্য। চীন-জনগণতন্ত্রের আমন্ত্রণে চীন দেশে যান—সহযাত্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯৬১ কলকাতায় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও যুগ্মসম্পাদক।

১৯৬২ মস্কো শান্তি সম্মেলনে যোগদান।

১৯৬৩ মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্মেলনে যোগদান।

১৯৬৭ ইউরোপে।

১৯৬৮ মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও পূর্ব সোভিয়েতে—সোভিয়েত দেশ-নেহরু পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে।

গবেষণা

১৯২৯	গোপীচন্দ্র লিজেণ্ড	**Oriental Conference, Patna Session.**
১৯২৯	**Noakhali Dialects Noakhali Phonetics**	**Calcutta University, Departments of Letters.**
১৯৩১	বিদ্যাপতি এণ্ড হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ	**Oriental Conference, Baroda Session.**
১৯৩২	**Skeleton Grammar of Noakhali Dialects**	**Calcutta University, Department of Letters.**
১৯৩৫-৩৬	**Eastern Bengali Dialects (Ibid)**	**Researches completed in Jail.**

১৯৭৬	সাহিত্য অকাদেমির ফেলোশিপ

ভাষণ-সম্মেলন

১৯৪৭	প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাংবাদিক শাখার সভাপতি।	
১৯৫২	**Lectures on literary trends**	**Gauhati University. Allahabad University.**
১৯৫৩	নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (লক্ষ্ণৌ) সমাজশাখার সভাপতি।	
১৯৫৮	**Russian Literature through Indian eyes**	**International Slavist Conference, Moscow.**
১৯৫৮	ক্ষুদিরাম বসু বক্তৃতা	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬০	**Romantic Novels in Bengali Literature of 19th Century**	**International oriental Conference, Moscow.**
১৯৬২	সেবচেংকো স্মারক বক্তৃতা	কিয়েভ, সোভিয়েত ইউনিয়ন
১৯৬৩	মায়াকভস্কি স্মারক বক্তৃতা	মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
১৯৬৪	সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা	প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়, চেকোশ্লোভাকিয়া হুমবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বজার্মানি
১৯৭০	বিদ্যাসাগর বক্তৃতা	বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭১-৭২	বিদ্যাসাগর বক্তৃতা	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭২ মে	**Slavist Culture and India**	**Warsaw, Poland**
১৯৭৩ নভেম্বর	সিংভূম আঞ্চলিক ভাষা	জামশেদপুর বাঙালি সমিতি
	সতীনাথ ভাদুড়ী বক্তৃতা	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৪ জানুয়ারি	ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাদেশ

প্রকাশিত গ্রন্থ

অরুণা হালদার কর্তৃক সংকলিত তথ্যের ভিত্তিতে

উপন্যাস

একদা	রঞ্জন পাবলিশার্স	১৯৩৯
উনপঞ্চাশী	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৪৬ জানুয়ারি
তেরশ পঞ্চাশ	ঐ	১৯৪৬ মে
পঞ্চাশের পথ	ঐ	১৯৪৬ সেপ্টেম্বর
ভাঙন	ঐ	১৯৪৭ জুন
অন্যদিন	ঐ	১৯৫০ মে
স্রোতের দ্বীপ	ঐ	১৯৫০ জুন
উজান গঙ্গা	ঐ	১৯৫০ জুলাই
আর একদিন	ঐ	১৯৫১ মে
ভূমিকা	ঐ	১৯৫২ সেপ্টেম্বর
নব গঙ্গা	ঐ	১৯৫৩ সেপ্টেম্বর
জোয়ারের বেলা	ঐ	১৯৫৪ সেপ্টেম্বর
ভাঙনী কূল	ঐ	১৯৫৬ মে

১. একদা-অন্যদিন-আর একদিন, ২. ভাঙন-স্রোতের দ্বীপ-উজান গঙ্গা, ৩. ভূমিকা-নবগঙ্গা-জোয়ারের বেলা ও ৪. উনপঞ্চাশী-পঞ্চাশের পথ-তেরশ পঞ্চাশ—এইগুলি ত্রয়ী-উপন্যাস। ঘটনাকালের দিক থেকে তৃতীয় গুচ্ছ থেকে দ্বিতীয় গুচ্ছ পর্যন্ত ১৮৫৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত, ও প্রথম গুচ্ছে ১৯৩২ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত সময়কে আধার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থ-প্রকাশ এই কালানুক্রমে ঘটে নি। আমরা যতদূর জানি, এই কালানুক্রমে লেখাও ঘটে ওঠে নি। দ্বিতীয় গুচ্ছের উপন্যাসগুলি বাংলাদেশ থেকে 'মুক্তধারা' পুনঃপ্রকাশ করেছেন। প্রথম গুচ্ছের উপন্যাসগুলি একত্রে 'ত্রিদিবা' নামে 'সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ' পুনঃপ্রকাশ করেছেন। স. 'পরিচয়'।

ছোটগল্প

ধূলিকণা	ডি. এম. লাইব্রেরি	১৯৪২ অক্টোবর

রম্য রচনা

বাজে লেখা	পুঁথিঘর	১৯৪২ অক্টোবর
স্বপ্ন ও সত্য	এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং	১৯৫১ জুলাই
আড্ডা	প্রকাশ ভবন	১৯৫৬ মে
বনচাঁড়ালের কড়চা	ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স	১৯৬০ সেপ্টেম্বর

প্রবন্ধ

সংস্কৃতির রূপান্তর	পুঁথিঘর	১৯৪২ অক্টোবর ১৯৬৫ ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স পরিবর্ধিত
বাঙালী সংস্কৃতির রূপ	অগ্রণী	১৯৪৭ মে
এ যুগের যুদ্ধ	পুঁথিঘর	১৯৪৭ নভেম্বর
বাঙ্গালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ	ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স	১৯৫৬
বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি	ডি. এম. লাইব্রেরি	১৯৫৬
ভারতের ভাষা	লেখক সমবায় সমিতি	১৯৬৭
বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা	গ্রন্থালয়	১৯৭২

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা

বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা		এ. আর মুখার্জী	১৯৫৬
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা	প্রথম খণ্ড	এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং,	১৯৫৭
ইংরাজী সাহিত্যের রূপরেখা		ঐ	১৯৬১ ডিসেম্বর
রুশ সাহিত্যের রূপরেখা		ঐ	১৯৬৬
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা	দ্বিতীয় খণ্ড	ঐ	১৯৬৮
সতীনাথ ভাদুড়ী		অয়ন	১৯৭৯

আত্মজীবনী

রূপনারানের কূলে	প্রথম খণ্ড	মনীষা গ্রন্থালয়	১৯৬৯
রূপনারানের কূলে	দ্বিতীয় খণ্ড	পুঁথিপত্র	১৯৭৯

সম্পাদনা

বিষবৃক্ষ (অরুণা হালদার সহ)	এ. আর. মুখার্জি এ্যাণ্ড সন্স	১৯৫০
সীতারাম (ঐ)	ঐ	১৯৫০
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী তিন খণ্ড	পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি	১৯৭২
বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ড	ঐ	১৯৭৩
দীনবন্ধু রচনাবলী	ঐ	১৯৭৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ-এর মহাভারত	ঐ	১৯৭৪

রূ১ ও রূ২ যথাক্রমে 'রূপনারানের কূলে' গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড।

গোপাল হালদার

‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত রচনাবলির পঞ্জি ১৯৩১—১৯৭০

প্রবীরগোপাল রায় সংকলিত

সংযোজন : রামকুমার মুখোপাধ্যায়

প্র=প্রবন্ধ, পু স=পুস্তক-সমালোচনা, গ=গল্প
[সংযোজন অংশ তৃতীয় বন্ধনীতে ছাপা]

প্রথম বারো বছর (শ্রাবণ ১৩৩৮—আষাঢ় ১৩৫০) কোনো রচনা নেই।
[ত্রয়োদশ বর্ষেও কোনো রচনা নেই]

১৪.১।১৩৫১ শ্রাবণ	উপন্যাসের যুগ প্র
১৪.২।১৩৫১ ভাদ্র	বিমলচন্দ্র সিংহের প্রবন্ধ ‘বাঙলা কবিতা ও উপন্যাসের গতি’-র পাদটীকায় শ্রীহালদারের দীর্ঘ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।
ঐ	শরৎচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ প্র
১৪.৩।১৩৫১ আশ্বিন	শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ প্র
১৪.৪।১৩৫১ কার্তিক	বনফুল—‘বিন্দুবিসর্গ’, ও ‘দশভাণ’ পু স
১৪.৫।১৩৫১ অগ্রহায়ণ	আমাদের সাহিত্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন প্র
ঐ	নন্দলাল বসু—‘শিল্পকথা’ পু স
১৪.৭।১৩৫১ মাঘ	সংস্কৃতি সংবাদ
১৪.৮।১৩৫১ ফাল্গুন	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [?] পু স
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
১৪.৯।১৩৫১ চৈত্র	সংস্কৃতি সংবাদ
১৪.১০।১৩৫২ বৈশাখ	কৃষকের দাবী (চালের দাম নিয়ে তর্ক চলছিল, সেই বিষয়ে মন্তব্য)
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
১৪.১১।১৩৫২ জ্যৈষ্ঠ	সংস্কৃতি সংবাদ (দুই দফায়)
১৪.১২।১৩৫২ আষাঢ়	ওয়েভেল প্রস্তাব প্র
১৫.১।১৩৫২ শ্রাবণ	নীহাররঞ্জন রায়—‘রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা’ পু স
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ

১৫.২।১৩৫২ ভাদ্র	গণতান্ত্রিক বিজয় প্র
১৫.৫।১৩৫২ অগ্রহায়ণ	যুদ্ধান্তের দ্বন্দ্ব প্র
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
১৫.৬।১৩৫২ পৌষ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—'দর্পণ', রমেশচন্দ্র সেন—'শতাব্দী', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—'স্বর্গাদপি গরিয়সী' (১ম) পু স।
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (দুই দফায়)
১৫.৭।১৩৫২ মাঘ	সংস্কৃতি সংবাদ (তিন দফায়)
১৫.৮।১৩৫২ ফাল্গুন	সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ প্র
১৫.৯।১৩৫২ চৈত্র	কবি নবীনচন্দ্র প্র
১৫.১০।১৩৫২ বৈশাখ	আব্দুল কাদের ও রেজাউল করিম—'কাব্য-মালঞ্চ' পু স
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (তিন দফায়)
১৫.১১।১৩৫৩ জ্যৈষ্ঠ	ঐ (দুই দফায়)
১৫.১২।১৩৫৩ আষাঢ়	শান্তিপর্ব, না উদ্যোগপর্ব প্র
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
১৬.১ ।১৩৫৩ শ্রাবণ	সংস্কৃতি সংবাদ (দুই দফায়)
ঐ	পত্রিকা প্রসঙ্গ
১৬.২ ।১৩৫৩ ভাদ্র	সংস্কৃতি সংবাদ (দুই দফায়)
১৬.৫ ।১৩৫৩ অগ্রহায়ণ	ঐ (তিনটি বিষয়)
১৬.৯ ।১৩৫৩ চৈত্র	পুস্তক পরিচয়
১৬.১০।১৩৫৪ বৈশাখ	সংস্কৃতি সংবাদ (দুই দফায়)
১৬.১১।১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ	ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত—'সাহিত্যে প্রগতি', বিষ্ণু দে—'রুচি ও প্রগতি', মোহিতলাল মজুমদার—'বাংলার নবযুগ' পু স
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
১৬.১২।১৩৫৪ আষাঢ়	পত্রিকা প্রসঙ্গ
১৭.১ ।১৩৫৪ শ্রাবণ	ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা প্র
১৭.২ ।১৩৫৪ ভাদ্র	সংস্কৃতি সংবাদ
১৭.৭ ।১৩৫৪ মাঘ	মহাত্মা গান্ধী প্র
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (দুটি বিষয়)

১৭.১০—১৭.১২।১৩৫৫	
বৈশাখ—আষাঢ়	বনফুল—'অগ্নি', মণীন্দ্র রায়—'প্রধূমিত বহ্নি' ও 'ভস্মাবশেষ', সুখময় ভট্টাচার্য—'মহাভারতের সমাজ' পু স
ঐ	'পরিচয়'-এর ভবিষ্যত সম্পাদকীয়

১৮শ বর্ষ ১ম—৩য় সংখ্যা দেখিনি।

১৮.৪।১৩৫৫ কার্তিক	সংস্কৃতির সংকট প্র
১৮.৫।১৩৫৫ অগ্রহায়ণ	পত্রিকা প্রসঙ্গ
১৮.৭ ।১৩৫৫ মাঘ	ঋষিদাস—'বার্নার্ড শ' ও 'গান্ধীচরিত' পু স
ঐ	পাঠকগোষ্ঠী
ঐ	সম্পাদকীয় [?]

১৯শ বর্ষ প্রথম পাঁচ সংখ্যা দেখি নি। ১৯শ বর্ষ শেষ সংখ্যা দেখিনি।

[১৯ বর্ষ বলে কোনো সংখ্যা নেই। 'নবপর্যায়' বলে আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের লেখা থেকে বোঝা যায় তখন কিছুদিন গোপাল হালদার বিনা বিচারে আটক আছেন। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়]

২০ ১ ।১৩৫৭ শ্রাবণ	পত্রিকা প্রসঙ্গ
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
২১.১০।১৩৫৯ বৈশাখ	শান্তি-সংস্কৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ প্র
২১.১১।১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ	বাঙলায় শেকসপীয়র প্র
২১.১২।১৩৫৯ আষাঢ়	পুস্তক পরিচয় (৬টি পুস্তক)
২২.১ ।১৩৫৯ শ্রাবণ	মণীন্দ্র রায়—'অন্যপথ' পু স
২২.৪ ।১৩৫৯ কার্তিক	বিয়োগপঞ্জী (মোহিতলাল মজুমদার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
২২.৫ ।১৩৫৯ অগ্রহায়ণ	সোভিয়েত চারুকলা প্রসঙ্গে প্র
ঐ	নিকুঞ্জ সেন—'জেলখানা কারাগার', সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—'বন্দী জীবন' পু স
২২.৬।১৩৫৯ পৌষ	সংস্কৃতি সংবাদ
২২.৮।১৩৫৯ ফাল্গুন	প্রমথ চৌধুরী—'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (১ম), কাজী আবদুল ওদুদ—'শাশ্বত বঙ্গ' পু স
২২.৯।১৩৫৯ চৈত্র	মৃত্যু নেই স্তালিনের সম্পাদকীয়

২২.১১।১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ	বঙ্কিমসাহিত্যজিজ্ঞাসা আলোচনা
২২.১১।১৩৬০ আষাঢ়	ভাষাসমস্যার মূলসূত্র প্র
২৩.২।১৩৬০ ভাদ্র	বাংলার ভাষা সমস্যা প্র
২৩.৪।১৩৬০ কার্তিক	ভারতবর্ষে এক লিপির প্রশ্ন প্র
	মনোজ বসু—'চীন দেখে এলাম', Mewlett Johnson—'China's New Creative Age' পু স
২৩.৭।১৩৬০ মাঘ	সোবিয়েত নৃত্য ও সংগীত উৎসব সংস্কৃতি সংবাদ
২৩.৯।১৩৬০ চৈত্র	অমূল্যচন্দ্র সেন—'অশোক লিপি', জীবনকৃষ্ণ শেঠ—'কোণার্ক' পু স
২৪.২—২৪.৩।১৩৬১	শারদীয় বাংলার রূপ প্র
২৪.৪।১৩৬১ কার্তিক	বিয়োগপঞ্জী (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সুবিমল সরকার)
২৪.৭।১৩৬১ মাঘ	পরিবর্তনের মুখে সমাজ ও সংস্কৃতি প্র
২৪.৮।১৩৬১ ফাল্গুন	বিয়োগপঞ্জী (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)
২৪.৯।১৩৬১ চৈত্র	মানসী মুখোপাধ্যায়—'বিদায় বর্মা' পু স
২৪.১০।১৩৬২ বৈশাখ	শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ প্র
২৪.১১।১৩৬২ জ্যৈষ্ঠ	ঐ (পূর্বানুবৃত্তি)
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
২৪.১২।১৩৬২ আষাঢ়	শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ (সমাপ্ত)
২৫.১।১৩৬২ শ্রাবণ	আশুতোষ ভট্টাচার্য—'বাংলার লোকসাহিত্য' পু স
২৫.৩—২৫.৪।১৩৬২ শারদীয়া	উপন্যাসের পরিক্রমা প্র
২৫.৫।১৩৬২ অগ্রহায়ণ	সম্পাদকীয়
২৫.৬।১৩৬২ পৌষ	শিবশঙ্কর মিত্র—'সুন্দরবনে আজান সর্দার' পু স
২৫.৮।১৩৬২ ফাল্গুন	বাংলা বিহার সংস্কৃতি সংহার প্র
ঐ	সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়—'জার্নাল' পু স
২৫.৯।১৩৬২ চৈত্র	'রাজ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি' প্র
২৫.১০।১৩৬৩ বৈশাখ	অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রদর্শনী প্র
২৫.১১।১৩৬৩ জ্যৈষ্ঠ	আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্র
ঐ	সুলেখা সান্যাল—'নবাঙ্কুর' পু স
২৫.১২।১৩৬৩ আষাঢ়	আড়াই হাজার বছর পরে (বিষয় : বুদ্ধজয়ন্তী) প্র

২৬.২—২৬.৩।১৩৬৩	
শারদীয়া	নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত রম্যরচনা
২৬.৫।১৩৬৩ অগ্রহায়ণ	পুস্তক সমালোচনা (চারটি পুস্তক)
২৬.৬।১৩৬৩ পৌষ	মানিক প্রতিভা প্র
ঐ	সম্পাদকীয় (?)
২৬.৭।১৩৬৩ মাঘ	বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় প্র
ঐ	পুস্তক সমালোচনা (দুটি পুস্তক)
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
২৬.৮।১৩৬৩ ফাল্গুন	শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু প্র
ঐ	এশীয় লেখক সম্মেলনের পূর্বে ও পরে প্র
ঐ	দীপক চৌধুরী—'ঝড় এলো' পু স
২৬.৯।১৩৬৩ চৈত্র	আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে (বিষয় : সিপাহী বিদ্রোহ) প্র
২৬.১০।১৩৬৪ বৈশাখ	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্র
ঐ	সম্পাদকীয় (?)
ঐ	মুসাফির (?)
	(মুসাফিরের আরো একটি রচনা আছে ১৩৬৩ অগ্রহায়ণে)
২৬.১১।১৩৬৪ জ্যৈষ্ঠ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিচারক' পু স
২৬.১২।১৩৬৪ আষাঢ়	**Narendra K. Sinha—'Economic History of Bengal (Vol.-1)** পু স
২৭.৫।১৩৬৪ অগ্রহায়ণ	সরকারী ভাষার সমস্যা প্র
২৭.৬।১৩৬৪ পৌষ	সংস্কৃতি সংবাদ
২৭.৯।১৩৬৪ চৈত্র	সাহিত্যে আধুনিকতা প্র
২৭.১০।১৩৬৫ বৈশাখ	ঐ (পূর্বানুবৃত্তি ?) প্র
২৭.১১।১৩৬৫ জ্যৈষ্ঠ	ঐ
ঐ	রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'ও 'গীতবিতান' (৩য়খণ্ড) পু স
ঐ	বিয়োগপঞ্জী (যদুনাথ সরকার)
২৭.১২।১৩৬৫ আষাঢ়	পাঠকগোষ্ঠীতে সম্পাদকীয় (?)
২৮.১—১৮.২।১৩৬২	
শ্রাবণ-ভাদ্র	সমরেশ বসু—'গঙ্গা' পু স

২৮.৫।১৩৬৫ অগ্রহায়ণ	সংস্কৃতি সংবাদ
২৮.৬।১৩৬৫ পৌষ	হোটেল উক্রেইনার অভ্যাগম-শালা (মস্কোস্মৃতি) প্র
২৮.৭।১৩৬৫ মাঘ	নবযুগ ও বিপিনচন্দ্র প্র
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (চারটি বিষয়)
২৮.৮।১৩৬৫ ফাল্গুন	শিক্ষা জিজ্ঞাসা
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (সাতটি বিষয়)
২৮.৯।১৩৬৫ চৈত্র	আফ্রোশীয় অভ্যুদয়ের কথা
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (ছয়টি বিষয়)
২৮.১০।১৩৬৬ বৈশাখ	ঐ (তিনটি বিষয়)
২৮.১১।১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ	ঐ (ঐ)
ঐ	পুস্তক সমালোচনা (তিনটি পুস্তক)
২৮.১২।১৩৬৬ আষাঢ়	সংস্কৃতি সংবাদ (৭টি বিষয়)

১৩৬৬ শ্রাবণ সংখ্যা আমি দেখিনি।

[২৯.১।১৩৬৬ শ্রাবণ	সংস্কৃতি সংবাদ]
২৯.২—২৯.৩।১৩৬৬ শারদীয়া	অসমাপ্ত পত্র গ
২৯.৪।১৩৬৬ কার্তিক	সংস্কৃতি সংবাদ
২৯.৫।১৩৬৬ অগ্রহায়ণ	ঐ
২৯.৬।১৩৬৬ পৌষ	ঐ
২৯.৭।১৩৬৬ মাঘ	ঐ
ঐ	আন্তন চেকভ প্র
২৯.৮।১৩৬৬ ফাল্গুন	সংস্কৃতি সংবাদ
২৯.১০।১৩৬৭ বৈশাখ	এই বৎসরে প্র
২৯.১১।১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ	আদিত্য ওহ্‌দেদার—'রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা' পু স
২৯.১২।১৩৬৭ আষাঢ়	সংস্কৃতি সংবাদ
৩০.১।১৩৬৭ শ্রাবণ	**Suniti Kumar Chatterjee—'Asianism', 'The African Personality'** পু স
৩০.৪।১৩৬৭ কার্তিক	প্রাচ্যবিদ্যার প্রাঙ্‌মুখী আয়োজন প্র
৩০.৫।১৩৬৭ অগ্রহায়ণ	ঐ (শেষ)
ঐ	টলস্টয় প্র

৩০.৮।১৩৬৭ ফাল্গুন	সংস্কৃতি সংবাদ
৩০.১২।১৩৬৮ আষাঢ়	সংস্কৃতি সংবাদ
৩১.১।১৩৬৮ শ্রাবণ	ললিতকলা অকাদেমি প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রমালা' ও টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রমালা' পু স
৩১.৮।১৩৬৮ ফাল্গুন	রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার ঐতিহ্য প্র
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ (বিয়োগপঞ্জী—অজয় ঘোষ, সজনীকান্ত দাস ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ)
১৩৬৯ বৈশাখ—আষাঢ়	তিনটি সংখ্যা আমি দেখি নি।
[৩১.১০।১৩৬৮ বৈশাখ	স্বদেশী সমাজের ভাবনা প্র
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
[জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে কোনো লেখা নেই]	
৩২.৫।১৩৬৯ অগ্রহায়ণ	সম্পাদকীয় (?)
৩২.৭।১৩৬৯ মাঘ	স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী প্র
ঐ	সম্পাদকীয় (স্বাক্ষরিত)
১৩৬৯ ফাল্গুন সংখ্যা দেখি নি।	
৩২.৯।১৩৬৯ চৈত্র	রবীন্দ্রনাথ—'স্বদেশী সমাজ', পুলিনবিহারী সেন—'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' পু স
৩২.১০।১৩৭০ বৈশাখ	রূপনারানের কূলে (শুরু) আত্মকথা
ঐ	সংস্কৃতি সংবাদ
৩২.১১।১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ	মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ প্র
৩৩.৩।১৩৭০ আশ্বিন	মস্কোতে তিনটি দিন দিনলিপি
১৩৭০ কার্তিক সংখ্যা আমি দেখিনি।	
[৩৩.৪।১৩৭০ কার্তিক	রূপনারানের কূলে (পূর্বানুবৃত্তি)
৩৩.৫।১৩৭০ অগ্রহায়ণ	সংস্কৃতি সংবাদ (অস্বাক্ষরিত)
১৩৭১ বৈশাখ-আশ্বিন ছয়টি সংখ্যা আমি দেখিনি।	
[৩৩.১০।১৩৭১ বৈশাখ	শেক্সপীয়র সাক্ষাৎ রম্যরচনা সম্পাদকীয় (?)
৩৩.১১।১৩৭১ জ্যৈষ্ঠ	রূপনারানের কূলে (পূর্বানুবৃত্তি) সংস্কৃতি সংবাদ
৩৪.১।১৩৭১ শ্রাবণ	ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য প্র
৩৪.২।১৩৭১ ভাদ্র	রূপনারানের কূলে (পূর্বানুবৃত্তি) নাট্যপ্রসঙ্গ
৩৪.৩।১৩৭১	আশ্বিন উপহার গ]

৩৪.৪।১৩৭১ কার্তিক	বিয়োগপঞ্জী (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী)
৩৪.৫।১৩৭১ অগ্রহায়ণ	পুস্তক সমালোচনা
৩৪.৬।১৩৭১ পৌষ	পত্রিকা প্রসঙ্গ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—রবীন্দ্রসংখ্যা)
৩৪.৭।১৩৭১ মাঘ	সংস্কৃতি সংবাদ (শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুহৃদ্বরেষু)
৩৪.১১।১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : স্মৃতিরেখা
ঐ	বিয়োগপঞ্জী (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়)
৩৪.১২।১৩৭২ আষাঢ়	ভারতের সরকারী ভাষা : কয়েকটি প্রস্তাব প্র
ঐ	গোলাম কুদ্দুস—'সুরের আগুন' পু স
ঐ	বিবিধ প্রসঙ্গ (ব্যক্তি স্বাধীনতা)
ঐ	বিয়োগপঞ্জী (উল্লাসকর দত্ত ও ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়)
৩৫.১।১৩৭২ শ্রাবণ	বিপিনচন্দ্র পাল—'নবযুগের বাঙলা, 'সত্তর বৎসর',
পু স	Saint Bijoy Krishna Goswami পু স
৩৫.২।১৩৭২ ভাদ্র	প্রথম অশ্রু গ
৩৫.৩।৩৫.৪।১৩৭২ আশ্বিন—কার্তিক	পত্রিকা প্রসঙ্গ (সাহিত্যপত্র, শারদীয় ১৩৭২)
ঐ	বিয়োগপঞ্জী (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও অশোক গুহ)
৩৫.৫।১৩৭২ অগ্রহায়ণ	বিবিধ প্রসঙ্গ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পাল্টানোর প্রস্তাব)
৩৫.৬। ১৩৭২ পৌষ	সম্পাদকীয় (?)
ঐ	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাঁকুড়ার মন্দির' ও মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 'উড়িষ্যার দেবদেউল' পু স
৩৫.৭।১৩৭২ মাঘ	বিবিধ প্রসঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গে গণ-অভ্যুত্থান)
৩৫.৮—৩৫.৯।১৩৭২ ফাল্গুন—চৈত্র	বিবিধ প্রসঙ্গ (জরুরী অবস্থা)
৩৬.১।১৩৭৩ শ্রাবণ	বিয়োগপঞ্জী (অধ্যাপক কৌশম্বী)
ঐ	বিবিধ প্রসঙ্গ (অমূল্যচন্দ্র সেনের 'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' বইটিকে বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কে)

৩৬.৪।১৩৭৩ কার্তিক	বিয়োগপঞ্জী (নীরেন্দ্রনাথ রায়, কালিদাস নাগ, মোহিত মৈত্র)
৩৬.৫—৩৬.৬।১৩৭৩	
অগ্রহায়ণ—পৌষ	নীরেন্দ্রনাথ ও পরিচয় প্র
ঐ	বিবিধ প্রসঙ্গ (চতুর্থ নির্বাচন)
৩৬.৭—৩৬ ৮।১৩৭৩	
মাঘ—ফাল্গুন	চতুর্থ নির্বাচনের সাক্ষ্য প্র
ঐ	বিবিধ প্রসঙ্গ (শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিভাষার প্রয়োগ)
৩৬.৯—৩৬.১০।১৩৭৩-৭৪	
চৈত্র—বৈশাখ	সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতিবিপ্লব প্র
ঐ	বিবিধ প্রবন্ধ
৩৬ ১১।১৩৭৪ জ্যৈষ্ঠ	লেখকের কৈফিয়ত (চতুর্থ নির্বাচন প্রসঙ্গে)
৩৬.১২।১৩৭৪ আষাঢ়	বিবিধ প্রসঙ্গ (সম্পাদনা থেকে অবসর গ্রহণ)
৩৭.৩।১৩৭৪ আশ্বিন	ঘেরাও ও ধরাও গ
৩৭.৪—৩৭.৫।১৩৭৪	
কার্তিক—অগ্রহায়ণ	নতুন দিন পুরানো কথা স্মৃতিচিত্র
৩৭ ৬—৩৭.৭।১৩৭৪	
পৌষ—মাঘ	একটি সাক্ষাৎকার
৩৭.১০—৩৭.১২।১৩৭৫	
বৈশাখ—আষাঢ়	গর্কি: জীবন-সাহিত্য প্র
৩৮ ২। ১৩৭৫ ভাদ্র	অঘটন ঘটলো গ
৩৮ ৪—৩৮ ৫।১৩৭৫	
কার্তিক—অগ্রহায়ণ	সরোজ আচার্য প্র
ঐ	বিয়োগপঞ্জী (কানাইলাল গাঙ্গুলী)
৩৯ ১।১৩৭৬ শ্রাবণ	অসীম রায়—'শব্দের খাঁচায়' পু স
৩৯.২—৩৯.৩।১৩৭৬	
ভাদ্র—আশ্বিন	জিন্দাবাদ গ
৩৯.৪।১৩৭৬ কার্তিক	পুস্তক সমালোচনা (রবীন্দ্রনাথের দশটি পুস্তকের, প্রমথ চৌধুরীর তুইটির এবং সতীশ চক্রবর্তীর একটির)

৩৯.৬—৩৯.৭।১৩৭৬

পৌষ—মাঘ ইলিয়া এরেনবুর্গ: শেষ আলাপ প্র

৩৯.১০—৩৯.১১।১৩৭৭

বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ বাংলা সাহিত্যে লেনিন প্র

৪০.৫।১৩৭৭ অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগর: দেড়শ বছর পরে (ইংরেজি থেকে অনূদিত) প্র

৪০.৬।১৩৭৭ পৌষ বিপ্লবী নিকেতন: মৃত্যুহীন পু স

৪০.৯—৪০.১০।১৩৭৭-৭৮

চৈত্র—বৈশাখ 'বাঙলাদেশ': ভাবী বাঙলার আবির্ভাব প্র

সংযোজন

২৭.২—২৭.৩।১৩৬৪

শারদীয়া হালখাতা রম্যরচনা

২৭.৪।১৩৬৪ কার্তিক সরকারী ভাষা ও বিচার বিভ্রাট প্র

ঐ রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্র' (৬ষ্ঠ খণ্ড) পু স

ঐ সংস্কৃতি সংবাদ ('অপরাজিত' ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা)

ঐ সম্পাদকীয় (?)

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত যাবতীয় রচনার সংকলনের দায়িত্ব একমাত্র তিনিই নিতে পারেন—

১ যাঁর হাতের কাছে আছে শুরু থেকে আজ অবধি প্রকাশিত 'পরিচয়'-এর সব কয়টি সংখ্যা।

২ যাঁর হাতের কাছে আছে গোপালবাবুর অদ্যাবধি প্রকাশিত সকল গ্রন্থ।

৩ গোপালবাবুর রচনার ভাষা ও ভঙ্গির সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে।

৪ প্রাপ্ত তথ্য যিনি নির্ভুলভাবে ও uniform method-এ লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

যাঁর দ্বারা এই চারিটি শর্তই সর্বাংশে পূর্ণ না হচ্ছে, তাঁর কৃত পঞ্জি অপ্রামাণ্য।

আমার দ্বারা মাত্র চতুর্থ শর্তটির ভগ্নাংশ পূর্ণ হচ্ছে। —প্র. রা.

পরিচয়

পরিচয়

এপ্রিল ১৯৮০

মার্কসবাদ ও শিল্প-সাহিত্য

কবিতাগুচ্ছ

আত্মকথা

গল্প

পুস্তক-পরিচয়

৪৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয়-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মার্কসবাদ ও শিল্প-সাহিত্য আলোচনা-সংকলন ৪

আমরা এই সংখ্যায় বাস্তবতা প্রসঙ্গে লুকাচের তত্ত্বের বিরুদ্ধে ব্রেখট যে আলোচনা করেছিলেন, সেটি প্রকাশ করছি।

এর সঙ্গে আমরা এই আলোচনা-সংকলনও শেষ করছি। পরেও নিশ্চয়ই আরো নানা আলোচনা আমরা বের করব, কিন্তু তা সিরিজ হিসেবে নয়। গিনজবার্গ, গোল্ডমান, অ্যাডরনো ও ব্রেখটের এই আলোচনাগুলি ইংরেজিতেও খুব সুলভ নয়। ফলে এগুলি একসঙ্গে সংকলিত করে 'পরিচয়' পাঠককে দেয়া হল।

দুটি ফাঁক থেকে গেল। কিন্তু সেই দুই ক্ষেত্রেই আমরা নিরুপায়। লুকাচের প্রায় সব বই-ই ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য নিয়ে বাংলায় লেখাও হয়েছে। তাই তাঁর কোনো একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশ করা ঠিক হত না। তেমনি, রেমণ্ড উইলিয়ামস একটি গোটা বই-ই সম্প্রতি লিখেছেন বিষয়টির ওপর। সেই বইটির ওপর কোনো আলোচনা ভবিষ্যতে আমরা প্রকাশের চেষ্টা করব।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ মস্কো থেকে *Das Wort* নামে জার্মান ভাষায় একটি কাগজ বেরত। ব্রেখট ছিলেন তাঁর তিন-সম্পাদকের একজন। মস্কো থেকে আর-একটিও কাগজ বেরত, ***International Literature***। সেই কাগজটিতে ১৯৩৪-এর জানুয়ারিতে জর্জ লুকাচ বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন—বালজাক ও তলস্তয়ের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেন। এই সব লেখা তাঁর 'স্টাডিজ ইন ইয়োরোপিয়ান রিয়ালিজম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লুকাচের এই মতামত নিয়ে ১৯৩৭ থেকে *Das Wort* পত্রিকার আলোচনা শুরু হয়।

এই সব আলোচনা, বিশেষত লুকাচের মতামতের ব্যাপারে, ব্রেখটের মত, বর্তমান প্রবন্ধটি ও আর-একটি প্রবন্ধে ধরা পড়ে। তখন এই প্রবন্ধগুলি লেখা হলেও সম্ভবত কোথাও বেরয় নি। প্রথম বেরিয়েছে ১৯৫৪-তে।

স. প.

জনপ্রিয়তা ও বাস্তবতা

বের্টোল্ট ব্রেখট

জার্মান সাহিত্যের জন্য আজকে কোন্ শ্লোগান দেয়া উচিত—এ নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময় খেয়াল রাখা দরকার জার্মান ভাষায় সাহিত্যপদবাচ্য সব কিছুই এখন বিদেশে ছাপা হয় আর সেগুলো সবই প্রায় সেখানেই পাওয়া যায়।[১] এই পরিস্থিতিতে 'সাহিত্যে জনপ্রিয়তা' শ্লোগানটি খুব উদ্ভট লাগে।

ধরেই নেয়া হচ্ছে লেখক যে-জনসাধারণের জন্য লিখছেন তাঁদের মধ্যে থাকছেন না। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় লেখক আর পাঠকের ভেতর পার্থক্যটাকে যত দুস্তর মনে করা হচ্ছে ততটা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবস্থার এই পরিণতিকে নেহাতই 'বাইরের ঘটনা' মনে করাটা হবে খুব অসম্ভব। নিশ্চয়ই জনপ্রিয় লেখার জন্য আজ বিশেষ চেষ্টার দরকার আছে। কিন্তু তেমন লেখা একটু সহজও হয়েছে—সহজ এবং দরকারি। জনসাধারণের সর্বোচ্চ স্তর থেকে জনসাধারণ আলাদা হয়ে গেছে। জনসাধারণের যারা শোষক আর অত্যাচারী তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন জনসাধারণেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। যে যুদ্ধ আর না-দেখে উপায় নেই। এখন কোন পক্ষে যাব সেটা ঠিক করা সহজ। 'দর্শক'দের ভেতর প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

বাস্তববাদী রচনার দাবিও আর স্বীকার না করে উপায় নেই। এটা দিনে-দিনেই বোঝা যাচ্ছে। আগের চাইতে অনেক প্রকাশ্যভাবে শাসকরা মিথ্যা বলছে, মিথ্যাকে ব্যবহার করছে। এখন মিথ্যার সাইজও বেড়েছে। সত্য কথাটা বলা দিনে দিনেই আরো দরকারি হয়ে পড়ছে। দুঃখকষ্ট বেড়েছে। যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন তাঁদের সংখ্যাও বেড়েছে। জনতার অপার দুঃখকষ্টের তুলনায় ছোটখাট অসুবিধে বা ছোটখাট দলের অসুবিধে তুচ্ছ মনে হয়, যে সব নিয়ে কথা বলতেও খুব খারাপ লাগে।

বর্বরতার আক্রমণের বিরুদ্ধপক্ষ মাত্র একটিই: জনসাধারণ—যাদের ওপর কষ্টের বোঝা চাপানো হয়। একমাত্র জনসাধারণের ভেতরই

---

১. নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করলে বেশির ভাগ জার্মান শিল্পী-সাহিত্যিকই দেশ ছেড়ে চলে যান। বিদেশে, বিশেষত সুইজারল্যাণ্ডে, তখন জার্মান সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হত ও জার্মান বই ছাপা হত। অনু

সম্ভাবনার আভাস আছে। তাই তাদের দিকে ফেরাটাই স্বাভাবিক এবং তাদের ভাষায় কথা বলাটা এখন সবচাইতে জরুরি।

'জনপ্রিয়তা' আর 'বাস্তবতা' এই শব্দ দুটি তাই এখন স্বাভাবিক সহযাত্রী। জনসাধারণের স্বার্থে, মেহনতি জনতার স্বার্থে সাহিত্যকে জীবনের সত্য প্রতিফলন দেখাতে হবে। এবং, জীবনের সত্য প্রতিফলন প্রকৃতপক্ষে শুধু মেহনতি জনতার, জনসাধারণেরই কাজে লাগতে পারে। তাই সাহিত্যকে এমন হতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে ও তাদের কাছে সব অর্থের ইঙ্গিতই পৌঁছয়। তার মানে, সাহিত্যকে জনপ্রিয় হতে হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে কিছু লেখার আগে, জনতা ও বাস্তবতা এই সব ধারণা একটু পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। কারণ সেই ধারণা থেকেই তো তাদের সম্পর্কে লেখা হবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে এ-সব কথা বোঝা হয়ে গেছে, কোনো খটকা নেই, কোনো দ্বিধা নেই, কোনো ইতিহাস নেই—তা হলে ভুল হবে। ('আমরা সবাই জানি এর অর্থ কী, চুলচেরার কোনো দরকার নেই')। 'জনপ্রিয়' কথাটির জার্মান প্রতিশব্দ (volkstumlich) খুব জনপ্রিয় নয়। এই প্রতিশব্দটিকে জনপ্রিয় মনে করা খুব অবাস্তব ব্যাপার।...এই শব্দটিও আনুষ্ঠানিকতা আর পবিত্রবোধের সন্দেহজনক ঘের দিয়ে ঘেরা। এ-সব কথা এড়ানো যায় না। কারণ জনপ্রিয়তার ধারণাটা আমাদের নিশ্চিতভাবেই খুব দরকার।

যাকে বলা যায় কবিত্ব করে বলা, তেমনি একটি ঢঙে 'Volk' শব্দটির অর্থে যেন ধরা হয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু, বা, বরং সেই কুসংস্কারের লক্ষ্য কিছু। এতে সেই লোকায়ত বা জনতা যেন তার নিঃসংশয় বৈশিষ্ট্য, নিয়েই হাজির তার শিল্প প্রকরণ, রীতিনীতি ও অভ্যাস, ধার্মিকতা, পিতৃ-পিতামহের সূত্রে আসা শত্রুতা, অপরাজেয় শক্তি আর এ-রকম সব কিছু। আসলে এর ভেতর অত্যাচারী আর অত্যাচারিতকে, শোষক আর শোষিতকে, মিথ্যাবাদী ও তার শিকারকে অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে; এমন-কি মাথার ওপরে যারা তাদের বিরুদ্ধে নিচুতলার জনতাকেও ঘুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

Volkstum, লোকায়ত বা জনতার এই ধারণা থেকে যে-সব মিথ্যাবাদিতা চলে আসছে তার ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল—সে ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাসেরই অংশ। সে আলোচনায় আমরা যাব না। কিন্তু বিপুল জনসাধারণের জন্য, কয়েকজন মুষ্টিমেয় কর্তৃক শোষিত

অনেক মানুষের জন্য, যথার্থ জনতার জন্য, বিশাল উৎপাদক-শ্রেণী—যারা এতদিন রাজনীতির উপাদান ছিল আর এখন যাদের রাজনীতির কর্তা হতে হবে, তাদের জন্য শিল্প চাই, এই কথা বোঝাতে যখনই আমরা জনপ্রিয় শিল্পের কথা বলব তখনই এই শব্দের জালিয়াতির কথা আমরা যেন মনে রাখি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতাসীন শক্তির দাপটে এই 'জনসাধারণ' পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি, জোর করে কৃত্রিম ভাবে এদের সংস্কারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং **Volkstumlich**—জনসাধারণ—এই ধারণাটি যেন অচল, অনড়, পরিবর্তনহীন কোনো জড় পদার্থের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এই সব ধারণার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই বরং এই ধারণার সঙ্গে আমাদের লড়াই। 'জনপ্রিয়' বলতে আমরা সেই জনতাকেই বোঝাই যারা সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুধু যে সম্পূর্ণ জড়িত তাই নয়, সেই প্রক্রিয়াটিকে তারা কব্জা করছে, চালাচ্ছে, সাব্যস্ত করছে। আমরা সেই জনতার কথা ভাবি যারা ইতিহাস তৈরি করছে, দুনিয়া পাল্টাচ্ছে, নিজেকেও বদলাচ্ছে। আমাদের মনে আছে জনতার সংগ্রামী চেহারা আর 'জনপ্রিয়তা'র সংগ্রামী ধারণা।

পপুলার, জনপ্রিয়, বলতে বোঝায় জনসাধারণের বোধগম্য, তাদের প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন, সে প্রকাশভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করা / জনসাধারণের বক্তব্য গ্রহণ ও সংহত করা / জনসাধারণের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব এমন ভাবে করা যাতে সেই অংশ নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে : অন্যান্য অংশের কাছেও যেন বোধগম্য হয় / ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ ও তাকে অগ্রসর করা / বর্তমান নেতৃত্বের কৃতিত্বকে আগামী নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেয়া।

এখন আমরা 'বাস্তবতা'র প্রসঙ্গে আসি। এই ধারণাটি অনেক পুরোন, বহু লোক বহু উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করেছে। এই ধারণাটিকেও ব্যবহারের আগে সাফাই করা দরকার। কারণ, জনসাধারণ যখন এর উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে তখন এর স্বত্ব-নিরসনের একটি প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। ফ্যাক্টরি যেভাবে দখল করা যায়, সাহিত্যকর্ম সেভাবে দখল করা যায় না, কিংবা শিলা-উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মতো করে সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করা যায় না। ইতিহাসে বাস্তবতাবাদী রচনার নানা ধরনের উদাহরণ আছে। সেই সব রচনা এই সব প্রশ্নের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—কখন, কবে ও কোন শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য এগুলি রচিত। এই সব প্রশ্ন দিয়ে বাস্তবতা চর্চার সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্ম স্তর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু আমাদের মনের ভেতরে আছে, দুনিয়া বদলাচ্ছে এমনই এক লড়াকু জনতা—গল্প বলার কোনো বহু পরীক্ষিত নিয়ম বা সাহিত্যের ইতিহাসে খাড়া করা কোনো মডেল বা চিরন্তন কোনো নান্দনিক নীতির কাছে বাঁধা পড়ার কোনো দায় আমাদের নেই। কয়েকটি বিশেষ লেখা থেকে বাস্তবতার নির্যাস গ্রহণের কোনো দরকার আমাদের নেই। আমরা বরং নতুন-পুরোন যাচাই করা যা একেবারে টাটকা, শিল্পকর্ম থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে সংগৃহীত নানারকম সব উপায় খাটাব যাতে জীবন্ত জনতার হাতে এমন ভাবে জীবন্ত বাস্তবতা তুলে দিতে পারি যেন সেই বাস্তবতাকে কব্জায় আনা যায়। আমরা যেন একটি নির্দিষ্ট পর্বের, ধরা যাক বালজাক বা তলস্তয়ের, নভেলের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ফর্মের সঙ্গে বাস্তবতাকে বেঁধে না ফেলি। তাতে বাস্তবতার নেহাতই একটি সাহিত্যিক ও আইনমাফিক নিরিখ সাব্যস্ত হবে। বাস্তবতা বলতে আমরা এমন একটা অবস্থার ভেতর আটকে থাকব না যে, যা বর্ণনা করা হচ্ছে তার গন্ধ পাঠক শুঁকতে পারে, সব কিছু পাঠক দেখতে পারে, বা অনুভব করতে পারে। সেখানে 'পরিবেশ' তৈরি করা হয় আর গল্প এমন ভাবে বানানো হয় যে চরিত্রগুলো মনের দিক থেকে নগ্ন হয়ে পড়ে। 'বাস্তবতা' বিষয়ে আমাদের ধারণা হওয়া দরকার প্রসারিত ও রাজনৈতিক, নন্দনতন্ত্রের শাসন থেকে মুক্ত, প্রচলিত ধারা থেকে স্বাধীন। 'বাস্তবতাবাদী'[১] বলতে বোঝায়: সমাজের কার্যকারণের শৃঙ্খলা উদ্‌ঘাটন / সমাজে যে দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠিত তাকে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ হিসেবে দেখানো / মানব সমাজের সবচেয়ে কঠিন সমস্যার ব্যাপকতম সমাধান যে-শ্রেণী তৈরি করছে তার অবস্থান থেকে লেখা / প্রগতির প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়া / নির্দিষ্ট কিন্তু সে-নির্দিষ্টতা বিমূর্তণকেই সাহায্য করে।

এ বড় লম্বা চওড়া লিস্টি। ইচ্ছে করলে একে আরো বাড়ানো যায়। এই দাবি পূরণ করতে শিল্পী তাঁর সমস্ত কল্পনা, মৌলিকতা,

১ বিশেষত জর্জ লুকাচের কাছে Das Wort কিছু বিশিষ্ট রচনার জন্য বাধিত। এই রচনাগুলিতে বাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে নানা আলোচনা আছে, যদিও আমার মতে, এগুলিতে বাস্তবতাকে খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। [ব্রেশটের পাদটীকা]

রসবোধ ও নির্মাণ ক্ষমতা ব্যবহার করুন। সাহিত্যের আদর্শ কি হওয়া উচিত তার এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণের কোনো দরকার নেই। বা, কোনো গল্প বলার নিয়ম কি তার একটা খুব অতিনির্দিষ্ট আইন-কানুন মেনে চলতে আমরা শিল্পীকে বাধ্য করব না।

আমরা এটা প্রমাণ করব—যাকে বলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রচনা, যে-রচনায় সব কিছুর গন্ধ পাওয়া যায়, স্বাদ পাওয়া যায়—তাকেই বাস্তববাদী রচনা ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ দেখা যাবে, এমন অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রচনা আছে যা বাস্তববাদী নয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্রগুলোকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করলেই একটা গল্প সবচেয়ে ভালো ভাবে বলা হয় কি না, এটাও আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হবে। আমাদের গল্পের যারা হিরো তাদের মনের ভেতরে কি হচ্ছে না-হচ্ছে সেটার পেছনে যদি পাঠকদের লাগিয়ে দেয়া যায় তা হলেও আমাদের পাঠকরা মনে করতে পারেন যে ঘটনার চাবিকাঠিটা তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় নি। বালজাক ও তলস্তয়ের ফর্ম যদি আমরা ভাবনাচিন্তা না-করেই পুরোপুরি নিই—তা হলে আমাদের পাঠকদের, জনসাধারণকে, আমরা হয়ত ক্লান্ত করে ফেলব। এই লেখকরাও প্রায়ই ক্লান্ত করেন। বাস্তবতা তো শুধুই ফর্মের ব্যাপার নয়। এই বাস্তববাদীদের লেখা টুকে আমরা আমাদের বাস্তববাদের বারোটা বাজাব।

কারণ, সময় চলে যায়। যদি না যেত তবে অবস্থা খুব খারাপ হত। এক-একটা পদ্ধতি নষ্ট হয়ে যায়, প্রেরণা শুকিয়ে যায়। নতুন সমস্যা দেখা দেয়, নতুন টেকনিকের প্রয়োজন হয়। বাস্তবতা বদলে যায়। বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে, প্রতিফলনের উপায়ও পাল্টাতে হয়। পুরোন থেকেই নতুন জন্মায়। কিন্তু তার ফলেই তো সে নতুন হয়ে ওঠে।

অত্যাচারীরা সবসময়ই এক মুখোশ পরে না। সেই মুখোশ সবসময় একই ভাবে খুলে দেয়া যায় না। যে আয়না সামনে ধরা হয়েছে, সেটা এড়ানোর নানা ফন্দি আছে। তাদের যুদ্ধের রাস্তাগুলোর নাম এখন হয়েছে গাড়িচলার রাস্তা। তাদের ট্যাঙ্কগুলোর গায়ে এখন ঝোপঝাড়ের রং। তাদের দালালদের হাতও এখন শিরা-ওঠা—যেন তারা মজুরই। এই শিকারীকে শিকার করতে নানা রকম ফন্দি দরকার। কাল যা ছিল জনপ্রিয়, আজ আর তা জনপ্রিয় নেই। কারণ কালকের জনসাধারণ তো আজকের জনসাধারণ ছিল না।

যার সংস্কার নেই, তেমন যে-কেউই মানবেন যে সত্য গোপনের নানা উপায় আছে, সত্য বলারও নানা উপায় আছে। সরাসরি বর্ণনা দিয়ে যা

গল্প-কথা বলে বা মজা করে বা বেশি বলে বা কম বলে—নানা ভাবেই তো পরিস্থিতির অমানবিকতার কথা বলা যেতে পারে। মঞ্চে বাস্তবতাকে যদ্দৃষ্টং করেও দেখানো যায় আবার আজগুবি করেও দেখানো যায়। অভিনেতা মেক-আপ ছাড়া বা খুব কম মেক-আপে বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে মঞ্চে নাবতে পারেন। তবু সব ব্যাপারটা বানানো মনে হতে পারে। আবার তারা সব উদ্ভট মুখোশ পরে নামতে পারে ও সমস্তটাকেই খুব সত্য মনে হতে পারে। এ নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই—যে-পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না, তার উদ্দেশ্যটা আগে পরিষ্কার ধরতে হবে। জনসাধারণ জানেন সেটা কি করে ধরতে হয়। মঞ্চে পিসকাটোর বিরাট সব পরীক্ষা এবং আমারও নানা পরীক্ষায় প্রচলিত ফর্মকে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলো শ্রমিকশ্রেণীর প্রগতিশীল অংশের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছে। তার মধ্যে কতটা সত্য আছে—এই দিয়েই শ্রমিকরা সব কিছু বিচার করে। সত্যের প্রতিফলন ঘটাতে, সমাজের আসল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখাতে যে-নতুন পদ্ধতি সাহায্য করে তাকেই তারা সমর্থন করে। যা-কিছু দেখে মনে হয় শখের খেলনা, এমন একটা কল যা শুধু চলার জন্যই চলে, অর্থাৎ যার কোনো কাজ নেই বা এখনো কোনো উদ্দেশ্য নেই—তেমন সব কিছুকেই তারা বর্জন করে। শ্রমিকরা কখনোই শুধু-সাহিত্যিক বা শুধু-থিয়েটারের যুক্তি ব্যবহার করে না। 'তোমাকে ফিল্ম আর থিয়েটার মেলাতে দেয়া হবে না',—এই ধরনের কথা কখনোই বলা হয় না। যদি ফিল্মটা ঠিকমতো কাজে লাগানো না হয়ে থাকে তা হলে বড় জোর শোনা যাবে, 'ঐ ফিল্মের ব্যাপারটার কোনো দরকার নেই, ওটাতে মন মরে যায়'। শ্রমিকদের কোরাস জটিল ছন্দের পার্ট বলেছে—('যদি এটা মিল-দেয়া ছড়া হত, তাহলে তো সব মাখনের মতো গলে যেত, কিছুই আর লেগে থাকত না) ; বা আইসলার সব কঠিন অনভ্যাস, সুর গেয়েছে ('গানটার ভেতরে মাল আছে')। কিন্তু এমন কিছু লাইন আমাদের বদলাতে হল—যার অর্থ ছিল ভুল, বা, যার অর্থে পৌঁছতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। যে-সব মার্চিং সঙে ভালো মিল থাকত যাতে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় আর খুব সোজা ছন্দ থাকত যাতে গাওয়া সহজ হয়, সেই সব গানে যখন একটু জটিল করে, একটু নিয়ম ভেঙে সূক্ষ্ম সব কাজ যোগ করা হত তখন তারা বলত, 'বেশ মজার তো, কেমন একটা খোঁচ আছে'। যে-জিনিস পুরনো, তুচ্ছ, এতই সাধারণ যে কিছু ভাবতে হয় না ('এর ভেতর কিছুই নেই'), সে সব নিয়ে তাদের কোনো কাজ নেই। যদি কোনো নন্দন-

তত্ত্বের দরকার হয়, এই তো সেই নন্দনতত্ত্ব। একটি ঘটনা আমি কখনো ভুলব না। একজন শ্রমিক আমাকে বলেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে লেখা এক গানের ভেতর আরো কিছু ঢোকাতে ('গানটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে—নইলে কোনো মানে নেই')। জবাবে আমি তাকে বলেছিলাম—তেমন কিছু ঢোকালে গানটার শিল্প-ফর্ম নষ্ট হবে। শুনে সে একদিকে মাথাটা হেলাল ও হাসল। এই বিনীত হাসিতে নন্দনতত্ত্বের এক ভাগ পুরোপুরি ধ্বসে গেল। শ্রমিকরা আমাদের শিক্ষা দিতে ভয় পায় না, শিক্ষা নিতেও ভয় পায় না।

যতক্ষণ বাস্তবতা নিয়েই আমাদের কাজ, ততক্ষণ অনভ্যস্ত দুঃসাহসী কোনো কিছুই প্রলেতারিয়েতের সামনে উপস্থিত করতে আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই—এ-কথাটি আমি কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। এমন শিক্ষিত লোক বা শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার সব সময়ই থাকে যারা বলে, 'এটা সাধারণ লোক বুঝবে না'। কিন্তু এই সাধারণ মানুষ নেহাত অধৈর্যে তাদের হটিয়ে দেয়, এবং শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে। সংখ্যালঘুর জন্য খুব কালচার্ড জিনিসপত্র বানানো হয়, তা দিয়ে আবার যাতে সংখ্যালঘুই তৈরি হয়: কোন এক ধাঁচের টুপির দ্বিসহস্রতম সংস্করণ, খুব বিখ্যাত কোনো পচা মাংসের নতুন মসলাদারি রান্না। প্রলেতারিয়েত মাথার একটা ঝাঁকুনিতে এ-সব বাতিল করে, ('মাথা খাটানোর আর জিনিস নেই!') মসলাটা বা রান্নাটা প্রলেতারিয়েত বাতিল করে না—বাতিল করে মাংসটা। দ্বিসহস্রতম সংস্করণটিকে বাতিল করে না—টুপিটিকে বাতিল করে। তারা নিজেরা যখন লেখে ও থিয়েটার করে তখন তাদের মৌলিকতা চমকে দেয়। যাকে বলা হত 'এজিট-প্রপ' শিল্প, অনেক কিসিমের নাকই তো সেই শিল্পের দিক থেকে ঘোরানো ছিল। কিন্তু সেই শিল্পে নতুন টেকনিকের ও প্রকাশভঙ্গির কত পরীক্ষাই না করা হত। সত্যিকারের জনপ্রিয় শিল্পের বিস্মৃত চমৎকার সব ফর্ম সেখানে ব্যবহার করা হত নতুন সামাজিক উদ্দেশ্যে। দুঃসাহসী সব কাট্ ও কম্পোজিশন্, সুন্দর সব সরলীকরণ (ভুলচুকের সঙ্গে সঙ্গে),—এই সবের ভেতর প্রায়ই ছিল বিস্ময়কর পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ এবং জটিলতার প্রতি নির্ভীক আকর্ষণ। এর অনেক কিছুই হয়ত ছিল নেহাতই প্রাথমিক পর্যায়ের। কিন্তু বুর্জোয়া শিল্পের তথাকথিত বহু বৈচিত্র্যের ভেতর যে-প্রাথমিকতা থাকে, এ-শিল্পে তা ছিল না। বাস্তবতার প্রধান বিষয়কে যে-শিল্পপ্রকরণে ধরার চেষ্টা হয় ও যে-শিল্পপ্রকরণে বিমূর্ততার চেষ্টা আছে—তাকে কতকগুলি

ভুল কেরামতির অভিযোগে বাতিল করা অন্যায়। শ্রমিকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ছিল ন্যাচারিলিজম ওপরপটকা বাস্তবতাকেই শুধু ধরতে চায়। তারা যখন বলে,...'আমরা এত জানতে চাই না', তখন আসলে বলতে চায়, আপাতদৃশ্য বাস্তবতার গভীরে যে-সামাজিক শক্তিগুলি সক্রিয় তার বাস্তব প্রতিফলন তারা দেখতে চায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি : ''থ্রি পেনি অপেরা'র উদ্ভট পোশাক-আশাক ও আপাত-অবাস্তব সেট দেখে তারা ঘাবড়ায় নি। তারা সঙ্কীর্ণ নয়, তারা সঙ্কীর্ণতাকে ঘৃণা করে (তাদের থাকার ঘরগুলো বড় সঙ্কীর্ণ)। তারা উদার, তাদের নিয়োগকর্তারাই কিপটে। তারা ভেবেছিল—শিল্পী যাকে অপরিহার্য ভাবছেন, তেমন কিছু বাদ দেয়া যায় কিন্তু সে-ব্যাপারে তাদের সহ্যশক্তিও বিস্ময়কর। তারা ওপর-ভাসা কিছুর বিপক্ষে নয় : তারা কিছু ওপর-ভাসা লোকের বিরুদ্ধে। যে-বলদ ধান মাড়াই করে তার মুখে ঠুলি পরাতে তারা রাজি নয়, কিন্তু এটা তারা দেখতে চায় যে বলদ মাড়াইটা যেন করে। সৃষ্টির সর্বজনীন প্রক্রিয়া—এ-ধরনের কোনো কিছুতে তারা বিশ্বাস করে না। তারা জানে তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে তাদের অনেক ধরনের প্রক্রিয়া দরকার। যদি কোনো নন্দনতত্ত্বের দরকার হয়—এই তো সেই নন্দনতত্ত্ব।

সুতরাং জনপ্রিয় আর বাস্তব শিল্প নির্ধারণের নিরিখ শুধু যে খুব সাবধানে ঠিক করা দরকার, তাই নয়, খুব খোলামনেও ঠিক করা দরকার। বর্তমানে প্রচলিত জনপ্রিয় রচনাগুলি থেকে বা বাস্তববাদী রচনাগুলি থেকে তার নিয়মকানুন বানানো যায় না। এ-রকম চেষ্টা করলে তা হবে তো এক আঙ্গিকসর্বস্ব নিরিখ এবং কোন্ রচনা জনপ্রিয় আর কোন্ রচনা বাস্তব তা সাব্যস্ত হবে শুধু আঙ্গিক দিয়ে।

বিখ্যাত সব বাস্তববাদী রচনার সঙ্গে মিল আছে কিনা তাই দিয়ে তো আর কোনো রচনা বাস্তববাদী কি-না তা বিচার করা যায় না। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই জীবনের যে-চিত্র আঁকা হয়েছে তা তুলনা করতে হবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে, আরেকটা চিত্রের সঙ্গে নয়। তেমনি জনপ্রিয়তার ব্যাপারে আঙ্গিকসর্বস্ব পদ্ধতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। জনসাধারণের প্রিয় সব লেখার নকল করে তো আর একটি লেখা সুবোধ্য হয়ে উঠতে পারে না। সেই জনপ্রিয় লেখাগুলিও তো আর তাদের আগের কোনো লেখা নকল করে তৈরি হয় নি। সেগুলিকে সুবোধ্য করার জন্য কিছু করা

হয়েছিল। তেমনি নতুন লেখাগুলি সুবোধ্য করার জন্যও আমাদের কিছু করতে হবে। 'জনপ্রিয়'-র মতোই 'জনপ্রিয় হয়ে ওঠা'-ও তো একই ব্যাপার।

যদি আমরা সত্যি এমন জনপ্রিয় রচনা চাই যা জ্যান্ত, লড়াকু, বাস্তবতার দ্বারা সম্পূর্ণ ধৃত, বাস্তবতাকেও সম্পূর্ণ ধারণ করে আছে, তা হলে বাস্তবতার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের তাল রাখতে হবে। জনতার বিপুল ধারা আজও বাড়ছে। জনতার শত্রুদের কাজকর্ম ও বাস্তবতাই তার প্রমাণ।

অনুবাদ : প্রমীলা মেহতা

প্রতিশব্দ

(মিকিস থিওডোরাকিসের জন্য)

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শব্দ গললে স্রোতের ঢল নামে।   তার
ব্যঞ্জনার রেশটুকু নেভে-না যন্ত্রণার অগাধ
ছায়ায় ডুবলে, যন্ত্রণার বিশৃঙ্খলতায়
ডুবলে।

যন্ত্রণা গললে স্রোতে ঢল নামে।   তার
ইচ্ছার জ্বালাটুকু নেভে-না শব্দের অগাধ
ছায়ায় ডুবলে, শব্দের বিশৃঙ্খলতায়
ডুবলে।

আমার সময় খুব কম

রত্নেশ্বর হাজরা

গন্ধেরা রয়েছে অপেক্ষায়
বাগানের কাছে
ঝরনারা কোথায়
যজ্ঞশালায় অগ্নি একা
মন্দির খোলে নি পুরোহিত
পথের দুপাশে যেন কার উপবীত
ছিঁড়ে পড়ে আছে—

রোদ্দুর দেখাচ্ছে খেলা গলিতে গলিতে
অন্য মাঠ ফাঁকা
বন্ধনের রজ্জু পড়ে আছে
অশত্থতলায়
বন্দীরা হয় নি আজও ফেরারী
মুক্তিতে
আমাকে যে যেতে হবে বাড়ি
সন্ধ্যার আগেই
দিন যে চলেছে খুব দ্রুত
দিন যায়—

সিদ্ধকাম-মূষিক সমাচার

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

সিদ্ধকাম চলে গেছেন বনে
ভারমুক্ত মূষিক এখন গান গাইছে
বসে সিংহাসনে।

আসলে ও মূষিক নয়
লম্বোদরের অনুরক্ত বাহন
প্রভুর যে কাজ অসমাপ্ত—
শাস্ত্রমতে দোহন এবং দাহন—
তাকেই মেনে নিয়েছে ও
নিজের এবং দশের পরমার্থ
অন্ধজনে কাঁপায় গগন—
এ সব নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থ!

আসলে ও বাহনও নয়
মহাপ্রভুর নিজস্ব ভাবমূর্তি
তাকেই প্রভু রেখে গেছেন:
বকলমে নিজের উদরপূর্তি।

মূষিক যখন পালাক্রমে ফিরে যাবে বনে
সিদ্ধকাম বসবেন তাঁর তক্তে
এমন একটা অলিখিত চুক্তি
হয়েই আছে গুরু এবং ভক্তে।

এ বছরে গুরু আনেন বন্যা
শিষ্য আনে খরা পরের বছর
ভক্ত যদি গুঁড়িয়ে দেয় স্বপ্ন
গুরু এসে গুছিয়ে দেন ঘর।

মধ্যখানে সম্মোহিত মানুষ
পেখম তোলে দেখলে মেঘের ছায়া
গরম হাওয়া যখন ওড়ায় মেঘ
ত্যাখে সবই প্রভুর মহামায়া।

সিদ্ধকামের সখের ভ্রমণ :
চুক্তিমাফিক লুকিয়ে থাকেন বনে
মূষিকেরা গান গেয়ে যায়
বসে প্রভুর ত্যক্ত সিংহাসনে।

দরবারি কানাড়া

শুভ বসু

নারকেলবীথিও খুব গম্ভীর
তাকে কি
নিখিলরাত্রির ধ্যান ছুঁয়েছে গোপনে ?

স্তন থেকে
আবরণগুলি সরে গেলে
তৃষ্ণার গম্বুজ।

আমাদের দৈনন্দিন
জীবনযাপন থেকে

আলগা হাসি, অনর্থক
শব্দগুলি খসে খসে গেলে
মানুষেরই মুখের দর্পণে দূর নক্ষত্রমণ্ডল
নিজের গোপন-রাখা নিঃসঙ্গতা, শূন্যের বিশাল চাপ
দেখে, তমস্বিনী তার
আলোর সামর্থ্যে বড ছুয়ো দেয়,
শোনায় ধ্বংসের খুব ক্ষুব্ধ ঘন জ্যাজ।

তোমার শীর্ণতা ছেড়ে উঠে এস,
এস স্তব কর।
কীর্তিনাশা প্রবল কল্লোলে বয়।
স্রোতোস্বান তার সেই পেশীর টংকার বাজে—
একদম স্তব্ধ হয়ে শোন। এখন নির্মোকগুলি
খুলে গেলে, নগ্ন,
এই শূন্যতার প্রবল দাপটে
তুমি নিজেকে মেলাও।

তোমার ঘর কি খুব ছোট নয়,
তোমার সংসার?

সবাই পালিয়ে যায়

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাই পালিয়ে যায় আসন্ন বিপদে···
অন্ধকার স্বচ্ছ হলে নিশ্চিন্ত মানুষ
শঙ্কার বিকল্প চিত্র স্মৃতিতে থাকে না;
চেতনা বধির হলে অদ্ভুত জড়ত্ব
অস্থিরতা ছিঁড়ে ফেলে মগ্ন পরিবেশ
লহমায় বিবেকের দ্রুত পলায়ন—
সমস্ত বিস্ময়বোধ হয়ে পড়ে একা।

সাক্ষী থেকে যান দূরে বিহ্বল ঈশ্বর
আবিষ্টতা কেটে গেলে উন্মেষ তখন।

খেলা

মতি মুখোপাধ্যায়

ঝাঁপির ভিতর থেকে উঠে আসে কারা
কার সুরে, কে বাজায় মোহন মুরলী
আমিও যে মাথা নাড়ি, নড়ে চড়ে উঠি
প্রতিধ্বনি আমাকে জাগায়
ও কি তবে সাপুড়িয়া, দূরে যার কুঠি
নাকি দানবের
প্রাচীর রেখেছে ঘিরে বসন্তের দিন
বই থেকে মুখ তুলে একদিন বলেছিল কেউ
সে কী কোন ভাবুক বালক
বলেছিল···, সে কাহিনী জানি
আমি জানি আরো কিছু গভীর বেদনা
যেন আলো ছাড়া বায়ু ছাড়া প্রজাপতি ছাড়া
ফুল ছুঁতে আর কারো অধিকার নেই
বসন্তের উদ্যানে যে বাজাল মোহন মুরলী
তার অই ঝাঁপি নাকি, অহোরাত্র ডাকে
প্রতিধ্বনি আমাকে জাগায়
প্রতিধ্বনি শুনে মাথা নাড়ি
শরীর দোলাই।

যে খেলাই সাপুড়ে দেখাক
আমাকে দেখাতে হবে খেলা
আমাদের নড়াচড়া ইচ্ছাগুলি নিয়ে
আমাদের জন্মদিন মৃত্যুদিন নিয়ে
স্বপ্ন নিয়ে প্রেম নিয়ে যন্ত্রণাকে নিয়ে
আরো যা দেবার থাকে সব
এমনকি শেষ বিন্দু রক্তটুকু নিয়ে।

বেদুইন

দীপক রায়

দ্রুত অশ্বারোহীরা নগর আর জনপদ পার হচ্ছে
দ্রুত জাহাজ বন্দর থেকে চলে যাচ্ছে দূরে
রেলগাড়ি সবুজ পতাকা উড়িয়ে আরো দ্রুত নগর থেকে
দূরে
দূরে
দূরে
আমার চার পাশের আবহ থেকে শব্দ শেষ হচ্ছে দ্রুত
আজ সূর্যাস্তের আগেই একটা নীল উট পশ্চিম
দিগন্ত থেকে
পায়ে পায়ে
পায়ে পায়ে
হেঁটে আসছে
আমার কাতর হাত উটের লাগামে ধরা আছে
ও হাটছে
দ্রুত নয়
পাহাড়ের ওপারে সূর্য ডোবার মুহূর্তে অভিষেকের
বাজনা বাজবে
আর তখনও উটের লাগাম ধরে হাঁটতে থাকবে
অপরিচিত
এক বেদুইন……

সুফিয়া কামাল তাঁর প্রায় ৭০ বৎসরের জীবনে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়ে উঠেছেন। মুসলমানি আভিজাত্যের ভেতর কেটেছে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ। স্কুল-কলেজের শিক্ষা তিনি পান নি। এক গভীর সংস্কৃতিচেতনায় তিনি যেমন ভাঙতে পেরেছেন পর্দা, তেমনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন শিক্ষায় সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশের সমস্ত প্রগতিকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই বর্ষিয়সী ঠিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক নেত্রীও নন কিন্তু, তাঁর অবস্থান বাংলাদেশের সব কিছুকেই আধুনিকতা, স্বাদেশিকতা ও প্রগতিশীলতার মর্যাদা দেয়।

তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের এক অংশের কাহিনী লিখেছেন। তাতে মুসলিম অভিজাত পরিবারের ভেতরের কাহিনী যা জানা যায়, তেমনটি বোধহয় বাংলা সাহিত্যের আর কোনও লেখা থেকে জানা সম্ভব নয়। আমরা পুরো লেখাটাই একসঙ্গে প্রকাশ করছি। ঢাকার 'গণসাহিত্য' পত্রিকা ও বাংলাদেশের কবি-সমালোচক হায়াত মামুদের সৌজন্যে লেখাটি আমরা পেয়েছি। স. প.

আমার কথা

সুফিয়া কামাল

১৯১১ সালের ২০শে জুন আমার জন্মদিন। বাংলা আষাঢ় মাস। সেকালে জমিদার বাড়িতে পুণ্যাহ বলে একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হত। আনন্দ-কলরবে আমার জন্মক্ষণটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বলে শুনেছি। কিন্তু তারপর!

সারা বাংলাদেশে বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ নওয়াব পরিবারের তখন খ্যাতি। মাতামহ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের কনিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা সাবেরা খাতুন আমার মা। ত্রিপুরা জেলার শিলাউর গ্রামের সৈয়দ আব্দুল বারি বি. এল্. আমার বাবা। আমরা এক ভাই এক বোন।

আমার ভাই সৈয়দ আবদুল ওয়ালি আমার তিন বছরের বড়। আমরা মাতামহের গৃহে আদর-যত্নে লালিত-পালিত। শায়েস্তাবাদ পরিবার তখন মানে-সম্মানে ধনে-জনে ঐশ্বর্যে-শিক্ষায়-শৌহ্‌রতে তাজিম-তওজায় বিখ্যাত। অন্দর মহলে পুরোপুরি মোগলাই আদব-কায়দা, হালচাল, শিক্ষা-সংস্কৃতি। বাইরে ইঙ্গ-বঙ্গ ফ্যাশন, কেতাদুরস্ত হালচাল। মামারা ব্যারিস্টার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নিমকের দেওয়ান, পুলিশের বড় কর্তা। কিন্তু ছয় মাস, বছর— বড় জোর বছর দুই, চাকরির পর 'গোলামির মুখে ঝাড়ু মারি' বলে হাতি, ঘোড়া, বজরাবাইচ, গাড়ি, পাল্কি, বাইজি শোভিত প্রাসাদে ফিরে এসে, সুবৃহৎ পাঠাগার স্থাপন করে আরাম-আয়েশে থাকতে থাকতে হঠাৎ শ্রাবণ-রাতের প্লাবন ধারার মতো একে-একে অনন্তের ডাকে পরিণত অপরিণত বয়সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

আমার প্রথম স্মরণে জাগে ঐশ্বর্যের সমারোহ। বর্তমানের পাঁচতলা সমান উঁচু দোতলা বাড়ির বিরাট দরওয়াজা, আবলুস কাঠের চিক্কন সূক্ষ্ম কারুকাজের উপর রোদের আলো পড়ে চক্ চক্ করে উঠত। ছাদ ভর্তি টানা পাখার আওতা বাঁচিয়ে বিরাট বিরাট ঝাড় ফানুস, হাওয়ার তার টুংটাং আওয়াজ। টানা পাখাগুলো খশ-এর পাল্লা দেওয়া, গরমের দিনে তাতে পিচকারি দিয়ে পানি দিত বাঁদিরা। দুপুর বেলা ছায়াছায়া, অন্ধকারের মধ্যে সেই পাখার হাওয়া, খশ-এর খুশ্‌বু ; চারিদিকে বাঁদি-খোলাই। আতুজি মোগলানিরা বসে আছে, আর মামানি, খালাআম্মারা, মা-বোনেরা শুয়ে-বসে পান খেতে খেতে বা হাতে-পায়ে মেহেদি লাগাতে লাগাতে, কেউবা শেলাই হাতে, কেউবা সরু সুন্দর শুপারি কাটার অভ্যাস করতে করতে 'আমির হামজা' বা 'হাতেমতাই'-এর পুঁথি পড়া শুনছেন—পড়ছেন বসে আমার আম্মা—টুকটুকে ঠোঁট নেড়ে রূপে অপরূপা, গুণে অতুল্যা, ধৈর্যে অনিন্দিতা—সেই আমার মা।

মাটিকে বাদ দিয়ে ফুলগাছের যেমন কোনও অস্তিত্ব নেই আমার মাকে বাদ দিয়ে আমারও তেমন কোনও কথা নেই। আমি জন্ম নেবার আগেই মায়ের মুখে 'হাতেম তাইয়ের কেচ্ছা' শুনে আমার নানিআম্মা আমার নাম রেখেছিলেন হাসনাবানু। আমার নানা প্রথম বয়সে সদর আলা থেকে জজগিরি পর্যন্ত সারা করে শেষ বয়সে সাধক-'দরবেশ' নাম অর্জন করেছিলেন। শুনেছি যে-দিন আমি হলাম, নিজের হাতে আমার মুখে মধু দিয়ে তিনি আমার নাম রেখেছিলেন সুফিয়া খাতুন। কিন্তু আমার ডাক নাম হাসনা বানুটাই আমাদের পরিবারে প্রচলিত। সুফিয়া বললে এখনও কেউ কেউ আমাকে হঠাৎ চিনতে পারেন না। আমার ভাইয়া ছোট বেলায় আমাকে ডাকতেন 'হাচুবানু' বলে ; কেউ কেউ বলত 'হাসুবানু'।

মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—সুখস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নে আসে একটা আতঙ্কিত ভাব ; সুখস্বপ্নের মধুর আবেশে মন ভরে থাকে। আমারও শৈশবের সুখ-স্বপ্ন মধুময়। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে, শিক্ষিত পরিবারের আওতায়, ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছি :

মক্তব-মসজিদ-লঙ্গরখানা, স্কুল-পাঠাগার, হিন্দু কর্মচারীদের পূজা-পার্বন অনুষ্ঠান-উৎসব আনন্দ ছড়ানো একটি পরিবেশ। ছোট বেলায় এসব আনন্দ উৎসবে শরিক হতে বাধা ছিল না। বার মাসে তের পার্বন লেগেই থাকত। তখনকার জমিদারেরা শাসন করতেন কড়া হাতে আবার পালন

করতেন উদার মন নিয়ে। ঈদে-বকরঈদে সারা রাজ্যের প্রজারা এসে নামাজের পর জড়ো হয়ে জমিদারের সাথে কোলাকুলি করত। মামারা ঘেমে যেন বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। তবুও গলা মিলাবার পালা ক্ষান্ত হত না। সবাই খেতে বসত। একসাথে হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে। শুধু দুই ঈদেই নয়। শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদরেও এ-ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হত। আমাদের নবি করিমের জন্মদিন 'বারে ওফাত' ঈদ-ই মিলাদুন্নবি বড়ই সমারোহের সাথে সম্পন্ন হত, আলোতে জেয়াফতে ধনী-দরিদ্র বারদিন ধরে মিলাদ-মহফিলে সমবেত হত। বারদিনের দিন জেয়াফত খাওয়ানো হত সকলকে একসাথ করে। আখেরি চাহার শোম্বা —হজরতের আরোগ্যস্নানের দিনটিতে সকলে দোয়া লেখা পানি মাথায় দিয়ে গোসল করে বৎসরের মতো রোগের হাত থেকে বাঁচবার আরামের নিঃশ্বাস ফেলত। বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য তো এ দিনটি প্রত্যেক মায়ের প্রতীক্ষার দিন ছিল। এসব হল বিশ্বাসের আশ্বাসের ইমানের কথা। মোহররমের দশদিন এলাকার প্রজারা বাড়িতে রাঁধত না। সারাদিন রোজা রাখার পর খিচুড়ি ও শরবত খাবার জন্য দলে দলে সমবেত হত। সন্ধ্যায় কোরআন তেলাওয়াত, দরুদ পাঠ আর মর্সিয়া জারি গানের সুরে আকাশ বাতাস বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠত। 'শহিদে কারবালা' 'জঙ্গনামা' পুঁথিও পড়া হত! নিকটের-দূরের গাঁয়ের 'পণ্ডিতেরা' এসে সরকারি বাড়িতে পুঁথিপড়া শুনিয়ে ইনাম বখশিস্ নিয়ে যেতেন। জমিদার বাড়িকে সবাই বলত 'সরকারি বাড়ি' বা 'নিওয়াব বাড়ি'। আমার নানা নওয়াব ছিলেন। কিন্তু নওয়াব বাড়ি কথাটা তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন, এটা সবার বাড়ি—তাই 'সরকারি বাড়ি' কথাটাই চালু ছিল।

আমলা-কর্মচারী, ডাক্তার-কবিরাজ এঁরা ছিলেন হিন্দু। তাঁদের পালা-পার্বন-পূজায় জমিদারের খরচায়-ই উৎসব হত। ভোজও তাঁরা জমিদারকে দিতেন 'সম্মানী' নজর সহ। তাদের দেয়া উপহার পায়েস 'পরমান্ন'-নাড়ু-মণ্ডা-মিষ্টি যে কত খেয়েছি! আবার তাদেরকেও দিতে হত সম্মানী টাকা। সাহেব, বেগম সাহেবা, ফুফুজান, খালাআম্মা, আপাজান, দুলাভাই সাহেবদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেতেন সেলামি বাবদ। এঁদের বেতন ছিল মাসিক ৮, ১০, ১৫ টাকা; কিন্তু বাড়ি-ঘর, জমি, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল যথেষ্ট। পুকুর-দিঘির মাছ, বাগ-বাগিচার ফল, পান-গুপারি, তরকারি এরা পয়সা দিয়ে কিনতেন না। এঁদের বৌ-ঝিরা অনেক সোনার গয়না

পরতেন। আমাদের খানদানে সোনা কেউ বড় একটা পরতেন না। সাচ্চা পাথরের 'জড়াও' গয়না এবং সাধারণত মোতির ব্যবহার বেশি ছিল। মুরুব্বিরা বলতেন, সোনা যদি আমরা পরব তবে বাঁদি-চাকরানী-দাই-খেলাইরা কি পরবে?

তাই ওদের সকলের হাতে-নাকে-কানে গলায় যে পরিমাণে সোনা দেখতাম, আজকাল তা আমাদের নেই, হীরা-মোতি তো দূরের কথা। কাপড়-চোপড়েও ঢাকাই শাড়ি, থানের উপর চিকনের কাজ করা, আবেরওয়াঁ আর আসল মসলিন না হলেও নামে মসলিনের উপর চিকনের কাজ করানো কাপড়ের ব্যবহার ছিল। পুরুষদেরও কুরতা, বেনিয়ান, শেরওয়ানি তাই দিয়ে তৈরি হত। বিয়ে-সাদিতে সাচ্চা কাজ করা সিল্কের কাপড়ে পেশোয়াজ, ওড়না, পাজামা এবং জোড়া বদ্‌লাইয়ের জন্য বেনারসি শাড়ির প্রচলন ছিল। তারপর এল বোম্বাই শাড়ি। গয়নাপত্র ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, কলকাতার হ্যামিল্টনের দোকানে অর্ডার দিয়ে আমদাজি করা হত। চিকনের কাজ, বদলার কাজ মোগ্‌লানিদের সাথে বসে ঘরের বৌ-মেয়েরাই পছন্দমত তৈরি করে নিতেন। ছোট থাকতে কাপড় দরজি সেলাই করবে; কিন্তু একটু বড় হয়ে উঠলে ঘরের মেয়েদের গায়ের মাপ অন্য পুরুষ জানবে—এটা বড় বেহায়াপনা ও শরমের কথা ছিল। নিজেদের নিমা নিজেরাই তৈরি করে নিতে হবে। তার উপর ঢিলা কুর্তা ও কলিদার পায়জামা এবং তার সাথে ওড়না ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল। আমাদের পরিবারে শালওয়ার কামিজের প্রচলন হয়নি। উৎসবে খুশিতে শাড়ি পরতে বড় ভালো লাগত। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা পায়জামা কুর্তা পরত। অবিবাহিত মেয়েদের সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো বা সাজগোজ করা, পানখাওয়া ইত্যাদি একদম নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের যুগে আমরা সাবান-পাউডার ব্যবহার করেছি। কিন্তু নানি, খালা, মামানি, মা—এঁরা সাবান, পাউডার ব্যবহার করতেন না। তাঁরা মুসুরের ডাল পেষা, উপটন ও সেন্দা মেথি গিলা, একাঙ্গী পেশা ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ তাঁদের ঘর-বিছানা ভরে থাকত। মেহেদি পরার ব্যাপারটাও একটা ললিতকলার মতো অনুষ্ঠান ছিল। প্রথম কোনও শিশু রোজা রাখলে তার রোজা রাখার দিন পহেলা রমজান একটি আনন্দ উৎসব হত। রোজাদার শিশুকে সকাল থেকে নানা ধর্মকথা শোনানো হত। তাকে মেহেদি লাগিয়ে সেন্দা-মেথির খুশ্‌বু মাখিয়ে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হত।

যে কয়জনই এ-ভাবে একসাথে রোজা রাখত, সবাইকেই একরকম ভাবে তোয়াজ করা হত। তারপর আসত ইফ্তার তৈরি করার পালা। মুরুব্বিরাও গোসল নামাজ সেরে জোহরের পর থেকেই ইফ্তারের আয়োজনে লেগে যেতেন। কতরকম ইফ্তার যে তৈরি হত! আসরের নামাজ পড়ে সেই ইফতারের অংশ মসজিদে দিয়ে এসে তবে মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে বাচ্চা রোজাদার অপেক্ষা করত ইফ্তারের সময়ের জন্য। মসজিদে মুয়াজ্জিন আজান দিলেই রোজা খোলা হত। গরিব বাচ্চারা থাকত আশে পাশে; তারাও খেতে পেত। আর পেত পয়সা। ধনী গৃহের অনুষ্ঠানটি দরিদ্রদেরও ভাগ্যে ভালো খাবার জোটাবার একটা উপায় ছিল।

আমাদের সুবৃহৎ পরিবারে বাচ্চা অভাব ছিল না। প্রত্যেক বছরই দু-চার জনের রোজা খোলাই হত। এমনি এক রোজা খোলাই হচ্ছিল আমার মামাতো বোনের মেয়েদের। মামাতো বোনের মেয়ে হলেও আমার চেয়ে তারা ছিল বয়সে বড়। তাদের রোজা রাখা দেখে আমিও নাকি জেদ ধরেছিলাম রোজা রাখব বলে; আমার বয়স নাকি তখন ছ-বৎসর পূর্ণ হয়নি। অবশ্য পরে আমি একথা সকলের কাছে শুনতে পেয়ে জেনেছি। আমার জেদ দেখে আম্মারা নাকি বলেছিলেন: থাকুক কতক্ষণ; না খেয়ে খিদে পেলে বা পিয়াস লাগলে আপনি খেতে চাইবে। কিন্তু আমি নাকি সারাদিন ধরে কিছুই খেতে রাজি হইনি। তাই আমাকেও মেহেদি উপটন লাগানো হল, গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পড়ানো হল। সন্ধ্যায় আজান দেবার অল্পক্ষণ আগে নাকি আমি বলেছিলাম: আর রোজা রাখব না, পানি খাব। তখন নাকি একেবারে সন্ধ্যা। তাই আমাকে কোলে করে ভুলিয়ে ভালিয়ে আজান দেয়া পর্যন্ত এটাসেটা করে সময় কাটিয়ে দেয়া হয়।

আজান হওয়া মাত্র মুখে শরবত দেবার সাথে সাথেই নাকি আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর হুলুস্থুল কাণ্ড। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। কোথায় কি করবে—মসজিদের বড় হাফেজ সাহেব আম্মার ওস্তাদজি, তিনি এসে আম্মাকে খুব বকলেন, আর আমাকে কোলে করে বসে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করলেন। ডাক্তার-কবিরাজ সবাই মুখের ফাঁকে ওষুধ দিতে লাগলেন। রাত তিনটায় আমার হুঁশ হতেই বলে উঠলাম যে পানি খাব। কিন্তু পরে সাত বছর থেকে রোজা রেখে আর কখনও বেহুঁশ হইনি।

মানুষের বুদ্ধি হয় কখন জানিনা। নানা-নানি যে ইন্তেকাল করেছেন

আমার দেড় বছর বয়সেই। তখন আমি দুঃখ-শোক বোধের অতীত। এই সাত বছর বয়সের সময় একদিন আমার এক মামাতো বোনের স্বামী ঘোড়ায় চড়ে বরিশাল থেকে বাড়িতে আসছেন। মামাতো বোনের মেয়ে চাঁন্দ বিবি আমার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়। সে বল্ল, চল্ চল্ খালা, আমার আব্বু আসছেন দেখি গিয়ে। দৌড়ে গেলাম সেই অন্দর বাড়ি থেকে বাইরের প্রকাণ্ড দেউড়ির কাছে। দুলাভাই দেউড়ির কাছে ঘোড়া থেকে নামলেন। এগিয়ে এসে আমাদের দু-জনকেই আদর করে দুই কোলে নিয়ে বাড়ির মধ্যে এসে সবাইকে আদাবসালাম করে নিজের ঘরে গেলেন। আমার আম্মা তখন আসরের নামাজ পড়ে নামাজের চৌকি থেকে নামছেন। আমি গিয়ে বললাম, পরশুদিন সুলতানা আপার (আমার এক মামাতো বোন) আব্বা এলেন। আমার আব্বা আসেনা কেন আম্মা ? আম্মা, নির্বাসিতা হাজেরার মত মহিয়সী আমার মা, আমাকে জড়িয়ে ধরে বাণবিদ্ধ কপোতীর মতো লুটিয়ে পড়ে ফিট হয়ে গেলেন। সবাই দৌড়ে এলেন, আমি তো সেই কালের অন্ধ শিশুমন নিয়ে বিস্ময়ে অবাক। কী হল বুঝতে পারলাম না, কেঁদে উঠলাম। কি হল ! কি হল ? সবার মুখে একই প্রশ্ন। গোলাব পানি স্মেলিং সল্ট দিয়ে আম্মার হুঁশ ফিরিয়ে আনা হল। সকলের জিজ্ঞাসার উত্তরে আম্মা আমার প্রশ্ন করার কথাটি বললেন। দেখলাম সকলেই চোখে আঁচল দিচ্ছেন। সুলতানা আপাই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, আসবে আপু তোমার আব্বাও আসবেন একদিন। কিন্তু সেই 'একদিন' আমার জীবনে আর আসেনি। আমার আব্বাও কখনও আর ফিরে আসেন নি।

এই না-আসার কারণ আমি পরে জেনেছিলাম। তিনি বিদ্বান মানুষ ছিলেন। একসাথে নয়টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। দিওয়ান-ই-হাফেজ তার কণ্ঠস্থ ছিল। এসুমে আজম জপ করতে গিয়ে তিনি উন্মাদ হয়ে যান; আমার নানা অনেক দোয়া-দরুদ করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। পরে তিনি সাধকদের অনুসরণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আমার ভাইয়া তখন সাড়ে তিন বছরের। আর আমি সাত মাসের। অনেক খোঁজ-খবর নেবার পর আমার প্রায় সাত-আট বছর বয়সের সময় আমার এক মামাতো ভাই হজ থেকে ফিরে এসে খবর দিলেন যে আমার আব্বা এখন পুরোপুরি দরবেশ হয়ে গেছেন। হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি করেও মামতো ভাই তাঁকে আর দেশে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। উপরন্তু তিনি মামাতো ভাইয়ের মারফত সকলের কাছে মাফ চেয়েছেন এবং বলেছেন যে

আল্লাহ যখন তাঁকে এই পথেই এনেছেন, তখন তার আর সংসারে ফিরবার সাধ্য নেই।

আমার প্রশ্নে মায়ের সেই কাতরতার কথা আজও মনে রয়েছে। আমার শিশু মনে বেদনার দুঃখের সেই প্রথম বোধ, উপলব্ধি। সেদিন থেকে আমার মনের বয়স যেন বেড়ে গিয়েছিল। দুনিয়া তখনও আমার অচেনা, কিন্তু বেদনার সাথে যেন সেই শৈশবেই—সেই দিন থেকেই—নিবিড় পরিচয় হল আমার। চিরকাল আমি সংসারানাভিজ্ঞা, বুদ্ধিহীনা—তবু সেদিন মায়ের যে কতখানি ব্যথা; অত ঐশ্বর্যের ক্রোড়েও যে মা কত রিক্তা—একথাটি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। সেই ব্যথাই আজও হয়তো আমাকে দুঃস্থ মানবমনের সংস্পর্শে আসার প্রেরণা দেয়।

আমাদের পরিবারটি ছিল সুবৃহৎ। মা, মামা-খালাআম্মারা মিলে ছয় ভাই ছয় বোন। আমার আম্মা বোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। মামা সৈয়দ ফজলে রব্বি এককালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ. টি. এম. মোস্তফার শ্বশুর। ১৯৬৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর সন্তানরাই এখন শায়েস্তাবাদ বংশের অবশিষ্ট বংশধর।

আমার শৈশব-কৈশোর আমাদের পরিবারেরই গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। বিশাল প্রাচীরের ভিতর বিরাট ভবন। বাগবাগিচায় শোভান্বিত শ্যামল ভিতর-বাড়িতে দুই পুকুর—একটি গোসলের, অন্যটি রান্নাকরা কাপড়-ধোয়ার কাজের। অন্দরের পুকুরের সাথে প্রাচীরের তলা দিয়ে গেট করা, খাল থেকে নদীতে যাওয়ার পথ। জোয়ারের পানি নববর্ষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে গেটের তলা দিয়ে পুকুরে আসত আর আসত অসংখ্য মাছ। বেগম-বিবিরা সেই মাছ ধরতেন অবসরের আনন্দে। অন্দর বাড়িতে পুরুষের প্রবেশ ছিল না; তাই বিবিরা সকলেই সাঁতার কেটে নৌকা বেয়ে আনন্দ-উৎসব করার সুযোগ পেতেন। গরমের দিনে দুপুরে থাকবার জন্য ঠাণ্ডা আটচালা বাংলোর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে বৃহৎ পুকুরের মধ্যে। দুই ধারে মেহেদি গাছের বেড়ার মধ্যে অজস্র ফুলের গাছ। রঙ্গন গাছের কুঞ্জ বেয়ে লতিয়ে উঠেছে লতা—বেলি, জুইয়ের ঝাড়, কামিনী, শেফালি, জবা, সূর্যমুখী। শিউলী বোঁটার রঙে কাপড় রাঙিয়ে পরার জন্য প্রচুর ফুল সংগ্রহ করে বোঁটা শুকিয়ে রাখা হত। এসব কাজে ছেলে-মেয়ে বৌ-ঝিদের উৎসাহ ছিল প্রচুর। ভোর-সকালে ফুল কুড়াবার পাল্লা দেওয়া হত, কে কত ফুল কুড়াতে পারে। বাইরে থেকে মালিরাও ফুল পাঠাত [illegible] বরকে। ফুল

বাছানিয়ারা তা থেকেও বোঁটা সংগ্রহ করত। আম জাম লিচু আতা বাতাবি সপেটা লেবু তুত পেয়ারা তাল খেজুর কলা কামরাঙা করমচা চালতা আমরুল আঁশফল গুপারির গাছ প্রাচীরের পাশে বহু বিস্তৃত সীমানার মধ্যে থাকায় তাজা টাটকা ফল পেতে পরিবারের অভাব হত না। বরিশালের কালবৈশাখী যে না দেখেছে বৈশাখের রুদ্র রূপই তার যেন অদেখা রয়েছে বলে আমার ধারণা। সেই কালবৈশাখীর দিনে ঝড়ের মধ্যে আম কুড়াবার আনন্দ আমার সন্তানরা কেউ পেলনা বলে আমার দুঃখ হয়।

পশ্চিমের বালাখানার সামনে প্রকাণ্ড গোলাকার ময়দান। তার উপর লোহার গেট, প্রকাণ্ড দেউড়ির সীমানা ছাড়িয়ে দু-তিন বিঘা জমির উপর-বৃত্তাকার লাল সুরকির পথ। তারই বৃত্ত ঘিরে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। নয়জন মালি তার দেখাশুনা করত। গোলাব যে কত রকম ছিল তার হিসেব নেই। আমার একজন দূর সম্পর্কের মামা ডাক্তার ছিলেন। রেঙ্গুন ঘুরে এসে বাড়িতে সখের ডাক্তারি আর এই বাগান নিয়ে তিনি এতই মশ্‌গুল হয়ে গেলেন যে রাত্রে সবাই ঘুমালেও তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন ফুল গাছে কোন ফুলটা ফুটল, না বুঝি কী কথাটা কয়ে উঠল! তিনি নানারূপ ভেষজ বৃক্ষলতার চাষও করতেন। কোন পাতার কী গুণ, কোন গাছের হাওয়ায় কত উপকার তিনি তা আমাদের বলতেন। একে ত আমাদের পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু, তারপর বহুদিন তিনি বিদেশে কাটিয়ে নানা ভাষার জগাখিচুড়ী করে মালিদের যখন বকতেন তখন আমরা খুব মজা পেতাম। এই ডাক্তার মামা ছিলেন ঢাকারই এক প্রসিদ্ধ পীর বংশের সন্তান। তার পূর্বপুরুষ নাকি এসেছিলেন বাগদাদ থেকে। তিনি একটি দোয়া জানতেন, পানিতে সেই দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে যে কোনও কলেরা রুগীকে খাওয়ালে সে ভাল হয়ে যেত। আমি ছোটবেলায় নিজেই তা দেখেছি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগে একথা হয়ত পাগলের প্রলাপ বলে ধরা হবে।

ফাল্গুন মাস পড়লেই কাপড় রাঙাবার ধুম পড়ে যেত। সেও যেন এক উৎসব। শেফালি ফুল, কুসুম ফুল, বাসন্তী রং, গুলাই আনার রং, হালকা নীল সবুজ গোলাবী রং, ঘরেই তৈরি হত। কুসুম ফুলই চোলাই করে সোডা সাজিমাটি লেবুর রস দিয়ে নীল সবুজ রং করা হত। গোসল-অজু করে পাক সাফ হয়ে তবে রং চোলাইয়ের ঘরে ঢুকতে হত। কাপড় রং করা হয়ে গেলে সবাই মিলে সেই রং নিয়ে রং খেলে হাসি কলরবে মেতে উঠতেন। ঠাট্টার সম্পর্কের দুলাভাই নানা-নাতীরাও এতে অংশ নিতে পারতেন। রং করা

শাড়িতে-কাঁপড়ে আবার আতর লোবানের ধোঁয়া দিয়ে 'বাসাও' করা হত। সারাদিনের পর আসরের নামাজের সময় সেই শাড়ি পরে সবাই যখন একসাথে হতেন, তখন সত্যিই স্বপ্নপুরীর শাহজাদিদের কথা মনে পড়ত। আমার আম্মার চুল ছিল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। সেই চুল আলনায় হাওয়া করে শুকিয়ে নেয়া হত। তারপর চুল বাঁধার পালা। কত যে মানুষ ছিল, একজন একজনের খোঁপা বেণী এক-এক রকম করে বেঁধে দিতেন গরমের দিনে ঘাটের সানের উপরই সবাই নামাজ সেরে নিতেন। তারপর চলত চা পানের পালা সারাদিন যে-সব পিঠা, হালুয়া, মোরব্বা তৈরি হত বাইরে খানশামারা আর ভিতরে চাকরানিরা বড় বড় রূপার ছেনি ভরে তা পৌঁছাত। কিন্তু মেহমান এলে বেগম-বিবিদের এ আয়েশ আর থাকত না। সে সন্ধ্যাই হোক আর রাতই হোক। খালি বাবুর্চির হাতের খানা-নাশতা মেহমানকে দিতে বেইজ্জতি মনে হত বলে তখনি আবার নতুন করে খাবার তৈরি করতে হত। চা-শরবত-পান এ সবাই অন্দর মহল থেকে যাওয়া চাই।

বাড়িতে অন্দর মহলে বিস্কুট রুটি কেকও তৈরি হত। কিন্তু আমার বড় মামার বিস্কুট রুটি কেক চিনি নুন চা গোল মরিচের গুড়ি আসত কলকাতার আর্মি নেভি স্টোরস থেকে। পাউরুটি তিনি খেতেন না। ঘরের তৈরি রুটি, পরটা, হালুয়া, নিমকি সবই তিনি খেতেন। কিন্তু অতি সামান্য পরিমাণে। টেবিল চামচের এক চামচ সরু চালের ভাত খেতেন, কিন্তু উপকরণ থাকত সতের রকম। আর খেতেন সাত সের দুধকে ঘন করে এক সের করে। ১৯৩১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন; কিন্তু, সেই আশি বছর বয়সেও তিনি ছ-মাইল হাঁটতেন। শিকার করতেন। কুড়াল দিয়ে কাঠ চিরে এক্সারসাইজ করতেন।

তাঁর ছিল সর্ব ভারতে প্রসিদ্ধ নিজস্ব লাইব্রেরি। খোদা বখশ সাহেব ছাড়া এতবড় নিজস্ব লাইব্রেরি আর কেউ প্রতিষ্ঠা করেননি বলে আমরা বহুজনের মুখে শুনেছি। কিন্তু সে সব কথা এখন একান্তই অবান্তর বলে মনে হয়। রাক্ষসী পদ্মার অন্যবাহু 'কালাবদর' সমস্তই গ্রাস করেছে। আজ উত্তাল তরঙ্গ সেই স্বর্ণভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত। কীর্তিপাশা গ্রাস করে পদ্মা 'কীর্তিনাশা' হয়েছে। শায়েস্তাবাদ গ্রাস করে হয়েছে 'কালাবদর'। দশমাইল দূরে নদীর পারে হাওয়াখানা ছিল। পাল্কি করে সেখানে যাওয়া হত। আর বর্ষার দিনে বোটে করে। নদীর পানি সেই হাওয়াখানার তলায় ছলাৎ ছলাৎ করত। বোট থেকে একেবারেই ঘরে ওঠা হত।

আর নদীতে বসে নদী দেখার জন্য উঁচু করে গোলমিনার তৈরি করা হয়েছিল। তার সাথে ছিল প্রশস্ত চিলা ছাদ। গোল ঘুরানো সিঁড়ি দিয়ে সেই ছাদে সন্ধ্যায় উঠতেন বিবিরা, নামাজ পড়া হত, পান খাওয়া হত। তারপর সাহেবও কখনো-কখনো সেখানে গেলে নীচের তলায় তামাকুদার পেচোয়ানে তামাক দিয়ে তার নল বাঁদির হাতে দিয়ে সেই গোল চাবুতরার ছাদে পৌঁছিয়ে দিত। সাহেব সেখানে বসে তামাক খেতেন।

এ সব আমার নানার আমলের কথা। কিন্তু আমি সেই পেচোয়ানের বিরাট নল জড়ানো-অবস্থায় দেখেছি। কত কারুকার্যকরা সেই পেচোয়ানের নল। আর কত লম্বা! ১৯৫০ সন পর্যন্ত আমার সেই খালু বেঁচেছিলেন। তিনি একদিন বলেছিলেন 'এই নল তোমার শ্বশুড়বাড়ি চাঁটগা থেকে এনে লক্ষ্ণৌএর কারচুবিদার দিয়ে জরির কাজ করানো হয়েছিল'। তখনকার দিনের মানুষেরা অন্য রকম মনমেজাজের ছিলেন। শখ, ঝোঁক, জেদ বা নেশার জন্য তাঁরা সব কিছুই করতে পারতেন বেপরোয়া হয়ে। তাঁদের উত্থান বা পতন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিতেন ; তাই বোধহয় পরিণাম পরিণতির ভাবনা ভেবে তাঁরা দুঃখ পেতে চাইতেন না। আল্লাহ্ যখন যা করেন, সবই তাঁর হাতে—এই বিশ্বাসেই তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চাইতেন। হিসেবের খাতার ধার ঘেঁষতে চাইতেন না।

লোহা-পিতল মিলানো তৈরি দেউড়ির বাইরে সোজা চলে গেছে পথ। ঝাউ দেওদার কৃষ্ণচূড়া নিম একটির পর একটি সারিবদ্ধ করে লাগানো। তার পর হাটখোলা। ইঁটে বাঁধানো দু-ধারের চালা ঘরের উপর সেই তরুচ্ছায়া। তারপর খালের উপর দিয়ে কাঠের পুল। সেই পুলের দু-ধারে কতকালের প্রাচীন যে গুলমোরের দুটি গাছ! বসন্ত থেকে বর্ষা পর্যন্ত গোলাবি ফুলে ছেয়ে থাকত, আর বহুদূর নদীর পথ থেকেও সেই গাছ দেখে স্থান নির্ণয় করত মাঝিরা—শায়েস্তাবাদ নওয়াব বাড়ির ফুলগাছ! লঙ্গরখানা চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকত রাহগির মুসাফিরের জন্য। ডালভাত, একটা মাছের সালুন। কাবুলি-পেশোয়ারিরা এলে চারজনের জন্য একটা ভেড়া জবেহ্ করে আটা-ঘি সমেত দেয়া হত। ভোজপুরি দারোয়ান এলেও যথাযথ আটা ইত্যাদি বরাদ্দ ছিল। অবস্থা বিশেষে ময়দা ও চাউলের গুড়ার পিঠাও হত। কাবুলি-পেশোয়ারি, খোরাসানি, তুর্কি, মিশরি কত যে মুসাফির ব্যবসায়ী, মৌলানা মৌলবিরা তখন আসতেন। আর কত রকমের মসলা-মশারেল, হাদিস-কোরআনের

ব্যাখ্যা যে হত, সে এক এলাহি কারবার! আর মিলাদও অনেক দেশের অনেক রকম হত। কেউ বসে সালাম পাঠ করবার ফতোয়া দিতেন, কেউ দাঁড়িয়ে। কেউবা আবার ওসব না-জায়েজ বলে প্রচার করতেন। কিন্তু আমাদের খানদানি মিলাদ মহফিল প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার হতই। এতে ছেলেরাও সব গজল-নাত-হাম্‌দ পড়া শিখত। আর আমার মামানি বলতেন, সবচেয়ে আমাদের মিলাদই সুন্দর। চিকের আড়াল থেকে মেয়েরা সবাই যোগ দিতেন সেই মিলাদ মহফিলে। রমজানের সময় মেয়েরাও গিয়ে মসজিদে তারাবিহ্‌ নামাজে শামিল হতেন।

দারোয়ানরা বাড়ি পাহারা দিত। আমার মনে আছে আমরা বাচ্চারাও যেতাম আর মসজিদের জায়নামাজেই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে দেখতাম ঠিক বিছানায়ই শুয়ে আছি। বড় মামা বলতেন ফেরেশতারা বাচ্চাদের সবাইকে ঘরে এনে শুইয়ে দিয়ে গেছেন।

খতম তারাবিহ্‌র রাত্রে খুব ধুমধামে খানাপিনা হত; আর শবে-কদরে সারারাত নামাজ পড়ার জন্য আমরা প্রাণপণে জেগে থাকতে চাইতাম। সেদিন মসজিদে ফজর হয়ে যেত, ফজরের নামাজ পড়ে সবাই ফিরে আসতেন। বড় মামা ভাইয়াদের জিজ্ঞাসা করতেন: কোন কোন ফেরেশতার সাথে দেখা হল বলত মিঞারা! তাঁর বিরাট দেহ আর গুরুগম্ভীর আওয়াজকে সবাই ভয় করত। কিন্তু আমি ছিলাম তাঁর বড় আদরের। তিনি আমাকে সযত্নে কোলে করে ঘরে নিয়ে আসতেন। কী সুন্দর যে তিনি ছিলেন আর কী বিদ্বানও যে ছিলেন! কিন্তু নারী শিক্ষার মোটেও পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। আমার প্রথম লেখা কাগজে বের হবার পর তিনি আমাকে হুকুম দিলেন বরিশাল থেকে শায়েস্তাবাদে গিয়ে থাকতে। অথচ তাঁরই এমন বিরাট লাইব্রেরির আওতায় চুরি করে লেখাপড়া শেখা আমার—শুধুমাত্র আমার মায়ের উৎসাহ ও সহায়তায়। আর তাঁরই মুখেই আমরা যত বাইরের দুনিয়ার খবর পেতাম। রাত্রে এশার নামাজের পর তিনি বাংলা উপন্যাস পড়ে মামানি-খালাআম্মাদের শোনাতেন। ভালো সংস্কৃত জানতেন তিনি। 'মেঘদূত' 'রাজতরঙ্গিণী' 'রঘুবংশ' পড়ে কী সুন্দর বাংলা করে শোনাতেন। আমি তখন খুবই ছোট, তবুও তাঁর পড়ার মাধুর্যটুকু এখনও যেন মনে গুঞ্জরণ করে। তার মুখে প্রথম প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রত্নদ্বীপ' আমরা শুনি। আর যতরকম ইংরেজি বাংলা আরবি উর্দু ফার্সি গল্প কবিতা তিনি আবৃত্তি করে, গল্প পড়ে

শোনাতেন। সব রকমের খবরের কাগজ, মাসিক ত্রৈমাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক পত্র-পত্রিকা তাঁর কাছে আসত। একবার 'বম্বে ক্রনিকল' থেকে তিনি অদৃশ্য জানোয়ার 'বুনিপ্'-এর কথা শোনালেন, আর আমার শিশুমন বহুদিন ধরে সেই অদৃশ্য জানোয়ারের ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। কি রকম ভয়ে ভয়ে যে থাকতাম!

আমার এক দুধ-মামা আমার এই ভাব লক্ষ্য করে অনেক করে তবে আমার কাছ থেকে সবকথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন: ও সব গল্পের কথা, ও রকম জানোয়ার আছে নাকি? আর থাকলেও এদেশে আসতে পারবে না; কেননা এটা সূর্যের দেশ, আলোর দেশ। ও সব জানোয়ার অন্ধকার দেশে হয়ত থাকতে পারে, আলোর দেশে নয়। ছোটবেলায় আমি খুব চাপা ছিলাম। কারুর কাছে কোনও কথা বলা বা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা বা সাহসই হত না। কিন্তু একা মনে মনে আমি বলতাম অনেক কিছু। দেখতাম ফুলপাখি চাঁদতারা আলো-আঁধার মেঘ-বৃষ্টি নদী-পুকুর। এরা আমার মনে কত অদ্ভুত ভাবের প্রশ্ন তুলত। এ সব কেন? এ সব কি? এরা কোথা থেকে আসে? কেন এল? কি হবে এদের? আর আমার অফুরন্ত আগ্রহ ছিল ফুল ফোটা দেখতে। কি করে একটির পর একটি পাপড়ি মেলে? কি করে এরা গন্ধ ছড়ায়? বহু রাত আমি এই নিয়ে ভেবেছি। এমন কি আমার প্রথম সন্তান হওয়ার পর ষোল-সতের বছর বয়স পর্যন্ত এই এক নেশা আমার ছিল; রাত্রে উঠে বাইরে চলে যেতাম ফুল ফোটা দেখতে; আর তার সাথে সাথে কত যে কী কল্পনায় দেখেছি তা ভাবলে আমার নিজেকে নিজের এখন পাগল মনে হয়।

ধন-জন-বল যেন জোয়ারের জল—একথা আমার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি অতি কঠোর-তিক্ত-তীব্র এবং তীক্ষ্ণভাবে। জোয়ারের উপচানো সুখের দিন দুর্দিনের ভাটির টানে কখন যে সরতে শুরু করেছে তা টের পাই নি। অবশ্য টের পাওয়ার বয়স তখন হয় নি। শুধু দেখতাম ঢাকা-কলকাতা-বরিশাল থেকে লোকজন আসছে-যাচ্ছে আর শুনতাম এর মৃত্যু সংবাদ, ওর মৃত্যু সংবাদ—আর বিরাট বাড়িঘর লোকের বিষাদে বিমর্ষ-ম্লান, চারিদিকে অঝোর কান্না, তুহিন শীতল স্তব্ধতা। নওয়াব শায়েস্তা খানের দুহিতার গোরস্থান তাঁর বংশধরদের গোরে গোরে ভরে উঠল, আর বিরাট প্রাসাদ শন্য হতে লাগল। রাক্ষসী

কালাবদরও এগিয়ে এল তার লোল জিহ্বা বিস্তার করে। জমিদারির দেখাশোনার লোকাভাব দেখা দিল। যে মামা বেঁচেছিলেন তিনিও তাঁর বিরাট পাঠাগার ছেড়ে শহরে যেতে নারাজ; অন্য মামা তো একান্ত ছোট। নায়েব-পেশকাররা কে কী করছে কেউ দেখবার নেই। দোতালার কামরায় বসে পর্দার উপর পর্দা খাটিয়ে আমার মামানি জমিদারির হিসাব-নিকাশ শুনছেন, আমার আম্মার সাথে আমিও এতে হাজির থাকতাম। আমার এই মামানি উর্দু ছাড়া বাংলা ইংরেজি পড়া মোটেও জানতেন না। বাংলা বলতে পারতেন অবশ্য। আর আম্মা তাঁকে নিকাশ নেবার বেলায় সাহায্য করতেন। কিন্তু তাতে আর কতখানি চলে? একদিন ধড়াধড় করে করে মালখানা বালাখানার দুয়ারে মস্ত বড় বড় তালা ঝুলল। মামানি বড় মামাকে জোর-জুলুম করে মস্তবড় বোটে করে ভেসে পড়লেন জমিদারি দেখাশুনা করতে। বৃহৎ প্রাসাদে আমার মা, আশ্রিতা-পোষ্য, আত্মীয়-কুটুম আর নাবালক আমরা রইলাম গোটা দশেক।

সেই অবকাশে মালি-পেয়াদা আর খেজুর গাছ কেটে রস বের করার 'শিফালি'দের সাথে আমাদের মেলামেশা করার আর কোনও বাধা রইল না। ভাইয়ারা জুবিলি স্কুল নামে আমাদের পারিবারিক স্কুলে পড়তেন আর বন্দুক, গুলাল, ক্যাটাপুলেট নিয়ে শিকারের হাত পাকা করতেন। আমরা দু-চার জন বালিকা মেয়েও এতে অংশ নিতে পারতাম। কেননা এসব শিকার আমাদের চার দেয়ালের মধ্যে অসংখ্য ছিল। শত শত কবুতর, শালিক, চড়ুই আমাদের গাছ ভরে কার্নিশ ভরে তো থাকতই; মসজিদ মক্তব ভরা জালালি কবুতর ছিল, কিন্তু সে কবুতর মারা সবার নিষিদ্ধ ছিল। আর ধর্মভীরু সেকালের লোকেরা সে নিষেধ অমান্য করার ধৃষ্টতা কখনও প্রকাশ করেন নি।

মসজিদে গিয়ে সুর মিলিয়ে জোরে 'কায়দা বোগদাদি' পড়তে হত। আমরা তিন চারজন মেয়েও যেতাম। ভাইয়ারা যখন আরবি-ফারসি পড়তে শিখলেন, আমরা তখন জের-জবর-পেশ-তশ্‌দিদ শিখছি। তাঁরা সুর করে পড়তেন :

করিমা বেবখ্‌শা য়ে বর হালেমা
কে হাস্তম আসিরে কমন্দে হাওয়া

. . .

নেগাহ্‌দার মারা-জারায়ে খাতা
খাতা দর্‌ গোজারো সওয়াবেন্নামা......

তখন কিছুই বুঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি হয় নি। কিন্তু কি জানি কেন আমার ভীষণ কান্না পেত। আর আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় এক বোনঝি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলত: এসব আল্লাহ্‌র কথা; কাঁদতে নেই। সিপারের আমপারা পর্যন্ত মসজিদে আমাদের পড়া; তারপর কোরআনের সবক আম্মার কাছ থেকেই নিতে হয়েছে, কেননা তখন আমরা বড় হয়ে গিয়েছিলাম। তবে সেই জুবিলি স্কুলে প্যারিলাল মাষ্টার মশায়ের কাছে আমিও দু-এক সবক পড়েছি পায়জামা-কুর্তা আবার আচকান-পায়জামা পরে গিয়ে। তাও বাল্য শিক্ষা পর্যন্ত। আমার বিদ্যা হবার পর ভাইয়ারা সব চলে গেলেন কেউ বরিশাল, কেউ ঢাকা আর আমার ভাইরা গেলেন কলকাতায়, আমার খালাআম্মা তাঁকে নিয়ে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। মামাত বোনেরা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেলেন। শূন্য বিরাট ভবনে পক্ষীমাতার পক্ষতলে রইলাম আমি একা। আর রইল দাই-খেলাই বাঁদি খানশামা-পেয়াদাদের দল। তখন আমার বয়স সাত বছর। আর এই বয়সে নিরালা নিঝুম পুরীতে পাহারা দেবার পেয়াদাদের বেহালার মূর্ছনা অনেক রাত পর্যন্ত আমার কানে বাজত। আর সবচেয়ে আমার শিশু জীবনের প্রকৃত শিক্ষক-সাথী ছিলেন আমার 'জামাই', অর্থাৎ পুতুল মেয়ে তার সাথে বিয়ে দিয়ে আমি 'শাশুড়ি' হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আমার আম্মার দুধভাই, ভাইয়ারা সকলে তাঁকে ডাকত মামা। আমি ডাকতাম জামাই। সেই জামাই-এর কোলে বসে বসে শুনতাম পুঁথি পড়া। শুনতাম গান। দেখতাম বেহালার তানে তানে ওস্তাদ বেহালাদারের ভাবোদ্বেল মুখ, কখনও হোসেনের বীরত্বে উচ্ছ্বসিত, কখনও সখিনার ব্যথায় ব্যথিত। আবার পালাগানও হত। ভালো ভালো পালা—সোনাভানের পালা ইত্যাদি—বানিয়ে ওরা অভিনয় করত। তখন তো আর অভিনয় কি জানতাম না। এখনও মনে হয় শিল্প-সাহিত্য মানুষের অন্তরের সম্পদ। আল্লাহ্‌ তা সবাইকে দান করেছেন। সকলের অন্তরে এ স্বতঃস্ফূর্ত। কেউ এ নিয়ে বিশ্বজোড়া নাম করে, কেউ বা কোথায় ঢেউয়ে ভেসে তলিয়ে

যায়—সাধনা সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার অভাবে - তার আর পাত্তা থাকে না। শীতের দিনে খেজুর গাছের রস নামিয়ে নারিকেল চাউল দিয়ে পেয়াদারা যে শিনি রাঁধত আমিও জামাই-এর কোলে বসে তা খেতে পেয়েছি। কত যে ভালো লাগত। অনেক রাতে জামাই-এর কোলে ঘুমিয়ে পড়লে তবে গিয়ে আমাকে নিয়ে শুইয়ে দিতেন।

সেইত জীবন - সেই স্বপ্ন ছন্দ সুর ব্যথা, আর তার সাথে শুরু দুঃখ-অভাব-অনটনের। ব্যথার যে কত রূপ তা কি এখনও জানতে পেরেছি?

সেই ত জীবন—সেই স্বপ্ন ছন্দ সুর ব্যথা, আর তার সাথে শুরু দুঃখ-অভাব-অনটনের। ব্যথার যে কত রূপ তা কি এখনও জানতে পেরেছি? হারিয়ে পাওয়া, পেয়ে হারানো। চাওয়া-পাওয়া-দেওয়া— এ সবই তো ব্যথা-বিজড়িত সুখ-দুঃখ অশ্রুজল সিক্ত, স্মৃতির সুরভিতে সুরভিত। কখনও কোন দূরান্ত থেকেও এরা ভেসে এসেছে। ভোলাত যায় না, অথচ ধরেও কি রাখা যায়?

হঠাৎ কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল আমার খালুর কাছে; আমার ভাইয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আম্মাকে নিয়ে কলকাতা যাবার জন্য। সেই দিনই খালু আমাদের নিয়ে রওয়ানা হলেন। পাল্কি করে জাহাজের ফার্স্ট ক্লাশের কামরার সামনে নিয়ে আম্মাকে তুলে দেয়া হল। তারপর সেই জাহাজ বরিশাল এসে আবার খুলনা মেলে যাত্রী তুলে তবে কলকাতা রওয়ানা। খুলনা এসে আবার রেলগাড়ি ধরা। সেই আমার প্রথম রেল গাড়ি চড়া। আম্মা মূর্ছিতের মত পড়ে ছিলেন। জাহাজের সারেং, বাবুর্চি, ক্যাপটেন সবাই-ই তখন শায়েস্তাবাদ পরিবারটিকে চিনত, সম্মান করত। তাই অত তাড়াহুড়ার মধ্যেও আমার আদর-যত্নের জন্য লোকের অভাব হলনা। বরং জাহাজের লোকদের অতি ঘনিষ্ঠতায় আমিই যেন আম্মার কাছে সব সময় থাকতে না পেরে অতিষ্ঠ বোধ করছিলাম। কতক্ষণ সময়ে যে কলকাতা পৌঁছলাম তা মনে নেই, তবে রাত হয়েছিল। আম্মা-খালাআম্মা-বোনভাইদের মিলিত ক্রন্দন আমাকে হতভম্ভ করে দিয়ে ছিল, আর আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হল যে আম্মা আমাকে ফেলে রেখে ভাইয়ার রোগশয্যার পাশে চলে গেলেন। আমাদের বাড়িসহ বাচ্চাদেরকে ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্য কঠোর শাসনাধীনে অন্য মহলে পাঠানো হল। সেই প্রথম আমি আম্মার কোলছাড়া হলাম। হঠাৎ একটি আর্তনাদ করে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার খালাত বোন ও দুলাভাই ডাক্তার

সৈয়দ এহ্সাস আমাকে বুকে তুলে নিলেন। তাঁদের প্রথম সন্তান প্রায় আমার সমবয়সী ছিল ; কিন্তু আপার কোল খালি করে সে তখন অন্য জগতে চলে গেছে—মাত্র মাস খানেক আগে। তাই আপা তার শূন্য কোলে আমাকে পরম স্নেহ-মমতায় আবৃত করেই চিরদিন রেখেছিলেন।

কলকাতার জীবন অন্য জীবন। একেত ভাইয়ার অসুখের জন্য উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততা, তার উপর আম্মা ও আমার মধ্যে এই প্রথম ব্যবধান। পরিবেশও অনেকখানি অপরিচিত ও বিরূপ। বিরাট বাড়ি হলেও গাছ নেই, পুকুর নেই, পাখি নেই, ফুল নেই।—আমি যেন হাঁপিয়ে উঠতাম। আমার চেয়ে বড় আমার খালাত ভাইয়ের মেয়েরা, আপার ননদেরা আমাকে খুবই আদর করতেন, খেলার সাথিও জুটেছিল, কিন্তু সবাইত উর্দুভাষী—সবকিছুই যেন কেমন পোষাকি পোষাকি। আমার 'নিজ' দেশের সেই চাষিদের ও ঘরের পরিচারিকাদের মেয়েরা—জরি, ময়না, সোনাবানু; বড়দের মধ্যে সকিনা, জয়না, আঞ্জু, ফুলি, গেদি তেমন, মেহের, নুরি, বুড়ি কেউ নেই। টিয়া ময়নাগুলির গান নেই, পুতুল খেলা নেই। পৌষ মাসের শীত। কিন্তু খেজুর রস, পিঠা, আর সেই সজ্বিবাগানের সোঁদা সোঁদা গন্ধ নেই—কী যে বেখাপ্পা লাগত। আর খালি কান্না পেত। খালুর বাড়ি ছিল ধর্মতলার কাছে, মট্স্ লেন-এ। সেই বাড়ি পরে সরকার নিয়ে ট্রেনিং কলেজ করেছিল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। তিন মহল ভর্তি মানুষ, তবুও যেন কেমন লাগত। আপা দুলাভাই ঘরের ঘোড়ার গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন সেই নদীর ধারে, গড়ের মাঠে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতেই চাইতাম না আমি। ভাইয়া অসুখে পড়ে আছেন, আম্মা বাড়িতে আছেন, তাই বাড়িতেই আমি থাকতে চাইতাম। কত যে আত্মীয়-স্বজনেরা আসতেন—আদর করতেন। লালমিঞা নানা জাস্টিস আকরাম সাহেবের আব্বা ; আকরাম সাহেব ছিলেন আমার আম্মার মামাত ভাই। তারা এসে নিয়ে যেতেন তাঁদের বাড়ি। লাল নানি খুব আদর করতেন। বাদাম-পেশতা-পোস্তদানা-দুধ-কেওড়া দিয়ে 'হাড়িয়া' বানিয়ে খাওয়াতেন, বলতেন : আগা ? মা ভাইয়ের জন্য ভেবে ভেবে ওর কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে। সালু ওকে রোজ হাড়িয়া খাইও। আমার খালা আম্মার নাম সালেহা খাতুন। কিন্তু কলকাতায় থাকতেন বলে তাকে আমরা কলকাতার খালাআম্মা বলতাম। মেজ খালাআড়ার বিয়ের পর খালু বরোদার মহারাজার ছেলের গার্জিয়ান টিউটর হয়ে বরোদা চলে গিয়ে ছিলেন। তাই সেই

খালাআম্মাকে বলতাম বরদার খালাআম্মা। আমাদের ত বাবা ছিলেন না, কিন্তু এই কলকাতার খালাআম্মা যেন আমাদের পিতার অভাব পূর্ণ করেছেন, অভাব দূর করেছেন। খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, খেলনাপাতি—এমন কি তেল সাবান, তা ছাড়া সৌখিন কোন জিনিস তাঁর চোখে পড়লেই আমাদের দুই ভাই-বোনকে কলকাতা থেকে তা কিনে পাঠিয়েছেন। আর ভাইয়াকে পড়াশুনা করাবার জন্য নিজের কাছে নিয়ে এসে এই প্রাণান্তকর অসুখে ফেলেছেন বলে সে কি আর্তনাদ তিনি করতেন! তখন আমার পরম সহিষ্ণু সর্বংসহা ধরিত্রীমাতার মতোই সবরদার মা রাবেয়া খাতুন মৃতপ্রায় সন্তানের শিয়রে বসে বড় বোনকে সান্ত্বনা দিতেন। পরম নির্ভাবনায় তিনি আল্লাহ্‌র উপর সন্তানের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ দিন পর কবিরাজ যেদিন ভাইয়াকে অন্ন পথ্য দিতে বললেন সেদিন সারা বাড়িময় কি আনন্দ! কি মিলাদ পড়ার ধুম! গরিব-দুঃখীরা শিরনি খেল, পয়সা পেল। আবার আতর গোলাব-লোবানের সুগন্ধে বাড়িঘর ভরে উঠল। লাল মিঞা নানা-নানীরা এলেন, আকরম মামুরা চার ভাই দুই বোন এলেন। নওয়াব শামসুলহুদা (আমার আব্বার খালাত ভাইয়ের ছেলে) তখন কলকাতায় থাকতেন, তিনিও এলেন; আমার দুলাভাইয়ের আম্মার মামু স্যার আবদুর রহীম এলেন, আমাকে শিখিয়ে দেয়া হলো তাঁকে নানা ডাকতে। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার বড় আলেম-ওলামারাও এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। খালা আম্মা-আম্মা রোজা রেখে শোকরানার নামাজ আদায় করলেন, আর এতদিন পর দূর থেকে আমাকে দেখতে দেওয়া হল। বসন্ত রোগী যে কী সহ্য করে, কী হয় তার—আমার স্বাস্থ্যবান ভাইয়ের দশা দেখে আমি যেন প্রথম তা উপলব্ধি করলাম! আমার শিশুমন যেন এই প্রথম ভয়ঙ্করের রূপ দর্শন করল। ভাইয়া ভালো হলেন। দেখা শুরু হল কলকাতা। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ইডেন গার্ডেনের বাজনা শোনা; বটানিক্স-এ যাওয়া। আম্মারা ঘরের পাল্কী গাড়ি করে যেতেন, নামতেন না। তখন সম্ভ্রান্ত ঘরের গাড়ি চিড়িয়াখানার ভিতর ঢুকতে দেয়া হত। আমরা ছোটরা নেমে বেঁচে যেতাম। সবচেয়ে আমার ভাল লাগত বটানিক্স-এ প্রাচীন বটের তলায় দাঁড়াতে। আর ইডেন গার্ডেনের বাজনা শুনতে। হগ্ মার্কেটের পুতুল দোকান ছিল আকর্ষণীয় ও দ্রষ্টব্য স্থান। এই মার্কেটে এক রাত্রে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে আমার যে কী কান্না! সব পুতুলগুলো পুড়ে গেল—কী হবে! তখন সবাই বললেন: দমকল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিবে

এখুনি তুমি কেঁদো না। তার পরের দিন সকলে আমরা সেই পোড়া মার্কেট দেখতে গিয়াছিলাম।

সেই মার্কেটে আগুন লাগার একটা আধ্যাত্মিক গল্প আমরা শুনেছিলাম। সেই কাহিনীটাই বলি!

একালের হগ্ মার্কেট দেখলে সে কালের হগ মার্কেটের অবস্থা বোঝা দুষ্কর। তখনও এ-মার্কেট এতবড় এত বিস্তৃত-পরিধি হয়নি, বাড়ান্তির মুখে মাত্র। সেই সময়ে আগুন লাগার আগের দিন নাকি এক অল্প বয়সী পাগল—পাগল ভাবে বিভোর লোক—হগ মার্কেটে বসে পড়ল। বাংলাদেশ—বিশেষ করে কলকাতায় হুজুগে লোকের অভাব নেই। লোক জমায়েত হতে দেরি হল না। হাসি হাসি মুখ সাধু প্রকৃতির এই লোকটির কাছেও ভিড় জমে উঠল। দু-একজনকে গালাগাল দিয়ে অতীতের দু'একটি কথা বলে দিতেই ভক্তদল বিরাট আকার ধারণ করল। কেউ খাবার নিয়ে এল, কেউ কেউ টাকা-পয়সা দিতেও দরাজহস্ত হয়ে উঠল। সাধু কিন্তু টাকা পয়সা ছুঁলেন না, ছোট দোকানদারেরা ভক্তিতে বা ভয়েতে কিছু বলল না। কিন্তু শো-কেসওয়ালা দোকানের কোনো দোকানদার চটেমটে সাধুকে ও ভক্তদলকে কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। দু'পক্ষে শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটি হতে হতে দোকানদার পুলিশ ডেকে ভক্তদল শুদ্ধ সাধুকে বের করে দিতে বললেন। পুলিশ এসেও সাধুকে সম্মান দেখাল, কিন্তু দোকানদারটি নাকি বল্লেন, আমি নিজেই সাধুকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করব। সাধু তখন বললেন: আচ্ছা বেটা! আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমিও তো যাবে। বলে তিনি হেসে হেসে বের হয়ে গেলেন। সন্ধ্যার সময়ে ভক্তদলের সাথে সাধু বাবাজী রাস্তায় বের হলেন বটে। কিন্তু কোন্ গলি পথে যে তিনি উধাও হলেন, ভক্তেরা তা আর দিশা করতে পারল না। রাত্রে যখন হগ্ মার্কেটে আগুন লাগল, আর সকালে সে জায়গায় লোক জড়ো হল, তখন দেখা গেল যে সেই দোকানদারটিরই শো-কেস শুদ্ধ দোকান জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন। আশেপাশের দোকানের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ভক্তদল তখন কি পেয়েছিলাম, কি হারালাম বলে হায় হায় করছে। অনেক অলিগলি খুঁজেও আর বাবাজীর দর্শন পাওয়া গেল না। তখনকার দিনের সব দৈব ঘটনা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনার কথা লোকমুখে শুনে কত যে ভয় ভীতিভরা ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব উদয় হয়েছে। জানি-না এসব ঘটনার সত্যতা কতখানি! তবে সে-কালের মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাধু-সাধক

জনকে অবেহেলা করলে বা তাঁদের সাথে অশিষ্ট ব্যবহার করলে ভাল হয় না।

সাধু-সাধক, ফকির-দরবেশকে আমরা ছোটবেলা থেকে ভক্তিভাজন মাননীয় বলে মেনে এসেছি। আমাদের পরিবার আবার ছিল পীর পরস্তি বা মাজার পরস্তির বিরোধী। মাজার মানত করা, শিরনি দেওয়া, চাদর চড়ানো ইত্যাদি কর্ম 'বেদাত' বলে গণ্য হতো। শুধু প্রতি চন্দ্রমাসের এগার তারিখে বড় পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানীর নামে শিরনি হবেই। আমার নানা তাঁর নামে অনেক শেদরনাত গজল লিখেছেন বলে শুনেছি। বড় বড মৌলানা-মৌলবীরা আসতেন, তাঁদের সাথে এ-সম্পর্কে আলোচনা হত। মামার আমলেও এই শিরনি করতে আমি বার বার দেখে এসেছি। আর কলকাতায় আমার খালুর বাড়িতে তখন সেকালের প্রসিদ্ধ সুফী সাধক মৌলানা সফিউল্লাহ্ সাহেবের প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। খালুরা খানদান সহ তাঁর মুরিদ ছিলেন। মৌলানা সাহেব প্রায়ই আসতেন খালুর বাড়িতে, আর দোয়া দরূদ পড়তেন, তাবিজে ফুঁক দিতেন। বাড়ি শুদ্ধ ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই তাঁকে সালাম-শ্রদ্ধা জানাত। তিনিও সকলকে দোয়া দিতেন। এর অধিক বুজর্গ মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ বা কোনো অলৌকিক ঘটনা তখনও আমার জীবনে আসেনি।

কলকাতার সেই প্রথম জীবন। ছয়-সাত মাস কেটে গেল। আম্মা দেশে ফিরবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। আর ভাইয়াকেও খালাআম্মা মায়ের কোল থেকে কেড়ে রাখবার সাহস করলেন না। আমরা শায়েস্তাবাদ যাব আবার—এ যে কী খুশি তা আর বলা যায় না। কলকাতা থেকে বরিশাল এসে মামার বাড়িতে থেকে আবার বোটে করে হাওয়া খেতে-খেতে নদী পথে একদিন ধরে শায়েস্তাবাদ যাওয়া—সে যে কী আনন্দময়, সৌন্দর্যময় পরিবেশ! বড়নদী, ছোটনদী, খাল জলে-স্থলে ফুলে-ফলে রূপে-রসে ভরা সে পথ! ফিরে-ফিরে চিরপরিচিত সেই মাটির গন্ধ। পুরানো দিনের বন্ধ ঘরের আসবাবপত্র বই-পর্দা-কার্পেটের ধূলার গন্ধে যেন মনভরে বুকভরে আনন্দ সংগ্রহ করা হলো। ঝাড় ফানুসের টুংটাং। কর্নিশের চড়ুই পাখির, পায়রার বাক্‌বাকুম। গরু, ছাগল, ভেড়ার ডাকাডাকি—সকলে যেন বুঝতে পারল এতদিনে আমরা ফিরেছি। বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগী সব পায় পায় ঘুরতে লাগল। ধামাভরে ধান-চাউল নিয়ে আম্মা প্রকাণ্ড প্রশস্ত সিঁড়ির ওপর বসে ওদের খাওয়ালেন। ওরা যেন নতুন করে খাওয়ার স্বাদ পেল। রাত্রে,

দিনে-দুপুরের নির্জনতায় আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বৌয়েরা—মেয়েরা এসে আমাদের দেখে যেত। ভাইয়াকে দোয়া করতে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। আবার খেলার সঙ্গিনীরা এল, খেলাঘর তৈরি হল, হাঁড়ি-পাতিল-উনুন আর এবারে আমার অনেকদিনের সখের একটি জিনিস এল—সেটা হল সত্যি-সত্যি কাঠ দিয়ে তৈরি একটা ছোট্ট ঢেঁকি। গৃহস্থ বাড়ির মেয়েদের নিয়ে ধানকুটে যেদিন সত্যিকারেরই চাউল বের হল, কী বিস্ময় সেদিন আমার! আবার চাউল কুটে গুঁড়ো করে পিঠের জন্যে আটা তৈরি করা—তারপর পিঠা করেও সত্যিকারের পিঠা হল—কী খুশি আমার! কী তাজ্জব ব্যাপার। আম্মাকে এ নিয়ে কথা শুনতে হল কিছু। অনেকে বললেন মেয়েটাকে একদম চাষা বানিয়ে ছাড়লে। কিন্তু আম্মা ওসব পরওয়া করলেন না। তিনি নিজের জন্যে আরও বড় আকারের ঢেঁকি তৈরি করিয়ে পাড়ার যত বৌ-ঝিদের ডেকে ধান কুটলেন। ডাল কুটতে, চাউল-ডাউল ঝাড়তে শিখলেন। মাটির চুলা বানাতে শিখলেন। আমিও শিখলাম। আর এত ভালো করে তা শিখলাম যে আমার মতো ভালো করে চুলা, আলটা, থর আর কেউ বানাতে পারল না।

শায়েস্তাবাদ ফিরবার পর ভাইয়াদের এবং সবচেয়ে ছোট মাতুল 'কুট্টি মাম্মা'-র পড়শুনার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে বড় বেশি সমস্যা দেখা দিলো। অগত্যা তাঁদের বরিশাল শহরের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশুনার ব্যবস্থা হল। জেলা ইসলামিয়া বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশুনার ব্যবস্থা হল। জেলা ইসলামিয়া বোর্ডিং থেকে ওঁরা তিনজন বরিশাল জেলা স্কুলে পড়াশুনা করতে গেলেন। আর আমার তাতে হল বই পড়ার বিরাট সুবিধা। আমার পড়াশুনার আগ্রহ দেখে ভাইয়া ওখানকার লাইব্রেরি থেকে প্রচুর বই পড়তে এনে আমাকে পাঠাতে লাগলেন। পণ্ডিত বাদশা মিঞা ভাইয়াদের বোর্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। আমার লেখা চিঠি ভাইয়ার কাছে দেখে আর আমি খুব আগ্রহ করে বই পড়তে চাই জেনে তিনি যে কত বই ওখান থেকে আমাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ্‌র করুণার যেন অন্ত ছিল না আমার উপর, তাই যাঁকে কখনও দেখিনি তিনি আপন মেয়ের মতো স্নেহ-মমতা করে আমার মনের ক্ষুধার খাদ্য জুগিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন। একে আল্লাহ্‌র করুণা না বলে কী আর বলব! এমনি করেই দেশ-বিদেশের গল্প-উপন্যাস-কবিতা—অবশ্য ছোটদের জন্যে লেখা, সব বই পড়বার সুযোগ পেয়ে আমি পাঠ্য-অপাঠ্য—মানে আমার জন্যে অপাঠ্য—স্কুল পাঠ্য অনেক বই পড়তে লাগলাম।

আর শিক্ষকতা করলেন আমার সেই খেলাঘরের পুতুল বিয়ের জামাই। আজও তাঁর উদ্দেশে আমি হাজার হাজার সালাম জানাই। তাঁর রূহ্ যেন আল্লাহ্‌র করুণায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে থাকে।

আমার খুব ছোট বেলায় আমার এক মামাত বোনের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তা আমার মনে নেই। এবারে আমরা কলকাতা থেকে ফিরবার পর বড়মামা বরিশাল থেকে এলেন। শুনলাম তাঁর নাতনী আমার মামাত বোনের মেয়ে আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়—তারই বিয়ে হবে এক ডেপুটির সঙ্গে। তাই মাম্মা-মামানী শায়েস্তাবাদ এসেছেন। আমার বয়স তখন আট বছর। আর পরীবানুর নয় বছর। তবু তার বিয়ে। বাড়িময়, দেশময় উৎসব লেগে গেল যেন। হলুদ কোটা সোন্দা-মেথি কোটা, কাপড় রাঙানো, মেহেদী তোলা, আবার এদিকে মসলা পেষা, মেওয়া বাছাই, পিঠা-মিঠা-হালুয়া-মোরব্বা মোতানজান-মোসাম্মান-কাবাব-পরাটা তৈরির ধুম পড়ে গেল। আমরা ছোটরা বাইর বাড়ি অন্দর বাড়ি করে নিত্য-নতুন মেহমান-মোসাফিরের আসা-যাওয়া বেশভূষার তামাশা দেখতাম। গয়নাপাতি, শাড়ি-চুড়ির দান-দেহজের জিনিসপত্র দেখে চোখের ঘুম ঘুচে যেত। কিন্তু যেদিন প্রকৃতই বিয়ে, সেদিন বিয়ের কনে পরীবানু আর আমি দুজনে সোন্দা-মেথি আতর-গোলাবের গন্ধভরা মেহেদী রাঙা হাত নিয়ে এক বিছানায় পড়ে রাতভোর অঘোর ঘুম। আর সকালে উঠে শুনি, রাতে তো বিয়ে হয়ে গেছে। আজ শাহ্‌নজর বা রুসমত হবে। তারপর ওরা বউ নিয়ে যাবে। আমি তো জানলামই না যার বিয়ে সেও জানলো না সেই বিয়ের সমারোহ, সাজ-পোশাক, আর খাওয়া-দাওয়া। রেসাম-রেওয়াজই আমাদের পরিবারের শেষ সমারোহ উৎসব। বোটভর্তি করে ঢাকা থেকে বরযাত্রী গিয়েছিলেন। পরীবানুর শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেবর-নন্দাই, তাদের ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরানী—সকলকে দেখা-শোনা, সকলের নাস্তা, খানা—আস্ত খাশীর পেটের মধ্যে পোলাও থেকে আলুভর্তা পর্যন্ত—সবকিছুর যথাযথ ব্যবস্থা করা হল। আর জন-জনকে মর্যাদা মাফিক কাপড়-চুড়ি-জুতা ইত্যাদি দেওয়া হল। আর মা-বাবা একজনও বেঁচে ছিলেন না। তার খালা-ফুফুরা বেয়ানকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গরস করলেন, আর আমাকে নিয়ে তার শ্বশুরের কোলে বসিয়ে দিলেন বেয়ান বলে। দাড়িওয়ালা বেয়াই আমাকে খুব আদর করেছিলেন মনে আছে। অনেক রাত্রে ঘুমভরা চোখে পরীবানুর রুসমত হল। পালকিতে তুলে তার শাশুড়ী

তাকে কোলে নিয়ে চললেন। সেই সময়ের কান্না-কাটি যেন সব আলোক-উৎসবকে ম্লান করে দিলো। আমি হয়ে গেলাম একা, নিঃসঙ্গ; বহুকাল আমি এ-ব্যথা ভুলতে পারি নি। কিন্তু এতে করে এই নিঃসঙ্গতার ভিতর দিয়েই আমার আরও গাঢ় নিবিড় পরিচয় হল পড়াশুনার সাথে। এরই বুঝি প্রয়োজন ছিল আমার জীবনের এই সন্ধিক্ষণে। এই সময়ই আমি বৃষ্টি ঝরঝর এক নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বানান করে করে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' নজরুল ইস্‌লামের লেখা 'হেনা' গল্পটি পড়তে পেরেছিলাম; আর সেই থেকেই আমার ভাষা ভাব ও ব্যথার মাধুর্য উপলব্ধি হল। এরই সাথে সাথে আমি পরিচিত হলাম 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবি ঠাকুরের কবিতার সাথে। ছন্দে-সুরে-রূপে-শব্দ গাম্ভীর্যে অন্য এক জগতের সাথে এই আমার প্রথম প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার।

বাল্যের কলকাতা ভ্রমণের আনন্দ বা অভিজ্ঞতা—কোনোটাই আমার জীবনে রেখাপাত করে নি; কিন্তু সেসময় একটি মহৎ অবিস্মরণীয় জীবনের প্রথম সংস্পর্শে যে এসেছিলাম, সেই কথাটি আমার বাল্যজীবনের একটি পরম শুভ-ক্ষণ বলে মনে করি। জীবনে ত্যাগের আদর্শের সাধনার পবিত্র রূপ আমি সেই বাল্যে যাঁর মধ্যে দেখেছিলাম তাঁর কথাই বলি।

একদিন বিকেল বেলায় সবাই চায়ের টেবিলে চা খেতে বসেছি। আমাদের খালাআম্মার পরিবারও বেশ বড় গোছের পরিবার ছিল। প্রচুর নাস্তা টেবিলে, কাচ্চা-বাচ্চা আমরাও কম নই। এমন সময় দারওয়ান উর্দুতে হাঁকল—স্কুলের সওয়ারি এসেছে। এ বাড়ি থেকে কেউ স্কুল যায় না, কিন্তু সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। বড়রা সিঁড়ির মুখে এসে গেলেন, সাথে-সাথে আমিও। সিঁড়ি বেয়ে একজন মহিলা উঠে আসছেন, ছোটখাটো সুন্দর। সাদা কাপড় পরনে। তার পিছনে আয়ার মতো আর একটি মেয়েলোক। আমার খালাত বোন শাবানা আপা, খালাত ভাইয়ের বিধবা-স্ত্রী—ভাবী সবাই মহিলাকে সালাম করলেন। আমিও করলাম। খোলা বারান্দায় উঠে এসে তিনি খালাআম্মার সামনে পড়তেই খালাআম্মা বললেন: ওমা ফুফু যে! মহিলা খালাআম্মার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে হাসি মুখেই বললেন: হ্যাঁ ফুফুজান আমি এলাম। রওশন-খুরশিদকে স্কুলে দেবার কি করলেন? রওশন-খুরশিদ আমার খালাত ভাইয়ের দুই মেয়ে, তাঁরাও এসে যথারীতি সালাম করে দাঁড়িয়েছিল। খালাআম্মা আমার আম্মাকে দেখিয়ে

বললেন : এ আমার ছোট বোন সাবেরা, তোমার ফুফু হন তিনিও। তাড়াতাড়ি আম্মাকে তিনি সালাম করলেন। বড় অপ্রতিভ হয়ে বললেন, আমি অনেক ছোট বেলায় দেখেছি ফুফুজানকে, তাই চিনতে পারি নি মাফ করবেন। আম্মা হেসে তাঁকে খুব আদর করে বললেন, না না তাতে কি হয়েছে? আমিও তো তোমাকে ঠিক চিনতে পারছিলাম না। শুনেছিলাম তুমি স্কুল করেছ। তিনি বললেন হ্যাঁ, স্কুল করেছি। পরের মেয়েরা তাতে পড়াশুনা করে মানুষ হচ্ছে, কিন্তু দেখুন না নিজেদের মেয়েদেরকে আর নিতে পারছি না। খালাআম্মা বললেন, রওশন-খুরশিদের তো বাপ নেই; নানা-দাদার হুকুম ছাড়া আমি…তুমি তোমার ফুফাকে কেন বল না? খাও, নাস্তা খাও। পরে কথা বলে দেখো। আম্মা আমার দিকে চেয়ে বললেন, এঁকে সালাম করলে না? হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, এটি বুঝি অপেনার মেয়ে? ও-তো আগেই সালাম করেছে। এস বুয়া তুমি আমার সাথে খাও। বোনকে আদর করে 'বুয়া' বলার চল এখনও আমাদের পরিবারে রয়েছে। সেই প্রথম যাঁকে দেখলাম, যাঁর আদর পেলাম, যিনি মুখে তুলে খাওয়ালেন, তিনিই চিরস্মরণীয়া বাংলার—তথা মুসলিম মহিলা সমাজের জাগরণের অগ্রমহিষী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তখন তাঁর বয়স অধিক হয় নি। তন্বী লাবণ্যময়ী শ্বেতাম্বরা সংকল্পদীপ্ত সেই মূর্তি আমার মনে আজও অপরূপ অতুলনীয় হয়ে আছে। সেদিন কি কথা কার সাথে হয়েছিল তা আর আমি জানি না; কিন্তু কয়েকদিন পর তিনি আবার এলেন, খালাআম্মার সাথে কি কি কথা হল, তারপর তিনি আমার আম্মাকে বললেন, আমার এই ছোট্ট বোনটিকে পড়তে দেবেন না ফুফুজান? আম্মা বললেন, পড়াতে চাইলেই কি পারি? আপা বললেন, আমার স্কুলে দিন আমি পড়াব। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কি রে আমার কাছে পড়বি? আমি তক্ষুণি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেরি করলাম না; কিন্তু আম্মা বললেন, আমি তো কলকাতায় থাকব না, শায়েস্তাবাদ চলে যাচ্ছি। একটু চুপ করে থেকে আপা বললেন, আমার কাছে দিয়েও যেতে পারতেন, ফুফুজান! আম্মা হাসলেন শুধু। কিছু বললেন না। আপা আমার কপালে চুমু খেলেন, বড় ফুফুজানকে নিয়ে একদিন আমার স্কুল দেখতে যাবেন।

সত্যিই একদিন আমরা গাড়ি করে তাঁর স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম।

কি কি দেখলাম তা আর মনে নেই, শুধু সারি-সারি বেঞ্চে বসে পাঠরতা মেয়েদের দেখেছিলাম বলে মনে আছে।

বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম আমার খালাত ভাইয়ের দুই মেয়ে রওশন জাহান, খুরশীদ জাহান, আর শাবানা আপার খালাত ননদ বাদশা বুবু এরা সবাই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে পড়তে যাবে। ওরা যাবে আর আমি বাদ; মনটা যেন কেমন করে উঠল। কিন্তু ছোট বেলায় আমি বড় চাপা ছিলাম। কাউকে মনের ব্যথা বলতে চাইতাম না। তবুও আম্মা বুঝলেন; রাত্রে বিছানায় শুয়ে আম্মা বললেন, আমরা কলকাতায় থাকলে তোমাকেও পড়তে দিতাম। কিন্তু আশ্চর্য ওদের কারুরই পড়তে যাওয়া হল না; কিন্তু কেন হল না তা তখন জানি নি। সেই মৌলবী সাহেবই রইলেন। সেই মেম গভর্নেস্ই রইলেন—সেই পর্যন্ত। পরে শুনলাম খানদানের কেউ যখন স্কুলে যায় নি তখন এরা কি করে যায়! মুরব্বীরা সরাসরি সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। যাহোক আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথম জীবনে সেই মহীয়সী মহিলাকে দেখবার—এও এক পরম সম্পদ। বাইরে বিপুল বিশ্ব। আর আমি রইলাম বিপুল সংসারের বিরাট পরিবেশেও বন্দিনী। পরীবানুর বিয়ে হওয়ায় চলে গেছে। ভাইরাও বোর্ডিংয়ে। মেয়ে! বড় হচ্ছি। এবার সত্যিকার সংসারের কাজের তালিম শুরু হল। রান্না করা, সেলাই করা, কাপড় রঙ করা, নাস্তাপানি—চা করা, ইংরেজি কায়দায় খানার টেবিল সাজানো, লাঞ্চ-ডিনার-ব্রেকফাস্ট তৈরি করা। কিন্তু খাবে কে? এক বড়মামা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, সিংহের মতো চেহারা, রাশভারী বিদ্বান লোক। আপনভোলা মানুষ। না-খাওয়ার খেয়াল আছে, না জমিদারী চালাবার যোগ্যতা আছে। বিরাট লাইব্রেরি আর শিকার নিয়ে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। বরিশালের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-কমিশনাররা হচ্ছেন নিত্যনতুন অতিথি। আর তখন তাঁরা সবাই বৃটিশ, আইরিশ আর কি জানি কোন-কোন দেশের লোক। ওরা আসতেন মেম সাহেব বাচ্চা-কাচ্চা সব নিয়ে। আর মামানী বেচারী খাস কামরায় বসে মেমদের সেকহ্যাণ্ড সহ্য করতেন। আর ওরা চলে যাওয়া মাত্রই সাবান দিয়ে একঘন্টা ধরে হাত ধুতেন। আমার খালাআম্মা কলকাতা থেকে যখন শায়েস্তাবাদ, তখন তিনি উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু সব ভার ছিল আমার আম্মার ওপর। মামাত খালাত বোনেরাও থাকতেন; এটা-সেটার ব্যাপারে সাহায্য-সহায়তা করতেন।

খালাআম্মার ছিল দারুণ শুচিবাই। এমন-কি তার স্বামীকেও আগে গরম পানি দিয়ে গা মুছিয়ে শোবার কাপড় পরিয়ে তবে বিছানায় উঠতে দেয়া হতো। মেম সাহেবরা চলে গেলে তিনি আবার গোসল করে নিতেন। খেতেন বসে এক টেবিলে। কিন্তু নিজেদের চেয়ার, বাসন, কাটা চামুচ ইত্যাদি সব আলাদা চিহ্ন দেয়া থাকতো, যাতে লাগালাগি ছোঁয়াছুয়ি না হয়ে যায়। মামানী খেতেনই না। 'গোল দালান' ছিল গেস্ট হাউস, দক্ষিণের বাগানের মধ্যে সেখানকার আসবাবপত্রও ছিল সব গোলাকার। মেম-সাহেবরা সেখানে থাকতেন। আম্মারা আবার তাঁদেরকে চুড়ি, পুঁতির মালা পরিয়ে চুল বেঁধে দিতেন। শাড়ি পরাতেন। তাঁরা অন্দরের পুকুরে নৌকা চড়ে বেড়াতেন। আম্মার পায়ে লুটিয়ে-পড়া, চুল দেখে মেম-সাহেবরা অবাক হয়ে যেতেন। এঁরা কখনও মেম-সাহেবদের সামনে গোসল করতে পুকুরে নামতেন না; আর আমার নানীআম্মার বোন ছোট নানী তো তাঁদের সামনেই আসতেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই মোগলকন্যার পূর্বপুরুষেরা ইংরেজের হাতে যে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, সে কথা তিনি কখনও ভুলেন নি। বৃদ্ধা বয়েসে এই পরমাসুন্দরী নানীআম্মাকে আমি দেখেছি ধার্মিকা, নিষ্ঠাবতী, কর্মিষ্ঠারূপে। একরকম রান্না তিনি জানতেন, আর মুখে-মুখে কত সব কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। উর্দু, আরবী, ফারসী তিনি খুব ভালো জানতেন। দুঃখের দাহে তিনি যেন বহ্নি-রূপিণী হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। আম্মা, খালাআম্মা, মামানীদের শিক্ষা তাঁরই কাছে। ১৯৩৩ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। শুনেছি তিনি ১২০ বৎসর বেঁচেছিলেন। শায়েস্তাবাদের উত্থান-পতন, ঐশ্বর্য-দারিদ্র্য সমস্ত তিনি দেখে গেছেন। তাঁর শেষ বংশধরটিকেও তিনি পরম ধৈর্যে, পরম যত্নে গোরের মাটিতে শায়িত করে শোকরানার নামাজ আদায় করেছেন।

আমাদেরকে রোজা-নামাজ, শরা-শরিয়ত পালন, মসলা-মসায়েল, ফরজ-সুন্নত, তরীকা-তরবিয়ত সবই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। আমার খালু ছিলেন তাঁর বোনের ছেলে, আর মামা-খালারা ছিলেন অন্য বোনের ছেলে-মেয়ে —নানীদের মেজবোন ছিলেন তিনি। আর ছিলেন সমস্ত পরিবারের মুরব্বী। নিজের মেয়েদেরকেও আমার মামার মেজমামা ও ছোটমামার সাথে বিয়ে দিয়ে মুঙ্গের থেকে চিরজীবনের মতো তিনি শায়েস্তাবাদ চলে এসেছিলেন। বেশি গয়না বা ঝক্‌মকে কাপড় পরা তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন,

চাঁদের আবার গয়নার কি দরকার। সবসময় আতর, গোলাপ, লোবান, কর্পূরের গন্ধে তাঁর ঘর সুবাসিত থাকত। বাচ্চাদের অসুখ করলে ওষুধ খাওয়াতে দিতেন না তিনি। বলতেন, একবার ওষুধ খাওয়ালে হায়াৎ কমে যায়, আর পরে শক্ত বীমারেও কোনো ওষুধ ধরবে না। টোট্‌কা ও তেলমাখা গোসল করাকেই তিনি স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য রক্ষার উপায় বলতেন। তাতে রোগ-ব্যারামও বেশি দেখি নি তখন। কারুর অসুখ হলে পানি-পড়া ও তেলপড়া ছিল ব্যবস্থা। তিনি নিজেই দোয়া পড়ে দিতেন। সবাই ভক্তিভরে খেতো। আর বেশি জ্বর হলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে বলতেন। তাঁর এক পোষ্য নাতি মহীউদ্দীনকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন। গরিব-দুঃখী সবাইকে তার ওষুধ খাওয়াতেন। আমরাও খেতাম।

সৈয়দ বংশে বিয়ে হয়েছিল বলে তিনি অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। বলতেন, যাঁর জন্যে আল্লাহ দুনিয়া পয়দা করেছেন তার বংশের খেদমতে আমার জিন্দেগী ধন্য হয়েছে ; এর চেয়ে বেশি দুনিয়াতে কি আর সৌভাগ্যের হতে পারে! বড়লোক তো অনেকেই হতে পারে। কিন্তু বড় মানুষ কতজন আর হয়? মাসের মধ্যে প্রায় দিনই তিনি রোজা রাখতেন। রোজা না রাখলেও একবেলা খেতেন। আর ভীষণ শুচিবাই ছিল তাঁর। কারুর ঘরে যেতেন না। কারুর বিছানায় বসতেন না, নিজের বিছানায়ও কাউকে বসতে দিতেন না। মামা-মামানীরা সালাম করতে যেতেন। আলাদা বিছানায় বা সোফায় বসে তিনি তাঁদের সালাম-আদাব গ্রহণ করতেন। নিজের হাতে রেঁধে খেতেন। আর সবাইকে একটু-একটু করে সব জিনিস দিতেন। তিনি ছিলেন একা মানুষ। কিন্তু পাঁচসেরি হাঁড়িতে তাঁর ভাত-তরকারি রান্না হত। কত কি যে তিনি রাঁধতেন! তাঁর মতো রওগনী রুটি, গোল কাবাব আর কেউ বানাতে পারতো না। তাঁর হাতের রেজালা আর পরটা খাইয়েদের মধ্যে এখন পর্যন্ত বোধ করি সঙ্গীতশিল্পী লায়লা আরজুমান্দ বানুর আব্বা সৈয়দ তাইফুর সাহেব এই সেদিনও বেঁচে ছিলেন।

আমার নানার বহু সন্তান-সন্ততির মধ্যে বড় হয়ে বেঁচেছিলেন ছয় ভাই ছয় বোন। সবচেয়ে বড়মামা, মেজমামা, বড়খালা ও মেজখালাকে আমরা দেখি নি।

বড়মামা : সৈয়দ মোজাফ্‌ফর হোসেন

মেজমামা : সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ হোসেন

সেজমামা : সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (এঁকেই আমরা বড়মামা বলে ডাকতাম)

ন-মামা : সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

ছোটমামা : সৈয়দ মোতাহার হোসেন (এঁকেও আমি দেখি নি)

কুট্টিমামা : সৈয়দ ফজলে রব্বী

বড়খালা : আয়শা খাতুন

মেজখালা : সাল্‌মা খাতুন

সেজখালা : কওকাব খাতুন (আমি দেখিনি)

ন-খালা : হাজেরা খাতুন (আমি দেখি নি)

ছোটখালা : সালেহা খাতুন

আমার আম্মা : সাবেরা খাতুন

বড় দুই মামা ঢাকার নওয়াব আব্দুল আলী সাহেবের কন্যার সন্তান। আব্দুল আলী সাহেব দশ-দশ হাজার টাকার দুই খণ্ড হীরা দিয়ে দুই নাতির মুখ দেখেছিলেন। আর ঢাকার মৌলবী বাজার ও বেগম বাজার—দুই বাজার দুই নাতিকে যৌতুকরূপে দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যার ইন্তেকাল হলে নানা আবার কলকাতাবাসী মুঙ্গেরের নওয়াব বংশে মওলবী আলম সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বর্তমানের চৌরঙ্গী প্যালেস ও পার্শ্ববর্তী অনেক স্থান কন্যার যৌতুকরূপে লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের মুসলিম-বিদ্বেষ ও শরিকানা গোলযোগে অনেক স্থান তখন তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখনও কলকাতায় সামান্য পরিমাণ জমি-জায়গা শায়েস্তাবাদ পরিবারের রয়ে গেছে। কিন্তু ঢাকার সমস্ত সম্পত্তি বহু আগে শরিকদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। অনেক জায়গা বিক্রি করে ও বাকি খাজনার দায়ে নিলাম করিয়ে নায়েব-পেশকাররা নিজেদের পেট-পরিবার পালনের ব্যবস্থা করেছেন। আমার দেখা বড়মামা হিসাবে সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবই তখন বেঁচেছিলেন; আর সবচেয়ে ছোট আমার কুট্টিমামা সৈয়দ ফজলে রব্বী তখন একেবারেই ছোট, আমার ভাইয়ার বয়সী। বড়মামা পণ্ডিত—আত্মভোলা মানুষ, লাখ-দুলাখ টাকার হিসেব নেয়াটা তিনি সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করতেন। তাই জমিদারি হিন্দু নায়েব—পেশকার-তহ্‌শীলদারদের হাতেই থাকল। প্রকৃতপক্ষে পর্দার আড়ালে

বসে মামানীই যা হিসাব-নিকাশ নিয়ে আয়-ব্যয়টা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মামার হাত থেকে দু-পাঁচ-সাত হাজার টাকা দামের হীরা-জমরুদের দশ-পাঁচটা আংটি কেউ-কেউ নমুনা দেখবে বলে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেন নি। চাকর-খানসামারা কিছু বললে তিনি আরও উল্টা রাগ করতেন। এদিকে শায়েস্তাবাদ তখন পদ্মার আর এক নাম কালাবদরের গ্রাসে পড়ে বিরাট সৌধারণ্যসহ, আসবাবপত্রসহ এমন কি অত সাধের লাইব্রেরির বিরাট-বিরাট আলমারি ভর্তি বইপত্রসহ একে-একে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে প্রাসাদের এক অংশে বাস করছি আমরা ও অন্য অংশ ঝপ্‌ঝপ্‌ করে ভেঙে পড়ছে। বড়মামাকে দেখলে মনে হতো যেন এক ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী। নির্বাক—ইজি চেয়ারে বসে চেয়ে আছেন। কিন্তু দৃষ্টি যেন সামনের কিছুতে নেই। দূরে, বহুদূরে—আর বিশাল নয়ন হতে অশ্রুবিন্দু আরক্তিম কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। সে যে কী করুণ অথচ মহান দৃশ্য! তা ভোলা যায় না। নায়েব-কর্মচারী, এমনকি আমার খালু পর্যন্ত হাত জোড় করে বলেছেন, আপনি হুকুম দিন বরিশালের বাড়িতে কিছু মালপত্র বই-পুস্তক সরিয়ে রাখি। অবিচলিতকণ্ঠে তিনি শুধু বলেছেন, না! বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট—জে ওয়াভেল, স্যাঙ্কি সাহেবরাও শায়েস্তাবাদ এসে অনুরোধ করলেন বইগুলো, পাথরের আসবাবগুলি, পোরসিলিনের প্রাচীন বাসন, চা-কফি সেটগুলি, হুকা, দেওয়ালের সেটগুলি বরিশালে নিয়ে গিয়ে যাদুঘর বানিয়ে রাখবার জন্যে, সব খরচ তাঁরা দেবেন। কিন্তু তাতেও বড় মামা রাজি হলেন না কিছুতেই! সবশেষে পোনাবালিয়া-কাণ্ডের হোতা ব্লাণ্ডি সাহেবও শায়েস্তাবাদ এসে অবশিষ্ট যে-টুকু আছে তাই সরাবার অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, অন্তত বইগুলো যা আছে তা-ই পাবলিক লাইব্রেরিতে দিয়ে দিন। আপনাকে নওয়াব উপাধি দেয়া হবে। অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ব্লাণ্ডিকে বিদায় করে রাগে ক্ষেপে উঠে বড়মামা গালাগালি দিতে থাকলেন, হারামজাদা শূয়রের বাচ্চা। আমার দাদা-নানা-বাবা নওয়াব ছিলেন। আমাকে নওয়াবীর লোভ দেখাতে এসেছে। কম্‌বখত যেন আর শায়েস্তাবাদে ঢুকতে না পারে।

শায়েস্তাবাদের নিয়ম ছিল জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হোক বা কমিশনার হোক, বিনা অনুমতিতে শায়েস্তাবাদে আসতে পারবে না। পোনাবালিয়া-হত্যা-

কাণ্ডের পর ব্লাণ্ডির নিজেকেই বরিশাল ত্যাগ করে চলে যেতে হল। কিন্তু তখন তো আমি সন্তানের মা।

আবার এর আগের জীবনেই ফিরে যাই। ১৯১১-য় আমার জন্ম। ১৯১৪-য় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৮ পর্যন্ত সে যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল। যুদ্ধের সাথে হল চাল-চিনি-কাপড়ের দুর্মূল্যতার পত্তন। তবু যে আমাদের অভাব খুব বেশি হয়েছিল তা নয়। ঘরের চাল ছিল, তেল ঘি-ও পাওয়া যেত, চিনিও খুব শাদাটা না পাওয়া গেলেও শাদা ধব্‌ধবে বাতাসা পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে। বড়-বড় বাতাসা, গুড় সবই ছিল। শুধু শাড়ির ব্যাপারে মিহিন-শাড়ির অভাবটাই মহিলা মহলে ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। ঢাকাই মসলিন, আবে রওয়াঁ তখন বিলেতী কাপড়ের কলে বলি হয়ে গেছে; আমরা ছোটরা তখন পা-জামা কুর্তা দোপট্টা পরি। কিন্তু আমাদের কাপড়ের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। আর স্বদেশী আন্দোলনের যুগের আগুনটাও বোধকরি আবার জ্বলে উঠেছিল। কোথা থেকে আমাদের অসূর্য্যম্পশ্যা অন্দর মহলেও গানের কলি ভেসে এল :

আমরা পরব না বিলেতী বসনভূষণ
খাব-না কলের চিনি, কলের লবণ ;
পরের মেয়ে মোদের ঘরে এনে
কিনব না ঠুনকো চিনি—যাবে ভেঙে,
তোরা শোন্ বিদেশী! আমরা সব বুঝেছি
চাইনা তোর ল্যাভেণ্ডার মিছা মিছি…

আরও কি কি লাইন ছিল আমার মনে নেই এতদিনে, আর সে গান কারুর মুখেও অবশ্য আমি শুনি নি। দেখলাম আম্মারাও তাঁতে শাড়ির দিকে ঝুঁকেছেন। আমার মামা ব্যারিস্টার মোতাহার হোসেন সাহেব স্বদেশী আন্দোলনে অশ্বিনীবাবুর সঙ্গী ছিলেন। শায়েস্তাবাদ জেলায় কারিগরদের তাঁত বসিয়ে দিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত ভালো শাড়ির প্রস্তুত-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন ; এখন আবার ব্যাপারীরা অল্প-অল্প করে ভাল তাঁতের শাড়ি আমদানি করতে শুরু করল। বরিশালের গোবিন্দ সা-র দোকান বলতে গেলে শায়েস্তাবাদের দোকান ছিল। বেনারসী শাড়ি থেকে তোয়ালে পর্যন্ত

সবকিছু ওরাই যোগান দিতো ; কাজেই শাড়ি-সঙ্কটও কেটে গেল। কিন্তু ভাইয়া যখন বরিশালে জেলা-ইসলামীয়া বোর্ডিংয়ে, তখন সেখান থেকে চিঠি এলো যে তাঁরা সব খদ্দরের জামা-কাপড় তৈরি করতে শুরু করেছেন। বড় মামা এক হুমকি ছাড়লেন নায়েব বাবুর উপর, আর আম্মাকে ডেকে হুকুম দিলেন ; খবরদার, ছেলেরা যেন ও-কর্ম না করে। বাস, ওই পর্যন্তই। ভাইয়ারা পূজার ছুটিতে বাড়ি এলেন। দেখলাম খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা। সেই প্রথম খদ্দর চোখে দেখলাম।

ইতোমধ্যে আমারও মানস নয়ন যেন উন্মিলিত হয়েছে অন্যভাবে। ভাইয়ারা বাড়িতে আসতেন, খেলাধূলা হৈ-হুল্লোড় তো হতোই, আর এক খেলা তাঁরা খেলতো ইস্কুল-ইস্কুল খেলা। চাকর-চাকরানীদের ছেলে-পুলের অভাব ছিল না। আর ছিলাম আমি, আনজু, জবি, ময়না। প্রকাণ্ড হলঘর খালি পড়ে থাকতো। দুপুর বেলায় ভাইয়ারা সত্যি বইপত্র স্লেট নিয়ে দেওয়ালকে ব্ল্যাকবোর্ড বানিয়ে ইস্কুল বসাতেন, ঘণ্টাও বাজানো হতো। বাংলা ইংরেজি, অঙ্ক সব ঠিক-ঠিক তাঁদের বিদ্যাদান অনুযায়ী হতো। আমি সেই স্কুলের ছাত্রী হয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতাম। ইংরেজি পরীক্ষায় ১০০-র মধ্যে ১০০-ই পেতাম। এতে ভাইয়ার কি আনন্দ! কি করবেন ভেবে পেতেন না যেন। সব মাস্টাররা পরামর্শে বসলেন আমাকে কি দেয়া যায়। আমার ভাইয়া খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। সব ক্লাশেই তিনি প্রথম হতেন, বৃত্তিও পেয়েছেন। তিনি বললেন, আমার নামে 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকাটি আনিয়ে দেবেন। তার বৃত্তির টাকা দিয়েই সে পত্রিকায় দাম দেওয়া হবে। যথারীতি 'সন্দেশ' অফিসে চিঠি লেখা হলো। ছুটি শেষ হলে ভাইয়ারা চলে গেলেন। একদিন হাসনাবানু বেগমের নামে 'সন্দেশ' পত্রিকা সত্যিই এল। সে যে কি আনন্দ! কি উল্লাস! কিন্তু ভাইয়া যে বাড়িতে নেই, এ সুখের ভাগ কাকে দেই, কে বুঝবে। এক্ষণি এ সুখের ভাগ ভাইয়াকে না দিতে পারলে আমার বুক ফেটে যায় আর কি! আম্মা দেখলেন। চুপ চুপ! বাংলা পত্রিকা মেয়ের নামে এসেছে একথা বড়মামা শুনলে যে কী কাণ্ড করবেন তার ঠিক কি? কিন্তু ভাইয়াকে না জানিয়ে যে শান্তি পাচ্ছি না। তাই আমার জামাই বরিশাল রওয়ানা হলেন। পায়ে হেঁটে বার মাইল যেতে আসতে ; কিন্তু খালি হাতে তো কখনও আম্মা ছেলেদের খবর নিতে পাঠান নি। তক্ষুণি কিছু নাস্তা তৈরি করতে বসে গেলেন তিনি। আম্মার নিয়ম ছিল বোর্ডিংয়ে যখনই কিছু পাঠাবেন তখন

নিজের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের জন্যই শুধু পাঠাবেন না; বোর্ডিংয়ে কত ছেলে আছে জামাই জেনে আসতেন বা ভাইরা চিঠি লিখে জানাতেন; সেই হিসেবেই নাস্তা পাঠান হতো। একদিন একশো-দেড়শো পরোটা তৈরি করে, সেই অনুযায়ী কোরমা বা রেজালা রেঁধে তাঁকে পাঠাতে দেখেছি। শীতের পিঠা, মাছ, গোস্ত, হালুয়া মোরব্বা, যা পাঠাবেন সেই মতো পাঠাবেন। আর দেবার আদেশ ছিল বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পণ্ডিত বাদশা মিঞা সাহেবের হাতে। যাতে করে কেউ পায় আর কেউ না পায় সেইরকম হতে না পারে। সে বোর্ডিংয়ে তখন বরিশালের সব বড়-লোকের ছেলেরাই থাকতো; তখন ছিলেন (অবসরপ্রাপ্ত) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল হাদী তালুকদার সাহেব, সাবেক মন্ত্রী তফাজ্জল আলী সাহেব, জজ এনায়েত পীর সাহেব, তাঁর ভাই গোলাম মওলা সাহেব, মহিউদ্দীন সাহেব আরও অনেকে। ভাইয়া ছিলেন তখনকার দিনের নামকরা সেরা ছাত্র। এখনও আব্দুল হাদী তালুকদার সাহেব ভাইয়ার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। সে থাক্। সেই অবেলায় জামাই নাস্তা নিয়ে ভাইয়াকে খবর দিতে ছুটলেন। আর ফিরলেন রাত দশটায়। আর আরও অবাক কাণ্ড, তাঁর হাতে একরাশ শিশুপাঠ্য বই! আল্লাহ্ আমাকে সুখ-দুঃখ দুইয়েরই স্বাদ যথেষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করি যে, কখনও দেখা না হয়েও অনেকে আমাকে বিশেষ স্নেহে অভিষিক্ত করেছেন। এ যে আমার অন্তরে কতখানি প্রেরণা যুগিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করবার নয়। সেদিন, অসময়ে জামাইকে বোর্ডিংয়ে দেখে পণ্ডিত বাদশা মিঞা যখন 'সন্দেশের' ব্যাপার শুনলেন এবং ভাইয়া ও জামাইয়ের মুখে আমার বই পড়ার আগ্রহের কথা জানলেন, তখন তিনি তাঁর লাইব্রেরি থেকে অনেকগুলো শিশুপাঠ্য বই জামাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি মাসের মধ্যে প্রায়ই আসেন, এই বই পড়া হয়ে গেলে নিয়ে আসবেন আবার অন্য বই দেব। খুশিতে আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসে যেন! আল্লাহ্‌র কী মেহেরবানী আর মানুষের কি স্নেহ মমতা আমার জন্যে! নামাজ পড়ে বারবার আল্লাহর শোকরানা গোজারী করলাম।

ছোটবেলায় খুব নামাজ পড়তাম, আর মনে হতো যেন আল্লাহ্ তালা হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। এর পর থেকে বোর্ডিং থেকে আর এক কাণ্ড শুরু হলো। আম্মা তো নাশ্‌তা পাঠাতেন সবাইর জন্যে; আবার অন্যদের বাড়ি থেকেও তো তাদের মায়েরা নাশ্‌তা পাঠাতেন। ভাইয়া

আবার সেগুলো আমার ভাগ বলে জামাইয়ের হাতে দিতেন। আমাকে ওরা নিজের বোনই বলতো। আশ্চর্য, ওদের অনেককে কেনো প্রায় সবাইকেই আমি দেখি নি। ওদের নামও জানি না। শুধু গফুর ভাই ছিলেন ভাইয়ার খুব বন্ধু। আমার বিয়ের পর আমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে এসে তিনি আমাকে দেখে গিয়েছিলেন—অনেক মিষ্টি, বই, ফুল ইত্যাদি নিয়ে। আর চাখারের মহীউদ্দিন ভাইতো আমাদের আত্মীয়ই ছিলেন। তিনি ছোটবেলায় শায়েস্তাবাদে আসা-যাওয়া করতেন। আম্মাকে ফুফু ডাকতেন। তাঁর আম্মা আমাদের মামী হতেন, কত হালুয়া, মোরব্বা, পিঠা, রাজহাঁস রান্নাকরা, রাজহাঁসের আণ্ডা যে তিনি আমাকে পাঠাতেন। বড় হয়ে শায়েস্তাবাদ ভেঙে যাওয়ার পর যখন আমরা বরিশাল এলাম, তিনিও তখন চাখার থেকে এসে বরিশালে ছিলেন। আম্মাতে-মামীতে যে কত সুখ-দুঃখের কথা, কত হাসি-কান্নার আলাপ হতো তা আমিও বসে-বসে শুনতাম। রঁাধতাম, খাওয়াতাম, আবার তাঁদের বাড়ি গেলে রান্না খাওয়া হতো। সেসব দিন আজ শুধু স্বপ্ন।

ভাইয়ারা বোর্ডিংয়ে থাকতেই জীবনের আর এক অদ্ভুত পর্যায় শুরু হলো। সে-ও অভিনব। সুখ-দুঃখ আনন্দময় সে স্মৃতি, কিন্তু গুছিয়ে সাজিয়ে লিখবার মতো মন যে আর নেই! অনেক দিলেন আল্লাহ্। অনেক নিলেন! আরও তো সামনে জীবন আছে, কতটুকু আর কলমের আঁচড় কেটে তুলে ধরতে পারব কে জানে!

বাংলা, উর্দু, ফারসীতে শুনলাম কত গান, কত দেহতত্ত্ব, কত মুর্শিদী, কত ভাটিয়ালী-জারি-সারি গান। দেখলাম কত নাচ, কত নাটক। অন্তঃপুরের অন্তরালে যে সৃজনশীল প্রাণ কত সৃষ্টি-চঞ্চল হতে পারে—আমাদের এসব নৈশ অভিসারে তা আমরা উপলব্ধি করতাম অজস্র অশেষ ধারায়। আমাদের মন যেন উধাও হতো অনাবিল আনন্দের উৎসে অবগাহন করতে, অপার রহস্য রসের সন্ধানে। বুকভরা এ পাওয়া-অ-পাওয়ার দাম কি কম। পরম শ্রদ্ধেয়া বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যে 'অবরোধ বাসিনী'র চিত্র এঁকেছেন, সে যুগে তাও ছিল। আবার নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার আগ্রহে তাঁর মতো মহিমময়ীরও সৃষ্টি হয়েছে এই অবরোধ-ঘেরা অন্ধকারের মধ্যেই, রাত না থাকলে দিনের প্রকাশ হতো নাতো। তাই কিছু আলো কিছু আঁধার, কিছু মুক্ত, কিছু বন্ধনের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে স্ফুরণ—বড় সুন্দর, বড় মূল্যবান সে।

পলাশের বরাত

বিশ্বনাথ বসু

এ পাড়ায় তখন পড়ো মাঠ, ডাক-পাখি, পানা ডোবা ও অনেক গাছ-গাছালি ছিল। আঝোড়া গাবে ঘুঘুর ঘষাঘষা ডাক উঠত, রাতে রাত-পায়রা বা কোক, ডোবায় কলস ও উদবিড়াল—আর ভাঙ-বিষ কাঁঠালির ঝুড়ি-জংলায় শঙ্খচুড় ও দ্রুত দাঁড়াস। সকাল-সন্ধ্যা কাঁচারাস্তা, উঠোনে হত কানামাছি ও উপেনটিবায়োস্কোপের হৈ চৈ। তারপর সন্ধ্যা উৎরাতেই শ্যাওড়ার ঝাড়ে বেতাল হাওয়ার খসখসানি, কিছুর কাতরানি ও রান্নাঘর ছানচাতলা অবধি শেয়াল বাঘডাঁসার উৎপাত। বসন্ত মাসে মৌচুষির বিপজ্জনক ওড়াউড়ি, ক্লান্ত ঘোড়ার নালের মত ক্লিক ক্লিক গলা। অধ্বে বেলায় বননিমে ঝিঁঝির ঝিনঝিনানো আর আমডালে উত্যক্ত কাক ও কোকিল।

ওর বাবা, ইতিহাসের শিক্ষক ও আত্মভোলা ধরনের ধরণী ভট্টাচার্য পড়াতে পড়াতে হর্ষবর্ধনের জন্য কাঁদতেন। আবার কোনও কোনও দিন বিশেষত বৃষ্টিবাদলায়, বলতেন ভীষ্ম, নকুল, কর্ণ বা মজার যত ভূতের গল্প যেমন গোগোলের ওভারকোট। তাঁর বলবার কায়দায় মনে হত যেন কলকাতার অভিনয়। ওর মা পদ্মা, ঘি, গরম মশলা দিয়ে নেড়ে নামানো ওঁর হাতের ওলের তরকারি লাগত যেন রোববারের মাংস। তাছাড়া দেওয়ালে, আসবাবে, আয়নায় ওঁর কুরুশ উলকাঁটার বাতিকের সব নমুনা : পাহাড় করা বালিশ, সাতরঙা মাছরাঙা ও নাও, মুকুট মাথায় নুলিয়া, আয়নায় কুরুশের জাল ও বাচ্চা-পেটে কাপড়ে তোলা গগন ঠাকুরের অনুকরণে রৌদ্র রঙের ফুল, আর লেখা নার্সিসাস।

বাঁশবাগারের ওপারে কেউ আর সে-সময় বসবাস করতে যেত না। জোড়া মসজিদ, ইটাভাঁটা, রাজবংশী গ্রাম ও পোদ্দারদের বড়তরফের আমোদ-প্রমোদের জন্য একটা জোতবাগান ছিল। জমির দর বড় জোর শ টাকা কাঠা। ক্রমে চায়ের ডিরেক্টাররা, সদর অফিসের সেক্রেটারি, বাগানবাবুরা, ত্রাণ-পূর্ণবাসন কৃষি ও পূর্ত দপ্তরের পাকাল অফিসাররা ও যুদ্ধের পর সব নাম করা ঠিকাদারগণ যখন রঙ-বেরঙের দালান, গ্যারেজ ও লন করল—কামলাপট্টির জায়গায় ও-পাড়ার নাম দিতে হল নতুন পাড়া।

বাঁশহাটিতে পাওয়া যেত নানা রকমের বাঁশ ও শস্তা কামলা, ধারার বেড়া, ফুল, মিষ্টির সাজি, পাখির খাঁচা আর দয়ালের লাটাই। উল্টোদিকে ছিল কাঠ ও ছনের একটা সিনেমা হল, যেন দলগাঁও চা বাগানের পাতি ওজন ঘরখানা। একদা ওতে অচ্ছুৎকন্যা, দেবদাস ইত্যাদি বায়স্কোপ হত—এখন পরপর বোম্বাই পিকচার। পাতি পাইকারদের অতবড় যে মাঠ, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস রোধ উপলক্ষে হোমযজ্ঞ, যাত্রাগান, ফুটবল ও জনসভার জন্য বারোয়ারি ছিল—সে মাঠে হঠাৎ উঠল চামড়ার কারখানা। রৌদ্র বাতাসে চামড়ার উৎকট গন্ধ, দিঘির জল ঘোলা, কাঁচা চামড়ার পর্দা ও ঝিল্লি নিয়ে কাককুত্তার কাড়াকাড়ি। পাশেই বাস সিণ্ডিকেটের গ্যারেজ-ওয়ার্কসপে পোড়া মবিল আর ছেঁড়া টায়ারের কাজলানো ধোঁয়া। এদিক-ওদিক ছড়ানো শিশুমহল, ভাওয়াইয়া-সংগীত শিক্ষা বিদ্যালয়, রঙ্গনাথ চন্দ্রনাথ নার্সিংহোম ও খাপছাড়াদের আসর। মঙ্গলবার আসর থেকে 'কেয়ার'-এর দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। আর ১৪ই নভেম্বর হাতি ও ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে শহর পরিক্রমা করে স্টেডিয়ামে যায় জমকালো শোভাযাত্রা। স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চায়ের রাজা বাঘাবণিক। মাথায় থাকে রৌদ্র নিবারণের জন্য হান্টিং হ্যাট আর হাতে, বয়সের দোষে দমহারা হলে, যত্রতত্র বসবার জন্য ছড়ি চেয়ারের প্যালা। ওদিকে মঞ্চের পাশে মাঠে গার্ডেন ডোনেশন—সরকার ও বিশ্বসংস্থা থেকে পাওয়া ও কেনা কমলার পাহাড়, বিস্কিট লজেনচুশ-এর অসংখ্য টিন। সাবালিকারা কমলা ও বিস্কিট লজেনচুশ বিলায়। বাঘাবণিক উপভোগ করে। সব ফুরিয়ে যায় না। সিমেন্টের স্টেডিয়াম ও চারদিকে টিনের মজবুত বেড়া। যা বাঁচে তা যায় আসর পরিচালক 'খাপছাড়া মশায়ের' বাড়িতে। ও-বাড়িতে অনেক বাচ্চাকাচ্চা। অজস্র গ্যাস বেলুন ওড়ে। যোগ ব্যায়াম, ছড়ার ব্যায়াম, ফ্যান্সি ড্রিল, ব্রতচারী আর শেষে বাঘ-ভালুক, রাক্ষস-খোক্কসের মুখোশ পরে নাচ গান হয়। এই হল খাপছাড়াদের বাৎসরিক উৎসব। আর রোজ বিকালের জন্য আছে চমৎকার শিশু উদ্যান।

'কেয়ার'-এ মিল্ক বা বাগলার হুইটের খিচুড়ি। থালাবাটি পেতে খাওয়ার মত অভাব অবশ্য পলাশদের কখনো হয়নি। তবে ধরণী ভট্টাচার্য সন্ন্যাস রোগে মরে গেল। পলাশ কাঁদে নি, চতুর্দিকে আত্মীয়-পরিজন, পাড়াপড়শি, গুণমুগ্ধ শিষ্য, হিতৈষী বা অন্যান্যরা কি ভাবছে ভেবেও না। বরং শব বয়ে, খড়িঘর থেকে ঠ্যাবাকল সে টেনে এনেছে চিতায়। মুখাগ্নি করতেও

কোনোরকম মায়া হয় নি। কেবল, পুড়ে ঝলসে ছাই হয়ে যাওয়া বাবার ঘি-মাখা মজার মুখটা মনে পড়লে বড় খারাপ লাগত। শিক্ষক পিতার জন্য সন্তানদের অবশ্য কোনো বড়াই ছিল না। আসলে লোকটা ছিলেন সম্ভবত নাট্যকার। রোববারে যারা ওঁর কাছে আসত, নাটকের ইতিহাস বা চরিত্র জিজ্ঞাসা করে নিত ও যাদের উনি বলতেন 'হ্যাংলা' বা 'ওপর ভাসা' তারাই কিন্তু পরে নাটক, মঞ্চ আর অভিনয়ে শহর মফস্বল মাত করত। এ নাট্যকারের নাটক কেউ গরজ করে কখন অভিনয় করে নি। স্কুল ও টিউশনি করে ফেরবার পর কখন সন্ধ্যার ভ্যাপসায়, কখন শুক্লপক্ষের রাতে ওঁকে অযথা কাঁদতে দেখা গেছে। গৌড়ীয় মঠের তালগাছ থেকে দারোয়ানের তাড়া খেয়ে হড়হড়িয়ে নামতে গিয়ে পলাশের বুকের ছালচামড়া তখন যেন ছড়ে যেত। চায়ের দাম দিতে গিয়ে পলাশ একটা ক্যাপস্টান কিনে ফেলে। ওটা ও নদীর জংলা পাড়ে বসে কেশে কেশে টানল। বিশ্রী লাগে। শেষে মুখের গন্ধ মারতে ওকে ফের পানের দোকানে গিয়ে পানের বোঁটা চিবোতে হয়। তবু পিতৃদশায় ধূমপান ওর অভ্যাস হয়ে গেল। পোড়ায় একরকম ব্রাণ্ডে জমত না। বয়েলইয়েট, পাশিং শো, পানামা, কুল সবই ওরা চাখত। পরে পয়সা ও মৌজের জন্য ফুৎ ফুৎ করে নয় নম্বর আসাম বিড়ি।

গণেশ গাঠুয়া ওকে একদিন সিনেমায় নিয়ে যায়। ও আর মাকাল সুশীলই মমতা, সামতা ওদেরকে সাপ্লাই করত—খচরা কিস্যা হত। গেট-ম্যান ধূলি ঠাকুরকে আটআনা দিয়ে ওরা থার্ডক্লাশের সিট ম্যানেজ করে। পলাশ ন্যাড়া মাথায় ক্যাপ পরে গিয়েছিল। অত সামনে বসায় চোখের ওপর ঘোলা জলের মত, ঘসা কাচের ভেতর দিয়ে যেন দৃশ্যগুলোর জঘন্য নড়াচড়া। আর সারাক্ষণ ধরে ঐ বাঙালিপনার এলোমেলো ড্রামা বা কান্নার যক্ষ্মা। পলাশের মাথা ধরে যায়। ও ঘামে চপচপ-ক্যাপ মাথা থেকে খুলে ফেলে। তবে ইন্টারভেলে যে কাটিংগুলো দেখানো হয়েছিল তাতে ছিল স্পাই পিকচার। লিপস্টিক ঘসা ঠোঁটে শিরদাঁড়া শিরশিরানো কসরৎ আর বিহ্বল গলায় '—কিস! কিস!' কোল্ট পেস্তলের রক্ত উশকানো আওয়াজ আর ষাঁড়ের মতো জবর গলায়—ব্যাঙ! ব্যাঙ! এই ধরনের দুর্ধর্ষ ফ্লিমের আমদানি তখন দেদার, যার প্রতি ইঞ্চি চারমিনারের চেয়ে কড়া। ঐ 'কিস কিস কিল কিল' ফ্লিমটা ওরা ব্ল্যাকে দেখে।

পলাসের নিজেকে ক্রমে ক্রমে যেন নপুংসক মনে হয়। আর তাই ওকে

রান্না ঘরে চলে গেলেন। ওঁর স্ত্রীও আর বেরুলেন না। আগে মাসিমা প্রায় দুপুরেই মার কাছ থেকে শৌখিন রান্না ও ডিজাইন তুলত। এমনি ভাবে একা একা বসে থাকতে থাকতে পলাশের রাগ হয়। ও উঠতে গিয়ে বাইরের ঘরে অঞ্জনাকে দেখতে পায়। অঞ্জনাও আমলকির মতো ওর মুখখানা ভেঙাল। পলাশ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে অঞ্জনাকে দরজার কোণায় লুকনো দেখল। আর 'খাপছাড়াদের আসর'-এ যেমন ভাবে উঠতিদের মধ্যে ডার্করুম গেম হয় ওর লুকানোটা সে রকম ছিল। অঞ্জনা আড়চোখে হাসল। তাই পলাশও ওকে রঙ দিতে যায়। পলাশ জানত না ওমন কোমলাঙ্গে অত জোর হয় বা কুলকাঠের আগুনের মতো গরম। কোঁকড়ানো চুলে খুনখারাপিয়া আভা আবির ঘষে দিয়ে ও পালালো। সে রাতে ঘুমোবার জন্য, ওয়েসিসে, পলাশ হিরোইন গেলে।

জমিতে যেতেই আধিয়ার আধমণ ধান দেয় আর ফিসফিসিয়ে বলে— 'এদিকটায় জমিনের মারডাঙা বহুৎ নাগি গেইসে। ভগবান, কার ভাগ্যৎ যে কি আছে?'—'দিলেন তো আধমণ ধান।' পলাশ মুখ বেঁকিয়ে বস্তা বাঁধা পাটের টুকরাটা বাঁ হাতের দুই আঙুলে মরা ইঁদুরের ল্যাজের মতো ধরে ছেড়ে দেয়। আধিয়ার হাতের ময়লা বুড়া আঙুলে খৈনির মত ডলে ডলে ওঠায় ও বলে—'আরে সত্যি। অধিকারীর পাটে সাংঘাতিক গণ্ডগোল।' রাতজাগা ঘোলা চোখে আধিয়ার এদিক-ওদিক তাকায় আর বলে— 'ভীষণ ডাকাত।' পলাশ ফট করে হাট-পাইকারের মত বলে ফেলে—'বরং কন না ক্যানে দেউনিয়াতে দেশি ভাটিয়ার কাজিয়া লাগি দিবার জন্য নাঙ্গা গতরে পাখা হাতে বিবাগী হয়া গেইসে।' '—তাই বলি তোমাকে ঠকাইম না দাদা। এ বছর তো ধানে হয় নাই। বাদ বাকিটা তোমার বাগাত ধরি যাম।' আধিয়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ধানের খোসা, মরাপাতা ও জঞ্জালের নেভা পোড়ের দিকে তাকায় ও আস্তে বলে—'এলায় যা ধান না দেওয়ারে উসকানি।' পলাশও অন্যদিকে সরে গিয়ে যেন অন্যমনস্ক হয়ে বিবর্ণ কালো মেঘের গাছপাতা নাড়ে। —'তোমরা বরং জাপানি প্রথাতেই চাষটা কর। দেউনিয়া কসে ঐ চাষে নাকি ম্যাকছিমামে নাফা।' এই খচরামো পলাশের সহ্য হয় না। এক ঝটকায় ও ধানের বস্তা কাঁধে করে নিয়ে হাঁটা দেয়। আর তাতে আধিয়ার এমন 'হায় হায়' করে ওঠে যেন ডাকাত পড়ায় জোতদারের সর্বনাশ হয়ে গেল—'আরে তোমরা বাবুর ঘর। উলটি পড়িটরি যাবেন রে। কনেক দাঁড়াও রে বাবুর ঘর। মোর ব্যাটায়

ধরি যাবে।' পলাশ পাত্তা না দিয়ে চলে যেতে থাকে। আধিয়ার গাল পাড়ে—'এ্যাই ধরকটু! কুঠে গেইছিস্‌রে বজ্জাত।' 'টাউনৎ। এতক্ষণে 'ওয়ারিসের' হাফ হয়ে গেল।' 'কি কসেন?'—'তোমার ব্যাটা কুন্তলা পারেখের মহব্বতমে দিবানা বনে গেছে।'—'হে-এ-এই ধো-ও-র কটু।' ততক্ষণে পলাশ মোটা আলে উঠে পড়েছে। '—এই ধোরকটু।' অমন গরু গরু-ডাকটায় ওর হাসি পায়। '—দেউনিয়াক কবেন ভাটিয়ালাও পারে,' পাতল বাতাসে ও ওর কথা ভাসিয়ে দেয়। আধিয়ার পেছন থেকে কী বলে বোঝা যায় না। কাঁধ থেকে ধানের বস্তা ও মাথায় তুলে নেয় ও তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। মাথায় ধানের বস্তা যেন ঘোর জ্বরে বরফখণ্ড। আজ চড়ক ডাঙার হাট।

সেদিন সন্ধ্যায়। ওর এক কাকু কমপিউটার কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন-টেটিভ, কদিনের জন্য কোনো কাজে-বা বেড়াতে এসেছেন আর পলাশ গিয়ে হাজির। লোকটার পরনে ব্যাঙ্গালোর প্রিন্টের কাটা লুঙি ও গাঢ় রঙের জামা। ওঁর যা জলভসকা স্বাস্থ্য তাতে পলাশ বোঝে যে সে বিদায় হলেই এই ভর সন্ধ্যায় উনি বোতল বের করবেন। কিন্তু পলাশও কিছুতেই উঠে আসছিল না। অঞ্জনা আয়নায়। কাকা শেষে আলস্য কাটিয়ে বলে—'লেখাপড়া কর না'?—'উহু'।—'কাজ কারবারের কোন ধান্ধায় আছ'? 'না'। 'তবে'? লোকটার অস্তিত্বই তখন পলাশের কাছে বিরক্তিকর। তার উপর এইসব জঘন্য জিজ্ঞাসা। অঞ্জনা ওকে এককাপ চা বানিয়ে এনে দিল। 'ওঁর চা'? 'খাই না'। ওর কাকা অঞ্জনার দিকে চেয়ে খচ্চরের মতো হাসল। টেবিলে তখনও খালি কাপ ছিল। পলাশ যখন চা-টা খাচ্ছিল অঞ্জনা বিছানার কোণে বসে বসে একটা পর একটা ন-কাকার ম্যাচের কাঠি জ্বালাচ্ছিল। আর কাকা যেন চিড়িয়াখানাতে অবাক হয়ে বেবুনের চা খাওয়া দেখছে। আবার হঠাৎ উনি বলে উঠলেন—'চুল আঁচড়াওনা পলাশ'? —'আঁচড়াইতো'। ডুয়ার্সের রঙ ও দার্জিলিঙের গন্ধওয়ালা পঁয়ত্রিশ টাকা পাউণ্ডের চা খাওয়ার আমেজে ও উত্তর দেয়।—'বেশ। এবার থেকে ভালো আয়নায় চেয়ে আঁচড়াবে।'—আয়নায়'?—'বেলজিয়াম আয়নায়। আর মাঝে মধ্যে রসগোল্লা, পটেটো, ডিমছানা খাবে। নইলে এ বয়সেই ব্রহ্মতালুতে চাঁদ উঠবে।' অঞ্জনা খিল খিল করে হেসে ফেলে। লবনে পোড়া হাসি। কাকা এরপর কাটা লুঙ্গি তুলে ভেতরে চলে গেল। আর অঞ্জনা হেসে হেসেই তাকে বলে—'আজ রাতে কিন্তু বিবিধ ভারতীতে বিনাকার প্রোগ্রাম

আছে।' এতক্ষণে পলাশের লক্ষ্য হয় চায়ের কাপে কাটা দাগ। অঞ্জনা বিছানায়। বলল—'খাওয়া হয়েছে'? আর যেন উহ্য থাকল অসভ্য। আধ-খাওয়া কাপটা পলাশ রাখতে রাখতে জানোয়ারের মতো তাকায়। অঞ্জনা ধবধবে বালিশে পিঠ লাগিয়ে যেন জুজুৎসু জানা কোনও নায়িকার মতো, আর ভাবখানা—এসো না কেমন দেখি? মজা বোঝাব। পলাশ ভ্রূ ভেঙে উঠে দাঁড়াতেই অঞ্জনাও ফ্রক-বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায় ও সেই অনুচ্চারিত ভাষায় বলে—কি করবি তুই চাঁড়াল। উটের মতো গলা বাড়িয়ে ও রক্ত ওতলানো, কপালে নীল-টিপ-দেওয়া অঞ্জনাকে দেখে। পলাশের শরীর মন শিথিল হয়ে যেতে থাকে আর ও বলতে চাইল—'অঞ্জনা, তুই লায়লা'। দোমড়ানো ঠোঁটের রাগে ও অদ্ভুত আহ্লাদে অঞ্জনাই বলে ওঠে—'কিন্তু, লাভ হবে না'। পলাশ আর যায়নি। শুকনো রাতে ও গ্রামে এলেই সেই সন্ধ্যা খেজুরের কাঁটার মত মস্তিষ্কে গেঁথে থাকে।

উজানি বেলায়, গ্রাম্য গড়িমসি ভেঙে আস্তে আস্তে হাট লাগছিল। এই স্যাঁতস্যাঁতা গ্রামগঞ্জে সময়ের ব্যাপার ও জীবনের ঢং এ-রকমের। দরদাম নিয়ে কচলাকচলি করতে আর ভালো না-লাগায় পাইকারকে ও তেতাল্লিশ টাকার পরতায় ধানটা ছেড়ে দেয়। অবশ্য চাউল-বানানোর খাটনি খরচা দিয়ে হরে গড়ে একই পড়ে। কচকচা টাকাগুলো পকেটে রাখতে গিয়ে পলাশের মন উগলে ওঠে; লাল ও সবুজ পাতার জলপাই গাছটার ওখানে মেটা মদেশিয়া। ওর মুখের কাটিঙে এত বাঙালিয়ানা যে চমকে যেতে হয়। যুবতী এলাচি লেবুর মত মোটা ঠোঁট ও ঝকঝকা দাঁতে মরদ-পটানো হাসি হাসে। জমিতে আসা টাউনের বাবুদের মতোই পলাশ তখন হাট করবার অছিলায় পা বাড়ায়। যত ও এগোয় ততই যুবতী যেন চাঁদের প্রায় ভার-শূন্যতায় সরে সরে যেতে থাকে। অথবা যেন ওর কোন হাড় মাংসের পা নেই, অদৃশ্য ডানা। পলাশেরও জংলী জিদ চড়ে যায়—আজ ধরবই! চালগমডালের, পালংকুমড়ার লাইনটা ছাড়িয়ে পলাশ পাউডার আলতার লাইনে চলে এল। মেটা ঠোঁট কামড়ায় আর তাকিয়ে থাকে প্রসাধনের দোকানটায়, যেখানে ঝোলে ফোলানো বেলুন, সস্তা ফিতা, কানফুল ও নাককড়াইয়ের পাতা। ও পাশ ফিরে দাঁড়ানোয় নজরে পড়ে খয়েরি ব্লাউসে বাতাবিলেবুর গড়নের স্তন। লাইন টপকে পলাস মাছমাংসের ওখানে চলে যেতে একজন দোকানির পিঠে পা লেগে যায়। লোকটা ফচকে চ্যাংড়ার বেআক্কেলপনায় গালিগালাজ করে মাছের চোঁচা তুলে তাচ্ছিল্যভরে

ফেলে দেয়। এগুলো পলাশের আর লক্ষ্য হয় না—ও যেন নিশিপাওয়া হয়ে বালি-কাদার গাঙ ভাঙে। ডোঙার খলুইতে তাজা জিওল—কই, শোল; ডোঙার খাঁচায় গোরা পায়রা, কালো ঘটে ঘরে দোয়ানো দুধ, মাটিতে রাখা ছ-সাতটা ডিম আর কলাপাতায় নড়তে থাকা কালী-কাউঠার কলিজা ও একটু তফাতে শুয়ারের লাল থলথলা মাংস। ও জায়গাটার জটলা, ক্রেতাদের ভিড় পেরুতেই পলাশ একেবারে বোকাল্যালা বনে যায়—মেটা উধাও।

হাটের প্রান্তে যেখানে একপোছ ঝুড়ি জঙ্গলা ও আখরোটের মতো শিমুল ফলভরা বৃহৎ বৃক্ষ—চৈত্র মাসে ওড়া তুলা পড়ে ও মাঠ যেন সম্বরের চামড়ার মতো পড়ে থাকে—সেখানে জমেছে হাড়িয়ার আড্ডা। বড় বড় এনামেলের ডেক ও মাটিয়া হাড়ি ঘিরে দুচারজন চাতক চাষা ও বাগানের লেবরদের দঙ্গল। জেনানা হাড়িওয়ালি। খড়িমাস ওঠা পা ছড়িয়ে, গায়ের কাপড় মাটিতে ফেলে দিয়ে, রগড় রঙে মাতা ন্যাংটা বুড়ি। দুধে বাচ্চা লাগিয়ে পানিয়াল পাকা আউরৎ—চায়ের মতো তারিয়ে তারিয়ে হাড়িয়া খায়; অড়-বড়িয়া বুড়া আর আক্রমক বাঘের মতো দুই কালো ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মরদ পেতলের জামবাটি মুখে উপুড় করে দিয়ে যেন গ্রহণছাও। পলাশের মেজাজ বিগড়ে ছিল। তার উপর সবজান্তা কে যেন উল্লুকের মতো হাসে। ও যেন জানত এরকম হবে। আর সে হাসিটার অর্থ হল—হাবা ভাড়ুয়া। হনহন করে পলাশ তখন ট্যাঙ্গালো শিমুল তলায় যায়। ফস করে টাকা বের করে ও এক ভাঁড় হাড়িয়া কেনে। মাটিপোঁতা পান্তাজলের পচাই কয়েক পোয়া মেরে দেওয়ায় পলাশের মাথাটা কিঞ্চিৎ টলতে থাকে ও পেচ্ছাব পায়। জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পলাশ পেচ্ছাব করে আর পেচ্ছাব হয়ে যেতেই থাকে। সেই সঙ্গে সুপার হিট ছায়াছবি 'অমানুষের'…'কারণ সুধা/ মেটায় জ্বালা মেটায় ক্ষুধা / তোমরা হলে সাধু'…গানটাও হালখাতার ঘসা রেকর্ডের মতো পলাশের গলায় হয়ে হয়ে যায়। …'মনে হয় স্বর্গে আছি…। হুক্কু!' ওর মাথার উপর দিয়ে চামচিকার মতো কালচে বড় প্রজাপতি ওড়ে। অঞ্জনা বা মদেশিয়া মেটার কথা ততক্ষণে ওর আর মনেই থাকে না। ও দেখে বাঁশঝাড়, ওলট কম্বলের ঝুড়ি জংলার ওপাশে, পড়ো দহলায়, স্বর্ণলতা জড়ানো কুল গাছটার নীচে জুয়ার বোর্ড পাতা হয়েছে। পানসে পচাইতে মেজাজ তেমন জমে নাই। পলাশ এবার হাবুডুবু পায়ে জুয়ার বোর্ডে যায়।

বামপন্থী জমানা বলেই বোর্ড এত আড়ালে বসানো। নয়তো হাটেই

থাকত। বোর্ডের মালিক, কয়েকজন জুয়াড়ির জটলা আর অন্যান্যরা যথারীতি দর্শক ও ফড়ে। দু-জন মদেশিয়া মোটা খ্যাপ্ জিতে চলে গেল। পলাশও অমনি লাল পানের ঘরে নোট লাগালো। মালিক হাত বাড়িয়ে আলাও-এ বসানো কাঁটাওয়ালা বোর্ড এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিতেই ঘুরতে ঘুরতে কাঁটা গিয়ে লাল পানেই ঠেকে আর তাতে পলাশ ডাবল রুপায়া পায়। সেই টাকা কপালে ঠুকে ও তাতে আরো যোগ করে 'জয় মা প্যাটকাটি' বলে ঝাণ্ডিতে ও রুহিতনে ভাগাভাগি করে এবার ও ধরল। ফের রুহিতনে কাঁটা! —'জিৎ গেলাক ছোড়া! —হ! হ! উকর বহুৎ সাইদ হ্যায়।' ফড়েরা নিজেদের মধ্যে এরকম ভাবে বলাবলি করে আর পাঁচ টাকা লুফে নিয়েই পলাশও যেন ফতো নবাব বনে যায়। ও পকেট থেকে আরো টাকা বের করতে করতে তরপাতে থাকে—'এ দেখো ময় মালিককে আজ নাঙ্গা বানায়েঙ্গে। আরে ইয়ে লাক হ্যায় লাক—ফন্দেবাজকে লাক।' ওতে মালিকের কোনো ভাবান্তর হয় না। তামাক খেতে কাকতারুয়ার মতো লোকটার মুখখানা। পলাশ বিশটাকার দান মুকুটে চালে—'ময়নে ঘুরায়েঙ্গে' বলে বোর্ড নিজেই ঘুরিয়ে দেয় আর উটকো আওয়াজ ছাড়ে—'ওয়াইল্ড হিরোইন!' চাকার গতি ও কাঁটার দিকে দর্শকদের দপদপানো চোখ। পলাশই কেউকেটা। ওতো খেলুড়ে।—'হাইর গেলাক'। হরতনে থেমে যাওয়া কাঁটা। মালিক বোর্ড থেকে টাকাগুলো উঠিয়ে নিতেই পলাশের খেয়াল হয় যে সে হারল। ততক্ষণাৎ কয়জন, ওরাই যেন ওর খেলার পার্টনার, বেশ ক্ষোভে বলে ফেলল—'চুউজ। কেইসা নাদান!'—'আরে ফালনাকো দাইন চালনেকো ঢং তক নহি।' এরকম গায়ে পড়া মন্তব্যে পলাশকে যেন বোলতা কাটে। 'ঘাবড়াও মৎ' বলে ধমকে উঠে তারপর বেশ খোশ মেজাজে উমর আউর হিম্মতের নামে একগাদা টাকা ও ঝাণ্ডিতে দেয়।—'ফিন তুমি হারে গেচো'।—'তা এইলো, মাইলাভ!' ভোট বাক্স উপুর করে দেয়ার মতো করে অবশিষ্ট সব টাকা পয়সাই পলাশ চিড়িয়ায় ঢালল। আর 'চিড়িয়া খতম' ভোঁতা শব্দটা ওর মাথায় গিয়ে ধুমাতীরের মতো লাগল। অন্ধের মতো এ-পকেট ও-পকেট হাতড়িয়ে শেষে হেসে কড়াইভরা রসগোল্লা, পানতোয়ার প্রতি ময়রার যে মনোভাব সে রকমভাবে চলে যেতে যেতে হাত নেড়ে বলে 'ফিন মোলাকাৎ হোগে দোস্ত'।—'হুর। বুর্বাক!' জটলার মধ্যে থেকে কে যেন বলে বসে। তাতে পলাশ আবার দাঁড়াল—'নো নো, ময়না হারল।…বু-বু…তো কা হইলাক? এবার ওর মেরুদণ্ডে যেন খোঁচা

লাগালো। সার্কাসের সিংহবিক্রমে গর্জে উঠতে গিয়ে ও অদ্ভুত ভাবে তারের জোকারের মতো নিজেকে সামলে নিয়ে শেষে পাবলিককে বুঝ দিতে ছেলে-ভুলানিয়া স্বরে জানালো—'আরে ময়তো জিৎলো। হ! হ! তয়তো মন্ত্রী বনলো। উহু, ময়কে হারাই দেলাক্।'—'এই! ফুটানি বাত মইত কর। যা যা ঘর যাইকে লজেন খা।' মালিকের জবর জবাবে মজা পেয়ে লোকগুলো চোতরা পাতা ঘসা খসখসা হাসি হেসে ওঠে। এতে পলাশ ভয়ানক রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলে—'ইয়াস! স্রেফ ঠগি কারবার। বোর্ডমে ভেল্কি হ্যায়। আউর কই মৎ খেলবা।' এই কথা কুড়ালচটা জ্বালানির টুকরার মত ছিট্‌কায়। ফলে হাট ও হাড়িয়া থেকে ছুটে কয়জন রগড় দেখতে আসে।—'শালে, রোয়াব নি ছোরবা। বড়া খিলাড়ি। খেল্‌কা টাইম মে কিয়া নিদাইলাক?'—'তুঝকো ময় দেখাই দেগা!' পলাশ, মস্তান ধনরাজ তামাং-এর মতো, এগোতে থাকে। ওর গায়ে যেন তখন ভাল্লুকের তাগদ। ততক্ষণে যে মদেশিয়াদ্বয় জুয়ায় জিতে চলে গিয়েছিল হঠাৎ কোথা থেকে এসে মালিকের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ জায়গাটায় বেশ ভিড় ও উত্তেজনা হয়। কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর জুয়ার বোর্ড রাখা ও সেই বাক্সে মালিকের অর্ধেক পা। ওদের মুখগুলো যেন এ্যাসিড বাল্ব চার্জে ছাল-চামড়া ঝলসানো। পলাশের, আতঙ্ক নয়, ঘৃণা হয়—গুয়ের পোকা। আত্ম-ধিক্কারও জাগে এই জন্য যে সে কিনা ধান বেচা টাকা বোর্ডে হারল। ফের-'যাক্ ঝামেলা চুকে গেছে, বাড়িতে যাওয়া দরকার' মনে হতে মাঝরাতে ইয়ারদোস্তদের কাছ থেকে যেমন করে হাওলাত চায় তেমনি ভাবে মালিকের কাছে হাত পেতে পলাশ পাঁচটা টাকা চাইল।—'কাঁহে'? মালিক নোংরা হলদে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। আর পলাশ যেন রাতে ঘুমভাঙা জড়তায়, যেন খোকামো করে, বলে—'আমি বাড়ি যাব'। 'হ! রূপায়া তেরা বাপ্‌কা।' এই চাছাছোলা উত্তর হাট, হাড়িয়া ও বোর্ডের জমায়েতে অজানা লাফিং গ্যাসের মতো গিয়ে পড়ে। অমনি কি যেন হয়ে যায়—'তেরা রূপায়ামে ময় মুতি'। ক্ষ্যাপা পলাশ বোর্ডে লাথি লাগায়। জুয়ার বোর্ড উল্টে পড়ে। বোর্ডের নীচে, বাক্সের মধ্যে যেন সাইকেলের ব্রেকের মত কী কারসাজি।—'পাকড়ো'! হুংকার ও মারের চোটে নেশা ঘুচে পলাশ দেখে প্রতিপক্ষ পাঁচজন, আর ওদের হাতে ড্যাগার ও লোহার ডাণ্ড। ঐ সশস্ত্র মদেশিয়া মুখকটায় যেন তখন আমবাড়ি অঞ্চলের শিকার-করা নাচের বাঁশ চাঁছা মুখোশ। পলাশের পা, ছোটবেলাকার দুঃস্বপ্নের মধ্যে লামাঝামা :া:খ

কাঠের মতো; জড় বা পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে যেতে থাকে।—'আরে তয় ভাইগ যা'। হাড়িয়াখোর মদেশিয়ারা বা হাটের মদেশিয়া লেবররা নেশার সাহসে বা দলবদ্ধতায় ওকে সতর্ক করে দিতে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ও ধাওয়া খাওয়া কোটরার মতো দৌড়ায়।

যদি ও জমিতে চলে যেত ঘটনা অন্যরকম হতে পারত। জংলা মাড়িয়ে, আল টপকিয়ে ক্ষেত ভেঙে ও উল্টোদিকে ছোটে। পেছনে পেছনে চোর ডাকাত তাড়া করবার মত হল্লা, হৈ-চৈ। বালাখাত, ঝুড়িবট, কলাঝোপ, খড়ের গাদা, টারিবাড়ির ঘুপচির আড়াল আবডালে অজগ্রাম আর কঙ্কাল হওয়া চা-ঝাড়ের কোণায় ধর্মান্তরিত লেবর, হতদরিদ্র চাষা ও কালা সাহেবদের এক গির্জা। চুনকাম করা গির্জার গড়ানো লাল চাল, সাদা ক্রস ও অনড় ঘণ্টা। কাঞ্চনের লতাপাতা পেঁচানো লোহার মেইন ও ঘোরানো সাইড গেট। ভেতরে দুর্বাঘাসের চিকন জমি, কাঁকরের রাস্তা ও নানারকম ফুল ক্যাকটাসের সযত্ন সমারোহ। গির্জার তকতকা বারান্দায় প্রকাণ্ড কালো টেবিলে মদেশিয়া পাদ্রি কি যেন লেখাপড়ার কাজ করছিল। এ পাদ্রিকে প্রত্যহ গ্রাম বাগানের যত্রতত্র দেখা যায়। বারান্দার শেষে উপাসনার হল ঘর। পলাশ ছুটে হল ঘরে ঢুকে পড়ল। পাদ্রির কান খাড়া হয়ে ওঠে। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে ইতিউতি তাকাতাকি করে হলে এসে দেখল দেওয়ালের কাছে জড়সড় হয়ে এক অবৈধ আগন্তুক। ও এত হাঁফাচ্ছিল যে হৃৎপিণ্ডটা যেন বুক ফেটে মাটিতে খসে পড়বে। পাদ্রিকে দেখে পলাশ চমকে ওঠে আর ওর হাতের পাতা দুটো যেন জংলা আঠায় জোড়া লেগে যায়।—'কি হলো ভাই? এখানে তুমি প্রবেশ করেছ কেন?' পাদ্রির গলায় অশ্রুতপূর্ব শোভনতা ছিল। পলাশ দম নেয় ও আর্তস্বরে বলে—'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ফাদার। আমাকে ওরা মারবে।' —'কেন'? পলাশ মাথা নত করে থাকে। —'বলো, ডোণ্ট ওরি, বলো।' —'আমি জুয়া খেলে হেরে গিয়ে ওদের চোট্টা বোর্ড ভেঙে দিলাম। আমি দোষী ফাদার। আমি পাপী!' এই অকপট স্বীকারোক্তিতে পাদ্রি প্রসন্ন হয় ও বলে—'কোনও ভয় নাই। ডোণ্ট ওরি। এ্যাজ ইউ কনফেসড্ দ্য সিন অব্ ইয়োর সোল, ইউ আর সেভড্।' —'ওরা আমাকে তাড়া করেছে ফাদার। ওরা যদি এসে পড়ে?' পলাশ উপসনার হলের বাতাসেই কান পাতে ও শিউরে ওঠে।—'না না কোথাও কেউ নাই। তুমি বৃথা ভয় পাও। আর ওরা আসিলে দরজায় তালা ঝুলিবে। আর ওরাও বুঝিবে যে এখানে

কেহ নাই'। এবং আমিও মিথ্যাই বলিব।' পাদ্রি অহংকারে আঙুলগুলো দক্ষ বাদকের মত নাড়ে। তারপর আবার বলে—'তুমিই সাহস করে ঢুকে গেছ। লেকিন উহারা গির্জায় আসবার কোন কারেজ করে না। পাদ্রি হাসে। বসন্তের ক্ষতে নিমডালের বাতাসের মতো সে হাসিতে পলাশের বুকখানা উথলে ওঠে আর ও সম্মোহিতের মতো বলে যেতে থাকে—'আমি ভদ্র পরিবারের ছেলে ফাদার। তবে হ্যাঁ, আমি লম্পট, থান ব্যাচা টাকায় মদ খেলাম, জুয়া খেললাম। আমিই সিনার ফাদার। আমায় উদ্ধার করুন।' —'আমিও তো নেহাৎ গডের চাকর আছি। রাদার ইউ প্রে টু জেসাস। কারণ জানিবে তিনি তোমার শত্রু এমন কি তাঁহার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেন।' পলাশ কেঁদে ফেলে। পাদ্রি ক্রশ আঁকে ও ওকে কাঁদতে দেয়। উপাসনা ঘরের পাতলা অন্ধকারে আইকনের দিকে পিঠ ভেঙে ও কাঁদতে থাকে—উনিশ বছরের ঠাণ্ডা কান্না।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে পাদ্রি মোম হাতে হলে ঢোকে। যথারীতি আইকনের মোমগুলো জ্বালিয়ে দেয়। হাঁটু ভেঙে বসে প্রার্থনা করে ও ক্রশ কাটে। তারপর ঘুমকাতর পলাশকে আস্তে আস্তে ডেকে তোলে এবং দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির মতো বিভিন্ন গলায় বলে—'চার্চ এখোন বন্ধ হয়ে যাবে। আমিও এখোন পীড়িতের চিকিৎসায় যাব। তুমিও আপন গৃহে যাও।' প্রথমে পলাশের মেজাজ চটে গিয়েছিল, তারপর কৃতজ্ঞতায় ওর গলা জড়িয়ে এল। ও জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় আপনার ঘর ফাদার?' —'চায়ে বাগানে। আমার মাতাপিতা লেবর আর আমি পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে পড়লাম আর খ্রীষ্টান হলাম।' খ্রীষ্টান হলাম কথাটায় পলাশের কেন যেন খারাপ লাগলেও ও কেবল ছলছলানো চোখে বলতে পারল—'যাই ফাদার।' পাদ্রি সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখল আর অভ্যস্ত উদাসীনতায় জানাল—পিতাই পরিত্রাতা। ঈশ্বর আমাদের পিতা। লভ দাই নেইবার এ্যাণ্ড ইয়োর মাদার। এরপর মোমের আলোয় পাদ্রী-পলাশকে গীর্জার গেট অবধি এগিয়ে দেয়। মেঠো বাতাস, রাত, আলথাল্লা ও আলোছায়ার ভাঙাগড়া। গীর্জাটা যেন ছায়ার নাও। পাদ্রী হাত নেড়ে বলল—গড মে ব্লেস ইউ। আমেন।

চাঁদ উঠছে। ভাঙা নীলাভ চাঁদ। এ আবছা আলোয় ওর আর কোনও ভয় করে না। ও ল্যাটারাল রোড ধরে চলতে থাকে। চড়কগঞ্জের হাট দিয়ে তাকে আর যেতে হবে না। ওদিকটা আজ এড়ানোই উচিত। মদেশিয়াদের গোঁয়ার রাগ নাকি সহজে পড়ে না। প্রথমটায় পলাশ আগে

পেছনে দেখে নিয়েছে। দু-একজন হাট-ফেরত চাষা আর কচিৎ কোথাও সর্বস্বান্ত মাতাল ছাড়া কেউ ছিল না। এই রাস্তা একটু পরেই পৌঁছে দেয় ন্যাশনাল হাইওয়েতে। ও বুক ভরে বাতাস টেনে নেয়—তরতাজা বাতাস। সয়েটারেও ওর ঠাণ্ডা লাগে। বসন্ত আসবে। ইতস্তত খড়ুয়া ঘরে নিকটতম নক্ষত্রের মতো আলোর খণ্ড ও কালচে গাছগাছলা আর তার উপরিস্তরে আলতো জ্যোৎস্না ও মিহি কুয়াশার অলৌকিকতা। সারারাত হাঁটা যায়।

অসময় রাতে, ধাইপাড়া বাস স্টপেজে বাস বা ট্রাকের জন্য পলাশ এসে দাঁড়ায়। পেছনে পরিত্যক্ত পেট্রোল পাম্প ও মাটিয়া রাস্তা। ওরা ঐ চোরা রাস্তায় এসে বার্মাশেলের কাঁচভাঙা শো রুমের আড়ালে ওঁতপেতেই বসেছিল। পাম্প ও স্টপেজের ব্যবধান যেন বুকে হেঁটে এসে আততায়ীরা ওর মাথায় রড মারে। কোঁত শব্দ করে ও মাথাভেঙে রোডের উপর পড়ে যায়। কাক ভোরে—নাড়া ধানক্ষেতে—পলাশকে পাওয়া গেল।

এ অপঘাত জুয়ার বোর্ড উল্টে দেবার জন্য। এবং পরিণতিতে, আরো সন্দেহাতীত হল যে ও উচ্ছন্নে গিয়েছিল। এমনকি রক্তের লোকেরাও তেমন থানা পলিশ করবার সাহস করে না। তেরাত পর শ্রাদ্ধ ও ১৯৭৯।

'কাবেরী নদী তীরে'

The Remembered Village M. N. Srinivas, Oxford University Press, 1976

এম. এন. শ্রীনিবাস বইটির প্রারম্ভেই দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—তার একটিতে সমগ্র সমাজের জীবনকে ধরতে গেলে নৃতাত্ত্বিককে ঔপন্যাসিকও হতে হয়, বলা আছে, আর-একটিতে লেভি স্ত্রাস বলেছেন, সামাজিক ঘটনা সমগ্র, এই কথার অর্থ, পর্যবেক্ষক, পর্যবেক্ষণেরই অংশ অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর বিচ্ছিন্নতা নয়, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংঘাত নৃতত্ত্বের ফিল্ড-স্টাডিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শ্রীনিবাসের চমৎকার বইটি নিঃসন্দেহেই দুটি উক্তির যথার্থ প্রমাণ করে। যদিও যে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন বহুজাতি বিশিষ্ট গ্রামকেই বিষয় করতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তিনি সমাজ-নৃতত্ত্বকে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অংশ হিসাবেই দেখেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের উল্লেখ করছি, আরও এই কারণে যে, ১৯৪৫-৪৬-এ অক্সফোর্ডে শ্রীনিবাস যখন গবেষক-ছাত্র, তখনও র‍্যাডাক্লিফ-ব্রাউন অক্সফোর্ডে, অবশ্য এটিই তাঁর শেষ বছর। সেই সময়ই শ্রীনিবাস র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনীয় ফাংশনালিজম (আমেরিকার স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম)-এর অনুবর্তী হন। **Louis Dumont** ও **D. Pocock** সম্পাদিত **Contributors to Indian Sociolgy**-র প্রথম সংখ্যাতে বলা আছে **Srinivas was the first under the influence of Radcliffe Brown, to ponder at Sufficient length the field data he had collected in order to a sociological analysis of the religion of the loocas.** প্রত্যক্ষত, সরাসরি ঘটনা ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের জটিল আন্তঃসম্পর্কের আলোয় দেখতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে ১৯২৩-এর র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের বিখ্যাত প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করি যেখানে তিনি এথনোলজি ও সোস্যাল অ্যানথ্রপলজির পার্থক্য করেন—প্রথমটি ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, কিছু ঘটনা ঘটেছিল এটিই শুধু জানাব, আর দ্বিতীয়টি তার আরোহী সামান্যীকরণে বলে ঘটনা কেমন করে ও

কেন ঘটে। সমাজ-নৃতত্ত্ব, আরোহী বিজ্ঞান হিসাবে তথ্যের ওপর অবশ্যই একান্তভাবে নির্ভর করবে—তার সঙ্গে এই বিষয়ে প্রামাণিক পর্যবেক্ষণ থাকবে। মজার বিষয়, মুখবন্ধলেখক সল ট্যাক্সসহ অনেক সমালোচকই শ্রীনিবাসের বইটিকে এথনোগ্রাফিই বলেছেন—সেকি পঞ্চাশ-দশকের শেষের দিকে আমেরিকার 'নব্য এথনোগ্রাফি' আন্দোলনের বাষ্পছায়ায় ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিগত কঠোর যথাযথতা ও সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা যার নতুনত্ব ছিল? লেভি স্ত্রাসের সমান্তরালেই আমেরিকায় এই মতালম্বীরা নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মানুষের মানসজীবন ও তাদের শ্রেণীবদ্ধ কার্যাবলিকে নির্দিষ্ট করেন। সল ট্যাক্স বইটির প্রশংসায় বলেন: অতীতের তাৎপর্যপূর্ণ অনুপুঙ্খগুলিকে বাইরে আসার মানবমনের অসাধারণ ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল অধ্যাপক শ্রীনিবাসের এই গ্রন্থটি একটি প্রধান এথনোগ্রাফিক প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতি মৌলিক উপাত্তর সমুদ্রে গভীরভাবে বিজড়িত সুতো ও উদ্দেশ্যমূলক অন্বেষণের জ্ঞান থেকে গাঁথা হয়েছে—একটি গ্রামের নিজের দিক থেকে বর্ণনা দেবার পরই। এই প্রতিকৃতির সাফল্য দেখায় না যে, আমাদের সব ফিল্ডনোট ধ্বংস করা উচিত, তবে বোঝায়, ফিল্ড-নোটদেরও আমাদের শিল্প ধ্বংস করতে দেওয়া উচিত নয়। শেষের বাক্যটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ১৯৭০এর ২৪শে এপ্রিল শ্রীনিবাসের প্রণালীবদ্ধ সব নোটই ষ্ট্যানফোর্ডের সেণ্টার ফর অ্যাডভানসড স্টাডি ইন দি বিহেভি-আরাল সায়ান্সেস-এ ভস্মীভূত হয়। এ ঘটনা না ঘটলে তিনি রামপুরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে একটি বই লেখার চিন্তা করতেন না। সেই কারণে এই বইটির জন্মগ্রহণে অগ্নিসংযোগকারীদের যে ভূমিকা, তার স্বীকৃতিও শ্রীনিবাস দিয়েছেন। সল ট্যাক্স্-এর মন্তব্যটি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই করা।

শ্রীনিবাসের স্মৃতিতে বিধৃত গ্রামটির বর্ণনায় স্ট্রাকচার বা অবয়ব ও সংযুতির বোধ সর্বদাই ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে লেভি স্ত্রাসকে লেখা র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের একটি চিঠি মনে পড়ে, আপনার কাছে, 'সামাজিক অবয়বে'র বাস্তবতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এর সম্পর্ক কেবল নির্মিত মডেল বা আদরার সঙ্গে। আমার কাছে সামাজিক অবয়ব ও সংযুতি একটি বাস্তব ব্যাপার। সমুদ্রোপকূলে একটি বিশেষ ধরনের সি-শেল যখন কুড়াই, তখন তার একটা বিশেষ অবয়ব লক্ষ্য করি। একই হাতের আরও সি-শেলের একই অবয়ব দেখলে বলতে পারি, এ হাতের শেলের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি

অবয়বের রূপ আছে। শ্রীনিবাসও, অন্তত এই বইটি পড়ে মনে হয়, এই অবয়বগত ধারণার অনুবর্তী। নচেৎ তিনি কোন আদরা আগে থেকে তৈরি করেন নি। বর্ণনাত্মক ভঙ্গিই গ্রহণ করেছেন—ঔপন্যাসিকের মতোই এগিয়েছেন, শেষের বিদায়ী অধ্যায়টি তো উৎকৃষ্ট উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের মতো কিংবা তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যে-ছবি তিনি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ধরে আঁকেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এই নৃতাত্ত্বিক শিল্পীও বটে, আর যেহেতু বইটি কেতাবি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, সেহেতু বিষয়ীও মিলে যায় মাঝে মাঝে দ্বান্দ্বিকভাবে, বিষয়ের সঙ্গে।

ভারতবর্ষের গ্রাম নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিকদের রচনার নানা সমস্যা সম্বন্ধে Contributions-এর এই সংখ্যার একটি রিভিয়ু-আর্টিকল এবং এস. সি. দুবের সোস্যাল অ্যানথ্রপলোজি ইন ইণ্ডিয়া (টি. এ. মদন ও গোপাল শরণ সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান অ্যানথ্রপলোজি, ১৯৬২) দ্রষ্টব্য।

শ্রীনিবাসের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কাছে রামপুর গ্রামের নামটি অপরিচিত ঠেকবে না। রামপুরের ওপরই তিনি পৃথক প্রবন্ধ ইতোমধ্যেই লিখেছেন। তার একটির নামকরণও লক্ষনীয়, 'দি সোস্যাল স্ট্রাকচার অব এ মাইশোর ভিলেজ' (পরে স্ট্রাকচারটি সিস্টেম হয়, তবে র‍্যাড্‌ক্লিফ ব্রাউন যাকে স্ট্রাকচারাল ফর্ম বলতেন, তাই কি আজকালের সোস্যাল স্ট্রাকচার নয়)। ১৯৬২-তে প্রকাশিত 'কাস্ট ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া' নামক বইটিতেও রামপুরের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে একাধিকবার এসেছে। ১৯৪৮-এ প্রায় এক বছর ধরে তিনি রামপুরে যে ফিল্ড স্টাডি করেছিলেন, তার কথা ঘুরে ফিরে তিনি জানান, তবে অ্যাকাডেমিক সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক গবেষকের মতো। কিন্তু আলোচ্য বইটি মানবিক উত্তাপে ভরা, স্মৃতির স্রোতস্বিনীতে ধুয়ে মুছে গেছে নৃতাত্ত্বিকের কেবলমাত্র বিষয়গত ঝোঁকের আড়ষ্টতা। রামপুর শুধু নয়, শ্রীনিবাসও এই বইয়ের বিষয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে, যেমন লেয়াঙ বা এরিকসনের রচনায়, দেখা যায় মনস্তত্ত্ববিদও কেমন একাত্ম হন তাঁদের কেসের সঙ্গে, তাঁরও সীমাবদ্ধতার কথা ভাবতে হয়—প্রক্রিয়াটি একমুখী নয়, উভয়মুখী, দ্বান্দ্বিকও বটে। শ্রীনিবাসও প্রমাণ করেছেন, নৃতাত্ত্বিকও তার বিষয়ের বাইরের পর্যবেক্ষক নন, বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন দেহ ও মনের সাক্ষাৎ নয়—তিনি তারই তখন অংশ, এমন কি বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আবার নিজের, বিষয়ীর সীমাবদ্ধতা, বিশেষ প্রবণতাও বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। শহরের উচ্চশিক্ষিত,

অক্সফোর্ড ফেরৎ শ্রীনিবাস ১৯৪৮-এর মহীশূরের একটি গ্রামে যখন গেলেন তখন তাঁর জীবনাচরণ, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি এ-সবই গ্রাম-জীবনের বিপরীত। এই সব বাধা পেরিয়ে তাঁর অগ্রসর হওয়ায় যেমন সাফল্য দেখা যায়, ব্যর্থতাও তেমনি আছে। যেমন রক্তপাত শ্রীনিবাস দেখতে পারতেন না, ফলে কোনো বলিদানই তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। এ সম্পর্কে তিনি সচেতন বলেই জানেন কোনো কোনো গ্রামীণ সাব-কালচার তিনি বুঝতে পারেন না। আরও বলেন, গ্রামবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা 'জলচল'-দের সঙ্গে সংস্পর্শ থেকেই হয়েছে। হরিজন ও মুসলমানদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শ্রীনিবাস বলেছেন,

> **My shortcomings as a field-worker are brought home to me poignantly, when I contemplate the Harijans and Muslims. I realize only too clearly that mine was a high caste view of village Society. I stayed in a high caste area, and my friends and companions were all Peasants or lingayats.**

নিজ অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে এই সচেতনাই বইটিকে অন্যমূল্য দিয়েছে। নাগরিক মানুষটি তাই গ্রামের বিশেষ গন্ধটিও নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। চমৎকার লেখেন শ্রীনিবাস, গ্রামে একটি স্পষ্ট স্বতন্ত্র ঘ্রাণজ জগৎ জেগে ছিল। কিছু গন্ধ সুখকর, যেমন গোলাজাত ধানের, জোয়ারের, খড়ের বা প্রথম বৃষ্টির পর মাটির। এর সঙ্গে থাকে গোয়ালের। গ্রামে গন্ধের হাত থেকে মুক্তি নেই। গ্রামে যে-ব্যক্তি মানুষ হয়েছে তার কাছে শহরের মধ্যবিত্ত বাড়ির ঘ্রাণগত অনুভূতি বিপরীত জগতে থাকে—শ্রীনিবাস যেমন রামপুরে ছিলেন বিপরীত জগতে। প্রথম প্রথম গোমূত্র ও গোবরের গন্ধে অবসিত হয়েছিলেন তাঁর Bullock House-এর আস্তানায়, পরে অভ্যস্ত হয়ে যান। অথচ শেষ পর্যন্ত তিনি যে গ্রামের পরম প্রীতিভাজন হয়েও গ্রাম সম্পর্কে গ্রামবাসীদের অপেক্ষা বেশি ওয়াকিবহাল হয়েও আরবানটেনান্ট-ই থেকে গেলেন, সেটিও স্পষ্ট ধরে রেখেছেন। তাই তথ্য সংগ্রহে অপরকে বিব্রত করতে চান নি, আবার অপরের ব্যাপারে নাক গলাতেও চান নি—যদিও জানতেন এ সবই তাঁর অসম্পূর্ণতা। শুধু তাই নয়, নিজের আচরণ যে মাঝে মাঝেই চতুর, কপট হচ্ছে, অকপট হচ্ছে না—সে কথাও বলতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। আসলে বইটিতে আমরা পাই বিশুদ্ধ নাগরিক রুচিসম্পন্ন

এক ব্যক্তির ভারতবর্ষের এক গ্রামের মুখোমুখি হওয়া—গাছের তলায় প্রাতঃকৃত্য করার অস্বস্তি, তাঁর দাড়ি কামানো নিয়ে গ্রামবাসীর কৌতূহল, তিনি কেন নগ্ন হয়ে স্নান করেন ইত্যাদি প্রশ্ন, এখনও কেন বিবাহ করছেন না এসব জিজ্ঞাসা, আস্তে আস্তে তাঁকে পরিচিত করেছে গ্রামের জীবনের সঙ্গে, তার অবয়বের সঙ্গে। আর শেষ অধ্যায়ে শ্রীনিবাস বলেছেন,

> আমার গ্রামের বন্ধুদের যথার্থই অনুরক্ত ছিলাম আমি। রামপুরে থাকার সম্পূর্ণ সময়ে, কোনো সময়ই বৌদ্ধিক সাহচর্যের প্রয়োজন আমার হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। (জানি, এটি আমার নিজের সম্পর্কেও মন্তব্য)। আমার বন্ধুরা ঘটনা ও নানা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও সরস আলোচনা করতে পারত, যার জন্য তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা জাগে।

ব্রাহ্মণ নৃতাত্ত্বিকটি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের আচরণ না করেও, এই যে মানবিক সম্পর্ক রচনা করতে পেরেছিলেন, এখানেই তাঁর সাফল্য।

রামপুর গ্রামের জগৎকে শ্রীনিবাস বলেছেন, কৃষির বিশ্ব। কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামের জীবন আবর্তিত—উৎসব, সুখ, দুঃখ, আনন্দ এমনকি পারস্পরিক সম্পর্কও এই কৃষি থেকে জাত। জীবনের পরিপ্রেক্ষিতও নির্মিত হয় কৃষিকে কেন্দ্র করে। কর্মকারের ছুতোর ও কামার, দুয়েরই কাজ করে। গ্রামবাসী তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বলে, কৃষিকার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। খাদ্যের প্রাথমিক প্রয়োজন থেকেই কৃষিকর্মের প্রয়োজন আসে। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা তারা স্বীকারই করে না। কারণ তারা যখন দ্বিপ্রহরের নির্মম উত্তাপে, জুতো ছাড়া, মাথায় কোনো আচ্ছাদন ছাড়া মাঠে কাজ করে তখন কর্মচারীটি মাথায় বৈদ্যুতিক পাখা খুলে তার চেয়ারে বসে। বেয়ারা এসে বোতাম টিপলেই ফাইল নিয়ে যাচ্ছে, কফি দিয়ে যাচ্ছে। মাথার কাজের এবম্বিধ দৃষ্টান্ত তাদের কাছে মূল্যহীন। শ্রীনিবাস চমৎকার বলেন, তলস্তয় না পড়েও এই গ্রামবাসীরা যেন তলস্তয়ান। চাষবাসই ঠিক করে দেয়, অধিকাংশ গ্রামবাসী বছরের বিভিন্ন অংশ কি ভাবে কাটাবে। কৃষিকার্য কেবল জীবনধারণের উপায় নয়, একটি জীবনচর্যাও—যত অনিশ্চিত কঠোর শ্রমনির্ভর কাজই হোক না কেন, এই কৃষিকর্ম অনিবার্য একমাত্র কর্ম, অধিকাংশের কাছে। শহরবাসীরা তাদের কাছে দরিদ্র গ্রামবাসীর শ্রমের উপর নির্ভরশীল পরশ্রমজীবী, পরগাছা—শহরের বড় বড় রাস্তা ঘাট, বাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, অন্যান্য সুযোগ

সুবিধা সবই গরিব কৃষিজীবীদের শ্রমেরই ফল। এই শ্রমের কেন্দ্র জমি—এই জমি গ্রামবাসীদের সর্বক্ষণ চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ শ্রীনিবাসের মনে হয়, এরা জমি নিয়ে বুঝি obsessed। জমির মালিকানা কেবল ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে আসে না, অন্য গ্রামবাসীর ওপর প্রভাব বিস্তারও এর ফলেই সম্ভব হয়। সেই কারণেই জমি নিয়ে বিবাদ, মারামারি, এমনকি খুনও। ভূমি-নির্ভর এই জীবনদৃষ্টিই তাদের করে তোলে সঞ্চয়ী, মিতব্যয়ী, যদিও বিভিন্ন উৎসবে খরচ করা মর্যাদার সূচক। মহীশূর শহর গ্রামবাসীদের কাছে লোভের জায়গা, নির্দোষ সরল গ্রামবাসীদের নষ্ট হবার জায়গা বলেই গ্রামবাসীরা মনে করে। মহীশূরের মানুষ শ্রীনিবাস এ সিদ্ধান্তে চমকিতই হন, কারণ তাঁর কাছে মহীশূর ঘুমন্ত শহর, সেখানকার অধিবাসীরা উদ্যোগ-হীনতা ও গতিহীনতার জন্য কুখ্যাত। এই লোভের সঙ্গে আর একটি লোভ যুক্ত হয়েছে: আইন-আদালত ও মামলার। এ সবই গ্রামবাসীকে ভূমিহীন করার উপায়। আর যেখানে চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই একটি ছেলে পূর্ণ কৃষিকর্মী হয়ে ওঠে, যে জগৎ ভূমিকেন্দ্রিক সেখানে ভূমিহীন হওয়া সামগ্রিকভাবে সর্বনাশ, কেন্দ্রচ্যুত হওয়া। এই জমি চাষের সঙ্গে যুক্ত বলেই জল, বলদ, বৃক্ষ এ-সবও এ জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বৃষ্টি গ্রামের জীবনে শুধু বর্ষা নয়, এর ভূমিকা গভীর। এর চালচলন, শব্দ সবই সেখানে অন্য অর্থবহ, যা শহরের মানুষের বোধের অগম্য।

বহিঃপরিবেশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্কে মধ্যস্থতা করে ভূমি, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে জাতি-বর্ণ। ভারতীয় সমাজনৃতত্ত্বে notion of dominance, শ্রীনিবাসই প্রথম ব্যবহার করেন বোধহয়। কাস্টের ক্ষেত্রে dominant easte-এর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে কথা শ্রীনিবাস আগেও বলেছেন, সে কথাই এখনও বললেন, সর্ব-ভারতীয় বর্ণ নয়, স্থানীয় জাতিই এখানে মূল কথা। ১৯৫২-য় শ্রীনিবাস আবার যখন রামপুরে যান, তখন তাঁর সঙ্গে এক ছাত্র যায়। গ্রামবাসীরা ছাত্রটির জাত জানতে চাইলে তিনি বলেন সে বেনিয়া, গুজরাটের বণিক জাত। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, কারণ, স্থানীয় ব্যবসায়ী জাতের নাম আলাদা, পোশাক-আসাক আলাদা। এই ছাত্রটি লম্বা কুর্তা ও শাদা পায়জামা পরেছিল—সাধারণত রামপুরের অধিবাসীরা মুসলমানদেরই এই পোশাকে দেখে। অর্থাৎ ছাত্রটির গুজরাটি ভাষা ও পোশাক, রামপুরের অধিবাসীদের কাছে বণিক জাতের মনে হয় নি। শ্রীনিবাসকেও তারা ব্রাহ্মণ ও ভূস্বামী হিসাবেই

দেখেছিল। তাঁর আচার-আচরণ নিজেদের ব্রাহ্মণজাত সম্পর্কে ধারণার অনুবর্তী করার জন্য তাই বারবার তারা পরামর্শও দেয়। গ্রামে এই জাতি যে সব মানবিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে ও জাতিচ্যুত হওয়া যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, এ সত্য শ্রীনিবাস বিস্তারিত ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখিয়েছেন, এর ব্যতিক্রমই আছে কেবল তাই নয়, বাস্তব প্রয়োজনে জাতির বিধানও লঙ্ঘিত হয়। যে শুদ্ধতা ও স্পর্শদোষ জাতি ব্যবস্থার বড় কথা, তাও ক্যানালের লক গেটের চাবি খুলতে গিয়ে মানা হয় না। আবার একটি জাতের স্তর সম্পর্কেও মতবিরোধ থাকে—বিবাহে রামপুরের চাষীদের কাছে নাপিত অপরিহার্য, কিন্তু অন্য নাপিত বিবাহে এলে স্পর্শদোষ ঘটে যাবে। তাছাড়া জমির মালিকানাও জাতিস্তরের ক্ষেত্রে হেরফের ঘটায়—হরিজনদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। হরিজনরা অবশ্য গ্রামের অপরিহার্য কাজ করে। কিন্তু অস্পৃশ্য হিসাবেই পরিগণিত হয়। আবার মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীনিবাস বলেন, বন্ধুত্ব কেবল ভিন্নজাতের মধ্যে তাই নয়, ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও হয়। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক ১৯৪৮-এর রামপুরে ঘনিষ্ঠ ছিল। মুসলমান সংস্কৃতির কয়েকটি দিকের প্রশংসা শ্রীনিবাসের বন্ধুরা করেছিলেন, তবে মুসলমানদের 'অপবিত্র' সম্পর্কে উদাসীনতার নিন্দা তারা করেন। শ্রীনিবাস নবম অধ্যায়ে 'দি কোয়ালিটি অব সোস্যাল রিলেশনস'-এর কথা বলেন। গ্রামীণ সমাজজীবনের মূল ভিত্তি রেসিপ্রসিটি বা ব্যতিহার। লেভিস্ত্রাস বলেছেন, কিনশিপ ব্যবস্থা বোঝার মূল চাবিকাঠি এই ব্যতিহারের নীতি। কারণ এ ব্যবস্থা বিবাহের মাধ্যমে নারীর বিনিময়কে সংগঠিত করার পদ্ধতি। শ্রীনিবাস অবশ্য এই নীতির উপস্থিত বৃহত্তর আরও অনেক আদান-প্রদানেই দেখেন। হায়ারার্কিও সম্পর্ক নির্ধারণে একটি বড় নিয়ন্ত্রক। জাতি ও ভূমির মালিক শুধু উচ্চস্তরের নয়, পুরুষও নারীর থেকে উচ্চস্তরের বয়স্ক যুবকদের তুলনাতেও তাই। মুখরক্ষা হওয়া, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, খোশগল্প, ঈর্ষা এ সবই সামাজিক সম্পর্কের নানাদিক। পোশাক কিভাবে প্রতীকী হয়ে ওঠে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীনিবাস দেখান, কি দ্রুততার সঙ্গে খাদি আত্মোৎসর্গও স্বদেশপ্রেমের সূচক থেকে দুর্নীতির চিহ্নে পরিচিত হয়েছে। গ্রামবাসীর রসবোধের কথা শ্রীনিবাস বার বার বলেছেন।

ধর্মের অধ্যায়ে শ্রীনিবাস স্পষ্টই বলেছেন, প্রায় দেড়শ বছর ধরে বিদেশীরা ভারতবর্ষের লোকধর্মের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ফলে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রাও এই সূত্রেই ধর্মের সেই দিকটার ওপরই গুরুত্ব

দিয়েছে, যেটুকু বিদেশীদের কাছে গ্রহণীয়। ফলে লোকধর্মকে উপেক্ষা করা হয়েছে, আড়াল করা হয়েছে। তদুপরি শিক্ষিত ভারতীয়রা অধিকাংশই উচ্চ জাতিবর্ণ থেকে এসেছে—তারা নিম্নবর্ণের পশুবলি, দেশী মদ্যপান, নিষ্ঠুর রীতিনীতিকে অনুধাবনের চেষ্টা করে নি, কেবল নিন্দা করেছে। জাতীয় অহংকে তৃপ্ত করে এমন দিকের ওপরই তাদের নজর। ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিকরাও যে অ্যাকাডেমিক জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন, তাও লোকধর্মের বিশ্লেষণের অনুকূল নয়। শ্রীনিবাস তাঁর রামপুরের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অনেক সময়ই গ্রামের ধর্মবোধকে ভুল বোঝা হয়েছে। তাদের নিয়তিবাদ যতটা বিপদের সময় হা-হুতাশে উপস্থিত থাকে, জীবনাচরণে আদৌ ততটা থাকে না। শুধু তাই নয়, শ্রীনিবাস সুন্দর বলেন,

> **it is clear that villagers viewed there relations with deities in much the same way as they viewed their relations with each other.**

অবশ্য দেবতারা অনেক শক্তিশালী আবার তাঁদের বোঝাও আরও কঠিন। তবে এক দেবতা ব্যর্থ হলে, গ্রামবাসী আর-এক দেবতার কাছে যায়। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব আছে : মড়কের জন্য মারী, গবাদি পশুর জন্য মহেশ্বর, রামচন্দ্র সবকিছুর জন্য। মহেশ্বর বা মারীর মতো তিনি ভীতিপ্রদ নয়। নতুন কাল্ট, দেবতা বা গুরুরও আবির্ভাব ঘটে। গ্রামের মানুষ মন্বন্তর-মারী চিহ্নিতজীবন ধারণে অভ্যস্ত—কর্মবাদ এই জীবনেরই সান্ত্বনা। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, পরজন্মের দুঃখের ভীতি কোনো প্রভাবই বিস্তার করে না তার ওপর, যতটা করে বর্তমানের শাস্তি বা পুরস্কারের সম্ভাবনা। ঈশ্বরকেও তাঁর ভক্তের আনুগত্য পেতে হলে প্রধান শিক্ষক বা রাজনীতিবিদের মতো শাস্তি ও পুরস্কারের একটা বৈধ মিশ্রণ ঘটাতে হয়। সন্ন্যাসী বা সন্তর মতো সাধারণ গ্রামবাসীরা মোক্ষকামী নয়। ম্যাক্স হ্বোবার এদের দেখলে হতাশই হতেন, কারণ তাঁর সটেরিওলজিস্ট বা মোক্ষকামীর নিদর্শন এরা নয়। (অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হনুমনথায়ার সত্যনারায়ণ পূজা দেখে হিন্দুধর্মের পরজগতের ওপর গুরুত্বদানের সটেরিওলজিক্যাল চরিত্রের কথা তাঁর মনে পড়ে, এটা ম্যাক্স হ্বেবারই বলেছেন) শ্রীনিবাস যে ধর্মজগতের কথা বলেন, তা কিন্তু বর্ণহিন্দুর, টাচেব্‌ল্ হিন্দু জাতির। সাড়ে তিনশ পাতারও বেশি এই বইটিতে শ্রীনিবাস এগারটি অধ্যায়ে বিস্তৃত

বর্ণনা দিয়েছেন রামপুরের। বিদেশীদের কাছে এ বর্ণনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে জ্ঞাত ভারতীয়ের কাছে এ-চিত্র পরিচিত। মহীশূরের একটি গ্রামের ছবি বাঙালি পাঠকেরও আপন লাগবে।

তবে শ্রীনিবাস ধর্ম, জাতি ইত্যাদি বিষয়ে যতটা উজ্জ্বল আলোচনা করেন, শ্রেণী-সম্পর্কে এসে ঠিক তেমন অনবধানতার পরিচয় দেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু হওয়ার অসুবিধার কথা বলেন, কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী হওয়ায় নৃতাত্ত্বিক হিসাবে তাঁর কি অসুবিধা হল, এ বিষয়ে কিছু বলেন না। তার কারণ 'শ্রেণী' এই পদ ও বর্গটির গুরুত্ব তিনি মানতে চান না। সেই কারণে গ্রামীণ জীবনের শোষণ ও দ্বন্দ্বর চিত্রটি ধরতে চান না, যদিও 'জিত' ভৃত্যদের দুর্দশার কথা বলেন, হরিজনদের অবস্থারও আভাস দেন। অথচ আন্দ্রে বেতেইদের মতো লেখকদের রচনাবলি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বর্ণ-জাতিপ্রথার সঙ্গে শ্রেণী-চেতনা ও ভারতীয় সমাজের বিচারে প্রাসঙ্গিক ধারণা—আজ থেকে দশ বছরেরও বেশি আগে। 'কাস্টস : ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ'-এর ভূমিকায় এ-কথা তিনি প্রথম জোরের সঙ্গে বলেন। তারপরের রচনাবলিতে আরও বিস্তৃত করেছেন। নিশ্চয়ই বর্ণ-জাতির নিজস্ব এলাকা ভারতীয় সমাজে আছে, যেমন ধর্মের গুরুত্ব তার নিজ জোরেই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ-সবকিছু শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য নয়। আসলে শ্রীনিবাস ইউরো-আমেরিকার প্রচলিত নৃতাত্ত্বিক ধারায় বিশ্বাসী। রামপুরের বিশ্লেষণের মানবিক ও শৈল্পিক প্রতিবেদনেও তিনি এই ধারার বাইরে যেতে পারেন না। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের অবয়ববাদ যে কারণে সমগ্রের পূর্ণ ঐক্যকে স্বীকার করে, সে কারণে নিশ্চয়ই এম্পিরিক্যাল। কিন্তু এই পূর্ণতা কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা তিনি বা তাঁর অনুগামীরা পেতে পারেন না। সমগ্রের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই ধরে নেন। এখানেই প্রয়োজন মার্কসবাদের। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে মার্কসবাদের এখনও বহুলপ্রয়োগ হয় নি। ইংলণ্ডে মেয়ার ফোর্টস ও ম্যাকস গ্লুকম্যান মার্কসীয় চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। পিটার ওরস্লির নামও নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে ফরাসী সামাজিক নৃতাত্ত্বিক Clande Meillassoux-ই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইয়োরোপের নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে বড় হয়েও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে প্রয়োগ করেন আদিম সমাজের ক্ষেত্রে। এই বিশ্ববীক্ষা থেকেই বোঝা যায়, কিনশিপের সম্পর্ক শ্রেণী-সম্পর্ক সরাসরি না হলেও, উভয় সম্পর্কই উৎপাদনের পদ্ধতির economic juridico political ও

ideological পর্যায়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। শ্রেণী সম্পর্কের মতোই কিনশিপ, হায়ারার্কি কৃষি জগৎ বিশ্লেষণের আলোচনায় এই তিনটি স্তরকে পৃথক করে ও সমগ্রে যুক্ত করে আলোচনা করা দরকার। আদিম সমাজের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত সত্য হলে ১৯৪৮-এর রামপুরের ক্ষেত্রে আরও সত্য। তাছাড়া কর্মের মধ্য দিয়ে উৎপাদকরা যে সম্পর্কে আসে তাই উৎপাদন সম্পর্ক—এই সম্পর্ক ও উৎপাদনের শক্তি একটি "বাস্তবতার" দুটি দিক। ভূমিশ্রমের উদ্দেশ্য ও মাধ্যম শ্রমশক্তির বিভাজন গ্রামের সম্প্রদায়কে নানা মর্যাদার কিনশিপ দলে বিভক্ত করে। উৎপাদনের বিভিন্ন এককের নানা 'টাইপ'-এর সঙ্গেও খাপ খাইয়ে নেয়। ব্যক্তিগত মর্যাদাও নির্ধারিত হয় এই উৎপাদন পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায়ে। ধর্ম, চিন্তা, রীতিনীতিও এই সূত্রে আসে। শুধু তাই নয়, উৎপাদন পদ্ধতির বিচারে dominant ও subordinate-এর পৃথকীকরণ প্রয়োজন। এই একাধিক উৎপাদন পদ্ধতি সামগ্রিক ভাবে জুরিডিকো-রাজনৈতিক ও ভাষাদর্শগত উপরি-কাঠামোর মূর্তরূপ গ্রহণের কারণকে স্পষ্ট করে। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনটিকে বুঝতে হলে তার গঠন ও অবয়বের সূত্র যেমন দরকার, তেমনি তার উপাদানসমূহ ও সেগুলি কেমন ভাবে সংগঠিত হয়েছে তাও বোঝা দরকার। এসবের আন্ত-ক্রিয়ার বিশ্লেষণেই স্পষ্ট করে সমগ্রকে। প্রচলিত সামাজিক নৃতত্ত্বে এটা যে করার চেষ্টা হয় না, তা নয়। কিন্তু তা করা হয় reciprocal expression-কে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে, মার্কসীয় অন্বেষায় থাকে উপাদানের reciprocal determination-এর ধারণা। তাই শ্রীনিবাসের চমৎকার বইটি সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। মাঝে মাঝেই মনে হয় বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমাহার, গল্প—শাশুড়ী-বৌ-বাপেরবাড়ি নিয়ে যা লেখেন, তাই তা তুচ্ছ মনে হয়, তুচ্ছ মনে হয় বড়-ছোটর সম্পর্কের বিবরণ। অথচ তা যদি উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি ধরে বিবেচিত হতো, তাহলে এসবের অন্তঃসত্তা ফুটে উঠত।

এ সত্ত্বেও অর্থহীন মনোগ্রাফের ভিড়ে 'দি রিমেমবারড ভিলেজ' সত্যই স্মরণীয় গ্রন্থ: পরিণত নৃতাত্ত্বিকের স্মৃতিনির্ভর এই অভিযান পাঠককে নন্দিত করে, নৃতত্ত্বকে আপন হবার সুযোগ দেয়। অনেকক্ষণই, বইটি শেষ করবার পরও, মনে হয় দূরে উজ্জ্বল কাবেরী নদী কেঁপে কেঁপে বয়ে যাচ্ছে।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের কবিতা

আমার দাহ আমার হাত। খালেদা এদিব চৌধুরী। পাইওনিয়ার পাবলিশার্স ৩৩।১ পটুয়াটুলি ঢাকা। দশ টাকা

বাংলাদেশের একজন মহিলার লেখা এই কাব্যগ্রন্থটি আমাকে বেশ টানা-পোড়েনের মধ্যে ফেলেছে। একদিকে প্রখর যৌনতা, অন্যদিকে তার আওতা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার মরীয়া আবেগ—এই দুই সমান টানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে খালেদা এদিব চৌধুরীর কবিতাগুলি ব্লেডের ফলার মতো কাঁপছে।

বইটিকে এককথায় প্রেম, প্রেমে ব্যর্থতা ও প্রেমহীনতার নিরুপম অথচ নিরুপায় পাণ্ডুলিপি বলা যেতে পারে। কবির স্বভাবই তীব্রতায় নিজেকে প্রকাশ করা। কবিতার পর কবিতায় শরীর উঠে দাঁড়ায় অলজ্জ, পাঠকেব মুখোমুখি। এত কাছে যে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসের আঁচ চোখে মুখে এসে লাগে। এরই সমান্তরাল ভাবে বহে যায় হাহাকারের স্বৈরাচার। একই সঙ্গে আসক্তি ও বেদনা এত প্রকট যে নিজেকে ধরে রাখতে না পারার সমূহ বিনষ্টির ভয়ে পরিবেশ ছমছম করে ওঠে।

বেশ জোরালো, পুরুষালি মেজাজে কলম ধরেছেন খালেদা এদিব চৌধুরী। যথেষ্ট স্মার্ট তাঁর প্রকাশভঙ্গি, তবে আশার কথা তাঁর কবিতার আন্তরিকতা প্রায়ই ঐ স্মার্টনেশকে পরাস্ত করে। সাবলীলতায় লেখেন তিনি—'পরঘাতি, সে কি নিজের কৃপাণে কাটে বুকের কুসুম?' বা 'যখন তোমায় জড়িয়ে ধরি, শিউরে ওঠো, এমন স্বভাব হলে / শ্রমের মূল্য বোঝাই কেমন করে' অথবা 'যুবতীর ভূমগুলে চাটাইয়ের নগ্ন শয্যায়/স্যাঁতসেঁতে গাছের উত্তাপ।'

কবির লেখায় রক্ত-মাংসের এত ভাপ ওঠে যা মর্মান্তিক নশ্বরতায় শেষ হতে বাধ্য। বড় বেশি ইনভলভ্‌ড তিনি, বাইরে চোখ মেলা বা পা ফেলা তাই তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় বস্তুত দুটি মাত্র কবিতায়, যা উৎসর্গীকৃত তাঁর পিতা ও মাতার প্রতি।

গ্রন্থের মূল প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি চমৎকার কবিতা আছে বইটিতে, 'রাতের টেবিলে সাংবাদিক', যাতে আছে এ জাতীয় দক্ষ পঙক্তি "হু হু শব্দে ভেসে আসে রাতের অক্ষরগুলো / বিদেশী প্রিন্টারে বাজে অলৌকিক মেঘমালা / অসম্পন্ন নারীর চোখের ভীত···/ সর্বত্রই কথামালা···ঐ

যাচ্ছে…আসছে / কাটাকুটি প্রুফ সিট, কবিতার পাণ্ডুলিপি / ক্রমাগত বদলে যায় টেবিলের গোলাকার / চক্রবার রঙের উৎসব।'

একটু মৃদু অনুযোগ, কবি মাঝে মাঝে খুব পুরনো শব্দের ব্যবহার করে ফেলেন। ছন্দও হঠাৎ হঠাৎ টাল খায়। আরো একটু মগ্ন হন তিনি—কারণ যে দুঃখী, তার সুখ তো ভেতর দিকেই ঢুকে পড়ে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সময়ের রোদে জলে

শিরীষ গাছের তিরিশ টাকা দাম। নন্দদুলাল আচার্য। বিশ্বজ্ঞান। ৪ টাকা।
রাবণের সিঁড়ি। রবীন সুর। অরণি প্রকাশন। ৫ টাকা।
সময় আসবে। তুলসী মুখোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান। ৫ টাকা।
সময়ের রোদে জলে। শুভাশিস্ গোস্বামী। ভাবনা। ৬ টাকা।
শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। যুবসাহিত্য প্রকাশনী। ১২ টাকা।

'শিরীষ গাছের তিরিশ টাকা দাম' কাব্যগ্রন্থের কবি নন্দদুলাল আচার্য তাঁর কাব্যগ্রন্থে মোটামুটিভাবে প্রেম-প্রকৃতি ও সেই সঙ্গে কখনও বা, সময় সচেতনও। তাঁর উপস্থাপনার রীতি অন্তরঙ্গ ও উচ্চারণরীতি স্বগত। কোনরূপ ভাস্কর্যের দৃঢ় গাঁথুনি ও ঋজুতা তাঁর কাব্যে হয়তো মিলবে না—কিন্তু জীবনানন্দ-গন্ধি ভাষা আমাদের ঠাণ্ডা করে। 'হে আমার অনাবিল নিশ্চিন্দিপুরের মাঠ', 'তবু যায়', 'নিবিড় শ্যামাঙ্গী পাখী' কবিতাগুলি প্রকৃতি-নির্ভর।

একটি কবিতার অংশ উদ্ধার করি—

"নিবিড় শ্যামাঙ্গী পাখী রক্তের প্রশাখা থেকে
ডাক দেয়— আয়—"

তাঁর প্রকৃতির প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা প্রকাশ করছে। তবুও লোকগীতি বা লেনিন-এর মতো কবিতাও লিখেছেন নন্দদুলাল। 'বদলি হইছে কাল' (লোকগীতি) লাইনটি তারই বাঙ্ময় রূপ।

শঙ্খ ঘোষ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব কোথাও কোথাও দেখতে পেলাম।

'রাবণের সিঁড়ি' রবীন সুরের ১৯৬৪-৭৮, এই দীর্ঘ চোদ্দ বছরের কবিতার মূল সুর নসটালজিয়া বা অতীতচারণা, প্রেম, প্রকৃতি অনুরাগ

ও কখনও বা রক্তক্ষরা সময়। বাংলা কাব্যকলার প্রধান তিনটি ছন্দই তাঁর মুঠিতে। তবুও কাব্যের মধ্যে গল্পভঙ্গি ও লৌকিক ভাষার প্রতি তাঁর আনুগত্য নজরে পড়ে। বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোরা গোপ্তা প্রভাব প্রায়শ চোখে পড়বে। ক্লাসিক রীতি নয়, একেবারেই সরল মৌখিক বুলির সরাসরি রূপটির উপর তাঁর কাব্যভাষার প্রতিষ্ঠা। রবীনের নায়িকা, যাকে 'তুমি' সম্বোধন সকল বাংলা কাব্যবিদ করে থাকেন, অর্থাৎ যে কোনো নায়িকাকে, চিরন্তন ঘরোয়া নারী। তাঁর প্রেমে বালসুভগতা কোথাও হয়তো আছে, কিন্তু মেট্রোপলিটান মনও তো বালসুভগতাকে এড়াতে পারে না। 'পা টলে যায় / পা টলে যায়; / পায়ের নিচে / ঘূর্ণি॥' কারই বা মনে নেশা না ধরায়? 'অরণ্যের পাতায় পাতায় / অলৌকিক শব্দের অক্ষর-এর জন্য তাঁর এষা পিপাসার্ত।' 'জুন মাসের বিকেল', 'ফনিমনসা', 'কার্তিকের মাস' কবিতা তাঁর প্রকৃতিমগ্নতা প্রকাশ করছে। রবীন যেন 'রাগে গরগর করতে করতে' লিখছেন, একেকবার মনে হয়েছে। এ ক্রোধ কবিতার জন্য, সৃষ্টির জন্য।

তুলসী মুখোপাধ্যায়ের 'সময় আসবে' কাব্যগ্রন্থে বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রতি বিদ্রোহ ও সোচ্চার কথামালা দ্রষ্টব্য। তুলসী, আমার মনে হয়, শত্রু-মিত্র যাচাই করে নিয়েছেন। যাবতীয় ভণ্ডামি ও ন্যক্কারজনক ব্যসনের বিপক্ষে তাঁর রণসজ্জা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গী তিনি সংগ্রামী ক্রীড়াভূমিতে। যে-সাধারণ শ্রমিক-কৃষক বুর্জোয়াদের বরাবরের শিকার, তাদের প্রতি সহানুভূতি তাঁর মর্মন্তুদ। তিনি পলায়নবাদে বিশ্বাসী নন। দৃপ্ত ও তেজী কাব্য ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এই কৃশ কাব্যগ্রন্থে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি কোথাও দেখা গেল না, এই তো পরম সান্ত্বনা। 'আমরা কি পাবো না তবে / জবাকুসুমসঙ্কাশের / উজ্জ্বল উদ্ধার?' এ ভাবনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ুক—আমরা চাই। তিনি চেয়েছেন মৌলিক আর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তন—

আমি যেথায় উরু থেকে দুঃখ চেটে বলব—
আর বর-বউ খেলা নয়
এবার শাস্ত্রমতে বিবাহ তোমার সঙ্গে।

বা,

'বিনাযুদ্ধে আজকাল / এক ছুঁচ ধরণী মেলে না' ঐ একই প্রজ্ঞার ঐক্যগত আরেকটি প্রকাশ।

শুভাশিস্ গোস্বামীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সময়ের রোদে জলে' প্রকাশিত হ'ল। এটি আনন্দজনক খবর। ষাটদশকে অনেকেই কবিতার নামে ফর্মচর্চা ও চাতুর্য বিলাস করে বলেছেন ও সমাজ সচেতনতার তোয়াক্কাও করেন নি। শুভাশিস্ এ দিক থেকে ব্যতিক্রম। কবি মূলত রোমান্টিক, কিন্তু তা তাঁকে প্রথাগত জোলো প্রেম ও পলায়নী প্রকৃতিবাদের দিকে নিয়ে যায় নি—সমাজসচেতন আত্মোপলব্ধিগুলিতে মন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। 'কলকাতার অরণ্যে তুমি / কোথা আজ কপাল কুণ্ডলে?' বা, 'সমুদ্রে যাওয়া যায় / যদি, আহা, কপালকুণ্ডল'—তীব্র প্যাশন প্রকাশ করছে। বিবেকের দংশন আছে বলেই কবি 'লেনিন' কবিতা লেখেন। 'এমন মুরলী চাই / যাতে করে অনায়াসে / হতে পারে কালীয়দমন॥' প্রতীকী অর্থে বর্তমান সমাজের তীব্র কামনা নয় কি! কালের রথের চাকা যে শূদ্রের হাতেই ঘুরে যায়, তা আর—একবার মনে করিয়ে দিলেন এই কবি। ছন্দ ও শব্দের ম্যাজিক শুভাশিসের করায়ত্ত।

'শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' কবি শিবেনের 'ঢেউকন্যা', 'দর্পিত প্রহরে', 'সূর্য-পতনের দৃশ্যে', নির্বাসিত জ্যোস্না' ও 'তুমি স্মৃতি রক্তের গভীরে', 'স্পেনের কবিতা' ও 'ইন্দোনেশিয়ার কবি'...' এই কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ ও অনুবাদ গ্রন্থের সংকলন। শিবেনের 'ঢেউকন্যা'র ভেজা ভেজা প্রকৃতিদত্তস্বর, 'দর্পিতপ্রহরের' মানুষ নিসর্গ পাখি প্রভৃতির উষ্ণমেদুর বর্ণনা আমাদের নিকট নয়নাভিরাম। 'সূর্যপতনের দৃশ্যে' শিবেন কিন্তু যুদ্ধবাজ। সেখানে শিবেনের নতুনতর ব্যক্তিত্ব। সত্যকার রাগী শিবেনকে এখানে আমরা পেলাম :

এখন বুকের মধ্যে—হৃৎপিণ্ডে
জলপ্রপাতের শব্দ—
অস্থির রক্তের স্রোতে
অগ্নিকাণ্ড তীব্র দাবানল।

বা, 'নির্বাসিত জ্যোৎস্নায়' কাব্যগ্রন্থে শিবেনের কবিতার মূলরস শান্ত। তাঁর অনুবাদগুলি অকারণে সপ্রতিভ নয়, বরং সরল ও যথাযথ। শিবেনের কাব্য-তন্ত্রীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ সুন্দরভাবে কাজ করে গেছেন।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক তিনজন কবি

১. শীত চলে যাচ্ছে। আনন্দ ঘোষহাজরা। বিশ্বজ্ঞান ১৯৭৯। পাঁচ টাকা
২. জ্বালামুখে কবিতার। উত্তম দাশ। কবি ও কবিতা ১৯৮০। পাঁচ টাকা
৩. বিদায় কোভালাম বিদায় সূর্যাস্ত। অজিত বাইরী। মহাপৃথিবী ১৯৮০। পাঁচ টাকা।

যে-কবিতাটির নামে আনন্দ ঘোষ হাজরার কাব্যগ্রন্থটি, সেটি দিয়ে শুরু করলে,…'চলে যাচ্ছে শীত / ফুটপাথ এবং সাবওয়ের সহস্র সহস্র চোখ / আরও একবার বেঁচে থাকার বিস্ময়ে / নতুন আকাশের দিকে পলক বিহীন'…চারপাশের দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝখান থেকে অন্তত জড়তা কেটে গিয়ে একটা প্রাণের স্পন্দন আসুক—এই আশা নিয়েই এই কবিতা। শীত তো এখানে প্রতীক। আনন্দ ঘোষহাজরার কবি সত্তা পরিপার্শ্বসচেতন, 'স্তোত্র শুনে উপবীত দেখে / ক্ষণিক ভ্রান্তিতে মনে হয়েছিল / সবই বুঝি পবিত্র সুন্দর হয়ে যাবে / এই মাঠ ময়দান আকাশ ফসল /…পুরোহিত বদলে যায়। অরণ্য আদিম কোন শিকারীর রূপে' (পুরোহিত)। কিন্তু তাঁর প্রকাশে কোন রকম অস্থিরতা নেই, আছে কিছু শব্দ উচ্চারণের সমন্বয়, একটি নিটোল কবিতা। এ-রকম আরো অনেক কবিতা বইটিতে আছে। আবার দু-একটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতাও চোখে পড়ে, যেমন, গদ্য ছন্দে লেখা তাঁর দ্বিতীয় কবিতা 'উৎসবের বাড়িতে'। কবিতাটির দু'টি স্তবকের যেন কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রথম স্তবকের শেষে যদি কবিতাটি থামিয়ে দিতেন তাহলে আমরা একটি ভালো কবিতা উপহার পেতাম হয় তো। এই ধরনের আর একটি কবিতা 'মধ্যবিত্তের গেরস্থালি'। আসলে তিনি যে ফর্ম ব্যবহার করেন তাতে তাঁর নম্র উচ্চারণ ভঙ্গিটিই তাঁকে সার্থকতায় পৌঁছে দেয়, কিন্তু যখনই সেখানে চড়া পর্দা লাগাতে যান তখনই ফর্ম ভেঙে যায়। কবিতার ক্ষতি হয়। এই ধরনের বিচ্যুতি তাঁর কবিতায় দেখতে ভালো লাগে না, কেন-না তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় শুধু সমাজ-সচেতনতা নয়, কবিতার শরীর অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ফর্ম এবং ছন্দের ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। যাই হোক মোট চুয়াল্লিশটি কবিতা নিয়ে জ্যোতিরঞ্জন চন্দ অঙ্কিত সুন্দর প্রচ্ছদের এই কাব্যগ্রন্থটির সব কবিতা নিয়ে আলোচনা সম্ভব না হলেও কিছু কিছু উজ্জ্বল কবিতার কথা এসেই পড়ে। যেমন, 'প্রতিদিন মরে যায় ফুটপাথে মিশে যায় মৃতের মিছিলে / সূর্য ডুবে গেলে ফের বেঁচে ওঠা ছেলেদের হাসির দমকে / নিয়তই এভাবেই ভেঙে যায় মনের পরিধি' (মানুষের বংশ ছিল); 'কিংবা প্রৌঢ় হাত থেকে আজ

চাবিগুচ্ছ পড়ে যায় কঠিন মেঝেয়। উদাসীন ঝনৎকার বলে দেয় সীমিত পথের প্রান্তে / কোন গৃহ নেই, / খোলা নেই বুকের কপাট'। খুব ভালো লাগল 'সীমারেখা পার হলে' কবিতাটি এবং মনে হল তিনি নিজেও গণ্ডির বাইরে পা রেখেছেন, তারই ফলস্বরূপ এই কাব্যগ্রন্থটি, কেন-না, 'গণ্ডির বাইরে পা দিলেই / চোখ থেকে আবরণ ক্রমশই সরে সরে যায় / অলঙ্কার খুলে খুলে যায়...' ; তাঁর এই নিষ্ক্রমণ অভিনন্দনযোগ্য। দণ্ডক-প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের মনে রেখে তিনি গভীর বেদনায় উচ্চারণ করেছেন, 'মানুষ কি আমাদের ব্যবহারে লাগে / প্ররোচনাময় কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে / ব্যবহারযোগ্য কোন মহিষের মেষের মতন ?'—অজস্র দুঃখ-হতাশার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন মানুষকে প্রশ্ন করে তখন আত্মপ্রত্যয় জাগে—মানুষ তার জাগ্রত চেতনার কাছে একদিন লজ্জিত হয়ে নিজেকে নিজে শুধরে নেবে, তাই এই প্রশ্নই হয়ত বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে, কবিতাকে।

মোট বত্রিশটি কবিতা নিয়ে উত্তম দাশের কাব্যগ্রন্থ 'জ্বালামুখে কবিতার'। 'রক্তের দুরন্ত কোষে জমে থাকা বরফের বীজ জ্বলে ওঠে / অকস্মাৎ রাত্রির আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলে / ক্রমান্বয়ে ডুবে যাই অস্তিত্বের নিহিত পাতালে' (অধিষ্ঠান ভূমি) ; 'দেখে নিতে চাই / কিভাবে জড়িয়ে থাকে / শব্দের শরীরে মায়া / মায়ার শরীরে / অদৃশ্য দেয়াল (দেখে দিতে চাই)—এই আত্মসমীক্ষা এবং অন্বেষণের মধ্য দিয়ে কাব্যগ্রন্থটির শুরু। তাঁর কবিতায় জীবন, কবিতা, প্রেম মিলেমিশে একাকার, 'শোষণ সমাজ সব বিজাতীয় ব্যভিচার / কামুকের স্পর্শপাপ মুছে দেব / অক্ষত কুমারী কবিতা আমার / বিশুদ্ধ শরীর তোকে দিয়ে যাব' (বিশুদ্ধ শরীর) ; কিংবা, 'সেই তুমি অকস্মাৎ কানে কানে চুমো খেলে কাল / লেগে আছে সারা গায় আলতা-ধোয়ানো পায়ে লাল' (সেই তুমি)। এই কবিতা, এই প্রেমকে বাঁচানোর কখনও দৃঢ় প্রত্যয় কখনও তার সঙ্গে সাহচর্যের তীব্র অনুভূতির প্রকাশ আবার কখনও অসহায়তার চরম আর্তি 'এ কি দিলে, এ কী দিলে—দ্রুতময় ঝলসে ওঠে / যন্ত্রণা-তাড়িত এক বিস্ফোরিত মুখ'। নিঃসঙ্গতা—নির্জনতার ওপর কয়েকটি কবিতা আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'তিন জোড়া চোখে বকখালি', 'আমার মধ্যে একটা বিদেশ', 'আমার মধ্যে একজন'। আছে স্মৃতিচারণমূলক 'মনে পড়ে'। ভালো হয়েছে তাঁর গদ্য-ছন্দে লেখা 'এক সময়' কবিতাটি। তবে 'যাও পাখি' 'কিছু কিছু

প্রাণী আছে', 'চাঁদের কথা', 'শব্দেরও গন্ধ থাকে', 'যাচ্ছ যাও'—এই কটি কবিতার কোনও কোনও অংশের শব্দ নির্বাচন, উপমা, এবং কয়েকটি পঙক্তি ভাল লাগে নি। এ কবিতাগুলি যেন তাঁর গভীর বোধ থেকে উঠে আসা অন্যান্য কবিতাগুলির সঙ্গে মেলে না।

প্রায় একশ কবিতা নিয়ে 'বিদায় কোভালাম বিদায় সূর্যাস্ত' কাব্যগ্রন্থে অজিত বাইরীর দীর্ঘ পরিক্রমা। প্রায় সমস্ত কবিতার পটভূমিই গ্রাম-বাংলা বা মফঃস্বল, সেখানকার পারিপার্শ্বিক, সুখ-দুঃখ। 'গলায় গামছা বেঁধে বাবলার নির্জন ডালে ঝুলে থাকা মানুষ' 'দুপুর রাতে নিঃসঙ্গ পুরুষের গলায় শিরা-ছেঁড়া হাঁক'—এসব যেমন কবিতায় এসেছে তেমনি আছে. 'আমরা ওকে আগলে রাখছি / আমরা ওকে যত্নে গড়ে তুলছি / ওর ছোট্ট টলটলে মুখ' কিংবা, 'যাও বললেই যাওয়া যায় না ; / খাঁচার পাখিও শেকল কাটার আগে দেখে নেয় / ডানার ভার, প্রকৃতির প্রস্তুতি'—এই ধরনের দায়িত্বশীল পঙক্তি যার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁর প্রথম কবিতা 'স্বদেশ'-এ, 'আমি তোর পরাণ-হাটের ভাবুক যুবক / আমি তোর কবিয়াল / দু-পায়ে পরিয়ে দিয়েছি মল ; / দুঃখ-রাতে বেড়া বেঁধে তোর ঘর দিয়েছি আগল।' যুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিকের প্রতি কটাক্ষের ইঙ্গিত তাঁর 'আমার ছোট্ট কবর' কবিতায়। আবার, 'আমি হেঁটেছি তাঁর সঙ্গে, তাঁর পাথেয় / ধ্যান, স্বপ্নের হাত ধরে আরো দূরে যাবো / কাঁধের ওপর ন্যস্ত তাঁর দীর্ঘ বর্দ্ধিত হাত'—যেন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। তাঁর কবিতার যে-বিশেষত্ব তা হল চারিদিকের গ্রামীণ পরিবেশ, সুখ-দুঃখ-বিষণ্ণতার শুধু বর্ণনা নয়, নিজের গভীর উপলব্ধি নিংড়ে যেন ভালোবাসায় গড়ে তুলেছেন কবিতার শরীর এবং অসংখ্য কবিতার মধ্যেও প্রত্যেকটিকে আলাদা করে চেনা যায়।

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাস্তবতার খোঁজে

সংকলিত গল্প : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দে বুক স্টোর কলকাতা-১২। কুড়ি টাকা

'সাংবাদিকতা আমার জীবিকা, আর সাহিত্য আমার জীবনধারণের প্রায়শ্চিত্ত। আমার অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা নিজেদের সাংবাদিক বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তৃপ্তিও পান। আমার মনে হয়, বেশ্যাদের

সঙ্গে সাংবাদিকদের মূলগত পার্থক্য একটি মাত্র—তা হলো, বেশ্যারা তাদের পেশার গর্ব করে না, আমরা, সাংবাদিকরা করি।'

কথাগুলো যাঁর, অবশ্যই তিনি একজন সাংবাদিক। বেঁচে-থাকার তাগিদে সেটা তাঁর জীবিকা। কিন্তু এমন এক 'গৌরবময় বৃত্তি'র সঙ্গে যুক্ত থেকেও যিনি এত তেতো বিস্বাদে, মাত্রাতিরিক্ত ঘেন্নায় থুতু ছিটোতে পারেন নিজেরই পেশাকে, বলা বাহুল্য, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই তাঁর স্বতন্ত্র এবং ভয়ঙ্করভাবে নির্মম।

যে-দেশে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' মানে সাংবাদিকের স্বাধীনতা নয়, সংবাদপত্রের মালিকের স্বাধীনতা—সেখানে প্রাত্যহিক কলম পেষার অবমাননায় একই সঙ্গে বিক্রিত এবং বিকৃত হবার বিরুদ্ধে একই সঙ্গে কলম আর নিজের শুদ্ধতা রক্ষার আত্যন্তিক তাড়নায় তিনি সাহিত্যকে আশ্রয় করছেন জীবনের অন্য এক প্রেরণায়।

এই সিনিসিজ্‌ম্‌ থেকেই শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই বহুবিচিত্র পেশায় নিজেকে নেড়ে-চেড়ে অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবনকে নানাভাবে চেখে দেখা—ইংরেজ আমলের সৈনিকবৃত্তি থেকে সরকারি-বেসরকারি আপিশে কেরানিগিরি, সবশেষে অন্যূন ছটি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা। অনিকেত জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমণ শেষে এমন এক বৃহৎ সংবাদপত্র আপিশে চাকরি, যার প্রাতিষ্ঠানিক গৌরব গোটা পূর্বভারতে সম্রাটসদৃশ, যেখানে আনত থাকলে স্থিতি আছে, অর্থ আছে, যশ-খ্যাতি-প্রচার না চাইলেও সুলভ। অনুগতের জন্য ঢাকের বাদ্যি সেখানে এমনি বাজে। সাহিত্যশ্রেষ্ঠীদের গদিতে বসে, তাদেরই বেতনভুক শান্তিরঞ্জন সব প্রলোভনকে পরিহার করে 'প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য কারবার'-এর বিরুদ্ধে নিজের শিল্পকর্মকে শাণিত করেছেন নিরন্তর। 'কলাকৈবল্যের প্রলাপ' বা 'নির্বস্তুক অন্তর্লোকে পাড়ি' জমানোর ধোঁয়া তাঁর কাছে এক নিরাকার কিম্ভূত। শব্দের বুজরুকি। শত্রুব্যূহে অবস্থান এবং ক্রীতদাস না থেকে শত্রুকেই প্রতিনিয়ত আঘাত—সাহিত্যই তাঁর সেই তরবারি। 'নন্‌-কনফর্মিজ্‌ম্‌' বহু উচ্চারিত এক শব্দ। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে চিহ্নিত করার মতো নন-কনফর্মিস্ট ব্যক্তিত্ব শান্তিরঞ্জন বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো খুব বেশি নেই।

শান্তিরঞ্জনের 'অশ্লীল' গল্পের একটি সংলাপ—'আপনার এখনকার গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় আমাদের জীবন থেকে সমস্ত দুঃখদুর্দশা যেন ঘুচে

গেছে, বাস্তব কোন সমস্যাই আর আমাদের নেই। কিন্তু সত্যি কি তাই? দুমুঠো ভাতের জন্য যখন…' (পৃষ্ঠা ২৭১)

রাখালের-বউ যদি সত্যি সত্যি 'বেশ্যা'ই হন, তবু তাঁর এই প্রশ্নটা কি বাতিল হয়ে যায়? বরং নামী সাহিত্যিক সত্যসুন্দর মহিলাকে গণিকা মনে করে বিবেকে সান্ত্বনা পান—প্রশ্নটা বাজে-মেয়েছেলের বলেই বাজে। উত্তরের দায় নেই।

অথচ প্রতিষ্ঠানপুষ্ট এসব সত্যসুন্দররাই আমাদের সাহিত্যের 'জনপ্রিয়' সাহিত্যিক এবং জনপ্রিয়তার নিরিখেই 'মহৎ'। অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতায় এঁরা মূলত নাগরিক—হোটেলের কেচ্ছা, নারীবিলাস আর পানসুখের তৃপ্তিতে পাঠক-ভোলানো বয়স্ক রূপকথায় এঁদের শিল্পসুখ। এঁদের মতো শান্তিরঞ্জনও মূলত নগরকেন্দ্রিক। কিন্তু পার্থক্য এই, নিজস্ব শ্রেণীভুক্তির বাইরে তাঁর বিচরণ নেই। সংকলিত গ্রন্থের সাতাশটি গল্পের মধ্যে প্রায় সবই নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডিতে, তাদের সুখদুঃখবেদনা আনন্দের প্রেক্ষিতে রচিত। বাস্তবতার প্রতি আনুগত্যে এখানেই তাঁর আন্তরিকতা বা শুদ্ধি। এমন-কি প্রগতিশীলতার নামেও অচেনা মানুষ শ্রমিক কৃষক নিয়ে ঠাট্টা করার সাধ তাঁর হয় নি কখনও। বরং বিশ্বাস করতেন, মিটিং মিছিল ইনকিলাবি আওয়াজেই শুধু মানুষের লড়াই নয়। মানুষের লড়াই তার অন্তঃপুরে, তার প্রতিমুহূর্তের জীবনযাপনে। বাহ্যিক উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও এই শহরেরই তলানিতে কি বিচ্ছিরিভাবে বাঁচে মানুষ, ভাতকাপড় ঘরের টানে কি মর্মান্তিক তাদের দিন আর রাত।

হঠাৎ একটা বড়সড় মাছে কিনে আনার পর নিজের ঘরে যখন ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় আর উৎসব, শান্তি পান না পরেশ সরকার। সমশ্রেণীভুক্ত মহাদেব মাস্টারের ঘরবাড়ি বৈভব নিয়ে তার ভাবনা। ঈর্ষা বা ক্ষোভ নয়, সামাজিক ব্যভিচারে নিজের অসহায়ত্বকেই নতুন করে যাচাই (ভদ্রভাবে বাঁচার উপায়)।

কি ভীষণভাবে অসহায় পকেটমারের দায়ে ধরা-পড়া সেই অচেনা ট্রামের যাত্রী। তখন যার জন্য আপিশ কামাই করে দিনেশ নাজেহাল (দিনেশের দয়ামায়া)।

একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যে যখন কোনো নৈতিকতা নেই, লজিকের পারম্পর্য নেই শান্তিরঞ্জন সেখানে জীবনকে দেখেছেন ভ্রূকুটি তুলে। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের খোঁচা প্রায় প্রতিটি গল্পে। কারণটা স্পষ্ট, তাঁর গল্পের কুশীলব

মধ্যবিত্ত মানুষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাঁদ নিয়ে যাদের জন্ম এবং বয়োবৃদ্ধি, কেরানি-গিরি শিক্ষকতা সাংবাদিকতার উঞ্ছাচরণে তার পরিণতি। ভাঙাচোরা বিকৃত জীবনকে তখন ঠাট্টা করেই চৈতন্যে ফিরিয়ে আনতে হয়, চাবুক মেরে বেতো-ঘোড়াকে চাঙা করার মতো। এই নিদারুণ কশাঘাতের ছবি—'স্বপ্ন দেখে আত্মজিজ্ঞাসা' বা 'একটি উপন্যাসের বিজ্ঞপ্তি'। শান্তিরঞ্জন এখানে নিজেকেই দাঁড় করিয়েছেন কাহিনীর মুখচরিত্র হিশেবে। এ যেন আর্শিতে নিজেরই শ্রীমুখ যাচাই করে দেখা, শ্বেতকুষ্ঠের বিস্তৃতি ঘটল কতটা! ইত্যাকার ঠাট্টা বিদ্রূপ থেকে মুক্তি পায় না বিবাহপূর্ব বা বিবাহিত প্রেমের অভিজ্ঞতাও, মধ্যবিত্ত ভীরুতা সংশয় নীচতার ছবি—'বাঁধ ভেঙে দাও', 'রাখাল আর রাজকন্যা' ইত্যাদি গল্প।

যে সিনিসিজ্‌ম্ থেকে শান্তিরঞ্জনের বস্তুনিষ্ঠার উদ্ভব, তার সবটাই নেতিবাচক নয়। অধিকাংশ গল্পেই অনায়াসে এসে যায় পুলিশি তাণ্ডব, মালিকের উৎপীড়ন, ইউনিয়নের সংগ্রাম, শহিদের মৃত্যু, ছাত্র ফেডারেশন। যতদূর জানি, তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না কখনও। অথচ বামপন্থী আন্দোলন আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে না তাঁর লেখায়। এই দায়বদ্ধতা থেকেই কি ভাবে তৈরি হয়ে যায় 'সওয়াল' বা 'রবীন্দ্র সঙ্গীত'-এর মতো গল্প। ঐতিহাসিক খাদ্য-আন্দোলনের শহিদ লখাই-এর বাপ গুরুপদ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে উন্মাদ হতে হতেও শিরদাঁড়া উঁচিয়ে দাঁড়ায়। তাঁর প্রশ্ন—জীবন দিয়ে লখাই যে চালের দাম কমাল তার ভাগ নেবে কেন, লখাই-এর খুনীরা? অথবা দেশবিভাগের পর ওপারের শওকত এসে দাঁড়ায় এপারের লীলা সরকারের পাশে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত জমিতে অবিশ্বাস আর ভয়। অন্ধকারে দুজন পাশাপাশি। রবীন্দ্রসঙ্গীত রাখী।

এই গল্প সংকলন নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান গ্রন্থপ্রকাশ। নিজের জীবিতকালেই প্রচারবিমুখ নিজেরই লেখাজোখার প্রতি উদাসীন, যে লেখক হারিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁকে এত সহজে বিস্মৃত হতে না-দেওয়ার এই প্রয়াসের জন্য প্রকাশিকা শ্রীমতী কল্পনা সেন এবং ব্যবস্থাপক শ্রীসুব্রত চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ। একটি অনুরোধ, গল্প সংকলনের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের সময় প্রতিটি গল্পের রচনাকাল খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। ওটা খুবই জরুরি।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

ডুমুরের দিনরাত। অমল আচার্য। রক্তস্বাক্ষর পাবলিকেশনস্। ছ টাকা।

মোট বারোটি গল্পের সমাহার অমল আচার্যের 'ডুমুরের দিনরাত' গল্পগ্রন্থ। প্রেম, শরীর, যৌনতা, মাটি, সমকাল ও সবশেষে মানুষ ও সেই মানুষের 'অস্তিত্বে'র সংকট ও বেঁচে-থাকা—খুব সংগতভাবেই এই হল গল্পগুলির উপজীব্য বিষয়। দুটি ছাড়া আর সব গল্পেরই প্রেক্ষাপট মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন। কিন্তু এই জীবনচিত্রনের ঢং-টা মোটেই প্রকৃতিবাদীদের মতো নয়। হুবহু ফোটোগ্রাফি না তুলে গল্পকার নিজের রঙে রাঙিয়ে ছবিই আঁকতে চেয়েছেন। অধিকাংশ গল্পের ক্ষেত্রেই এই স্থায়ী রংটি যে হল একটি রাজনৈতিক-সামাজিক প্রত্যয়—পাঠকদের তা বুঝে নিতে ভুল হয় না। কিছু কিছু গল্প শুধুমাত্র এই প্রত্যয়ের জোরেই প্রায় ওয়াক-ওভার পেয়ে গেলেও অন্তত দু-একটি গল্প-যেমন 'অজ্ঞাত যুবকের শব' কিংবা 'হায়েনা' এই প্রত্যয়েরই স্বেচ্ছাচারী শাসনের ফলে গল্পের সজীব ত্বকমাংস না পেয়ে হয়ে দাঁড়ায় কেমন যেন শুকনো হাড়ের কাঠামো মাত্র। কখনো কখনো এসে পড়ে যেন বা সরল ও মসৃণ সিদ্ধান্ত টানার ঝোঁক। দুটি গল্পের উদাহরণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে পারে। 'ডুমুরের দিনরাত' গল্প অবধারিতভাবে শেষ হয় ডুমুরের কানে ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলা—রাত্তিরে এসো, এই কুহক-ডাকের মধ্য দিয়ে। এর চেয়ে ব্যঞ্জনাগর্ভ শেষ এই গল্পের আর কি হতে পারত? যদিও নিপুদার বৌ সুষমা ডুমুরকে ডাকে 'ফস্টিনস্টি' করার জন্য তবু আমরা না ভেবে পারি না যে, 'রাত্তিরে এসো' এই ডাকের স্মৃতি ব্যাঙ ডাকা বর্ষার নিবিড় রাতে ডুমুরের মনে খুচরো ফস্টি-নস্টির ওপারে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের আহ্বান নিয়ে পৌঁছোয়। আর পৌঁছোবার ফলেই গল্পটি লক্ষ্য শেষ করে।

পক্ষান্তরে 'নাড়ির স্পন্দনে জলতরঙ্গ' গল্পের শেষে একটি রূপোপজীবিনী মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার অপরাধে নিজের প্রতি প্রখরের ঘৃণা বোধটাকে কেমন যেন মনে হয় দুর্বল, খণ্ডিত অকিঞ্চিৎকর মধ্যবিত্ত সুলভ নীতির চোখঠারা মাত্র। দ্বিধাদীর্ণ হয়ে পড়ে গল্পের অভিপ্রায়। 'সংহত' গল্পটিতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাস্তব ও রুদ্ধশ্বাস চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু গল্পের উপসংহারে নিবারণের দশ বছরের ছেলে ছান্টুর হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া এবং বাবাকে আশ্বাস দেওয়ার ইতিবৃত্তটি বিষয় হিসেবে মহৎ হলেও বাস্তবতার বিচারে কেমন যেন আকস্মিক,

আচমকা মনে হয়। হয় তো তা এর জন্য আরও কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

বারোটি গল্পের মধ্যে 'সাপ' গল্পটিকে মনে হয়েছে প্রক্ষিপ্ত, পরিপ্রেক্ষিত-হীন। গল্পটিকে এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করলেই বোধ হয় সমস্ত গ্রন্থটির মূল চরিত্রটি অটুট থাকত।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

মাটি-আলো-ইতিহাসের দায়

সুনীলকুমার নন্দী। অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে। অন্বেষা। দাম পাঁচ টাকা।

কিছু কিছু বই থাকে যা শো-কেসে নানান ঠাটে-ঠমকে 'আমাকে দেখ' বলে চেঁচায় না। কিছু কিছু কবি থাকেন মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে নিরুপায় আত্মঘোষণার নিয়তি যাঁদের অব্যাহতি দিয়েছে। সে কবি বা সে কবিতার নম্র সুর যেন নির্জনে বাজে। নিষ্ঠা নিয়ে তার কাছে গেলে তবেই সে খুলে দেখায় কিছু গোপন রহস্য। আমাদের দিনযাপন, স্মৃতি আর প্রবাস তেমন কবিতাতেই নিজেকে চিনতে পারে। সে নিজে বাজে না, পাঠককে বাজায়। তার কাজ চলে ভেতরে, অন্দরমহলে।

সুনীলকুমার নন্দী, চিরদিনের মতো, 'অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে'-তেও মগ্ন আত্মকথনে যে অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করেন তার লক্ষ্য থাকে আমাদের ভেতর থেকে উস্কে দেয়া। উস্কে দেয়া—কেননা তা আমাদের মধ্যবিত্ততার স্বরূপকে চিনিয়ে দেয়। তাঁর ভাষা আবেগের মেদ ঝরিয়ে ফেলে শুদ্ধতার খোঁজে।

মজা হচ্ছে যে, তাঁর কবিতার ধরনে বাইরে থেকে মনে হয়ে যেতে পারে যে, এও বোধ হয় কিছু নস্টালজিক, আত্মমুখী বিষাদ বিষাদ খেলারই লিরিসিজম। কিন্তু একটু সাবধানী পাঠে ধরা পড়ে মাটি, আলো ইতিহাসের প্রতি তাঁর দায়বোধ। এ দায়বোধ হয়তো তাঁকে সে জায়গায় পৌঁছে দেয় না—যেখানে বিষয়ী আর বিষয়ের বিবাদ ঘুচে গিয়ে কবিতা হয়ে ওঠে বাস্তবের রূপকার। বরং যেহেতু সংকটপ্রসূত অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার যন্ত্রণাই তাঁর অভিজ্ঞতার সম্বল সেহেতু নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার কাহিনীই ধরা পড়ে কবিতাগুলো জুড়ে। ধরা পড়ে গোপন শোণিতপাতের আর্তি।

'বীজাণু' কবিতার কথাই ধরা যাক। মাত্র ছটি লাইন পেরিয়েই কবি সিদ্ধান্তে পৌঁছোন—

আছে আছে হয়তো রয়েছে মিশে অদৃশ্য বীজাণু
জীবনের গূঢ় মূলে
রক্তের ভিতরে সূক্ষ্ম রক্তকণিকায়—

তা না-হলে, এ আঘাত কাকে দাও
রোদে-জলে ছায়ার মত যে পাশে ; জানি, জানি সবই
বীজাণুর কাল !

আত্মবিশ্লেষণের নির্মমতা এখানে সময়ের দিকেই ইঙ্গিত করে আমাদের। সময়ের সে সংলগ্নতার বোধেই তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে ধরা দেয় আজকের কলকাতা ('তিলোত্তমা'), সাম্প্রতিক বন্যা ('বিষ'), সমাজতত্ত্ব ('এ বড় অদ্ভুত মাটি'), কিংবা স্বৈরতন্ত্র ('গোলাপের খেলা চলে')। নিজেকে চিনে নেবার যন্ত্রণা থেকেই কাদামাটি জলের পৃথিবীর জন্য তীব্র অথচ অসহায় টান 'কৃষ্ণনগর মুখোশ জোগায়', 'অথচ হয় না ফেরা', 'হিমস্রোত', 'বাজনা বাজে খালে বিলে', 'হারিয়ে ফেলেছি', 'ভিতরে যাও' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কখনো বা টানটান আত্মবিশ্লেষণের টংকারে আবার নস্টালজিয়ার মায়াবী আলোয় ধরা পড়ে।

আর, নিজেকে ঠিকমতো চিনতে হলে তো যেতে হয় প্রেমের কাছে, নারীর কাছে। লিরিকের বিহ্বলতায় নয়, আত্মজিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতাতেই 'কোটালের চাপাটান', 'জপমালা', 'খেলার প্রতিভা', 'পাহাড়ী জ্যোৎস্নায়', 'ধস', 'মেঘ ডেকে যায়', 'জলস্তম্ভ', 'এত স্বাভাবিক তুমি অদ্ভুত শীতল', 'বোধন', 'দুর্ঘটনা', 'রক্তগোলাপ', 'বনজ ভ্রমর', 'আরোগ্য' প্রভৃতি কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে প্রেম।

বস্তুত খুব আত্মমগ্ন ভাবেই তিনি জীবনের অপার রহস্যের মুখ দেখতে চান আলোয়। মধ্যবিত্ত মানুষ হিসেবে তাঁর জানা হয়ে গেছে 'আরো ঢের ঢের রহস্যনীল ভাসমান প্রবণতা

আমার রক্তে আজো তিরতির করে, তবে
ও শুধু খেলাই—
না, রহস্যময় পৃথিবীর কিছুই আমার খোলা হল না।'

('ও শুধু খেলা-ই')।

অথচ রহস্য তো পুরোপুরি ফুরিয়ে যায় না কখনো। কেননা, তারপরেও তো 'ছায়ার খেলা চিনতে ছেলের আস্তে বাড়ে ভুবনডাঙা' ('ভুবনডাঙা')।

রহস্যকে চিনতে চান বলেই, অস্তিত্বের স্বরূপকে বুঝতে চান বলেই সম্ভবত তাঁর কণ্ঠস্বর ঘন হয়ে ওঠে। কথ্য চালের কেলাসন হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য। প্রতীকীবাদী না হয়েও তাঁর কবিতা প্রতীকের মর্যাদা আদায় করে নেয়। যেমন, 'সাইকেল' কবিতায় সাইকেলচালক একটি ছেলের অভিজ্ঞতা,

আলো
চোখে টেনে পথের নিশানা গড়ে
সাইকেল চালায়, ছেলে
মেলায় পৌঁছতে গিয়ে
বয়স বাড়ায় যেন, সাইকেল চালায়।

এমন প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই সংগত আত্মকথনের ছন্দোময় আবেগে সুনীলকুমার নন্দীর বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি বাংলার কাব্যভাষার বিবর্তনে অনুধাবনীয় আজকের পর্যায়টির প্রতিনিধিত্ব করে। আর, সত্যিকারের কবিতা যেহেতু সমসাময়িক জনপ্রিয়তার শত্রু সেহেতু আমাদের সময়কার আরো দু-একজন কবির কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি 'অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে' কাব্যগ্রন্থটিও পাঠকদের কাছে সিরিয়াস কাব্যচর্চার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

পাঠক হিসেবে, অবশ্য দু-একটি অস্বস্তির উল্লেখও করা প্রয়োজন। বিশেষত 'গোলাপের খেলা চলে' এবং আরও কোনো কবিতাতেও হয়তো বা বলবার আত্মমগ্ন ধরন বিষয়ের মেজাজটিকে পাঠকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া 'খসা' শব্দটি বিভিন্নভাবে বারবার মুদ্রাদোষের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর মতো মান্য কবির পক্ষে এ মুদ্রা দোষ বড়ই বেমানান।

শুভ বসু

পুনর্পাঠ ঃ পুনর্বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প। ভারবি। আঠারো টাকা।

এক সময়ে বাঙলা ছোট গল্পের খুব কদর ছিল। ভালো ছোট গল্প লেখার কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতেন লেখকরা। ঢাউশ উপন্যাস রচনাই কৌলীন্যের একমাত্র বাঁধা সড়ক ছিল না। বাঙলা ছোটগল্পের সেই সুসময়ে জ্যোতিরিন্দ্র

নন্দী গল্পকার হিসেবে অগ্রগণ্য ছিলেন। লিখেছেন অজস্র, স্বল্প হলেও এখনও লেখেন, কিছু আগে লেখা 'আম-কাঁঠালের ছুটি' (দেশ, শারদীয় ১৩৮৩)-তেও ক্ষমতার চিহ্ন স্পষ্ট।

১৯৭৬ সালের শেষ দিকে সুবোধ দাশগুপ্তের আঁকা পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদে মুড়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্কলন, আঠারোটি গল্প নিয়ে। আমাদেরও মনে হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্পের প্রকাশ এত বিলম্বিত হওয়া উচিত ছিল না। এ বিলম্বের কারণ হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ভূমিকায় যা বলেন, গ্রন্থশেষে 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জীবন ও সাহিত্য' নামক অস্বাক্ষরিত রচনা তা বলে না। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলেন : 'মনে আছে ঠিক তখনই আমার কজন পাঠক বন্ধু চাইছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির একটা সংকলন বেরোক।...এখন চিন্তা করি গিরগিটি ও ট্যাক্সিওয়ালার যুগে যদি আমার শ্রেষ্ঠ গল্প বেরোত, তবে পরের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি ধরে রাখার জন্য আর একটা সোনার খাঁচা কোথায় পেতাম।' আর গ্রন্থশেষে জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয় 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মত তদ্গত সাহিত্যব্রতী যে জনগণেশের প্রসাদপুষ্ট হবেন না, সমকালের কাছ থেকে হাতে হাতে বুঝে নিতে পারবেন না তাঁর ন্যায্য পাওনা এটাই স্বাভাবিক, এটাই প্রত্যাশিত।'...তাই 'তাঁর চেয়ে সর্ববিষয়েই কনিষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলন অনেক আগে বেরিয়ে গেলেও, এতদিনে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলন প্রকাশিত হতে পারল।'

গ্রন্থ শেষের ঐ রচনা থেকেই জানা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মপাসাঁর গল্প অনুবাদ করে ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্কলনের প্রথম গল্প 'নদী ও নারী' লেখা হয়েছিল ১৯৪০ সাল নাগাদ—লেখকের চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে। এ গল্পটা থেকেই লক্ষ্য করা যায় জীবনের আপাত সাবলীল প্রবহমানতার মাঝে মধ্যে নিষ্ঠুরতার অস্তিত্ব তাঁকে টানছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে চিরকালই ব্যাপারটা থেকে গেছে, হাজিরও করেছেন আকস্মিক চমকে। গল্পে এ পদ্ধতিই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অনুসৃত—তিনি সযত্নে পরিশ্রম করে একটা পরিবেশ তৈরি করেন, পাঠককে কোনো একটা দিকে নিয়ে যান, একটা কিছু বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে হাজির করেন—সেটা বেশ জমে উঠলে কোনো ঘটনায় বা মন্তব্যে বা তথ্যের আঘাতে চুরমার করে দেন। আপাত সুখীদের নিটোল সংসারে আবিষ্কার করে দেন কীট দংশন; জাঁহাবাজ, ফুর্তিবাজ প্রসাধন পটীয়সীর কোনো গোপন

অসহায় দুঃখ—যেমন ঘটেছে 'নদী ও নারী'তে। কিংবা 'চোর' গল্পে পাশের বাড়ির বড়লোকের চাকর মদন চলে আসে যখন, তখন মধ্যবিত্ত বাড়ির লোকজন উল্লসিত। মদনকে আদর যত্নে রাখে, মদনও এ বাড়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা আর পুরনো বাড়ির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে। ভাবাই যায় না শেষে ও বাড়ির মালিকের হাতে প্রহার খেয়ে ও বাড়িতেই আবার মনোযোগী চাকর হিসেবে বহাল হয়ে যাবে। বড়লোকের চাকর হয়েই সে কৃতার্থ।

ফলে প্রায়শই একটা পরাজয় ফোটে—মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে। পৌরুষের অভাব যেন প্রকট হয়, কখনও-বা পরিবেশ বা নিয়তির কাছে প্রায় মনুষ্যেতর আত্মসমর্পণ। কেউ লড়াই করতে গিয়ে ঠেলাচাপা পড়ে—'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পটায় পাওনাদারদের পথরোধ করাকে পরোয়া না করে তারিণী বউ-ছেলে সমেত মালপত্তর নিয়ে রওনা দেয় বেলেঘাটার নতুন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে। পথে মালপত্তর ও বউ-ছেলেবাহী ঠেলার সামনে থাকায় গড়ানে পথে সেই ঠেলাতেই সে চাপা পড়ে মরে। 'হঠাৎ একজন কথা বলল "কিন্তু ওকি জানতো না, ঠেলা যখন ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তখন তার আগে থাকতে নেই, পিছন ধরে চলাই নিরাপদ, সবাই তা করে"।' ঠেলার সামনে থাকা মানে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা, পেছনে থাকা মানে ঘটনার পেছনে ছোটা। দুর্যোগে সামনে থাকলে মরতে হয়। বাঁচা মানে ঘটনার পেছনে থাকা। এমনই কি বলতে চান লেখক?

জীবন সম্পর্কে একটা ভাবপ্রবণ মনোভাব অবক্ষয়ী বাস্তবে ধাক্কা খেলে এমন সব গল্পই লেখা হয়। 'সেই ভদ্রলোক' গল্পের বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরের স্বামী এবং কতিপয় সন্তানের জনক—সাংসারিক দায়ের চাপে অ্যাংজাইটি নিউরোসিস-এর শিকার হয়ে যায়। তারপর মানসিক গণ্ডগোল। এসব থেকে পালিয়ে লণ্ড্রিতে ইস্ত্রির কাজ করে বেড়ায়, সেভাবেই বাঁচে। তথাকথিত আধুনিক জীবনের অর্থহীন চাহিদাগুলো একজন মানুষের ওপর কি চাপ তৈরি করে, কিভাবে বিব্রত করে, তাকে ধরেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে। গল্পটাতে শেষদিকে ভদ্রলোকের মানসিক গণ্ডগোলের সময়কার অস্থিরতা হাজির করতে আঙ্গিকের তীক্ষ্ণ ব্যবহার প্রায় মুগ্ধ করে।

'জীবন' গল্পটাতে অবশ্য জীবন থেকে পলাতক দুজন খেটে খাওয়া মানুষকে আবার জীবনে, কঠিন জীবনেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্যান্য গল্পে বাস্তবের বিশ্বস্ত বর্ণনাই মেলে। এ গল্পটায় অবাস্তব

কোইন্‌সিডেন্সকে বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হতে দেখা যায়। একটা লোক কারখানার লক-আউটে সর্বস্বান্ত হয়ে বউ-ছেলেকে হত্যা এবং আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তের প্রথমাংশ পালন করে ফেলে বনের নির্জনে ছুরি চালিয়ে। দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ আত্মহত্যাটা না করে বিড়ি ধরায়। বউ-ছেলেকে মেরে ফেলেছে অথচ নিজেকে মারতে পারছে না এমন হওয়ায় আত্মগ্লানি বোধ করে বটে, কিন্তু মরতে পারবে না এটা ধরেই নেয়। তারপর আবিষ্কার করে অন্য একটি গাছের তলায় তার নিহত স্ত্রীর সমবয়সী এক নারীকে। জনমজুর খেটে সংসার চালানোয় অপারগ স্বামীকে এবং সন্তানকে কাটারিতে কেটে তার নিজেকে কাটার কথা ছিল, কিন্তু সে-ও পারে নি। পরস্পর পরস্পরকে বাকি কাজটা শেষ করতে অনুরোধ করে অস্বীকৃত হল। তখন দুজনকেই নতুন করে বাঁচার কথা ভাবতে হয়। 'যুবতী ঈষৎ লাল হল, ঘাড় নিচু করে বলল 'কিন্তু পেটের ভাতের জন্যে গায়ের কাপড়ের জন্যে আবার যে আপনাকে রক্ত মুখে তুলে ছুটোছুটি করে মরতে হবে গো মশাই।' দরিদ্র জীবনের হাড়-ভাঙা শ্রমের কঠোর বাস্তবতা সত্ত্বেও এদের জীবনাসক্তি জিতে যায়। 'ধনের রাজা'-ও এক জীবনভোগীর গল্প। ষাট বছর বয়স্ক প্রাক্তন ইন্‌জিনিয়ার সারদা অধুনা শহর থেকে বহুদূরে আম জাম কাঁঠালের বাগানে প্রায় আদিম জীবনে বেঁচে থাকে। শুধু প্রবল খায় দায়, উলঙ্গ হয়ে বনের ঘাসে শুয়ে থাকে, দিঘিতে সাঁতরায় তাই নয়, গাছের মতো হিলহিলে কালো কুচকুচে রমণীকে দিঘির শাপলা উপহার দেয়। যদিও এ বাঁচাটা জীবনের জটিলতা থেকে পালিয়েই বাঁচা।

তবু লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিষয় জীবনেরই সুখ দুঃখ হলেও তিনি Strangeness-এর সন্ধানে ছুটে বেড়ান। তাই কুষ্ঠরোগীর বিচ্ছিন্নতা নিয়ে লেখেন 'অজগর'। 'সামনে চামেলি' একজন খঞ্জ প্রাইমারি টিচারের গল্প, যে-নাকি সৌন্দর্যের সন্ধানে ঘিঞ্জি বস্তিপাড়া থেকে দূরে বড়লোকদের গাছলাগানো, কুকুর ও প্রেসার কুকার ডাকা, নির্জন, বারান্দায় সুন্দরী মেয়ে দাঁড়ানো রাস্তায় ঘুরে বেড়াত—একদিন এক সুন্দরী ভিখিরি ভেবে পয়সা ছুঁড়ে দিল, পুরানো জামাটামা দিতে চাইল। গল্পটায় ছিঁচকাঁদুনে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য মারফের একটা হিসেবি সত্তাকে দিয়ে অবুঝ কল্পনাপ্রবণ সত্তাটিকে ধমক ধামক দিয়েছেন। কিন্তু ফল হয় নি।

একসময় 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'গিরগিটি'—এসব গল্প নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। কারণটা ছিল যৌন প্রসঙ্গ। যৌনতা গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে হাজার-বার। খুব ভাল গল্পও হতে পারে সেগুলো। কিন্তু বাঙলা গল্পে দেখি ব্যাপারটা একটু ছুঁক ছুঁক করা কি বড়জোর একটু উঁকিঝুকি পর্যন্ত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গায়ে একসময়ে যৌনতার একটা লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এ গল্পগুলোতে নারীর শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ভোজ্য বস্তুর উল্লেখ, ব্লাউজ খোলা-পরা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গৃহবধূর ঘুরে ফিরে নিজের শরীর দেখা, বড়জোর কুষ্ঠরোগীর আত্মহত্যা করার সময় প্রেমিকার স্তন যোনি উরু সমেত ছবি এঁকে পাশে নিয়ে শোয়া—অথচ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্বন্ধে কমলকুমার মজুমদার লিখে ফেলেছিলেন 'লেখক ছোট গল্পে দক্ষ, জৈব-চেতন গল্প লিখিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে মানুষ আহার নিদ্রা মৈথুনশীল বলিয়াই তাঁহার সকল ক্ষেত্রে মনে হইয়াছে।'

এবং বহু সময় মনে হয়েছে যে, এই লেবেলটাকে সত্য প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিকভাবে যৌন প্রসঙ্গে উঁকিঝুঁকি চলে আসে। তাঁর গল্পের খালপোলের চিত্রকর উলঙ্গ নরনারীর ছবি এঁকে চাঞ্চল্য তৈরি করে ছবি বিক্রির বাজার পেয়েছিল। গল্পটা বাঙলা সাহিত্যের বাজারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বোধহয়।

'ট্যাক্সিওয়ালা' বা 'গিরগিটি' গল্প হিসাবে দুর্বল। যৌনতা আছে বলে নয়, গল্পগুলোর নিজস্ব লজিকেই অনেক গণ্ডগোল আছে বলে।

অথচ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীই তো লিখেছেন 'ভাত' গল্পটা—তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা দেখিনি কোথাও। 'কেষ্টনগরের পুতুল' গল্পটা শ্রেষ্ঠ গল্পে জায়গা পায় নি। 'সমুদ্র', 'তিন বুড়ি'ও তো শক্তিমান লেখা। ভাত গল্পে ছেলে চাকরির ধান্দায় সকালে বেরিয়েছে, বাবা দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ছেলের ভাত পাহারা দিয়ে বসে আছেন। রাত্তির বারটা প্রায় বাজে। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। বাড়িতে একটাও পয়সা নেই। ছেলের ভাত, ডাল শুকোচ্ছে, আরশোলার হাত থেকে ঢেকে রাখছেন, দেখছেন ডালের লঙ্কাটা পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ডালটা খারাপ হয়ে গেছে কিনা দেখতে একটু চুমুক দিয়েছেন। খিদে বেড়ে গেছে। অনেক পরে হতাশ ছেলে বাড়ি ঢুকেছে। বাবা পেটের অসুখের দোহাই দিয়ে খেতে চাইল না। ছেলে বাবার কথা ঠিক বিশ্বাস করে না। খোকা শেষ পর্যন্ত খেতে বসে।

'আমি সব ভাত খাব না, বাবা

কেন, ভাত কি এখানে খুব বেশি—তবে কি ফেলে দিবি !

কেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কৈলাসবাবু।

তুমিও দুটো খাও, ডালটা দিয়ে খাও—আমি ডাল খাব না—ওই আলুকুমড়োর তরকারি আমার হয়ে যাবে।

কৈলাসবাবু হঠাৎ কথা বলেন না।

অর্ধেক ভাত ডালের বাটিতে তুলে দিয়ে খোকা বাটিটা বাবার সামনে বাড়িয়ে দিল। আর দুজনের খাওয়ার মাঝপথে আলোটা দপ্ করে নিবে গেল।'

এ গল্পের লেখককে কোনো লেবেল আঁটাটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত—বোঝা শক্ত নয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের সম্মোহিত-আচ্ছন্ন করার ক্ষমতা পাঠকমাত্রেই জানবেন। সেটা বুঝি আসে তাঁর গল্পবলার ভঙ্গিমার প্রত্যক্ষতা থেকে। পাঠককে তিনি সহজেই কনফিডেন্সে নিয়ে নেন। ছোট ছোট সরল বাক্য ব্যবহার করতে করতে এগোন একটু হাল্কা চালেই, প্রয়োজনে বড জটিল বাক্যের বিস্তারকে কাজে লাগান। সংলাপে দুর্বলতা থাকলেও, বর্ণনায় প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশ ফোটে। মনে হয় যেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এমন সব ক্ষমতার ব্যবহার এদেশের একালের বাজারি পাকেচক্রে ঠিকমত ঘটে ওঠে নি।

আশীষ মজুমদার

চলচ্চিত্র বিষয়ে দুটি পত্রিকা

দৃশ্য। সিনে ক্লাব অব নৈহাটির মুখপত্র। ২৩ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। প্রকাশন উপ-সমিতি: সত্যজিৎ চৌধুরী, বীরেন্দ্র দাশশর্মা, বোম্মানা বিশ্বনাথম্, অতনু চট্টোপাধ্যায়। দাম দেড় টাকা।

চলচ্চিত্রের ভাষা। ভারতী পরিষদ বার্ষিকী ১৩৮৬। সম্পাদক। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দাম পাঁচ টাকা

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত চলচ্চিত্র-বিষয়ক দুটি পত্রিকা হাতে পেয়ে বেশ ভালো লাগল। সিনে ক্লাব অব নৈহাটির মুখপত্রটি তো দেখা যাচ্ছে অনেক দিন হলই বের হচ্ছে। এ সংখ্যার সূচিপত্র দেখে মনে হয়, পত্রিকাটিতে

দেশী এবং বিদেশী চলচ্চিত্র, তার সামাজিক, বাণিজ্যিক ও নান্দনিক নানা দিক অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। একটি সংখ্যাতেই পত্রিকাটির মান এবং সিরিয়সনেসে খুব আশাবাদী হতে হয়। 'চলচ্চিত্র বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব'-এ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মনস্তত্ত্ব' বিষয়ে বীরেন্দ্র দাশশর্মা, 'চলচ্চিত্র ও অপসংস্কৃতি' বিষয়ে নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, চ্যাপলিন সম্পর্কে গণেশ চট্টোপাধ্যায়—এই হল প্রধান লেখকদের নাম। তবে সংখ্যাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল শ্যাম বেনেগাল-এর চলচ্চিত্র 'জুনুন' সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা দুটি প্রবন্ধ: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ চৌধুরী-র। পার্থপ্রতিমবাবু বলতে চান সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'র মতো 'জুনুন'-ও পরিচালকের অভ্রান্ত ইতিহাস বোধেরই প্রমাণ। কিন্তু সত্যজিৎবাবু তীব্র ভাষায় শ্যাম বেনেগালের ইতিহাসবোধের বিচ্যুতির কথাই বলেছেন। দুটি লেখাই প্রায় সমান উপভোগ্য। নানা বাধাবিপত্তি এড়িয়ে সিনে ক্লাব অব নৈহাটি এবং তার মুখপত্রটির জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ থাকুক এই প্রার্থনা করি।

উত্তর কলকাতার 'নিঃশুল্ক পাঠাগার সহ সাধারণ গ্রন্থাগার' ভারতী পরিষদ প্রতি বছর তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় একটি করে পত্রিকা বের করেন। কোনো একটি বিষয়ের উপর খুব মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধ ও বিভিন্ন তথ্য সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় এই বার্ষিকীতে। গত বছর তাঁরা বের করেছিলেন 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ'। 'পরিচয়'-এ তার সমালোচনাও বেরিয়েছিল। এবারের বিষয়: 'চলচ্চিত্রের ভাষা'। দু-বছরের এই বিষয়-নির্বাচন একটু আকস্মিক লাগে—কিন্তু 'সূচনা'য় সম্পাদক লিখেছেন, 'সাহিত্য-সমালোচনার মতো চলচ্চিত্র-সমালোচনারও আছে নিজস্ব পরিভাষা। অ আ ক খ না শিখে সাহিত্য পড়া যায় না, পরিভাষা না জেনে সমালোচনার রীতিনীতি ধরা যায় না। চলচ্চিত্রের বেলাও তাই। চোখ থাকলেই দেখা যায় না।' অর্থাৎ চলচ্চিত্র-সমালোচনার নিজস্ব পরিভাষা বা চলচ্চিত্র দেখার এই অ-আ-ক-খ বিশেষজ্ঞদের কাছে নয়, সাধারণ শিক্ষিত দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই সংকলনের লক্ষ্য। স্বভাবতই বেশ কটি প্রবন্ধ বিদেশী লেখকদের বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধের অনুবাদ—তার মধ্যে পুদভ্‌কিন বা আইজেনস্টাইনও আছেন। সম্পাদনা, মন্তাজ, ক্যামেরার কলাকৌশল, তাছাড়া সিনেমার নানা টেকনিক্যাল পরিভাষা নিয়ে

আলোচনা, কখনও-কখনও রেখাচিত্র সহ, সংকলনটিকে খুব মূল্যবান করে তুলেছে।' সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের এই সংকলনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক লেখাও সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্টে দুটি তথ্যমূলক কাজ—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিনেমা চর্চা : একটি বই-এর তালিকা' এবং স্বপন সোমের 'চলচ্চিত্র : গ্রন্থপঞ্জী'—এঁদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে খুবই মানানসই। ভারতী পরিষদকে ধন্যবাদ এই সংকলনটি জন্য।

'অপসংস্কৃতি'

ক্যাম্পাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র। বার্ষিক সংখ্যা ১৯৭৯। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : সাইফুদ্দিন চৌধুরী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের বার্ষিক সংখ্যা 'একতা-'র প্রকাশ বহুদিন ধরেই বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জগতে রীতিমতো একটা ঘটনা হিসেবে গণ্য হত। এই পত্রিকায় প্রথম গল্প লিখে যিনি সকলকে সচকিত করতেন, দেখা যেত তিনিই পরবর্তীকালে বাংলা দেশের সবচেয়ে দুঃসাহসী লেখক। বাংলা কবিতার প্রগতির ও পরীক্ষার একটা আঁচ পাওয়া যেত এখানেই। দীর্ঘ, পরিশ্রমী, বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরেও আলোচিত হত। তা ছাড়া লেখাগুলির পরিবেশনায়, সম্পাদনায়, যাকে বলে ছাপা-বাঁধাই তাতে এমন একটা কুশলতা ও রুচির ছাপ থাকত, যা নিয়ে গর্ব করা চলত।

হঠাৎ ১৯৭৯-র বার্ষিক সংখ্যা হাতে পড়তেই চমক লাগল। শুধু পত্রিকার নামটাই পালটায় নি, ইতিমধ্যে অনেক দূর জল গড়িয়েছে বোঝা গেল। অর্থাৎ রুচিহীনতা ও অসচেতনতার প্রদর্শনী শুধু 'একতা'-র বদলে 'ক্যাম্পাসে'ই নয়, এই পত্রিকার লেখায়-ছাপায় সর্বাঙ্গে—মনে হয় যেন একটা যুগের বদল হয়ে গেছে। প্রথমেই আখ্যাপত্রটির হরফ-বিন্যাস মনে করিয়ে দেবে যাত্রার কোনো লিফ্‌লেট, তারপর মুখ্যমন্ত্রী, উপাচার্য প্রভৃতির পাতাজোড়া আশীর্বাণী, ছবিসহ, যা কেবল পাড়ার সরস্বতী পুজোর স্যুভেনিরেই মানায়, তারও পর পাতার পর পাতায় বিজ্ঞাপনের ধাঁচে নানা রকম বাণী, আশুতোষ বিদ্যাসাগর স্ট্যালিন রবীন্দ্রনাথ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ছবি, যার ছাপা ও নির্বাচন বাংলা পঞ্জিকাকেও লজ্জা দেবে।

কবিতাগুলি অধিকাংশই নিকৃষ্ট পদ্য। অথচ বাংলাদেশের নামী তরুণ কবিরা একদা 'একতা'তেই লিখতেন। আজ কি তাঁরা কেউই আর

য়ুনিভার্সিটিতে পড়েন না? গল্পগুলিও অধিকাংশই অখ্যাত পত্রিকাতেও ছাপার অযোগ্য। প্রবন্ধগুলির গড় আয়তন ৩-৪ পৃষ্ঠা, বিষয়বস্তু শিরোনামে প্রকাশ্য, যথা 'শিক্ষা একটি অধিকার, কোনো বিশেষ সুবিধা নয়', 'জনগণ রাষ্ট্রকে শিক্ষা দেবেন কি?' 'নিরক্ষরতা কেন?' ইত্যাদি, মতামত সর্বত্রই চবিত-চর্বণ বুলিসর্বস্ব, স্কুল-ম্যাগাজিনের ওপরে আর ওঠে না। ইংরেজি বিভাগ আরো অনাদৃত, সমানই খাপছাড়া ও বালভাষিত।

প্রশ্ন জাগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সংখ্যার এই বিস্ময়কর মানাবনয়ন কি আকস্মিক, কোনো দলীয় অযোগ্যতার সাক্ষ্য, না কি আমাদের সৃজনশীলতা ও মননচর্চায় ক্ষয়েরই ইঙ্গিত? বাইরের জগতে তা তো মনে হয় না—তরুণ বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিকের কি কোনো অর্থেই ঘাটতি পড়েছে? শুধু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্লোগান আওড়ালেই তো হয় না, নিজেদের চিন্তায় ও কর্মে তাকে প্রয়োগ করতে হয়।

দেবমিত্র বসু

প্রাকৃতজনের উদ্ধারের শকট

মৃচ্ছকটিক। বহুরূপী। নির্দেশনা ঃ কুমার রায়। একাডেমি মঞ্চ।

প্রাকৃতজনের উদ্ধারের শকট-ই বলব। হাজার বছরের পথ উৎরে এসেছে। বালক রোহসেনের খেলার মৃৎ-শকট, এই প্রাচীন সংস্কৃত প্রকরণ নাট্যে, প্রতীকী ব্যঞ্জনা পায়।

মঞ্চে হট্‌-হট্‌ করে আরও আভাসিক শকট চলেছে—একখণ্ড কাপড়ের ওপর মস্ত একটা চাকার ছাপই যথেষ্ট—সেই সব রথের গন্তব্যের লক্ষ্যও ছিল নিতান্ত দুর্নিবার্য।

দুবারই রথ পৌঁছে যায়, আপাতভাবে গর-ঠিকানায়। একবার শ্রেষ্ঠী চারু দত্তের রথ, যা অপেক্ষমান ছিল প্রণয়িনী নগরনটীকে নিয়ে আসতে মিলনের কুঞ্জে, তা কারাগার-ভাঙা বিদ্রোহী আর্যক-কে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে নগরীর বাইরে। আর, কিছুই না জেনে, রাষ্ট্রীয় শ্যালক শকারের রথে উঠে বসন্ত সেনাকে সেই ক্লীব নিপীড়কেরই কবলে পড়তে হয়।

নাটক যে জমে ওঠে তা মাত্র এই দুটি কাকতালীয় ভুলের খেসারত গুণতে নয়। নাটকের মূলেই ব্যক্তিক-রাষ্ট্রিক ভাগ্য প্রায় পরস্পর জড়িত হয়ে চূড়ান্ত মুহূর্তের অপেক্ষা করে। এবং পরিণতি যখন আসে, তখন তা ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনের জটগুলি উপড়ে ফেলে এক নতুন ব্যবস্থার উদয় ঘটায়।

শূদ্রক-এর কাল কেমনতর, কে তিনি, বা আদপেই অমন কেউ ছিলেন কিনা,—প্রাচীনতম সংস্কৃত নাট্যকার মহাকবি ভাস-এর 'দরিদ্র চারুদত্ত'-ই কি হাত বদলে শূদ্রক-এর 'মৃচ্ছকটিক', এ নিয়ে পণ্ডিতরা মতান্তর করুন—কিন্তু আমাদের কালে শূদ্রক যে বাংলা নাট্যের মুক্তিতে বাস্তবিক এক নতুনতর মাত্রা যোগ করে দিতে আসেন, বহুরূপীর পরিশীলিত প্রযোজনার গুণে ও সমকালীনতার প্রতি তাঁদের দায়বোধের সচেতনতায়—এটা নিশ্চিতই আমাদের নবনাট্যের লাভের কড়ি বাড়ায়।

চিরায়তের পুনর্বিন্যাস সমসাময়িকের প্রাসঙ্গিকতায় বাস্তবতার সৎ ও গভীর উপলব্ধিতে এতটাই সহায়ক। বহুরূপী-র মতো নাট্যসংস্থা এই নাটক নির্বাচন ও সময়োচিত মঞ্চায়ন করে আরও একবার তাকেই নিঃসংশয়িত করলেন।

প্রস্তাবকের প্রতিবেদন ও সূত্রধারের উপস্থাপনা তো নাটকের মুখপাতে। তবু, শুরুর থেকেই আমরা হয়তো খানিকটা ইঙ্গিতার্থ ধরতে পারি সূত্রধার-নটী সংবাদে। তবে আমাদের চোখ-কান ততক্ষণে চলে গেছে মঞ্চের ওপর শিল্পিত দৃশ্য-সংস্থাপনে। কামদেবের মন্দিরে নৃত্যরতা নটীর পূজার আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গিতে, যেখানে দর্শনার্থীদের মধ্যে অন্যতম সুপুরুষ, সুভদ্র চারু-দত্ত। লাবণ্যশালিনী বসন্তসেনা যার দৃষ্টির একান্ত অনুগামিনী। আমরা জেনে যাই এখানে এক অসাধারণ প্রেমের সঞ্চার ঘটেছে। এ প্রেম বর্ণভেদ-ভিত্তিক সমাজের অনুশাসনে বাঁধা পড়ে না, কেননা নায়ক বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বিবাহিত, সন্তানের পিতা, পেশায় একদাসম্পন্ন বণিক, আপাতত দানধ্যানে নিঃস্ব হলেও একজন আদর্শবান সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন নগর-অভিজাত এবং নায়িকা উজ্জয়িনীর নটীশ্রেষ্ঠা হয়েও পেশাগতভাবে নিছক রূপোপজীবিনী গণিকা, সমাজ পতিতা। তবু, নর-নারীর সম্পর্কের জোরটা যেখানে নিঃশর্ত প্রেমের, সেখানে তা পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্বকে কি অন্যতর মূল্যে অন্বিত করে না?

এই নাটকে, একটু পরেই, আমরা অনুরূপ আর-একটি প্রেম কাহিনীও পেয়ে যাই। এখানেও প্রেমিক একজন ব্রাহ্মণ যুবক (শর্বিলক) ও তার প্রেমিকা নিতান্ত দাসনারী (মদনিকা), যার মুক্তিপণ সংগ্রহের উপায়ান্তরে এক চুরির ব্যাপারে দায়ী ঐ যুবক যে আরও একটি বৃহৎ মুক্তির আয়োজনেও ব্যাপৃত, তা আমরা দেখি। নাটকের তৃতীয় কাহিনীটি রাষ্ট্রনৈতিক—আর্যক-পালক বৃত্তান্ত। মূলে এই তিন কাহিনীই অঙ্গাঙ্গী।

এ নাটকে সংঘাতটা চারিয়ে থাকে তাই নানান স্তরে। ব্যক্তিক-রাষ্ট্রিক টানাপোড়েন ওতপ্রোত স্বৈরাচারী রাজশাসনের উৎখাত ঘটায় গণতান্ত্রিক জনবিদ্রোহ। এক মহাপুরুষ জাতিফুলের গন্ধ বিতরণ করছিলেন। নিম্ন-বর্গীয় আর্যকের নেতৃত্বে রাষ্ট্রবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতার কথাটাই তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেলেন মাত্র! সেই গন্ধযুক্ত একটি অঙ্গাবরণ একদিন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ মৈত্রেয়ের মারফৎ চারু দত্তের কাছেও পৌছেছিল, তার মোট তাৎপর্য চারু-দত্ত ও আমরা, এই নাট্যের দর্শকরা, তৎক্ষণাৎ না বুঝলেও, বুঝে নিই যে

মুহূর্তে সাক্ষাৎ পলাতক আর্যক-কে, তিনি ও আমরা, মঞ্চে পেয়ে যাই। বিদ্রোহীর এক পায়ে তখনও একটি কড়ায় বাঁধা ভাঙা শেকল, ঝন্ ঝন্ করছে।

২.

সংস্কৃত নাট্যের বহুলপ্রচল রাজকাহিনী এ প্রকরণ-নাট্যের অবলম্বন নয়। যা আছে তা উজ্জয়িনীর নগরজীবনেও জনকাহিনী। যেমন আছে প্রেম-ভালবাসা, বন্ধুত্বের আনুগত্য, তেমনি প্রশাসনিক নৈরাজ্য, দুর্নীতি, শঠতা, নীচতা, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার, গণিকা, জুয়াড়ি, ধূর্ত, অপহারক, চেট, বিট ইত্যাকার। একেবারে একটি অবক্ষয়ী নাগরিকতা, যা সামাজিক সম্পর্ক-গুলির বদল ও সমাজবিপ্লবেরই চাহিদা তৈরি করেছে, সামাজিক বিপ্লবই তলে তলে রাষ্ট্রবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করলে। আবার নতুন নির্বাচিত রাজা-দেশেই পাকা হল সামাজিক কাঠামোরও একটা সংস্কার ব্যবস্থা। নগরনটী বর্ণশ্রেষ্ঠের বধূর মর্যাদা পেল। রাজদ্রোহী নিম্নবর্গীয় আর্যকের পক্ষে অধিকাংশ নিঃস্ব, বঞ্চিত, অবহেলিতদের সাহসিক সমাবেশ ঘটল, যতক্ষণ না জয় তাদের করায়ত্ত হয়েছে। সে বিদ্রোহের শরিক তখন এমনকি রাজ-সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে-আসা অনেকেই।

শূদ্রের বা গণের অভ্যুত্থানেই উৎপীড়িত দুঃস্থ সমাজ আবার তার স্বাস্থ্য ও ভারসাম্য ফিরে পেল। শূদ্রক তাঁর নামের মাহাত্ম্যে এই নাট্যে কি তারই অসাধারণ শিল্পরূপ রচনা করতে চেয়েছিলেন, সহস্রাব্দ পার হয়েও আজকের ভারতীয় সমাজেও যার প্রাসঙ্গিকতা জরুরি হয়ে থাকে! জুয়ায় হেরে ও জুয়াড়িদের হাতে নিগৃহীত হয়ে অনন্যোপায় যে তরুণটি শ্রমণ হয়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দেয় ও পরে মুমূর্ষু বসন্তসেনাকে বাঁচিয়ে তুলে ঘটনার মোড় ঘোরাতে সাহায্য করে, সেও কী উচ্চবর্গীয় রক্ষণশীল সমাজে বৌদ্ধ-প্রতিবাদের ও সামাজিক ন্যায়ের পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করেছে?

অবশ্য, এ সবই আমার অনুমান। নাটক দেখতে দেখতে আমরা জেনে যাই যে, সেকালীন উজ্জয়িনী রাজ্যের রাজা নামত পালক হলেও কার্যত সংহারক। আর, সেই সুবাদে রাষ্ট্রীয় শ্যালকটি, শকার (সংস্থানক) তো এক মূর্তিমান উপদ্রব বিশেষ—লালসাতুর, শঠ, হীন আত্মচরিতার্থতায়, এমনকি হত্যাকাণ্ডে, এবং তার শাস্তি এড়াতে অপরকে শূলে চড়াতেও

পরাঙ্মুখ নয়। শকারকে একজন খলনায়ক বললে খুব কম করে বলা হয়। সে তার পার্শ্বচর মোহমুক্ত পণ্ডিত বিটের ভাষায় ঠিকই, পশুর নব অবতার বৈ কিছু নয়। জনসমাজে এই স্বেচ্ছাচারী অপগণ্ড একাধারে উপহসিত ও ঘৃণার পাত্র।

নাটকে বিচারশালার পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্যটি ও ন্যায়াধীশের ভ্রান্তি শুধু যে ব্যবহারদুষ্টতার পরিচায়ক তাই-ই নয়, স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজশক্তি বিচার-ব্যবস্থাকেও যে কি পরিমাণে নিজের কার্যোদ্ধারে লাগাতে পারে, তারও জাজ্বল্য সাক্ষ্য হয়ে থাকে। নাটকে আগাগোড়া এক ভাগ্য-বিপর্যয়ের যোগসূত্র হিসেবে প্রদত্ত, অপহৃত ও প্রত্যাহৃত সেই বসন্তসেনার স্বর্ণালঙ্কার। আধুনিকের চোখে, তা-ও কি সমাজের 'ক্যাশ-নেক্সাস'-এর প্রতি এক প্রাচীন কবির কটাক্ষ?

৩.

মৃচ্ছকটিকের সমাজ তো ছিল প্রাচীন ভারতের। কিন্তু, একেবারে এই আজকের আধুনিকের মৃচ্ছকটিক যখন নামাতে হয়, তখন নির্দেশকের যে দায়িত্ববহন করতে হয়, তা মোটেই লঘুভার নয়। সে কাজ অনেকটাই যেন রঙ্গমঞ্চে একটি প্রাচীন মৌলিক সৃষ্টির পুনঃসৃষ্টির, অর্থাৎ আধুনিকের নাট্যপ্রকরণে মূলের অনুবাদের কাজ। তাতে নাট্যটি শুধু সুঅভিনীত হলেই চলবে না, অভিনেতব্য বিষয়ের, পাত্রপাত্রী ও তৎকালিক পরিবেশের দূরত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতাও হাজির করতে হবে।

এই সমস্যার সমাধানে বহুরূপীর তিন-দশকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কিংবদন্তিপ্রতিম সাফল্য, আধুনিকের নাট্যপ্রয়োগ ও অভিনয়কলায় যিনি স্বয়ং-ই এক প্রতিষ্ঠান, সেই শম্ভু মিত্রের অসামান্যতা তো সামনে থাকেই। বিশ্বনাট্যের ক্লাসিক ঐশ্বর্য, একে-একে রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, সফোক্লেস তো আমরা পেয়ে যাই তাঁর কাছে, তদুপরি বহুরূপীর এক স্বতন্ত্র নাট্য-ঘরানাই। বহুরূপীর সেই ধারাটিরই পুষ্টি সাধিত হয় সংস্কৃত ক্লাসিক-এ এসে, কুমার রায়ের নির্দেশ-নৈপুণ্যে। আন্তরিকতায় তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

রবীন্দ্রনাটকে যে ফর্মের মুক্তি চিরায়ত ও লৌকিকের যুগ্ম-সংকেতে, সেই 'রক্ত-করবী'র যুগ থেকেই বহুরূপী তাকে আধুনিকের নাট্যশৈলীর এক অর্জনে আনেন। আর এই আধুনিকের টেনশন যখন বস্তুন্তরিক,

তখন আমাদের ভারতীয় যুগ যুগব্যাপী ঐতিহ্যের সমকালীন মূল্যায়নে ও তার সঙ্গে সৃজনশীল যোগসাধনে অর্থাৎ নিজেদেরই বিকাশের প্রয়োজনে— টেকনিকের উত্তরাধিকারকেও খুঁজে নিতে হয়। সেই খোঁজটা থামে না, চলেই। সংস্কৃত নাট্যসিদ্ধির কাছে তখনই আমাদের পাওনা বেড়ে যায়।

সন্দেহ কি, মঞ্চে চারুদত্তের যে মার্জিত চরিত্র গড়ে তোলেন শ্রীরায় স্নিগ্ধ কিন্তু ঋজু মর্যাদাময় অভিনয়ে, অভিব্যক্তিক ও বাচনিক বিশিষ্টতায়— যা আবার বহুরূপীরই বিশিষ্টতা তা একই সঙ্গে প্রেমিক ও দায়বদ্ধ সামাজিকের। সঙ্গে, সমগ্র বহুরূপী শিল্পীগোষ্ঠীই আবার, হয়তো কিয়ৎ-কালের শিথিলতা কাটিয়ে, অনুপ্রাণিত অভিনয়ের শরিক হন। অনসূয়া ঘোষের বসন্তসেনা অভিনয়কলা-নৃত্যকলাকে পরিপূরক করে তোলে। তাঁর নটী অনেক সময় মন্দির ভাস্কর্যের আঙিনা থেকে নেমে আবার তাতে ফিরে যেতে চায়। মঞ্চ-স্থাপত্য বাহুল্যহীনভাবে শিল্প-ও দৃষ্টিশোভন, প্রাচীন ভারতের নগর-পরিকল্পনার অনুষঙ্গে। প্রধান চরিত্রগুলির বেশভূষা হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের স্মারক। মঞ্চের আয়তনের (স্পেস) ব্যবহারে অসামান্য কুশলতা ও দৃশ্যগুলির গতিশীলতা, ঘুরন্ত মঞ্চে না হয়েও, লক্ষণীয়। প্রায় প্রতিটি দৃশ্য সংস্থাপনেই সেই পরিমিতির বোধ মঞ্চ স্থাপত্য, ছন্দ ও অভিনয়ে, যা একটি নান্দনিক তৃপ্তি আমাদের দান করে।

অভিনয় ও চরিত্রানুগতায় তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'মৈত্রেয়', কালীপদ ঘোষের 'বিচারক', নমিতা মজুমদারের 'মদনিকা', সৌমিত্র বসুর 'শর্বিলক', রাণী মিত্রের 'রদনিকা', দেবতোষ ঘোষের পণ্ডিত (বিট), শান্তি দাসের 'আর্যক' এবং সামগ্রিকভাবে বহুরূপীর দলগত অভিনয় এই নাটককে গতিবান ও মূর্ত করেছে। আলাদা আলাদাভাবে বলতে গেলে কয়েকটি দৃশ্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণ তো নিছক চিত্রকল্প। কলাকুশলীরা উৎপল নায়েক (মঞ্চ নির্মাণ), দিলীপ ঘোষ (আলো), দীনেশচন্দ্র চন্দ্র (সঙ্গীত), শক্তি সেন (রূপসজ্জা) প্রমুখ সুষমভাবে নাট্য-নির্দেশকের সামূহিক ছকটির বিন্যাসে সার্থকতা এনে দিয়েছেন।

এই প্রযোজনা মূল সংস্কৃত থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ-অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাছে আসে। মঞ্চে অভিনয়ের সমস্ত ইলিউশনিটি তৈরি করে, আবার সেটি ভেঙে-দেওয়া—কেননা বাস্তবতার সত্যেই দর্শকদের তখন পৌঁছে দিতে হবে, আদত রিয়ালিটিতে, বহুরূপী এই নাটকে নাট্য-শৈলীর সেই শর্তটি পূরণ করেন। অভিনেতারা নাটকের অভিনয়ই করে

দেখাচ্ছেন মাত্র। অভিনয়ের নিরপেক্ষতা ও দূরত্বরচনা, তাতে দর্শকরা অভিনীত বিষয়ের ও সেই সঙ্গে তাঁদের সমকালের বাস্তবতার বোধে উপনীত হতে পারেন। এই রীতিতে প্রতীচ্যের থিয়েটার ফর্ম ব্রেখ্‌টকে ভেঙে দিয়ে দেখাতে হয়েছিল। আমাদের প্রাচ্যের নাট্যরীতিতে—বিশেষ প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যে যে সূত্রধারের উপস্থাপনা ও উপসংহারে স্বস্তিবাচনের প্রচল রয়েছে, তাও কি, এদিক থেকে, আমাদের ক্লাসিক নাট্য ঐতিহ্যের শিক্ষানুসারী ইঙ্গিত নয়?

তাই, নাটকের শুরুতেই যে সূত্রধার-নটী সংবাদে আমরা 'সুন্দর পতিলাভ ব্রত'র কথা শুনেছিলাম, নাটকের স্বস্তিবাচনে আমরা যেন তার অন্তর্লীন তাৎপর্যেই পৌঁছই। নাট্য-নির্দেশক এখানে ভরতবাক্যের চিরা-চরিত প্রথা না নিয়ে এমন এক মৌলিক প্রয়োগের আশ্রয় নিলেন যা আমাদের চমৎকৃত করলে। আমাদেরই কালের সার্থকতার অন্বেষায় কবি বিষ্ণু দে-র সেই পঙক্তি: 'তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই, সত্তা নেই / লাল নীল কমলের দেশে আজ বর নেই / বিধবার দেশে অরক্ষণীয়া সুন্দরীর বর নেই / সত্তা নেই…', সত্তার সার্থকতার খোঁজে এই তীব্র আর্তিই উচ্চারিত হল নাটকের যবনিকা পাতে।

'মৃচ্ছকটিক'-এ শুনি প্রক্ষিপ্ত অংশের বাহুল্য। শতকের পর শতক প্রযোজনায় এ তার প্রাণবন্ততাকেই প্রামাণ্য করেছে। উপসংহারে স্বস্তি-বাক্যের হেরফেরে বহুরূপীও তাই করলেন। বাংলা নাটকের স্বাবলম্বী হবার দিনে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকের মূল্যায়ন ও প্রাণবান সাযুজ্য প্রয়াসে নিশ্চিতই অত্যুক্তি করলেন না।

সিদ্ধেশ্বর সেন

পথের পাঁচালীর পঁচিশ বছরে

পথের পাঁচালীর জন্ম আর বাংলা চলচ্চিত্রের উপনয়ন, দুটো একই দিনের ঘটনা। এই ১৯৮০-তে, আজ, আমরা যারা চল্লিশের কোঠায়, এবং যাদের লম্বা ছায়া ইতিমধ্যেই গড়িয়ে গেছে পঞ্চাশের কোঠার দিকে, তারা গর্বিত, আনন্দিত এবং স্মৃতিমুখর এই কারণে যে, ঐ দুটি স্মরণীয় ঘটনায় তারা ছিল অভিভূত প্রত্যক্ষদর্শী। অত্যন্ত নীরবে, লোকচক্ষুর অগোচরে, এবং কোনো রকম স্বর্গীয় শঙ্খধ্বনি ছাড়াই, ১৯৫৫-য় যেদিন ভূমিষ্ঠ হল পথের পাঁচালী, সেই দিনই বালক-বয়সী বাংলা-চলচ্চিত্রের গলায় উপবীত পরিয়ে তাকে অভিষিক্ত করা হল ব্রাহ্মণের মর্যাদায়। সেই দিনই তার নবজন্ম, তার দ্বিজত্বলাভ। একই দিনে রচিত হল দুটি ইতিহাস। আর পথের পাঁচালীর আঁতুড়ঘর হিসেবে কলকাতা অথবা ধাইমা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতি রাতারাতি পৌঁছে গেল পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায়। পৃথিবীর শিল্পরসিকেরা তাঁদের নোটবুকে সম্মানিত চিত্র-পরিচালকদের নামের তালিকায় লিখে নিলেন আর-একটি নতুন নাম—সত্যজিৎ রায়।

সেই উদ্বেলিত সময়কে এখনো আমাদের সুস্পষ্ট মনে পড়ে। তখন আমাদের সদ্য-যৌবন। তখন সাহিত্যে, শিল্পে, সংস্কৃতির সমস্ত নদী-শাখা-নদীতে, এমন-কি রাজনীতিতেও এক উপচে-পড়া ভরা জোয়ার। তখন প্রতিদিনই মন্দ্রিত হয়ে চলেছি দিনবদলের এক দুরন্ত দামামাধ্বনির ভিতর। তখন গল্প, কবিতা, নাচ, নাটক, মিটিং, মিছিল, গুলি, টিয়ারগ্যাস, অবরোধ-প্রতিরোধ সব কিছুই মাতৃস্তনের মতো আমাদের মুখে জুগিয়ে যাচ্ছে এক বলশালী পথ্য। তখন আমাদের চোখে মুখে চুলে চিবুকে এক অবশ্যম্ভাবী স্বপ্নের ঘোর। তখনও সংকট-সংঘর্ষ, বাদ-প্রতিবাদ, পক্ষ-প্রতিপক্ষ ছিল। কিন্তু তখন ব্যর্থতার রঙ শুকনো পাতার মতো ধূসর ছিল না। তখন হতাশা টেনে নিয়ে যেত না আত্মবিক্রয়ের দিকে। অবিশ্বাস জোগাত আরো

গভীর অন্বেষণের আত্মদহন। তখন মতান্তরের ভিতরে ঢুকে পড়ে নি সাপের ছোবল অথবা পাইপগান। তখন আমাদের চলা-হাঁটার সমস্ত পথগুলোই ছিল মানবিকতায় ঠাসা। কলকাতা তখন এক একান্নবর্তী পরিবার যেন।

সেই সময়ে আমাদের সব ছিল। দেখার নাটক, শোনার গান, উদাত্ত আবৃত্তির কবিতা, আলোড়িত হওয়ার গল্প-উপন্যাস, বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবন্ধ, রাতের পর রাত জাগার সম্মেলন, দিনভর দৌড়বার মতো উৎসব—সবই ছিল আমাদের। ছিল না কেবল সুস্থ, সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র। ছিল না বলেই শুরু হয়ে গেছে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন। ছিল না বলেই প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে ক্ষুধার্ত কলকাতা তরমুজের সরবতের মতো গিলে নিলে এক চুমুকে। ছিল না বলেই আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠছিল প্রার্থনার মতো সোচ্চার।

এরই তিন বছর পরে পথের পাঁচালী। তারপর থেকেই চলচ্চিত্র হয়ে উঠল ভদ্র সমাজের আলোচ্য। হয়ে উঠল সংস্কৃতিবানদের প্রবল তর্কের অন্যতম বিষয়। চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ অনিবার্য হয়ে উঠল সাহিত্যের পত্র-পত্রিকায়। সম্ভব হয়ে উঠল শুধুমাত্র চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকারও। আর আমরা পেয়ে গেলাম আজীবন মুগ্ধ হয়ে থাকার এক চিত্র-প্রতিমা। কিন্তু কোন্ মায়ায় মুগ্ধ করেছিল সে? সে কি কোনো তত্ত্বকথার জোরে? না। অভিনয়ের দাপটে? না। নামী চিত্রতারকার নয়ন-লোভন সমাবেশে? না। সংলাপের তুখোড় চাতুর্যে? না। জীবনের আকাড়া সমস্যাকে ছুরিকাঘাতের মতো নির্মমতায় ফুটিয়ে তুলে? না। তাহলে কিসের জোরে?

হুইটম্যান তাঁর 'লীভস অব গ্র্যাস' সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন:

Camerado, this is no book
who touches it, touches a man

ঠিক সেই রকমই ঘটেছিল পথের পাঁচালীর বেলায়। পথের পাঁচালীকে আমাদের মনে হয়েছিল চলচ্চিত্র নয়, জীবন। পথের পাঁচালীকে ছুঁয়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম নিশ্বাস-প্রশ্বাসময় মানুষের বাঁচা-মরা, হাসি-কান্নার কাছাকাছি। জীবন ঠিক যে-রকম, ধুলোবালি এবং মেঘরৌদ্র এবং জন্মমৃত্যু, এবং সুখ-শোকসহ, তেমনি ভাবেই তাকে চোখের আলোয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা হয়ে গেল আমাদের।

তখন আমাদের সন্ত-যৌবন। একটি নারীর জন্যে যা ছিল আমাদের

পক্ষে স্বাভাবিক, তার চেয়ে অনেক বেশি আবেগ দিয়ে আমরা পথের পাঁচালীর জন্যে জোগাড় করেছিলাম ছুঁচ, সুতো এবং টাটকা ফুল।

২

সেই পথের পাঁচালীর এখন ২৫ বছর। সেই সব সমুজ্জ্বল দিনের স্মৃতিকে মনে এনে আজকের বাংলা চলচ্চিত্রের দিকে তাকানোর মুহূর্তে খানিকটা কালো মেঘ এবং ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের ভাবনার ভিতরে ঢুকে পড়তে চাইছে কেন? এখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে—পথের পাঁচালীর সেই বিদ্যুৎ-চকিত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বর্ষণের যে ব্যাপ্ত সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল, তা শুকিয়ে গেল কোন সর্বনাশা খরার দাপটে? অস্বীকার করে লাভ নেই, পথের পাঁচালীর প্রবল প্রেরণা থেকেই জেগে উঠেছিল একটা দমকা হাওয়া। ঋত্বিককুমার ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেনদের মতো প্রতিভাবান পরিচালকদের দ্রুত আগমন তারই অমোঘ প্রমাণ। কিন্তু অনতিবিলম্বেই সেটা হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রবিন্দুহীন, একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অঙ্গীকার মাত্র, সংঘবদ্ধ এবং স্থায়ী কোনো আন্দোলনের আবহ রচনা না করেই। সেই ট্রাডিশন এখনো চলেছে। প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে। এই সব প্রথিতযশা পরিচালকদের অনেকেই ছিলেন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের নেতৃপদে। এবং কেউ কেউ এখনো আছেন। তবুও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন বন্‌শাই-এর আদলে হয়ে রইল তিন ফুটের মহীরুহ। ঘটল না সেই প্রত্যাশিত দৃশ্য যেখানে অগ্রজদের উৎসাহে এবং নেতৃত্বে তরুণ পরিচালকেরা এগিয়ে আসতে পারছে সুনির্দিষ্ট অভিযানে, এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের যা-কিছু সমস্যা-সংকটে তাঁদেরই ভূমিকা হয়ে উঠছে সবচেয়ে সক্রিয় এবং সক্ষম।

পথের পাঁচালীর ২৫ বছরে আরও অসংখ্য প্রশ্ন এসে আছড়ে পড়তে চাইছে আমাদের ভাবনায়। এমনকি প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করছে, সহসা পথের পাঁচালীর ২৫ বছরটাই বা আমাদের মনে পড়ল কেন? এই মনোযোগ কি ফুঁড়ে উঠেছে কোনো সার্বিক সাংস্কৃতিক সচেতনতার বোধ থেকে? নাকি সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতির সমারোহ এবং চলচ্চিত্রের প্রতি আমাদের ভারসাম্যহীন অতিরিক্ত অনুরাগই এর উৎস। এটা ঠিকই যে চলচ্চিত্র তার নিজস্ব শিল্প-স্বভাবের গুণে অনেক সহজে খ্যাতির বিস্তীর্ণ সীমা তৈরি করে নিতে পারে। যে-কোনো মহৎ অথবা মূল্যবান সাহিত্যের

চেয়ে অনেক দ্রুতগামী তার বিশ্বভ্রমণ। অভ্যর্থনা, স্বীকৃতি, লাভালাভ অনেক বেশি আকস্মিক এবং অবিলম্বিত। কিন্তু আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক-কাঠামো কি শুধু কয়েকটি গৌরবান্বিত চলচ্চিত্রের ইট-কাঠ দিয়ে গড়া?

চলচ্চিত্রের দিগ্বিজয়ী-প্রতিভা এবং পথের পাঁচালীর অসামান্য কৃতিত্বের কথা মনে রেখেই আজ প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করছে—সংস্কৃতির অন্য সব কীর্তির দিকে পিঠ ঘুরিয়ে কেবল চলচ্চিত্রের দিকে এই যে উৎসুক ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গি, একে কি তারিফ করা উচিত স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ বলে? যদি সার্বিক সাংস্কৃতিক-সচেতনতা হয়ে থাকে এই স্মরণ-উদ্‌যাপনের উৎস, তাহলে অন্য আরো সব স্মরণীয় সৃষ্টির বেলায় তা আমাদের মনে পড়ল না কেন? কোনো একদিন 'নবান্ন'ও তো পা দিয়েছিল ২৫-এ। গণনাট্য সংঘ কিংবা বহুরূপীর মতো নাট্যসংস্থা, দেশের প্রগতি আন্দোলনে যাদের অবদান কিংবা আত্মদানের মূল্য পাহাড়-সমান উঁচু, তাদেরও তো ২৫ বছর পার হয়েছিল কোনো একটা সময়ে। আমার মনে আছে, নিজের গাঁটের পয়সায় পুরো পাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে বহুরূপী তার দেশবাসী এবং অনুরাগীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আজ তাঁদের ২৫ বছর। শুধু নাটক কেন, তাহলে ঐভাবে কবি-সাহিত্যিকদেরও সবচেয়ে স্মরণীয় কোনো রচনার ২৫ বছর আমাদের মনে পড়া উচিত ছিল। উচিত ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেদিন পুতুল নাচের ইতিকথা, জীবনানন্দের যেদিন বনলতা সেন, সুকান্তর যেদিন ছাড়পত্র, সতীনাথ ভাদুড়ীর যেদিন জাগরী অথবা ঢোঁড়াইচরিত মানস, এমনকি বিভূতিভূষণের যেদিন পথের পাঁচালী, সেই সব স্মরণীয় আবির্ভাবের দিনক্ষণগুলোকেও মনে রাখা। আমরা কি কখনো ভেবেছি গীতাঞ্জলি কিংবা গোরা-র ২৫ অথবা ৫০ বছর নিয়ে?

৩

এসব কাঁটা এবং যন্ত্রণাবহুল প্রশ্নোত্থাপন থাক। আমরা বরং আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখি শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের চৌহদ্দিতেই। বরং শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন নিয়েই তল্লাস করি যে, পথের পাঁচালী থেকে আমরা কি সত্যিই যথার্থ চলচ্চিত্র ভাবনার শিক্ষালাভ করেছি? তাহলে পথের পাঁচালীর ২৫ বছরের প্রাক্কালে এমন ছবি কি করে সম্ভব, যার সর্বাঙ্গে চিৎকৃত যাত্রা-থিয়েটারের আদল? পথের পাঁচালীর ২৫ বছর পরেও একজন লেখক কি করে সগর্বে উচ্চারণ করতে পারেন যে,

নির্বাচিত গল্পের অদল-বদল ঘটানো চিত্রপরিচালকের এক্তিয়ারের বাইরে। যে কাহিনীর অনেকাংশ তাঁর অপছন্দ, তেমন কাহিনী নির্বাচন না করে, তিনি তো নিজেই লিখে নিতে পারেন নিজের গল্প। তাঁরা সোল্লাসে ঘোষণা করেন—চলচ্চিত্র আদৌ কোনো স্বাবলম্বী শিল্পমাধ্যম নয়। আপাদমস্তক সাহিত্যাশ্রয়ী। সাহিত্য-নিরপেক্ষ চলচ্চিত্র অসম্ভব। পথের পাঁচালীর ২৫ বছর পরে, এই তো মাত্র কদিন আগে, 'ঘটশ্রাদ্ধ' দেখে একজন বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন করলেন—কেন এই ছবি দেখে আমরা অহেতুক কষ্ট পাব? এখন তো আর ঐ সমাজ-ব্যবস্থা নেই। পথের পাঁচালীর ২৫ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কতজন শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি এই বিস্ময়কর শিল্পমাধ্যমের দিকে এগিয়ে এসেছেন সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে?

হায়! পথের পাঁচালীর ২৫ বছর পরেও আজ আমরা কত সহজে আপ্লুত হয়ে যেতে পারি অতি-নাটকীয় সংলাপে, অবাস্তব মেকআপ এবং কৃত্রিম দৃশ্য রচনায়, অবক্ষয়ের গতানুগতিক উন্মোচনে, ছেলে ভুলনো বিপ্লবের বুলিতে, দৈন্যমথিত জীবন-রচনার ছবিতে, ছবি-রচনার দৈন্যদশায়।

বিদেশে অথবা বিশ্বে বাংলা অথবা ভারতীয় চলচ্চিত্রের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়াটাই পথের পাঁচালীর সমগ্র অথবা চরম সার্থকতা নয়। সত্যজিৎ রায়ের প্রধানতম কৃতিত্ব এই নয় যে, বিশ্বদরবারে তিনি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূত। পথের পাঁচালীর সাফল্য আরও গভীর। জীবনের ভাষা এবং চলচ্চিত্রের ভাষা এই দুটোকেই সে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল এক সহজ সাবলীলতায়। পথের পাঁচালী হয়ে উঠেছিল মানুষের জন্যে মানুষের বিষয় নিয়ে তৈরি এমন একটি ছবি যা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব।

এখন বইছে উল্টো হাওয়া। জনগণের জীবন অথবা সমস্যা নিয়ে হাল-আমলে কিছু ছবি তৈরি হচ্ছে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে মনে রেখে। আর কলকাতার হাতে গোনা কিছু বুদ্ধিজীবীর বাহবা পেলেই উদ্দেশ্যের যাবতীয় সিদ্ধি।

এখন বইছে নানান রকম হাওয়া। কোনো কোনো চতুর বুদ্ধিজীবী নিজেকে বিশেষ বিশেষ স্থানে সাংঘাতিক বামপন্থী সাজিয়ে এমন কথা বলতেও দ্বিধা করছেন না যে, যে-চলচ্চিত্র এই মুহূর্তের সমস্যা নিয়ে আলোড়িত নয়, তা ব্যর্থ।

চলচ্চিত্রে সমসাময়িককালের ভাষ্যকার আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন।

কিন্তু শিল্পের বাতাসে এমন বিষ ছড়ানোর প্রয়োজনটা কেন যে, যা-কিছু চিরায়ত তাই-ই অপ্রয়োজনীয়। চিরায়ত সাহিত্য ছাড়া আর কোনখান থেকে আমরা জানব জীবনের সেই সব ভয়াবহ অন্তঃসংঘাত, বিধ্বংসী ক্ষয়-ক্ষতি, মূল্যবোধের তুমুল সংগ্রাম, এমনকি শ্রেণীচেতনারও সংঘর্ষময় উত্থান।

তাঁর সারা জীবনে আইজেনস্টাইন যতখানি বলেছেন চলচ্চিত্রের কথা, ঠিক ততখানি বলেছেন চিরায়ত সাহিত্যের প্রসঙ্গ, নানাভাবে, অবিরত, অক্লান্ত। গ্রেগরাই কুজিনৎসেভ, আইজেনস্টাইনের দেশেরই পরিচালক এবং সেই একই ঘরানার মানুষ। তাঁর 'টাইম অ্যাণ্ড কন্‌সেন্স' নামের বইটির অতি-সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি যা বলে গেছেন, তা একাধিকবার পড়ার এবং পড়ে মুখস্থ করার মতো।

The meaning of the concept 'classic art' does not seem to require lengthy meditation. The words are not hard to understand. Nevertheless, aside from the accepted properties, classic works are further characterized by an ability to each epoch its own vital interests...Shakespeare's words still sing, resonant and full. His verse is still blistering its hands today. People are improved and cleansed by the poetry, their hearts penetrated by its warmth, their consciences stirred by its noble anger. In Shakespeare's tragedies, they discover the unmasked face of Virtue and Scorn. His plays seem to be written by someone close to us, by a man of our time.

২৫ বছর পরে এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে পথের পাঁচালীর মধ্যে দিয়ে আমরা সেই প্রথম মুখোমুখি হয়েছিলাম এমন এক ট্রাজিক কবিতার, যার চামড়ায় লেগে ছিল warmth আর পাঁজরের আড়ালে noble anger.

৪

আসুন, আমরা ঈষৎ মাথা নত করে ভেবে দেখি, কোনটা আমাদের কাছে, এই মুহূর্তে, বেশি স্মরণীয়। পথের পাঁচালীর প্রথম বছর, না, পঁচিশ বছর?

পূর্ণেন্দু পত্রী

গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র পুরস্কার

গোপালদা এবার রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন তাঁর 'রূপনারানের কূলে' বইটির জন্য। যে-কোনো পুরস্কারই তো খুশিরই খবর। কিন্তু প্রায়-অশীতি গোপালদাকে পুরস্কারের জন্য অভিনন্দন জানাতে লজ্জা করে। 'পরিচয়'-এর 'গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যায়' তাঁর সারা জীবনের কৃতি নিয়ে আমাদের সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করেছি। তার মাত্র কদিন পরই, একটি পুরস্কার পাওয়া নিয়ে অভিনন্দনে সংকুচিত বোধ করাই তো উচিত। গোপালদা অন্তত একটি পুরস্কারের চাইতে বড়।

কিন্তু এমন স্বীকৃতিতে নিজেদের অভিনন্দিত করার একটা সুযোগ পেয়ে যাই। গোপালদা বাংলাদেশের সেই বুদ্ধিজীবী যিনি তাঁর সারা জীবনের সাধনায় মার্কসবাদের তত্ত্বকে ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বকে বাঙালির জীবনসাধনার সঙ্গে মিলিয়েছেন। মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে আমাদের স্বদেশী সমাজে একঘরে করে রাখার চেষ্টা তো সব সময়ই হয়ে আসছে। হয়ে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে নতুন সংস্কৃতির মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এ নামতে হয়। তেমন লড়াই-এ গোপালদার মতো ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতেই সেনাপতির কাজ করেন। সৃষ্টিকর্ম ও মনীষায় তাঁর প্রতিপত্তি এমনই নিঃসংশয় হয়ে ওঠে যে, তাঁকে অস্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায় বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশকেই স্বীকার না করা। গোপালদা আমাদের জন্য সেই গৌরব সঞ্চয় করেছেন—তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ।

গোপালদা আমাদের সাহসও জোগান। এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'সারা জীবন যে রাজনীতি করলেন, পার্টিতে ডুবে থাকলেন, তাতে লেখাপড়ার ক্ষতি হয় নি?' গোপালদা কী অনায়াসে বললেন, 'সারা জীবনই এই কথা আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা করেছে। এখন ভাবি হয়তো কিছু ক্ষতি হয়েছে। খুব ভালো অবসর পেলে হয়তো খুব

ভালো শিল্পকর্ম হত—কিন্তু আমার কেন যেন মনে হত, মানুষের ভেতর থাকাটা আরো অনেক বেশি দরকার, তাতে ঐ-সব ক্ষতি পুষিয়ে যায়।'

'পরিচয়' পঞ্চাশে পা দিতে চলল। তার ঘাড়ে অতীতের চাপ নেহাত কম নয়। ভবিষ্যতে এ-চাপ আরো বাড়বে নিশ্চয়ই। সবসময় যে তাতে সুবিধে হয়, তা-ও নয়। কিন্তু গোপাল হালদার একদিন 'পরিচয়' করেছেন—এ-কথা মনে রাখলে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন সতর্কতা বাড়বে। তাতে কিন্তু 'পরিচয়'-এর কাজের সুবিধেই হবে।—পুরস্কারটি অন্তত এসব কথা আবার ভাবালো।

সার্ত্রে

বছর দুই আগে, বোধহয় 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট'-এই একটি ফিল্মের আলোচনা চোখে পড়েছিল—'সার্ত্রে অন সার্ত্রে'। কেউ ইন্টারভিয়ু করেন নি। সার্ত্রে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন। বলেছেন তাঁর সারা জীবনের চিন্তাভাবনা-কাজকর্ম নিয়ে, আর ক্যামেরা ধরে রেখেছে তখনকার সত্তর-পেরনো সার্ত্রেকে।

তখন সার্ত্রে প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ। ডান চোখটা তো তিন বছর বয়সেই হারিয়েছিলেন। এক বাঁ চোখ। সেটাও বার্ধক্যে নষ্ট। আলোচনাটিতে ছিল, পর্দায় সার্ত্রের দুই হাতে বাতাস হাতড়িয়ে হাঁটা দেখতে কষ্ট হয়। কোনো এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, আমার যা কাজ ছিল, আমি করেছি। আমি যা করেছি, তা আমি ইচ্ছে করেই করেছি। তার সব দায়িত্বও আমার। অবচেতন মনের অস্তিত্ব আমি মানি না। ওগুলো দায়িত্ব এড়াবার অছিলা। মানুষের স্বাধীনতা আছে নির্বাচনের (চয়েস)। সে-নির্বাচনের দায়িত্বও তার একার।

কথাগুলো একেবারেই নতুন নয়। সার্ত্রে তাঁর উপন্যাস চারটি, নটি নাটক-ও প্রবন্ধ গ্রন্থপঞ্জকে এই কথাগুলি তো বলে আসছেন গত প্রায় চল্লিশ বৎসর। কিন্তু তবু যখন, সপ্ততিউত্তীর্ণ এই লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা বলেন তখন তাঁর দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর দার্শনিক সত্য মিলে যায়।

কারণ যে-অস্তিবাদী দর্শনের বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে সার্ত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে আধুনিক কালের দুনিয়ার দার্শনিক হয়ে উঠেছিলেন

সে দর্শন তাঁর ব্যক্তিমনন থেকে তৈরি হয় নি, তৈরি হয়েছিল ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে, দর্শনকে দুনিয়া বদলানোর কাজে ব্যবহারের জরুরি দরকার থেকে। সার্ত্রে জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু চোখ খারাপ বলে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। বন্দীশালাতেও তিনি সহবন্দীদের নিয়ে থিয়েটার ইত্যাদি করতেন। বেরিয়ে এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিল কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টদের পাশাপাশি, সার্ত্রে তাঁর এই নতুন দর্শনের কথা বললেন। ব্যক্তিকে তার অস্তিত্বের দায় বহনের কথা বলা হল। পরাজিত, খিন্ন, হতাশ জাতিকে বলা হল—তোমার তো কিছু করার নেই, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও প্রতিরোধ ছাড়া। ব্যক্তির সার্বভৌমত্বই একমাত্র নাৎসী-সংগঠনের নৈর্ব্যক্তিকতার সামনে দাঁড়াতে পারে।

সার্ত্রের অস্তিবাদ তাই প্রতিরোধের ফ্রান্সে হয়ে উঠেছিল মার্কসবাদের সহযোগী। সে সহযোগ সার্ত্রে শেষ পর্যন্তও রক্ষা করেছিলেন। কামুর ক্ষেত্রে সে সহযোগ টেঁকে নি। আর সার্ত্রের সঙ্গে কামুর পরবর্তী বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণও নিহিত ছিল সেইখানে।

কি কারণে জানি না, যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে যখন সার্ত্রের অস্তিবাদ সমাজ প্রগতির প্রধান ধারার সঙ্গে, তখন আমাদের দেশি-সংস্করণে অস্তিবাদ হয়ে দাঁড়ায় যেন মার্কসবাদের কর্মদর্শনেরই বিরোধী প্রস্থান। যেন অস্তিবাদে মানুষের নির্বাচনের বিকল্পহীন স্বাধীনতায় মানুষের অসহায়তা স্বীকৃত, যেন নিরুপায় কর্মের অধিকারের অর্থ ভবিতব্যের কাছে নতিস্বীকার। যে-নব্য কান্টীয় অজ্ঞেয়তার বিরুদ্ধে অস্তিবাদ পাশ্চাত্যদর্শনে সক্রিয়তার দর্শন হয়ে ওঠে—আমাদের দেশের আধুনিকতার চর্চায় সার্ত্রের অস্তিবাদকে সেই নব্য-কান্টীয় ক্যাটিগরির সীমার মধ্যেই বেঁধে ফেলার চেষ্টা কখনো কখনো হয়েছে।

আমাদের দেশে অস্তিবাদের এই বিকৃতি ঘটানো হয়েছে ভেবেচিন্তেই। আমাদের মতো এমন সব দেশ, যেখানে এই সেদিনও ছিল কোনো ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যের কলোনি, জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে সেখানে মার্কসবাদের একটা প্রবল টান আছে। এই টানের ভেতর বিভিন্ন দেশের শাসকশক্তির নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বও জড়িত। আর এই জাতীয় পুনর্গঠনের সময় মানসিক জগতে এত দ্রুত এত প্রবল সব বদল ঘটে যেতে থাকে যে সবসময় তার পূর্বাপর বোঝা যায় না। মার্কসবাদ-ই

একমাত্র দর্শন যা শিল্পী-সাহিত্যিকের বিশ্ববীক্ষা হিসেবে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারে। পাশ্চাত্য অস্তিবাদ সেই সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার সহযোগী হয়ে অনেকদূর এগোয়। আমাদের দেশে, এই বিশেষ যুগপরিবর্তনের সময়ই প্রয়োজন হয় অস্তিবাদের সেই বিকৃতি—যেখানে ব্যক্তি আর ইতিহাসের সম্পাদক নয়, ইতিহাসের শিকার।

সার্ত্রে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের চরম সঙ্কটে ব্যক্তিকে ইতিহাসের সওয়ার করেছিলেন—বল্গা সহ। মার্কসবাদের শ্রেণী আর সার্ত্রের ব্যক্তির ভেতর পার্থক্য দার্শনিক আলোচনার বিষয়। সে আলোচনা হয়েওছে। এখনো হচ্ছে। কিন্তু সার্ত্রে তাঁর দর্শন নিয়ে সবসময়ই থেকেছেন সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে—আলজেরিয়ায়, ভিয়েতনামে, শান্তির স্বপক্ষে বিশ্বশান্তি আন্দোলনে। সেই ব্যক্তির আত্মগৌরবেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ফ্রান্সের লিজিয়ন অব অনার বা নোবেল পুরস্কার।

সার্ত্রের জীবন, দর্শন ও কর্ম তাই আমাদের দেশের পক্ষে দুই ভাবে প্রাসঙ্গিক। যাঁরা মার্কসবাদকে সমগ্রত গ্রহণ করতে পারেন না, অংশত পারেন অথচ জাতির পুনর্গঠনে মার্কসবাদী চিন্তার প্রয়োজন মেনে নেন, তাঁরা সার্ত্রের জীবন, দর্শন ও কর্মে পাবেন সেই সহযোগের আদর্শ। যাঁরা মার্কসবাদ ছাড়া আর-সব দর্শন ও মতকেই মনে করেন মার্কসবাদ-বিরোধী ও কর্মসূচি-বিরোধী বলে—তাঁরা সার্ত্রের জীবন, দর্শন ও কর্মে পাবেন সেই আদর্শ যা ভিন্ন হলেও বিরোধী নয়।

দেবেশ রায়

বইমেলা-য় 'পরিচয়'

খুব অস্পষ্টভাবেই কথাটা উঠত পরিচয়-এর বেশি রাত্রের বৈঠকে। বইমেলাতে একটা দাঁড়াবার বা বসার জায়গার জন্যই শুধু নয়—'পরিচয়'-এর কথা, 'পরিচয়'-এর অতীত ও বর্তমানের কথা আরো বেশি লোকের কাছে ছড়িয়ে দেবার এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে কেমন হয়! তার পরে তো ঐ ১০ দিন (এ-বছরে ১২ দিন) লেখক-শিল্পীবন্ধুদের একটা আড্ডা গড়ে উঠবেই। কিন্তু সমস্যা অনেক। ফলে সমস্যার কথাই বেশি আলোচনা

হয়। প্রথম সমস্যা : বইমেলার কর্তৃপক্ষের ঐ ভাড়া কিভাবে জোগাড় হবে—হোক না সবচেয়ে ছোট স্টলই—কিন্তু ভাড়া তো খুবই চড়া। এই সব জল্পনা-কল্পনা যখন চলছিল, তখন একদিন সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন ঘোষ 'শুধু কথা কেন কাজ চাই' এ-রকম একটা মহাবিরক্তির ভাব নিয়ে চাঁদার প্রথম টাকা টেবিলে রাখলেন। বাস্, সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা পাকা হয়ে গেল। আমরা পরিচয়-এর কর্মী ও লেখকেরা ১৯৮০-র বইমেলাতে একটা স্টল সাজিয়ে বসছি। এবং সেই স্টলের ভাড়া জোগাড় করব আমরা নিজেরাই চাঁদা তুলে।

তখনও বেশ কয়েক মাস বাকি ছিল। বইমেলা-র ঘোষণাও হয় নি। কিন্তু পরিচয়-এর দৈনিক কর্মীদের উৎসাহে আমাদের প্রয়োজনীয় টাকাটা যেন অনায়াসেই উঠতে থাকে। কাউকে কাউকে প্রায় বলতেই হয় না, কেউ কেউ নিজেই উপযাচক হয়ে চাঁদা দেবার অধিকার দাবি করতে থাকেন—পরিচয়-এর বিভিন্ন সময়ের নিকট ও কিছুটা দূর লেখক ও কর্মীরা।

কি কি করা হবে আমাদের স্টলে? তার পরিকল্পনাতেও কোনো কোনো দিন বেশ রাত হয়ে যায়। পরিচয়-এর লেখকদের বইপত্তর না হয় বিক্রি হবে কিছু কিছু। কিন্তু পরিচয়-এর প্রকাশনা? এত তাড়াতাড়ি করা যায় কিছু? পরিচয়-পুনর্মুদ্রণ? পুরনো পরিচয়-এর বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি লেখা জড়ো করে? তা না হলে ঠিক কি নিয়ে বসব আমরা? মুখে-মুখে সম্ভাব্য পুনর্মুদ্রণের একটা লম্বা তালিকাও তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু কত ছাপা হবে, কোথায় ছাপা হবে, কিভাবে ছাপার পয়সা উঠবে, বিক্রি হবে কিনা, দাম কত করা হবে একটি গল্প বা কয়েকটি কবিতার ঐ ছোট ছোট পুস্তিকা—সংশয় আর কিছুতেই দূর হয় না।

এবারও সংশয়কে চুরমার করে আমাদের পরিকল্পনাকে অনিবার্য করলেন পরিচয়-এর আরেকজন লেখক ও শিল্পী-বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী। কদিনের মধ্যে এঁকে নিয়ে এলেন পুনর্মুদ্রণ-পুস্তিকার কভার।

বইমেলার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল পরিচয়-এর দপ্তর। পুনর্মুদ্রণের লেখাগুলি কপি করার কাজ, স্টল সাজানোর ব্যাপারে পরিচয়-এর শিল্পী বন্ধুদের সলাপরামর্শ, বিক্রির জন্য পাওয়া বইগুলোর হিসেবপত্তর। বইমেলায় 'পরিচয়'-এর স্টলে আমন্ত্রণ জানিয়ে কার্ডও ছাপা হল। হাতে আর সময় নেই—পুরনো ঠিকানার খাতা দেখে কিছুটা এলোমেলো চিঠি ছাড়া গেল, যত দূর পারা যায়, নিশ্চয়ই বাদও পড়লেন অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেকে। তা কি আর করা যায়!

শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়ে এল পুনর্মুদ্রণ সিরিজের ৫টি বই—'পরিচয় পুনর্মুদ্রণ ৫০' এই নামে—অর্থাৎ পরিচয়-এর আসন্ন ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সিরিজের শুরু। যে-কটা বই ছাপার পরিকল্পনা আমাদের মাথায় আছে, তা যদি কখনো সম্পূর্ণ হয়, তবেই বোঝা যাবে তালিকাটি ভেবেচিন্তেই করা হয়েছিল। আপাতত নানা সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে ছাপা হতে পারল স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্প 'মন্ত্রশক্তি', ননী ভৌমিকের গল্প 'সলিমের মা', সুলেখা সান্যালের গল্প 'সিঁদুরে মেঘ', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র 'কয়েকটি কবিতা', হিরণকুমার সান্যালের টুকরো প্রবন্ধের সংগ্রহ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে'। বলা বাহুল্য, গল্পগুলি তো বটেই, বটুকদার কবিতা বা হাবলদার রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক ছোট ছোট লেখাগুলি সবই পরিচয়-এর পাতায় বেরিয়েছিল। গত ৪৯ বছরের পরিচয় ঘেঁটে তা সংকলন করতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্মীরা কাজ করেছেন।

পরিচয়-এর জন্ম, তার নানা দিক্‌বদল, তার ইতিহাস ও আদর্শের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে আমরা লিফ্‌লেটও ছাপিয়েছিলাম—সংখ্যায় অনেক - ইচ্ছে, হাজার হাজার দর্শকের কাছে পৌঁছে দেব পরিচয়-এর খবর।

পুস্তিকা বা ঐ লিফ্‌লেট ধারে ছাপার ব্যবস্থা করে দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন 'কালান্তর' প্রেসের কর্মকর্তা ও কর্মীরা। মনে মনে অবশ্য ভয় ছিলই, ধার শুধতে পারব তো!

বইমেলার শুরু ১৪ মার্চ, আর শেষ ২৫ মার্চ রাত্রে। এই ১২ দিন পরিচয়-এর লেখক ও কর্মীরা, পরিচয়-এর বন্ধুরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করে টিম-ওয়ার্কের সাক্ষ্য রেখেছিলেন, তা অনেককেই বিস্মিত ও উৎফুল্ল করেছিল। সাহিত্যে সুস্থ বামপন্থার গৌরব নিয়ে সকলের সামনে বিনীত-ভাবে দাঁড়ানোর সাহস ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তাঁরা।

১৩ মার্চের সন্ধেতেও মেলা-প্রাঙ্গণে ছিল একটা অসম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল চেহারা। কিন্তু বোঝা যায় সত্যিই একটা কর্মযজ্ঞ চলেছে। চারদিকে হাতুড়ি-ঠোকার শব্দ। বড় বড় প্যানেল কাঁধে করে এদিক-ওদিক চলেছে কুলিরা। রঙ-তুলি হাতে নিয়ে আর্টিস্টরা ব্যস্ত! তার মধ্যেই গাড়ি করে বই নিয়ে এসে স্তূপ করে রাখা হচ্ছে ঘাসে। কন্‌ট্রাক্টরদের হাতে-পায়ে ধরে স্টল-মালিকরা জোগাড় করেছেন চট, কাপড় কিংবা কাঠের র‍্যাক। ১৪ তারিখের সকালেই নীল কাপড়ে মোড়া স্টলের কাঠামোটি বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন বিকেলে যুধাজিৎ সেনগুপ্ত যখন ৫টি অসামান্য

পোর্ট্রেট এঁকে পেছনের দেয়াল ভরিয়ে দিলেন, তখনই তা হয়ে উঠল পরিচয়-এর স্টল। রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই পাঁচজনের ছবি নির্বাচন করে পরিচয়-এর কর্মীরা বোঝাতে চাইলেন পরিচয় তো বটেই, প্রগতি সাহিত্যেরও বিস্তার।

১৪ তারিখ বিকেলে পরিচয়-এর স্টলের সামনে শিল্পী ও লেখকদের কর্মচাঞ্চল্যের যে ছবিটি ফুটে উঠেছিল তা অনেক দিন মনে রাখার মতো। শিল্পীরা অনেকেই ব্যস্ত ও সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। কেউ ছবি টানাচ্ছেন, কেউ পোস্টার লিখছেন, কেউ ওপরের সাদা প্যানেলে 'পরিচয়' লেখাটি ঠিকমতো বসাচ্ছেন। শিল্পীদের এই তৎপরতার পাশে লেখক ও কর্মীরা টেবিলে সাজাচ্ছেন পুস্তিকা ও লিফ্‌লেট এবং র‍্যাকে বই।

আমাদের ঐ ছোট্ট স্টলে একটা প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল। মাত্র ২টি র‍্যাকে পরিচয়-এর সঙ্গে সংলগ্ন লেখকদের এবং প্রগতি সাহিত্যের একটা চাক্ষুষ পরিচিতি। নেহাৎই তাড়াহুড়ো করে করা—আশার কথা, প্রদর্শনীতে লেখক বা বইয়ের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কেউ সম্পূর্ণতা দাবি করেন নি, বা বলা যায়, অসম্পূর্ণতার ত্রুটিকে মার্জনা করেছিলেন।

ধীরে ধীরে যত সন্ধ্যা হতে থাকে পরিচয়-এর সামনে ভিড় বাড়তে থাকে, যত দিন যেতে থাকে পরিচয়-এর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। লেখক ও শিল্পীরা, তা তাঁরা যে-মতের ও যে-পথেরই হোন, একবার অন্তত পরিচয়-এর সামনে সময় কাটিয়ে যান। ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী ও টুকরো টুকরো আড্ডা জমতে থাকে স্টলের সামনে।

স্টলের মাথায় সাদা প্যানেলে জ্বলজ্বল করত পরিচয়-এর স্বাতন্ত্র্য—শুধু সত্যজিৎ রায়ের আদলে 'পরিচয়' নামাঙ্কনটিই নয়, তার পাশে লাল অক্ষরে 'চাই / রাজনীতিচেতন সংস্কৃতি / সংস্কৃতিচেতন রাজনীতি' এই ঘোষণা টুকুও।

পরিচয়-এর বর্ষীয়ান লেখকেরা যেন সঞ্জীবিত হন, মনে হয় নবীনদের এই উদ্যোগে। গোপাল হালদার এ-বয়সেও যে অন্তত তিনদিন বই মেলাতে এসেছিলেন, তা কি পরিচয় স্টল করেছে বলেই নয়? চিন্মোহন সেহানবীশও তার খুশি প্রকাশ করে যান। সুশীল জানাও এসেছিলেন। অরুণ মিত্র তাঁর সদাহাস্যময় চিরযৌবন উজ্জ্বলতায় প্রায় রোজ আসেন, এমনকি বসেও পড়েন স্টলের সামনের ছড়ানো চাটাইয়ে। মনীন্দ্র রায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা

চিত্ত ঘোষও। অমল দাশগুপ্ত অনেকক্ষণ গল্প করেন। শঙ্খ ঘোষ তো আসছেনই। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তরুণ সান্যাল কি করে গরহাজির হবেন, পরিচয় যেকালে স্টল করেছে। এ-রকম অনেকেই। কার নাম ছেড়ে কার নাম করা যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও দেখা যায় বন্ধুত্বের আকর্ষণে পরিচয়-এর স্টলের আশেপাশেই ঘোরেন-ফেরেন। ভক্তমিছিল সহ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও কুশলপ্রশ্ন করে যান। মৃণাল সেন ও পূর্ণেন্দু পত্রী প্রায় একই সঙ্গে স্বাক্ষরসংগ্রহকারীদের ভিড় জোটান পরিচয়-এরই সামনে। নবীন লেখক ও কর্মীদের ভঙ্গিটা ছিল একটু জঙ্গী। তাঁরা চিৎকার করে পরিচয়-এর কথা প্রচার করতে থাকেন—কারোর বিশদ ব্যাখ্যা, কারোর প্রায় নিশ্চুপ লিফলেট বিতরণ। সকলেরই হাতে হাতে পুনর্মুদ্রণের পুস্তিকা। কেউ মাথা নিচু করে রসিদ লিখে যাচ্ছেন। কেউ হিসেব মেলাচ্ছেন। সবাই যেন উৎসাহে দীপ্র তাঁদের নতুন ভূমিকায়।

কাজের মাঝে মাঝে রিলিফও ছিল না এমন নয়। স্টলের কর্মীরা প্রায় রোজ হাঁ করে বসে থাকতেন বিকেল বা সন্ধেয়, কখন পরিচয়-গোষ্ঠীর মহিলা-সদস্যরা নিত্যনতুন মেনুর বৈচিত্র্যে খাবার তৈরি করে নিয়ে আসবেন। কারো কারো সন্দেহ, সন্ধেবেলায় কোনো কোনো বন্ধুদের ভিড়ের এটাও একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল কিনা!

দু-দিন মেলা থাকতে-থাকতেই পরিচয়-পুনর্মুদ্রণ শেষ হতে থাকল। শেষ দিন তো লোকজনকে ফিরিয়েই দিতে হল। পুস্তিকা-কটির উল্লেখ হতে লাগল দুর্লভ বস্তু যেন। 'কালান্তর' প্রেসের ধার শোধার ভয় কেটে যেতে সম্পাদকের মুখে তখন হাসি।

পরিচয়-এর লেখকদের বইও কোনো-কোনোটা বেশ ভালোই বিক্রি হয়েছে। আর বিক্রিটা তো বড় কথা ছিলই না, লক্ষ্য ছিল পরিচয়-এর কথা বেশি লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বাজারি সংস্কৃতির এই দূষিত হাওয়ায় এই পৌঁছে দেওয়ার কাজটা যে কত কঠিন, অথচ জরুরি, তা আর জানতে কারো বাকি নেই। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাণিজ্যিক পত্রিকার আনুকূল্য ছাড়া বিকল্প বামপন্থী সাহিত্যের—বস্তুত যে কোনো অ-বাজারি সৎ সাহিত্যেরই—আত্মপ্রকাশের সুযোগ বড়ই সীমিত। বিজ্ঞাপনের আকাশছোঁয়া দাম, অথচ তার শরণাপন্ন না হলে প্রকাশনার রেজিস্ট্রিতে নামই ওঠে না। এই অবস্থায় বই মেলায় একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া

গড়ে উঠতে পারে। অন্তত এখন পর্যন্ত কিছুটা গড়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। এটাকে খতম করার একমাত্র উপায় হলো স্টলের ভাড়াকে আরো চড়িয়ে দেওয়া। উদ্যোক্তা পাবলিশার্স গিল্ডকে ধন্যবাদ, তাঁরা উল্টে বরং ছোট ব্যবসায়ী বা লিট্‌ল-ম্যাগাজিনের প্রকাশকদের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় টেবিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশ জমে উঠেছিল মেলার সেই সব অংশগুলো।

জানি না, বাংলা বই বা পত্রিকা ছাপার জগতে বা বিক্রির জগতে যে দুরূহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তার কতটা সুরাহা করতে পারে এই বাৎসরিক বই মেলা। কিছুটা অন্তত করতে পারে বলে কারো কারো মনে হয়েছে। কাগজের দাম, ছাপার খরচ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা বইয়ের উৎপাদন খরচ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। তাকে কাটান দেওয়ার চেষ্টাতেই ব্যাপক গ্রাহক করে রচনাবলি সিরিজ বা সেইভাবে অন্যান্য বই ছাপার চেষ্টা হয়েছে, সাফল্যও এসেছিল—কিন্তু উদ্যোক্তাদের প্রথম দিককার সাহসী কল্পনা আজ পরিণত হয়েছে অতিরিক্ত ব্যবসায়িকতায় বা দায়িত্বহীনতায়। তা ছাড়া এভাবে প্রাচীন সাহিত্য বা নামী লেখকদের রচনা বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয়তো যায়—কিন্তু বই প্রকাশের জগতে সৃষ্টিশীলতার হাওয়া কি বয়ানো যায়? সত্যিকারের সমাধানের পথে বাধা হয়ে আছে উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বইকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমের অভাব। বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন মানে বিশেষ একটি পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন, আর তার বিজ্ঞাপনের হার মাঝারি প্রকাশকদের কাছেও আতঙ্কের ব্যাপার। অথচ বাংলা দেশের যেটুকু পাঠক আছে, তাদের কাছে পৌঁছুবার পথ তো ঐ একটাই। তা না হলে একটা বই যে বেরিয়েছে, তা প্রায় ধরাই হয় না। লোকে জানতেই পারে না। আরো নানা সমস্যাই আছে এবং সেগুলো কোনোটাই নিশ্চয়ই গৌণ নয়। শিক্ষিতদের মধ্যেও বই পড়ার অভ্যাস একটা অনুকূল আবহাওয়া বা আন্দোলন বা প্রচারের ফলে বেড়ে যেতে পারে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

একটা অ-ব্যবসায়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকার পক্ষে পাঠকদের এক-একটা বৃত্ত ছাড়িয়ে যাওয়া যে কী কঠিন কাজ এই ধনতান্ত্রিক সমাজে! মতামতের বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রগতিশীলতা বা নতুনত্বের জন্য যে বাধা তার কথা এখানে উঠছে না। উঠছে নিছক পাঠকের কাছে

পৌঁছনোর যে বাধা তার কথা, বিশেষত যখন একটি পত্রিকা লিটল ম্যাগাজিনের গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হবার দায়কে গ্রহণ করে কিংবা সেই পত্রিকার বাস্তবতার পক্ষে জরুরি এই সমস্যার মুখোমুখি হয়। কলকাতার পত্রিকার স্টলগুলি এখনও ততটা বিক্রির মাধ্যম হতে পারে নি এবং তাদের ব্যবস্থাপনা ও কার্যকলাপও খুব সুস্থির নয় অবশ্য, সন্দেহ নেই পড়ুয়া মানুষেরও পত্রিকা-কেনার অনভ্যাসেই এই অব্যবস্থার প্রশ্রয়। যেভাবে ঘরে ঘরে হকার পৌঁছে দেয় খবরের কাগজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক সাময়িক পত্রিকাগুলি, সেই মাধ্যমকে সামান্যভাবে ছোঁয়াও অসম্ভব ব্যাপার! ব্যবসা-জগতের বৃত্ত বা চক্র এখানেও কাজ করে। ফলে পোস্টার বা লিফলেট বা গোষ্ঠীবদ্ধ কথা চালাচালি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয় প্রচার।

বাংলা বই ও পত্রিকার এই বাস্তবতার জগতে বই মেলা বোধহয় কিছুটা প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে। যেহেতু বইয়ের জগতের খোঁজ নিতেই একটি জায়গায় হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোক জমায়েত হন কয়েক দিনের মধ্যে।

অরুণ সেন

সুকুমার সেন সংবর্ধনা

তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনীকক্ষে জমাট উপস্থিতির মধ্যে সুকুমার সেনের আশি বছর বয়ঃপূর্তির আনন্দময় উপলক্ষটি উদযাপিত হয়েছিল গত এপ্রিলে, তাঁর প্রধানত বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সুকুমার সেন, একদাসতীর্থ সুহৃৎ জনার্দন চক্রবর্তীকে পাশে নিয়ে, সামনের সারিতেই নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, কিছু দূরে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে চোখে পড়ছিল তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের গুণমুগ্ধ ছাত্রদের। আশি বছর বয়সেও সমান সক্রিয়, চিন্তা ও কর্মে সদাজাগ্রত এই প্রজ্ঞাবান পুরুষের সংবর্ধনার অর্থ তো বিশ শতকের বাঙালি মনীষার স্বাস্থ্য ও সজীবতাকে, নিরলস সক্রিয়তাকেই অভিনন্দন জানানো।

কাকলি রায়ের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। তারপরে অভিনন্দনলিপি পাঠ করে তারাপদ মুখোপাধ্যায় বাঙালি জাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই নিবেদন করেন। দীর্ঘ অথচ উপভোগ্য ভাষণে জনার্দন চক্রবর্তী সংস্কৃত কলেজের ক্লাশরুমে নবীন আগন্তুক বর্ধমানের গেঁয়ো ছেলেটির কথা বলেন, ছাত্র বয়সে সঙ্গিসাথীদের এড়িয়ে যে বসে কেবল বই নিয়ে 'বড়ো টোকে'। তাঁর বর্ণনায় একটি চরিত্র ফুটে ওঠে, যার পরিণতিতে মনীষার এই মহীরুহ। স্বকীয় অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রমথনাথ বিশী শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষটি সম্পর্কে বলেন যে, মঞ্চে বসে সময়ের অপব্যয়ের কথা ভেবে উনি নিশ্চয় উদ্বিগ্ন, হিসেবি মানুষটি ভাবছেন দু-ফর্মা প্রুফ দেখা হয়ে যেতো এতক্ষণে। ভাষাতত্ত্ব, ভারততত্ত্ব এবং আজকাল যাকে বলা হচ্ছে বঙ্গবিদ্যা—এসব বিষয়ে সুকুমার সেনের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার প্রমুখ। শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রণাম নিবেদন করেন আরো অনেকেই। এবং সেই নিবেদনে যদি কিছু অবান্তর কথা বা কিছু নিজের প্রসঙ্গ বেশিই ওঠে, তা নিশ্চয় মনে রাখার নয়।

সব শেষে অসুস্থ শরীরেও এসে সজীব কণ্ঠের গান পর পর পরিবেশন করেন সুচিত্রা মিত্র। জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাই অপরিহার্য ছিল জলযোগের আনন্দময় সংযোজনও।

শান্তা সেন

প্রসঙ্গ : ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত Phonetic Changes in Indo-Aryan Langneyes-এর সমালোচনা।

আমার সকল উক্তির যথাযথ্যে আমিও নিঃসন্দেহ ছিলাম না। যথা, পৃঃ ২১ —"Although modern persian may not be a direct descendant of Avesta···'। তবে ইরানে হখামানিষ্য পহ্লবী ও সামানী রাজারা ধর্মে জরথুস্ত্রীয় ছিলেন বলে তাদের ভাষার আবেস্তা ভাষার সঙ্গে বেশ সম্বন্ধ ছিল বলে মনে করি। পরবর্তী যুগে ফিরদৌসি ধর্মে মুসলমান হলেও তাঁর আধা ঐতিহাসিক বীর গাথা মূলক মহাকাব্যে যত্নপূর্বক আরবী ও বৈদেশিক শব্দগুলি পরিহার করেছেন। হয়ত তখন নাশ্‌খ্‌লিপি অপ্রচলিত ছিল বলে আরবীলিপি আবশ্যক remodel করে ব্যবহার করেছেন। সিংহল ভাষাকে ⁄সুনীতি চ্যাটার্জী গুজরাটী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ বলেছেন। এবং লাড় দেশ তদানীন্তন লাট (গুজরাট), রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) নহে। তবে শ্রীলঙ্কার অধিবাসীরা থেরবাদী বৌদ্ধ এবং তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি আধা ঐতিহাসিক পালি কাব্য মহাবংস হওয়াতে, তাদের ভাষাও পালির সঙ্গে বেশ কিছু সম্বন্ধ রাখে বলে মনে করি।

আমার পুস্তকের কিছু কথা অপ্রাসঙ্গিক ও বিষয়বহির্ভূত তা আমি নিজেই ভূমিকায় স্বীকার করেছি। আচার্য সুনীতি বাবু ৫।১২।৭৫ তারিখে যে অভিমত দিয়েছেন তাতে লিখেছেন 'Three chapters at the end of the book are...more or less of topical interest, but still they have their linguistic value' হিন্দী সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালির মত বা ধারণা অন্যরূপ হলেও সুনীতিবাবুও লিখেছেন 'His chapter on Hindi as our Union State Language is exceedingly will written, sober and reasonable' সুনীতিবাবু তাঁর দীর্ঘ অভিমতে আমার ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই ; লিখলে উপকৃত হতাম। আমি সাক্ষাৎ ছাত্র না হলেও, কলকাতা যাওয়ার সুযোগ হলেই তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতাম এবং ⁄প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের 'শিক্ষা'

(বৈশাখ, ১৩৬৬) পত্রিকায় আমার 'অথাতঃ শব্দজিজ্ঞাসা' শীর্ষক লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি।

অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা তো আমার বদভ্যাস। অতিশয়োক্তি একটা অলংকার, ঐতিহাসিক সত্য নয়। স্বদেশপ্রেমী কবির কাছে নিজদেশেই চাঁদ উঠে, ফুল ফোটে, 'মরাল চলে', কোকিল গায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু পংক্তিতে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। 'একদা যাহার বিজয় সেনানী…' বোধহয় গুজরাটের সন্তান এবং হয়ত তখন বঙ্গে কিরাতদের বাস ছিল। 'সন্তান যার তিব্বত চীন' ইত্যাদি ব্যাপারে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'ভারত ও চীন' (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ) পুস্তকে যে শ খানেক ব্যক্তি মহাযান প্রচারে চীন যান, তাদের নামের লিস্ট আছে, কিন্তু তার মধ্যে বাঙালির নাম একটাও দেখলাম না। তবে দীপংকর বোধ হয় বঙ্গের সন্তান এবং তাম্রলিপ্ত থেকে 'অর্ণবপোত' ছাড়ত। 'বুদ্ধ-আত্মা' ও অশোক যে অবাঙালি ছিলেন তা সকলেই জানে।

আবেস্তার সঙ্গে ফারসীর যে সম্বন্ধ আছে তার এক প্রমাণ—অশ্ব = আবেস্তা 'অশ্‌প' এবং ফারসী (asb)।

জলপাইগুড়ি
১৬.৩.৮০

সুধীর চন্দ্র মজুমদার

পরিচয়

সমালোচনা সংখ্যা

জুনে বেরবে

সত্তরের দশকে প্রকাশিত বাংলা গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধের সমীক্ষা।

লিখছেন

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস মজুমদার, অভ্র ঘোষ।

পরিচয়
সমালোচনা সংখ্যা ১৯৮০

Chau Lakhi Gate Qaisar Bagh Pre-Mutiny photograph

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬-০০

মস্তক বিনিময় (Thomas Mann-এর Transposed Heads-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—ক্ষিতীশ রায় ৪-০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫-০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—নৃপেন ভট্টাচার্য ৪-০০

বেনিটের চাওয়া পাওয়া (আনা সেগাস-এর Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪-০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০-০০

গোবিন্দ সামন্ত (লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants' Life'-এর বঙ্গানুবাদ) সাধারণ ৪-৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪-৫০

পরিচয়

মে-জুন ১৯৮০ ৪৯ বর্ষ ১০—১১ সংখ্যা

সমীক্ষা

পুস্তক-পরিচয়

প্রচ্ছদ

চিত্র যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয়-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সমালোচনা সংখ্যা পরিকল্পনায় আমরা জানিয়েছিলাম—গত দশ বছরে লেখা বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি সমীক্ষা প্রকাশ করব। তার অনেকটাই করা গেল—উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সাহিত্য-ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধের সমীক্ষা। কিছুটা হল না—নাটক ও সাহিত্য-প্রবন্ধ। শারদীয় সংখ্যার পর, নভেম্বর-ডিসেম্বরে, এই সমীক্ষা দুটি দিয়ে আমাদের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

গত দশ বছরে প্রকাশিত বই-এর, বা যাঁরা এই সময়ে লিখছেন তাঁদের, নামের তালিকা এই সমীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য নয়। সমীক্ষায় খোঁজার চেষ্টা হয়েছে—বিষয় ও আঙ্গিকের নতুন গঠন, গত দশ বছরের প্রধান ঝোঁক, সময় ও শিল্পের দায় মেটাতে শিল্পীদের চেষ্টা।

এ ধরনের সমীক্ষা তো সব সময়ই আংশিক—যতই আয়তনে বড় হোক। মতামতেও সে আংশিকতা থেকে যায়—যতই কেন উদার হোক। তবু দশ বছরের লেখাগুলি একসঙ্গে দেখায় ও পড়ায় কোনো-একটা চেহারা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়, কোনো কোনো দিক যেন ঝলসে ওঠে—যেদিকে এতদিন চোখ পড়ে নি, এমন কোনো তুলনা খুব প্রাসঙ্গিক ঠেকে—যা হয়ত মনেই ছিল না, কোনো শিল্পীর রচনার তাৎপর্য ধরা দেয়—অব্যবহিতে যা হয়ত তত তৎপর ঠেকে নি, কিছু আপাতকীর্তি ধসে যায়, কোনো রচনা যা ছিল অন্যমনস্ক স্মৃতিতে-তার কৃতি সময়ে যেন ভাস্বর হয়ে ওঠে। সময় ছাড়া শিল্পের আর-কোনো পরীক্ষাগার নেই আমরা দেখতে চেয়েছিলাম দশ বছর সময়কে একসঙ্গে দেখলে নতুন কিছু দেখা যায় কিনা।

'পরিচয়'-এর উদ্যোগে এই সমীক্ষা হলেও, সমীক্ষায় প্রকাশিত মতামতের সব দায় লেখকদের—আমাদের নয়। কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের মতামত প্রায় বিপরীতও হতে পারে। কিন্তু এই সমীক্ষাগুলি যদি আরো কিছু মতামত উসকে দেয়—আমাদের উদ্দেশ্য তাতে সফল হবে।

এই সমীক্ষাগুলিতে অনেক লেখক ও বই আলোচিত হয়েছে। সেজন্য স্বতন্ত্র আলোচনায় আমরা এমন কিছু বই বেছে নিয়েছি যা সমীক্ষার ভেতর পড়ে না।

সম্পাদক।

সত্তরের দশকের বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১.

যে কোনো দশকের শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে দশকটির চেতনামূল অবশ্যই খুঁজতে হয় সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে। শুধু এই কথা বলে কোনো লাভ নেই, সত্তর দশক অস্থিরতার দশক। কোনো দশক-শতক-সহস্রকই স্থিরতার জন্য চিহ্নিত সময়খণ্ড নয়। সত্তরের দশকও নয়। প্রশ্নটা বরং এই হলে আরো ভালো হয়, সত্তরের দশকে কোনো স্থিরতার চেষ্টা কি কোথাও ছিল, নাকি ছিল তার বিকল্পে অস্থিরতাকে চাপা দেবার চেষ্টা? উপন্যাসের দিকে তাকালে এই প্রশ্নের সদুত্তর মেলা উচিত—এ কারণে উচিত যে, এই শিল্পকর্ম জীবনের সব থেকে ঘনিষ্ঠ। ঔপন্যাসিকের ভাষ্য তাঁর চেতনার দান, তাঁর চেতনা তাঁর বাস্তবতার গূঢ় ফল। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের বৃহত্তর অংশে সেই চেতনা আমাদের খুব আশান্বিত করে না। এখনো বাংলা উপন্যাসের একাংশে মধ্যবিত্ত-স্বপ্নেরই জের চলেছে। সব স্বপ্ন ভেঙে গেলে ভাঙা স্বপ্নের জন্য যেমন ক্ষোভ থাকে, ক্রোধ থাকে, অথচ তার হাত ছাড়িয়ে এগিয়েও যাওয়া যায় না, এখন প্রধানত অবস্থাটা সেরকম। অথচ এমন স্বপ্নহীন অবস্থা বুঝি আর কখনো আসে নি। মধ্যবিত্ত বাঙালি, এমন কি তার অর্ধশতাব্দীর প্রিয়, বিপ্লবের স্বপ্নও আর দেখে না। তাই বুঝি সত্তর দশকের বাংলা উপন্যাসের বৃহদংশে স্মৃতির প্রাধান্য। মনে করি এই স্বপ্নহীনতাই সত্তরের দশকের সমস্ত রক্ত ও শৃংখলের দাগ সত্ত্বেও প্রধানতম, একমাত্র অবদান।

২.

পঞ্চাশের দশক থেকে উপন্যাস-পণ্য ও উপন্যাস-শিল্প স্পষ্টত দুভাগে আলাদা হতে শুরু করে। 'কাগুজে পিণ্ড'-রচয়িতাদের—নীহার গুপ্ত প্রমুখদের, এ তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছি। উপন্যাস-পণ্য বর্তমান প্রকাশনা-জগতের সৃষ্টি। এতে নাসাকুঞ্চিত করার কিছু নেই। সবদেশেই বেস্ট্‌-সেলারের একটা বাজার থাকে। বেস্ট্‌ সেলার যখন 'বেস্ট্‌ হেলার'

হয়ে ওঠে তখনই তা 'পাল্‌প্‌ ফিক্‌শনে' রূপান্তরিত হয়। বাস্তবতা নয়, বাস্তবতার উপাদানের সাহায্যে বাস্তবতাকে আবৃত করাই তাদের লক্ষ্য। এককালের ফাল্গুনী মুখুজ্যে, একালের নীহার গুপ্ত, বিশ্বনাথ রায় এ জাতীয় লেখক। কিন্তু আসল বেস্‌ট্‌ সেলার প্রকৃত নভেল আর 'পাল্‌প্‌ ফিক্‌শনের' মাঝামাঝি জায়গায় দুয়ের থেকে সমান দূরে অবস্থিত। বিক্রি বেশি হলেই তাকে বেস্‌ট্‌ সেলার বলে না। বিক্রি কয়েক দশক জুড়ে সমছন্দে সমান গতিতে চলেছে, তেজি-মন্দা বিশেষ নেই—এরকম ধরনের উপন্যাসের মধ্যে কিছু না কিছু শোনার কথা থাকেই, এমন কি তাদের মধ্যে বেস্‌ট্‌ সেলারের কম-বেশি উপাদান থাকলেও। এগুলিকে বেস্‌ট্‌ সেলার বলে বসা ঠিক নয়। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস 'পুঁথির লেখা'-র (১৯৭৯) মধ্যে বেস্‌ট্‌ সেলারের উপাদান আছে। উপাদানটি হল পুরাতন মূল্যবোধ নিয়ে, একটি দরদ-টেনে-নেওয়া ভাবালু কাহিনীবন্ধ নিয়ে আবেগ—যার আসল কথা হল উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের পটভূমিতে বর্ণ-নিষিদ্ধ প্রেম। তাঁর নভেল ভালোই বিক্রি হয়। কিন্তু তিনি বেস্‌ট্‌ সেলারদের পর্যায়ে পড়েন না। কেন না, 'বিক্রির জন্য বিক্রি' একথা তিনি মানেন না। একটা জীবন সম্বন্ধীয় 'মর‍্যাল আউটলুক' তাঁর আছে। মর‍্যাল এওয়্যারনেশ্‌ (moral awareness) শংকরেরও আছে, তিনি কিন্তু বেস্‌ট্‌ সেলারদের শিরোমণি। কারণ আশাপূর্ণার মতো তিনি একটা প্যাটার্ন ভেঙে ফেলার কথা বলতে চান না। প্রাইভেট সেক্‌টর, পাবলিক সেক্‌টর নানা বিষয় নিয়ে তিনি লেখেন। 'জন অরণ্য', 'সীমাবদ্ধ' সব উপন্যাসেই তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজে কম্প্রাদুর বুর্জোয়াদের মুখোশ খুলতে চান—না, ভুল বললাম, মুখোশ ধরে টান মারেন, খুলতে চান না। ততটুকু টান মারেন, যতটুকু টানলে নভেল-রিডিং পাবলিক লাইব্রেরি-কাউন্টারে তাঁর জন্য ভিড় করবে। তিনি কোনো প্রতিষ্ঠিত অবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাতে চান না—বরং আলগোছে একটা ভাবনাই পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন—যতই মানসিক অশান্তি থাক, থাক নৈতিক স্খলন, উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার সোয়াদটা মন্দ নয়। সোয়াদটা বজায় রেখে মধ্যবিত্তের অশান্তির হাত থেকে রেহাই পেলে খুব একটা খারাপ ব্যাপার হবে না!

বিক্রি বেশি হলেই সেটা বেস্‌ট্‌ সেলার হল, এটা যেমন ঠিক কথা নয়, বিক্রি সেরকম না হলে যে সে বইটা 'বেসট সেলার' হল না, এটাও

তেমন খাঁটি কথা নয়। 'বেসট সেলার' একটা প্রবণতা। চাণক্য সেনের 'রাজপথ জনপথ' বেসট সেলার-প্রবণতার দ্বারা চিহ্নিত। ভিতরের সংবাদের জন্য পাঠকের দুর্বলতার ওপর এর প্রতিষ্ঠা। দিনেশ রায়ের 'লিপইয়ারের মৃত্যু' (১৯৭৫?) সে তুলনায় প্রকৃত নভেল, তার শিল্পরূপ বক্তব্যেরই নামান্তর। গজেন্দ্র মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' (১৩৮৬) মাত্রার তারতম্য সত্ত্বেও বেসট সেলার। প্রতিযোগিতার বাজারে প্রভূততম সংখ্যক ভোগীর হাতে পৌঁছে যাওয়া পণ্যোৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য। এগুলো লেখার সময় সচেতন ভাবে বৃহৎ পাঠক সমাজের চিত্ত-বিনোদনের যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসে এমন ঘটনাও আছে যে, দ্রৌপদীর হাতে হাত ঠেকে গিয়েছিল বলে কৃষ্ণের চিত্তে অস্থিরতা দেখা দেয়। ইন্দ্রপ্রস্থ গমনে অনীহা জাগে। 'অফ অল', কৃষ্ণের এই চিত্তচাঞ্চল্যে হাসি পায়। লেখক একেবারে যাত্রার আসরের কৌশলে কৃষ্ণের সাধারণ-অসাধারণত্ব (অথবা অসাধারণ-সাধারণত্বকে) ফুটিয়ে তুলতে গিয়েছেন। এর মধ্যে পুরাণকে একালের আলো ফেলে দেখা, বা একালকে পুরাণের পৃষ্ঠপটে রেখে বিচার—কোনোটাই নেই। পূর্বনির্ধারিত পৌরাণিকতার বাইরে লেখক যেতে চান নি। অধিক-সংখ্যক লোকের কৃষ্ণানুরাগ আরো বাড়ুক, সেটাই তাঁর ভরসা। এটাই বেসট সেলারের ঝোঁক। প্রত্যেক ভালো বেসট সেলারের লক্ষণ হল সযত্নে আগের বেসট সেলারদের লক্ষণগুলি লক্ষ করে সেগুলির মিশ্রণে আর একটি পানীয় তৈরি করা। এখন মার্কিন বেসট সেলার আর্থার হেলি তাঁর লেখার মধ্যে হ্যারল্ড রবিনস, হেডলি চেজ, পূর্বসূরী মম্ সবাইয়ের কিছু কিছু মিশিয়ে স্বাদু পানীয় তৈরি করেন। শংকর এবং বিমল মিত্র সমমাত্রায় খল-নুড়িতে উত্তমরূপে ঘসে নেড়ে একটি উপন্যাস লেখা হল। অথচ ঐ উপন্যাস-লেখকই একদিন আমাকে বলেছিলেন—সমরেশ বসু তাঁর আদর্শ। তিনি সমরেশ বসুর (আমি শ্রীবসুর কোনো একটি তখনকার লেখার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিয়েছিলাম বলে) সমালোচনা শুনতে চান না!

২.

পুরাণের ভিতর দিয়ে আধুনিক অস্তিত্বের সংকল্প ও সংকটের পুরাণ-প্রতিমা রচনা করতে চাওয়া কোনো নতুন ব্যাপার নয়। বিশেষ, সত্তরের দশকে

যখন জটিল আবর্তের নানামুখী চাপ প্রবল হয়ে উঠেছে তখন এই জটিলতার পৌরাণিক প্রতিমান কেউ কেউ খুঁজেছেন। নাটকে যদি বা উপযুক্ত, কবিত্বে ঈপ্সিত সার্থকতার দেখা পেলেন কেউ কেউ (বুদ্ধদেব বসু ও মণীন্দ্র রায়), উপন্যাসে প্রায় ক্ষেত্রেই পাওয়া গেল পৌরাণিক যথেচ্ছাচারের নিদর্শন—'পাঞ্চজন্য'র কথা আগেই বলা হয়েছে। কালকূট-এর 'শাম্ব' সে তুলনায় অনেক বেশি জিজ্ঞাসা-সচেতন লেখা—তবে কালকূটের লেখাই হয়েছে, সমরেশ বসুর হয় নি। চিত্ত সিংহ বাংলা লোকপুরাণ সংস্কৃত-পুরাণ ঘেঁটে দু-চারখানা এ-জাতীয় বই লিখেছেন। 'জতুগৃহ', 'বেহুলা', 'ঈশ্বর পাটনী' ইত্যাদি বইয়ের অভিনবত্বে কোনো সন্দেহ নেই। 'ঈশ্বর পাটনী' (১৯৭৬) এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে-বোধ নিয়ে এসব বই পড়তে যাই—পুরাণ-কথার চাবিকাঠি দিয়ে আজকের গহন জটিলের ভিতরকার দরজা খুলে ফেলা হবে—সে-বোধ পরিতুষ্ট হয় না। 'ঈশ্বর পাটনী'তে ভাষার একটা কবিয়াল শক্তির পরিচয় আছে—সম্প্রতি পড়েছি এ্যান্থনি বার্জেস-এর 'মোজেস' কাব্যে লিখিত বাইবেলীয় পুরাণ-কথা, উপন্যাসের স্বাদযুক্ত রচনা, এবং সেখানেও ভাষা-ভঙ্গিমা এমনতরই। কিন্তু বক্তব্য নির্মাণে পুরাণকে একটুও না বেঁকিয়ে 'মোজেস' আরো সিদ্ধকাম। চিত্ত সিংহ, কী সব 'আমরা বাঙ্গালী বাঙ্গালী' বলেন তার সঙ্গে ঈশ্বর পাটনী বা বেহুলা-র কোনো যোগ নেই—এটা আনন্দের কথা। রাধাকৃষ্ণ নিয়ে একটা উপন্যাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন। তবে তাঁর মতো কবি লিখেছেন বলেই বলা, এটা বিয়ের উপহারে ইউটিলিটি গুডস্-এর বিকল্প হিসাবেই চলবে।

৪.

ধ্রুপদী পুরাণ ও লোক-পুরাণ নিয়ে যেমন, সত্তরের দশকে অদূর বিগত ইতিহাস-পটেও তেমনি, কতকগুলি নভেল লেখা হয়েছে—এবং এর মধ্যে কয়েকটি নভেল আমাদের উৎসাহিত করে। অন্তত পূর্ববর্তী দশকের ইতিহাস-ঘেঁষা উপন্যাসগুলি থেকে এই দশকের ইতিহাস-মিশ্র উপন্যাসগুলির কোনো কোনোটিতে বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধপাতটি ঘটেছে কালের মাত্রা-বিষয়ে স্থির সচেতন থেকে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৬) এবং অসীম রায়ের 'নবাব বাঁদী' এই সচেতনতার সাক্ষ্য দেয়। জরুরী অবস্থার নিশ্বাস-বন্ধ দিনগুলিতে বীরসা মুণ্ডার কাহিনী শুনিয়েছেন মহাশ্বেতা। এই

দশকের সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলিই ছিল এখন কাহিনী বলার উপযুক্ত সময়। সময়, চেতনা, বিবৃতির খর আকর্ষণ—সব মিলে 'অরণ্যের অধিকার' একখানি মহানুভব রচনা হয়ে উঠেছে। লেখিকার নিজ পটভূমি ও ইতিহাসবোধের অন্বয়ের ফলে এটা সম্ভব হল। অসীম রায় 'নবাব বাঁদী'তে বর্ণিত ইতিহাসের মৌল দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলে এটি কোনো দ্বিপ্রহরভোগ্য লোভন-ভোজ্যে রূপান্তরিত হয় নি। বরং সাধারণ দুস্থ মানুষের প্রাকৃত দুঃখ-দুর্দশা-সংকল্পের বীরোচিত চলচ্ছবি ফুটে ওঠে নায়ক-নায়িকাদের মুক্তিপ্রয়াসে।

একেবারে সুদূর অতীতে পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'আমিই সে' (১৯৭৩)। তিনি পরিধি বাড়িয়ে চলেন দেখে ভালো লাগে, একটু গভীরতার দিকেও তাকান যেন।

৫.

সত্তরের দশকে স্মৃতি প্রবল হল সব দিক দিয়েই। ইতিহাস এবং পুরাণও তো অবচেতনে ও চেতনে ধৃত স্মৃতি। 'নস্‌টালজিয়া' স্মৃতি-বিধুরতা সেও তো অদূর অথচ অপ্রাপ্য অতীতের জন্য ব্যাকুলতা। বিশেষ যখন পুরানো জীবন, জীবনার্থ, পরিবার-প্যাটার্ন, সামাজিকবোধ ও ভাষ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যাচ্ছে, এবং গেল, তখন পুরানো কথা বেশি মনে পড়বে। বর্ষীয়ান কথা-সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'সেই গ্রাম সেই মানুষ' দেশ-ভাঙা, গ্রামছাড়া আজকের বাঙালিকে 'মন-কেমনে'র উপাদান যোগান দিয়েছে পরম ব্যস্ততায়। কোনো শৈল্পিক স্ট্রাক্‌চার এই বইয়ে নেই। তাই স্মৃতিকথা হিসাবেও এ ব্যর্থ। বরঞ্চ উপন্যাসের ভান নেই অথচ স্মৃতিকথা হিসাবে জীবন্ত হয়েছে রাণী চন্দের 'আমার মায়ের বাপের বাড়ি'। এ বই বর্তমান আলোচনার এলাকার মধ্যে পড়ে না বলে অনিচ্ছায় নীরব হলাম। স্মৃতি ঝরা বকুলের কান্না—এ তো কাব্যখ্যাত। ব্যক্তিগত স্মৃতিও তাই। তার ফলে আমরা পেয়েছি একটি অসামান্য উপন্যাস, মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' (১৯৭৪)। জীবন-স্মৃতি আর উপন্যাসের সীমান্ত এখানে বারে বারে লঙ্ঘিত হয়েছে—সেটা মানিয়ে গেল উপন্যাস জীবনেরই আত্মীয় বলে।

স্মৃতিকথা নয়, অথচ দেশভাঙা মানুষকে নিয়ে একটি অনাড়ম্বর কাহিনী লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—'মানুষের ঘর বাড়ি' (১৯৭৮)। সুখী হবার জন্য বেশি কিছু লাগে না—বইটিতে বিলু-পিলুর বাবা এ-কথা তার নিজের

লড়াই দিয়ে প্রমাণ করেছে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র পর থেকে অতীন যে এগুচ্ছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু স্মৃতি দিয়ে কোনো কাজ হয় না, সত্তার বর্তমান সংগ্রামের পটেই যে স্মৃতির সার্থকতা, অতীনের এই অনুচ্চকণ্ঠ কাহিনীতে তা দেখা যায়।

৬.

কিন্তু সত্তরের দশকে স্মৃতিই সব কথা নয়। বহু হৃৎপিণ্ড-উপড়ে-দেওয়া ঘটনার প্রত্যক্ষতা এই দশকে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সংকল্পের জ্যাবদ্ধ উত্তেজনা, নিক্ষিপ্ত তীরের ভ্রষ্টলক্ষ্য নিরুপায়তা, ছিন্নমস্ত আদর্শের আত্মনাশা অভিযান—সর্বোপরি, বৃহত্তর এলিট তথা বুদ্ধিজীবী সমাজের সতর্ক সুবিধাবাদী নীরবতা ও রাষ্ট্রশক্তির ধূর্তবুদ্ধি নৃশংসতা, সব মিলিয়ে এই দশকে সৃষ্ট হয়েছিল মেঘার্ত মৌন। হয়তো অধিকাংশক্ষেত্রে এই মৌনের ভ্রুকুটির সামনে ভয় খেয়েই, অথবা তার সম্মুখীন হতে না চেয়েই সত্তরের দশকের বাঙালি লেখকের আত্মমগ্নতার চর্চাও সমানভাবে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু কেউ কেউ ভয় খান নি। তাঁরা অন্তত ভস্মাবশেষ নিয়েও নাড়াচাড়া করেছেন।

'ভস্মাবশেষ' কথাটি ভেবেচিন্তেই বসালাম। যে কটি এই প্রসঙ্গের উপন্যাস আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে তারা কেউই স্ফুলিঙ্গের যে দাবানল হবার সম্ভাবনা ছিল, সে কথা বলে নি। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা' (১৯৭৪), সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৬), এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' (১৯৭৭) সব কটি উপন্যাসই যেন পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির শেষ দৃশ্যের রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। যদি নাটকের তুলনাই ব্যবহার করি, তাহলে বলতে হয়, এর এক্সপোজিশন, গ্রোথ্ অফ্ এ্যাক্শন প্রভৃতি স্তরগুলি আভাসে ইঙ্গিতে পরোক্ষই থেকে গেল। 'দি ওয়েক অফ নক্শালবাড়ি' (১৯৮০) গ্রন্থে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর শ্রমে যে পদ্ধতিতে সামাজিক-রাজনীতিক তথ্য বিশ্লেষণ করেন, ঠিক সে পদ্ধতি ঔপন্যাসিকদের কাছে আশা করি না, কিন্তু তিন ভিন্ন দৃষ্টিতে তিনজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক শুধু একটা প্রয়াসের ব্যর্থতার কারুণ্যকে এঁকে দিলেন। এটাকেই আমি বলছি 'ভস্মাবশেষ নিয়ে নাড়াচাড়া'। একটু বোধহয় পাশ কাটানোর চেষ্টা এর মধ্যে ছিল।

তিনটি রচনারই (আরো এ জাতীয় রচনা আছে, আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় এই তিনটিকে বেছে নিয়েছি) আর একটি সাধর্ম্য

আছে। তিনটি রচনাতেই মধ্যবিত্ত বাসনার লুব্ধ এবং মুগ্ধ সংকীর্ণতাকে আঘাতের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আমাদের শহুরে আত্মরক্ষা-প্রবণতা শেষ পর্যন্ত কোন আত্মবিকারে পরিণতি পায়—তিনটি উপন্যাসেই তা দেখানো হয়েছে। এই ফ্রেমটা মেনে নিলে 'হাজার চুরাশির মা' এ প্রসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে ক্রোধ থেকে সমস্ত ব্যাপারটার জন্ম, লেখিকা এই বইয়ে সেই ক্রোধের উৎস ও বাস্তব উপাদানটি সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র রুইতন কুর্মির পরিণতির পর্যায়কে যত যত্নে এঁকেছেন সমরেশ, তত মনোযোগে তিনি রুইতন কুর্মির স্বপ্নকে আঁকেন নি। অথচ স্বপ্ন আর রিয়্যালিটির সংঘাতে কে হারল, কে জিতল দেখাতে গেলে দুয়ের ওপরেই জোর দিতে হবে, যেমন দিয়েছিলেন টুর্গেনিভ 'ভার্জিন সয়েল'-এ, যেমন দিতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'-এ। 'শ্যাওলা'-র ত্রুটি গভীরতর। এটা যে কোনো স্বপ্নের বিষয় ছিল সেটাকেই শীর্ষেন্দু বোঝেন নি। নায়ক হিরন্ময় শুধু একটা রক্তাক্ত পর্বান্তের পরাভূত চরিত্র। হিরন্ময়-রূপালি ঘটনার কারণেই এই পর্বান্ত লেখকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। এখানে এর সীমাবদ্ধতা। শেষাংশের নাট্যপরিকল্পনার চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও তা যে গল্পকে গভীরে নিয়ে যায় না, তা এই কারণে।

৭.

যাঁরা কবি, তাঁদের কারো কারো কাছে বাস্তবের এই চাপ বিচিত্র ফলপ্রসূ হয়েছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' (১৯৭২) উপন্যাসে এক সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ লভ্য। একটি নামহীন বন্দীশিবির, সম্ভোগ যেখানে বাধ্যতামূলক, সেখানকার কয়েদিদের জীবনের যান্ত্রিক অনিবার্যতা যেন এই সভ্যতার, বা আধুনিক অস্তিত্বের চরম অবস্থার রূপক। রূপক এবং প্রতীকে মেশানো এ কাহিনী। যখন লেখা হয়েছে তখনকার বিস্ফোরক অবস্থার ইঙ্গিত এতে আছে। মানুষগুলি সামূহিকভাবে ওই বন্দীশিবিরে কখনো কখনো স্মরণ করতে চেয়েছে দীর্ঘবিস্মৃত ভালোবাসা, বিরহ, যন্ত্রণা ইত্যাদিকে। প্রত্যক্ষ বাস্তবের অবয়ব আরেকটু স্পষ্ট হলে লেখাটি আরো লক্ষ্যভেদী হতো। কন্তু আমরা ভুলে যাই না লোকনাথ স্যুররিয়্যালিস্ট কবি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'হাংরাস' (১৯৭৩) আর একটি উপন্যাস—যা কবির হাত থেকে এল। এখানেও প্রিজনওয়ার্ড। অনশন ধর্মঘট উপন্যাসের

মূল ঘটনা। দেখা যাচ্ছে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন জেলখানা হতে চলেছে—প্রিজ্‌নওয়ার্ডের গল্প অন্তত দুজন কবি তখনই বলতে বসেছেন। দমদম জেলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় একটা গান লিখেছিলেন—'হরতাল, ভাই ভুখ হরতাল / ক্ষুধার্ত চোখে ঘৃণা জেগে থাক / মৃত্যুর ভয় ডর ঘুচে যাক।' বর্তমান প্রবন্ধকার অনশনে অবশ্যই যোগ দেন নি (খেয়েই টিকতে পারি না, তো না খেয়ে!) কিন্তু সেখানে গানটি খুব উৎসাহের সঙ্গে গাইতেন। বইটিতে গানটির দেখা পেলাম না বলে দুঃখ পেলাম। লোকনাথের রূপক-নির্মাণ-প্রয়াস সুভাষদার নয়। সেই অর্থে ঠিক কবির লেখা নয়, বরং ঔপন্যাসিকের লেখা। ছবি পট সবই স্পষ্ট। বাদশার আখ্যানটাই যা একটু বাড়তি।

অরুণ মিত্রের 'শিকড় যদি চেনা যায়' (১৯৭৯) কবির লেখা উপন্যাসই বটে, সেখানে কিন্তু সময়ের এই চাপটা নেই। মারিয়া, পিটার, পলাশ, অঞ্জলি—এদেশ এবং ওদেশের পট-পরিবেশ—পলাশের অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা কবির স্বভাবানুযায়ী অনুচ্চকণ্ঠে, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। কোনো সমস্যা বা সংকল্পের আবর্ত এখানে নেই। অন্যদিকে নেই কোনো মিথ্যা ভাবাবেগ। একটা অন্তর্লগ্ন বিষণ্ণতা, যা ক্লেদাক্ত করে না, বরং বিশুদ্ধ করে তোলে—তার স্বাদ পাওয়া যায় এই লেখায়। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অরুণ মিত্রের সে দান আমরা গ্রহণ করি।

৮.

কবির লেখা উপন্যাসের কথা বলতে বলতেই মনে পড়ে যায় কবিকে নিয়ে লেখা উপন্যাস 'এই তার পুরস্কার' (১৯৭২)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই উপন্যাসটিতে এই কথাটা প্রধান হয়ে উঠেছে, শিল্প এবং শিল্পীর চেয়ে জীবন অনেক স্বাধীন, নির্মম এবং সে কারণেই সত্যিকার শিল্পীকেও তা টানে অমোঘ ভাবে। রামানন্দ আমার চেনা নয়। কিন্তু রামানন্দের এই জীবন-সন্ধ কাব্যবৈরাগ্য অনেক বেশি সচেতন আধুনিক কবির ব্যাপার এটা বুঝি। মধ্যবিত্ত জীবন ধরে যারা উপন্যাস লেখেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের সময়ের শক্তিমান ঔপন্যাসিকেরা রয়েছেন—রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু। এঁদের মধ্যে সমরেশ বসুই একমাত্র যাঁর লেখায় বাংলা উপন্যাসের তিরিশের তিন প্রধানের ঐতিহ্য বোঝার চেষ্টা আছে। তাঁর লেখায় একটা বাঙালি-আবহাওয়া থাকে। বিমল কর এবং রমাপদ চৌধুরী

(আমি 'খারিজ' 'গ্রহণ' প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন লেখাগুলির কথা অবশ্যই ভুলে যাচ্ছি না ; কোনো সৎ পাঠকই এগুলো ভুলতে পারেন না) যে জীবন আঁকেন তা যেন বড় বিবর্ণ, তাঁদের অভিজ্ঞতার জগতটা বড় ছোট। অথচ এঁরা দুজনই আগের দশকে 'এখনই' এবং 'যদুবংশ' লিখেছিলেন। এখন প্রায়ই দেখি এঁদের পাত্রপাত্রীরা স্মৃতির পটে রেখান্বিত হতে চায়—ত্রিমাত্রিক হয়ে ওঠা তাদের লক্ষ্য নয়। সে তুলনায় জ্যোতিরিন্দ্রের উল্লিখিত নভেলটিতে একটা প্রত্যক্ষের জল-হাওয়ার ছাপ আছে। জীবন যে এই মধ্যবিত্ত খাতে ফেলা নিঃস্রোত এক পল্বলের আকাশ-বিলাস মাত্র নয়—সে যে এখানেও বেগবান এবং এখনকার অর্থেই নাটকীয়, 'এই তার পুরস্কার' সে কথা আমাদের ভুলতে দেয় না।

এঁদের পরবর্তী বয়ঃক্রমের ঔপন্যাসিকদের চেষ্টার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেঞ্জ'-এর কথা আগে বলেছি। বোধিসত্ত্ব এবং আধুনিক স্বদেশ-পট নিয়ে তিনি যে-উপন্যাসটি লিখেছিলেন (সম্পূর্ণ অনুচিত হয়েছে আমার পক্ষে উপন্যাসটির নাম ভুলে যাওয়া) সেটি এই দশকে তাঁর তো বটেই অনেক উপন্যাসের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে আমি সেই কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে খুঁজে পাই, 'গরম ভাত' গল্পের লেখককে পাই। দুঃখের বিষয় (তাঁর পক্ষে সুখের বিষয় বটে) তিনি এত বেশি লেখেন যে, তাঁকে অবিকল খুঁজে পাওয়া দায়। তিনি নিজে তাঁর সব লেখা পড়ে উঠতে পারেন ?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর একটা বক্তব্য আছে। জীবনকে তার নিজছন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আধুনিক অনন্বয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মোকাবেলা করতে হবে, পৃথিবীকে স্বরূপে জানতে হবে—এসব কথা তিনি তাঁর 'যাও পাখি', 'কাগজের বৌ' প্রভৃতি উপন্যাসে বলেন—বলেছিলেন 'পারাপার'-এ, বলেছিলেন 'ঘুণপোকা'তেও। যতক্ষণ এইটুকু বলেন ততক্ষণ আমরা অবশ্য তাঁর সঙ্গে থাকি। কিন্তু মাঝে মাঝে এই সব কথার আড়াল দিয়ে এগিয়ে আসে এক অভিনব 'আনুকৌলব'। তখনই আমার ভয় হয়। এও যে সেই মধ্যবিত্ত সংকটের আরেক রূপ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬) তাঁর অন্য উপন্যাসের ক্রুটি থেকে মুক্ত। তাঁর উপন্যাস পড়লে (যেমন 'স্বর্গে তিন পাপী' বা 'চন্দনেশ্বর জংসন') আমার কেবলই মনে হয়, তিনি কাঠ আর খড় এক জায়গায় করতে জানেন না, জানলেও কেরোসিন খুঁজে পান না, পেলেও দেখা যায় তাঁর দেশলাই ভিজে। 'ঈশ্বরীতলার

রুপোকথা'-র অনাথের বেলা এসব প্রশ্ন ওঠে না। অনাথের গরু, কুকুর, হাঁসেরাও জীবন্ত—অনাথের সঙ্গে তাদের ভাবসংযোগ আছে। উমা, অরুণ, বরুণ সব মিলিয়ে নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিতার্থতার বাইরের আস্তো একটা মানুষকে, তার সাধ এবং পরাজয়কে শ্যামল যত্ন করে এঁকেছেন। 'কুবেরের বিষয়আশয়'-এর পর এ একটা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮) কতকটা আঞ্চলিক উপন্যাস। বাদা অঞ্চলের লোকায়ত বিশ্বাসকে ঘিরে এই উপন্যাসের গৌরী-কাহিনী লেখা হয়েছে। দয়াল লক্ষণ, ঈশানকে অবলম্বন করে কাহিনীর নাটারম্ভ সম্পূর্ণ হয়েছে। পরিণতিতে গৌরীর গল্প তত স্পষ্ট না থাকায় আঞ্চলিক উপন্যাসের উপাদান হারিয়ে গেল বলে মনে করি। ঠিক আঞ্চলিক নয় এমন একখানি উপন্যাসের কথা এখানে উল্লেখ করি—সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'নিলয় না জানি' (১৯৭৬)। এখানে নায়িকা মরজিনা। মারফতী সাধনতত্ত্বের ও বীরভূম-মুর্শিদাবাদী পটভূমিতে লেখা এই কাহিনীর আউলদের কথা পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল কালকূটের লেখা পড়ছি না তো? এ বইয়ের নায়িকাও শেষ পর্যন্ত মারফতী সীমা থেকে উত্তীর্ণ হল। বরেন এবং সিরাজ কি তারাশঙ্করের কথাই নতুন করে আবার বলতে চাইছেন?

এই বয়ঃক্রমের লেখকদের মধ্যে মতি নন্দীর শক্তির মান পৃথক। 'স্ট্রাইকার' এবং 'বারান্দা' এক অবিচল-দৃষ্টি লেখকের জীবনের দুই রূপের স্টাডি। এই দুইকে তিনি যেদিন এক করে ফেলবেন, সেদিন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। তুহিন নিস্পৃহতার সঙ্গে সংগ্রামের স্থিরতা সেদিন মিশে যাবে। 'স্ট্রাইকার' যে মাত্র কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস নয়—এটা তিনি মানেন তো?

৯.

আঙ্গিকগত নিরুপায়ত্ব এবং বক্তব্যগত নিঃস্বতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আপাতত এই মুদ্রাটির নাম শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন। দুঃখের বিষয় মুদ্রাটি অচল। বাস্তবের গোলক ধাঁধার মধ্যে ঢুকে তার জটিলতার ছবি এবং আত্মা খুঁজতে গিয়ে এইসব লেখকেরা যে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-উপন্যাস লিখলেন তার হাতা-মাথা আমি আজ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারলাম না। সুব্রত সেনগুপ্ত অনেকদিন আগে তাঁর একটি বই

পাঠিয়েছিলেন। আমি সবিনয়ে জানিয়েছিলাম—আমি প্রতীক্ষায় থাকলাম, কখনো হয়তো বুঝে উঠব। তিনি লিখেছিলেন—তিনিও প্রতীক্ষায় থাকলেন। বোধহয় উভয়তই এ প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল। অমল দত্তের 'তৃতীয় মুদ্রণ' (১৯৭৯), বলরাম বসাকের 'আমি একশটা' (১৯৭৬) পড়লাম। রাত্রে বোবায় পাওয়া মানুষ যেমন ভালো করে স্বপ্ন এবং বাস্তব কিছুই গুছিয়ে বলতে পারে না, এগুলি সে রকম আর কী!

১০.

তবু বলব—সত্তরের দশক উপন্যাসের দশক হিসাবে সব মিলিয়ে অগৌরবের নয়। একথা ঠিক, ইমার্জেন্সির দুর্বহ দুরপনেয়তার মুখোমুখি হয়ে লেখকেরা কখনো ছুটে গেছেন দূর অতীতে, কখনো বা আত্মগোপন করতে চেয়েছেন পুরাণে, আবৃত হতে চেয়েছেন অনচ্ছ রূপকে প্রতীকে, বয়স্করা কেউ কেউ মনোলৌল্যকেই প্রশ্রয় দিলেন পরম প্রযত্নে—তবু এরই মধ্যে উজ্জীবনের সংকেতও ছিল, ছিল আজকের অস্তিত্বের ভাষ্যরচনার নির্মম সংকল্প, ছিল সময়ের দীর্ঘ ছন্দকে ধরে দেবার সময়োচিত তাগিদ, ছিল জীবনের নিবিষ্ট সংগ্রামকে খুলে ধরার প্রয়াস। সমরেশ বসুর 'টানাপোড়েন' (১৯৮০), মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' (১৯৭৪), দেবেশ রায়ের 'মানুষ খুন করে কেন' (১৯৭৬), গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', অসীম রায়ের 'আবহমান কাল' আমাদের গত দশকের উপন্যাস সাহিত্যের সম্পদ।

দেবেশ রায়ের 'যযাতি' (১৯৭৩), 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের সুগঠিত প্রস্তুতিপর্ব। অন্তর্দৃষ্টি ও টেকনিক সম্বন্ধে বিষয়ীর অসামান্য জ্ঞান নিয়ে যিনি একদা 'নিরস্ত্রীকরণ কেন'-র মতো হৃৎস্পন্দন থমকে-দেওয়া গল্প লিখেছিলেন, তাঁর উপন্যাসে আমরা বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ও উপলব্ধির বন্ধুর ভূমিখণ্ডকে নতুন আলোক-সম্পাতে দেখতে চেয়েছি। 'মানুষ খুন করে কেন'-তে সেই চাওয়ার আশা অনেকটা মেটে। এ জাতীয় চরিত্র-পাত্রকে আধার করে বক্তব্যের এমন আধেয় সচরাচর মনে পড়ে না। এ উপন্যাস যেখানে শেষ হয় 'বিবর'-এর ঘটনা যেন সেখান থেকে শুরু। এই উপন্যাসটিও নির্মম অঙ্গুলি-সংকেতে দেখিয়ে দেয়—এ মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব কত ধসা, পচা এবং পতিত। এরকম 'গ্রিম্' উপন্যাস বাংলা নভেলের শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করে। অশ্বিনীর শেষ

পরিণামে যে ব্যক্তি-অশ্বিনী এবং সে যে-শ্রেণীর মানুষ, সেই শ্রেণীর নিয়তির অনিবার্যতা সক্রিয় হয়ে রয়েছে—সে বিষয়ে লেখকের অদ্বয় দৃষ্টিকে একবারের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দেখি নি।

গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি মহাশ্বেতার ভূমিকা। সত্তর দশকের একক বিস্ময় এই লেখিকা। 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের বসাই টুডু আর কালী সাঁতরা অনেকদিনের বকেয়া হিসাব যেন মিটিয়ে দিল। ন্যারেশনের অপ্রতিরোধ্য যে টান-সৃষ্টি, বাচনিক বয়নের যে রুক্ষ উপাদান মহাশ্বেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তার মূলে আছে লেখিকার দেশ-কাল-ব্যক্তি-চেতনার ক্লান্তিহীন পাঠ। সে পাঠ অনেক সময় আমার মতো পাঠকের বিপক্ষে চলে যায়। তার ভ্রান্তিও কখনো কখনো যে ধরা পড়ে না, তা নয়। কিন্তু কোনো ভুল নেই তাঁর অদম্য আন্তরিকতায়, অবিচল দায়বদ্ধতায়—জননীসম্ভব ক্রোধের অকৃত্রিমতায়। সত্তরের দশকে আমাদের অতিবিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণের অহমিকা অর্জনের ও স্ট্যাটাস সিম্বলগুলি সংগ্রহের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার নাগরিক চরিত্রহীনতার একটু দূরেই যে যথার্থ ভারতবর্ষ খিন্ন ক্ষুব্ধ প্রবঞ্চিত—ইতিহাসের সেই বিরাট ট্রাজেডিকে গল্পে-উপন্যাসে মহাশ্বেতা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন—তারাশঙ্করের পরে এ-ব্যাপারে তিনিই অধিকতর অগ্রণী লেখক। আমার বলতে দ্বিধা নেই, তারাশঙ্করের থেকে তাঁর দৃষ্টি অবিকম্পিত। মৃত্তিকায় গ্রথিত বদ্ধাবস্থা থেকে মহাশ্বেতার চরিত্র যেদিন ডাইনামিক হয়ে উঠবে সেদিন এই মহাপ্রাণ শিল্পী এক নান্দনিক সিদ্ধির সাক্ষাৎ পাবেন—যেটা এখনো সবটা তাঁর করায়ত্ত হয় নি।

'টানাপোড়েন' সমরেশ বসুর অনেকদিনের ফেলে-রাখা কলমে লেখা উপন্যাস। 'গঙ্গা'-র পরে এমন উপন্যাস তিনি আর লেখেন নি। সমরেশের 'টানাপোড়েন'-এ বিলাস-কল্প কোনো চরিত্র নেই। তার কারণ কি এই যে, এই উপন্যাসের বিষয়ের সঙ্গে 'গঙ্গা'র মতো তাঁর আবেগের মেলবন্ধন সম্পূর্ণ হয় নি? কিন্তু অনেকদিন বাদে মধ্যবিত্ত জীবন-পরিসরের বাইরে গিয়ে তিনি উপন্যাস লিখলেন। জীবন ও জীবনার্থের প্রত্যক্ষ জল-হাওয়া-মাটির ছোঁয়া লেগে তাঁর ভাষার কান্তি আবার উজ্জ্বলতা পেল। কলম আবার বেগবান হল। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির মতোই এই উপন্যাসের বিষয় ও রূপায়ণের বুনোনে ও বিন্যাসে এমন এক ছিরি-ছাঁদ এসেছে, যা ঐ বালুচরী শিল্পীর মতোই শ্রম ও প্রেমনির্ভর। বর্তমান

বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু ছাড়া এ উপন্যাস আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। কেননা, আর কেউ এমনি করে নিজ সীমা ভেঙে আকাঁড়া জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন না।

গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' এখনও পুস্তকাকারে বেরোয় নি। কিন্তু এ বইটির নাম না করলে সত্তরের দশকের বাংলা উপন্যাসের দশক-তামামি শেষ হয় না। মুসলিম সমাজ-পরিবারের একেবারে ভিতরে চলে গিয়ে তাদের সময়-ছন্দিত বিবর্তন-পরিবর্তনের এমন ছবি বাংলা সাহিত্যে আমরা কেউই পড়ি নি। কিন্তু এটুকু তো গেল লেখকের পরিশ্রমের কথা—তাঁর শিল্পজ্ঞানের কথাও এই সূত্রে অবশ্য স্মরণীয়। সেই শিল্পজ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত হয়ে রয়েছে লেখকের অর্থনৈতিক, ভৌম ও রাজনৈতিক সম্পর্ক-জটগুলি সম্বন্ধে অবধানতা। আমার শুধু মনে হয়েছে শেষ দুটি-তিনটি পরিচ্ছেদে লয় সহসা দ্রুত হয়েছে। আরেকটু সময় এবং ঘটনার সহযোগে, অথবা পিরিয়ডের দিক থেকে আর একটু এগিয়ে এলে উপন্যাসটির ছান্দিক প্যাটার্ন নির্ভুল হবে।

'আবহমান কাল' (১৯৭৮) অসীম রায়ের এমন একটি উপন্যাস, যাকে তাঁর অন্য উপন্যাসগুলি থেকে একটু আলাদা করে ধরতে হয়। 'দেশদ্রোহী' কি 'শব্দের খাঁচায়' কি 'একদা ট্রেনে', ইত্যাদি সব উপন্যাসেই এই লেখক ব্যক্তির ক্রমপরিণামী স্বরূপকে করেছিলেন প্রধান বিষয়। এখানেও তাই। কিন্তু এত বড় সময়সীমা বা কালপ্রবাহকে আশ্রয় করে কাজ তিনি কখনো করেন নি। এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি শুধু তাঁর নায়ক টুটুলেরই নয়, উপহার দিয়েছেন আমার সমবয়সী পাঠকদেরও শৈশব-কৈশোর-যৌবনের পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের স্মৃতি। অথচ স্মৃতিরস নয়, এই বইয়ের প্রধান কথা কত রাশিফলের যোগবিয়োগ কাটাকুটির ভিতর দিয়ে টুটুলের হয়ে ওঠা। সেই রাশিফলগুলিই তো আমাদের গতকাল-আজ-আগামীকালের রিয়্যালিটি।

সাতের দশকের বাংলা উপন্যাস আমাদের একটা ভরসা দিয়েছে—সে ভুল করতে পারে, ভুল বোঝাতে চাইবে না।

৮

গল্পে সত্তর দশক

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

'সত্তর দশকের গল্প'[১] সম্পর্কে কিছু বলার আগে দেখে নেওয়া প্রয়োজন এই দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমি কি ও কেমন? রাজনৈতিক শব্দটি ইচ্ছা করেই আগে বসান হল, কারণ ১৯৬৬ থেকে, খাদ্য আন্দোলন থেকে, যে অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, তা কোনো নতুন ঘটনা নয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে-তে তথ্য প্রকাশিত হয়, ১৯৬০-৬১-তে গ্রামের শতকরা ৩৮ ভাগ লোক জীবনধারণের ন্যূনতম মানের নীচে ছিল, ১৯৬৮-৬৯-এ দাঁড়ায় সেটি শতকরা ৫৪ ভাগ। এ ইতিহাস পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর, তারও আগে, আরও আগের ইতিহাস। ভূমি-সংস্কারের নামে যে প্রহসন চলেছে ও চলছে, তার কথা সকলেরই জানা—প্ল্যানিং কমিশনের রিভিউই বলে যে শাসনব্যবস্থার সাধারণ-দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে ভূমি-

---

১. প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য, ১৯৭০-এর দশকে প্রকাশিত সব গল্প আমি পড়ি নি। এমন কি যেসব গল্প পড়েছি, তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়, তাদের সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রেই নীরব থেকেছি, অনেকের উল্লেখ মাত্রও করা যায় নি। যাদের উল্লেখ করা হয় নি, তারা যে সকলে গল্প হিসাবে খারাপ, তা নয়—আসলে সত্তর দশক যেহেতু আমাদের আলোচনার প্রাথমিক সীমা, সেহেতু সে দশকের বিশেষ চরিত্র ও প্রবণতার নিরিখেই এ আলোচনায় গল্প বাছা হয়েছে। নিশ্চয়ই এক্ষেত্রেও মতপার্থক্যের অবকাশ প্রবল, কিন্তু আলোচকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি মানতেই হবে এখানে, এমনও হতে পারে যেসব গল্প ও লেখকের উল্লেখ-আলোচনা এখানে করা হয়েছে, অন্য আলোচকের আলোচনায় তাদের নাম আদৌ থাকবে না, ভিন্ন গল্প ও লেখক গুরুত্ব পাবেন—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিস্টোফার হিল যাকে বলেছেন **worm's eye view**, তাই। তাছাড়া, কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকের, ধরুন অসীম রায়ের, বিচার বিচ্ছিন্ন উপন্যাস বা গল্পে হয় না, হয় তাঁর সামগ্রিক কাজ ধরে, কিন্তু এ আলোচনায় যেহেতু 'সত্তর দশক' প্রাথমিক গুরুত্ব পায়, সেহেতু তাঁর 'হরিদ্বারে ত্রিসন্ধ্যা'র উল্লেখ আমরা করি না, এ-গল্প অন্য দশকেও লেখা যেত। সর্বোপরি, দশক-ওয়ারি গল্প-আলোচনায় ব্যক্তিগতভাবে আমার আস্থা কম, কেননা এমন গল্প এ দশকেও লেখা হয়েছে, যাদের নিয়ে পৃথক প্রবন্ধ এমন কি বইও লেখা চলে। যেমন বালজাক-এর **Sarrasine** নিয়ে রলাঁ বার্তে করেছেন। এক্ষেত্রে দশক-নির্ভর বিচার ভ্রান্ত হতে পারে।

সংস্কারকে কার্যকর করার ব্যাপারে অনীহা। আর 'সবুজ বিপ্লব' নামক আমেরিকা-প্ররোচিত যে ব্যাপারটি ৬০-এর দশকে ভারতবর্ষে ঘটল, তার সম্পর্কে নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান দমন করার কয়েকদিন পরে লেখা চেস্টার বোলস-এর মেমরাণ্ডাম পড়লেই জানা যাবে। আসলে স্বয়ং গান্ধীও কৃষক আন্দোলনকে 'ফ্যাসিবাদ' হিসাবে দেখেছিলেন, ১৯৩৮-এ নেহরুর কাছে বারবার কৃষক-বিক্ষোভ সস্তা ও হাস্যকর মনে হয়েছিল। অন্যদিকে, শিল্পের ক্ষেত্রেও মন্দা ভারতবর্ষের অর্থনীতির অঙ্গ হতে বাধ্য: কেন তা গুণ্ডের ফ্র্যাঙ্ক, পল বারাণ এসব পড়লেই বোঝা যাবে—বিদেশী ফাঁস ক্রমশই বাড়ছে, বাড়বেও। শহরে প্রলেটারিয়েট, পাতিবুর্জোয়া, ছাত্র—এই ত্রিমুখী শক্তি এই শিল্প সংকট, সরকারী শিল্পনীতির প্রত্যক্ষ শিকার। আর যেহেতু এরাই সব থেকে মুখর, তাই এদের প্রতিক্রিয়াই তীব্রতর হয়। সাহিত্যেও প্রতিফলিত এদের দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ এখনও প্রধানত পাতি-বুর্জোয়া ও ছাত্ররা বাংলা সাহিত্যের লেখক ও পৃষ্ঠপোষক। কৃষক বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস সত্ত্বেও কৃষক-আন্দোলনের চালিকাশক্তির অনেকটা এদের হাতে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামে, প্রলেটারিয়েট তো বটেই, অন্য দুটি সামাজিক স্তরেরও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—যেমন গুরুত্বপূর্ণ সত্তর দশকে। বস্তুত অর্থনৈতিক দিক থেকে সত্তর দশক ও তার আগের বছরগুলি, বিশেষত ১৯৬৭-র পর, নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়—ভিতে, উৎপাদন সম্পর্কে একই ধারা, কেবল নৈরাজ্য ও ভাঙনের চিহ্ন আরও স্পষ্ট। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক রদবদল, বিশেষত বাংলা দেশে। ৬৭ ও ৬৯-এ দুটি যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা। ৭১ থেকে উল্টোরথ—জরুরি অবস্থায় যার পরিণতি। আবার ৭৭-এ বামফ্রন্টের আগমন—সত্তর যখন শেষ হচ্ছে তখন আবার ৬৯-এর অবস্থাই খানিকটা—কেন্দ্র ও রাজ্য দলীয় আধিপত্যে বিপরীতমুখী। এর সঙ্গেই ১৯৬৭-তেই ঘটে নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান—যা অচিরেই সর্বভারতীয় গুরুত্ব পায়। ১৯৬৭-১৯৭২—এই পাঁচ বছরে এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ব্যর্থই হয়েছে এ আন্দোলন, অন্তত প্রচলিত হিসেব-নিকেশে। কিন্তু এ আন্দোলন নতুন ভাবাদর্শ ও চৈতন্যে আলোড়িত করে দিয়ে গেছে সমাজের সচেতন স্তরকে—যার প্রমাণ বারবার পাওয়া যায় সত্তর দশকের গল্পে। এ আন্দোলনের ফলে মারাত্মক অন্তর্সাম্যবাদী খুনোখুনি যেমন বেঁধে গেছে, তেমনি এ আন্দোলন মধ্যবিত্ত সত্তার আবরণ ও ফাঁকিকে স্পষ্ট

করে দিয়েছে, বীরত্বে এই আন্দোলনের ছেলেরা যেমন অম্লান ইতিহাস রেখেছে, তেমনি পরবর্তীকালে এদের অনেকেই বিন্যস্ত করেছে নিজেদের এই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে—আমাদের বামপন্থী আন্দোলনের, মৌখিক ঘোষণার শূন্যচারিতা স্পষ্ট করে দিল এ আন্দোলন, কৃষকদের সম্পর্কে নতুন চেতনা, নতুন বোধ নিয়ে এল। কি ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স-এর ওপর বর্তমান সমাজ-শাসনব্যবস্থা দাঁড়িয়ে, তার মাধ্যম ও উপায় কত বীভৎস, হাজার হাজার ছেলে তাই দেখিয়ে দিল প্রাণ দিয়ে[১]। সব মিলিয়ে তারা জানিয়ে দেয় বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে না পারলে মুক্তির পথ তৈরি হবে না।

সত্তরের দশকের গল্পকারদের চৈতন্যে এই আন্দোলন প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে, সদর্থক-নঞর্থকভাবে ছায়া ফেলেছে—সেই সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কহীন রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষাদগ্রস্ত করেছে। সত্তর দশকের গল্পে লড়াই আছে, মানুষের নিজস্ব জোরের কথা আছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে আছে বিষাদ, অন্ধকার তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ছেঁদো আশার কথা কেউ শোনান নি। অন্ধকারের শরীর-সংস্থানকে, বিষাদের স্নায়ুকে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁরা—কারণ জানেন বক্তৃতার আশায়, শুধু স্বপ্নে মুক্তি আসবে না, অন্ধকারকে চিনতে পারলেই আলো আনা যাবে। লক্ষণীয় বিষয়, বেশির ভাগ গল্পে মধ্যবিত্ত ও কৃষকরা, ক্ষেত-মজুর, ট্রাইবাল জগৎ যতটা এসেছে, শ্রমিক সে তুলনায় খুবই কম। শংকর বসুর 'কপিলের মুলুকযাত্রা'-র মতো গল্প ছেড়ে দিলে অথেনটিক শ্রমিক প্রায় আসেই না। মধ্যবিত্ত-নেতৃত্ব-কেন্দ্রিক কৃষিবিপ্লব-সন্ধানী আন্দোলনের চাপ লেখকদের কল্পনাকে এভাবেই স্পর্শ করেছে—খানিকটা যথার্থভাবেই চাষী ও তার জগৎ গল্পে এসেছে সত্তর দশকে এমন ভাবে, যা আগে আসে নি। দেবেশ রায়, শংকর বসু, অমর মিত্রদের গল্পে চাষী-ক্ষেতমজুর যে মাত্রায় ও যে বীক্ষায় এল, বলতে দ্বিধা নেই তারাশঙ্করে বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়তেও সেভাবে আসে নি। দেবেশ রায়ের 'জোত-জমি' বা 'মূর্তির মানুষ', শংকর

---

১. কেবল স্বপ্নের জন্য, আদর্শের জন্য তারা এটা করে। নচেৎ ৩০০ জন আণ্ডার ট্রায়াল-এর যে পুলিশী সার্ভে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, কলকাতায় এই বন্দীদের সবাই ১৬ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে শতকরা ৭·৫ ভাগ মার্কস গুরুত্ব দিয়ে পড়েছে, আর ছ-জনের মধ্যে একজন মাও-এর লেখার সঙ্গে পরিচিত।

বসুর 'ভূঃ', 'বাদার গল্প' ১, ২, ৩ বা সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে ছিরু মাঝি কিংবা অমর মিত্রর 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'-এর একাধিক গল্প এ মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে। শুধু চাষী-ক্ষেতমজুর-জোতদারই নয়, গ্রামই আসে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, নতুন ভাষায়—যেহেতু বিষয়ের ধারাবাহিকতা রূপবন্ধন, আবার রূপবন্ধনের ধারাবাহিকতা বিষয়, সেহেতু এ সমস্ত গল্পের ভাষা কিন্তু বিষয়ের মতোই নতুন: কখনও আঞ্চলিক কখনও জটিল, কখনও মুড অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। উল্লেখের বিষয় 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'মতিলাল পাদরী' বা 'নিম অন্নপূর্ণা'র লেখক কমলকুমার মজুমদার নিজের সৃষ্ট দুর্গে যাদুঘরে আটকে গেলে কি হয়, তাঁর ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস, বহু ব্যবহারে জীর্ণ নীরক্ত শব্দের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম (সত্তরের দশকেও 'লুপ্ত পূজাবিধি' নামক উল্লেখযোগ্য গল্প তিনি লেখেন) হারায় না: দেবেশ রায়, শংকর বসু, বিশ্বনাথ বসুর মতো গল্প-লেখকদের নিজস্ব রসায়নে ছায়া ফেলে। বিশ্বনাথ বসু খুব বেশি না লিখলেও, বিষয়কে ধরার পরীক্ষায় ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এঁদের ভাষার সতর্কপাঠ একান্ত প্রয়োজনীয়—বস্তুত আমাদের মধ্যবিত্ত-চর্চিত ভাষা থেকে অনেক দূরে এসব গল্পের ভাষা, আর বিষয়ের মতোই যেহেতু স্বেদাক্ত বাস্তবের মুখের ভাষার স্রোতস্বিনীতে এঁরা নামেন সেহেতু আমাদের মধ্যবিত্ত অভ্যাসে ধাক্কা দিয়ে যায়।[১] একথা আমি বলছি না এঁরা সকলেই ইতোমধ্যে ঈপ্সিত সার্থকতা পেয়েছেন, নিশ্চয়ই দেবেশ রায় অনেক পরিণত, কিন্তু শংকর বসু, অমর মিত্র বা বিশ্বনাথ বসু যে বিষয় ও রূপের দ্বান্দ্বিক মিলনবিন্দু খুঁজছেন, কখনও কখনও পাচ্ছেনও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া তাঁদের উপস্থাপিত জগচ্চিত্র, তাঁদের দেখবার ভঙ্গি বড় নতুন—১৯৬৭-৭২-এর আন্দোলনের ফলবাহী, আকাঁড়া বাস্তব আসছে ভাষাগত পরীক্ষার শুদ্ধতার পথে: যে কথা প্রথমেই বলেছি এঁদের প্রতি মনোযোগ পৃথকভাবে দিতে হয়, দশক-ওয়ারি আলোচনায় যা সম্ভব নয়।[২]

১. এর অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ: হাসান আজিজুল হক-এর 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পটি—এঁর ভাষা বাস্তবিকই অনুধাবনীয়। কমলকুমার মজুমদারের অনুসারী কিন্তু অপ্রয়োজনীয় আর্কেইজম-এর ঝোঁক নেই। গল্প হিসাবেও প্রথম শ্রেণীর।

২. 'এ প্রসঙ্গে ১৯৭৯-র 'পরিচয়ে'র অমিয়ভূষণ মজুমদারের অসামান্য 'মহিষকুড়ার উপকথা'—শারদীয় লেখাটির কথা বলতে চাই। অনবদ্য এ রচনা—কিন্তু ছোটগল্প কি? উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত।

১৯৬৭-৭২-এর অভিজ্ঞতা ও সত্তর দশকের তথাকথিত রাজনীতি একদিকে যেমন নিয়ে আসে রাজনীতি সম্পর্কেই নতুন অভিজ্ঞতার গঠন, এ যাবৎ লালিত রাজনীতিগত মোলায়েম বিশ্বাসগুলোর চুরমার হয়ে যাওয়া, তেমনি এর সুযোগ নিয়ে 'রাজনীতি' ঘটনা বা ফেনোমেননটাই যে খারাপ এমন কথাও নানা গল্পে বোঝানোর চেষ্টা হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রতন ভট্টাচার্যের 'রাজার এঁটো' গল্পটি—এ ধরনের গল্পে এটাই বোঝাবার চেষ্টা হয় রাজনীতিই খুনীর আশ্রয়, রাজনৈতিক মিছিলই খুনীর আধার। অথচ এর বিপরীতে সেই ১৯৭৩-এই রাজনৈতিক হত্যা নিয়ে কি মানবিক গল্পই লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'শোকমিছিল'। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'র পর রাজনৈতিক পরিবার নিয়ে, একেবারে রাজনৈতিক কাহিনী 'শোকমিছিলে'র মতো আর নেই। এ গল্পে সাময়িক খুনোখুনি, যা আসলে ভ্রাতৃহত্যা ছাপিয়ে উঠেছে লেনিনের মুখ আঁকা মেডেল, আর লাল পতাকা। মা পারুলের মধ্যেই দীপেন্দ্রনাথ আমাদের ভ্রান্তপথের প্রায়শ্চিত্ত দেখেন, তার দৃঢ়তায় স্পষ্টতায়, সেই তো প্রতীক: যে মেলাতে পারে বিশ্বাসকে কমিউনিস্টের ভাঙনেও, হোক না এখন তা শ্মশানে—কিন্তু পতাকাও লেনিনের মুখ: একে তো রাখতেই হবে ঐ শ্মশান পেরোবার জন্য। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথ তো আর লিখবেন না—এই আকাশছোঁয়া দ্বান্দ্বিক মানবতা কার লেখায় পাব? পাব তাঁরই উত্তরাধিকারীদের কাছে। গল্পে ও কাজে।

১৯৬৭-৭২-এর অভিজ্ঞতা নানা লেখককে নানা ভাবে স্পর্শ করে। অসীম রায়ের দুটি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'অবনীভূষণ চাটুজ্জে-সুষমা' এবং 'সলবেলো বাড়িওয়ালা বাংলাদেশ'। সত্যনিষ্ঠ রিপোর্টার অবনীভূষণ, যখন কুড়ি বছরের চাকরির ইস্তফা দেয় তখন 'সব কিছু ভেঙে পড়েছে, যখন বিপ্লব বলতে চার দিক ফর্সা তখন বিপ্লবের পতাকা তুলে নিল অবনী-ভূষণ, যেন তার বয়স বিয়াল্লিশ নয়, বাইশ।' আন্দোলন ভেঙে যাচ্ছে, সবাই ধরা পড়ছে, কিন্তু অবনীভূষণের স্বপ্ন ভাঙে না, বিপ্লবের কবিতাকে সে বাঁচিয়ে রাখে। চাটুজ্জে তার নিরাপদ জীবন অবনীভূষণকে আশ্রয় দিয়ে ভাঙতে চায় না, আবার পুরনো সহকর্মীকে ফেরাতেও পারে না: বোঝে, অবনীভূষণের কথায় কোথাও একটা সত্য আছে। সেও তো যৌবনে বিশ্বাস করত কবিতায়—অবনীভূষণের কথাবার্তা অদ্ভুত কবিতা—যে কবিতা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিজের আগুনে পুড়ে নিঃশেষিত। চাটুজ্জের আর সে কবিতা নেই,

অবনীভূষণই সেই কবিতা, যাকে সে এড়াতে চায়। অসীম রায়ের কৃতিত্ব এই, তিনি আরও অনেক গল্প লেখকের মতো ১৯৬৭-৭২-এর স্বপ্নকে রগরগে নাটক ভাবেন না, স্বপ্ন ছাড়া যে বিপ্লব হয় না, আবার বিপ্লব যে একটা ভয়ঙ্কর বাস্তব অনাটকীয় ব্যাপার—কবিতার মতোই—এটাই দেখাতে চান অবনীভূষণের মধ্যে—তার সূত্রেই একদা বিপ্লবে বিশ্বাসী চাটুজ্জে ও তার স্ত্রী সুষমার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সুখ, চালাকি, হয়তো বা ক্বচিৎ যন্ত্রণাও ধরে দেন। চাটুজ্জের ছেলে বোঝে, 'অবনীকাকু মা বাবা প্রত্যেকের জগৎ আলাদা এবং কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই।' অন্য গল্পটিতে ৬৭-৭২-এর সামগ্রিক প্রত্যাখ্যান অন্যভাবে এসেছে—সল বেলো পাঠরত এক মধ্যবিত্ত যে নিঃসীম শূন্যে দুলছে, যার কাছে মানুষ শিক্ষিত উল্লুক, এমন এক মানুষের নীচেরতলা ভাড়া দেওয়ার প্রসঙ্গে অসীম রায় একটি বিষয় জানান—তাঁর গল্পে ইদানীং সিদ্ধান্ত প্রমাণ, ধারণাটা প্রায় গল্পছাড়াই থাকছে। আমাদের বর্তমান মূল্যবোধ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, এসব পেরিয়ে এ গল্পের চরিত্রটিও পেতে চায় তার ঘুমন্ত রাজকন্যাকে : বাংলাদেশ না বিপ্লব? দুটোই। এই সামগ্রিক প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা ৬৭-৭২-এর রাজপুত্রেরা আন্তনিও গ্রামসির আধুনিক রাজপুত্রেরা, এমনভাবে দেখিয়ে গেছে যে, বুদ্ধদেব গুহ ('শান্তকে পাওয়া যাচ্ছে না') বা প্রতিভা বসু ('অভ্যর্থনা')-র মতো তরল লেখকও এই ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পেশাদার পপ্যুলার লেখকও (এ প্রসঙ্গে আব্রাহাম কাপলানের উক্তি মনে পড়ে **'popular art is not the degradation of taste but its immaturity**) 'গরম ভাত' অথবা 'নিছক ভূতের গল্প'-এর মতো গল্প লিখেছেন, এতেই প্রমাণ হয় চাপটা কত প্রবল। এর বিষয়বস্তু সত্তর দশকের নতুন চৈতন্যেই সম্ভব। যে গরম ভাতের জন্য ক্ষুধা শেষ পর্যন্ত নিবারণকে পিতৃহত্যায় নিয়ে যায়, তার সঙ্গে ভূত ধরার প্রসঙ্গে সমস্ত ঘটনাই এক নতুন মাত্রা পায়, যদিও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ও সংযুতিবোধের অভাবে গল্পটি ছড়িয়ে যায়, মাঝে-মধ্যেই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে, তবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য-নির্ভর এদেশীয় জীবিকার অপরিণত জগৎ থেকে বেরোতে চান, তার প্রমাণ এ গল্প। যেমন প্রমাণ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোঘ্ন'। সত্তর দশকের শেষে লেখা এই অসাধারণ গল্পটি লেখকের ক্রান্তি-কালের দৃষ্টান্ত হতে পারে : গ্রামজীবন নিয়ে তাঁর অনেক গল্পেই অভিজ্ঞতার ছাপ থাকে। কিন্তু শিল্পের সত্যে জীবনের ব্যাপ্তি থাকে না : এখানে তা আছে। সত্তরের দশকের, ৬৭-৭২-এর অভিজ্ঞতার এখানেই জিৎ :

তবে বেরোতে পারবেন কি? ৭২-এর পরের ইতিহাস তো ভয়ঙ্কর, চরিত্রহীন, সন্ত্রাসে শাদা কাপড়ে ঢাকা।

১৯৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত, ৬৭-৭২-কে নির্মূল করার আয়োজন চলে, অনেকটা সফলও হয় এই প্রচেষ্টা। এই সন্ত্রাসের সামগ্রিক ভয়ের আবহাওয়া বহু গল্পেই ফোটে, হত্যা-খুন, অত্যাচার নানা গল্পের বিষয় হয়, ১৯৭৭-এর পর নাটকীয় অত্যাচারকে উপজীব্য করে গল্প লেখা হতে থাকে। ৬৭-৭২-এর স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গিয়ে সত্তর দশক ভীতির দশক হয়ে ওঠে—অন্তর্দলীয় সংঘাত, পাতিবুর্জোয়া ভায়োলেন্স-এর পাশাপাশি বৃহত্তর রাষ্ট্রযন্ত্রের সন্ত্রাস, সর্বোপরি সমাজব্যবস্থার ভায়োলেন্সের দিকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নানা গল্পকারের গল্পে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'নচিকেতা জানিতে চাহিলেন' ও 'রোহিতাশ্বের নামে' গল্প দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১] প্রথম গল্পে এক কেরিয়ারিস্ট অধ্যাপককে লেখক দাঁড় করান পিস্তল হাতে যুবকের সামনে যার 'গ্রহণের সূর্যের মতো এক জোড়া চোখ।' গ্রহণের সূর্যের চিত্রকল্পটি অব্যর্থ—আর দ্বিতীয় গল্পটি শুরুই হয়: 'কে বা কারা কাল রাতে ফটিককে খুন করেছে।' কে বা কারা—এই অনির্দেশ্যতেই সত্তর দশকের অন্যতম বিধিলিপি। কার্তিক লাহিড়ীর 'তাঁর মৃত্যুর ধারাবিবরণী'তেও বারবার শহিদের ফাঁসির প্রসঙ্গ আনেন। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিছিলের জন্য মানুষ' গল্পও আরম্ভ হয় এই ভাবে, 'বিনোদ ঘরে ঢুকেই বলল, সুকুকে ওরা মেরে ফেলেছে, শুনেছিস।' সেই সুকুকে নিয়ে মিছিলের পারমিশন পাওয়া যায় না। তার থেকেও বড় কথা: 'আর দিলেই বা কী লাভ হতো। লোক কই? মিছিলের…।' মিহির সেনের 'আলোয় শুধু' গল্পে হত্যার আতঙ্কই ফোটে: 'গোটা ঝিলটা জুড়েই যেন তাণ্ডব চলছে। হৈ চৈ, চিৎকার, আর্তনাদ, বোমার শব্দ, পাইপগানের গুলির শব্দ।' গল্পের শেষ হচ্ছে, এই ভয়ের রাজ্যে, খুনের রাজ্যে…'আলোকিত ওঁদের কলোনীর সেই শিল্পপতির প্রাসাদটি। নিরাপদ উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ির নিরুদ্বেগ কৌতূহলগুলো একটু ঝুঁকে ঝিলটার অন্ধকার সন্ত্রাসকে নিরীক্ষণ করছে।' এই রকম আরও গল্পের কথা বলা যায়। তবে প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রযন্ত্রের সন্ত্রাস বা অন্তর্দলীয় হত্যা ছাড়াও, সমগ্র সত্তর দশকেই যে অজানা

---

১. অবশ্য অমলেন্দু চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ গল্প, আমার কাছে মনে হয়েছে, 'কিংবদন্তি', যার শেষে আছে, 'আর, আঁধার রাতের কন্যে হাঁটে সোনাডাঙার মাঠে। বাপ্‌ঠাকুদ্দার মাথার খুলি খুঁজতে হবে তাকে।'

ভয়-আতঙ্ক মানুষের মনে চেপে বসেছিল, কালো অন্ধকারকে ফুলিয়ে দিয়েছিল, তার প্রমাণও রেখে যান গল্পকাররা—এমনই একটি গল্প শক্তিমান গল্প লেখক মতি নন্দীর 'শীত'। মতি নন্দী এই দশকের এক সাক্ষাৎকারে ('কৃত্তিবাস') বলেছিলেন, 'ন্যারেটিভ স্টাইল ভাঙা, এসব কাজের বরাদ্দ কে দিয়েছে গদ্য-লেখককে? আমার যা বলার যা বর্ণনার, যা ব্যাখ্যার তা যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আমার লেখাকে ন্যারেটিভ করে তোলে তাহলে অযথা অন্য ভঙ্গিতে আশ্রয় নিতে যাব কোন দুঃখে?…সিনেট হল ভেঙে যে বাক্সটা তৈরি হয়েছে সেটা কি আধুনিক? না কমল মজুমদারের গদ্য? …পরিষ্কার ঝরঝরে করে বলায় অসুবিধাটা কোথায়?' এই উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ, প্রথমত কমলকুমার যেখানে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে প্রভাব-বিস্তারী সেখানে মতি নন্দী লেখক হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন, দ্বিতীয়ত তাঁর গল্পই দেখায় প্রচলিত ন্যারেশন ও ভাষায় সত্তর দশকের জীবনকে প্রকাশ করা চলে।[১] 'শীত' গল্পে বাড়ির মেয়ে ইলাকে একদিন ভোরে পাওয়া যায় না। এই ঘটনা ও তার কেলেঙ্কারির ভয় গল্পটার বিষয়। কিন্তু গল্পের শেষে যখন এই সংলাপ বাজে—'সারা জীবনই কেমন ভয়ে ভয়ে কাটল। ভেবেছিলুম কোনো না কোনোদিন ভয় কেটে যাবে।' তখন বোঝা যায় এ ভয় কেবল একটি ঘটনাগত নয়, সমগ্র মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের। আর সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার স্যাটায়ার লেখেন সুবিমল মিশ্র তাঁর '৭২-এর ডিসেম্বরের এক বিকেল' নামক গল্পে: এই বিদ্রূপ ইদানীং-এ গল্পে থাকে না। একই সঙ্গে মর্মভেদী, হিলারিয়স অথচ প্রতিবাদী।[২] প্যারাবেল জাতীয় গল্পও লেখেন তিনি—'বুর্জোয়া কাগজ যেভাবে…' ইত্যাদি গল্পে। আর এই স্যাটায়ারই সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে দেবেশ রায়ের 'মানুষ রতন' গল্পে—উনচল্লিশটি মৃতদেহ পাওয়া যাবার পর নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত বিচারপতির জবানিতে

---

১. এখানে একটি আপত্তি জানিয়ে রাখি। মতি নন্দী ও আরও অনেকের গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এত অগোছালো, এলোমেলো-ভাবে করা হচ্ছে, যা ক্ষতিকর, বিভ্রান্তিকর। লেখকরাও সম্মতি দিচ্ছেন কেন, বোঝা যায় না।

২. হাসির গল্প, যা শুধু হাসির নয়, লেখাই তো উঠে যাচ্ছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এদিকে চেষ্টা করছেন—দু-একটা ভালো গল্পও লিখেছেন মধ্যবিত্ত সংস্কার, অভ্যাস, পরিস্থিতির সচেতন বিচারে।

গল্পটা বলা—যার শেষ সিদ্ধান্ত হয় 'জনসাধারণের সুবিধার জন্য সরকারের প্রচার করা উচিত কোন্ কোন্ জায়গায় ঘা দিলে মানুষের ব্যথা লাগে না।' বিজ্ঞপ্তি পড়ে 'মারতে ও মরতে যাতে জনসাধারণের কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্য সরকার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে কতকগুলি সুপারিশ করছে।...আপাতত মানুষের মাথা বাঁচাবার জন্যই মানুষের মাথা কাটা দরকার।' ভয়ঙ্কর এই ব্যঙ্গ—বাংলা গল্পে অসামান্য। এই ব্যঙ্গ আরও নানা উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপস্থিত হয় অচিন দাশগুপ্তের রাজনৈতিক-অরাজনৈতিকের বিরুদ্ধ-শিল্পে। সুবর্ণ নামে সাংবাদিক, ভারতীয় পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে ১৯৭৭-এর 'বড়সড়ো পরিবর্তনে'র সুযোগে সদ্যমুক্ত নকসাল-সি.পি.এম মিসাবন্দীদের নিয়ে ফিচার লেখার ইচ্ছা ও অভিযানকে কেন্দ্র করে, ওয়াসিম নামক এক যুবকের চিত্র আঁকেন, দশটি তথ্যচিত্রে ভাগ করে—সমালোচনা-সহানুভূতি ভালোবাসা-ক্রোধ—সত্তর দশকের সব উপাদানই এ গল্পে আছে, আর আছে সুবর্ণ তথা মধ্যবিত্তের প্রতি ব্যঙ্গ। নিশ্চয়ই এ শিল্প আরও অব্যর্থ হতে পারত, যদি লেখক আর একটু আসঙ্গন আনতে পারতেন লেখায়, কিন্তু, যেটুকু হয়েছে তাও অভিনন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে আরও বলি, সত্তর দশকের 'সাময়িক' (আসলে পুরো ব্যবস্থা থেকেই এরা জাত) ঘটনা নিয়েও গল্পও লেখা হয় একাধিক—উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বন্যা নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রী লেখেন 'বেহুলা লখিন্দর ১৯৭৮', রেল ধর্মঘট নিয়ে লেখেন শংকর বসু 'গ্যাঙম্যান নটবরের ভারত আক্রমণ'।

নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর 'খোঁচোড়' গল্পে উল্টো দিক থেকে রাষ্ট্রীয় হত্যাকে ধরেছেন: খোঁচোড়, যাকে বলা যায় 'সরকার অনুমোদিত ঘাতক', তার দৃষ্টিকোণ থেকে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হত্যার কাজে সে নিযুক্ত। তার 'ডানপকেটে সিগারেটের কালো গুঁড়ো, নোনা ঘাম আর যৌনগন্ধের মধ্যে রিভলভারের কালো কোটরটা চোখ খুলে তাকায়...।' নবারুণ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব এইখানে যে, এই খোঁচড়ের ক্রিয়া ও মানসিকতার দর্পণে প্রতিফলিত করতে পারেন সময়কে, সমকালকে। ভাষাটাও করে তোলেন লুম্পেন আতঙ্কের উপযোগী: গল্পটা দাঁড়ায় বিপ্লবী অর্গানাইজার গৌতম বিশ্বাসকে হত্যার ঘটনার ওপর। যে জলসায় তাকে খুন করা হয়, তার বর্ণনায় নবারুণ ফুটিয়ে তোলেন বীভৎস অসাড় মানুষ-কালকে—এর মধ্যেই গৌতমকে খোঁচোড়ের হত্যা, ঐ ভিড়, ঐ মানুষের মধ্যে তার মরে যাওয়া প্রায় প্রতীকী হয়ে ওঠে

গল্পটিতে। গৌতমকে নিয়ে যায় প্লেন-ড্রেস পুলিশ। মাইকে বাজতে থাকে—ভয় পাবেন না, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। পুলিশের অর্ডারে ঘোষিত হয়: আমাদের সংগীতানুষ্ঠান আবার শুরু হচ্ছে, পিয়ানো একর্ডিয়নের সুর বেজে ওঠে। খুব সচেতনভাবেই নবারুণ ব্যবহার করেন নাৎসি, গেস্টাপো, মার্কিন পদ্ধতি শব্দাবলী। পরদিন স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতার কাজগুলিতে ছাপা হবে 'বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে দু-রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়।' কিন্তু নবারুণ এটাও দেখান, এই বিনষ্ট করবার যে অধিকার রাষ্ট্র থেকে ঘাতকটি পায়, তার থেকে তার মধ্যবিত্ত মৃত্যুর ভীতি জাগে, প্রতিটি হত্যাই নিজের মৃত্যুর অনুঘটক হয়ে কাজ করে। সেও ভয়ের রাজ্যে চলে যায়: তার সমগ্র অস্তিত্ব ভীত কৃমির মতো কুঁচকে যায়। বাড়িগুলোকে বিশাল বিশাল জন্তুর মতো মনে হয়, যেন তারা ওৎ পেতে আছে। 'প্রতি-বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' নামক গল্পেও নবারুণ চিত্রকল্পে সময়কে ধরেন: 'কলকাতার সারা গায়ে রাস্তাগুলো ব্যাণ্ডেজ ও স্টিকিং প্লাস্টারের মতো লাগানো।...কলকাতায় পুলিশ ভ্যান সার্চলাইটের আলোয় ব্যাঙের মতো উল্টোন জিভ বার করে মানুষ ধরে।' আর 'আমি ব্যারিকেড হয়ে যুগ যুগ বেঁচে থাকব।' এ গল্পটায় একটা বেদনা আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত: নিজের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে নিজেকে হাঁটতে হয়। এ গল্পটা ঘৃণার, তার থেকেও ভালোবাসার বেদনার। এই গল্পটির সঙ্গে ছাপা হয়েছিল জ্যোৎস্নাময় ঘোষের 'সরীসৃপ' গল্পটি: বভ্রু চ্যাটার্জি নামক ব্যক্তির আত্ম-আবিষ্কার বা সমালোচনার গল্প। রন্টি নামক এক সাহসী যুবককে পুলিশ খুন করছে দেখেও যে সরীসৃপের মতো নীরব থাকে, চাকরিতে উন্নতি করে, তারপর বুঝতে পারে খাকি ও শাদা পোষাকে ঘুরে বেড়ানো মানুষেরা সবাইকে হয় সরীসৃপ করবে নয় মেরে ফেলবে। ১৯৭২-পরের প্রতিক্রিয়ার কায়েম হবার বিষাদই বাজছে।

ম্যুজিল-এর ইয়ং টোয়েরলেস অবলম্বনে একটি জর্মন ফিল্ম দেখেছিলাম, যাতে খুব সচেতনভাবে পরিচালক সেই বিকৃত মানসিকতা, মর্ষকামিতা দেখান যার পরিণতি ঘটে নাৎসিবাদের সামগ্রিক বীভৎসতায়। সত্তর দশকের বাংলা গল্পেও এর আভাস থাকে—এই দশকের একেবারে শেষে প্রকাশিত সমীর রক্ষিতের 'র‍্যাগিং' গল্পটি এরই দৃষ্টান্ত। যে র‍্যাগিং-এর কথা হস্টেলে ঘটে সবাই জানে, তাকেই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে শিল্পায়িত করেন লেখক। বিকৃত মানসিকতা, মর্ষকামিতা কেমন এই সমাজদেহে

জমছে—'পৃথিবীব্যাপী এক বীভৎস উৎসবের সংকীর্তন' কেমন ধ্বনিত হচ্ছে সেটাই সমীর রক্ষিত ধরিয়ে দেন : লুম্পেন ফ্যাসিবাদের মানসিকতার ভিত্তি এমন ভাবেই তৈরি হয়, জমে সমাজের নানা স্তরে। অবশ্য শুধু বিষাদ, শুধু বীভৎস আত্মসমর্পণ, ভীতিই নয়—লড়াই, আশার কথাও পরাজয়ের মধ্যেই আসছে, এ শিকড়হীন আশাবাদ নয়, এ স্বপ্নের, উজ্জীবনের কথা। রবি সেনের 'ঠাকুমার শতবার্ষিকী ও ফাঁসির দড়ি' গল্পটি এই স্বপ্নের, 'আমরা, কয়েক শ বছরের কৃষক বিদ্রোহের কথা পোস্টারে এঁকে আর লিখে তোমার একশটি বছর আমরা উদ্‌যাপন করব।' ঠাকমার তক্তপোষের নীচে রাখা বোমা ফেটে ঠাকমার মৃত্যু হয়। লাল, যার দাদা নীল জেলে, গৃহত্যাগ করে—প্রায় ভিখারী বুড়কীর বুদ্ধিমত্তায় চলে যেতে পারে পুলিশকে এড়িয়ে। তার নতুন ঠাকুমা, নতুন মা-রা কাদায় পা ডুবিয়ে ধানের চারা পোতে, ফসল পাহারা দেয়। আর লাল নীলের চিঠি পড়ে, 'মনে রেখো, শহিদদের চেয়ে জীবিত বীরদের দায়িত্ব অনেক বেশি।'

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর রোমান্টিক স্বপ্ন ও বিদ্রোহের যে সাময়িক বিপর্যয়, তাতে বিষাদ ঘনায় শুধু সামাজিক চৈতন্যে নয়, ব্যক্তিগত মানসেও—১৯৭৭-এর পরের ঘটনাবলীও তার প্রতিবাদ মৌলিকভাবে আনে না, যদিও মধ্যবিত্ত মানস বোধহয় হাঁফ ছাড়ে, হয়তো ব্যাপকতর রুদ্ধতার একটু স্পেসে। এ সময়ই সমাজ-জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রবণতা জাগে। শুদ্ধ শিল্প ও সমাজ-জগতের মধ্যে এক বিরোধ কল্পনা করা হয়, একটু ইনার-স্পেস বা অন্তর্দেশ খোঁজার ইচ্ছা জাগে, যেখানে বাইরের বীভৎসতা থেকে বাঁচা যাবে। এ অন্বেষণে হয়তো বাইরের বিপ্লবী শক্তি সম্বন্ধে অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্লবীর সঙ্গে ঐক্যবোধ গভীর তলদেশে থেকেই যায়—ফ্লোবেয়র সম্পর্কে এক প্রবন্ধে আর্থার রিটজমান ১৯৭৯-র সেপ্টেম্বরের 'জর্নাল অব মডর্ণ হিস্ট্রি'র এক প্রবন্ধে যেমন দেখান। সত্তর দশকের বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই ফ্লোবেয়র নেই, তুলনাও অবান্তর, তবু ছোট উপমা হিসাবে অরূপরতন বসুর গল্পের কথা বলতে পারি। তাঁর 'অবলোকিতেশ' গল্প আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত স্তরের বিচ্ছিন্ন সত্তার মনে হতে পারে, কিন্তু যে আমির জবানিতে গল্পটি লেখা, সে যখন বলে, 'বেঁচে থাকার যুক্তি, মানুষ সংগ্রহ করে তার নিজস্ব মৃত্যুর বিশেষ চেহারা

থেকে। নাটকের সম্ভাব্য সলিল সমাধি তৈরি করে তার জীবনযাপনের মুক্তি, কেরানির নিরবয়ব মৃত্যু তৈরি করে তার কিমাকার জীবন।··· প্রতিদিন ভোরে এক অনাগত পিস্তলের শব্দ আমি আজও ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করি।' তখন ১৯৭৪-এর মানস চিনতে অসুবিধা হয় না। 'বিদীর্ণ হওয়ার আগে যে মুহূর্তটুকু পাওয়া যায়, এমনকি শুধু সেই মুহূর্তটুকুই আজ আমার কাছে ভিক্ষার অতিরিক্ত বলে মনে হয়'— অবলোকিতেশের একের পর এক শিকড়গুলিকে নিরালোক তলদেশে পাঠিয়ে দেওয়া সত্তর দশকের সামগ্রিক বিষাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। 'সিংহাসন' নামক আর একটি গল্পে শঙ্খ ঘোষের 'নিঃশব্দের তর্জনী'র প্রতিধ্বনি করেই অরূপরতন লেখেন: 'আমি কেবল অপেক্ষা করে থাকতে পারি, কখন অন্তস্থল শূন্য হয়ে ওঠে দুটি শব্দের মধ্যবর্তী নৈঃশব্দ্যের মতো।' সংকটের, বিষাদের নির্জনতাতেই মাঝখানের নৈঃশব্দ্য দুটি শব্দের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে যুক্ত হয় না, বড় হয়ে ওঠে ৭২-পরবর্তী মূক হয়ে যাওয়ায়।[১]

---

১. গোষ্ঠীবদ্ধভাবেও গল্প লেখা, গল্প আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা বাংলায় হয়েছে। আগের 'ছোট গল্প: নতুন রীতি'র কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যার শ্রেষ্ঠ ফসল দীপেন্দ্রনাথের 'জটায়ু'। তবে 'সাহিত্যপত্রে'র এক প্রবন্ধে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম, এঁদের মধ্যে স্পষ্ট ভাগ ছিল। এর পর হাংরি জেনারেশন ও শাস্ত্র-বিরোধী গল্প—এই দুটি গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে প্রথমটির সূত্রপাত সত্তর দশকের অনেক আগে, সত্তর দশকেই এর অবসানের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে ১৯৭৫-এর শারদীয় 'পরিচয়ে' আলোচনা করেছি—নতুন কিছু বলার এখন আর নেই। তখনই বলেছিলাম, শাস্ত্র-বিরোধী গল্পকাররা সচেতন চিন্তাভাবনায় ঐক্যবদ্ধ নয়, প্রায় পরস্পর-বিরোধী টানাপোড়েনে দ্বিধা বিভক্ত। তবু কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা সে প্রবন্ধে এঁদের সম্পর্কে বলা সম্ভব হয়েছিল—কিন্তু পাঁচ বছর পরে আর সেটুকুও বলা যাচ্ছে না। 'দেশ' পত্রিকায় সুব্রত সেনগুপ্ত ('আলোক চিত্র'), শেখর বসু ('ছবির সুন্দরী'), রমানাথ রায় ('হে অরণ্যদেব'), কল্যাণ সেন ('দিনযাপন') যে সব গল্প লেখেন, তাতে আর ঐ অনির্দেশ্য শাস্ত্রবিরোধিতা নেই, আছে বড় পত্রিকার বাণিজ্য জগতের গহ্বরে ঢোকা। পঞ্চাশের কবিদের দাপাদাপি বিদ্রোহের মতোই ওসব বিরোধ-টিরোধ এঁদেরও শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা আরও শততাবর্জিত, তার কারণ, এঁদের অনেকেই 'দেশে'র জন্য এক রকম গল্প লেখেন, ছোট পত্রিকার জন্য আর এক রকম: বলরাম বসাকের 'অলীক আন্তরিকে'র সঙ্গে 'কৌস্তুভ'-এ 'আমার জীবন' তুলনা করলেই বোঝা যায়।

সত্তর দশকের গল্পের আলোচনায় তিনজন গল্পকারের কথা পৃথক ভাবে বলতে চাই—সমরেশ বসু, দিনেশচন্দ্র রায় ও মহাশ্বেতা দেবী। এর মধ্যে দিনেশচন্দ্র রায়ই একান্তভাবে সত্তর দশকের লেখক—এই প্রতিভাবান গল্প-লেখক ভবিষ্যতে আর লিখবেন না, ৭৮-এর ১ মার্চ আটচল্লিশে পৌঁছবার আগেই তাঁর মৃত্যু, সত্তরের আগেও বোধহয় কোনো গল্প তাঁর ছাপা হয় নি। তাঁর মৃত্যু, বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে মর্মান্তিক ক্ষতি—তিনি পৃথক প্রবন্ধ-বইয়ের বিষয় হবার যোগ্য, যেমন মহাশ্বেতা দেবী। ঠিক এই ধরনের আলোচনায় তাঁদের প্রতি ন্যায়সম্মত মনোযোগ দেওয়া যায় না, আর সমরেশ বসু, তাঁর প্রায় চারদশক ব্যাপী সাহিত্যিক জীবনে অনেক মোড় ফিরলেন—'স্বীকারোক্তি'র মতো গল্প লেখার পরও ফিরছেন তার প্রাথমিক শিকড়ে, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে এ ঘটনা বিরল।

সমরেশ বসুর 'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পগ্রন্থটিতে বিধৃত গল্পগুলি কিন্তু প্রাক্-বিবর পর্বের সমরেশ বসুর পুনরাবৃত্তি ভাবলে ভুল হবে। 'বিবর' থেকে একটি বেশ বড পর্যায় তাঁর লেখক জীবনে যে গেছে, তার অভিজ্ঞতাও এসব গল্পে ক্রিয়াশীল না হলে, 'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পটিই তিনি লিখতে পারতেন না। দুটি মধ্যবিত্তর মাসের প্রথম রবিবারের মদ্যপানোৎসবেই একটা কারুণ্য থাকে—এরা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি রেনেসাঁসের কথা বলে: তাদের স্ত্রী লোলি-কণা এই রেনেসাঁসে বিশ্বাস করে, আর বিশ্বাস করে বলেই তো 'ওরা মিলের ম্যানেজারের বউয়ের মতো খুব টিপটপ্ গোছ-গাছ করে সুন্দর করে সব কিছু সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসে। ...নীতিবাগীশ—একটাও খারাপ কথা সইতে পারে না, ওদের হচ্ছে ওটা মূল্যবোধ।' শেষ পর্যন্ত এই রেনেসাঁসের আবিষ্কার ঘটে দরিদ্র বেশ্যাবাড়ির বোবা এক ক্ষুধার্ত মেয়ের মধ্যে: 'হাবি নিজের হাতে ভাতের গরাস তুলে ভুগুলের মুখে গুঁজে দিল—রাত্রে পান্তা, সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা মাখা। হাবি হাসছে, চোখে কি ওর স্নেহ; অথচ সংকুচিত জিজ্ঞাসা? ক্ষুধার্ত মাতাল ভুগুল হাবিতেই দেখতে পেল বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে: ও রে শালা পোটো, তোর রেনেসাঁসের মুখ দেখে যা। ...কথা বলতে পারে না—কানে শুনতে পায় না—মুখের ভাত পরকে দেয়।' 'হাবি হাসছে'—আমাদের সামগ্রিক মধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারকেই যেন চাবকে দেন সমরেশ বসু—অথচ স্নেহময়ী হাবির জন্য মমতায় ভরা—হাবিই তো সেই মানুষ, সে নিজের গ্রাস পরকে দিয়ে এসেছে, তবু হেসেছে। 'নিষিদ্ধ ছিত্র' ও 'পেলে লেগে যা'—আসলে একই গল্পের দুটি পর্যায়: নিষ্ঠুর,

দুঃসহ এই গল্প। সারাদিন 'শুয়োরের বাচ্ছা' 'ইঁদুরের বাচ্ছা' শোনা কান্ত কুণ্ডুর দোকানের চাকর কর্মচারী বেন্দার ইতিবৃত্ত এই গল্প দুটি—সারাদিনের অপমানের, পরিশ্রমের, অপূর্ণখাওয়ার ক্রোধ সে মেটায় দোকানের গুদামঘরের ইঁদুরদের মেরে। এই বদ্ধ ঘরেই সে থাকে রাত্রে: 'বেন্দার হাতের মুঠি শক্ত হল, লাঠি উঠল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত লাঠি প্রচণ্ড আঘাতে উঠল, থামল।' অভিশপ্ত দিনের পরের এই উত্তেজনা ও সুখেই সে বাঁচে। বাঁচে কি? 'পেলে লেগে যা'-তে দেখা গেল বাঁচে না। কান্ত কুণ্ডুর বাড়ির খেটে, নেচে কুঁদে সবাইয়ের মজা জাগিয়ে, মেপে, সারা গায়ে খাবার মেখে, মিষ্টির রস লাগিয়ে ক্লান্ত বেন্দা গুদামের মধ্যে যখন ঢোকে, তখন তার চোখে ঘুমের সীসে, সারাদিনের মদের নেশার মতো, তাকে খেপানোর 'পেলে লেগে যা' চিৎকার তার কানে—রোজকার ইঁদুর হত্যার কথা তার মনে রইল না। ঘুমিয়ে পড়ল; আর 'সেই লাল অঙ্গার বিন্দুগুলো কাছে দূরে উঁচুতে নিচুতে জ্বলে উঠতে লাগল।' অগুনতি ইঁদুর তাকে আবিষ্কার করল: তার সারা দেহের খাবার খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। সকালে কান্ত কুণ্ডু বলল: 'এই শুয়োরের বাচ্চাটার চোখের মণি, নাকের ডগা শুদ্ধ খেয়ে ফেলেছে। বানচোত কি বেঁচে আছে এখনো?' একটা খুশির দিন বেন্দাকে এভাবে শেষ করল, বেন্দাদের এভাবেই করে। 'বিবেক' গল্পটিতে সমরেশ বসু আর এক স্তরকে ধরেছেন: বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভূতি ও জেল থেকে বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে লেখক প্রায় নৈর্ব্যক্তিভাবেই আঁকেন—কিন্তু তিনি দাঁড় করান গল্পকে অন্য বিন্দুতে—বিভূতির সাধারণ স্ত্রী জ্যোতির কেন্দ্রে। যে ধর্মে বা কর্মের জন্য বিপ্লবী স্বামীকে প্রণাম করে—স্বামীর আণ্ডার-গ্রাউণ্ড থাকার সময়, জেলে থাকার সময়, সে বলে, 'আমার শ্বাশুড়ীকে এখানে ফেলে রেখে, আমি বাপের বাড়ি গিয়ে কলেজে ভর্তি হবো? তাই কখনো হয়?...তা ছাড়া এসব লেখাপড়ার মূল্য কী আছে? চারপাশে তো অনেক লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে দেখছি। কী দাম আছে ওসবের?' জ্যোতি কিন্তু বিবেক: বিভূতি যে বিবৃতি দেয় জেল থেকে, সে আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। এটা কি সত্য? বিভূতি বোঝাতে চেষ্টা করে: ভুল পথে চলেছিলাম। জ্যোতি নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আলতো প্রশ্ন করে, 'আন্দোলন করলে জনতা সরকার কিছু বলবে না?' জ্যোতি হঠাৎ হঠাৎ প্রশ্ন করে: সশস্ত্র আন্দোলন বিশ্বাস এখন করো না, তাহলে নিরাপরাধ লোকগুলোকে যে খুন করা হল,

তার কি হবে? বিভূতি বোঝাতে চায়, নিরাপরাধ কাউকে তারা খুন করে নি, পুলিশ আরো অনেক নিরাপরাধ মানুষকে খুন করেছে। জ্যোতি অবাক: পুলিস! ওদের সঙ্গে তোমাদের আমি মেলাতে পারি না। পুলিস পুলিসই।...তারাও বাড়াবাড়ির ভুল স্বীকার করছে। অদ্ভুত না? এর পরই গল্পটা নতুন মোড় নেয়—গোপালদার প্রসঙ্গ আসে, একজন ফেরিওয়ালা, যাকে ভুল করে পুলিশের চর ভেবে খুন করা হয়েছিল, সে জ্যোতিরই বাপের বাড়ির দেশের লোক—তার স্ত্রী কুসুমদি এখন বেশ্যাপল্লীতে। বিভূতি বিবেক তাড়িত অবস্থায় কুসুমদির সঙ্গে দেখা করতে যায়—কুসুমদি অবাক 'জ্যোতনের বর আমার কাছে?' কুসুমদিই বলে, 'কপালের নিকণ বাবা। কেতুটা মাসভর জর-জালায় ভুগছিল!'—তার মাল নিয়ে গোপাল গিয়েছিল, সে নতুন। তাই বিভূতিরা সন্দেহ করে খুন করে। পেটের শত্তুরগুলানকে বাঁচাবার জন্য কুসুমদি এক ভাতার হারিয়ে বারো-ভাতারি হয়েছে। জ্যোতনের বর জেলে ছিল সে জানে। বিভূতি বলে: 'আপনার স্বামীকে ভুল করে মারা হয়েছিল।' কুসুমের উত্তরটিই অবাক করে: 'অহ্, এই কথা। ও-কথায় আর কী দরকার, সব তো চুকেবুকে গেছে। খুনের খবর যখম পেথাম পেইছিলাম, তখন মনে মনে বলতাম, ও তো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা গ। দেশে গাঁয়ে এত যে শত্রুর, সব লাট-বেলাটি করে বেড়াচ্ছে, উয়াদের মুণ্ডুগুলান কাটে ক্যানে নাই।...ওই উয়াদের, জামাইকে যারা জেলে পুরেছিল, উয়াদের মুণ্ডুগুলান কাটা যায় ক্যানে নাই?' যে মাটির মানুষের, লড়াকু মানুষের, সেই পূর্ণ মানুষের কথা সমরেশ বসু বলেন, কুসুম তাদের হয়েই এ দাবি জানায়। আর বিভূতির চোখের সামনে জ্যোতির মুখ ভেসে ওঠে: জ্যোতির নীরব চোখ, হাসি একথাই বলে। কুসুমদির সঙ্গে দেখা করার খবর জ্যোতিকে বিভূতি যখন দেয়, তার চোখ প্রতিমার প্রদীপ্ত অপলক—কলকাতায় না গিয়ে কুসুমদির কাছে যাওয়াই তো ঈপ্সিত। আর কুসুমদির সিদ্ধান্ত শুনে জ্যোতি ক্রমশ দেবীমূর্তিতে পর্যবসিত। জ্যোতির্ময়ীই বিভূতির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটায় কুসুমের বিশ্বাসের, মরণোত্তীর্ণ দাবির ভিত্তিতে।

যে গল্প-লেখক এই অসামান্য চিত্র-চিত্রকল্পগুলি রচনা করতে পারেন গল্পের অনুষঙ্গে, তাঁর শক্তিমত্তা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে না। সব কটিই দিনেশচন্দ্র রায়ের শেষ গল্প 'ওড়কা' থেকে নেওয়া: "একমাত্র সন্তানের মৃত্যুজনিত কারণে আকুলা জননীর মতো এই রাত অস্থির

এবং আলুলায়িতা,' 'এত আলোতে ম্যানেজারের পরিষ্কার কামানো মুখও একটু কালচে লাগছে, এ যেন ভাদ্র মাসের ঠা-ঠা রোদ্দুরের মধ্যে এক পলতা মেঘলা ছায়া,' 'ফলে স্টিফেনের কথাগুলো একরাশ মৃতদেহের মতো মাটিতে শুয়ে পড়ল,' 'সেদিন দুপুর রাতে কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বে ওঠা চাঁদ পতিঘাতিনী কুলবধূর মতো নিজের রূপের আলোতে চরাচর ভাসিয়ে দিয়েছে,' 'তারপর থেকে এক খণ্ড পতিত জমির মতো ঝালো একা এবং ফাঁকা'—দিনেশচন্দ্র তাঁর শেষ গল্পে এই ভাষাতেই গল্প বলেছিলেন। আপাতভাবে একটি বহুদিন সংস্কার চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই গল্পটি কিন্তু সময়ের দর্পণই হয় যখন ঝালো, একটি শিশুর প্রায় হত্যার প্রতিবাদেই বলে—যদি শাদা পার্টি আর লাল পার্টির নেতা তাদের দুজনের দুটি বাচ্চাকে জঙ্গলে রেখে আসে তবে আমিও এই ছওয়াকে সেইখানে রেখে আসব—ওড়কার অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য ঐ শিশু হত্যার এই প্রতিবাদ, সত্তরের-নিধন যজ্ঞের প্রতিবাদেই দাঁড়িয়ে যায় না কী? অবশ্যই 'ঐরাবতের মৃত্যু' দিনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প: বৃদ্ধ হাতির হত্যা ও পাণ্ডা সর্দারের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মহাকালগুড়ি গ্রামের বুনো মানুষ, রাভাদের মৃত্যুই সূচিত হয়। হাতির দাঁতের জন্য যারা এই হত্যা করে, তারাই এখানে বাইরে লোভী সভ্যতার প্রতিনিধি, ধ্বংস করছে এরা, এ সভ্যতা তো পোচার-সভ্যতা। মুমূর্ষু হাতিটিকে বাঁচাতে না পারার হতাশায় আত্মহত্যা করে পাণ্ডা সর্দার: যার স্মৃতিতে-সত্তায় জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিত্যকার প্রাচীন জীবন, যার দেবীস্তোত্র 'ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র শব্দব্রহ্ম হয়ে এই মহারণ্যের সমস্ত পশুপক্ষীর কণ্ঠনাদ, শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনি এবং সরীসৃপ বাতাসের কশাঘাতের আর্তনাদকে সমাধিস্থ' করে। আদি এই কবিতা অনাদি ও অমর। তার মৃত্যু তাই এক সভ্যতার, এক জীবনচর্যার মৃত্যু, আত্মহত্যা—আমাদের তথাকথিত সভ্য পোচারের অভিযানে। তবে আমার কাছে দিনেশচন্দ্র রায়ের 'আনন্দময়ীর সন্ধানে' গল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে: গল্পটির নামকরণ থেকে শুরু করে এর ন্যারেশন ট্রিটমেন্ট সবই প্রথম শ্রেণীর লেখকের ক্ষমতা চিহ্নিত। সমকামী নিয়ে অনেকদিন আগে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি গল্প পড়েছিলাম মনে আছে, কিন্তু দিনেশচন্দ্রের গল্পটি আমাদের সময়-কালের ব্যর্থতা, নপুংসকতা, যন্ত্রণার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে এমন এক গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে, যাতে বিষয়টি কেবল এক সমকামীর গল্প থাকে নি—আনন্দময়ীর সন্ধানে ব্যর্থ আমাদের অস্তিত্বেরই রূপক হয়ে উঠেছে। দীপু নামক যুবকটি বলে, 'পাকস্থলীভর্তি হতাশা আর মনভর্তি কাম নিয়ে আমি

পদ্মের মতো পবিত্র লীলাকে সহ্য করতে পারি নি।' তাঁর মিলন হীরা সিং-এর সঙ্গে। তাদের সম্পর্ক দুটি সাবালক পুরুষের যুগ্ম-সম্মতিতে গড়ে উঠেছিল। 'আমি এই সময়ে একটা কালো মহিষের মতো ছিলাম। দারিদ্র্য কশাঘাতে সারাদিন আমাকে তাড়না করে ফিরত।' দুজন স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন পুরুষের এই 'সম্পর্ক স্ফটিকের মতো পরিষ্কার অথবা পুরনো দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ। একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায়। তাতে স্বার্থের গন্ধ নেই। দেওয়া-নেওয়ার হিসেব নেই।' কিন্তু স্বার্থহীন এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের পশ্চাৎপট কি: 'হে ভারত! তুমি কি জান না এই বিপুল মহাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মিশ্র অর্থনীতি, চাকুরির দুর্ভিক্ষ আর অর্থনৈতিক মুক্তির অসাফল্য কী দারুণ মনস্তাত্ত্বিক অবদমনের সৃষ্টি করেছে। এই মহাদেশে অবদমন, পরাজয়, ভয়-আশঙ্কা—সব দাহ্য বস্তুর উপকরণে অগণিত জতুগৃহ নির্মিত হয়েছে। আর সেই অভিনব গৃহের অভ্যন্তরে একখানা বিরাট শ্বেতপাথরের পালঙ্ক।' এই পালঙ্কেরই দুটি তুষারশুভ্র তাকিয়া—উত্তরে দীপু ও দক্ষিণে হীরা সিং। 'তুশ কোটি কালো টাকার কৌরব অক্ষৌহিনীবাহিনী আসমুদ্র হিমাচল তোলপাড় করে আমাদের খুঁজছে, ব্যক্তিগত মালিকানা যক্ষিনীর মতো মায়াবিনী রাষ্ট্রশক্তির সুদর্শন চক্রে পঁচাত্তর পীঠস্থান হয়ে এই সূতিকারোগাক্রান্তা ভারতভূমিকে বলাৎকার করছে …জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করার জন্য যে অগ্নি ছিল তা লুঠ হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎহীন এই ভারতভূমির এই হিমশীতল কবরভূমিতে চারিধারে নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় চুরি যাওয়া আমার যৌবন, আর হীরা সিং-এর প্রৌঢ়ত্ব পলাতক।' দীপু ও হীরা সিং-এর সমকামী সম্পর্ক এ ভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে যায়, দেশ-কাল বিধ্বত হয়ে পড়ে। দীপু চেষ্টা করে, কিন্তু দেখে, 'কোনো নারীর সঙ্গে যৌনসম্ভোগ করার মুহূর্তে আমার অস্তিত্ব কেমন টুকরো টুকরো হয়ে যায়।' এখানে এই যৌনসম্ভোগ সুস্থ জীবনের স্বপ্নই। দীপু জীবিত নারীদের মধ্যে ভালোবাসা পেল না, তার অক্ষমতায় সে প্রহৃত, অপমানিত হল—ভারতবর্ষের জতুগৃহ থেকে সে মুক্তির চেষ্টা করেও, পারল না। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল: এবার আমি কলকাতার সব সমাধি-ক্ষেত্রে, যেখানেই যুবতী নারীকে সমাহিত করা হয়েছে, সেখানেই তাদের কবর খুঁড়ব। দেখব, তারা আমাকে ভালোবাসে কিনা।' পরের দিন খবর বেরোয় এক বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকের, যে জনৈকা মৃতা নারীর কবর খুঁড়ছে, যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী। অদ্ভুত ট্র্যাজেডি, নপুংসক অস্তিত্বে

অসহায়, কিন্তু মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা—দিনেশচন্দ্রর এ গল্প বাংলা ভাষার অনন্য সম্পদ। কবর খুঁড়েই কি আমাদের জীবনকে পেতে হবে?

১৯৭০-এর দশকের বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা লেখক হিসাবে মহাশ্বেতা দেবীর রূপান্তর। 'হাজার চুরাশীর মা' থেকে, তার একটু আগে-পিছে থেকেই মহাশ্বেতা দেবী রূপান্তরিত হলেন, ১৯৬৭-৭২-র অভিজ্ঞতার এখনও পর্যন্ত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যায়ন তাঁর রচনাতেই দেখা গেছে।[১] তিনি এইরকম একই বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন তা নয়: 'গুরু', 'অনন্ত খাটুয়া: এইচ. এম' কিংবা 'স্তনদায়িনী' বা 'জাহ্নবী মা', 'বেহুলা', 'জগমোহনের মৃত্যু', 'দ্রৌপদী', 'নুন' বা 'শিশু', 'জাতুধান' বা হুল', এদের বিষয় ও রূপবন্ধন, ভাষা ও শৈলী এক নয়। ঔপনিবেশিক জগাখিচুড়ি মাখানো মধ্যবিত্ত বাতাবরণ, মিথ্যা সত্তাকে তীব্র প্রত্যাখ্যান, সময়ের শবকে ডিসেকশন যেমন আছে, আদিবাসী প্রাণান্ত লড়াই তেমনি আছে, দ্রৌপদীর বিদ্রোহ যেমন তীব্র চাবুক মারে, বেহুলার শেষে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সাপ মারা তেমনি ক্রোধের অগ্নিকে প্রকাশ করে—ধর্মের ভণ্ডামী বিদ্রূপে খান খান করে দেন মহাশ্বেতা দেবী। আর বলাই বাহুল্য এ সব করেন শিল্পের প্রতি অসাধারণ বিশ্বস্ততায়—জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পের সেই পিকাসো-কথিত মিথ্যায় আরও সত্য, জীবনের উজ্জীবিত রূপায়ণে নিয়ে যান, আমাদের, মধ্যবিত্ত পাঠকের মানস-ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ, বিশ্বাসকে প্রসারিত করেন, পরিবর্তিত করেন, তছনছ করেন—লজ্জিত করে তোলেন লোভী-ভিখারী সত্তাকে দগদগে ঘায়ের মতো উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে, অসহনীয় করে তোলেন এই কারাগারকে। তিনি এই অর্থেই বিপ্লবী লেখক যে, মাতার মতো শিল্পকে তিনি রক্ষা করেন, আর সেই ভারতীয় প্রতীক ঐরাবতের মতো বাস্তবকে বহন করে নিয়ে আসেন, ঐরাবত তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর 'নৈঋর্তে মেঘ' গল্পগ্রন্থটি পড়তে পড়তে এ কথাই কি মধ্যবিত্ত পাঠকের মনে হয় না? এ জগৎ আছে জানতাম না, সুবোধ ঘোষ ইত্যাদির মাধ্যমে, সাঁওতাল পরগণা-রাঁচি-পালামৌ, আদিবাসী জগৎ তো একটি রোমাণ্টিক ব্যাপার ছিল—কিন্তু এই দুঃসহ সত্য মহাশ্বেতা দেবীর আগে কে শিল্পে এনেছে 'নুন

১. 'আমার সাহিত্য ভাবনা ও চিন্তা আমার গত আট-দশ বছরের গল্প উপন্যাসে বিধৃত, আমিও। সম্পূর্ণ আমি আমার লেখাতেই আছি।' —মহাশ্বেতা দেবী। 'মুক্তাঙ্গন', ইছাপুর।

যে জান লড়িয়ে দেবার মতো সমস্যা হতে পারে, তা বাবুরা কোনোদিনই বুঝবে না এবং ব্যাপারটি তাদের কাছে অবাস্তব থেকে যাবে তা সে জানে।' আমি তাঁর গল্পেই ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করি নতুন ভাবে, যে আবিষ্কারে নির্মম বাস্তব, অসহনীয় দারিদ্র্য থাকে, থাকে মরণপণ সংগ্রাম, বিদ্রোহ, আর এসবের অন্তরালে, নিশ্চয়ই স্বপ্ন, ভারতবর্ষের জাগরণের স্বপ্ন: 'গুরু' ও 'অনন্ত খাটুয়া এইচ. এম.' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী স্পষ্ট দেখান সে স্বপ্নের ভূমি আমাদের মধ্যবিত্ত সত্তার বিকার নয়, তার পরিবেষ্টনী নয়। উলঙ্গ বিদ্রোহী দ্রৌপদীর তীক্ষ্ণ চাবুক থেকেই এ স্বপ্ন আসবে। আসবে 'বেহুলা'র শ্রীপদর কাছ থেকে যার সংস্পর্শে নিরীহ গবেষক বসন্তও পাল্টে যায়—আসবে ঐ আদিবাসীদের কাছ থেকে। ধর্মীয় শোষণ ও প্রতারণার বিরাট জগদ্দলের সামনে তাঁর গল্পের চরিত্রই ভাবতে পারে: ভীষণ ও প্রজ্বলন্ত ক্রোধে ধনুকধারীর মনে হয় সে কাজ করার ক্ষমতা আছে। রাগ মানুষকে এ রকম সাহস যোগায়। ধনুকধারীর মতো মানুষকেও। আবার এভরিম্যান গুরু, কলকাতা যাদের জন্যে সৃষ্ট এবং কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ যাদের ভুলে গেছে, ছেলেগুলি তারই শব বয়। শূন্য খাটিয়া—কারণ গুরুর মৃত্যুর পর তার বাড়ির লোকেরা, মধ্যবিত্ত মানুষরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে নিয়ে গেছে। এই 'খাটিয়ায় নিরন্ন ছেলে-গুলি পবিত্র থেকে পবিত্রতম এক শব বইছে। সময়ের শব।' গুরুর প্রত্যাখ্যান ও সময়ের শব, সব মিলিয়ে মহাশ্বেতা আমাদের জীবনের, কলকাতা তথা ভদ্রলোক অস্তিত্বের ফাঁপাজীবন যেমন ধরিয়ে দেন, তেমনি সমাজের সীমান্তবাসী ঐ ছেলেগুলির সময়ের শব বইবার রূপকে, প্রতীকে ধরে দেন বর্তমান দেশকে, কালকে।

একটি আলোচনায় মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন, '...হিংসা ব্যক্তি মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় অর্জন, অনন্যোপায় শোষিত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার, শাসকের দমনাস্ত্র।...ভারতে আজকে ভায়োলেন্স, শোষিত মানুষের প্রয়োজনে ভায়োলেন্স-এর, যৌক্তিক ভায়োলেন্স হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দিন এসেছে। একে স্বীকার করলে তবেই আমরা অযৌক্তিক ও নিরর্থক হিংসাকে পরাজিত করতে পারব।' ('প্রমা') আর একটি চিঠিতে তিনি বলেন, 'এমনিতে বাংলা গল্প উপন্যাসের ভাষায় শব্দ ক্রমশ এত নীরক্ত ও প্রকাশক্ষমতাহীন হয়ে উঠেছে যে বাঁধাধরা কয়েক হাজার শব্দ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলে আর রক্ষা নেই।...রসায়ন,

জ্যামিতি, ভূ-তত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল, যেখান থেকে দরকার শব্দ আহরণ ও ব্যবহার করি। অবশ্যই মূল ভাষা, কি শব্দে, কি গঠন পদ্ধতিতে, থাকে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।' এই দুটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট মহাশ্বেতা দেবী জীবনকে শিল্পে ও শিল্পকে জীবনে, দ্বান্দ্বিকভাবে ধরতে চান। তাঁর বিদ্রোহ কেবল গৌণ লেখকের বিষয়গত অনুসন্ধান নয়, তার জন্য বিদ্রোহী রূপবন্ধনও খোঁজেন। আর এই লেখিকা খুব সচেতন যে যাঁরা তাঁর গল্পের কুশীলব, তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, তাঁর গল্প তারা পড়ে না। চরিত্রকে জীবন্ত করতে মহাশ্বেতা তাদের ভাষাই বসান এদের মুখে, খুবই বিশ্বস্তভাবে, কিন্তু নিজের ন্যারেশনে অদ্ভুত সজীবতা আনেন কখনো ইংরেজি, কখনো সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে, কখন দার্ঢ্য উচ্চারণে, কখনো ভাবমসৃণ সাবলীলতায়। আর সবটাই অনায়াস, বহতা মুখের ভাষার মতো—তাঁর ভাষার এই বিভিন্ন স্তরে যাতায়াত ঘটে কোনো জার্ক না দিয়ে। দু একটা উদাহরণ দিইঃ 'একটা মাঠ। সারসার অসমাপ্ত বাড়ি। কোণে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের ওপর একটি হাতের **শিল্যুয়েট**।' 'পার্থিব রুটি-ডাল-তরকারি **অকেশ্যনাল** মাছের বাসনটি নামিয়ে রেখে বেরিয়ে যান।' **'সারভাইভালের** জৈব ও মৌল নীতি এই ব্যাপারটি **ক্যাশ** করেই বিমল কনট্রাকটর হয়ে গেছে।' 'পার্থ জানত না, ওই হাত জোড়ার দিকে এগোলে সে আগামী ছ মাস কি **ফ্যাসাদে ফেঁসে** যাবে।' **'উদীয়মান ঘর** দোর দূরে।' 'বিধবারা যে-যার **পুত্র-কলত্র-সহ স্বস্ব** বাপের বাড়ি চলে যায়।...বিচিত্র ওর **মনস্য** গতি।' 'এখন ওর **অন্তর্সত্ত্বা** রূপান্তরিত হয়ে এক অদ্ভুত রেকলেস হোবো ছিন্নমূল সত্ত্বায় দাঁড়ায়।' 'আদিবাসী গ্রামে ঢুকলে এক ধরনের হিংস্রতার **কারেণ্টও** বুলাকিকে চমকে দেয়।' 'অন্ধকার **বনচ্ছায়ে শুষ্ক** চোটি নদীর তীরে চলে যায় বুলাকি। বহু খুঁজে জগমোহনের **বেড়ার সদৃশ শুঁড়** এক **কর্দমাক্ত** জলের **দহ** আবিষ্কার করে ও সেখানে নেমে যায়।' অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়—ন্যারেশনে মহাশ্বেতা দেবী মধ্যবিত্ত মুখের অভ্যাস বজায় রাখেন, কিন্তু তার সঙ্গে আরও উপাদান মিশিয়ে, নানা স্তরের ওঠা নামায়, এই অভ্যাসের নীরক্ততা, মেরুদণ্ডহীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে, তাকে করে তোলেন জীবন্ত স্রোতময়, কমলকুমার মজুমদারের একদম বিপরীত। এসব মিলিয়ে মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যে নতুন ঘটনা।

কিন্তু ভয় হয়। গল্পে মহাশ্বেতা দেবী মহৎ, কিন্তু এখনও তাঁর বিশ্ববীক্ষা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সংগঠিত হয় নি, যদিও তাঁর উপন্যাসের শক্তিও প্রচণ্ড। মনে হয়: বড় বেশি লিখছেন তিনি, শক্তি থাকলে নিশ্চয়ই লিখবেন, তবু। ভয় পাই, নিজের সৃষ্ট জগতেই আটকে যাবেন না তো—গেলে আমাদের সমূহ সর্বনাশ। আর ইতোমধ্যেই অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন: এ সব পুরস্কারের থালায় বিষ। মহাশ্বেতা দেবী যাদের কথা বলছেন, যে ভায়োলেন্স ও প্রতিবাদের জমি তৈরি করছেন, এসব পুরস্কার তার থেকে বহু দূরে, তার বিরুদ্ধে। তবে এসব আশঙ্কা মধ্যবিত্ত বিষাদগ্রস্ত আলোচকের যার চতুর্দিকে ভগ্নস্তূপ; তাকে ভুল প্রমাণিত করে, তিনি ও এ-আলোচনার তাৎপর্যপূর্ণ গল্পকাররা এগোবেন নিশ্চয়ই, জীবন ও শিল্পের দুই শিং-কে ধরে। আর গল্পই এখন এই অগ্রগমনের মূল গন্তক্ষেত্র, যেহেতু উপন্যাস বাণিজ্যিক পণ্য প্রায় ক্ষেত্রে, গল্পই তার বাজারমূল্য হারিয়ে এ সমাজে শুদ্ধ শিল্প-প্রতিবাদ হয়ে ওঠে।[১]

---

১. এ আলোচনায় ১৯৭০-এ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৯-র ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেখা গল্প দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অনীক, প্রস্তুতিপর্ব স্পন্দন, সম্পর্ক, পরিচয়, এক্ষণ, সাহিত্যপত্র, কালান্তর, বারোমাস, কলকাতা, কৃত্তিবাস, কৌস্তুভ, প্রমা, মুক্তাঞ্জন, দেশ, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে।

সমাজ, ইতিহাস, আর্থিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গে

অভ্র ঘোষ

গত দশ বছরে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধে সামাজিক, আর্থিক ইতিহাস ও অন্যান্য নানা প্রসঙ্গের একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। স্বভাবতই গত দশকের চিন্তা-ভাবনার মূল ধারা বা ঝোঁকগুলিই (trend) আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। এবং স্বল্প পরিসরে প্রায় কিছু না বলেই মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করে আলোচনা গুটিয়ে আনতে হয়েছে। ফলে নানান প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে বহু লেখকের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় কাউকে কাউকে বেছে নিতে হয় এই দশকের চিন্তার ঝোঁকগুলি পাঠককে চিনিয়ে দেবার জন্য; বাদ থেকে যান আরও বেশ কিছু লেখক, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁদের অনেক লেখা।

বাংলা পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়, আর তুলনামূলক বিচারে স্বল্প হলেও সাহিত্যেতর বিষয়ে লেখাপত্তরও যে খুব কম হয়েছে গত দশকে, তাও বলা যায় না। সেজন্য তেমন প্রয়োজন না হলে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ এ-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি, প্রকাশিত গ্রন্থগুলি থেকেই নির্বাচন করেছি। এর ফলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা নিশ্চয়ই চোখ এড়িয়ে গেছে। এমন কি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখও হয়তো পাওয়া যাবে না এই আলোচনায়—সেটা বর্তমান লেখকের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য ছিল না, সীমাবদ্ধতা বলেই ধরে নিতে হবে একে।

সত্তর দশকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটেছে—এক: নকশালবাড়ি আন্দোলন, দুই: ইন্দিরা গান্ধী সরকার ঘোষিত জরুরি অবস্থা। প্রথম ঘটনাটি সম্পর্কে বাংলায় যে দু-চারটি আলোচনা গ্রন্থ বেরিয়েছে ইতোমধ্যে, তার সামান্য পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক বিষয়-সমূহে এ-দশকের চিন্তার মৌল ঝোঁকগুলির প্রসঙ্গ আদৌ বর্তমান আলোচনায় রাখা হয় নি। কারণ, এ-বিষয়ের ব্যাপকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিরোধের প্রসার

এত বেশি যে তা একটি নিবন্ধের এক সামান্য অংশে ন্যায়-নীতি বজায় রেখে বিশ্লেষণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। অবশ্য যে-প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হল তার বিশ্লেষণেও যে কোনো ফাঁক নেই তা দাবি করা যায় না, তবে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়তো ছিল না কেন্দ্রীয় ঝোঁকগুলি আলোচনার পরিসরে নিয়ে আসার।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস বিষয়ে ঈষৎ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে (রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বিতর্কসহ)। তার কারণ এই নয় যে এ-বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে এই দশকে। আলোচিত সব প্রসঙ্গেই কম-বেশি এ-কথা বলা যেতে পারে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর পুনর্মূল্যায়ন যে সর্বাধিক বিতর্কিত হয়েছিল আরও একবার এ-দশকে, তা বোধহয় সন্দেহাতীত।

১.

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হুবহু অনুকরণে না হলেও উনিশ শতকের বাংলাদেশেও যে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ ঘটেছিল এবং সেই নবজাগরণ যে রেনেসাঁসেরই বাংলা প্রতিশব্দ মাত্র, 'বাংলার রেনেসাঁস' (ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৭৪) নামক গ্রন্থে এই কথাই বিস্তৃত বুঝিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। শুধু অন্নদাশঙ্কর নন, ঐতিহ্যবাদী ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ বক্তব্য আমাদের অপরিচিত নয়। ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, গদ্যরীতি, শিল্পকলা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে যে-নতুন ধারার প্রবর্তন দেখতে পাওয়া যায় উনিশ শতকে, রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের নিরন্তর সাধনায়, তাকেই বাংলার রেনেসাঁস বলে চিহ্নিত করেছেন এই বুদ্ধিজীবীরা। ভক্তির পরিমণ্ডল থেকে যুক্তি, অন্ধবিশ্বাস আর সামাজিক কুসংস্কার থেকে ক্রিটিকাল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আর মানবিকতাবোধ যে উনিশ শতকে বাঙালি সমাজের নতুন ভিত গড়ে তুলেছিল তার দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা তুলে ধরে অন্নদাশঙ্কর সিদ্ধান্ত করেছেন, আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ। ইউরোপের রেনেসাঁসের তুলনায় আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতার কথাও বলেন অন্নদাশঙ্কর। 'আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানে নয় যে ওটাতে জনগণের যোগ ছিল না। কোন্ দেশের রেনেসাঁসেই বা ছিল!

আমাদের রেনেসাঁসের অপরাধ এখানেও নয় যে ওটা পরাধীন দেশের ও ফিউডাল সমাজের ফসল। একই অপরাধ অন্যত্রও দেখা যায়।...তা নয়। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে ওর কোনো ক্লাসিকাল বনেদ ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ছিল। সেটা প্রাচীন গ্রীসের বনেদ। রামমোহন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ধর্মে। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভাষায়। কিন্তু কলেজে গিয়ে যাঁরা নতুন বিদ্যার পাঠ নিতেন তাঁদের সকলের আদর্শ ছিল ইংরেজী কাব্য-নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তাঁদের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় থিয়েটার, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুরীতি, উদ্যানরীতি। পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে একটা স্বদেশী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরাও ক্লাসিকাল বনেদ খুঁজে পেলেন না।' এই বৈসাদৃশ্যের কারণ কোথায় নিহিত তার কোনো উল্লেখ না করে লেখক এরপরেই বলেছেন, 'ঘটনাচক্রে গ্রীক পণ্ডিতদের কনস্টান্টিনোপল থেকে ইতালীতে শরণার্থী হয়ে আগমন যেমন সে দেশের রেনেসাঁসের সূচনা করে তেমনি ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিকদের বাংলাদেশে শাসনভার গ্রহণ ও তাদের নতুন বিদ্যার প্রতি এদেশের ভদ্রলোক শ্রেণীর আকর্ষণ এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করে। আপাতদৃষ্টিতে যা ঘটনাচক্র ইতিহাসের বিচারে সেটা যুগপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা।' ইংরেজ বণিকদের পরোক্ষ অবদানের এই স্বীকৃতির পরেই আমাদের আবার জানতে হয়, 'পূর্ববর্তী কালে ইংরেজ শাসন ছিল এক জিনিস, রেনেসাঁস ছিল আরেক। ব্রিটিশ অধিকৃত সব অঞ্চলে রেনেসাঁস হয় নি, হয়েছিল যেখানে একদল অগ্রদূত ছিলেন। পরবর্তী কাল একথা ভুলে যায়। তার দৃষ্টিতে রেনেসাঁস ও ইংরেজ শাসন একাকার। আরো পরবর্তীকালের চোখে ইংরেজ ও বুর্জোয়া পিণ্ডি রেনেসাঁসের ঘাড়ে চাপানো হয়।...আসলে ইংরেজ শাসন, রেনেসাঁস এক জিনিস নয়। বুর্জোয়া প্রাধান্য ও রেনেসাঁস নয় এক জিনিস।'

তাহলে উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে নবযুগের সূচনা তা ইংরেজ ব্যতিরেকেও হতে পারত। 'একদল অগ্রদূত' যে-কোনো জীয়নকাঠির স্পর্শেই জেগে উঠতে পারতেন, সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হতে পারত, এমন কি বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের বিকাশের ধারার সঙ্গেও রেনেসাঁসের কোনো যোগাযোগ নেই! অন্নদাশঙ্কর আমাদের এই ইতিহাসবোধেই আস্থা রাখতে বলেছেন। সুশিক্ষিত ইংরেজের আগমন না ঘটলে কিছুতেই

এ-দেশের অন্ধকার ঘুচত না, নবজাগরণ হত না—এ-দেশের বিদ্বৎসমাজে এ-রকম ভয়াবহ সরল দৃষ্টিভঙ্গি এখনও যে দেখা যায় না তা নয়। কিন্তু নিশ্চল গ্রাম-সমাজের বনিয়াদ ভেঙে দেশীয় জমিদার ও মুৎসুদ্দি বেনিয়াপুষ্ট সমাজের নতুন আর্থিক ভিত্তি রচনায় ইংরেজ বেনিয়াদের অর্থলোলুপ স্বার্থ ও শাসনব্যবস্থা যে এ-দেশের ইতিহাস পুনর্গঠনে 'অচেতন শক্তি'র কাজ করে গেছে তাতে সন্দেহ কোথায়? ইদানীং ভারতে ইংরেজশাসন ও এশিয়াটিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের অনেক বক্তব্য বিষয়ে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের সংশয় থাকলেও ইংরজ শাসনের অভ্যুদয় এ-দেশের অর্থনীতি ও সমাজ প্রকৃতিতে যে গতির সূচনা করেছিল তা কি কেউ অস্বীকার করেন? অতএব 'ইংরেজ ও বুর্জোয়ার পিণ্ডি রেনেসাঁসের ঘাড়ে চাপানো হয়' লেখকের এই বিক্ষোভের সূত্রেই সেই পুরনো ঝগড়া আরেকবার এসে যায়। সংশয় প্রকাশ করতে হয় উনিশ শতকের সমাজসংস্কার বা ধর্মসংস্কার প্রকৃতই রেনেসাঁস কিনা। অথবা প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে বললে—ইংরেজ শাসনের স্বার্থে এ-দেশের অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন সমাজ দেহের কোনো কোনো অংশে গতির সঞ্চার করলেও, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে নবজাগরণের লক্ষণ-সমূহের প্রকাশ ঘটালেও, তা প্রকৃত রেনেসাঁস আন্দোলন কিনা এ-সংশয় থেকে যায়।

আরও অনেকের মতোই উনিশ শতকের সংস্কারমূলক কর্মোদ্যমকে রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করতে আপত্তি জানান বিনয় ঘোষ কিংবা বদরুদ্দিন উমর। 'বাংলার নবজাগৃতি' (পরিবর্ধিত সংস্করণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৯) গ্রন্থে নতুন সংযোজিত শেষ দুটি প্রবন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছেন, বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা। তাঁর মতে, 'পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে আমাদের ঐতিহাসিকেরা সাধারণত উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের বিচার করে থাকেন। ইতিহাসে কখনও দেখা যায় না যে দুই দেশের বা দুই পরিবেশের এক ধরনের ঘটনার মধ্যে ঠিক একই কারণের সমাবেশ অথবা একই প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। কিন্তু কারণ ও তার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, কতগুলি মৌল বিষয়ের বা ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সাদৃশ্যের জন্য আমরা 'রেনেসাঁসে'র মতো ঐতিহাসিক শব্দ ব্যবহার করতে পারি।' রেনেসাঁস কথাটির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে

গিয়ে বিনয় ঘোষ জার্মান সমাজ-বিজ্ঞানী আলফ্রেদ ফন মার্টিনের অনুসরণে **'typologically** উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোড়নকে' রেনেসাঁস বলতে আপত্তি করেন না প্রাথমিক ভাবে। তবে সে নেহাতই সংকীর্ণ অর্থে, কেননা বিনয় ঘোষ ভুলে যান না যে 'বৈদেশিক শাসনাধীনে সংঘটিত এই জারজ রেনেসাঁসের সঙ্গে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু তার বাস্তব পশ্চাদ-ভূমি না থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত তার সামাজিক ফলাফলও অধিকাংশ বিষময় হয়েছে।' পাশ্চাত্যে রেনেসাঁস আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক প্রায়-অচল স্তরবিন্যস্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানতে পেরেছিল বুর্জোয়া অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি এবং 'নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যমান সচল টাকা'। সামাজিক অঙ্গ-বিন্যাসের স্থবির পিরামিড ভেঙে গতি সঞ্চারিত হল, সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে **vertical mobility** দেখা গেল। এবং এরই ফলে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি ভেঙে তছনছ হয়ে নব্যযুগের মানুষের ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবতাবোধ আর ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মন। আমাদের দেশেও, বিশেষত কলকাতা শহরে উনিশ শতকে এ-রকম এক বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও টাকার সচলতা দেখা দিয়েছিল ইংরেজ বণিকদের দৌলতে। আঠারো শতক থেকেই এই পরিবেশ রচনার শুরু। ইংরেজ বণিকের অধীনে 'করিতকর্মা' দেশীয় বাঙালিরাও নিজের কুলবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করে অর্থকরী কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। একটা নতুন নাগরিক অভিজাত ধনিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'তার উপর আঠারো শতকের শেষে, ১৭৯৩ সালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে যখন নতুন জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পথ নব্য ধনিকদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাঁরা ভোগবিলাসের পর উদ্বৃত্ত টাকা প্রধানত জমিদারী কিনতে ব্যয় করেন।' এবং এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে নানা মধ্যস্বত্ব-উপস্বত্ব-ভোগী মধ্য শ্রেণী। এবং ব্রিটিশ শাসকের স্বার্থে শহরে তৈরি হয় নতুন নাগরিক ধনিক শ্রেণীর সাথে চাকুরীজীবী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ী-দালালদের নিয়ে নাগরিক মধ্য শ্রেণী। আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের এই নতুন চেহারায় পুরনো গ্রাম-সমাজের ছবি যে নেই তা স্পষ্ট, টাকাও হয়ে ওঠে সামাজিক সচলতার চালিকাশক্তি। 'কিন্তু

তার জন্যই কি তাকে 'রেনেসাঁস' বলা যায়?' এই প্রশ্ন রেখেছেন বিনয় ঘোষ। 'কেবল টাকার ধান্দা, টাকা সম্পর্কে মুনাফালোভী মনোভাব যদি typical early stage of capitalism হয় তাহলে বাংলা দেশে উনিশ শতকে নিশ্চয়ই তার বিকাশ হয়েছিল বলতে হয়, এবং সেটা যে রেনেসাঁসের যুগের একটা ঐতিহাসিক লক্ষণ তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি প্রকৃত রেনেসাঁস তা নয়।' রেনেসাঁস হয় নি তার কারণ এদেশে বাণিজ্যিক পুঁজির স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিকাশ হয় নি এবং তার ফলে শিল্পপুঁজি বিকাশেরও কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। তার একটা সাধারণ কারণ ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এবং তৎপরবর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ। ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ আদৌ সহজগম্য ছিল না। এরই সূত্রে বিনয় ঘোষ আরেক প্রশ্ন রেখেছেন, বাংলার আর্থিক-সামাজিক ইতিহাস চর্চায় তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তা হল এই, 'প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে মধ্য যুগ ও আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের (এবং ভারতবর্ষের) বণিকজাতি বংশপরম্পরায় দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন···বাংলাদেশের গন্ধ বণিক, তাম্বুল বণিক, সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি বণিকজাতির বাণিজ্যলব্ধ ধনৈশ্বর্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে একথা অন্তত ভাবা যেতে পারে যে এদেশে Mercantile Capitalism-এর বিকাশ স্বচ্ছন্দে হতে পারত এবং তার ক্রমিক পরিণতি, ঐতিহাসিক অবস্থার আনুকূল্যে, ইউরোপের মতো Industrial Capitalism-এ হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা হল না কেন? তাছাড়া, যে ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে বিজ্ঞান অনুশীলনের (গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি) ধারা বেশ পরিস্ফুট ছিল (মধ্যযুগে অবশ্য শীর্ণ হয়েছিল), সেই দেশে সর্বত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল কেন, তাও ভাবা দরকার।'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থানুকুল আবহাওয়া বজায় রাখার জন্য শাসকশ্রেণী রেল লাইন স্থাপন করে বা টেলিগ্রাফ জাতীয় প্রাযুক্তিক শিল্পের প্রসার ঘটালেও এ-দেশের সামাজিক সংগঠনের সনাতন কাঠামোটির মৌলিক কোনো পরিবর্তন চায় নি। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যই তারা এমনভাবে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসটির পরিবর্তন করেছিল যাতে সামন্ততান্ত্রিক বনেদটি বজায় থাকে এবং সে-কারণেই জাতিভেদ প্রথা,

ধর্ম, বিবাহপ্রথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন উন্নতিশীল পরিবর্তনের কোনো সুযোগ তারা করে দেয় নি। আর সেই কারণেই রেনেসাঁসের আপাত লক্ষণ মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলনগুলিতে লক্ষ করা গেলেও তার স্থায়ী সুদূর-প্রসারী কোনো প্রভাব সমাজের উপর পড়ে নি। এ-জন্যেই উনিশ শতকের নবজাগরণ বা রেনেসাঁস একটি অতিকথা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বদরুদ্দিন উমর প্রতিপন্ন করেছেন ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ', চিরায়ত, ১৯৮০। বাঙলাদেশ সংস্করণ-এর অনেক আগেই প্রকাশিত) যে উনিশ শতকের বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বন্ধনে এদেশে স্বাধীন বাণিজ্যিক বুর্জোয়া বা বণিকবৃত্তির উন্মেষ ঘটেনি বরং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ভূমিব্যবস্থায় অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর বাঙালি ব্যবসায়ীদের 'স্বার্থ ছিল বিদেশী ইংরেজের বাণিজ্য ও শাসনস্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত' এবং শুধু তাই নয় এ-দেশের মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ীশ্রেণীর ভূমিস্বার্থও ছিল এবং তা ছিল অভিজাত মধ্যশ্রেণীর লোকেদের আর্থিক জীবনের মূল ভিত্তি। ফলে স্বাধীন ভূমিস্বার্থ-হীন ইউরোপের বণিকেরা যে সামাজিক-আর্থনীতিক আন্দোলন ঘটাতে পেরেছিলেন, এদেশে তা হয় নি। শুধু তাই নয় উমরের মতে 'এই ভূমি-স্বার্থের জন্যে সেকালের মধ্যশ্রেণী শ্রেণীগতভাবে থাকত কৃষক-স্বার্থের বিরোধী এবং সামন্তবাদের রক্ষক ও মুখপাত্র। এদিক দিয়ে রেনেসাঁসের বাণিজ্যিক বুর্জোয়ার সাথে উনিশ শতকীয় বাঙালি মধ্যশ্রেণীর পার্থক্য যে আকাশ-পাতাল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই।'

বদরুদ্দিন উমর আরও বলেছেন, রেনেসাঁসের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় আন্দোলনের যোগ ছিল না। ইউরোপে রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন ছিল স্বতন্ত্র দুই ধারা এবং দুয়ের প্রভাবেই যদিও সামন্ততন্ত্রের ভিত শিথিল হয়ে বুর্জোয়া শক্তির বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু রিফর্মেশনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত খ্রীস্টধর্মের সংস্কার। এবং মূলত ধর্মীয় আন্দোলন হওয়াতে এর নেতৃত্ব ছিল মার্টিন লুথার, ক্যালভাঁ প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যক্তিদের হাতে। অন্যদিকে 'উনিশ-শতকে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর উত্থানের যুগে রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, বিবেকানন্দ প্রমুখকে ঢালাওভাবে তথাকথিত নবজাগরণের নেতা বলে আখ্যা দেওয়া তো হয়ই উপরন্তু তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় আন্দোলনে নিযুক্ত ব্যক্তি ও ধর্মীয়

আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের কোনো তফাৎ করা হয় না। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ সকলেই নির্বিবাদে একই দলভুক্ত হয়ে বাঙালি নবজাগরণের নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত হন।'

রামমোহন প্রসঙ্গ

১৯৭২ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে (On Rammohan Roy, ১৯৭২) ইতিহাসবেত্তা রমেশচন্দ্র মজুমদার রামমোহন সম্পর্কে এক নতুন মূল্যায়ন তুলে ধরেন এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই তা প্রবল বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রমেশচন্দ্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু কলেজের আদি কল্পক হিসেবে রামমোহনের কৃতিত্ব সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা তা ভ্রান্ত এবং হিন্দু সমাজে আচরিত সামাজিক কুপ্রথার পরিবর্তন প্রসঙ্গে এক প্রকার রামমোহন-মীথ গড়ে উঠেছে, ইত্যাদি।

হিন্দু কলেজ বিষয়ক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'আমাদের দেশের বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে কয়েকজন এই মিথ্যাকে (অর্থাৎ রামমোহন এ-দেশের প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একেবারেই যুক্ত ছিলেন না) সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য এমন উৎকট উৎসাহ প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের মধ্যে অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধির চেয়ে গোষ্ঠীগত ও ধর্মগত বিদ্বেষই বেশি প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়' ('মেহনত ও প্রতিভা', অয়ন, ১৯৭৯)। 'রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা' (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৫) বইতে সোমেন্দ্রনাথ বসু রমেশচন্দ্রের এই অভিযোগগুলির বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। সোমেনবাবুর মতে রমেশচন্দ্র স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের একটি চিঠির উপর ভিত্তি করে রামমোহনের সঙ্গে হিন্দু কলেজের বিযুক্ততার কথা প্রমাণ করার যে চেষ্টা করেছেন তা নিতান্তই ভিত্তিহীন। হাইড ইস্টের চিঠিটি* ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, 'কলকাতা শহরে বহু সংখ্যক

---

* ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ মে স্যার হাউড ইস্টের লণ্ডনের বন্ধুকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ :

'গত মে মাসের প্রথম ভাগে আমার পূর্ব-পরিচিত-কলিকাতাবাসী এক ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন যে, এই শহরবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর ইচ্ছা যে, ইউরোপে যে-রকম উদার প্রণালীতে যুবকগণের শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে

হিন্দু ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের জন্য এতই ব্যাকুল যদি তাহলে কেবল রামমোহন রায়ের চাঁদা না নেওয়ার প্রসঙ্গ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এবং এও লক্ষণীয় যে ইস্ট নাকি তাঁকে আদৌ চেনেন না। যদি কোনো স্তরে, কোনো আলোচনায় রামমোহন হিন্দু কলেজের পরিকল্পনায় আদৌ যুক্ত না থাকবেন তাহলে হঠাৎ তাঁর নাম করে গায়ে-পড়া ঝগড়ার মধ্যে এই ব্রাহ্মণ (যার কথা ইস্টের চিঠিতে উল্লেখ আছে—লেখক) গেলেন কেন? আর ইস্ট-ই বা সে ঘটনা এত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন কেন? সভায় কি আলোচনা হল তার বিবৃতি নেই, শুধু আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা প্রতিশ্রুত হল এবং স্থির হল রামমোহনের চাঁদা নেওয়া হবে না। একথা ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে না যদি বলি যে কোনো একটা স্তরে রামমোহন এই পরিকল্পনায় ছিলেন আর সেজন্যেই সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণপ্রবরের এত উত্তেজনা।'

পারে, সেইরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। আমার বাড়িতে একটি সভার অধিবেশন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য করিবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি স্বীকৃত হইলে ১৪ই মে প্রায় ৫০ জন ধনী মানী ও নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু আমার বাড়িতে সমবেত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাও ছিলেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং আরও অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবেন, এরূপ ভরসা দিলেন।

সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে আমি সকলকে সভাস্থলের পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। আমার অপরিচিত কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতকে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, তিনি দুই হাত মুঠা করিয়া আমার দিকে প্রসারিত করিলেন, এবং মুঠার ভিতর হইতে অনেকগুলি সুগন্ধি পুষ্প আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, 'সাহিত্যের প্রতীক স্বরূপ এই ফুলগুলি আমাকে উপহার দান করিলেন, আমি গ্রহণ করিলে তাঁহারা সুখী হইবেন।' তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। এমন সময় একজন ধনী, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন যে, আশা করি রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোনো চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, 'রামমোহন আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন।' আমি বলিলাম, 'আমি রামমোহনকে চিনি না; কখনও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; তাঁহার ধর্ম কি, তাহা জানি না।' (বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার-কৃত অনুবাদ)।

রমেশচন্দ্র আরও বলেছেন যে হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতি থেকে রামমোহনের স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার গল্পটি তৈরি করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৭৭ সালে ও ১৯০৩ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীমশাই। সোমেনবাবু তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে, প্যারীচাঁদ মিত্র বা শিবনাথ শাস্ত্রীর বহুপূর্বেই 'সমাচার দর্পণ'-এ (১৮৩১ সালের ১৫ অক্টোবর) প্রকাশিত এক গোঁড়া হিন্দুর লেখা এবং ১৮৩৪ সালে রামমোহন স্মরণে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে রক্ষণশীলদের প্রবল বিরোধিতার জন্যই রামমোহন সরে এসেছিলেন এই কলেজের সংস্পর্শ থেকে।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই বক্তব্য কোনো কোনো মার্কসবাদী মহলেও যে স্বীকার্য হয়েছে তার উদাহরণ, নিঃশঙ্ক গুপ্ত-র 'বৃটিশ-ভারতের শিক্ষা-ষড়যন্ত্র' ('অনুষ্টুপ', ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮০) প্রবন্ধে রামমোহন প্রসঙ্গে মন্তব্য।

সমাজ-সংস্কারক রামমোহন সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বলেছেন যে, আধুনিক কলকাতা শহরে ঢাক-ঢোল পেটানো দুর্গাপুজোই প্রমাণ করে যে রামমোহনের ধর্মসংস্কারের প্রভাব এ-যুগের ওপর পড়ে নি। রামমোহনের মূর্তি পুজোর বিরোধিতাই বা কজন মেনেছে? সোমেন্দ্রনাথ খুব সঙ্গত উত্তরই এ-বিষয়ে দিয়েছেন, 'জানতে ইচ্ছে করে বুদ্ধের অহিংসার বাণী কজন মেনেছেন, যীশুর প্রেমমন্ত্রকে কজন খ্রীস্টান শ্রদ্ধা করেছেন, বিবেকানন্দের ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে কজন হিন্দু মনে প্রাণে সমর্থন করেছেন। Extent of success দিয়ে বিচার করলে এইসব মহাপুরুষদেরই বা পরিণতি কি?'

উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে বদরুদ্দিন উমর পূর্বোক্ত গ্রন্থে একটি সমস্যা তুলে ধরেছেন। এই সূত্রে তা ভাবা যেতে পারে। উমর সাহেবের বক্তব্য, 'বাঙালি জাতির এই তথাকথিত নবজাগরণ ধর্মীয় চিন্তা ও কুসংস্কারের দ্বারা এত প্রবলভাবে আচ্ছন্ন ছিল যে, ধর্মীয় আন্দোলনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে অন্যদের পৃথক করার কোনো জরুরি তাগিদ পরবর্তীকালের সমালোচকেরাও অনুভব করেন নি। এক্ষেত্রে তাই একটি বিষয়ের উল্লেখ একেবারে অপরিহার্য। সে বিষয়টি হল এই, উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্তের নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকুন অথবা নাই থাকুন, তাতে নেতৃত্ব দেন অথবা নাই দেন, তাঁরা সকলেই জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়কে নিজেদের চিন্তায় এক করে দেখতেন। কাজেই জাতীয় উন্নতি ও মুক্তি বলতে তাঁরা নিজেদের ধর্ম-সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মুক্তিকেই বোঝাতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম

আব্‌দুল লতিফ, আমীর আলী, বিবেকানন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে পরবর্তীকালে পরিণতি লাভ করেছিল সাম্প্রদায়িকতায়। রাজনীতি ও ধর্ম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ধর্মাশ্রিত রাজনীতিই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার করেছিল ব্যাপক প্রাধান্য।'

বিনয় ঘোষের বক্তব্যে এই বিশ্লেষণ অবশ্য সায় পায় না। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার ট্র্যাজেডির রচয়িতা ইংরেজ শাসক। উদীয়মান হিন্দু সম্ভ্রান্তসমাজ বা বিদ্বৎসভা নন। উঁচুস্তরের হিন্দু সমাজে হিন্দুত্ব প্রীতির আধিক্য, এমনকি 'বিসদৃশ আতিশয্য' (ধর্মসভার ক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য) থাকলেও মুসলমানবিদ্বেষ কখনও ছিল না, ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ংবেঙ্গল হিন্দু-সমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, মুসলমানদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'নবযুগের রিনেস্যান্স আন্দোলন ও রিফর্মেশন আন্দোলন ঐতিহাসিক কারণে, হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, তার মধ্যে সচেতন 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে কিছু ছিল বলে মনে হয় না। এই চেতনা পরবর্তীকালে ইংরেজরা কৌশলে জাগিয়ে তুলে ঐতিহাসিক ফাঁকটুকু পূরণ করেছেন মাত্র।' ('বাংলার বিদ্বৎসমাজ', প্রকাশভবন, ১৯৭৩)

রমেশচন্দ্র মজুমদারের আরেক অভিযোগ যে, সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও তাঁকে Pioneer বলা চলে না। কারণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বহু আগেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। আর তাছাড়া বেণ্টিঙ্কের আইনের বিরোধিতাতেও রামমোহনের ভূমিকা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে। সোমেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দেশীয় সমাজে রামমোহনই প্রথম সংগঠিত আন্দোলন অর্থাৎ জনমত গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন, ইংরেজ রাজপুরুষদের এ-ব্যাপারে সদিচ্ছা থাকলেও তা মুভ্‌মেন্টের আকার কখনও নিতে পারত না—এই অর্থেই রামমোহন পাইওনীয়র। দ্বিতীয়ত, সুপ্রীম কোর্ট সতীদাহ ব্যাপারে হিন্দুশাস্ত্রের আইনগত অবস্থা জানতে চাইলে বেতনভুক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর বক্তব্য জানিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে জনসাধারণকে জানাবার জন্য প্রকাশ্যেও তিনি কিছু লেখেন নি। সোমেনবাবু লিখেছেন, 'তাছাড়া সরকারী পণ্ডিত হিসেবে শাস্ত্রব্যাখ্যা তো তাঁর বহু আগেই ঘনশ্যাম করেছিলেন। ঘনশ্যামকে বাদ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে প্রাধান্য দিলে সন্দেহ হয় যে রামমোহন-মীথ ভাঙতে গিয়ে রমেশচন্দ্র আবার

একটা মৃত্যুঞ্জয়-মীথ গড়ে তুলছেন না তো।' তৃতীয়ত, বেন্টিঙ্কের আইন-প্রণয়নে বিরোধিতার ব্যাপারটা যে নিতান্তই স্ট্র্যাটেজিক, নীতিগতভাবে বিরোধিতা নয় এবং রামমোহন এ-বিষয়ে আইন পাশের পর যে সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তা তো বিশেষ অপরিজ্ঞাত তথ্য নয়।

রামমোহনের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক চিন্তা-ভাবনায় উনিশ শতকের বাংলাদেশের জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ফুটে ওঠে এবং এতে তাঁর চাটুকারী দাসত্বের মনোভাবই প্রতিষ্ঠা পায়—এ ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন এ-যুগের বহু মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হলেও রমেশচন্দ্রের অভিমতও তাই। রামমোহন প্রসঙ্গে এই বিশ্লেষণ নতুন কিছু নয়, বহুকাল ধরেই এ-বিতর্ক অব্যাহত। তবে ইদানীং ঝাঁঝটা একটু বেশি।

দেশীয় অভিজাতদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও ভূমিস্বার্থের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের কৃপা অবিচ্ছেদ্য ছিল বলেই রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখের রাজনৈতিক চিন্তায় 'ইংরেজ শাসনকে এদেশে কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, কিভাবে এদেশকে ইংরেজবিরোধী বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করা যায়' এই বোধ প্রাধান্য পেয়েছিল। বদরুদ্দিন উমরের এই বক্তব্য আরও প্রসারিত হয় এইভাবে, 'ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি জানাতে গিয়ে রামমোহন বলেছেন যে, এই স্বাধীনতা দরকার কারণ তা না হলে জনসাধারণ নিজেদের অভাব অভিযোগ স্বাধীনভাবে সরকারের কাছে জানাতে পারবে না এবং তার ফলে সরকারের পক্ষে দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মাধ্যমে যদি স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার অধিকার জনগণের না থাকে তাহলে এদেশে ইংরেজ-শাসন-বিরোধী বিপ্লবীশক্তি (মূলত কৃষকশ্রেণী) জোরদার হবে এবং পরিণতিতে তা হয়ে দাঁড়াবে বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক। এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এদেশে সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে রামমোহনের 'জোরালো আবেদন। এর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর দেশপ্রেম কোথায়?' (উমরের পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

নিঃশঙ্ক গুপ্ত লিখেছেন, 'ব্রিটিশকে উৎখাত করার ব্রত নিয়ে তিতুমীর যখন কোম্পানির গোলার মুখে নিজের ও সহযোদ্ধাদের রক্তে নারকেল-বেড়িয়ার বাঁশের কেল্লাকে ধুইয়ে দিচ্ছিলেন সেই সময় ইংলণ্ডে বসে "বর্তমান

সরকার ও দেশী বিদেশী শাসকদের সম্পর্কে ভারতবাসীদের মতামত কি ?" —ইত্যাদি প্রশ্নের চতুর উত্তর দিচ্ছিলেন রামমোহন। তিনি বলেছিলেন, "একটু ভিতরের দিকের কৃষকেরা ও গ্রামবাসীরা কি অতীত কি বর্তমান সকল সরকার সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিস্পৃহ......" সুতরাং তাদের কথা বাদ। কিন্তু কাদের হয়ে কথা বলছিলেন রামমোহন? প্রশ্নটি অবান্তর, কথা বলছিলেন তিনি নিজের শ্রেণীর হয়ে, তাদের হয়ে যারা ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত থেকে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, এবং যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদে নিরাপদে সুখে-শান্তিতে জমিদারি ভোগ দখল করছে' (নিঃশঙ্ক গুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)।

নিঃশঙ্ক গুপ্ত রামমোহনের প্রতিবেদনের অংশমাত্র তুলেছেন, পুরো বক্তব্যটি তুলে অমলেন্দু দে পৌঁছেছেন অন্য সিদ্ধান্তে। 'ইংরেজ শাসক সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের মনোভাব কি এই বিষয়ে রামমোহনের অভিমত হল এই: (ক) কৃষক ও গ্রামের লোকেরা পূর্বের ও বর্তমান সরকার সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাদের ধারণা, তারা যে বিপদ হতে রক্ষা পাচ্ছে অথবা অত্যাচারিত হচ্ছে তা তাদের অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের আচরণের ফলেই হচ্ছে। (খ) কিন্তু যাদের উচ্চাশা আছে এবং যে সমস্ত প্রাচীন পরিবারের লোকেরা বর্তমান শাসনব্যবস্থার ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তারা ইংরেজ সরকারের অধীনে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করে এবং তারা এই শাসনব্যবস্থার প্রতি সুনিশ্চিত ভাবে অসন্তুষ্ট। (গ) আর যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি অর্জন করেছে এবং যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে, তারা শুধু এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় নি, তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে। ভারতীয়দের এই তিনটি অংশে ভাগ করে রামমোহন মন্তব্য করেন যে ভারতীয়দের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তাঁরা মনে করেন যে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরির ব্যবস্থা থাকার উপরেই সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নির্ভর করে। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে রামমোহন যে মনোভাব ব্যক্ত করেন তা কি নিছক ইংরেজ-তোষণের পর্যায়ে পড়ে?' ('বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪)।

অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণে বলেছেন,

১৮১৬ সালের পর থেকে রামমোহনকে বলা যায় গ্রামের জমিদারির অনুপস্থিত শহরবাসী মালিক। 'তাঁর লেখাতে আমদানি রপ্তানি, সরকারি ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উল্লেখ থাকলেও, প্রধানত তিনি ভূমি ও কৃষির সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, এই আলোচনাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কৃষকপ্রজার অনুকূলে, জমিদারের নানা প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে।' ভবতোষবাবু বলেছেন, 'খুদকাশ্‌ত্‌ চাষীর অধিকার সংরক্ষণের আশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু জমিদারেরা সে আশা সফল করেন নি। রায়ত খাজনা দিতে দেরি করলে কিভাবে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হত তার বর্ণনা রামমোহন দিয়েছিলেন। আর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন জমিদারেরা চাষীর উৎপন্ন ফসলের দামের অর্ধেক নিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন, বাকি অর্ধেক থেকে চাষীকে বীজ ও কৃষির অন্য সব ব্যয় নির্বাহ করে জীবনযাত্রার সম্বল খুজতে হত। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-নির্ধারণে চাষী সুবিচার পেত না। এই ব্যবস্থায় চাষীর পক্ষে জীবন ধারণই শক্ত ছিল, সঞ্চয়ের তো কথাই ওঠে না।' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকের দুরবস্থার সমস্যার সমাধানে রামমোহনের মত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মতে ভূমিব্যবস্থায় তিন পক্ষেরই অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন—শান্তিরক্ষা ইত্যাদির বিনিময়ে রাজস্বপ্রাপ্তিতে সরকারের অধিকার, স্থিরীকৃত রাজস্ব দেবার বিনিময়ে জমিদারের খাজনা আদায়ের অধিকার, এবং জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশ লাভে চাষীর অধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই তৃতীয় অধিকারটি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন তীব্র ভাষায় বলেছিলেন, 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না, তাদের দেয় খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হবে না কেন, কেনই বা সহৃদয় সরকার এখনো রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধি শক্ত হাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।' রামমোহন যা চেয়েছিলেন তা অবশ্য তখন করা হয় নি, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। ১৮৩১ সালে বসে 'রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব তদানীন্তন অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে।'

প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের দেয় রাজস্ব কমানোর প্রস্তাবও দিয়েছিলেন রামমোহন এবং তাতে সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি

পড়তে পারে এই আশঙ্কা করে প্রস্তাব করেছিলেন যে, সরকার আয় বাড়াতে পারবেন বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর শুল্ক বসিয়ে এবং ব্যয় কমাতে পারবেন ইংরেজ কর্মচারীর জায়গায় ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ব্যয় কমানোর জন্য তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামমোহন প্রস্তাবিত ভারতীয়করণের দাবি অনেককাল পরে জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ভবতোষ দত্ত বলেছেন, রামমোহন ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বসবাস করার সুবিধে করে দেওয়ারও প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে স্থায়ী ভাবে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজ কৃষিশিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত আধুনিক পন্থা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, বিনিয়োগ করবে তাঁদের মূলধন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁরা সাহায্যকারীর ভূমিকা নেবেন। ভবতোষবাবুর মন্তব্য, 'রামমোহনের এ সম্বন্ধে লেখা খুঁটিয়ে পড়লে সন্দেহ হয় যে, তাঁর মনের অন্তস্থলে শিক্ষিত ভারতীয় ও স্থায়ী ইউরোপীয় বাসিন্দাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা অবাঞ্ছিত ছিল না......পরবর্তী যুগে ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা রামমোহনের অনেক প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ বসবাস সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কখনও উচ্চারণও করেন নি।' ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে নীলকর প্রসঙ্গে রামমোহনের চিন্তার ব্যাপারে। ভবতোষবাবুর ভাষায়, 'এটাও আশ্চর্য যে, স্থায়ী বসবাসকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীর দ্বারা ভারতীয়দের শোষণের সম্ভাবনাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন নি, যদিও নীলকরদের অনাচারের কাহিনী তাঁর অজানা থাকাবার কথা নয়' (অর্থনীতির পথে, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, ১৯৭৭)।

কালের বিচারে রামমোহনের অনেক প্রস্তাবই গ্রহনীয় হয় নি, অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা সীমাবদ্ধতা এনে দিয়েছিল—এ তো ইতিহাস এবং সে-যুগের বিচারে তা স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু এতে তাঁর কৃষক-বিদ্বেষী বা দেশপ্রেমহীনতার পরিচয় স্পষ্ট হয় কি ?

সম্প্রতি প্রকাশিত 'মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর' (প্রগ্রেসিভ স্টাডি গ্রুপ, ১৯৭৯) গ্রন্থে অমল ঘোষ মার্কস-লেনিনের বক্তব্য উদ্ধার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশ পুঁজিবাদ একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে। আর তাই রামমোহনের ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে সমর্থন কোন প্রতিক্রিয়াশীল কাজ নয়। এই সূত্রে লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

যেহেতু এদেশের ভূমি ব্যবস্থায় প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি করল সেহেতু একে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী ভ্রান্ত নীতি বলা যায় না। কারণ বুর্জোয়া বিকাশের জন্য এই ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি সহায়ক হয়েছিল। এবং এই একই যুক্তির প্রসারে নীলকর সাহেবের অত্যাচার, সমর্থন না করলেও নীল চাষের মাধ্যমে যে-পণ্য-অর্থনীতির সূচনা তা প্রগতির অনুকূল শক্তি হিসেবেই লেখক চিহ্নিত করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনাচার-অত্যাচার সত্ত্বেও এদেশে বুর্জোয়া অর্থনীতি বিকাশে তারা যে সহায়ক শক্তি ছিল, মার্কস যাকে বলেছেন 'ইতিহাসের অচেতন শক্তি', তার বিশ্লেষণ করে অমলবাবু রামমোহনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে তাঁর সপ্রশংস ভূমিকাই লক্ষ্য করেছেন।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে

গত দশকে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও নানা বিতর্ক দেখা গেছে। প্রসঙ্গত তারই কিছু কিছু উল্লেখ করা যাক।

অমল ঘোষ 'মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর' (প্রোগ্রেসিভ স্টাডি গ্রুপ, ১৯৭৯) বইতে বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর-চর্চায় কিছু কিছু তথ্য-বিকৃতির গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এই অভিযোগ মূলত দুটি ঘটনা কেন্দ্র করে—জনশিক্ষা ও সহবাস-সম্মতি আইন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অভিমত নিয়ে।

অমলবাবু লিখেছেন যে, ১৮৫৯ সালে জনশিক্ষা সম্পর্কে ছোটোলাটকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠির মূল বক্তব্য উদ্ধৃত না করে চিঠির সামান্য অংশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরের অভিমতের অপব্যাখ্যা করেছেন। একটু দেখা যাক ব্যাপারটা।

হ্যালিডে সাহেবের সক্রিয় উৎসাহে ১৮৫৫-১৮৫৬ সালে বাংলাদেশের চারটি জেলায় অন্তত কুড়িটি বাংলা মডেল স্কুল বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলি যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল তাঁর লেখা চিঠিপত্রেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায় একই সঙ্গে ঐ হ্যালিডে সাহেবের উৎসাহে বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এবং এ-ব্যাপারে সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ১৮৫৭-৫৮ সালের বিভিন্ন রিপোর্ট-নোট-চিঠিপত্রে বুঝতে পারা যায় যে সরকারের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ শিক্ষাবিস্তারের এসব কাজে বিদ্যাসাগরকে তেমন সাহায্য করতে আর রাজি নন। এতে যে বিদ্যাসাগরের আশাভঙ্গ হওয়ার বিশেষ কারণ

ঘটল তা সহজেই অনুমেয়। এই সময়েই ১৮৫৯ সালে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অল্প খরচে কিভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব সে-বিষয়ে ভারত সরকার ছোটোলাট গ্রান্ট সাহেবের মতামত জানতে চান। ছোটোলাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। ২৯ সেপ্টেম্বরের এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর জানালেন তাঁর অভিমত :

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'-এর প্রথম সংস্করণে (১৯৫৯) বিনয় ঘোষ এই চিঠির মূল বক্তব্য অনুবাদ করেছিলেন : চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করলেও এই অনূদিত অংশেই বুঝতে পারা যায় বিদ্যাসাগর কী বলতে চেয়েছেন এই প্রসঙ্গে। বিনয় ঘোষকৃত অনুবাদটি উদ্ধৃত করা যাক।

> সরকার ভেবেছেন যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে ৫/৭ টাকা খরচ করে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। আমার মনে হয় না তাতে কোন কাজ হবে : যাঁরা সামান্য লেখাপড়া জানেন, তাঁরা নিজেদের গ্রামের বিদ্যালয়েও এত অল্প বেতনে কাজ করবেন না। ···শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা এতই খারাপ যে তাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য তারা কোনরকম ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম। একটু বড় হলেই ছেলেরা যখন উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে, তখন তারা ছেলেদের আর পাঠশালায় রাখতে চায় না। তাদের ধারণা—এবং ধারণাটা বোধহয় ঠিকই—যে ছেলেরা লেখাপড়া শিখলেই তাদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হবে না। তাছাড়া দেশের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে (জ্ঞানার্জন) তেমন সচেতন নয়, তখন শ্রমিকশ্রেণীর সে-বোধ থাকতে পারে না। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। সরকারের যদি সত্যই তাদের শিক্ষা দেবার সাধু উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তেন তাঁরা অবৈতনিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত বলছি, এরকম ব্যবস্থা বেসরকারি-ভাবে যেটুকু করা হয়েছে। তাতে কোন ফল হয় নি।
>
> ইংলণ্ডে ও আমাদের দেশেও অনেকের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কিছু করা দরকার। ···কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে একথা সত্য বলে মনে হয় না।
>
> আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা

করলে, সরকারের উদ্দেশ্য অনেক বেশী সফল হবে। শিক্ষাবিস্তারের এইটাই যে একমাত্র পন্থা, তা অবশ্য আমি বলছি না। তবু আমার ধারণা, একশ' ছেলেকে সামান্য লেখাপড়া শেখানোর চেয়ে, একজনকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলতে পারলে সরকার শিক্ষা-বিস্তারের অনেক বেশী সাহায্য করবেন। দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করে তোলা খুবই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে বর্তমানে তা করা সম্ভব কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমন কি ইংলণ্ডের সরকার অত্যন্ত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, সেখানকার জনসাধারণের শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় এমন কিছু উন্নত নয়।

এই চিঠির ওপর মন্তব্য করে বিনয় ঘোষ লিখলেন, 'বিদ্যাসাগরের এই যুক্তির মধ্যে ফাঁক নেই কোথাও। ১৮৫৯ সালে তিনি শ্রমিক শ্রেণী ও দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও ধরেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য যুক্তি দেখিয়ে কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি। আজও যখন আমাদের দেশে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তখন একশ বছর আগে বিদেশী সরকারের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর বা সাধারণের শিক্ষার সদিচ্ছা প্রকাশ করা যে 'বুজরুকি' ছাড়া কিছু নয়, বিদ্যাসাগর তা বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্যই তিনি অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তাঁর বিবৃতির মধ্যে একটিও যুক্তিহীন কথা নেই। সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে তিনি যা বলেছেন তাও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু যুক্তি ও সত্যের উপরেও, অন্তত তাঁর মতন উদারচিত্ত পুরুষের কাছ থেকে, দেশের জনসাধারণ বড়-ছোট নির্বিশেষে গভীর মানবতাবোধ দাবি করতে পারে। সেই মানবতাবোধ এই উক্তির মধ্যে একটু বেসুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বললে নিশ্চয়ই রূঢ় শোনাবে। তা হয়ত হয়নি, কিন্তু কিছুটা উদাসীনতা যে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর, অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে, নিজের চিন্তাকে যে স্ব-শ্রেণীর সীমানার বাইরে বেশি দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন নি, তা তাঁর এই শিক্ষানীতিব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়।'

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৭৩) বিদ্যাসাগরের চিঠিটির উক্ত অনুবাদ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি গ্রন্থকার, পাঠককে নিবেদন করলেন শুধু সেই অংশটুকু যাতে বলা হয়েছে যে উচ্চতর শ্রেণীগুলির শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে এরকম ভাববার কোন কারণ নেই এবং এই শ্রেণীগুলির মধ্যেই ব্যাপকভাবে শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন এ-বিষয়ে যে চিঠির এই অংশটুকুর উল্লেখে বিদ্যাসাগরের মূল বক্তব্যের spirit কিছুমাত্র আঁচ করা সম্ভব হয় না সাধারণ পাঠকের পক্ষে।

১৯৭৩ এ প্রকাশিত 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থে 'বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা: ১৮০০-১৯০০' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বা তাদের সৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরা কেউই জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। এমন কি বিদ্যাসাগরের মতো এতো বড় একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকও চাইতেন শিক্ষাকে উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে। ১৮৫৯-এ (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯) বাংলা সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি: "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের সর্বোত্তম—এবং সম্ভত একমাত্র—উপায় হিসেবে সরকারের উচিত উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রসার করেই ক্ষান্ত থাকা"।'

জনশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের চিঠির ঠিক এই অংশটুকুই উদ্ধৃত করে বদরুদ্দিন উমর আরও তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর এই পরামর্শের দ্বারা তিনি যে শুধু তাঁর স্বশ্রেণীর সীমানার বাইরে' যেতে অক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, এই পত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবেই সরকারকে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

'মডেল স্কুলের সাফল্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নিজের রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায়, সেকালেও বাঙলাদেশে জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ একেবারে ব্যর্থ হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। সেই উদ্যোগের দ্বারা শতকরা একশো জনের অক্ষর পরিচয় অথবা শিক্ষা না হলেও জনশিক্ষা যে তার দ্বারা অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত হতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সরকার যে অর্থ শিক্ষা খাতে তখন ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল সে অর্থকে তিনি নিম্নশ্রেণীভুক্ত জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে

দায় করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সুস্পষ্টভাবেই সেই বিরোধিতা করেছিলেন। সেই বিরোধিতার মাধ্যমে তাঁর বাস্তব জ্ঞান অপেক্ষা তাঁর নিজস্ব শ্রেণী-চেতনাই যে অধিকতর প্রকটিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।' (উপরের পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

এই একই কথার প্রায়-প্রতিধ্বনি অমলেন্দু দেব মন্তব্যেও শোনা গেল।...'জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিষয়টি অনেকের নিকটেই অবাস্তব মনে হয়। তাই দেখি, বিদ্যাসাগরের মত মহান ব্যক্তি, যিনি বাংলাভাষায় বিদ্যা শিক্ষিবণের পথ সুগম করে দেন, তিনিও মনে করেন: "উচ্চশিক্ষা বাদ দিয়ে জনসাধারণের শিক্ষার চেষ্টা উচিত নয়। কোনো দেশেই গণশিক্ষা সম্ভব হয় নি, এদেশে তা অসম্ভব।" ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর এই মত ব্যক্ত করেন। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের উর্ধে ওঠা বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব হয় নি।' (অমলেন্দু দে-র পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক' (নবজাতক, ১৯৭৩) পুস্তিকায় সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, 'অনুষ্টুপ' (পূর্বোক্ত সংখ্যা) পত্রিকায় নিঃশঙ্ক গুপ্ত ও অচেনা মিত্রর বক্তব্যেও বিদ্যাসাগরের এই 'জনশিক্ষা বিরোধী', 'স্বশ্রেণীতে সীমাবদ্ধ' চরিত্রের রূপই উদ্ভাসিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২) গোপাল হালদারের বক্তব্য এ-বিষয়ে আমাদের অন্য সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন, 'বিশদ আলোচনা না করেও সংক্ষেপে কথাটা বলা যায়—বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের নায়ক। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের দ্বারা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি কোথায় কতটা খর্বিত, সে কথা অবান্তর নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রসঙ্গে তা গৌণ। তিনি নিজে যা উল্লেখ করেছেন তা মোটামুটি যথেষ্ট—উনিশ শতকের ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি—ইংলণ্ডেও না, যে ইংলণ্ড সেসময়ে তখন বুর্জোয়া সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়। ভারতে বা বাঙলাদেশে ১৮৫৯-৬০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব তোলা তাই অবাস্তব এখনো —১৯৭০-৭১ সালেও—স্বাধীন ভারতে যখন শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। আর, বিদ্যাসাগর কোনো অবাস্তব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না। শুধু বাস্তববাদী নন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল—কি শিক্ষায়, কি

সমাজকর্মে, কি নীতিতে, কি কর্ম প্রণালীতে; তেমন সম্ভাব্য কাজই তিনি বেছে নিতেন, নিজের কর্ম-পদ্ধতি ও প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি দ্বারা রূপায়িত করতেন।'

গোপাল হালদার বিদ্যাসাগরের বাস্তবতাবোধের কথাটিই জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু শুধুই কি বাস্তবজ্ঞান—প্র্যাকটিকাল চিন্তা? এই চিঠি লেখার অব্যবহিত আগের ঘটনাগুলি (যেমন স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আর্থিক সাহায্যাদি বন্ধ করে সরকারি কর্তৃপক্ষ যে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছিল) কি প্রমাণ করে না যে জনশিক্ষা প্রসারের এই প্রস্তাব নিতান্তই লোক-দেখান. সরকারের বুজরুকি। আর তাছাড়া উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে ইংরেজ সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত, অর্ধসমাপ্ত, আধা খ্যাচড়া ব্যবস্থাপনা ও নীতিগুলি বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রখর বাস্তবতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মনে যে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সঞ্চার করতে বাধ্য ছিল এই চিঠি তো তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব 'স্বশ্রেণীর সীমাবদ্ধতা' প্রমাণ করতে এই চিঠি কি খুব সাহায্য করছে আমাদের?

১৮৬৭ সালে স্ত্রী নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও গ্রে-সাহেবের কাছে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগরের মনোভাব এই দৃষ্টিতেই বিচার্য। দেশীয় উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের কথা ও কাজের মধ্যে ফাঁক বিদ্যাসাগর টের পেয়েছিলেন ততদিনে এবং সে-কারণেই বুঝেছিলেন বয়স্ক মহিলাদের নিয়ে শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে না তখনই। তাই এই পরিকল্পনা রূপায়নের সম্ভাব্যতা নিয়েই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, নীতিগত কোনো আপত্তি কখনই তোলেন নি। তদানীন্তন ডি. পি. আই-কে লেখা উড্রো সাহেবের চিঠির (২রা মার্চ, ১৮৬৯) বক্তব্যেই তো একথা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। কাজেই 'দেশবাসীর মনোভাবের কাছে কিঞ্চিৎ নতি স্বীকার' হয়তো তিনি করেছিলেন কিন্তু তাতে 'তাঁর চিন্তাধারার কিছুটা অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ' (বিনয় ঘোষ ও উমর সাহেব বলেছেন একথা) দেখা গেল, এ-অভিযোগও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

তথ্য-সরবরাহে ইচ্ছে মত গ্রহণ-বর্জনের আরও একটি উদাহরণ সহবাস-সম্মতি আইন প্রসঙ্গে বিনয়বাবুদের বিশ্লেষণ। ১৮৯১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সহবাস-সম্মতি আইনের ব্যাপারে যে-চিঠি লিখেছিলেন

বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে তার বিশ্লেষণ করে বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'বোঝা যায় না, কেন এই পত্রের মধ্যে তিনি 'Religious usage' কথাটির উপর এত জোর দিয়েছিলেন। বোঝা যায় না. শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে কেন তিনি এত চিন্তিত হয়েছিলেন।' এরপর তাঁর মন্তব্য যে এও স্বশ্রেণীগত স্ববিরোধের আরেক নমুনা। বলা নিষ্প্রয়োজন উমর সাহেবের মতও এই দিকেই। কিন্তু এসব মন্তব্য যার ভিত্তিতে সেই চিঠিতে ব্যক্ত বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা-ও যুক্তি-সমন্বিত বক্তব্য কি তুলে ধরেছিলেন সমালোচকেরা পাঠকদের সামনে ? তুলে যে ধরেন নি তার প্রমাণ এই—

> ...I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses ..such a law would not only serve the interests of humanity but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. (বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি)
>
> ...I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, *the measure I suggest would give larger, more real and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.*
>
> . . . .
>
> From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law

declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, *is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would be made more effective, if it was embodied in a penal law.* I may be permitted to press this consideration most earnestly on the attention of the Government. (সুবলচন্দ্র মিত্র ও পরবর্তীকালে ইন্দ্র মিত্রের উদ্ধৃতি. Italics বর্তমান লেখকের)।

বিদ্যাসাগর কেন অকারণে শাস্ত্রাচারে ঘা দিয়ে রক্ষণশীলদের আক্রমণ করার বিরোধী ছিলেন, তা কি এই শেষোক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না? বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় লড়াই-এর বাস্তব-পন্থা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতালব্ধ এই যুক্তি তাই 'শাস্ত্রাচারের কাছে পরাজয়' নয়, সমস্যা-মোকাবিলা করার সময়োচিত পদ্ধতি।

তথ্যের বিকৃতিতে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটতে পারে অমল ঘোষ এরকম আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 'দুন্দুভি' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ('বৃটিশের বাণিজ্যতরী ও বিদ্যাসাগর') জনৈক লেখক লিখেছেন, 'ব্যারাকপুরে যখন মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হয় এবং সিপাহী বিদ্রোহ সারা বাংলায় জ্বলে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কি তখন তার কলেজকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনানিবাসে পরিণত হতে দেন নি? ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যখন ফাঁসিতে উঠেছিল বিদ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে বৃটিশের জয়গান করে 'বাংলার ইতিহাস' রচনা করেন নি?' সংস্কৃত কলেজ কেন গোরা সৈন্যদের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং বিদ্যাসাগর যে কলেজ ছেড়ে দিতে আপত্তিও জানিয়েছিলেন—এসব কাহিনী বিস্তৃত জানিয়ে অমল ঘোষ এই অভিযোগ 'উন্মাদ ব্যক্তির কল্পনা' বলে মন্তব্য করেছেন।

এই ঘটনাটির আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ 'N. P. P. -- অর্থাৎ না-পড়ে-পণ্ডিত' (সাময়িকী, অধ্যয়ন, ১৯৭৭) শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, ১৮৫৭ সালের ১৭ আগস্ট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি ও ১৮ আগস্টে ডি. পি. আই-এর চিঠিতে বিদ্যাসাগর যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁকে সংস্কৃত কলেজ ভবন সৈন্যদের জন্য ছাড়তেই হবে তখন কলেজের জন্য অন্য দুটি বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করে তিনি ২৯ আগস্ট ডি. পি. আই-কে লেখেন যে খুব শিগগিরই তিনি সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতি চান। তবে যেহেতু সংস্কৃত কলেজের নতুন ব্যবস্থাদি গ্রহণে কিছু সময় লাগবে অতএব ডিসেম্বরের শেষদিক পর্যন্ত তিনি কাজ চালিয়ে যেতে রাজি আছেন। এবং পদত্যাগের এই সিদ্ধান্তের কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, তাও বলেছিলেন ঐ চিঠিতে। এই চিঠির প্রতিলিপি পেয়ে হ্যালিডে সাহেব অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদ্যাসাগরকে সাময়িকভাবে নিরস্ত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্ট যে পদত্যাগ পত্র তিনি দিয়েছিলেন তা আর প্রত্যাহার করেন নি। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, 'অতএব দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বেচ্ছায় সংস্কৃত কলেজে ব্রিটিশ সৈন্যদের স্থান দেন নাই। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া সংস্কৃত কলেজভবন অধিকার করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্তিভরে পদত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং এক বৎসরের মধ্যেই পদত্যাগ করিলেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষানুরাগী ছিলেন, কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং যতই অভিমান হউক, কলেজকে অব্যবস্থার মধ্যে রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারেন নাই। অবশ্য একটি মাত্র কারণেই বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করেন নাই, পদত্যাগের নানা কারণের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের কলেজভবনে স্থানদান অন্যতম।'

বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহের (২য় খণ্ড) ভূমিকায় গোপাল হালদার বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সামান্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে নারীর প্রতি অবিচার যেমন ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল অধিকাংশ মানুষকে অস্পৃশ্য বলে পশুবৎ পীড়ন করার সমস্যা। উনিশ শতকের জরুরি আরও কাজের মধ্যে ছিল 'ভারতীয় সমাজের আধুনিকতা সাধন, আধুনিক যুগধর্মে সমাজের নবরূপায়ণ, আত্মার নতুন স্ফুরণ' অর্থাৎ যুক্তির মুক্তি, ব্যক্তির মুক্তি, জাতির মুক্তিসাধনের কাজ। কোনোটিই গৌণ নয়, 'সকলের সমন্বিত উন্মেষেই ভারতীয় সমাজের যুগান্তর

সম্ভব। সেরূপ যুগান্তরই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের মূল দাবি'। এবং বাংলাদেশে আরো এক বিশেষ দাবি ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদারতন্ত্রের অভিশাপ মোচন : এই ছিল মূল দাবি। গোপাল হালদার বলেছেন, জাতীয় মুক্তি ও প্রজাসাধারণের অধিকার লাভের জন্য জমিদারিতন্ত্রের অভিশাপ মোচনের এই যুগদাবি সম্বন্ধে 'বিদ্যাসাগর নিস্পৃহ ছিলেন বলব না, কিন্তু মনে হয়—অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন।' কিন্তু কেন এই নিষ্ক্রিয়তা? তার কিছু কারণ অনুমান করে গোপাল হালদার বলেছেন, বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস ছিল আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আধুনিক যুগের ভিত্তি রচনা করতে হবে এবং সে-কারণে তিনি মনে করেছিলেন জনসাধারণকে চালনা করার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে তোলাই প্রাথমিক কাজ। যদিও ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি ক্রমে ভদ্রলোকের স্বরূপ বুঝে বিরক্ত হয়েই শেষ জীবনে করমাটাঁড়ে নির্ভেজাল সাঁওতাল নরনারীর সঙ্গ বেছে নিয়েছিলেন। গোপাল হালদার বিদ্যাসাগরের এই মধ্যবিত্তের উপর নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গিকেই তাঁর সীমাবদ্ধতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের চাষিদের উপর জমিদার-মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণ-নির্যাতনের স্বরূপ বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পারেন নি, এরকম অনুমান গোপাল হালদার অসংগত মনে করেছেন। এসব ছাড়াও প্রজাসাধারণের পক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর দেখেছেন, প্যারীচাঁদ-কিশোরীচাঁদের জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লেখাগুলিও বিদ্যাসাগরের অজানা থাকার কথা নয়। নীলবিদ্রোহ ও বাংলাদেশের জেলায় জেলায় প্রজা-বিদ্রোহের খবরাখবরও নিশ্চয়ই তিনি রাখতেন। ১৮৮৪ সালে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলেও বাঙালি সমাজের প্রধান সমস্যা যে সামন্ততন্ত্রের উৎখাতের সমস্যা তা তখনও টিঁকে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন—'অথচ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও শিক্ষাবিস্তারের বাইরে অগ্রসর হলেন না'। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গোপাল হালদারের মন্তব্য, 'মানতেই হবে—বিদ্যাসাগর ভারতীয় সমাজের যা মূল দাবি তা মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারেন নি, সেদিকে উদ্যোগ দেখান নি। হয়তো প্র্যাকটিক্যাল মানুষ হিসাবে মনে করেছেন, এই প্রজার অধিকারের সমস্যা অনেক বড় সমস্যা—দীর্ঘকাল শিক্ষাদীক্ষার শেষে, বহুবিধ আয়োজনের পরে, তার জন্য সংগ্রাম সাধ্য হবে। ততক্ষণ তাঁর কালে যা সাধ্য, এবং তিনি নিজ অভিজ্ঞতায় যাতে প্রতিনিয়ত পীড়িত হয়েছেন, চোখের উপর দেখা স্ত্রীসমাজের

এই দুর্ভাগ্য—সেইসব উপস্থিত কুপ্রথারই অবসান করতে অগ্রসর হয়েছেন।'

বাংলাদেশে জমিদারতন্ত্রের অবসান-চিন্তায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে নিস্পৃহ না বলে 'সচেতন নিষ্ক্রিয়তা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গোপাল হালদার। বদরুদ্দিন উমর একেই বলেছেন বিদ্যাসাগরের শ্রেণীবদ্ধতা, কৃষক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতা। উমর সাহেবের বিশ্লেষণ অনেকটা এরকম: 'বিদ্যাসাগরের সাথে কৃষকস্বার্থের কোনো মৌলিক সংঘাত ছিল না' এবং কৃষকদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত মমত্ব ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'তিনি কৃষকদের দুরবস্থা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে একটি বাক্যও রচনা করেন নি'। কেননা তিনি জানতেন যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অর্থ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, তার উচ্ছেদ ঘটাতে সহায়তা করা'। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে উমর সাহেব বলেছেন যে বিদ্যাসাগর কৃষকদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন নি, তিনি 'সচেতন ভাবেই পশ্চাদপসরণ' করেছিলেন। উমর সাহেব তাই সিদ্ধান্ত করেন, 'স্বশ্রেণীর মুক্তির চিন্তাতেই তিনি বরাবর আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট ভূসম্পত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্বার্থকেই বিবেচনার বিষয় মনে করেছেন; সেই স্বার্থকে অগ্রসর করতেই নিযুক্ত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কৃষকশ্রেণীর শত্রু না হলেও, এ জন্যেই তিনি শ্রেণীগতভাবে তাদের বন্ধুও ছিলেন না। নিজের শ্রেণীর প্রতি মৌলিক আনুগত্য ও কৃষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণে উৎসাহের অভাব—এই দুইয়ের সমন্বয় তিনি এক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের মাধ্যমেই সাধন করেছিলেন। এখানেই বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মের সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের চিন্তা ও কর্মের একটা মৌলিক পার্থক্য। এখানেই তাঁর বিশেষ শ্রেণীবদ্ধতা।'

বদরুদ্দিন উমরের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের একটি নিবন্ধ (শারদীয় পরিচয়, ১৯৭২) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সমালোচক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য তাঁর সমগ্র আলোচনায় যা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন তা হল এই যে এদেশে উনিশ শতকের জমিদার-নিপীড়িত কৃষকদের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য বিদ্যাসাগর আন্দোলনে ধাবিত হওয়ার কথা ভাবেন নি ঠিকই, এমন কি তাঁদের সমস্যাদি বিশ্লেষণে আক্ষরিক অর্থে কলমও হয় তো ধরেন নি, কিন্তু তিনি যে কৃষক-নির্যাতন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন তা কখনই বলা যায় না। এবং এই বক্তব্যটুকু প্রতিষ্ঠার

জন্যই প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য শোষিত-লাঞ্ছিত-দুর্গত সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি বিদ্যাসাগরের সেবাধর্ম প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, সে-যুগের সমাজ-সচেতন পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেন।

সমালোচক তাঁর আলোচনার উপসংহারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণে নতুন একটি সূত্রও ধরিয়ে দেন পাঠককে। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের ভাষাই উদ্ধৃত করা যাক সে-প্রসঙ্গে, 'মার্কসবাদে সমাজের সুপার স্ট্রাকচার বা ঊর্ধ্বতন কাঠামো, দুটি পৃথক এলাকায় বিশ্লেষিত। তার একটি হল রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র। অন্যটিকে মার্কস বলতেন 'ব্যুরগরলিশে গেজেলশাফট', বাংলায় আপাতত এর নাম দেওয়া যায় 'রাষ্ট্রেতর সমাজ' বা 'বেসরকারি সমাজ'। প্রথম এলাকাটি আমলাসংকুল, ফৌজ-পুলিশের দাঁতে-নখে সাজানো শাসনক ইস্পাত যন্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত। দ্বিতীয় এলাকায় পড়ে সরকার-বাহাদুর নামক মহাকায়-যন্ত্রের চৌহদ্দির বাইরেকার সমস্ত লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। এ হল সর্ববিধ সামাজিক সম্বন্ধ-বিন্যাস, লেন-দেন আর কর্মোদ্যোগের মহাক্ষেত্র। এই দ্বিতীয় এলাকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'-এর ধারণার অনেকটা মিল আছে। তাঁর 'আত্মশক্তি'-চর্চার কর্মসূচি বা 'স্বদেশী-সমাজ'-এর কার্যক্রমের তাৎপর্য বুঝতে মার্কসের এই রাষ্ট্রেতর সমাজের ধারণা আমাদের সাহায্য করবে। প্রথম এলাকাটি যদি হয় সমাজের সদর, দ্বিতীয়টি তার মফস্বল। বিদ্যাসাগরের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ছিল সমাজের এই দ্বিতায় এলাকা। অতএব, বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর এই স্বক্ষেত্রে; বাইরের কোনও দেশকাল-বিবিক্ত প্রতিমান-প্রয়োগ শুধু অবান্তর নয়, সেও এক ধরনের মেটা-ফিজিকাল বিলাস।

'বাস্তবিক, ঔপনিবেশিক শাসনে-শোষণে নিষ্পিষ্ট ভারতবর্ষে, সমাজের এই দ্বিতীয় এলাকার বিবর্ধনে সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধির মতন বিদ্যাসাগরের ভূমিকা-বিচার মার্কসবাদীদের একটা প্রধান কাজ। কাজটি খুবই জরুরি : আমাদের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝার জন্যেই ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রেতর সমাজের স্বরূপ আর ঐতিহাসিক ভূমিকা জানা আবশ্যিক। কারণ, সমাজের এই মফস্বল 'সমস্ত ইতিহাসের উৎসভূমি, রঙ্গভূমি' (মার্কস); 'প্রবীণের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মারফৎ নবীন সামাজিক শ্রেণীর প্রাধান্য, মূল্যবোধ আর বিশ্ববীক্ষা প্রতিষ্ঠারও কুরুক্ষেত্র।'

২

ভারতের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস রচনার উদ্যোগের অভাবের কথা জানিয়েছেন একালের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত। আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ভারতবর্ষের ক্ল্যাপহাম এখনও জন্মান নি বা অন্তত গ্রন্থকার-রূপে দেখা দেন নি' ('অর্থনীতির পথে' গ্রন্থের 'রমেশচন্দ্র দত্ত' নামক প্রবন্ধ)।

কিন্তু উনিশ শতকের ভারতের আর্থিক ইতিহাস তো রচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, তা কেন আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে? এ কি কেবলই আধুনিক পাঠকের ঔদাসীন্য? ভবতোষ দত্ত অবশ্য তা মনে করেন না। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম ও তথ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে রমেশচন্দ্র আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করলেও তাঁর আর্থিক ইতিহাসের বই দুটি যথার্থ ইতিহাস হয়ে ওঠে না। তার কারণ, ভবতোষ দত্তর ভাষায়, 'ইতিহাস-রচয়িতার প্রধান কাজ ঘটনাপরম্পরার বিবর্তনটি ফুটিয়ে তোলা—পাঠকের মনে একটা সুসংগত চলমান চিত্রধারা উপস্থিত করা। এই কাজের প্রথম ধাপ হল ঘটনার এবং তথ্যের আহরণ এবং পরের কাজ হল এগুলির মধ্যে কালানুক্রমিক বা সমকালীন যোগসূত্র আবিষ্কার। শেষ পর্যন্ত ছবিটা কী হয়ে দাঁড়াবে সেটা গবেষক-ঐতিহাসিকদের পক্ষে আগে নিরূপণ করা নয়—এবং তার পক্ষে যতটা সম্ভব কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন।' কিন্তু রমেশচন্দ্রের রচনায় সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই তো ফুটে ওঠে বারবার। নানা সিদ্ধান্তের মধ্যে 'উনিশ শতকের শেষে, কর্ণওয়ালিসের শতাধিক বৎসর পরে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণগান দেখে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই'। আর এই বিশেষ সিদ্ধান্তে অনবরত জোর দেওয়ার ফলে অনেক ঘটনাই তাঁর লেখায় স্থান পায় না। ডঃ দত্ত বলেছেন, 'সরকার ও জমিদার শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই তাঁর কৌতূহলের শেষ; জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক কর্ণওয়ালিসি বন্দোবস্তের পরে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল নেই।' অন্যদিকে আগাগোড়া ইংরেজ কর্তৃক ভারত-শোষণের চিত্র তুলে ধরার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত অটল হলেও তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে এদেশে যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার ধীর গতি, যা তাঁর রচনাকালের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। অথচ সে সব ঘটনার উল্লেখে ইংরেজের ভারত

শোষণের চিত্র উন্মোচন করার সিদ্ধান্ত তো আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করতে পারত।

ভবতোষ দত্ত ভারতের আর্থিক ইতিহাস রচনার ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও ১৯০২-১৯০৪-এর ভারতবর্ষে কোনো ভারতীয় লেখকের দ্বারা এ জাতীয় এই লেখা যে সম্ভব হয়েছিল তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় বিস্ময় তাঁর কাছে এই যে, যে-পথ রমেশচন্দ্র নির্মাণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন এই শতকের শুরুতেই, তা এখনও প্রশস্ত পথ পেল না। ডঃ দত্ত এই সূত্রেই আহ্বান জানিয়েছেন অর্থনীতির গবেষকদের-ঐতিহাসিকদের। পরামর্শ দিয়েছেন যে আর্থিক ইতিহাস রচনা করতে হবে কালানুসারে, বিষয়ানুসারে নয়। কেননা বিচ্ছিন্ন ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎপত্তি বা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিবর্তন বা সুয়েজ খাল খননের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয় গবেষকেরা প্রচুর আলোচনা করেছেন ও করছেন, কিন্তু যা হয় নি তা পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস-রচনার উদ্যোগ। অতএব ছোট ছোট কালপর্বে বিভক্ত করে এ-কাজ শুরু করা সমূহ কর্তব্য। যদি উপযুক্ত সংখ্যক বহুমুখী চেতনাসম্পন্ন গবেষক-ঐতিহাসিক না পাওয়া যায় তবে এ-কাজ করা উচিত অনেকে একত্রিত হয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও নিশ্চেষ্ট বসে থাকা উচিত নয়।

ভারতের আর্থিক ইতিহাস রচনার এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মোদ্যমের সূচনা হয়েছে কি না কিংবা আধুনিক ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ-কাজ গ্রহণে কিছুমাত্র আগ্রহী কি না—হলে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি, পদ্ধতি কি তার খবরাখবর দিতে পারবেন ইতিহাস-অর্থনীতির উৎসাহী গবেষকেরা। তবে গত এক দশকে বাংলা ভাষায় অর্থনীতি-চর্চার এই সমীক্ষায় আমরা তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক ইতিহাস রচনার কোনো ব্যাপক প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে না পারলেও কিছু কিছু সীমিত উদ্যোগ-আয়োজনের সূত্র সন্ধান করতে পারব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও।

বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা পত্র-পত্রিকায় এবং মুষ্টিমেয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধে অর্থনীতি-চর্চায় নিমগ্ন আধুনিক গবেষক-বুদ্ধিজীবীদের রচনার যে ঝোঁক তার চরিত্র অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। গবেষকের মেজাজ নিয়ে সাময়িকপত্রের লেখকেরা আর্থিক জগতের নানা বিষয় বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন তা বলা যায় না, তা আশা করাও অন্যায়। সাময়িক সমস্যার

চাপ, বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা রাজনীতিক আন্দোলনের সমূহ স্বার্থবোধ এসব বিশ্লেষণের, চিন্তার অব্যবহিত সূত্র। সব যুগেই সাময়িক পত্রের রচনাগুলির মৌল আদর্শ তাই হয়ে থাকে। এবং এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিশ্লেষণ ভঙ্গি-দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিস্ফুট হয় সে-সময়কার সমাজের আর্থিক-বিন্যাসের চেহারাটা কেমন, সমস্যাগুলির চরিত্র কিরকম এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবী মানুষের দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ ইত্যাদি। বেকার সমস্যা, দারিদ্রের সমস্যা, অর্থনীতির পরিকল্পনাগুলির ব্যাপক বিপর্যয়, মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সংকট, বৈদেশিক বাণিজ্য আর বিদেশী মুদ্রার নানা সমস্যা গত দশকের আর্থিক-ভাবনায় ঘুরে ফিরে বারবার অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞের কাছে প্রধান প্রধান চিন্তার সূত্র হয়ে উঠেছে। এরই সঙ্গে চোখে পড়েছে কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক, ভারতীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অর্থনীতির শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটন কিংবা পশ্চাৎপদ দেশের আর্থিক-উন্নয়নের সমস্যা প্রসঙ্গে নানা ধরনের চিন্তা। আর সাময়িক সমস্যার প্রেক্ষিতে এ জাতীয় চিন্তা ভাবনা ছাড়া আমাদের লক্ষে আসে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে সমাজের আর্থিক ভিত্তির বিশ্লেষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভব ও বন্দোবস্তজাত শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের ইতিহাস বা প্রাচীন ভারত ও মোগল-ভারতের কৃষি-অর্থনীতির শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু আর্থিক ইতিহাসের গবেষণা। শেষোক্ত এই বিষয়গুলি, যাকে স্থূল অর্থে আর্থিক ইতিহাস বিশ্লেষণ বলা যায়, তার দু-একটি প্রসঙ্গের পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে।

তারাপদ লাহিড়ীর 'মার্ক্সীয় অর্থনীতি' (লোকায়ত সাহিত্য চক্র, ১৯৭৩) এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। গবেষণা প্রসূত ও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ লেখা হয় নি, সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন সাধনই এর লক্ষ্য। অর্থনীতির মূল সূত্রগুলিসহ পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন এ-গ্রন্থে। এবং তার সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও মোটামুটি আঁচ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব, পুষ্টি ও পরিণতি প্রসঙ্গে। একেবারে বৈদিকযুগের ভূমি-ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ, ইংরেজ যুগ ও বর্তমান ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প্রকৃতি লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই বিশ্লেষণ, মূল বিষয়গুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন লেখক, একমাত্র

প্রাচীন ভারতের ও হিন্দুযুগের কৃষি-প্রকৃতির আলোচনা তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত পরিসর পেয়েছে। ভূমির মালিকানা ছিল রাজার—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তারাপদ লাহিড়ী হিন্দুযুগের সামন্ত-তান্ত্রিক কাঠামোটির বিশ্লেষণ করে তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন এই ভাবে, প্রথমত, ভূমির রাজকীয় মালিকানা হিন্দুযুগে স্বীকৃত হয় নি। দ্বিতীয়ত, গোড়ার দিকে সমস্ত কর্ষণাধীন ভূমির মালিকানা কৃষকের উপর ন্যস্ত থাকলেও পরবর্তীকালে প্রচুর সংখ্যক অকৃষক মালিকের হাতে প্রচুর পরিমাণ ভূমি চলে যায় এবং কৃষির ক্ষেত্রে মালিক-কৃষক একেবারে লোপ না পেলেও অকৃষক মালিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালক্রমে মালিক কৃষকেরা আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে অবর অংশীদার-এর পর্যায়ভুক্ত হয়। তৃতীয়ত, অকৃষক মালিকদের হাতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকল জাতির লোকই অকৃষক মালিকের ঘাটে ভিড় জমাতে থাকেন। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমি সমূহও আবার এঁরা খণ্ডবিভক্ত করে অধস্তন স্বত্ব সৃষ্টি করতেন এবং প্রজাদের মধ্যে বিলি করতেন এবং করের মাধ্যমেই মুনাফা লুণ্ঠন করতেন। কোনো মধ্যস্বত্বভোগী নিজ চাষে প্রচুর পরিমাণ ভূমি সাধারণত রাখতেন না। চতুর্থত, নানা ধাপে মধ্যস্বত্ব-ভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়—এরা প্রারম্ভ করাদারের মাধ্যমেই মুনাফা লুণ্ঠন করত। তার ফলে নিম্নতম পর্যায়ের ভূমি-মালিকের উপর করের বোঝা ক্রমাগত বর্ধিত হতে থাকে। subinfeudation হিন্দু সামন্ত অর্থনীতির এক বিশিষ্ট চরিত্র এবং শোষণরীতির একটি প্রধান স্তম্ভ। পঞ্চমত, ভূমির উপর শ্রমনিয়োগকারী কর্ষকেরা অকৃষক মালিকদের চাপে স্বত্বচ্যুত হয়ে বেশির ভাগ মজুরচাষি ও ভাগচাষিতে পরিণত হয়, কেউ কেউ বৃত্ত্যন্তর গ্রহণে বাধ্য হয়। তবে মালিক চাষি একেবারে লুপ্ত হয় নি। ষষ্ঠত, ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মতন ভূমিদান প্রথা ছিল না। ম্যানর সিস্টেম ছিল না। সপ্তমত, ভূমির ব্যক্তিগত মালিকদের চেয়ে উপস্বত্বলুণ্ঠক মধ্যস্বত্বভোগীরা অধিকতর ধনবান ও প্রভাবশালী ছিল।

তারাপদ লাহিড়ী বলেছেন, মোগলযুগেও এই ব্যবস্থাই ছিল মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। কেবল 'ঘোড়ার চরনদার বদলে' যায়। পুরনো শোষকদলের জায়গায় প্রতিপত্তি বেড়ে উঠেছিল মুসলমান অভিজাতদের এবং মূল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পর্কগত প্রকৃতি না পাল্টালেও রাজনৈতিক কারণে শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, মূলত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য। এছাড়া

জায়গিরদার, ইজারাদার-জমিন্দার প্রথার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-কৃষকের ওপরে কোন কোন সময়ে বৈষম্যমূলক কর প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল।

মোগল যুগের কৃষি-ব্যবস্থা বিষয়ে গৌতম ভদ্রের গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ ('অন্য অর্থ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়, ১৯৭৪-১৯৭৭-এ প্রকাশিত) এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, মোগলযুগের কৃষি অর্থনীতিতে তিনটি প্রধান শ্রেণী—মনসবদার বা জায়গিরদার, জমিদার, কৃষক,। মনসবদাররা ছিল মূলত সামরিক আমলাশ্রেণী। রাষ্ট্রের বিপুল সামাজিক উদ্বৃত্ত 'জায়গির' বা একটি এলাকার রাজস্বের মাধ্যমে পদমর্যাদানুযায়ী এদের মধ্যে বণ্টন করা হত। এঁরা বাদশাহের দাক্ষিণ্যের ওপর আইনত নির্ভরশীল এবং এঁদের জায়গির প্রায়ই বদল করা হত। এছাড়া ছিল জমিদার। এদের রায়তি গ্রামগুলির জমির উপর স্বত্ব অধিকাংশ সময়েই রাষ্ট্র ব্যতিরেকে গড়ে উঠেছে আর রাষ্ট্রকে সেই অধিকার স্বীকার করতে হয়েছে। রাজস্বের একাংশ বা নানকার (নিষ্কর জমি) মাধ্যমে রাষ্ট্র জমিদারদের এই অধিকার স্বীকার করেছিল। জমিদারদের অধিকার অর্থে কৃষকদের জমির উপর মালিকানা স্বত্ব নয়, যদিও সে স্বত্ব কেনাবেচা করার বা উত্তরাধিকারীর মধ্যে বণ্টনের কোনো বাধা ছিল না। অন্যদিকে কৃষকেরও জমির উপরে পুরোপুরি মালিকানা স্বত্ব ছিল না কিন্তু ভোগদখলি স্বত্ব ছিল (অষ্টাদশ শতকে যা কিছু কিছু অঞ্চলে মালিকানা স্বত্বে রূপান্তরিত হচ্ছিল)। এই অর্থে জমির উপর সরাসরি স্বত্ব কারুরই ছিল না, নানা ধরনের অধিকারে একের সাথে অন্যে জড়িয়ে ছিল। এমন কি এযুগে সম্রাটও সরাসরি জমির মালিক ছিলেন না, তিনি রাজস্ব ভোগ করতেন, খাজনা পেতেন না।

কৃষি-অর্থনীতির প্রসঙ্গে এ-যুগের আর যে-গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা গৌতম ভদ্র বলেছেন তা হল হস্তশিল্পের সাথে কৃষির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গ্রামীণ কারিগরেরা কোনো না কোনো ভাবে কৃষির সাথে জড়িত। তারা একাধারে কৃষক ও শিল্পী। ফলে অর্থনীতিতে সামাজিক শ্রমবিভাজন হয় নি, সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে মোগল অর্থনীতিতে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রসার, গ্রাম-শহরে বাণিজ্য বৃদ্ধি, অঞ্চলভিত্তিক শিল্পের বিশেষীকরণ—আত্মনির্ভরশীল স্বনিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ অর্থনীতির মূলে আঘাত হেনেছিল, তবে তা কৃষির অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোয় তেমন কোনো পরিবর্তনের সূচনা করে নি। এসব প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনার পর গৌতম

সিদ্ধান্ত করেছেন যে এশীয়-সমাজব্যবস্থার মূল আর্থনীতিক চরিত্রের সঙ্গে মোগল সামন্ততন্ত্রের স্বরূপের মৌলিক কোনো বিরোধ ছিল না।

প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগের ভারতীয় সমাজের আর্থিক ভিত্তি বিশ্লেষণে 'ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলিও একটি নতুন গবেষণা ধারার প্রবর্তন করেছে। গবেষণাপ্রসূত এই গ্রন্থগুলি মূলত ইংরেজিতেই রচিত তবে তা ব্যাপক প্রচারার্থে প্রাদেশিক ভাষাতেও অনূদিত হচ্ছে। রামশরণ শর্মার 'ভারতের সামন্ততন্ত্র', এন. এ. সিদ্দিকীর 'মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা', কে এম. আশারাফ-এর 'হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা' কিংবা সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থব্যবস্থায় ভিত্তি'—এই জাতীয় অনুবাদ-গ্রন্থের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। 'ভারতের সামন্ততন্ত্র' গ্রন্থটিতে রামশরণ শর্মা চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে বেছে নিয়েছেন ১৮৫৮—১৮৭২-এর কালপর্বটিকে। সিপাহী বিদ্রোহের পরিসমাপ্তির পর ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন অবসানের পর থেকে ১৮৭৩ এর 'গ্রেট ডিপ্রেশনে'র পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির বা আর্থিক ব্যবস্থাগুলির অনুশীলন করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। এই ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা কালপর্ব ভাগ করে সমাজের আর্থিক বিন্যাসের গভীর ও বিস্তৃত পর্যালোচনার এই গবেষণাধর্মী কাজগুলিই যে ক্রমে আমাদের আর্থিক ইতিহাস রচনার ভিত্তি তৈরি করে দিচ্ছে তা বলা যেতে পারে।

মুনাফালোভী ব্রিটিশ বণিকদের স্বার্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে এক কালান্তরের সূচনা করেছিল। বদরুদ্দিন উমর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' (চিরায়ত, ১৯৭৮) নামক গ্রন্থে এই পর্বের এক সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেন। তাঁর বক্তব্য, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানিলাভের পর মুনাফালোভী কোম্পানির বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় ও ব্যাপক লুঠতরাজের ফলে বাঙলাদেশের আর্থিক বনিয়াদের ওপর এক তীব্র আঘাত আসে যার ফসল কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ওদিকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায়ের এক সুষ্ঠু ভিত্তি রচনার জন্য কোম্পানি পুরনো দেশীয় ভূমি-ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে একশালা, পাঁচশালা, দশশালা জাতীয় নতুন নতুন বন্দোবস্তের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে

১৭৭৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির রাজস্ব-আদায়কারী পুরনো জমিদার-এজেন্টরা হয়ে গেল জমির চিরস্থায়ী মালিক আর অন্যদিকে ভোগদখলিস্বত্ব হারিয়ে কৃষকেরা জমিদারের অর্ধদাসে পরিণত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ঠিক হল যে জমিদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় করবে তার নয়-দশমাংশ কোম্পানিকে দেবে—তবে তা নির্দিষ্ট অঙ্কে বছরের কোনো-এক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। নতুন একদল জমিদার সৃষ্টি ও কোম্পানির ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও এই বন্দোবস্তে গভীর এক রাজনীতিক উদ্দেশ্যও সাধিত হল। গণ-বিক্ষোভের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল এক ধনী জমিদার গোষ্ঠী সৃষ্টি হল। এদিকে নব্য জমিদারবর্গের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল মধ্যস্বত্বভোগী ও উপস্বত্বভোগী আরও অনেক ছোটখাটো শোষকবর্গ। ক্রমে জমিদার আর মধ্যস্বত্বভোগী এইসব সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচারে নির্যাতিত কৃষকদের মধ্যে গড়ে উঠল বিদ্রোহমূলক মনোভাব। ১৮১২ থেকে ১৮৭৩-এর মধ্যে ময়মনসিংহের কৃষক-বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহের মত আরও অনেক বিদ্রোহ-বিক্ষোভ সংগঠিত হতে দেখা গেল। উমরসাহেব বলেছেন, 'এইসব কৃষকবিদ্রোহগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত যোগসূত্র ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত শোষণব্যবস্থাই এই যোগসূত্রের মূল স্রষ্টা'।

বিশ শতকের প্রথম তিনটি দশকে কৃষকদের অবস্থায় দ্রুত অবনতি ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যমও দেখা গেল। কিন্তু জমিদার-চাষির শ্রেণীবিরোধ, উমরসাহেবের মতে, 'বাহ্যতঃ একটা সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করল' কেননা জমিদার-মহাজনদের মধ্যে বৃহত্তম অংশই ছিল তখন হিন্দু আর কৃষকদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। বিশেষত ১৯২৯-এ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্বে কৃষক সংগঠন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' অসাম্প্রদায়িক সংস্থা হিসেবে বিঘোষিত হলেও এর চরিত্রে সাম্প্রদায়িকতার কালিমা ছিল এবং বদরুদ্দিন উমরের মতে, যে-সমস্ত নেতাদের দ্বারা এই প্রজাসমিতির আন্দোলন পরিচালিত হত তাদের সঙ্গে কৃষক-প্রজা স্বার্থের কোনো যোগও তেমন ছিল না। এরপর ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস 'নিখিল ভারত কৃষকসভা' গড়ে তোলে. কিন্তু বাংলাদেশে কংগ্রেসের মধ্যে জমিদার

শ্রেণীর আধিপত্য থাকায় কৃষকসভায় ক্রমশ বামপন্থীদের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং ১৯৪০-এ তা বাস্তবত কমিউনিস্ট পার্টির একটি শাখা হিসেবেই সংগঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, লেখকের মতে, তেমন কোনো ব্যাপক কৃষক আন্দোলন দেখা গেল না যদিও জমিদারি প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য খুব সোচ্চার ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর কৃষকদের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে গেল, জমিদারির বিরুদ্ধে আন্দোলনও জোরদার হল। সরকারি মহলও এ সময় সংস্কারমূলক চিন্তা-ভাবনা শুরু করে, কিছু কিছু আইনও পাশ হয়ে যায়। কিন্তু মূল সমস্যার সুরাহা কিছু হল না।

তিরিশ দশকের শেষ দিকেই উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর-রংপুরে কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল বিচ্ছিন্নভাবে, পুলিশি নির্যাতনে তা ভেঙে পড়ে অচিরেই। ১৯৪৬-৪৭-এ তা অনেক বড় আকারে গড়ে উঠল 'তেভাগা আন্দোলন' নাম নিয়ে। উমর সাহেব লিখেছেন, 'তেভাগা আন্দোলন মূলত ভাগচাষীদের তিনভাগ ফসলের দুইভাগ দাবীর আন্দোলন হলেও এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই তাদের দাবী সীমাবদ্ধ ছিল না। ভাগচাষীদের ওপর জোতদার মহাজনদের শোষণের অন্যান্য দিকগুলিও এই আন্দোলনের আওতাভুক্ত ছিল এবং সেই সমস্ত শোষণের অবসানের জন্যেও ভাগচাষীরা একই সাথে দাবী তোলেন'। আন্দোলনে বামপন্থী নেতারা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি, নেতৃত্ব জোগালেন। জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা শ্লোগান তুললেন, 'নিজ খামারে ধান তোল, আধি নাই তেভাগা চাই, রসিদ বিনা ভাগ নাই, পাঁচ সেরের বেশি সুদ নাই, বাজে কোনো আদায় নাই, দখল রেখে চাষ করো, পতিত জমিতে ফসল করো'।

কম-বেশি তীব্রতায় তেভাগার লড়াই হয়েছিল বাঙলাদেশের উনিশটি জেলায়। এবং এক সঙ্গেই এই আন্দোলন সর্বত্র গড়ে ওঠে নি, ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমে ক্রমে। তাঁদের দাবি-দাওয়ার মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য ছিল এবং তা অঞ্চল বিশেষে। কিন্তু এসব গৌণ, উমর বলেছেন, '১৯৪৬-৪৭-এর এই ব্যাপক কৃষক আন্দোলন সারা বাঙলাদেশে কৃষকদের মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল'। শাসক ও জমিদার-গোষ্ঠী আন্দোলন দমনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের চক্রান্তও করেছিল কিন্তু জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান ভাগচাষি ও অন্যান্য নিপীড়িত কৃষকদের এই যৌথ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত গড়ে তুলেছিল। তেভাগা লড়াই-এর ময়দানে 'নিজেদের শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ, সংগ্রামের সার্বিক চরিত্র ও স্বাধীনতা

অর্জনের' মাধ্যমেই যে কৃষক আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব একথা বুঝতে শিখেছিলেন নির্যাতিত কৃষকেরা। এবং জমিদার-জোতদারের নির্যাতন ও পুলিশ-আমলার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী হামলা যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কৃষকদের সংগ্রাম ততই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হবার সম্ভাবনা খুলে দিচ্ছিল। কৃষ্ণবিনোদ রায়ের 'চাষীর লড়াই'তে বর্ণিত অভিজ্ঞতার বিবরণ উদ্ধৃত করে বদরুদ্দিন উমর লিখলেন, 'ফসল ভাগের লড়াই দ্রুত-গতিতে পরিণত হলো সকল স্তরের নির্যাতিত কৃষকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিরোধী, জমিদারীপ্রথা-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে। তেভাগার লড়াই এভাবেই একত্রিত, উদ্বুদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হলো বাঙলাদেশের কৃষকসমাজের বিরাট এক অংশকে'। এইটুকুই লেখকের মতে তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য।

তেভাগা আন্দোলনের নানা ব্যর্থতারও উল্লেখ করেছেন উমরসাহেব। বলেছেন, তেভাগা লড়াই-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কৃষক সভা যা কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য একটি সংগঠন। পার্টি তখন 'কংগ্রেস-লীগের সাথে আপোষ-মূলক রাজনীতিকেই আঁকড়ে ধরেছিলো। সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ ও চক্রান্তে লিপ্ত কংগ্রেস লীগ নেতৃত্বের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।' সর্বোচ্চ পর্যায়ে পার্টির এই রণনীতির ফলে তেভাগা আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনের পথে যেতে পারে নি। উমর সাহেবের আরও অভিযোগ, 'অনেক-সময় বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কৃষকরা যেখানে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত সেখানে মধ্যশ্রেণী থেকে আগত নেতা ও কর্মীরা কৃষকদের সংগ্রামের পথ থেকে সুকৌশলে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছেন'। এবং এসব কারণে উমরসাহেবের সিদ্ধান্ত, 'তেভাগা আন্দোলন অর্থনীতিবাদী আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও জমিদার-জোতদার ও সরকারী প্রতিরোধের মুখে তা ক্রমশই অধিকতর জঙ্গী আকার ধারণ করছিলো, ক্রমশই তা পরিগ্রহ করছিলো একটা রাজনৈতিক চরিত্র' কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কারবাদী রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তা জঙ্গী অর্থনীতিবাদী সংস্কারবাদী আন্দোলন হিসেবেই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কোন প্রকারে টিঁকে থাকে।

তেভাগা সংগ্রামের মূল চরিত্র, তার সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বহু কৃষকনেতা তাঁদের বক্তব্য তুলে

ধরেছেন 'তেভাগাসংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে' (কালান্তর কার্যালয়, ১৯৭৩) প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে। মুখবন্ধে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সেই লড়াই ছিল একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তারই সমর্থক সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী প্রচণ্ড অভিযান'। ভবানী সেন (১৯৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার অনুবাদ) এই আন্দোলন কী অর্জন করতে পেরেছে তা বিশ্লেষণ করে লিখলেন, 'যদিও হিংস্র পুলিসী অভিযানে আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, বিদেশী শাসনের ফসল ও দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা সাবেক ভূমি ব্যবস্থা যে অবলুপ্ত হবেই সেই ভবিষ্যত কৃষক সমাজের বীরত্বপূর্ণ শহীদানের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্রায় চল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রে, কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ নিজেদের আওতায় রাখতে পেরেছিল। এমন কি যে ষাট শতাংশ ক্ষেত্রে জোর করে অর্ধেক ভাগ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেখানেও তেজারতি সুদ ও বেআইনী অন্যায় দাবি আদায় স্থগিত রাখা হয়েছিল। …তেভাগা আন্দোলন নতুন নতুন সামাজিক শক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং গ্রামীণ মানবতার এক নবজাগরণের সূচনা করেছে। …তেভাগা আন্দোলনের আর একটি অসাধারণ কৃতিত্ব হল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য'।

নেতৃত্বের ব্যর্থতাগুলিও ভবানী সেন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ১. কৃষকদের পক্ষে গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির সমর্থন আদায় করা ছিল খুব জরুরি। কিন্তু মধ্যবিত্তরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল কারণ এরা অনেকেই গরিব ও ক্ষুদ্র জোতদার, যারা এই ব্যবস্থাটা খারাপ স্বীকার করলেও মনে করেছিল যে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদে তাদের কর্মসংস্থানের নতুন পথ উন্মুক্ত করা না হলে তারা শেষ হয়ে যাবে। নেতারা কৃষকদের দাবির ন্যায্যতা তাদের বোঝাতে পারলেও এই ক্ষুদ্র জোতদারদের জন্য চমৎকার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে নি। ফলে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আন্দোলনটাকে ভুলভাবে নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে দেখেছিল। 'নির্দয় পুলিশী নিপীড়ন সম্ভব করে তোলার পেছনে বৃহত্তম একক কারণ ছিল আন্দোলন থেকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা'। ২. নির্দয় নিপীড়নের প্রতিবাদে কৃষক সংগ্রামে মদত যোগানোর ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীকে সমবেত করতে পারা যায় নি। এতে কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করে শাসক শ্রেণীর পীড়ন করার সুবিধে হয়। ৩. মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার খসড়া বর্গাদার

বিল প্রকাশ হলে নেতারা আত্মসন্তুষ্ট ও অসতর্ক হয়ে পড়েন, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। উচিত ছিল বিল পাশ করানোর দাবিতে গণ-অভিযান সংগঠিত করা কিন্তু তা হয় নি।

কৃষ্ণবিনোদ রায় বলেছেন, 'কৃষকসভার সংগঠন আরও প্রসারিত ও ব্যাপ্ত হতে পারে নি, কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বৃহৎ পার্টির শক্তি অর্জন করতে পারে নি এটাই তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। এই দুর্বলতাই পরিস্ফুট হয়েছে দুদিক থেকে (ক) শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব এই আন্দোলন দিতে পারে নি, (খ) নিম্নমধ্যবিত্তরা গণ-রাজনৈতিক, প্রগতিশীল ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে খুব সক্রিয় হলেও তেভাগা সংগ্রামে তার বিরুদ্ধে বা বড় জোর দ্বিধাগ্রস্তদের দলে ছিলেন'।

ডঃ সুনীল সেন তাঁর 'বাংলার কৃষক সংগ্রাম' (চলতি দুনিয়া, ১৯৭৫) গ্রন্থে তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের বীরত্ব ও তাঁদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্বপ্ন-হতাশার কাহিনী বিবৃত করেছেন—আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ছবি তুলে ধরেছেন। আর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলেছেন, 'আশু অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে তেভাগা আন্দোলনের শুরু, আন্দোলন যখন অর্থনীতিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চায়, গরিব চাষীর চেতনার ও রাজনৈতিক সংকটের চাপে, তখন নেতারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। আন্দোলনের এই ট্র্যাজেডি লেখায় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি। আন্দোলন সত্যিই অর্থনীতিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল কি না সে বিষয়ে আমার ধারণা স্পষ্ট নয়'।

বিভূতি গুহ তাঁর 'তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি' (শারদীয় কালান্তর, ১৩৭৯) শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, তেভাগা আন্দোলনের কর্মীরা 'নিছক অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে সংগ্রামে নামেন নি, তাঁদের চোখে ছিল আগামী দিনের স্বপ্ন। তাঁরা জানতেন তেভাগার আন্দোলন সফল হলে সমস্ত জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রামের পথ সুগম হবে। দেশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলমুক্ত হবে, স্বাধীন হবে'। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা ও মাঝে মাঝে বিরূপতা যে এ-আন্দোলনের সাফল্য পুরোমাত্রায় এনে দিতে পারে নি সেকথাও তিনি বলেছেন।

আর্থিক ইতিহাস ও আর্থনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসের এই আলোচনার ছেদ টানবার পূর্বে আরেকটি স্বল্পায়তন গ্রন্থের উল্লেখ করব। ডঃ অতুল সুরের 'ভারতে মূলধনের বাজার' (বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা, ১৯৭৭)। যে মূলধন দ্বারা শিল্পপতিরা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কিংবা বিবিধ স্বায়ত্ত-

শাসনাধীন সংস্থাসমূহ দেশের নানা আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হয়, সেই মূলধন কিভাবে সংগৃহীত হয়, কোন কোন সংস্থা তার সঙ্গে জড়িত, কী বিশেষ পদ্ধতি ও আর্থনীতিক চাহিদা যোগানের নীতি এই সূত্রে ক্রিয়াশীল—তারই এক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থ। বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক মূলধনবাজারের স্বরূপ, শেয়ারবাজারের গুরুত্ব ও তার কাজকর্মের ধরন, শেয়ার কেনা-বেচার পদ্ধতি, মূলধনবাজারের নানা সংস্থার চেহারা ইত্যাদি জটিল আর্থিক জগতের জট খুলে খুলে দেখিয়েছেন। ভারতে চতুর্থ যোজনাকাল পর্যন্ত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ কেমন ছিল এবং কী হারে এই-জাতীয় মূলধনের চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে তার বিবরণও পাওয়া যাবে এই গ্রন্থটিতে। অর্থনীতির টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে লেখা এরকম সাধারণ-পাঠ্য বিশ্লেষণ নিতান্তই দুর্লভ বলে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখ করা গেল এ-বইয়ের।

৩

ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল মানুষের স্বাধীনতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা কিংবা ইতিহাসের মূল লক্ষ্য সত্যের নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণ, যে-কথা বলেছেন এইচ. এ এল ফিশার, অথবা ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেল যখন বলেন, আমি অনুমোদনও করি না, দোষারোপও করি না, বিবৃত করি—তখন ঝগড়াটা মূলত ইতিহাস চর্চাতে দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনগত সমস্যার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। হয়তো তারই মধ্যে আড়ালে আড়ালে কাজ করে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত রাজনীতিবোধ, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত স্বার্থ বুদ্ধি কিংবা এরকম আরও নানান খুচরো ব্যক্তিগত ঝোঁক, তবু এ-ঝগড়ায় দার্শনিকতার প্রশ্নটিই অধিক গুরুত্ব পায়। কিন্তু এসব কথা উহ্য রেখে ইতিহাস চর্চায় অনেক ছোট মাপের বাস্তব কিছু সমস্যার কথা বলেছেন আরব ঐতিহাসিক ইবন খলদুন। ঐতিহাসিকদের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতার এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন ইতিহাসের ঘটনাবলির অপব্যাখ্যার উৎসগুলি কোথায়। ইবন খলদুন বলেছেন, ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রসাদলাভের অভিলাষ এবং তা চরিতার্থ করার জন্য ইতিহাসবেত্তা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের প্রশংসা করেন, খ্যাতি প্রচারে সহায়তা করেন, চাটুকারিতার আশ্রয় নেন এবং তাদের কার্যকলাপের অনুকূল ব্যাখ্যা করেন।

আমাদের দেশের ইতিহাস-চর্চা তো এই সমস্যাতেই ব্যাপকভাবে জর্জরিত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভারতে ইতিহাস-রচনা প্রণালী' (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, ১৯৭৯) নামক স্বল্পায়তন গ্রন্থটিতে ভারতের ইতিহাস-চর্চার এ-ধরনের নানা সমস্যারই উল্লেখ করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস কিংবা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের তোষণমূলক মনোভাব বা প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকারদ্বয়।

আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'ইতিহাসের ধর্ম যথাসম্ভব অবিকৃত এবং অভ্রান্ত সত্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বর্তমান যুগে ভারতীয় ইতিহাস রচয়িতার মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুসলিম নৃপতিকুলের হিন্দুধর্মের প্রতি অনুদার এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিবরণ লুপ্ত করিয়া দিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।...প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইংরাজের বিরুদ্ধে ঐক্যের খাতিরে এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে হিন্দু-মুসলিম সংহতির নামে ইতিহাসে যাহা সত্য, ইচ্ছাকৃত ভাবে তাহার অপলাপ হইতেছে।'

ঠিক এর বিপরীত অভিযোগ এনেছেন এ-যুগের আর-কয়েকজন ইতিহাসবেত্তা, রমেশচন্দ্রদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। ভারত ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির আচ্ছন্নতা ও বিকৃত ইতিহাসবোধ প্রসঙ্গে গত দশকে এক প্রবল আলোড়নও দেখা গেছে। প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যে ভারতীয় ইতিহাস-কারদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন রমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপান চন্দ্র 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা' (ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষৎ, ১৯৭৬) গ্রন্থটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই গ্রন্থটি সহ বরুণ দে ও উক্ত লেখকত্রয়ের ও অমলেশ ত্রিপাঠীর আরও কয়েকটি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ের বিরুদ্ধে কয়েক বছর পূর্বে জনতা সরকার দণ্ডাজ্ঞা জারি করেছিলেন। অভিযোগ ছিল দেশদ্রোহিতার, ইতিহাস বিকৃতির, কমিউনিস্ট অপপ্রচারের। রমেশচন্দ্র মজুমদারও অভিযোগ করে বলেছিলেন, এসব নেহাতই তরুণ ঐতিহাসিকদের তথ্যহীন, বিকৃত, অসতর্ক ইতিহাস চর্চা।

এইসব 'তরুণ ঐতিহাসিক'দের বক্তব্য যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতের ইতিহাস রচনায় 'হিন্দুযুগ', 'মুসলমানযুগ' কিংবা 'ব্রিটিশযুগ'

জাতীয় পর্ববিভাগ, যা করেছিলেন জেমস মিল কিছুমাত্র মুক্তবুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে, তা মেনে নিলেন নির্বিবাদে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা। তুর্কি-আফগান-মোগল রাজবংশের একত্রিত রূপ মুসলমান-আমলে শাসক মানেই মুসলমান আর শাসিতেরা হিন্দু—এই ছক তৈরি হয়ে গেল আমাদের ইতিহাসচিন্তায় আর তারই ফলে হিন্দু সামন্তরাজা রাণা প্রতাপ কিংবা শিবাজী হয়ে উঠলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শ বীর। শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব যে মূলত শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব সে ব্যাখ্যার ধারে কাছে না গিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অত্যুগ্র সাধনায় মেতে উঠলেন আধুনিক ঐতিহাসিকেরাও।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির বিষ শেষ পর্যন্ত যে দ্বিজাতি তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে দেশটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয় এবং নানা ধরনের সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যার সূত্রপাত করে তা আমাদের কাছে আজ এক মর্মান্তিক বাস্তব সত্য। এই দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রসার কী ভাবে হল তার এক সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন অমলেন্দু দে 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী বিচ্ছিন্নতাবাদ' গ্রন্থে।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতিক সিদ্ধান্ত কিন্তু হঠাৎ-ঘটনা ছিল না। উনিশ শতকের সমাজ বিকাশের ধারায় এর কারণ নিহিত ছিল। অমলেন্দু দে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে গত শতকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক, সমাজ বিকাশের ধারায় মুসলমান সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়েছিল হিন্দু-ব্রাহ্মদের তুলনায়। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে হিন্দু মধ্যশ্রেণীর অগ্রগতি সমাজ নেতাদের মধ্যে এক ধরনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বেড়াজাল সৃষ্টি করে সাধারণ স্তরের মানুষের সঙ্গে এক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে দিয়েছিল। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি গড়ে তোলার অদম্য উৎসাহ তো ছিলই। আলোচ্য লেখকের 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' (রত্না প্রকাশন, ১৯৭২) এই বিষয়ের বিশ্লেষণে আরেকটি তথ্যমূলক গ্রন্থ। মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের এবং তার প্রতিক্রিয়ায় স্বাধীনতা-পূর্ব বিশ শতকের রাজনীতিতে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অস্থির ক্রিয়াকলাপের চিত্র ফুটে উঠেছে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী' (রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৭৯) নামক বিনয়ভূষণ ঘোষের গ্রন্থটিতেও।

শুধুমাত্র রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তেই নয় দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতার

ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক জনজীবনেও। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান নিয়ে কোলাহল এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৩৭ এ ভারতের জাতীয় সংগীত সম্পর্কে 'বন্দেমাতরম' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটা **unfortunate controversy**-র বিষয় হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুদের ধর্মীয় শ্লোগান হিসেবেও পরিগণিত হল 'বন্দেমাতরম'। জগদীশ ভট্টাচার্য এই সংগীতের ইতিহাস, অর্থ, তাৎপর্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এর গুরুত্ব এবং সাম্প্রদায়িক কোলাহলের আবর্তে জড়িয়ে পড়া এই গানের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এসব কাহিনী তাঁর 'বন্দেমাতরম' (কবি ও কবিতা প্রকাশন, ১৯৭৮) গ্রন্থে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-নিপীড়ন ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 'লক্ষহীন, নেতৃত্বহীন, বৈপ্লবিক আদর্শহীন' হলেও কৃষক-বিদ্রোহগুলির তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রামী ধারার বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ, 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'; রচনা করেছিলেন সুপ্রকাশ রায়। লেখক বলেছেন, আঠার-উনিশ শতকে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ও প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য কৃষকদের সংগ্রাম নেতৃত্বের অভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল কিন্তু এই সময় কৃষক শ্রেণী ভিন্ন আর-কোনো সংগ্রামী শক্তি সমাজে ছিল না। 'কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অবস্থা ও গণসংগ্রামের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শ্রেণী দেখা দিয়াছে এবং উহারা ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণী একটি শক্তিশালী শ্রেণী-রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। উন্নত বৈপ্লবিক আদর্শ ও ভূমিকা লইয়া শ্রমিক শ্রেণী ভারতের গণসংগ্রামের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ায় এবং উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করায় বিংশ শতাব্দী কার্যত বৈপ্লবিক যুগে পরিণত হইয়াছে।'

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতে শ্রমিক-কৃষকের গণসংগ্রামের এই ধারা* সুপ্রকাশ রায় বিশ্লেষণ

---

* ভারতে শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সুকোমল সেন ইংরেজি ভাষায়। এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ লেখক করেছেন দুখণ্ডে প্রকাশিত 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' (নবজাতক) গ্রন্থে।

করেছেন 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' (ডি. এন. বি. এ, ১৯৭০) নামক গ্রন্থে। ১৯০১ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে গণ-সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। উল্লিখিত এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, এক ধরনের 'মধ্যশ্রেণীর বিপ্লববাদ' বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সুপ্রকাশ রায় এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'মধ্যশ্রেণীর এই বিপ্লববাদীরাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়াছিল।' কিন্তু এঁদের বিপ্লববাদ গুপ্তহত্যা ও আত্মাহুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। সুপ্রকাশ রায় এই সীমাবদ্ধতার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, 'মধ্যশ্রেণীসুলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তির বশে তাহারা শ্রমিক-কৃষককে বৈপ্লবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তাহারা তাহাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হিসাবে সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কারণ, যে চরমপন্থা বা সশস্ত্র সংগ্রাম জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া চলে, শ্রমিক-কৃষককে এড়াইয়া যায়, সেই সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না।' লেখক আরও বলেছেন, '...কয়েকজন জমিদার বা জোতদার হত্যা করিয়া যেমন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করা যায় না, ঠিক সেইরূপ কয়েকজন পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করা যায় না ; শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণকে সংগঠিত ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংগ্রামের মধ্যে পরিচালিত করিয়া বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিতে হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন, একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করিতে হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়াই ইহার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদীরা ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে দুঃসাহসিক, বীরত্বপূর্ণ কার্য দ্বারা আত্মাহুতি দানের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মারফত বিপ্লব সাধনের সহজ পন্থা আবিষ্কারের প্রয়াসী হইয়াছিল।'

কিন্তু সে সব সত্ত্বেও এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ গড়ন, এর নানা খুঁটিনাটি যে আমরা আজও জানি না সেকথা ধরিয়ে দিলেন কালীচরণ ঘোষ তাঁর দু-খণ্ডে রচিত 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রাইভেট লিমিটেড) নামক গ্রন্থে। ভূমিকাতেই (দ্বিতীয় খণ্ডের) তিনি লিখেছেন, 'কোন বিশিষ্ট ঘটনার অভিব্যক্তির পূর্ব পর্যন্ত সশস্ত্র-বিপ্লব-সংক্রান্ত সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন অতি গোপনে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যাঁরা এইসব দুঃসাহসিক বিপদসঙ্কুল কাজের উদ্যোক্তা, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছাড়া অন্য

লোকের পক্ষে মন্ত্রগুপ্তি ভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এরকম ক্ষেত্রে নিছক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিষয় নিয়ে বই-লেখায় ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর। পুলিশ দপ্তরে যে-সকল নথিপত্র আছে, তার সাহায্যে একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। প্রধানতঃ ঐসকল তথ্য গুপ্তচরের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সে কারণে সেগুলি কেবল অসম্পূর্ণ নয়, ভ্রমপ্রমাদ নিয়ে গড়া। উপরন্তু, আসলে তথ্যপূর্ণ 'ফাইল' দেখবার সুযোগ এ পর্যন্ত কেউ পেয়েছেন বলে শোনা যায় না।

'এসব কারণে বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবের ওপর ইতিহাস তো নয়ই, 'গল্প হলেও সত্যি' কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। ...অতি অল্প সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিপ্লবের স্মৃতি ছাড়া, বিশেষ নির্ভরযোগ্য 'কাহিনী' কিছুকাল পূর্বেও খুব বেশি ছিল না। সম্প্রতি কয়েকজন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক তাঁদের প্রকাশিত রচনা দিয়ে এ অভাব কিছুটা দূর করতে চেষ্টা করছেন। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় সে-সকল মোটেই পর্যাপ্ত নয়।'

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অরবিন্দ ছিলেন একজন অন্যতম প্রধান নেতা। এদেশে বোধহয় সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন, জনগণই সত্যকার শক্তির উৎস এবং যে পর্যন্ত না জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে সে পর্যন্ত কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা অর্থহীন। অরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল 'অনুশীলন সমিতি'র, 'যুগান্তর পত্রিকা'র। রাজনীতিক প্রচার ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়—এই বোধ থেকেই আয়োজন হয়েছিল 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের, ১৯০৬ সালে। টিঁকে ছিল ১৯০৮ পর্যন্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বহির্ভূত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজলাভের লক্ষ্য ছিল 'যুগান্তর' এর রাজনীতিক লক্ষ্য। জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের উপযোগী ও লক্ষ্যাভিমুখী সংগঠন প্রস্তুতিতেও আহ্বান জানিয়েছিল 'যুগান্তর' এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনাবসানের জন্য কোনো হিংসাশ্রয়ী কাজই 'যুগান্তর'-এর কাছে অননুমোদনীয় ছিল না। বছর দুই-তিনের এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ রচনাগুলি সংকলন করেছিলেন সেই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিনাশ ভট্টাচার্য তাঁর 'মুক্তি কোন্ পথে' নামক সংকলনটিতে। তার থেকে বাছাই করে এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের বাঁধানো পেপার-কাটিংস থেকে দুটি প্রবন্ধ নিয়ে সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের একটি দিক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় 'ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ' (ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২) নামক গ্রন্থে।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান না করলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঔদাসীন্য আমাদের কখনোই চোখে পড়ে না।* কোনো অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করেন নি, স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে। ফলে রবীন্দ্রনাথ সরকারি দৃষ্টিতে বরাবরই একজন 'দাগী' ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকার গোপন ইস্তাহার প্রকাশ করে নাকি বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে সরকারি কর্মীর সন্তানদের পড়াশোনা নিষিদ্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নাইটহুড ত্যাগ কিংবা হিজলীজেলের বন্দীদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের নির্মম নিপীড়নে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু সমস্ত জীবনব্যাপী সমকালীন রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর পীড়ন, নির্যাতন ও বন্দীহত্যার বিরুদ্ধে এবং বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত চিত্তে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, এবং সে প্রতিবাদ আকস্মিক উচ্ছ্বাস বা তাৎক্ষণিক আবেগ প্রসূত যে ছিল না, ব্যক্তি মুক্তির জীবন দর্শনের সঙ্গে যে তা ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেসব কাহিনী ও তথ্য খুব সুপরিচিত নয়। এসব তথ্যের বিশ্লেষণই করেছেন দিলীপ মজুমদার 'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (নবাঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৭৭) নামক গ্রন্থটিতে।

পরিশ্রমে ও যত্নে, তথ্যে ও সংবাদে বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মকাণ্ডের এক আকরগ্রন্থ রচনা করছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (মণ্ডল বুক হাউস) গ্রন্থটির চার খণ্ড এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে শুধু ধর্মান্দোলনের ইতিহাস নয়, ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিরূপ মন, স্বাদেশিকতার মন্ত্র উজ্জীবনে তাঁর কর্মকাণ্ড, বিদেশে ও সমগ্র ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁর ধর্মীয়-রাজনৈতিক পর্যটনের ইতিহাস এই গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে ছড়িয়ে আছে। প্রতি খণ্ডেই রয়েছে বিবেকান্দের সমকালীন মানুষ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য, বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের খবরাখবর, তাঁদের প্রতিক্রিয়ার নানা ঘটনা। এ ছাড়া তো আছে সমকালীন পত্র-পত্রিকায়

* 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামক বিশিষ্ট গ্রন্থের চার খণ্ডে নেপাল মজুমদার বহুপূর্বেই এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গত দশকে এ-গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গের উদ্ধৃতি আর অপ্রকাশিত নানা চিঠিপত্রের হদিশ। বোঝা যায় এ-গ্রন্থ পাঠে উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় রাজনীতিক-সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের স্বরূপ আর এর প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনেক না-জানা তথ্য-সংবাদ। তথ্য-কাহিনী সংবাদ আর ঘটনাবলির নিস্পৃহ উল্লেখ ও গ্রন্থকারের নিজেকে লেখা থেকে দূরে রাখার দুরূহ চেষ্টাও লক্ষনীয় এই বৃহৎ গবেষণ-কর্মে।

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট অংশ ছাত্র-সম্প্রদায়-এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ ১৯০৫-০৮ থেকে শুরু করে ১৯৩০-৩২ সালে, ১৯৪২ সালের অগাস্ট-আন্দোলনে কিংবা ১৯৪৫-৪৬ সালের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ছাত্র সম্প্রদায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন (এঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে), বিশেষত ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দশদিনের জন্য যে স্বাধীন গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়ও এক অভূতপূর্ব সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ' (চারুপ্রকাশ, ১৯৭৯) গ্রন্থটিতেও ছাত্রসমাজের এই সংগ্রামের নানা কাহিনী ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। লেখক উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮২০ থেকে ১৯৪৭-এর এই বৃহৎ কালপর্বের ছাত্র-আন্দোলনের স্বরূপ ও ভূমিকা ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে সূচনা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চিন্তাধারা। সমাজতন্ত্রমুখী ঐতিহাসিক ধারাটি কিভাবে ক্রমশ অগ্রসর ও শক্তিশালী হল এবং স্বাধীনতালাভের পর্যায়ে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যটুকু কি তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিশ্লেষণ করেছেন তুষার চট্টোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর' (মনীষা, ১৯৭৫) গ্রন্থটিতে।

শুধু স্বদেশেই নয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় স্বদেশের মুক্তিচিন্তায় প্রবাসেও ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্দোলনের নানা প্রস্তুতি চলছিল সে সময়। আর সেসব বিপ্লবীদের চিন্তায় কর্মকাণ্ডে ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন বিশ্ববীক্ষার প্রভাব পড়েছিল। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তখন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন চিন্তার

মানুষ। তাতে কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতা লাল-বাল-পাল যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন দেশের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষেরা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নানা বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা কেউ অস্ত্র বা অর্থ সংগ্রহ করার তাগিদে, কেউ বা যুদ্ধবিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে কিংবা ভারতের অবস্থা সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে অবহিত করার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। সেইসব প্রবাসী বিপ্লবীদের উপর রুশবিপ্লবের চিন্তাধারার প্রভাব কেমন ছিল তারই এক তথ্যবহুল, প্রায় এক আকরগ্রন্থ, প্রণয়ন করেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী' (মনীষা, ১৯৭৩) নামে। এই একই বিষয়ে লেখকের আরও বহু প্রবন্ধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাওয়া যায় গত দশকের পত্র-পত্রিকায়, বিশেষত 'পরিচয়' পত্রিকায়।

বাংলা পত্র-পত্রিকায় লেনিনচর্চা শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে। যদিও ব্রিটিশ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ছিল যাতে লেনিন ও রুশবিপ্লব সম্পর্কে কোনো তথ্য বা সত্য সংবাদ এদেশে প্রচারিত না হতে পারে। তথাপি সরকারের কঠোর ব্যবস্থা এড়িয়ে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় বিশেষত বাংলা সাময়িক পত্রগুলিতে লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লবের নানা তথ্য ও লেনিন সম্পর্কে বহু আলোচনা প্রকাশিত হয়। অবিনাশ দাশগুপ্ত সেই সব তথ্যই সংগ্রহ করেছেন 'লেনিন, রুশবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য' (ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৭০) গ্রন্থটিতে। ভারত ও রাশিয়া দুই বিশাল দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই গড়ে উঠেছে এবং সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও সাহিত্যচর্চায় বাঙালির রুশচর্চা যে নেহাতই অর্বাচীন নয় তার এক তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ কেশব চক্রবর্তীর 'ভারত রুশকথা: বাঙালীর রুশচর্চা' (মনীষা, ১৯৭৬) গ্রন্থ। গোপাল হালদারের ভূমিকা-সম্বলিত এই গ্রন্থের আলোচ্য কাল ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব পর্যন্ত।

হিটলার ও ফ্যাসিবাদের ওপর সমগ্র পৃথিবীর মানুষের বিজয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৯৪৫-এর ৯ মে। এর কয়েকমাস আগেই অবশ্য তৃতীয় রাইখ ও হিটলারের পতন হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও ইউরোপে ও এশিয়ায় যুদ্ধ চলেছিল এবং সেই যুদ্ধাবসান অনুসারেই ফ্যাসিবাদের অন্তের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৯৪৫-এ। তিরিশ বছর বাদে ১৯৭৫-এ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির বিজয়োৎসবের ত্রিশতম বার্ষিকী

উদ্‌যাপনে 'পরিচয়' পত্রিকার ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যাকে ভিত্তি করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রতিরোধ প্রতিদিন' (মনীষা) অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংকলন। চল্লিশের দশকের বাংলার ও বিশ্বের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের লেখাপত্র এই প্রথম একসঙ্গে পাওয়া গেল। এবং 'মনীষা' প্রকাশিত গোপাল হালদারের সম্পাদনায় 'বাংলার ফ্যাসিস্টবিরোধী ঐতিহ্য' এই বিষয়ে আর-একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেছিলেন রমঁ্যা রলাঁ। ভারতের সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অতি নিকট। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন তিনি, গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীকার তিনি। সেই রলাঁর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত শ্রদ্ধা-ভালবাসা, ভাবনা-চিন্তা, আনন্দ-উদ্বেগের সাক্ষ্যবহনকারী একটি দিনপঞ্জী (১৯১৫-৪৩) INDE-এর অনুবাদ 'ভারতবর্ষ' (র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৭৬) বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন অবন্তীকুমার সান্যাল। ১৯৫১ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এই দিনপঞ্জি আর দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করে দিলেন অবন্তীবাবু। প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তই প্রথম ১৯৬৬ সালে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বাঙালি বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও লোকনাথ ভট্টাচার্য এ-গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ এই অনুবাদের বেশ কিছুকাল আগে।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিশেষত ইতিহাসবেত্তাদের নানা উৎসাহ-ঔৎসুক্য থাকলেও আমাদের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস খুব সম্মানজনক নয়। দেশের ইতিহাস সম্পর্কে, খণ্ডিত হলেও, যদি-বা কিছু আগ্রহ থাকে গবেষকের, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস চর্চায় আমরা বড়জোর টুকরো প্রবন্ধ লিখি, তার বেশি কিছু নয়। এমন কি রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক ইতিহাসও আমরা রচনা করে উঠতে পারি নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য দশকের দু-একটি ব্যতিক্রম-প্রয়াসের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের তিন খণ্ডে 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮) প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর 'ফরাসী বিপ্লব' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৭৯) এবং দাস-বিপ্লব থেকে শুরু করে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিতে দেশে দেশে যে-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার ইতিহাস ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে নিত্যপ্রিয়

ঘোষের 'বিপ্লবের কথা' (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩) এই সূত্রে কৃতিত্বের দাবি রাখে।

সত্তরদশকের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের দেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, নকশালবাড়ি আন্দোলন। প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন ছিল উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষি-আন্দোলনের চেহারায়। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। কৃষি আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ক্রমে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনে। সমর সেন মন্তব্য করেছেন, এ-আন্দোলন সমস্যার সমাধান যত না করতে পেরেছে, সমস্যা বাড়িয়েছে তার চেয়ে বেশি। তবে যে শক্তি, সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলন খুব দ্রুত বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেয়েছিল, তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পর সে প্রচেষ্টা আর কখনই দেখা যায় নি। এবং এখানেই এ আন্দোলনের সার্থকতা (ভূমিকা, নকশালবাড়ি অ্যাণ্ড আফ্‌টার : এ ফ্রন্টিয়ার অ্যানথোলজি, ১ম খণ্ড)। 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক' মুৎসুদ্দি' শাসকগোষ্ঠীসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এই আন্দোলন, ক্ষণিকের জন্য হলেও। এই আন্দোলনের তীব্রতা গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের বামপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে এক অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অথচ সেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর তার তাৎপর্য অনুসন্ধানে বা তার ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ-আয়োজন এখনও দেখা যাচ্ছে না। পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং কিছু কিছু প্রচার পুস্তিকা ছাড়া গোটা আন্দোলনের পটভূমি ও তার চরিত্র-বিশ্লেষণে রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা এখনো পর্যন্ত খুব কমই আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র জাতীয় দু-চারটি ইংরেজি গ্রন্থ যদি বা লেখা হয়েছে, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ প্রায় নেই বললেই চলে। যে দু-একটি গ্রন্থ সম্প্রতি বেরিয়েছে তার মধ্যে একটি হল তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা' (প্রত্যয়, ১৯৭৮)। নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ এ বই-এর লক্ষ্য নয়। আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সঙ্গে অর্থাৎ আন্দোলনের বিভিন্ন দল-উপদলগুলির বক্তব্যগুলি তুলে ধরেছেন লেখক এই গ্রন্থে। ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন দল-উপদলগুলির বক্তব্যের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের বিরোধের সূত্র কোথায়, বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ধারার আপাত চরিত্র কি রকম।

আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলেন সুব্রত বল। তিনি লিখেছেন 'উপমহাদেশের সমাজ ও প্রধান দ্বন্দ্ব' (সুবর্ণরেখা, ১৯৭৯)। এই গ্রন্থে যে-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার ক্ষেত্র শুধু ভারত নয়, 'দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ'। উপজীব্য বিষয়, এই উপমহাদেশের সমাজে মূল শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বিচার করে রণনীতি স্থির করা। লেখক বলেছেন, যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতিতে বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে দ্বিমত নেই যে এই উপমহাদেশের সমাজ-বিকাশ দুটো মৌলিক দ্বন্দ্ব দ্বারা শাসিত : ১. সাম্রাজ্যবাদ ও 'সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে' জাতির দ্বন্দ্ব (জাতীয় দ্বন্দ্ব) ২. সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব (সামন্ত দ্বন্দ্ব)। তবে কোন্ দ্বন্দ্বটি প্রধান তা নিয়েই বিতর্ক। প্রসঙ্গত জানিয়েছেন, জাতি ও জনগণ ধারণাদুটি সমার্থক নয়, জাতির ধারণাটি ব্যাপকতর, জনগণ তার অংশমাত্র। সুব্রত বল বলেছেন, সংগ্রামী শক্তির উপাদানগত গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নের তাৎপর্য হল, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণী জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্টের অংশীদার হয়েছে কিনা এবং জনগণের ধারণা সম্প্রসারিত হয়ে জাতির সঙ্গে তা সমার্থক হয়ে গেছে কিনা তা দেখা। সুব্রতবাবু মনে করেন, বিগত কয়েক বছরে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সামন্ত দ্বন্দ্বকে প্রধান ধরে কাজ করেছেন এবং তা যথার্থই ছিল। প্রধান দ্বন্দ্ব কি—এই বিষয়ে অধুনা যে বিতর্ক চলেছে তাতে তাঁর এই বক্তব্য বিশ্লেষণই করেছেন বিস্তৃত-ব্যাপক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের একটা পর্যায়ে উনিশ শতকের মনীষীদের মর্মরমূর্তির মুণ্ডচ্ছেদের এক অভিনব আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 'মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে অমল ঘোষ এই অভিযানকে নৈরাষ্ট্রবাদী অমার্কসীয় বিকৃত কার্যকলাপ বলে উল্লেখ করেছেন। এই আন্দোলনের যে তাত্ত্বিক-রাজনীতিক মতাদর্শের ভিত্তি তা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, অমল ঘোষ তার বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের বক্তব্য রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে ইতস্তত উল্লেখ আগেই আমরা করেছি।

বিপ্লবোত্তর চীনের সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতির রূপান্তরের ছবি, চীনের সামাজিক জীবন, সমাজবিন্যাস ও রাজনীতিক-আর্থনীতিক-সামাজিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও উৎসাহও এ-দশকের এক বিশিষ্ট ঝোঁক। বিদেশী সাংবাদিক-লেখকদের অভিজ্ঞতার নানা লেখার

সঙ্গে এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত কিছু গ্রন্থের প্রকাশও হয়েছে এসময়। যেমন, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'আবার চীন দেখে এলাম' (শ্রীভূমি পাবলিশিং, ১৯৭৫), দেবব্রত বিশ্বাসের 'অন্তরঙ্গ চীন' (কথাশিল্প, ১৯৭৮) ও মৈত্রেয়ী দেবীর 'অচেনা চীন' (আনন্দ পাবলিশার্স)। এর মধ্যে দেবব্রত বিশ্বাসের গ্রন্থটির বিষয়বস্তু অনেকের কাছেই হয়তো পরিচিত ঠেকবে, কেন-না ১৯৫০ সালে শান্তি কমিটির উদ্যোগে চীন ঘুরে আসার পর 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতেই এ-বইয়ের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক চীনের রাজনীতিক-সামাজিক ইতিহাসের আরেকখানি গ্রন্থ অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর 'লালচীন' (নবভারতী, ১৯৭০)। এই গ্রন্থে বিধৃত চীনবিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাসও বাঙালি পাঠকের কাছে নতুন স্বাদ বয়ে নিয়ে আসে।

৪.

এদেশে বাংলা হরফ নির্মাণ শুরু হয়েছিল দুশ বছর আগে, ইংরেজ মিশনারিদের দৌলতে। আর সেইসব ইতিহাস আলোচনা করেছেন ডঃ অতুল সুর তাঁর 'বাংলা মুদ্রণের দুশ বছর' (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, ১৯৭৮) এবং শ্রীপান্থ তাঁর 'যখন ছাপাখানা এলো' (বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৭৭) গ্রন্থে। এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার-ইতিহাসের বিশ্লেষণ করতে ডঃ সুর জানালেন, ১৮৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র ভারতে মোট ১০৯৪টি ছাপাখানা ছিল, তার মধ্যে বাংলার সবচেয়ে বেশি ২২৯টি। বই ছাপা হয়েছিল ৭৯৯৯ খানা, তারমধ্যে বাংলায় ২৪১৪ খানা। এদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন পোর্তুগীজেরা গোয়া শহরে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে, বাংলাদেশে অবশ্য হিকির ছাপাখানার কথাই প্রথম শোনা যায়। মনোটাইপ-লাইনোটাইপের বিশেষত্ব, উভয়ের পার্থক্য এবং কিভাবে এসব টাইপের প্রচলন ঘটল তাও আমরা জানতে পারি অতুল সুরের গ্রন্থপাঠে। আর শুধু হরফ-নির্মাণের কথা নয়, এই শিল্পের আরেক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছাপার কাগজ ও কালি প্রসঙ্গেও নানা তথ্য লেখক জানিয়েছেন। হরফ-মুদ্রাযন্ত্র-কাগজ-কালির সম্মেলনে যে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটল মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশে তার এবং সেই সঙ্গে এর বাজার ও ব্যবস্থা প্রসারের নানা কাহিনী-কৌতুকও পরিবেশন করেন লেখক এই স্বল্লায়তন গ্রন্থটিতে। আর কবে প্রথম ভারতবর্ষে মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছিল—এ নিয়ে কিছু কৌতুককর বিতর্ক, যেমন, একহাজার

বছর আগেও নাকি ছিল এদেশে মুদ্রাযন্ত্র—যে কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'নববার্ষিকী' নামক বাংলা সাময়িক পত্রে, সে সব নানা তথ্যের ভ্রান্তি-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শ্রীপান্থ তাঁর গ্রন্থে। জানিয়েছেন পাঠককে মুদ্রণশিল্প প্রসঙ্গে অন্য আরও নানা খবর, এবিষয়ে অন্য অনেক গবেষণার নানা যুক্তি-চিন্তা।

আধুনিক সমাজজীবনের আরেক বাহন সংবাদপত্র। ভারতীয় সংবাদ-পত্রের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছেন তারাপদ পাল তাঁর 'ভারতের সংবাদপত্র' (সাহিত্য সদন, ১৯৭২) গ্রন্থে। ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসকে তিনটে বড় অংশে ভাগ করেছেন লেখক, ১৭৮০ থেকে ১৮৯৯, ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ এবং স্বাধীনোত্তর কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল। উল্লিখিত গ্রন্থে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক প্রথম দুই কালপর্বের ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের। সমাজ সংস্কার, ধর্মসংস্কার, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় উনিশশতকের নবচেতনার উন্মেষ সাধনে কিংবা রাজনীতিক চিন্তা, স্বাধিকার ও মুক্তিলাভের আন্দোলনে ভারতীয় সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জনমতের বাহন হিসেবে তার ক্রমপ্রতিষ্ঠা আর ক্রমে বিদেশী শক্তির দ্বারা অধিকার-দলনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে সংবাদপত্রের এই আন্দোলন আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারাপদ পাল তাঁর গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্যগুলিরই তথ্য-নিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের সাহিত্যনির্ভর নবজাগরণে বাংলা সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান আলোচনা করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ' (সাক্ষরতা প্রকাশন) গ্রন্থে। লেখক বাংলা সংবাদপত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত হন নি, ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮-এর কালপর্বে বাংলা সংবাদপত্র গণ-মাধ্যম হিসেবে সমাজে যে চেতনা-উপলব্ধির সঞ্চার করেছিল এবং তা ক্রমে সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক শক্তিরূপে যে নবজাগরণের সূচনা করে, উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের সেই ভূমিকাই বিশ্লেষণ করেছেন লেখক এই গ্রন্থে।

উনিশ শতকের সাময়িকপত্রের চরিত্র ও ভূমিকা বিশ্লেষণে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনয় ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আমাদের সবারই পরিচিত বিষয় এখন। গবেষক বিনয় ঘোষ এখনও যথেষ্ট তৎপর এ-বিষয়ে। কিন্তু এঁরা ছাড়াও টুকরো টুকরো ভাবে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার অন্বেষণ-বিশ্লেষণে আরও অনেকেই আগ্রহী। এরই একটি সুন্দর উদাহরণ

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার এক বছরের সংকলন গ্রন্থটি (দেবালয় ট্রাস্ট, ১৯৭৫)। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের এক বছরের 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার ফাইল আবিষ্কার করেছেন কানাইবাবু শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার থেকে। তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সংযোজন করে এই পত্রিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন লেখক তাঁর সংকলন গ্রন্থে। 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এই পত্রিকাই ছিল মজুর-প্রীতি বা মজুরবোধের প্রথম সূচনা। তবে সে মজুর-প্রীতি অবশ্যই শোষক-শোষিতের শোষণ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নয়, ধর্মীয়-মানবিক দিক থেকেই তা গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপান বর্জন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, শ্রম-মাহাত্ম্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদিই ছিল এ-পত্রিকার লক্ষ্য।

আঠারো-উনিশ শতকে সাম্রাজ্যলোভী অর্থলোভী বণিকবুদ্ধি ইংরেজ শাসকদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব শাসিতদের গোলামি, বাবুবিলাস আর অর্থগৃধ্নু মুৎসুদ্দি দেশীয় মধ্যবিত্তের প্রসারে যে শহরকেন্দ্রিক অর্থাৎ কলকাতা-কেন্দ্রিক সমাজজীবন গড়ে উঠেছিল তার বিশ্লেষণ বিনয় ঘোষের চিন্তার নতুন কোনো বিষয় নয়। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ-ব্যাপারে চর্চা করছেন বেশ কিছুদিন। কিন্তু উনিশ শতকের নাগরিক সভ্যতার ক্রম-পরিণতিতে আধুনিক শহুরে সমাজের গড়ন ও তার সংকট, বিশেষত কলকাতার সমাজজীবনের ঘনীভূত সংকটের বিশ্লেষণ চোখে পড়ে বিনয় ঘোষের সাম্প্রতিক রচনায়। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দুর্বার টেকনোলজিক্যাল উন্নতি, মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি, টাকা-অটোমোবিল-কনজুমারিজম আর ভুবনমোহন বিজ্ঞাপনের বিমোহিত সভ্যতায় মেট্রোপলিটন কলকাতার সমাজজীবন যে ক্রমশ নেক্রোপলিসের দিকে নিয়ত ধাবমান এবং টাকা-ক্ষমতা-স্ট্যাটাস শিকারের সমাজে উচ্চবিত্তের ক্রমপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের ক্লান্ত অবসন্ন প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম যে এক জটিল ক্রমবর্ধমান সংকট তৈরি করে চলেছে বিনয় ঘোষ তারই এক চিত্ররূপ রচনা করেছেন 'মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত: বিদ্রোহ' (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩) নামক গ্রন্থ এবং সাম্প্রতিক আরও নানা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে।

এরই প্রেক্ষিতে যুব-তরুণসমাজের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, হিপি-বিটনিকের মানসিকতা, পশ্চিমি দেশগুলিতে গড়ে ওঠার যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে তারও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বিনয় ঘোষের রচনায়। ব্যাধিগ্রস্ত ধনতান্ত্রিক

সমাজের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে, শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে, যান্ত্রিক দাসত্বের বিরুদ্ধে, প্রকৃতি ও মানুষের যান্ত্রিক বিকৃতি ও বীভৎসতার বিরুদ্ধে সতেজ কল্পনাপ্রবণ তরুণের মন যে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে তা লেখকের কাছে স্বাভাবিকই মনে হয়। বুর্জোয়া অবক্ষয়ের যুগে বিদ্রোহী তরুণ সমাজের মানসিকতার বিশ্লেষণের এই সূত্রে এদেশের ছাত্রসমাজ সম্পর্কেও বিনয় ঘোষ তাই বলেন, 'বিদ্রোহের সুরে বিশ্বতরুণের মনের সঙ্গে কলকাতার তরুণের মন একতন্ত্রীতে বাঁধা, এবং সেখানে শুধু না-না আর না-এর সুতীব্র ঝংকার।'

ছাত্র-তরুণের কিছু না-মানার এই বিক্ষোভ-বিদ্রোহের মূল চরিত্র আপাতভাবে এক মনে হলেও দেশে দেশে তার রঙের যে তফাৎ আছে—সামাজিক-রাজনীতিক নীতি ও বোধের—তাও স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গত দশকের নানা আলোচনায়। ফ্যানন-হার্বার্ট মার্ক্যুস প্রভাবিত নয়াবাম বিদ্রোহ আর অনুন্নত দেশের ছাত্রবিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি-বোধ, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যে পৃথক তার বিস্তৃত আলোচনাও চোখে পড়ে নানা পত্র-পত্রিকায়, বিচ্ছিন্ন আলোচনা-সমালোচনায়। বিনয় ঘোষের বিশ্লেষণেও এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আর নয়াবাম মানসিকতা ও বিদ্রোহের অন্তরালে যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত, পেটিবুর্জোয়া রোমান্টিকতা, এরিক ফ্রম-মার্ক্যুসের অতিবাম তত্ত্ব ক্রিয়াশাল তার এক বিস্তৃত বিশ্লেষণ একাধিক প্রবন্ধে করেছেন পাভলভীয় মনস্তত্ত্বচর্চা ও প্রয়োগে বিশ্বাসী এক প্রতিষ্ঠানসম ব্যক্তিত্ব, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' (আশা প্রকাশনী, ১৯৭৪) গ্রন্থে।

ডঃ গাঙ্গুলির এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়ের সূত্রেই মনে পড়ে যায় গত দশকের আরেক পরিচিত সমস্যা-বিশ্লেষণের ঝোঁক। তা হল বিচ্ছিন্নতার সংকট। আত্ম-বিচ্ছিন্নতাবোধের সমস্যা যে শুধু পরিপক্ব পুঁজিবাদী সমাজকেই পীড়ন করছে না, আমাদের সমাজেও যে তা নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য ও সমস্যা এবং যার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় বিকৃতি, সাংস্কৃতিক বিকৃতি, ব্যক্তি চরিত্রের বিকৃতিতে মধ্যবিত্তের নানা সমস্যা, বিদ্রোহ-বিপ্লবের সংকট ও কনজিউমারিজমের সমস্যা আমাদের সমাজজীবনকে ছিন্নভিন্ন করছে, তার বিশ্লেষণে আগ্রহী বিনয় ঘোষও, মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ আস্থা রেখে। তবে এ-সূত্রে মার্ক্যুস-ফ্যাননের অমার্কসীয় বৈপ্লবিক তত্ত্বের 'লাডাইট' চিন্তার ফাঁদে তিনিও যে অজান্তে পড়েছেন মধ্যে মধ্যে, তা

স্বীকার করেছেন লেখক তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (পরিশিষ্ট, ১৯৭৭)।

দেশী-বিদেশী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সামাজিক চেতনার জগতে, ছাত্র-বিক্ষোভের মনস্তত্ত্বে কিংবা সর্বাধুনিক মার্ক্স-ফ্রয়েড প্রভাবিত নয়াবাম দার্শনিকতার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ ও তার প্রতিফলনের এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন ডঃ গাঙ্গুলি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিরিখে। বলেছেন, এমন কি সমাজতন্ত্রেও, এক অর্থে, বিচ্ছিন্নতার সমস্যার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'পণ্য-উৎপাদনে শ্রম করতে হয়, পরিচালকের নির্দেশ মানতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ সমাধা করতে হয়। সমাজের নীতি ও পার্টি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়। এসবই বলা চলে বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন। কিন্তু আদর্শ সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাজাত ও বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতা নিরসনে সচেষ্ট থাকবে। সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তিমানুষ, সমাজতন্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এই ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতা-বিলোপ ও মুক্তি। রাষ্ট্রকে হতে হবে প্রধানত সেই কাজে নিযুক্ত।'

'পল্লী ও নগর' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৩) গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে আধুনিক বাংলার সঙ্কট বিশ্লেষণে অম্লান দত্ত লিখেছেন, 'নগর কলকাতা ও পল্লী বাংলার ভিতর অসামঞ্জস্য আমাদের সংকটের প্রধান কারণ। নাগরিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রাম্যতার যোগে আমরা এক উদ্ভট সংস্কৃতি ও রাজনীতির অধিকারী হয়েছি।' সহর ও গ্রামের ভিতর খানিকটা অসামঞ্জস্য সাধারণভাবে অনিবার্য হলেও আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আর তার ফলে নাড়ীর যোগ ছিন্ন করে আমরা ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ছেড়ে এই কলকাতা সহরে এসে ভিড় জমাই আর মহানগরীকে এক দুরারোগ্য ব্যাধির দিকে ঠেলে দিই। অম্লান দত্ত বলেছেন, শুধু আর্থিক ব্যাধিই এতে তৈরি হয় না, জটিল সাংস্কৃতিক ব্যাধি আমাদের আচ্ছন্ন করে, যুক্তিবোধহীন পরনির্ভরশীলতার জীবনচর্যায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি। কোনো গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত না থেকে আক্ষেপ-বিক্ষোভের আপাত প্রগতিশীল রাজনীতির চর্চা করি, অধিকাংশ মানুষকে নিরক্ষর রেখে বাক্যবন্ধ মুখস্ত করার উচ্চশিক্ষার প্রসারে মন দিই, স্বাধীন চিন্তাশক্তির অবদমনের নাম দিই বিদ্যা। এ সমস্যার উৎস 'পশ্চিমবাংলার ওপর কলকাতার একাধিপত্য' আর এর অবসান না হলে,

কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রেখে শিল্পকেন্দ্রগুলি দেশময় না ছড়িয়ে দিলে এ-সঙ্কট থেকে মুক্তি নেই।

'ব্যক্তি, যুক্তি, সমাজ' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮) নামে অপর এক গ্রন্থে লেখক এই সঙ্কটের বিশ্লেষণ করে আরও বলেছেন যে উনিশ শতকের বাংলাদেশে যুক্তিশীলতার প্রসারে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তা সমাজের বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করে সে নবজাগরণ দেশে কিছু ডাক্তার, উকিল, ডেপুটি, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপকমাত্র তৈরি করতে পেরেছিল। আর তাছাড়া এই নবজাগরণ ছিল মূলত নগরভিত্তিক। ফলে বাবুসম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ জাগরণে নগর ও গ্রামের ব্যবধান যেমন হল দুস্তর, তেমনই কৃষি-শিল্পের ব্যাপক উন্নতির জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারে নতুন মধ্যবিত্ত তেমন তৎপরতা দেখাল না। ফলে যা হল তা আজকের সংকট। আজকের মধ্যবিত্তের যুক্তিধর্মিতা 'ওকালতি বুদ্ধি এবং ডেপুটির সাবধানী মনোবৃত্তিতে পর্যবসিত হল। এর সঙ্গে প্রয়োগধর্মী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হল না। কর্মভিত্তিক নীতিবোধও এদেশের নাগরসমাজে গড়ে উঠল না।' অধ্যাপক দত্ত এই সংকট থেকে ত্রাণের পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'যুক্তি ও বিচারের স্বাধীনতা চাই, কারণ মানুষের ভিতর চৈতন্যের একটা সৃজনশীল দ্বন্দ্ব ক্রমাগত চলেছে, যার ভিতর দিয়ে সে এক স্তর থেকে পথ হাতড়ে অন্য স্তরের দিকে পা বাড়ায়। সেই দ্বন্দ্বকে অস্বাভাবিকভাবে অস্বীকার করার চেয়ে বড় ভ্রান্তি কমই আছে। মানুষের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনো বাঁধা সরকারী রাস্তায় কখনও চলে না। নবজাগরণের যদি কোনো বড় শিক্ষা থাকে তবে এই স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করবার শিক্ষা তার অন্যতম।'

আধুনিক সমাজজীবনের আরেক প্রধান সংকট 'অপসংস্কৃতি'। গত দশকের বুদ্ধিজীবী মহলে এই 'অপসংস্কৃতি'র বহু চুলচেরা বিশ্লেষণও হয়েছে। কিন্তু কোনটা 'সংস্কৃতি' আর কী-বা 'অপসংস্কৃতি' তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজও হয়ে ওঠে নি। ঠিক যেমন বহুকাল থেকে তর্ক পুষে রেখেছি আমরা শ্লীলতা অশ্লীলতা বিষয়ে। আর এই দুই প্রশ্ন যে অনেকের কাছেই সমার্থক হয়ে যায় তারও উদাহরণ আছে ভূরি ভূরি। নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' (এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, ১৯৭৭) গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে জ্যোতি ভট্টাচার্য এই সমস্যার কথা মনে রেখেই লিখেছেন, 'সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ও গভীর ধারণার প্রতিষ্ঠা-আয়োজনে আমাদের আলস্য বা অনাগ্রহ

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকেও দুর্বল এবং খণ্ড করে রাখে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের নিন্দাবাদ অনেক সময় শ্লীলতা-অশ্লীলতার বাঁধা বুলির গণ্ডি ছেড়ে ওঠে না। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের কারু কারু বক্তব্য অনেক সময় রক্ষণশীল শুচিবায়ুগ্রস্ত ভণ্ডদের বক্তব্যের সঙ্গে যেন এক হয়ে মিশে যায়। প্রশ্নটা যে আসলে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়েই শুধু নয়, উদ্দেশ্য ও প্রকরণ নিয়েই যে প্রধান প্রশ্ন, সেকথা আমরা ভুলে যাই।'

ঐ একই গ্রন্থের আরেক প্রবন্ধে উৎপল দত্ত বলেছেন, 'অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা যায় অপসংস্কৃতি হচ্ছে সংকট-জর্জর পচে-যাওয়া মরণোন্মুখ সমাজব্যবস্থার বমন, একটা গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ। সবদিক থেকে কোণঠাসা হলে শাসক শ্রেণী তখন চেষ্টা করে জনগণকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে ব্যভিচার আর নগ্নতার চরকি পাকে ঘুরিয়ে তার চারিত্রিক দার্ঢ্য ও প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট করতে।…যা কিছু জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামকে সাহায্য করে তাই সংস্কৃতি। যা কিছু জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামকে ব্যাহত করে তাই অপসংস্কৃতি।'

কিন্তু রাজনীতিক সংগ্রামের মত ও পথের পার্থক্য তো আজ দুস্তর। আর জনগণের ঐতিহ্য—তার কি কোনো সর্বগ্রাহ্য অবয়ব আছে প্রগতিবাদী মহলে? তাই প্রায় অনিবার্যই হয়ে ওঠে দীপেন্দু চক্রবর্তীর নানা সংশয়। যৌনতা আর খুনজখমই কি কেবল অপসংস্কৃতি? শহুরে যুবকের বাঁক কাঁধে নিয়ে তারকেশ্বর যাওয়া, রাস্তার মোড়ে মোড়ে শনিপুজো-শেতলাপুজো কিংবা ফুটবল-মাঠের তাণ্ডব অপসংস্কৃতি নয় কেন? 'বারবধূ' যদি অপসংস্কৃতি হয় যৌনতার দায়ে, তাহলে কি 'এবং ইন্দ্রজিত' সুসংস্কৃতি। 'রবি' বা 'বারবধূ'-র পেছনে যদি মুনাফার লোভ কাজ করে থাকে, তাহলে 'দুঃস্বপ্নের নগরী'-তেই যে সেই একই অভিসন্ধি কাজ করছে না, তা কি করে বোঝা যাবে। 'এই পরিস্থিতিতে অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে শত্রু-মিত্রের প্রশ্নটি কি আরো জটিল চেহারা নিচ্ছে না?' (সংস্কৃতির ক্ষয়-ক্ষতি, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৭৯)।

একালের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ঘোষিত নীতি ও অনুসৃত কর্মের মধ্যে সাযুজ্যের অভাব, তাঁদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও স্ববিরোধিতা যুগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর এই সমস্যা নিয়েও তর্ক-বিতর্কের ঢেউ উঠেছে গত কয়েক-বছরে। লতিকা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন' (শিল্প সাহিত্য-পরিবেশক, ১৯৭২) সংকলনটিতে এর কিছু আভাস

পাওয়া যায়। সমর সেন লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মানসিক দ্বন্দ্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কাজের সঙ্গে বিরোধ। অর্থাৎ যে কাজ, যে চাকরী করি তার সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ খাপ খায় না। ফলে বিবেকদংশন দেখা দেয়। অনেকে নানা জোড়াতালি দিয়ে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা সইয়ে নেন। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সেটা পারেন না। তাঁরা না ঘরের, না বাইরের। যাঁরা সইয়ে নেন আমাদের দেশে অনেকদিন ধরে তাঁরাই বাজার মাৎ করে রেখেছেন।' সমর সেন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিয়ে তেমন চিন্তিতও নন কেননা 'হয়ত যাঁদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলে মনে করি না তারাই কালান্তরের কারণ হবে, তাদের বুদ্ধি জীবিকায় পরিণত হবার আগে। তাছাড়া যারা খেটে খায় তারা তো বুদ্ধিজীবী নয়। এদের কথা লিখতে চন্দ্রবিন্দু লাগে না।'

বুদ্ধির চর্চা নয় আসলে শব্দের চর্চা, অর্থহীন-বোধহীন শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে আজকের শব্দজীবীরা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টায় মেতে থাকেন অপরকে এবং নিজেকেও, আসল সমস্যা ছুঁতেও পারেন না কখনও—এই হল আজকের প্রগতিবাদীর ব্যাপক সমস্যা। এর বিশ্লেষণেই শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, '...যিনি হয়তো বিপ্লব বিষয়ে উত্তেজক পরামর্শ দেন চায়ের আসরে বা মঞ্চের ভাষণে বা লেখায়, তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং সাধনা করেন অর্গলহীন ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের, সম্পদবৃদ্ধির, গাড়িবাড়ি সম্প্রসারণের। যিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেবলই ধ্বংস করতে চান কথায়, তিনি হয়তো কুটিল গোপনে সেই প্রতিষ্ঠানেরই করুণা ভিক্ষা করেন বারে বারে, কিংবা হয়তো এই করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েই তৈরি হয় তাঁর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী উদ্‌গার। উঁচু জগতের আরামে বসে থেকে কষ্টসহিষ্ণুতার পরামর্শ দেওয়া, নিজেকে নিরাপদ ব্যবধানে রেখে প্রকট সংগ্রাম বা গৌরবময় মৃত্যুর দিকে তরুণদলকে উশকে দেওয়া—এ আজ কতোই সহজ হয়ে এলো।'

আধুনিক নগরজীবনের সঙ্কট, সংস্কৃতির সঙ্কট, বুদ্ধিজীবীর সঙ্কট বাঙালি জীবনে যে-শহরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সেই শহর-কলকাতার গড়ে ওঠার কাহিনীও আমাদের অতি প্রিয় বিষয়। গত দশকে এই কলকাতার ইতিহাস-চর্চারও এক প্রবল উৎসাহ দেখা গেছে। আমাদের এই সমীক্ষার শেষ কিন্তু সমধিক জরুরি প্রসঙ্গ হিসেবে তাই এরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক।

নানা তথ্যে ভরপুর, সাহিত্যরসসিক্ত বিনয় ঘোষের কলকাতা-চর্চা আমাদের কাছে নতুন খবর নয়। ১৯৫৩ সালে 'কলকাতা কালচার', ১৯৫৬

সালে 'টাউন কলকাতার কড়চা' ও ১৯৬২ সালে 'সুতানুটি সমাচার' প্রকাশিত হয়েছিল। যে-কোনো উৎসাহী বাঙালি পাঠক সেসব খবর জানেন। সাম্প্রতিক আরও কিছু নতুন গবেষণার সমাহারে এ-তিন গ্রন্থের একত্রিত রূপ 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' (বাক্ সাহিত্য, ১৯৭৫)। কলকাতার ঐতিহাসিক বাড়িঘর বা প্রতিষ্ঠানগুলির পুরনো ইতিহাস, মন্দির-মসজিদ-গীর্জার ইতিহাস আর কলকাতার ইতিহাসে আধুনিকতার সূচনা কিভাবে হল—সেইসব প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে এ-গ্রন্থে সংযোজিত নতুন পরিচ্ছেদ-গুলিতে। মন্দির-মসজিদ-গীর্জার ওপর বিনয় ঘোষের সাম্প্রতিক এই প্রবন্ধের কিছু কিছু তথ্যগত ভ্রান্তির উল্লেখ করে এ-কালের বিশিষ্ট কলকাতা-বিশেষজ্ঞ রাধারমণ মিত্র বলেছেন, 'শ্রীবিনয় ঘোষের অন্যান্য লেখার মতো এই প্রবন্ধটিও আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম এই আশা নিয়ে যে এতে আমার অজানা নতুন কিছু তথ্য হয়ত পাব। কিন্তু পড়ে নিরাশ হলাম। প্রবন্ধের দুটি অংশ –একটি শাঁস ও একটি ছোবড়া। শাঁস বা সার অংশে তাঁর নিজের একটা কথাও পেলাম না। হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ ও খ্রীস্টানদের গীর্জা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা শ্রীপঞ্চানন রায়ের বই 'বাংলার মন্দির', David McCutchion-এর 'The Temples of Calcutta' নামক প্রবন্ধ, Dr. M. K. A. Siddiqui-র বই 'Muslims of Calcutta' ও ইংরেজদের দু-একটি মামুলি লেখা ও Guide Book-এর প্রতিধ্বনি মাত্র, অবিকল মাছি-মারা কেরানির মতো তিনি তাঁদের নকল করেছেন। অথচ তিনি কলকাতা সম্বন্ধে প্রামাণিক পণ্ডিত (authority), অনেকদিন থেকে কলকাতা নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার কি এই ফল?' (এক্ষণ, ১-২ সংখ্যা, ১৩৮৩)।

রাধারমণ মিত্রের কলকাতা-চর্চার ইতিহাসও সুদীর্ঘকালের। তবে সেসব গবেষণা-কর্ম প্রকাশের উদ্যোগ তেমন ছিল না। গত দশকে কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বাদানুবাদ থেকেই পুরনো কলকাতা বিষয়ে শ্রীমিত্রের নানা তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নিল 'এক্ষণ' পত্রিকা। 'কলকাতার টুকিটাকি' শীর্ষক বিভিন্ন প্রবন্ধে রাধারমণ মিত্র আদি কলকাতার রাস্তাঘাট, পুরনো বাড়ি ও তার মালিক, যানবাহন, জলপথ-স্থলপথের নানা যোগাযোগ ব্যবস্থা, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা আর সমাধি-ক্ষেত্রগুলির ইতিহাসসহ আঠারো-উনিশ শতকের এ-শহরের নানা অজানা কাহিনী আর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁটিনাটি নানা খবর জানিয়ে দেন পাঠককে

একান্তই যুক্তিনিষ্ঠ, 'ছোবড়াহীন শাঁসে ভরা' বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এইসব তথ্যানুসন্ধানের সূত্রেই রাধারমণ মিত্র রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কলকাতা-বাসের নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। প্রচলিত তথ্যসমূহের ভ্রান্তি ধরিয়ে দেন। 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা' প্রকাশিত 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' (১৯৭৭-এ প্রকাশিত) এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গঙ্গার প্রাচীন ঘাটগুলি নিয়ে 'ঐতিহাসিক' পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত তাঁর 'গঙ্গার ঘাট' (কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থমালা) গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

ভারতবর্ষে পর্তুগীজ বণিকদের আগমন থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরেজ বণিকদের ঘাঁটি-স্থাপনের কালপর্বে ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের তোলপাড় রাজনীতি, রাজপুরুষদের উত্থান-পতনের লড়াই-এর কাহিনী আর এরই ফাঁকে ডোবা-নালা-জঙ্গল ভেদ করে কলকাতা শহর গড়ে ওঠার কাহিনী লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী 'পুরনো কলকাতার কথাচিত্র' (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৯) বইটিতে। 'ইতিহাসের জটিল বিষয়কে কতটা সহজ এবং সুখপাঠ্য করে লেখা যায়'—ভূমিকায় লিখিত লেখকের এই লক্ষ্যের সার্থক পরিণতি হয়ে ওঠে এই গ্রন্থ। টুকরো টুকরো নানা তথ্য বিশ্লেষিত হলেও কলকাতা গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক পটভূমির ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস ছিল না। পূর্ণেন্দু পত্রীর এই বই সে-প্রয়োজন সাধন করল।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তেমন লেখা হয় না—এই অভিযোগ বহুদিনের। মনে হয়, এ-অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁরা প্রধানত অতি-প্রচলিত পত্র-পত্রিকার দিকেই নজর রাখেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিষয়ই তাঁদের মনে থাকে। এ-কথা ঠিক যে উচ্চতর গবেষণায় সাহিত্য-ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বাংলা ভাষা প্রধান মাধ্যম নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণা ইত্যাদির বাইরে জীবনযাত্রার সংগ্রামে, আন্দোলনে, নানা জিজ্ঞাসার কাতরতায় বাঙালি লেখক মাতৃভাষাতেই প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, বাঙালি পাঠকও মাতৃভাষাতেই তার উত্তর সন্ধান করছেন। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের রচনা হয়তো এখনো সংখ্যায় বেশি, তার মানও বোধহয় উচ্চতর। কিন্তু বাংলা ভাষাতেও যে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হতে শুরু করেছে—সত্তরের দশক সেই আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতেরই আভাস দেয়।

কবিতার দশবছর

অরুণ সেন

১.

বাংলা কবিতার, গত দশ বছরের বাংলা কবিতার, সালতামামি না হোক, তার মতিগতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে-কোনো আলোচকই ভীত হয়ে পড়বেন অনেকগুলি কারণে। প্রথমত, প্রকাশিত কবিতার বা কাব্যগ্রন্থের সংখ্যার বিপুলতা। শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় সত্তর দশকে প্রকাশিত গ্রন্থের যে পাহাড় জমেছে এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য, তা চোখে দেখাও আতঙ্কজনক। তা সত্ত্বেও একথা বলা যাবে কি যে প্রকাশিত সব কটি বই আমার পাশে আছে? থাকাটা বাঞ্ছনীয় কি? তাছাড়া সব কটি বইয়ের প্রতি সমান নজর দেওয়া বা কোনো কোনো বইয়ের প্রতি আদৌ নজর দেওয়া যদি সম্ভব না হয়ে থাকে, তার জন্য কি দায়ী শুধু আলোচকের রুচি-পছন্দ, কোনো বই বা লেখক সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট সংস্কার ও প্রচার, না কি অনেক সময় নেহাতই আকস্মিকতা?

বাংলাদেশে কবির বা কবিতাগ্রন্থের সংখ্যাধিক্য, এ নিয়ে হালকা ভাবে অনেক কিছুই ভাবা বা বলা যায়, কিন্তু তার বেশি, ধরা যাক এই অজুহাতে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রতি অমনোযোগ তো সত্যিই সম্ভব নয়। কবিতার নামে বাংলায় অনেক কিছুই উদ্ভট ঘটে থাকে এটা মেনে নিয়েও বলা যায় রসিকতা বেশি দূর এগোনো উচিত নয়। তাছাড়া চিন্তা কর্ম ও সৃজনের অন্য কোন ক্ষেত্রে আমরা কি এমনটা করেছি যে বেশি কবিতা লেখার জন্য আমাদের কবিদের গঞ্জিত হতে হবে? বরং এই একটি ক্ষেত্রেই আমাদের চর্চার যে পেশাদারি দক্ষতা ও তার মধ্য থেকে মাঝে-মাঝেই দীপ্তির যে উদ্ভাস, ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, স্থায়ী সত্য রূপে দেখা দিয়ে থাকে বাংলা কবিতায়, তার বিকল্প কোথায়? আবেগ ও মননের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো আমাদের চর্চা শৌখিন, অনুবাদসর্বস্ব বা গ্রাম্য।

মানি, এদেশের কবিতা-চর্চার ভেতরেও অনেক ফাঁকি আছে, আছে অনেক অন্ধকার, অনেক অক্ষমতা ও নৈষ্কর্ম্যের ক্ষতিপূরণ—কিন্তু ব্যাপক-ভাবে সামগ্রিকভাবে এই একটি ক্ষেত্রেই বোধহয় আমাদের সৃজনশীলতা

স্থায়ী সারাৎসারত্বে পৌঁচেছে বলে দাবি করা যায়। তাই এ-ব্যাপারে বারোয়ারি অশ্রদ্ধা পোষণ আমাদের অসচেতনতারই সাক্ষ্য শুধু নয়, বোধহয় একটু নির্লজ্জ ইতরতাও।

তবে আসল বাধা বোধহয় অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মনে সাম্প্রতিকদের বিষয়ে বিচারের বাধা। সত্তরের দশকে যে কবিদের আবির্ভাব ঘটেছে, শুধু তাঁরাই নন, আমাদের পূর্বপরিচিত কবিরাও কেউ কেউ যদি ভাষা ও অভিজ্ঞতায় কোনো অভাবিত নতুনত্ব প্রকাশ করেন, তবে তার প্রতি ঔদার্য প্রকাশ অনেক সময়ই ব্যাহত হতে চায়। পুরোনো অভ্যাস বা সংস্কার বা অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন যুগের ভাষাকে যাচাই করার সময় একটু বেশিই সহনশীল হতে হয়। অবশ্য উল্টোটাই হয়তো বেশি ঘটে: আগুনের পাশে অনেক ধোঁয়া। আর তখন কবিতা-আস্বাদনের পেছনে একটা বড় দৃষ্টির প্রস্তুতি বা আয়োজন না থাকলে ছদ্ম-অভিনবত্বকে বর্জন করার নান্দনিক প্রয়োজনীয়তাটাও বুঝতে অসুবিধা হয়। পাঠকের রুচিতে তখন একটা নৈরাজ্য ঘটে যেতে পারে। তৈরি হতে পারে এ-ও ভালো ও-ও ভালো গোছের একটা মনোভাব।

অবশ্য কবিতার ক্ষেত্রে, বস্তুত কবিতার ক্ষেত্রেই বেশি করে, বৈচিত্র্যের ভাবনাকে বাদ দিয়ে কোনো পাঠক দাঁড়াতে পারেন না। কবিতার মতো নিখাদ শব্দশিল্প কোনোটাই নয়। উপন্যাস তো নয়ই। সেখানে কন্‌টেন্ট-এর যে চাপ তাতে একদেশদর্শিতা যতটা গ্রাহ্য, কবিতায় তা নয়। কবিতার শরীরের যে বৈচিত্র্য উপভোগের ক্ষমতা পাঠকের অর্জন করতে হয়, তার মধ্যেই ইঙ্গিত থাকে কবিতার বিষয়কে একটু ভিন্নভাবে জানার প্রয়োজনীয়তা। ফলে একই মতাবলম্বী পাঠকদের মধ্যে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রুচি কবিতার ক্ষেত্রেই বেশি সম্ভব। শব্দছন্দব্যবহারের গুণেই বিষয়ের সর্বাধিক মাত্রা-পরিবর্তন হয় কবিতাতেই। তার মানে এই নয় কবিতা-পাঠের কোনো নন্দনকে অস্বীকার কিংবা বিচ্ছিন্ন কাব্যরূপবিলাসের প্রশ্রয়। কারণ, ব্যক্তিগত পছন্দ বলতে যা আমরা বুঝি, সত্যিই তো তা পুরোপুরি ব্যক্তিগত নয়। অন্য দিকে, কবিতার বৈচিত্র্যে অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটবে, এই ব্যক্তিগত টান না থাকলে কবিতাপাঠেরই বা বাধ্যতা কোথায়?

মূল্যবোধ ও নন্দনতৃপ্তির বিস্তার, ব্যক্তিগত রুচির স্বাধিকার ও নান্দনিক অবস্থানের নির্দিষ্টতা—এই সব টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই গড়ে

ওঠে কবিতা পাঠের এক-একটা ধরন। ফলে তার ঝোঁকে এই [illegible] কবি-নির্বাচনে, তার গুরুত্বারোপে ও বিভিন্ন মতামতে যে মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত রুচির সমন্বয়মূলক ও কখনো হয়তো সংঘর্ষমূলক প্রয়োগ ঘটবেই, তা তো বলা বাহুল্য। কিন্তু সেটা এই প্রবন্ধটি পাঠের পক্ষে, রচনার পক্ষেও বটে, একটি বাধা—কারণ নান্দনিক বোধ ও ব্যক্তিগত রুচির বিভিন্ন অবস্থান থেকে এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা খুবই অনুভূত হবে তা প্রায় ধরেই নেওয়া যায়। এই প্রবন্ধের মূল্যও যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তাও একটি বিশেষ অবস্থান থেকে দেখারই ফল। এর হাত থেকে কারোরই নিস্তার নেই।

আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় 'দশক' শব্দটির একটু ব্যাপক প্রয়োগ করতেই হয়, উক্তি-সংক্ষেপের জন্যও কিছুটা—যদিও শব্দটির প্রয়োগে অনেক গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে। প্রথমেই, কিছুটা বাহুল্য বোধ হলেও, সে-ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া ভালো। কোনো দশকের 'কবি' এবং সেই দশকের 'কবিতা'—এ দুয়ের তফাতটা সব সময় মনে-মনে থাকা দরকার। তিরিশের দশকের কবি বলতে আমরা যাঁদের বুঝি তাঁদের অনেকেরই কাব্যস্বরূপের আবিষ্কার ঘটেছিল কিন্তু চল্লিশের দশকে। তবু তাঁদের আমরা তিরিশের দশকেরই বলি যেহেতু তাঁরা কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন তিরিশে। এইভাবে পঞ্চাশের দশকের কবিদের কীর্তিকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো যে-দশকে তাঁদের আবির্ভাব, সেই দশকই বিবেচ্য। তাই সত্তরের দশকের কবিতা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করতে বসি, তখন পূর্বের সব দশকের জীবিত কবিদেরই এই-দশকে-রচিত কবিতা আমাদের মাথায় থাকে। সত্তর দশকের কবিদের রচনা তো বটেই। পূর্বের দশকের কবিরা অধিকাংশই, নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন সত্ত্বেও, তাঁদের ইতিমধ্যেই গড়ে-ওঠা নিজস্ব ভাষা ও অভিজ্ঞতার ধরনেই বাধ্যত লিখে থাকেন পরের দশকে। তৎসত্ত্বেও পরের দশকের কিছু চাপ নতুনভাবে পড়েও সেই সব সজাগ কবিদের ওপর। ফলে তাঁদের গড়ে-ওঠা ভাষা, সেই ভাষার ওপর সমকালীনতার চাপ এবং সেই-দশকেই লিখতে শুরু-করা নতুন কবিদের নতুন ভাষা—পাঠকের কাছে এর সবগুলিই এক সঙ্গে বাস্তব। ঐতিহাসিক বোধ এবং রুচির গ্রাহ্য সমকালীনতার মধ্য দিয়েই এই বাস্তবকে ধরা কিছুটা মানসিক কসরতের ব্যাপার সন্দেহ নেই—কিন্তু সেটা ছাড়া একটা দশককে বুঝতে চাওয়া তো খণ্ডিত। সত্তরের দশকেই কিভাবে

নিরন্ধ্র নৈরাশ্য স্পর্শ করেছে ভিন্ন ভিন্ন দশকের ভিন্ন ভিন্ন কবি-ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে—এ-দশকে সাম্যবাদী আন্দোলনের বিচ্ছেদ, অতিবামপন্থী হঠকারিতার বিস্তার, এ-সময়ের 'নিশি-পাওয়া' যৌবনের নানা বিচ্যুতি ও গৌরব, আর এর মাঝখানে অ-নাটকীয় বাস্তববাদী অথচ ধ্যানী বামপন্থাকে টিঁকিয়ে রাখার ব্যর্থতা-সাফল্য-সমস্যা, এ-সবই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কিভাবে স্পর্শ করেছে কবিদের, অন্তত ভাষার অবচেতন সংবেদ্যতায়, তার অনুসন্ধানই এ-প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২

জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে দেখা যায় এই সত্তরের দশকেই ক্রমশ বিষ্ণু দে-র অক্লান্ত কলম শারীরিক অসুস্থতায় স্তব্ধ হতে বসেছে। অবশ্য তার আগেই বাঙলাদেশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রেরণায় 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়'-এর মতো দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২-এ। তার আগুপিছু অনেক কবিতাই 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে' বা 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'-তে। কিন্তু ১৯৭৫-এ প্রকাশিত 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' এবং ১৯৭৭-এ 'উত্তরে থাকো মৌন'-তে আশা-র যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মরিয়া উচ্চারণ তার মধ্যে সেই সমগ্রতা ও সংসক্তির বোধ আর নেই, যা বিষ্ণু দে-কে একালের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আমাদের মনে অক্ষয় করে রেখেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, তিরিশের আরেক কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র মৃত্যুর আগে, জর্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘুরে এসে যে দীর্ঘ রঙ্গরসে-বক্রুতায়-প্রত্যয়ের উচ্চারণে উপভোগ্য ভ্রমণ-কবিতাটি লিখেছিলেন, তা বেরিয়েছিল ১৯৭৬-এর 'পরিচয়' সাহিত্য-সংখ্যায়। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থও বের হয়েছে, বের হয়। কিন্তু এতকালের প্রবাসী এই কবির কাছে আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু আর পাই কই? বিমলচন্দ্র ঘোষও বোধহয় তেমন আর বিশেষ লেখেন না।

ফলে, শুরু করতে হয় অরুণ মিত্র-কে দিয়েই। বয়স সত্তর পার করেও কবিতায় এখনও যিনি অজর। খুব বেশি যে তিনি লেখেন, তা নয়। সেই সত্তরের গোড়ায় বেরিয়েছিল 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে', আর ১৯৭৮-এ 'শুধু রাতের শব্দ নয়'। কিন্তু সব সময় মনে হয় তিনি খুব কাছে আছেন। এমন কারো কারো মনে হতেও পারে বই দুটোতে কণ্ঠস্বরের তফাৎ খুব বেশি নেই। ঠিক একই ভাবে আপনজনের সঙ্গে কথা বলার অন্তরঙ্গতায় তিনি সুখদুঃখের

কথা বলেন, আর তাঁর নিজের সুখদুঃখ দেশকালেরও সুখদুঃখ। আর এ সহজ করে বলা কথার মধ্যেই যে দুরন্ত কিন্তু চাপা আবেগ আছে, তা থেকেই অনিবার্যভাবে উঠে আসে তাঁর কবিতায় আলঙ্কারিকতা—প্রত্যেকটি শব্দে প্রত্যেকটি বাক্যে ইশারা, একটি উপমার পরে আরেকটি উপমা। মনে হয় যেন উপমাতে-উপমাতেই তিনি গেঁথে তুলছেন তাঁর কবিতার কাঠামো। তাই 'সে তো পাল তুলে নৌকো ভাসিয়ে যাওয়া', 'হাওয়াঘরের উপরে মোরগটা ঘুরছেই', 'ঘাসমাটি পার হলেই বাঁশঝাড়', 'থরে থরে ফলে সব্জিতে মারাত্মক রঙ'—কবিতার এই সব নিরীহ সূচনার প্রত্যেকটিই যে রূপক তা আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝে নিই। আর সেই রূপকের সঞ্চিত আবেগ প্রায়শই তাঁর কবিতাকে করে তোলে আলঙ্কারিক।

> লক্ষ লক্ষ শিশু
> ফুটপাথ ছাড়িয়ে ভাঙা রাস্তায় পা দিতে
> না দিতে পাখনায় থর থর…
> তখনই সন্ধের ফুল ফুটে ওঠে
> গড়িয়াহাট ছলাৎছল নদীর পাড়ের
> দোলা নিয়ে নলখাগড়া কাশবন…
> সব গলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বুলার চিৎকারে
> খুশির হাজার লক্ষ ঢেউ……(লক্ষ লক্ষ শিশু)

মাঝে মাঝে কোনো পাঠকের যদি মনে হয়, অরুণ মিত্রের কবিতা কখনও-কখনও আলঙ্কারিকতায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, দানা বাঁধছে না, স্কেচ্ হয়েই থাকছে, পূর্ণাঙ্গ পেইন্টিং নয়, যতটা কল্পনারমাতা আছে, ততটা সংকল্পনা নেই—তবে কি মনে করব সেই পূর্ণতা গড়ে তোলার পক্ষে সময়ের চরিত্র-বিহীন ভঙ্গুরতাই দায়ী? তাই কি মণীন্দ্র রায় পরের পর যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন, সময়ের বিরুদ্ধতা আছে বলেই তাতে তেমন জোর খাটছে না?

মণীন্দ্র রায়ের কাব্যবৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় এক সময়ে পাঠকের কাছে প্রতিভাত ছিল, তা হল সামাজিক অন্বয়ের আবেগ প্রকাশে এক ধরনের ঋজুতা ও সংযম। কেউ কেউ বিষ্ণু দে-র প্রভাবের কথাও বলতেন। কিন্তু সত্তর-দশকে তিনি পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ কাব্য রচনা করলেন এবং এই রচনাগুলির জন্যই এই দশকে তিনি বিশিষ্ট। 'স্বাধীন কিশোর ও মানুষ…মানুষ' (১৯৭১) এবং 'আমাকে বাঁচতে দাও / আমাকে জাগতে

দাও' (১৯৭৫) গ্রন্থ দুটিতে পূর্বযুগের ঐ সংযম ভেঙে কবিতার ভাষায় হয়ে উঠলেন উচ্ছ্বসিত—লাইনের পর লাইনে প্রকাশ পেল বাধাবন্ধহীন বহুবর্ণ আবেগ। পুরাণের আধুনিক রূপায়ণে তিনি প্রকাশ করলেন একালের হাহাকার, বিদ্রোহ ও স্বপ্ন। প্রথম জীবনের কাব্যভাষা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পরিণত বয়সে তিনি যে কবিতায় অভিজ্ঞতায় ও ভাষায় এই বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইলেন, তাঁর এই প্রাণনাই আমাদের মুগ্ধ করে। তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের খণ্ডতায় ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে এই অনায়াস বিস্তারের পরিকল্পনা একটু আরোপিত বোধহয়। বর্তমানে বিষ্ণু দে-র প্রভাব ঝেড়ে ফেলার কথা উঠলেও, এ-প্রভাব এখনও বোধহয় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'মানুষ… মানুষ' কবিতাটির বহু অংশ, শেষাংশটি তো বটেই, অবিকল মনে করিয়ে দেয় 'সন্দ্বীপের চর', যদিও সময়ের চরিত্র ইতিমধ্যে অনেকেটাই পালটে গেছে—আজ সেই অত্যুৎসাহ কালানুচিত বলেই বোধ হবে। এই সব দীর্ঘ কবিতায় যথারীতি মণীন্দ্র রায়ের কুশলতার ছাপ তো থাকবেই, কিন্তু এর কাঠামোর বা দৈর্ঘ্যের যাথার্থ্য তিনি এখনো পাঠকের মনে গেঁথে দিতে পারেন নি।

অরুণ মিত্র বা মণীন্দ্র রায়ের পাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বরং অনেক ক্লান্ত, বিষণ্ণ। তাঁর আবেগও অনেক গোপন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পথ-চলতি বাগভঙ্গির ব্যবহার, সমাসোক্তির প্রয়োগ এখনও আগের মতোই বজায় আছে। 'একটুও না দাঁড়িয়ে / তার ওপর দিয়ে / লাফাতে লাফাতে চলে গেল / সময়' জাতীয় অভ্যাস এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু সন্দেহ নেই, সত্তরের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ভেতরে-ভেতরে যেন কোথায় একটু বদলে গেছে।

আর সেই বদলটা যে সময়েরই চাপে তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না—সেই 'অদ্ভুত সময়', যখন পুরনো ভিতগুলো বালির মতো ভাঙছে, আর 'আমরা ভাইবন্ধুরা…ভেঙে টুকরো হচ্ছি'। ১৯৭২-এ প্রকাশিত 'ছেলে গেছে বনে'-তে এই অদ্ভুত ভাঙনের সময়েরই কথা। ঐ গ্রন্থেই 'ফেরারি' অংশটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক হঠকারিতার বেদনার্ত পরিণতির কথাই লেখেন—'ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ / অপাপবিদ্ধের দল', 'বলির বাজনা', চারপাশে 'ছেলেধরা'র দল, আর 'বাইশকোপের খেলা'। বিদ্রূপ নয় মোটেই, সহানুভূতিতে ভেজা লাইনগুলো। কিন্তু আবেগও প্রকাশ করেন নি—কারণ আগেই জানি আবেগ গোপন করতেই ভালোবাসেন কবি। এই অভিজ্ঞতার

লেখা সর্বোৎকৃষ্ট বোধহয় 'পাখির চোখ'। কবিতাটি পরের বই 'এই ভাই'-তে (১৯৭৪) আছে। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের মাঠে দেখছেন :

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাইবন্ধুদের মাথা ;
পেছনে
আততায়ী আমার ভাই।

হে সারথী,
রথ এখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো। (পাখির চোখ)

যে ব্যক্তিগত বিষাদ বা অভিমানকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কখনও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি, সময়ের চক্রান্তে দেখা যাচ্ছে এখন তা তাঁকে পেড়ে ফেলেছে। বিস্ময়করভাবে আত্মজৈবনিক মান-অভিমানের কথাও আসছে কবিতায়। কিন্তু এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা বলব না, বলব ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতা যে সেই ব্যক্তিগত প্রকাশই শেষপর্যন্ত হয়ে উঠতে পারছে সময়েরই স্বরলিপি। 'এই ভাই' গ্রন্থে প্রকাশ হয়ে পড়ে সময়ের এই নিঃস্বতার কথা, একটি যুগের ব্যর্থতার কথা, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই।

আপনি মশাই, গেছেন বদলে
বদলে গেছেন, ছি ছি।
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ। (ভাবতে পারছি না)

একি নিজেকে ব্যঙ্গ ? না কি সময়কে ? না কি নিজের কৃত-কে ? কবিতাটি শেষ হয় কিন্তু অভিমানের ব্যক্তিময়তাতেই, যা তাঁর কাছে এতকাল ছিল অভাবিত।

হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাড্যাং ড্যাং।

নিজের বা নিজেদের কৃত-কে এবং তার বর্তমান উত্তরাধিকারকে ব্যঙ্গ করার কথা উঠছে, কারণ তিনিই তো আজ লেখেন :

আমার হাতে তো কুষ্ঠ হয় নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো করে থাকব ! (ছুয়ো)

ফলে, ব্যর্থতার বোধ, নৈরাশ্যের বোধ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যার ছোঁয়া প্রায় ছিলই না—তা এই 'এই ভাই' বা 'একটু পা চালিয়ে, ভাই' (১৯৭৯) দুটি গ্রন্থকেই গ্রাস করে রেখেছে।

কেউ খায় না

শুধু জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সব কিছুই
জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সকলেই

থাকে। (কে যায়)

বনে দাবানল ;
খোলা হাওয়া কোথাও
নেই, কোথাও
নেই। (এই ভাই)

এই ভেবে যায়,
দিন যায়
দিন। (এমনি ক'রে)

রোজই ঘুম ভাঙলে ভাববার চেষ্টা করি
আমি কোথায়। (কোথায়)

এই ছিন্ন ঘুরে-ফিরে-আসা শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কবির দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সময়ের অভিজ্ঞতায় মেলানোর স্বভাব সময়ের চাপেই বোধহয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও মাঝে-মাঝে হারিয়ে ফেলেন। এরকম অভিমান তো আগে কখনো দেখা যেত না—এখন তাঁর কবিতা

তাই 'আজ আছি কাল নেই'। কিংবা 'হাজরা পার্কে সন্ধ্যা কাল' এই বলে যিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ', তিনি এবার লিখলেন,

কেন ডাকো
মন নেই, যাব না সভায়। (যাব না সভায়)

মনে হয়, আশাবাদে যেমন, তেমনি এই নৈরাশ্যেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব বেশি জটিলতার দিকে যেতে চান না। সব সময়ই একটা ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে তিনি সব কিছুকে উড়িয়ে দিতে চান, জটিলতাকেও। মানুষের নিত্যব্যবহৃত বাগধারা কিংবা ছড়া-রূপকথা-কথকতার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাকে তিনি যেমন সহজ-করে-বলায় কাজে লাগান, তেমনি এখানেই থাকে হয়তো অতি-সরলীকরণেরও বিপদ। তবে বিপদই মাত্র, এই বিপদকে পার করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'একটু পা চালিয়ে, ভাই'—ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যর্থতাবোধ-বিষাদ, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, আত্মসমালোচনা কিংবা আত্মবিশ্বাস সব কিছু দিয়ে মোড়া এই অসামান্য কবিতাটি।

সময়ের এই দায়কে মেনে নিয়ে বিশ্বাসকে আঁকড়ে রাখা, কোনো যান্ত্রিকতায় নয়, উচ্চারণের সজীব নতুনত্বে—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সাফল্য যে কতখানি তা বোঝা যায়, চল্লিশের দশকের অপরাপর কবি, যাঁদের সঙ্গে তাঁর নান্দনিক সাযুজ্য দীর্ঘকাল, তাঁদের পরিণতি দেখলে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈরী মন' অবশ্য বেরিয়েছে ১৯৭১-এ, তার অধিকাংশ কবিতাই বেশ কিছু আগে লেখা। তবু প্রথম দিকের সনেটে বোঝা যায় ষাটের দশকেও ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা কত সহজতর ছিল কিন্তু শেষের দিকে ক্রমশই সেই সুস্থিরতা ভেঙে যায়। কবিতার ভেতরে একটা ভাঙচুর অস্থিরতা আসে।

প্রশ্নের প্রলেপ মাখা মুখ
সঙ্গে ছায়ার মতন। ছায়া
এই ট্রামে বাসে
ভিড়ে
একাকী ও ভিড়ে
নৈঃশব্দ্যে চিৎকারে
ভিড়ে

তারপর ভিড় থেকে নৈঃশব্দ্যে একাকী
তারপর নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে ভিড়ে…। (তারপর)

জানি না সময়ের এই আর্তি এবং অন্ধের হাতড়ানোর মতো এই পথসন্ধান এ-দশকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে কোন দিকে চালিত করেছে—পত্র-পত্রিকায় তাঁর পরের কিছু কবিতা চোখেও পড়েছে, কিন্তু কিছু স্পষ্ট হয় নি। অবশ্য যে তাগিদে গোলাম কুদ্দুস কবিত্বের ঝুঁকি নিয়েও সরল ও প্রত্যক্ষ ভাষণের অনুরাগী, তা কখনও চল্লিশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির যে পথ হতে পারে না, তা আমরা বুঝি। এই পর্বে গোলাম কুদ্দুসের গ্রন্থের নাম 'স্বেচ্ছাবন্দী' (১৯৭৪)।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনে হয়, সময়ের এই নিরন্তর বিরুদ্ধতায় দিশেহারা—ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে যে উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে পারলে সময়কে মুঠোয় ধরা যায়, এখন তা তাঁর যেন আয়ত্তের বাইরে। এটা হয়তো তাঁর নির্মল বিবেকেরই পরিণাম—যে কারণে উত্তেজনার উল্টো প্রতিক্রিয়ায় তিনিই আবার অপার ক্লান্তিতে হাল ছেড়ে দেন। সত্তরের দশকে ছোট ছোট কবিতা-পুস্তিকা বেরোলেও, তাঁর ঐ ছোট কবিতাগুলিতে বিষয় ও প্রকরণের কোনো পারম্পর্য যেন থাকে না—কখনো তিনি শুধুই বিধুর ব্যঞ্জনায় কথা বলেন, কখনো প্রায় কবিত্বহীন মন্তব্যে। কখনো ক্রুদ্ধ শ্লোগানকে ভাষা দেন, কখনো জীবনানন্দীয় ধূসরতা। মনে হয় এই অন্ধকার সময়কে ভাষা দেবার জন্যই তিনি অস্থিরভাবে কা খুঁজছেন। তাঁর কবিতা প্রায়শই অসম্পূর্ণ, ছোট এক-একটি স্কেচ। এক সঙ্গে যেন কতকগুলি সুভাষিতাবলি।

চিত্ত ঘোষের বহু দিন পরে প্রকাশিত 'পরবাসী ঘুরে ঘুরে' (১৯৭৯) হাতে পড়তেই মনে হল এ আমাদের চেনা জগৎ নিয়ে লেখা কবিতা। এর স্বরলিপি আমাদেরই অভিজ্ঞতার। কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার কোনো নতুন দীপ্তি নেই যেন এখন। ফলে পুরনো বিষয়, পুরনো ভাষা, আশা-হতাশার পুরনো ডায়ালেকটিককে ভেঙেই তিনি কবিতা লিখছেন। পুরনো ঠিকানা, পুরনো স্মৃতি এই তাঁর সম্বল।

শুধু চিত্ত ঘোষের কবিতাতেই নয়, রাম বসু-র কবিতাতেও চল্লিশের দশকের সেই পুরনো কবিতার আদলটাই খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আবেগের তীব্রতায় রাম বসু তাঁর বলার তাগিদ ও অধিকার আরো স্পষ্ট করে তোলেন। আবেগের একটা ঢোল, প্রায় অন্ধ এবং কখনো কখনো অপরিচ্ছন্ন প্রকাশ পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এবং সেই

আবেগের প্রকাশ প্রকৃতির সংকেতময়তায়। প্রকৃতির ঐ ক্ষিপ্র চকিত ইশারাময় ব্যবহার একদা আমাদের যতটা মুগ্ধ করত, আজ হয়তো পুনরাবৃত্তির ফলে ততটা করে না। রাম বসু-র বিশ্বাসের জগৎ কিন্তু মোটামুটি অনড়ই ছিল—নৈরাশ্যের চিৎকার যতটা তীব্র, প্রায় ততটাই উচ্চকিত তাঁর আশা।

ফিরে আসা তাই ফেরা নয়
যাওয়া
এবং যাওয়াই
বিকাশের দিকে ক্রমাগত। (নদী চিরকাল যায়)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন আবেগকে নিজেই ঠাট্টায় উড়িয়ে দিয়ে হাল্কা চালে কথা বলেন, রাম বসু ঠিক তার উল্টো—আবেগের ঝোঁকে যেন নিজেরই গলা চেপে ধরেন।

রাম বসু-র কবিতায় অতিকথনের অভিযোগ আমরাও তুলেছিলাম। সময়ের এই বিরুদ্ধতায় কবির মনেও প্রশ্ন জাগে: 'নীরবতার কাছে বিশ্বস্ত হবার দিন এসে গেল।' কিন্তু তার পরেই কবি অনুভব করেন:

লতাপাতাগুলো পায়ে শিকলের চেয়েও কঠিন
প্রখর হীরার আভায় বস্তুর অণুতে অণুতে শন্‌শন্ শব্দ
কোন্ অপরিমিতির ওপার থেকে আসছে অলৌকিক ভেলা
আমার বোধের স্তম্ভগুলি থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠছে।
(বুকের মধ্যে কি?)

ফলে কবি চিনতে পারেন 'অবিরাম ডানার বিথারে আন্দোলিত' তাঁর চেতনাকে। বুঝতে পারেন, 'তাই তো এখনো আমার উত্তাপের কথা-গুলো ফুরিয়ে যায় নি।'

এখানে, সমুদ্রের কাছে অবনত হয়েই কবি তাঁর ঐ উত্তাপ, তাঁর ঐ কম্পন, অবিরাম ডানার আন্দোলনকে টিঁকিয়ে রাখতে চান। তাই তাঁর এখনকার কাব্যগ্রন্থের নাম 'সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে' (১৯৭৯)। প্রকৃতি তাঁর কাছে বরাবরই একটা বিরাট জট – ইশারাময়, সংকেতময়, মানুষের আবেগের চকিত প্রতিবিম্ব। এবার যেন একটু প্রশান্তভাবেই তিনি প্রকৃতিকে সরল রূপকার্থে দেখেন, কারণ প্রকৃতির মস্তাজ আর তেমন সাড়া দেয় না।

জটিল জট খুলবো কি করে?...
নদীর কাছে যাই

তারার কাছে যাই
নইলে বলো খুলব কি করে? (তুমি বললে)
এমন বুকের পাটা কার আছে, কে বলবে গভীর বিশ্বাসে
আমি সে-ই
যার স্থির উচ্চারণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে সমুদ্র পর্বত?
(দেরি হয় হোক)

এমনকি রাম বসু-র মধ্যেও হতাশা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে আজ, এবং তা প্রকৃতিরই রূপকে।

আর্তনাদ, মাগো
আজ এই নিরাশ্রিত শূন্যতায়
কোথায় স্নান করে পাবো
নবজাতকের চোখের রঙ
বীজবোনার আতুর গন্ধ
কোথায়
কোথায়? (সে আশ্রয় নেই)

মেঘগুলো জমবার আগে ছিঁড়ে যাচ্ছে
গ্রন্থি সব খুলে যাচ্ছে, স্বর শূন্যের পাঁকে ডুবে যাচ্ছে…
(বিষণ্ন অতিথি)

৩.

চল্লিশের দশকের কবিতার এবং কবিদের বিচারে কোথায় যেন একটু অবিবেচনা ঘটে যায়। তিরিশের দশকের ঐতিহাসিক গৌরব এবং পঞ্চাশের দশকের অহংকৃত আত্মপ্রচার—এ দুয়ের মাঝখানে চল্লিশের দশক সংকুচিত। কিন্তু সত্যিই কি এত কুণ্ঠার প্রয়োজন আছে? স্বাতন্ত্র্য বা চারিত্র্যের অধিকারেই তো এই দশক আমাদের বোধে একটা স্পষ্ট চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়—তার কন্‌টেন্ট এবং ফর্ম সহ। হয়তো তাঁদের আবেগাত্মক ভাবার ঐ গড়ানো একমাত্রিকতা তিরিশের যুগে এবং তিরিশের কোনো কোনো কবির হাতেই শুরু হয়েছিল—কিন্তু সময়ের সঙ্গে এক হয়ে বেজেছিল বলেই তো এত জন কবির মধ্যে এত স্থায়ী হতে পেরেছিল চল্লিশের দশকে। যে সাংগঠনিক সংবদ্ধতায় তিরিশে বা পঞ্চাশে,

দুটি বা তিনটি পত্রিকার সাহায্যে, জীবৎকালেই সে-যুগের কবিদের মহিমাকীর্তন সম্পন্ন হয়, তার অভাবে চল্লিশের কবিরা যেন বিচ্ছিন্ন, যেন উপেক্ষিত। কিন্তু সময়ের দূরত্বে তাঁদের শুধু ঐতিহাসিক নয়, শিল্পগত গুরুত্ব ক্রমশই স্পষ্ট হয়, বিশেষত পরবর্তীকালে যখনই কন্‌টেন্টের চাপ উধাও হতে চায় আমাদের কাব্য-অভিজ্ঞতা থেকে।

চল্লিশের দশকে দেশজোড়া বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনের চাপে যে দায়বদ্ধ কবিতার ধারা তৈরি হল, তার উপযুক্ত ছিল এই ভাষা এবং এই ধারাকে এড়ানো প্রায় এ-যুগের কারোরই সম্ভব হয় নি। যাঁরা এড়িয়েছেন, তাঁরাই মঞ্চ থেকে সরে গেছেন। ঠিক এরকম ঘটনা এর আগে বা পরে বোধহয় আর কখনও ঘটে নি। তথাকথিত কমিটেড্ বা দায়বদ্ধ কবিতা এবং শুদ্ধ শিল্পবাদী কবিতা সমান্তরালভাবে রয়ে গেছে তিরিশে বা পঞ্চাশে—হয়তো বরং বলা যায়, বুর্জোয়া পত্রিকার আনুকুল্যে শিল্পবাদী কবিতার প্রশ্রয় ও প্রচার স্বভাবতই একটু বেশিই, দায়বদ্ধ সমাজসচেতন কবিতাকে অনেক লড়াই করেই টিঁকে থাকতে হয়। চল্লিশের যুগেও এই সমান্তরালতা একেবারেই ঘটে নি এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংশয়হীনভাবে এ-যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছে ঐ দায়বদ্ধ কবিদেরই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, রাম বসু বা সিদ্ধেশ্বর সেনকে দিয়েই সকলের মনে চল্লিশের দশক। তার বাইরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আছেন, কিন্তু কখনই অরুণকুমার সরকার বা নরেশ গুহ বা অরুণ ভট্টাচার্য নন। তাঁরা এ-যুগের নিতান্তই গৌণ কবি।

অবশ্য এই গৌণ কবিদেরও স্বতন্ত্র একটা জমি আছে নিশ্চয়ই। তাঁদের কাব্যগ্রন্থও বেরোয় কখনো-সখনো। এই সত্তর দশকেও বেরিয়েছে—নরেশ গুহ-র 'তাতার সমুদ্র ঘেরা' এবং অরুণ ভট্টাচার্য-র 'সময় অসময়ের কবিতা'—দুটোই ১৯৭৬-এ। অরুণ ভট্টাচার্য তবু তাঁর বিনীত কাব্যসন্ধানে মাঝে-মাঝে নিজের প্রাক্তন খোলস এড়িয়ে সময়-অসময়ের কথা বলেন—তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের মৃদুতায় যদিও তা বেশির ভাগ অগোচর থেকে যায়। আর নরেশ গুহ এখনও বলেন, 'বেশ জায়গা পৃথিবীটা' এবং কবিতা শেষ করেন 'ফুরিয়ে গ্যালো ছুটি' এই বলে। 'বার্তা' কবিতায় নিদ্রিতা প্রেমিকাকে এই খবর দিতেই তিনি ব্যস্ত: 'শরৎকালের নিশান্তে এক / সত্যিকারের চাঁদ উঠেছে।' অরুণকুমার

সরকার বোধহয় এই সময়ের মধ্যে খুব একটা লেখেন নি। এঁদের দলে আরো কেউ কেউ আছেন নিশ্চয়ই, যথা রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী বা শুদ্ধসত্ত্ব বসু। স্বতন্ত্র জমি নিশ্চয়ই, কিন্তু খুব ছোট জমি, শব্দশিল্পের চাতুর্যেই তাঁদের মনপ্রাণ নিবেদিত। পাশাপাশি অরুণাচল বসু, সে-সময়ের জগন্নাথ চক্রবর্তী, মৃগাঙ্ক রায় (১৯৭৯-তে বেরিয়েছে 'তাসের পেখম'), কৃষ্ণ ধর, প্রমোদ মুখোপাধ্যায় বা অসীম রায় (১৯৭১-এ বেরিয়েছে 'আমি হাঁটছি') বিষয়ের মাহাত্ম্যে শুধু নয়, কাব্যভাষাতেও চল্লিশের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত বলেই যেন অনেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—যদিও, সত্তরের দশকে এঁরা কেউ কেউ অল্পবিস্তর লিখলেও, তা পুরনোর জের বলেই যেন আজ আর তত গ্রাহ্য হয় না।

এর মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ব্যতিক্রম। তিনি এই দুই শ্রেণীর কোনোটাতেই পড়েন না। কিন্তু নিছক কবিতার বিচারে তাঁর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। শুনতে একটু বিস্ময়কর লাগবে, কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভাষা ও মেজাজে কিছুটা অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যেন সগোত্র, যদিও উভয়ের নন্দনে ফারাক বিস্তর। হয়তো যতটা ফারাক বাহ্যত বোধ হয়, কখনো-কখনো সত্যিই ততটা নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গলাতেও এখন স্বগত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও বহু কবিতায় দলবদ্ধতার বিরুদ্ধে অসূয়া প্রকাশ করেও, শেষ পর্যন্ত অনুভূতির সততাতেই লেখেন,

> তুমি বিসমিল্লার বিখ্যাত সানাই
> যথারীতি শুনছ, কিন্তু তার ভিতরে ডুব দেবে কী করে
> যদি না সঙ্গতি
> সদরে-অন্দরে ঘটে যায়? যদি
> যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরেও ঝর্ঝর না-ঝরে
> সমস্ত ভাসিয়ে বারিধারা? (ভিতর-বাড়ি)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতোই নীরেন্দ্রনাথও জটিল কথাকে সহজ করে বলার ক্ষমতা রাখেন, হয়তো তাঁর মতো কখনও-কখনও সহজ কথাই সহজ করে। শহুরে বা গাঁয়ের আটপৌরে কথনের চালকে নীরেন্দ্রনাথ অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো নিজের বিশ্বাসে লোকায়তিক গাঢ়তা আনার কাজেই ব্যবহার করেন না, বরং অনেক সময়ই নিজের পালাই-পালাই ভাবকে এই ভাষার সাহায্যেই প্রশ্রয় দেন। কখনো

কখনো তাঁর শুদ্ধ শিল্পবাদকে। যেমন, 'আজ সকালে'-র (১৯৭৮) 'ছবি' কবিতায় গাছের ডালে প্রতীক্ষমাণ শকুন, গাছের নীচে ভূমিশয্যা গ্রহণে উদ্যত মানুষ—কবি মানুষটিকে পরামর্শ দিয়েছেন গাছের অনেক উপরে যে গাঢ়নীল আকাশ ও শঙ্খচিলের ওড়াওড়ি তার দিকেও চোখ রাখতে। শুদ্ধ সম্ভোগের সপক্ষে এই প্রচার সত্ত্বেও নীরেন্দ্রনাথ কিন্তু চলমান জীবনের প্রতি আগ্রহী দৃষ্টিতে এবং সেই দৃষ্টির স্বাভাবিকতাতে জীবনের মমতা-সহৃদয়তা-ভালোবাসার ছবি ফোটাতে পারেন, কখনো কখনো জীবনের নন্দনের দিকটিকেও। আসলে দুটো দিকই আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায়। একদিকে, 'খোলা মুঠি' গ্রন্থের (১৯৭৪) নাম-কবিতাটিতেই লেখেন

> মুঠি খোলো ;
>
> কী আছে গোপন, দেখতে দাও।

উত্তরে বলেন, কিছুই নেই, কিছুই থাকে না, শুধু 'কিছু ধুলো, কিছু বালি, কিছু-বা শুকনো পাতা-ঘাস'। অন্যদিকে 'ধাক্কা' কবিতায় 'কেউ কি কাউকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারে ?' এই পথ-চলতি শোনা কথাকে গড়িয়ে-গড়িয়ে নিয়ে যান।

> হা ভগবান, কার অনিচ্ছার ধাক্কা খেতে খেতে
>
> কোথায় থেকে
>
> এ কোন জাহান্নমে আমরা চলেছি।

মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়া' গ্রন্থের 'ভিড়' বা 'রাস্তা'। তবে এ-ধরনের দেখাশোনার কথার সহজ চাল থেকে অভিজ্ঞতার গভীরে চলে যাওয়া এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরই স্বধর্ম।

তবু, নন্দনের এই অনির্দিষ্টতা নিয়ে, চল্লিশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের একজন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নন, কিন্তু নিশ্চয়ই সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আরেকজন সিদ্ধেশ্বর সেন, চল্লিশের উপান্তে যাঁর স্থান। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের আত্মপ্রচারক কবিরা যে চল্লিশের কবিদের খর্বতার কথা বলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধেশ্বর সেন চল্লিশেরই কবি এবং সিদ্ধেশ্বর সেন ও শঙ্খ ঘোষ, তাঁদেরও সমকালীন পর্বের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ দুই কবি চল্লিশের উত্তরাধিকারকে বহন ও সম্প্রসারণ করেই তাঁদের স্বকীয়তায় পৌঁছেছেন। চল্লিশের দশকের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি হতে পারে!

৪

চল্লিশের দশকের ঐ গৌরবময় যুগেই সিদ্ধেশ্বর সেন তাঁর কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন—চল্লিশের শেষ পর্যায়ের কবি রূপেই তিনি চিহ্নিত। অথচ গোড়া থেকেই তিনি প্রায় স্বতন্ত্র। আধুনিক কবিতার জমিতে সিদ্ধেশ্বর সেন প্রায় একটা সমস্যার মতো। এক দিক থেকে মনে হয় তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' কবিদের মতোই তাঁর নিমগ্ন শব্দ সাধনা—অন্যদিকে তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন, প্রতিটি যতি ও ছেদচিহ্ন সময়চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সময়চেতনায় নিমজ্জিত। চল্লিশের সমস্ত কবিদের মধ্যে বোধ হয় তিনি এবং অগ্রজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এই দুজনেই চল্লিশের বাগধারাকে ছাড়িয়ে নিজেদের বদলে-বদলে নিয়েছেন সময়ের সঙ্গে। তুলনায় সিদ্ধেশ্বর সেনের চ্যালেঞ্জ আরো বিরাট। তিনি দুই অসম্ভবকে মেলাতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। একদিকে সমাজসচেতনতার আপোসহীন দায়, অন্যদিকে শিল্পের শুদ্ধতার দায়—এই দুইকে সমান মর্যাদা দানের সাফল্য যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যেভাবে এসেছে তাঁর কবিতায়, তা অসামান্য বীরত্বব্যঞ্জক। ফর্মের দুরূহতার চর্চার মধ্য দিয়েই কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সেন এই অন্বয়কে সম্ভব করেছেন। 'আমার মা-কে' দিয়ে যে যাত্রারম্ভ আজ সত্তরের দশকের শেষ বছরটিতে এসে 'ঘুঙুর' পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার নানা উত্থান-পতন, পরীক্ষা ও প্রগতি গভীর অভিনিবেশ দাবি করে। নিঃসন্দেহে সিদ্ধেশ্বর সেন দুরূহ কবি। সামাজিক-রাজনৈতিক দায় সত্ত্বেও ফর্মের যে দুরূহতা আমাদের পরিবেশের ট্র্যাজেডিতে অবশ্যম্ভাবী, তার দৃষ্টান্ত এখানেও।

অবশ্য সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার ফর্মেরও একটি ধারাবাহিকতা ও প্রগতি আছে। 'আমার মা-কে' থেকেই। শব্দকে, বাক্যকে, উক্তিকে আলগা করে দিয়ে আমাদের অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের স্বরূপকে যেন তিনি আরো প্রত্যক্ষ-গোচর করেন। তাঁর কবিতার ছেদচিহ্ন পর্যন্ত যেন অস্তিত্বের দ্বিধাকেই স্পষ্ট করে। এই দ্বিধা, এই শ্লথ গতি, নিজেকে টান টান করে ছড়িয়ে দেওয়া কিন্তু শেষপর্যন্ত সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় ধৈর্যের উপমান—বিপ্লবীর যে দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য অসহিষ্ণু নাটুকে সন্ত্রাসবাদী উত্তেজনার পাশে হাতে-হাতে বাজারদর পায় না, কিন্তু ইতিহাসের পরিণতির অপেক্ষায় থাকে।

এই 'নির্বিকার' কবির প্রেরণাতেও জোয়ার-ভাঁটা আছে। আজও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বই বেরোল না—ফলে এই ওঠাপড়া আমাদের কাছে তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু ষাটের দশকেও দেখেছি, সত্তরেও, কোনো একটি ধাক্কার জন্য

যেন কবি অপেক্ষা করে থাকেন। সে ধাক্কা হয়তো সব সময় বাইরের নয়; সব সময় জানাও যায় না—শুধু তাঁর কবিতা থেকেই প্রমাণ করা যায় কোনো এক প্রেরণার বশে তাড়িত হয়েই যেন তিনি কবিতাগুলি লিখছেন তাঁর ঐ সৃষ্টিসুখের সময়টিতে। ১৯৭৫ অবধি বোধহয় একটু ভাঁটার টানই ছিল। যদিও ১৯৭১-এ বাঙলাদেশের ঘটনায় 'সে' নামে অসামান্য কবিতা একটি লিখেছেন ('পরিচয়', বাঙলাদেশ সংখ্যা, ১৩৭৭-৭৮)—'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' চরণটি পাক-ফৌজিগুলিতে ঝাঁঝরা হওয়ার কাহিনী শোনাতে গিয়ে তাঁর কবিতাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যেখানে। ১৯৭৫-এর 'পরিচয়' শারদীয় সংখ্যায় 'দখল'। আর তারপর ১৯৭৬-এর শারদীয়তে 'অগুরু, ধর্মের মতো সনাতন'।

১৯৭৬-এ দাঁড়িয়ে আমাদের সব কিছুই তো শ্মশান—আমাদের রাজনীতি, আমাদের আদর্শ, আমাদের কার্যকলাপ সব কিছুরই তো শ্মশান-পরিণতি। বিচার-পুনর্বিচারের মধ্য দিয়ে যে পুনরুত্থান, তার শুরু শ্মশানযাত্রা থেকেই। কোনো সর্টকাট নয়, কোনো ভুঁইফোড় সূচনা নয়। শ্মশানের দীর্ঘ পথযাত্রা ও শ্রম, শ্মশানের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, তারপর শ্মশানের এই ছাই উড়িয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে হাতে লোহা ও আগুনের তাপ ছুঁয়ে ফিরে-আসা—এর মধ্য দিয়েই চিত্তশুদ্ধি। 'অগুরু, ধর্মের মতো সনাতন' কবিতাটিতে তাই বিলাপ নয়, শ্মশান-অনুষ্ঠান থেকেই নতুন ব্রত ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে চিরজীবিত মানুষের যাত্রারম্ভ। জীবনের দিকে। শ্মশানযাত্রীর আচার-অনুষ্ঠান বর্ণনার বিশদতায়, গাম্ভীর্যে ও ইঙ্গিতময়তায় চৈতন্যের উদ্বোধন কোন গহন নিদ্রাতুর অন্ধকার থেকে—এতে নতুন লড়াইয়ে প্রস্তুত মানুষের ব্রতের রূপক আরো স্পষ্ট হয়—শ্মশানের ছাই থেকে যার যাত্রা শুরু।' 'এই-ই তবে শূন্যতার শুরু।' কিন্তু কবি জানেন, ইতিহাসের শিক্ষায়, শূন্য শুধু শূন্য নয়। এই জানাটা কবিতার পরিব্যাপ্ত। পাঠকের মনে তাকে সঞ্চারিত করে দেওয়াটাই এই কবিতার দায়। বিলাপ ও আত্মকরুণাকে বাদ দিয়ে আমাদের সময়ের ট্র্যাজেডি ও তার উত্তরণ যেভাবে পৌঁছেছে এ-কবিতায় তার তুলনা নেই।

এই ভাবাবেগেরই তুঙ্গে সিদ্ধেশ্বর সেন ১৯৭৯-র জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে যে পরপর কয়েকটি কবিতা লেখেন, তাই, আমাদের পরম সৌভাগ্য, 'ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড়' নামক ছোট পুস্তিকাটিতে পেয়েছি। ছোট মানুষের ঘরোয়া স্নেহসিক্ত বর্ণনায় আবহমানের অভিজ্ঞতা, ভিড়ের মধ্যে আলুগা হয়ে পড়ার ঘোরে আদি রূপ-এর স্মৃতি, মানুষের

ঘাট-আঘাটায় চলাফেরা করতে করতে দেখতে-দেখতে মহাজাগতিক বিশ্বের স্বপ্ন—এই সব অসামান্য অভিজ্ঞতার পুঁজিকে তিনি কবিতার শীর্ষে পৌঁছে দেন।

'মাতৃকা' কবিতাতে আমাদের চিরচেনা বাংলার মেয়েটি, কিন্তু হয়তো অচেনাই, যাকে আমরা বিষ্ণু দে-র কবিতাতে পেয়েছি নানাভাবে, এখন একটু অন্যভাবে পেলাম এই কবিতায়। দূরে, কাছে, সামান্য ঘাড়-হেলানোয়, মুখের আদলে, চিবুকে, কাঁধের ঢালের পিছলে, পাতলা ঠোঁটের করুণায় ও মমতায় কবি যেন মাতৃমূর্তির কাঠামো থেকেই এক-মেটে দো-মেটের পূর্ণায়ত রূপ দেখেন। একটি মাত্র জিজ্ঞাসায় এই মাতৃ-মূর্তির গড়ে-ওঠা হয়ে যায় আমাদের বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নেরও প্রতীক :

কোন্ সংস্থান বদলে নিলে, কীভাবে
মেয়েটির
আদিরূপ স্পষ্ট হবে

শুধু তার
মুখের ডৌল চোখের দীঘল নয়
মনেরও ভঙ্গির রেখা

খানিকটা বাহুল্য
ছেঁটে ফেলে…

এই বাহুল্যবর্জনের, চিরকাল যাকে জেনেছি কম-কথার যাদু বলে, তার প্রত্যক্ষ রূপ সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায়—অথচ তার জন্য তাঁর চুদায়কে করতে হয় না শব্দের কুহেলিঢাকা বা তাঁকে চলে যেতে হয় না বক্তব্যহীনতার ধূসরতায়। ভাষার একমাত্রিক নাটুকে প্রগলভতা এড়িয়েছেন, ভাষাকে করেছেন নানার্থব্যঞ্জক ইশারা-ইঙ্গিতে ভরপুর। কিন্তু কম-কথা তাঁকে গুপ্তিমন্ত্রে নিয়ে যায় নি। সমাজের জীবনের বাস্তবের ব্যাপ্তিকে, তার টানাপোড়েনকেই ধরেছেন ভাষার এই ছড়ানো-গোটানো বহুমাত্রিক নকশায়। এই ব্যাপ্তিই ফুটে উঠেছে কখনো ছোট কবিতার স্বল্প ভাষণে, কখনো 'ঘুঙুর'-এর মতো দীর্ঘ কবিতার প্রলম্বিত অনিবার্যতায়। দীর্ঘ কবিতা রচনার ঝোঁক সিদ্ধেশ্বর সেনের বরাবরের। তাঁর দীর্ঘ কবিতা জোর করে তৈরি-করা ফ্যাশন বা অভিনবত্ব মাত্র নয়—যেমন অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে—এর তাগিদটা একেবারে ভেতর থেকে—এর আকাঙ্ক্ষা অনেক বড়। 'ঘুঙুর'-এ

আমাদের ইতিহাস, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, দুঃখ ও গৌরব প্রায় এপিক-এর কব্জিজোরে প্রতিভাত হয়—বিষ্ণু দে-রই মতো, এমনকি 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-ও মনে পড়তে পারে, সচেতনভাবেই মনে হয় সেই কাঠামোকে ব্যবহার করে তিনি কোথায় যেন সম্পূর্ণ আলাদা হয়েও যান। এরই নাম ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা। কখনও-কখনও এমনকি বিষ্ণু দে-র ভাষা, তাঁরই মতো গতি ও যতির বুননে আবেগ, প্রকাশ করেও তাকে আলাদা করে দেন আরো বেশি অন্তর্লীন তির্যকতায় ও শব্দের ধ্বনির বহুমাত্রিকতায়। এ কবিতাতেও, শোনা যায়, নিশি-পাওয়া পাথরে-মাথা-কোটা বিশৃঙ্খল অতীত ও বর্তমানের ব্যর্থ পরিবেশে অস্পষ্ট, ক্ষীণ, হয়তো তত সজ্ঞান নয়, কিন্তু নিশ্চিত, ঘুঙুরের শব্দ—যা কখনই স্তব্ধ হয় না। ইতিহাসের মুক্তি সেখানেই। কবি তাকেই চিনে নেন জীবন থেকে উৎসারিত প্রাণের ছন্দরূপে, রূপান্তরিত করেন বিপ্লবীর মুক্তির ছন্দে।

শঙ্খ ঘোষের শুরুও কিন্তু ঐ চল্লিশের দশকের ঐতিহ্য-ধারায়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'-কে বিষ্ণু দে-মঙ্গলাচরণ-অরুণ মিত্র-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জমিতেই ভালো চেনা যায়—স্বতন্ত্র অবশ্যই। প্রকৃত মৌলিকতা তো এভাবেই আসে। এর দীর্ঘকাল পরে বেরোয় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নিহিত পাতালছায়া'—ষাটের দশকে। মাঝখানে দু-বছর তিনি প্রায় লেখেনই নি। এ-সময় থেকে তাঁর কবিতার মেজাজেরও বদল ঘটে যায়। কবি যেন কোন অভিমানে 'ভুল মানুষের অরণ্য' থেকে দূরে সরে যেতে চান। কথার প্রগল্‌ভতা থেকে নৈঃশব্দ্যে। এ শুধু তাঁর নান্দনিক তত্ত্ব নয়, কবিতাতেও তিনি যেন আড়াল গড়ে তুলতে চাইলেন। বোঝা যায়, সামাজিক-রাজনৈতিক নানা বিভ্রান্তি ও উগ্রতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা এই অন্তর্মুখিনতায়। সরলমতি বিশ্বাসের থেকে আলো-অন্ধকারের জটিলতায় এই মুখ-ফেরানো, এই ভিতরের টান নিশ্চয়ই তাঁর কবিতাকে দীপ্র করেছিল। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম কবিতায়, শুধু বর্জন নয়, গ্রহণও, শুধু বৈরাগ্য নয়, সংরাগও।

ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে এসে কবিকে আমরা সেভাবেই পেলাম। 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (রচনাকাল: ১৯৬৭-৬৯। প্রকাশকাল: ১৯৭৮)। তারপরে সত্তরের দশকে একে-একে 'আদিম লতাগুল্মময়'

(১৯৭১), 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়' (১৯৭৪), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬)। বোঝা গেল, 'নিহিত পাতালছায়া'র ঐ আত্মসংবরণ আসলে অন্তর্মুখী প্রতিবাদই। কবিতার অবয়বে যে রহস্যধান ও অস্বস্তিকর নীরবতা তা আসলে মধ্যন্তর মাত্র। সেটা না জানলে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের ঐ চলন তো অসম্পূর্ণ বোধ হবেই, বিশেষ করে যে পাঠক বর্জন ও গ্রহণের, সংকোচন ও প্রসারের ঐকতান আকাঙ্ক্ষা করেন মহৎ কবিতার স্বভাবে।

এর পরের যুগেও বিশ্বাসের সারল্যে বা প্রগল্ভতায় কবি গা ভাসিয়েছেন এমন নয়। স্বভাবের যে সংকোচ আগে ছিল, এখনও আছে। কবি এখনও জানেন, আমাদের বানানো জগৎ, আমাদের সহজ স্বপ্ন প্রতারক, 'তুমি তো তেমন গৌরী নও'—কিন্তু ভিখারি হয়ে সেই আগোসের বা বাস্তবের গৌরীর যে সন্ধান, তার দায়কে অস্বীকার করেন না। আগের অভিমানে ও আত্ম-সংকোচনে ছিল বোধহয় খানিকটা প্রত্যাখ্যান, শুধুই প্রত্যাখ্যান, কিন্তু এখন তার মধ্যে সঞ্চারিত আত্মসমালোচনা ও মমতাও, শুধু দোষারোপ নয়। কবি এখনও বলেন, 'নিঃশব্দ বুকের মধ্যে ধরা', কিন্তু, 'পুনর্বাসন' কবিতায় যেমন, নিজেকে প্রাসঙ্গিকতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেন—সঞ্চরমান প্রত্যক্ষের আসক্তিতে জ্বালিয়ে নেন 'প্রতিদিনের পুনর্বাসন'। জানি না, যাকে উত্তরণ বলে ভাবার চেষ্টা হচ্ছে, তা আমাদের স্বকপোলকল্পিত কিনা। কিন্তু ১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' এ-কারণেই বর্তমান আলোচকের অতি প্রিয় গ্রন্থ।

> কখনো-বা মনে হয় সরে যাওয়া ততো ভালো নয়
> এ সব তো বহুদিন হলো।
> ওরা যে ঝড়ের দিনে অপমানে-শাপে
> আমারই দুহাতে রাখে হাত
> ওরা যে আলোর দিনে ঘৃণাভরে তুলেছে ইস্পাত
> পরস্পর দেহে…
> এইসব ক্ষতি সে তো আমারই দেহের ক্ষয়, আজ মনে হয়
> প্রতিশ্রুত শেষ ভালোবাসা (কখনো-বা মনে হয়)

কবি অভিমানে ঔদাসীন্যে এতকাল পথে-পথে ঘুরছিলেন, এখন ঘরে ফিরতে চান—কেননা কবির নিজের ঘরের মধ্যেই সকলের ঘর-খোঁজার চাবি 'আমি যদি এতই অশুচি তবে পথিকেরা আজও কেন জল চায়/আমার দুয়ারে?' সিদ্ধেশ্বর সেনের মতো শঙ্খ ঘোষও তাই

শ্মশান-ফেরার আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেন আত্মশুদ্ধি ও পুনরারম্ভ চান।

ঘরে নেবার আগে
একবার ছুঁতে দাও লোহা, আগুন।

সবার মুখ সন্দেহ করে করে কেটেছিল দুপুরের পথ…

দীর্ঘ উপবাসী দিন ধূলিভস্ম শরীর শ্মশান
ঘরে নেবার আগে
একবার হাতে দাও লোহা, আগুন। (শ্মশানবন্ধু)

সিদ্ধেশ্বর সেনের 'অগুরু, ধর্মের মতো সনাতন' কবিতাটির সঙ্গে আশ্চর্য মিল, অথচ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি কবিতা। শঙ্খ ঘোষের কবিতাটি অবশ্য অনেক আগে লেখা। তবে তাঁর কবিতার বাক্‌প্রতিমায় যা বলা হয়েছে, সিদ্ধেশ্বর সেন তাকেই প্রকাশ করেছেন মহাকাব্যিক নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রায় অ্যালিগরির বর্ণনা বিস্তারে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতার আবহে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সব সময় একটা ধ্বনিত হচ্ছে। কিসের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ, এই প্রতিবাদ? আমাদের পরিপার্শ্বের যে ক্ষয়, আমাদের চিন্তার ও জীবনযাপনের যে যান্ত্রিক সরলীকরণ ও বিকৃতি, তা-ই প্রতিপক্ষ এই কবির। এ-বিক্ষোভ কোনো ব্যক্তিগত অভিমান নয়, অন্তত তাঁর কবিতায়। পরিবেশের স্বধর্মচ্যুতির বিরুদ্ধে, রুচির চূড়ান্ত বিকারের বিরুদ্ধেই তাঁর এই বিরতিহীন ক্ষোভ। তাঁর কবিতায় অবিরলভাবে এই থিম, শুধু এই থিম। এ থেকে তাঁর কখনো কোনো পরিত্রাণ নেই। সে দিক থেকে শঙ্খ ঘোষ আদ্যন্ত রাজনৈতিক ও দায়বদ্ধ। মনে পড়ে যায়, 'অন্বিষ্ট'-র যুগে, 'অন্বিষ্ট' কবিতাতেই তো, বিষ্ণু দে-ও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকারের ও বিচ্যুতির এই ক্ষোভকে, এমনকি কখনো-কখনো সেই সূত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভকেও, পরোক্ষরূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকের ঐ ক্ষোভ সত্তরের দশকের সর্বগ্রাসী সর্বনাশের পাশে এক-হিসেবে দাঁড়াতেই পারে না। তাই ব্যক্তিগত ও কালগত সংকটের মুহূর্তেই বিষ্ণু দে উদ্দীপ্ত হয়ে লিখতে পারেন সাতরঙা সিমফনির কথা। কিন্তু আজ আর সেই ত্রাণটুকুও নেই। এখন শুধু সারা শরীরে বিষ।

সত্তরের দশকে আমাদের দলীয় রাজনীতির বিভেদ, আত্মকলহ, অর্থহীন মারা এবং মরা চারিদিকে আরও অন্ধকার হয়ে এল—'দশকের পর দশকের

সব সমর্পণ'—তখন কবির তিক্ততা বিদ্রূপের রূপ নেয়। 'আদিম লতাগুল্মময়' গ্রন্থের 'দল' অংশে সে-রকম অনেক কবিতা। তার পরের গ্রন্থ 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'-তেও। বেদনা ও বিক্ষোভ অনিবার্যভাবেই ভেতর থেকে বাইরে এল ব্যঙ্গের চেহারায়। কখনো কখনো সেই বেদনাকে আরো সংহত করেন মিতভাষণে, প্রায় নিঃশব্দ চরণে—কিন্তু সেখানেও লেগে থাকে যন্ত্রণার রক্তচিহ্ন। পালিয়ে যাওয়ার কথা এখানেও উঠেছে, কিন্তু শব্দের ছন্দের অভিজ্ঞানেই চেনা যায় এ পালানো নয়, এ ফিরে-আসাই।

বড়ো বেশি দেখা হলো যা-দেখার পাপে শরীরের
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে যায় ত্রাণহীন নিরন্ধ্র কালিমা।…
ছিন্ন করে নাও ছিন্ন অন্ধ করে দাও দুই চোখ
বড়ো বেশি দেখা হলো ধর্মত যা দেখা অপরাধ।

(বড়ো বেশি দেখা হল)

পাশ্চাত্য পুরাণের আধুনিক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এ আসলে চক্ষুষ্মানেরই বিলাপ, মৃত্যুর শ্মশানে দাঁড়িয়ে জীবনের কবিতা।

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে, জীবনের…
আর সবই শহরের কবিতা, কেবল এইটে প্রান্তরের।

(গঙ্গাযমুনা)

'বাবরের প্রার্থনা'-য় এরই সঙ্গে আরো জোরালোভাবে আছে জরুরি অবস্থায় স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। খুবই তিক্ত। খুবই শাণিত। ঔচিত্যেরও কোনো ফাঁক নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হয়, যে কবি সহজ আশাবাদে কখনও গা ভাসান নি, তিনি কেন সহজ বিদ্রূপের মনোহরণে স্বস্তি পান সাময়িকভাবে? আমরা বরং খুঁজে নিই এ-গ্রন্থ থেকে যৌবনের সমূহ পরাভবের মুহূর্তে কবির প্রার্থনা :

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক। (বাবরের প্রার্থনা)

৬.

শঙ্খ ঘোষ পঞ্চাশেরই পুরোধা কবি—আগেই বলা হয়েছে, চল্লিশের ধারাতেই তাঁর কাব্যচর্চার শুরু। কিন্তু চল্লিশের ঐতিহ্যকে ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

নন্দনে কবিতা লেখা শুরু করলেন, যাঁরা নিজেদের কৃত্তিবাস-গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করতেন, সেই পঞ্চাশের দশকের বহু কবি। তার বাইরেও পঞ্চাশের অনেকেই আছেন। হয়তো মনে হতে পারে, কৃত্তিবাস-গোষ্ঠী সংঘবদ্ধতা ও প্রচারের জোরে যতটা ঐ দশককে অধিকার করে আছেন, ততটা তা তাঁদের প্রাপ্য কিনা। যে প্রবল কোলাহল ও আত্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা সোরগোল তুলেছিলেন, তা কালের নিয়মে অনেকটাই অবসিত—ঐ নাটকের অনেক 'বিদ্রোহী' কুশালবই আজ ধীরস্থির, হিসেবী, আত্মস্থ—এমনকি তরুণতরদের চোখে 'এস্‌টাবলিশমেন্ট'। এমনকি তাঁদের রাগী, বিদ্রোহী ভাবটা কেটে গেলে দেখা যায় তাঁরা আসলে মনেপ্রাণে জাত রোমান্টিক—শুদ্ধ লিরিক রচনাতেই তাঁদের আগ্রহ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্ট সেন্টিমেন্টালও।

কৃত্তিবাসী বিদ্রোহে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গী ছিলেন অনেকেই—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, উৎপলকুমার বসু ইত্যাদি। এঁরা যে মেজাজে এক বা কাছাকাছি ছিলেন এমনও নয়। কিন্তু একই সঙ্গে এঁরা উল্লেখিত হন, হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে নয়।

পঞ্চাশের দশকে তো বটেই, এমনকি ষাটের দশকেও তাঁদের গ্রন্থের সংখ্যা গুটি কয়েক। মেজাজে তখনও পঞ্চাশের গুঞ্জন আছে কিছু কিছু। ১৯৬৯-এও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বন্দী, জেগে আছো' গ্রন্থে লিখেছিলেন :

> কাঁচের চুড়ি ভাঙার মতোই ইচ্ছে করে অবহেলায়
> ধর্মতলায় দিন দুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।...
> ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করি এবার পৃথিবীটাকে
> মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
> আমার কিছু ভাল্লাগে না। (ইচ্ছে)

আর তার কিছু আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লেখেন তাঁর বিদ্রোহী দুষ্টুমিতে ভরা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' এবং কিছু পরে 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' গ্রন্থের (১৯৭২) একটি কবিতায় ঘোষণা করেন, কবিতার সত্যকে তিনি কিভাবে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে দুগালে থাপ্পড় মেরে এবং আরো নানাবিধ শাস্তি দিয়ে কবিতার সত্য থেকে মুক্ত হয়ে মিথ্যের বাতাস হয়ে উঠলেন।

সত্তরের দশকে কৃত্তিবাসী বিদ্রোহীদের, বিশেষ করে সুনীল-শক্তির, ঘন ঘন বই বেরোতে লাগল। কবিতার মেজাজেও তাঁরা যেন বয়ঃপোচিত-

ভাবে অনেক আপোস মেনে নিতে থাকলেন। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার নতুন সম্পাদকীয়তে পরবর্তী কবিদের সম্পর্কে লেখেন, 'কবিতা লেখা অত্যন্ত সহজ, এ ধারণা তৈরি করেছে এরা—যার কুফল আমাদেরও ভুগতে হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আগ্রহ সুলভ উদারতা নিয়ে এদের আহ্বান না করলেই ভালো হতো। দায়িত্ববোধ নয়। আত্ম-শ্লাঘা, অবিনয়, প্রচলিত ব্যবস্থায় অনাস্থা ইত্যাদি মনোভাব এই অর্বাচীন দল সক্ষম হবার পূর্বেই রপ্ত করেছে। মৌলিকতা হারিয়েও চল্লিশের কবিরা আমাদের কাছে কিঞ্চিৎ সম্মান পেয়েছেন, এদের কাছে আমরা তার এক শতাংশও পাব না।' অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিছু কিছু পূর্বলক্ষণ অবশ্য পঞ্চাশের কবিরা এই সত্তরের দশকেও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন না। যেমন নারীশরীরের ব্যাপারে আচ্ছন্নতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এখনও লেখেন :

চোখের নিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী···। ইত্যাদি

(প্রবাসের শেষে)

বোঝা যায়, 'আমার স্বপ্ন' গ্রন্থের (১৯৭২) 'আমার কৈশোর' কবিতায় সুনীল দাবি করেছেন যদিও যে তাঁর কৈশোর কেটে গেছে, কিন্তু সত্যিই কেটেছে বলে মনে হয় না। কারো কারো কাছে কৈশোর তো চিরস্থায়ী। তা না হলে কেন এখনও তিনি প্রায় অবিকল আদি বুদ্ধদেব বসু-র সারলে, বলবেন, 'ভালোবাসাকে ভালোবেসেছি / আমার কোনো ভয় হয় না', কিংবা নারীর 'ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্যরাতে'?

এরকম বহু লাইনই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন এখনও, প্রায় কৈশোরক স্মার্টনেসে :

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করিতে পারি?

(সত্যবদ্ধ অভিমান)

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াব
আমি বিষপান করে মরে যাবো। (যদি নির্বাসন দাও)

এতৎসত্ত্বেও মানতেই হবে, শরীরের ব্যাপারে অকারণ বাড়াবাড়ি আছে বটে, কিন্তু হয়তো আবার সেই গুণেই, সুনীলের বহু লিরিক, যেমন নীরা-বিষয়ক কবিতাগুলি নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবেই স্মরণীয়। 'জাগরণ হেমবর্ণ'-তে

(: ৯৭৪) এরকম জ্যান্ত, আধুনিক বেশ কয়েকটি প্রেমের কবিতা পাওয়া গেল। এসব কবিতাতে সুনীলের শব্দ ও বাক্-প্রতিমার অভিনবত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু বোঝা যায় না 'নীরা'-র স্রষ্টা কেন নারীত্বের শুধু একটি দিককেই প্রকাশ করে ক্ষান্ত? অবশ্যই যৌনতার ঐশ্বর্যকে বাদ দেওয়ার ব্রাহ্ম ছুৎমার্গিতা কবিতায় চাইছি না। কিন্তু নারীর পরিচয় কি শুধু তাতেই? একজন কবির কাছে যদি তা-ই হয়, তবে বলতেই হবে তাঁর জগৎটা খুবই ছোট। যে মেয়ে কাজ করে, লড়াই করে, চিন্তা করে, ভালোও নিশ্চয়ই বাসে, শুধু পটের বিবির মতো বসে থাকে না—যে মেয়ের সন্ধান আমরা পাই বাস্তবে, শিল্পেও—সেই মেয়ে কোথায়? নারী কি শুধু বাসনার ধন, শুধু শয্যাসঙ্গিনী? এত ছোট? হয়তো এটা নিতান্তই সৌন্দর্যবোধের গোড়ার কথা—কোনো কবির কাছে যদি অসংলগ্ন যৌনতাই প্রাধান্য পায়, নারী যদি হয় ভোগ্যপণ্য, সেই সত্যকে প্রকাশ করা যেমন তাঁর পক্ষে চূড়ান্ত কথা, তেমনি সুন্দরের পূর্বোক্ত চেতনাকে কবিতায় সংলগ্ন করে দেখার নিরিখটাও অন্য কোনো কবি বা কোনো পাঠকের কাছে হতে পারে একটা প্রাথমিক শর্ত। এ নিয়ে তর্ক চলে না।

প্রেমের কবিতায় শুধু নয়, সর্বত্রই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা উদাসীন ভাব আছে। আসলে মর্মে মর্মে তিনি তার বিপরীত। হয়তো ওঁর আধুনিকতাও এখানেই। ভাবপ্রবণ, কিন্তু চতুরালিতে তিনি ধরতে চান পরিপার্শ্বকে।

'আমার স্বপ্ন'-তে এমন কতকগুলি কবিতা পাওয়া গেল—যেমন 'রক্তমাখা সিঁড়ি', 'ধাত্রী', 'তিনজন মানুষ', 'সেই ছেলেটি ও আমি' কিংবা 'উনিশ শো একাত্তর'—যেগুলো পড়লে হঠাৎ মনে হতে পারে সময়ের যন্ত্রণা ও উত্তাপকে সুনীলও ধরতে চাইছেন। এই সব কবিতায় অগ্নিগর্ভ সময়, ভ্রাতৃবিরোধের জন্য অনুশোচনা, শ্রমিকের প্রতিবাদ আমরণ অনশনে, এমনকি শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন বিষয় হয়েছে। শেয়ালদা স্টেশনে ভিখিরি বুড়ির মধ্যে নিজের ধাইমা-কে চেনা, দীপ্ত রোখা বালকের 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, কিংবা সুনীল যখন বলেন : 'সাবধান! মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না', কিংবা

চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত,
আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন
এতে কার জয়?

কিংবা যখন 'সেই সব স্বপ্ন'-তে লেখেন : 'কানু, সন্তোষ, অসীমরা জেলখানার নির্মম অন্ধকারে বসে/এখনও সেরকম স্বপ্ন দেখছে'—আর তাঁর ঠিক পাশে একই নিঃশ্বাসে বলেন নীরার উদ্দেশে : 'এত চুম্বনেও তেষ্টা মেটে না'—তখন কিন্তু সুনীলের কথাতে বিশ্বাস হয় না, মনে হয়, তিনি পাঠককে ভোলাতে চাইছেন।

পঞ্চাশের কবিদের যে অবদান বাংলা কবিতায় স্থায়ী হয়ে রইল তা হল তাঁদের ভাষা। বহুবর্ণ বহুমাত্রিক ভাষা। গুরুচণ্ডালীকে তাঁরাই ভাষার শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা কখনও বেপরোয়া, কখনও মৃদু সলজ্জ। সংস্কৃত শব্দের পাশে নিছক চিৎকার-ধ্বনিও জোড়া লেগে যায় শুধু কবিতার কানে। বিভিন্ন ওজনের, মাপের বা মানের শব্দ—শব্দের উচ্চাবচতায়—একটা স্থাপত্য তৈরি করে। এই ক্ষমতা আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পেয়েছি আরো জোরালো ভাবে।

৭

ষাটের দশকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও কাব্যের সংখ্যা ছিল নাম মাত্র, যদিও তখনই তিনি বহুপ্রসূ লেখক। সত্তরের দশকে, বস্তুত ১৯৭৫ থেকেই, একের পর এক তাঁর অজস্র গ্রন্থ বেরোতে থাকে—এমনকি ষাটের দশকে রচিত কবিতাগুলিও কখনো-কখনো সংকলিত হয়ে। শক্তির কবিত্ব তর্কাতীত, তাঁর কাব্যোচ্ছ্বাস বিরতিহীন।

কবিতার ভাষায় শক্তির দক্ষতার তুলনা হয় না। কবিতার ভাষাকে নিঃসন্দেহে তিনি অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ভাষার আধুনিকতার নির্মাণে ও সংগঠনে তাঁর নিঃশব্দ দান বাংলা কবিতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে—ঠিক এই ধরনের প্রভাব জীবনানন্দ দাশ ছাড়া আর কেউ ঘটিয়েছেন কিনা জানি না। অবশ্য তাঁর ভাষারীতির সূত্রপাত অনেকাংশেই জীবনানন্দ থেকেই, কিন্তু পরে স্বকীয়তায় তিনি আলাদা হয়ে যান। আধুনিকতার যে লক্ষণ কাব্যভাষাকে অনেক বহনক্ষম, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক করেছে—ভাষাকে শুধু ছুৎমার্গিতা থেকেই দূরে সরিয়ে নেয় নি, ভাষাকে বহুমাত্রিক সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ করেছে, ভাষাকে সংবেদনশীল করেছে—শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর মিল শব্দ ও চরণ ব্যবহারের নানা কারিগরি, নানা ভাঙাগড়া ও ভাঁজের মধ্য দিয়ে তাকে মূর্ত করেছেন।

শক্তির এই ভাষা-সাধনা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়কর তাঁর

বিষয়হীনতা। যে-কথা তাঁর প্রথম দিককার কবিতা সম্পর্কেও মনে হয়েছিল, পরে তা পরিবর্তন করার কোনো কারণ ঘটে নি। কি করে তবে ঐ মৌলিক আধুনিক ভাষা আবিষ্কার সম্ভব হল? সাহিত্যের ইতিহাসে উল্টোটাই ঘটতে দেখা গেছে—নতুন অভিজ্ঞতার তাগিদ তার যথোচিত প্রকাশরীতি খুঁজে পায় নি। তবে কি যে তীব্র ও মৌল ইন্দ্রিয়বোধ ও সংবেদনের জোরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই ভাষা তৈরি করেন, তার পেছনে কন্‌টেন্টেরও কোনো অবয়ব আছে? তাঁর ঐ উৎপলকুমার বসু কথিত 'অভিজ্ঞতা-লব্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শনে'-ও কোনো পারম্পর্য?

কবিতার পর কবিতায় সে-কাঠামো গড়ে ওঠে কই? বরং মনে হয়, নিরবয়ব শব্দবোধের তাড়নাতেই তিনি শব্দগুচ্ছ বা বাক্য বা একটি স্তবক তৈরি করেন। সেই শব্দগুচ্ছ বা বাক্যের একটা অর্থগত মোহও আছে, মরমিয়া সারল্যের ঐ শব্দগত টান কবিকেও আকৃষ্ট করে—তিনি বলেন, 'ভাষার ভিতরে খুব অভিমান আছে'—যেন তারই আবেশে তিনি আরো শব্দ গেঁথে চলেন। 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির' (১৯৮০) গ্রন্থে যেমন বলেন 'সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি হতে থাকে' অনেকটা সেরকম। 'এই আমি, যে পাথরে' (১৯৭৭) গ্রন্থে শক্তি ভারি সুন্দর করে বলেছেন, শব্দের যেখানে ফাঁক সেখানে তিনি রঙের বাটি ঢেলে দেন—ভাষার দেয়ালে লেগে থাকে 'নির্ভীক রক্ত, হিম, তন্তুজাল'। এটাই তার 'গান, ধ্বনি, বর্ণময়, রূপবান স্বতন্ত্র ঈশ্বর'। 'অস্ত্রের গৌরবহীন একা'-য় (১৯৭৫) বলেছেন, 'শব্দে পাখা মেলি / কখন চকিত হাঁস উড়ে যায়।' ভেসে ওঠে শব্দ 'একা-দোক্কা-তেক্কার গঠনে'। আসলে শব্দের প্রতি গভীর মমতায় কবি যে কী বলবেন কী করবেন ভেবে উঠতে পারেন না। কখনো বলেন 'কবিতা কল্পনালতা শব্দজব্দ', কখনো, যেমন 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' গ্রন্থে (১৯৭২): 'শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি', 'শব্দ শতরঞ্চ এবং শব্দ কাঁথাকানি', 'শব্দ গুলিসুতো', 'শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে হিসি করে বুকে' ইত্যাদি। বলেন, এক টুকরো চিনিতে যেমন 'ফিসফাস পিঁপড়ে আসে' তেমনি পাতাভর্তি কবিতা। পারম্পর্যহীন, স্বতন্ত্র, পৃথক, কিন্তু পিঁপড়ের মতো সারিবদ্ধ শব্দ 'আমাকে ঘেরাও করে, টানে কান, চাক বেঁধে খায় গুড় ও চৈতন্য'। এই সব নিতান্তই ব্যক্তিগত উপলব্ধির উক্তিসমূহ কবির তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বোধ থেকেই উঠে আসে, সঙ্গে সঙ্গে থাকে তাঁর কৌতুক, গভীর মমতা ও অসহায়তা।

কিন্তু বলা যাবে না, শক্তির কোনো সংকট আছে, অন্তত শব্দমালা

রচনায়। মনে হবে না আছে কোনো শব্দ ও অর্থের দ্বন্দ্ব। ফলে, তাঁর কবিতায় কোনো প্রগতি নেই, বন্ধ্যাত্ব বা অসন্তোষ নেই। আছে শুধু দিকচিহ্নহীন অজস্রতা। সত্তরের দশকে যে ১৪টা বা ১৫টা বা ১৬টা কাব্যগ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হয়, তার কালানুক্রমিকতা দুর্জ্ঞেয় এবং হয়তো তার জ্ঞান অনাবশ্যক।

পংক্তি উদ্ধার করে কেউ বলতে চাইতে পারেন, সহজিয়া মানবিকতার টান একটা আছে তাঁর কবিতায়। হয়তো এমনকি সংগতভাবেই কবিতার বাক্‌প্রতিমা বা শব্দ ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি থেকে বক্তব্যের একটা চেহারাও দাঁড় করানো যায়—বলতে পারা যায় কেন 'একা গাছ' বা 'ট্রেন' বা 'স্টেশন' বা 'তাঁবু' তাঁর কবিতায় বার বার আসে, হয়তো এমনকি প্রমাণ করতে পারা যায় 'হার্ট ক্রেন' শব্দেরও যাথার্থ্য। এমনকি হয়তো তার বেশিও এগোনো যায়। 'ভালবেসে ধুলোয় নেমেছি' (১৯৭৯)-তে বলেন, যদিও তিনি 'ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মাঝখানে একা / ঘরে ও বাইরে একা দিনে রাতে' এবং 'এই সব শূন্য আছে এই দেশ পরিপূর্ণ করে'—'তবুও মানুষ বাঁচে'।

> ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে
> বাঁচে, বেঁচে থাকে—এই বাঁচতে হবে বলে থাকে বাঁচে···

তাই তো আশ্বাসের কথা—'কলকাতা কলকাতা তার জগন্ময় দুঃখ ও মাধুরী' (কলকাতার প্রতি)। কিংবা 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' (১৯৭৮)-তে লেখেন,

> আশ্চর্য সময় এই, মানুষের পশুপাখিদের
> মনের ঘনিষ্ঠ তাপ নেই বুঝি, শীতল বরফ
> হয়ে গেছে পৃথিবীর সব ঘর, বিছানা, পাঁচিল—
> আছে তাপ শয়তানের, আর আছে রক্তচক্ষু শঠ
> সে ভয় দেখায়···

এই জীবনানন্দীয় বাগভঙ্গি ব্যবহার করার পর তিনি অকস্মাৎ শেষ করেন কবিতাটি এইভাবে, কি বলব প্রায় সুকান্তের আদলে!

> আজ কিছু দাও, কিছু তাকে দাও
> অন্তত উত্তপ্ত করো তার মন, পাখিদের দেহ!
>
> (আশ্চর্য সময় এই)

এমনকি সমকালীন রাজনীতির সংকটের কথাও তিনি প্রকাশ করেন মাঝে-মাঝে তাঁর যথারীতি গার্হস্থ্য ভাষায়। 'আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ

তন্তুজাল' (১৯৭৬) গ্রন্থের 'এই মেঘ থেকে বৃষ্টি' কবিতায় নিজের বিমূঢ়তা ও সময়ের বিরূপতাকে সরাসরি প্রকাশ করেন। অন্য একটি কবিতায় সুন্দর তৈরি করেন 'প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী' বাক্যটি। 'অস্ত্রের গৌরবহীন একা'-তে তো বাঙলাদেশের ঘটনার ছাপও আছে। আর 'এই আমি, যে পাথরে' গ্রন্থে (১৯৭৭) লেখেন :

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে
আমার কাছে লুকিয়ে আছে তোমার জন্যে ভালোবাসা।
(পাতাল থেকে ডাকছি)

এইভাবে সত্যিই গড়ে ওঠে সহজ মানবিকতার আভাস তাঁর কবিতায়। কিন্তু, দেখা যাবে, সেই কবিতাতেই, অন্তত তার পরের কবিতায় ঐ পরিচয়কে লুপ্ত করে দেয় সম্পূর্ণ অবান্তর একটি প্রতিমা বা উপমা। এই পরিচয়লুপ্তিতেই যেন কবির আনন্দ। আলাদা করে এক-একটা উক্তিতে আছে অমোঘ উচ্চারণের গাম্ভীর্য, হয়তো আছে বিচ্ছিন্ন, পারম্পর্যহীন দেখা। আছে আপাদমস্তক লিরিসিজ্‌ম্। কিন্তু তা কখনোই বড় কোনো প্রাসঙ্গিকতা গড়ে তোলে না। আপাত গভীর উক্তিগুলির উচ্চারণই থাকে, মর্মার্থ থাকে না। শব্দের টানেই তার যাওয়া-আসা, বসবাস। কবিতায় যেটুকু রয়ে যায়, তা হল স্বয়ং কবির চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব ও তাঁর চিন্তার বা অনুভবের বা এমনকি হয়তো তাঁর জীবনযাপনেরও ধরন। হয়তো যে সময়টা কবিকে এরকম কেন্দ্রচ্যুত ও শব্দলীন করেছে তাকেও। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কবিতাকে আলাদা করা যায় না। অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশে চমকপ্রদ কিন্তু বস্তুত অর্থহীন এলোমেলো একজন কবির ছিন্ন দিনলিপি আকর্ষণীয়, তবে তা কখনই কবিতার পরমার্থ হতে পারে না।

৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদিদের দেখা গেল একটা মুশকিল থেকেই যায়, বর্জন করতে-করতে তাঁদের আর বিষয় বলে কিছুই থাকে না। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সেটা আরো নির্মমভাবে সত্য। আর এই বিষয়হীনতাটা ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে। তখন দেখা যায়, নিছক ভাবালুতাকেই তাঁরা মোড়ক পালটে পরিবেশন করেছেন এতদিন। 'মা নিষাদ'-এর পর 'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ' (১৯৭০) এবং তারপর 'সৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা' (১৯৭২)—ক্রমশই বোঝা যায় শরৎ-এর বলার

কিছুই নেই। সে-কথাটা খুব বেশি করে স্পষ্ট দ্বিতীয় গ্রন্থে, সন্দেহ হয় নিছক কবিত্বও হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে কিনা।

যুবতী যেন ভারবাহী পশু
বেচারা সারাদিন সারারাত নির্বিকার
বহে বেড়ায় ওর স্তন দুটি
জানে না, আসলে ওরা আনন্দেরই মফস্বল।...

পাশাপাশি দুখানা ঘর ভাড়া করে থাকে দুজন
অবশ্য একটাই বাথরুম
একটাই রান্নাঘর, বাকি সব নিজের নিজের।...

দেখলে তো :
দেখতে-দেখতে জীবনটা কেটে গেল কেমন
অন্য সকলের মতো।

বরং স্বাদবদলের জন্য শরৎ-এর ছড়াই উপভোগ করা যেতে পারে, বরাবরই :

কবি আর কবিনী
পাশাপাশি হাঁটলে
মনে হয় ছবি নেই
মেঘলাটা কাটলে।

কবিনী ও কবিটার
মাঝে কে ও জ্যান্ত ?
নাকি চার, চোখ কার—
দেখি ধরে আন্ তো। (বাচ্চুর জন্যে চারটে বিস্কুট)

এ না হয় সুকুমার রায়-কে স্মরণ করা। মুশকিল হচ্ছে, শরৎ মুখোপাধ্যায়ের অন্য কবিতাগুলিও এখন মোটামুটি বাচ্চুর জন্যেই বিস্কুট।

স্বাদবদলের কথা উঠলে বরং তারাপদ রায়ের কথাই মনে ওঠে। ১৯৭০ সালে বেরিয়েছিল 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু' এবং ১৯৭৪-এ 'নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক'। তারাপদ রায়ের ভণিতা খুব কম। ফলে হাল্কা চালে তিনি শুরু করেন এবং হাল্কা চালেই শেষ করেন। মাঝে

মাঝে নিছক তামাশাই জমে, যেমন 'প্রেস নোট' কবিতায় টি. আই. টি. অর্থাৎ তারাপদ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের জন্য তিনি জনসাধারণের সহযোগিতা চান। আবার এরই ফাঁকে-ফাঁকে তারাপদ কখনো এনে দেন প্রকৃত কবিতারই স্বাদ।

সবই সেই রকম রয়ে গেলো,
যেন ময়দানে জনসভা, যেন সিনেমার চাঁদ
শুধু তুমি,
তোমাকে আমার আর তেমন জটিল করে জড়ানো হলো না।

(জটিল)

তারাপদ রায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে যায় সামান্য বয়ঃকনিষ্ঠ তুষার রায়-কে। দুজনেই কৌতুক ছড়িয়ে কথা বলেন, নির্দোষ, কৌতুক কখনও ঠাট্টা হলেও তা অন্য ব্যক্তির উদ্দেশে ততটা নয়, যতটুকু তা নিজেদেরই নিয়ে। মার্কিনি রঙ্গ-কবিতার ধারার মতোই একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠতে পারত এই দুজনের মধ্য দিয়ে। অবশ্য তুষার রায়ের বলবার কথা বোধহয় কিছু বেশি এবং তাঁর কবিতার চারিত্র্যও আরেকটু সিরিয়স ও স্পষ্ট। ফলত চারপাশের অসংগতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তিনি কলম ধরেছেন এবং তাকে প্রকাশ করেছেন প্রায়শই নিজেকে নিয়ে মজা করে-করে। 'মরুভূমির আকাশে তারা'-তে (১৯৭৪) ভাষাতেও অনেক স্বচ্ছন্দ কারিগরি আছে। তুষার ভাষার জীর্ণতা নিয়ে বেশ ভাবিত—'শব্দগুলি ওজনহীন ক্রমশঃ বিপুল ব্যয়'—বলেছেন, 'নতুন কোত্থেকে হবে, মশায় বাহাত্তরটা শব্দে / নতুন কি করে হবে।' কবিতার জগতকে তিনি বড় করতে চান—না হলে, জানেন, 'ছোটো জায়গা থেকে যাত্রা পৌঁছয় / আরো ছোটো জায়গায়'। এবং পরিণতি :

তখন তোমার ছাঁপা সামলাবার লোক তুমি নিজেই
নিজেই একমাত্র পাঠক, সমঝদার, শ্রোতা। (তখন)

তুষার খুব অনায়াসে বড় কথা এভাবেই বলে ফেলেন, যেমনভাবে তিনি হাসিঠাট্টা করেন। নক্‌শালী হঠকারিতার বিরুদ্ধে এরকম কবিত্ব জবাব আর কোথায় মিলবে?

আমার প্রিয়ের মূর্তি ভেঙে তুমি প্রিয় হতে চাও
তবে নাও আমাকেও, শুধু জেনো এই প্রিয় হাড়
বজ্রের সমতুল, অপ্রতুল তোমাদের নিহিত মমতা।

(নতজানুতার কথা)

তুষার রায়-এর মনে মনে খুব ক্রোধ, কিন্তু ক্রোধকে প্রকাশ করতে গিয়ে একটা কারুণ্যও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় তাই বারবার 'সার্কাসের ক্লাউন' কিংবা 'ব্যাণ্ডমাস্টার' চলে আসে।

ভাষার দিক থেকে পঞ্চাশের কবিদের যে অবদানের কথা বলা হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় বা তারাপদ রায়ের মধ্যে ততটা পাওয়া যাবে না, যতটা পাওয়া যাবে বিনয় মজুমদার বা উৎপলকুমার বসু-র মধ্যে। বিনয় মজুমদারের এ-দশকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থ তবু আমাদের হাতে আছে: 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' (১৯৭৪)। উৎপলকুমার বসু বহুদিন লেখেন না—এ-দশকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ ষাটের দশকের 'পুরী সিরিজ'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ। আর শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কোনো বই এ-দশকে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সঠিক জানা নেই।

'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র কবিতায় শব্দগঠন, বাক্যগঠন, বিষয় ও কাঠামো বিচিত্র ও স্বতন্ত্র—কারো সঙ্গে মিল নেই। জীবনানন্দীয় বাচনের একটা অদ্ভুত পরিণতি। এর দীর্ঘ ক্লান্তিকর ও প্রতারক সারল্যে, প্রায় অবোধ সারল্যে, এবং ছন্দ বিজ্ঞানমনস্কতায় আলগা কবিত্ব যেমন আছে, আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠনের শ্রম, তেমনি এগুলোই আবার ননসেন্স-এর চূড়ান্ত উদাহরণ। কবিকে যাঁরা অসুস্থ দেবদূত হিসেবে দেখতে ভালোবাসেন, তাঁদের কল্পনা চরিতার্থ করবে এই কবির ব্যক্তিত্ব ও কবিতা।

উৎপলকুমার বসু-র ভাষারও জটিল বিন্যাস ও স্বতন্ত্র সুর ষাটের দশকে সকলকে কৌতূহলী করেছিল। দীর্ঘকাল পরে লেখা সাম্প্রতিক দু-একটি কবিতায় তার পুনরাবৃত্তি বা দিকবদল কোনোটাই স্পষ্ট হয় নি। মাঝে-মাঝে মনে হয়, সত্তর দশকের কবিদের কবিতার ভাষার সংগঠনে সচেতন বা অসচেতন ভাবে উৎপলের প্রেরণা কাজ করেছে।

৯

কৃত্তিবাসী বিদ্রোহের পাশে পঞ্চাশের দশকে রাজলক্ষ্মী দেবী, শান্তিকুমার ঘোষ, সুনীলকুমার নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রী, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, নবনীতা দেব সেন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকেই আছেন। কোলাহল থেকে দূরে এঁদের শান্ত কবিকৃতি পাঠকের মনে স্থায়ী হয়েই আছে। এঁরা কেউ কেউ পঞ্চাশের একেবারে

গোড়ায়, হয়তো তারও কিছু আগে, কেউ কেউ একেবারে উপান্তে, যাট ছুঁই ছুঁই। মেজাজের দিক থেকেও এঁরা ভিন্ন ভিন্ন। নানা অনুষঙ্গে তাঁরা পাঠকের স্মৃতিতে থাকেন।

যেমন, রাজলক্ষ্মী-কবিতা-নবনীতা এই তিনজন মহিলা-কবি শুধু কবিতার সিদ্ধিতেই নয়, তাঁদের দৃষ্টির কিছু স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় স্মরণীয়। কবিতা সিংহ ও নবনীতা দেব সেন দুজনেই মহিলা-কবি এই অভিধায় আপত্তি করেছেন এবং সংগত কারণেই করেছেন। তবু, রাজলক্ষ্মী দেবীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে যেমন, তেমনি 'রক্ত-অলক্তক'-এও (১৯৭৬) নারীর প্রেমেরই যে আকুল রূপ ফুটে উঠেছে, তার ভাষা ভিন্ন। এমনকি কবিতা সিংহের 'কবিতা পরমেশ্বরী'-তে (১৯৭৬?) যে-প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তা নারীরই প্রতিবাদ—বহুভোগী পুরুষের পৌরুষহীনতার বিরুদ্ধে। 'এস্‌টাব্লিশমেন্ট' কবিতায় বিবস্ত্র পুরুষকে দেখে দাসীরা রোল দিয়ে কাঁদুক চেয়েছেন তিনি, 'হায় হায় কাকে তারা প্রতিদিন পুরুষ ভেবেছে?' নারীত্বের প্রতিবাদ ও অহংকারের মধ্য দিয়েই তিনি সামাজিক প্রতিবাদকে রূপ দিতে চেয়েছেন বহু কবিতায়। ফলে কবিতায় নারীসুলভ কোনো আড় তিনি রাখেন নি, রাখতে চান নি। নবনীতা দেব সেন তাঁর 'স্বাগত দেবদূত'-এর (১৯৭১) বিদেশবাসের কবিতাগুলিতে নারীরই ভেসে-যাওয়া এবং প্রত্যয়-ফিরে-পাওয়াকে বিষয় করেছেন বলে মনে হয়। কখনো-কখনো 'কবিতা'-ই সেই প্রত্যয়। কিছু পরে কবিতা লেখা শুরু করেছেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়—তিনিও তাঁর 'যদি শর্তহীন' (১৯৭২) গ্রন্থে যে নীতিবোধকে বারবার কবিতায় আনতে চেয়েছেন, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, তার উৎসও নারীত্বের বিশেষ অধিকারে ও শুভবোধে। কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ কেতকী কুশারী ডাইসন-এর প্রথম গ্রন্থ 'বল্কল'-এও (১৯৭৭) বয়ঃসন্ধি বা প্রথম যৌবনের সারল্যে লেখা তরুণীর অনাবিল শুদ্ধ অনুভূতির দিনলিপি। এই সব আবেগ-অনুভূতি যদি নারীত্বের ছোঁয়ায় বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তার জন্য লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, বরং এই অধিকারেই কবিতাগুলি কখনো-কখনো যে নির্দিষ্টতা পেয়েছে, তা প্রকৃত কবিত্বেরই অনুকূল।

সুনীলকুমার নন্দী অনেকের তুলনাতেই দেশকালের ভাবনায় বেশি দায়বদ্ধ। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনুভূতির একটা সংযোগ সব সময় ক্রিয়াশীল। ঠিক বিষয়ের বহিরঙ্গতায় নয়, ভেতরে-ভেতরে নানা ঘটনার আঘাতে ও প্রতিক্রিয়ায় নানা বাক্‌প্রতিমা বা

কখনো রূপকের মধ্য দিয়ে সময়ের এই টান প্রকাশ পায়। 'সেই 'মুখ'-এর (১৯৭১) পর 'পিচ্ছিল গুহার জল' (১৯৭৩), এবং তারপর 'অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে' (১৯৮০)—ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি-সমাজের অন্বয়ের এই সূক্ষ্মতা ও বিস্তার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। অভিজ্ঞতার জটিলতাকে কখনই তিনি বর্জন করেন না, ফলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কবিতা একটু সুদূর, ভাষা গহিন ও ব্যক্তিগত। মাঝে-মাঝে সমকালীন কোনো কবির ছায়াসম্পাত যদি ঘটেও, তবু এ তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাষা। তাঁর কবিতার সঙ্গে সামান্য স্থায়ী অন্তরঙ্গতাতেই এই দূরত্ব ঘুচে যায়, খুলে যায় ভাষার অর্গল—আমরা প্রবেশ করি 'নিভৃত নির্মাণে'র সেই জগতে যেখানে 'শিকড়-চারানো যত ডালপালা, গোপন মর্মর'। সুনীলকুমার নন্দী রক্তের উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতার সেই গোপন সংবাদই নিচু গলায় আমাদের দেন তাঁর কবিতায়।

> না-না-না, এসব আলগা-আলগা
>   যেন সৌখিন ঘটনাবলীর
> তলে
>   পেশী-টান
> শিকড়ে-শিকড়ে রক্ত ঝাঁকায়, রক্তের ডাক
> একই মাটি-জল, জনতার তিথি ফুলে-ফুলে ওঠে
> ঝাঁপ দিতে চায়। (রূপসী রূপসা)

সুনীলকুমার নন্দী-র কবিতায় বারবার ব্যবহৃত প্রায় সব কটি শব্দই এখানে আছে—'টান', 'শিকড়', 'রক্ত', 'জল' ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় এটা প্রায় অনিবার্য, কারণ বিভিন্ন কবিতায় শেষ পর্যন্ত বলবার কথার অন্তর্নিহিত ঐক্য নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিত্বের একাগ্রতারই পরিণাম।

পূর্ণেন্দু পত্রী-ও সামাজিক অন্বয়ের অনুসন্ধানীদের একজন। একদা প্রত্যক্ষভাবেই রাজনীতির সঙ্গে সংলগ্ন ছিল তাঁর কবিতার বিষয়। চলমান জীবন ও সংগ্রামের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার মালা গেঁথে গেঁথে তিনি এক সময়ে ফরাসী কবি জাক্ প্রেভের-ধরনের চলচ্ছবি তৈরি করতেন, তাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। এখন তাঁর পথ অনেকটা সরে এসেছে। বিশ্বাসের মৌল গড়নে নয়, উচ্চারণের ভঙ্গিতে। বিষাদ তাঁর কবিতাকে অনেক বেশি আচ্ছন্ন করেছে। 'শব্দের বিছানা'য় (১৯৭২) তিনি সেই অন্তর্মুখী বিষাদের কথা, দুঃস্বপ্নের কথা বলেন বেশি করে। আমাদের কারো কারো কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রী-র ঐ আগের যুগের কবিতার প্রতিই পক্ষপাত বেশি—সেটা ছিল তাঁর একেবারে

নিজস্ব জমি। অবশ্য হুবহু সে-ভাবে লেখা তো আজ আর সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবু, ধরা যাক, 'হুইস্‌ল' কবিতায় সেই শব্দস্রোত-চিন্তাস্রোতের রূপান্তরিত আভাস সবাইকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করবে।

মনে পড়ছে
নিসর্গ ভেদ করে কী দ্রুতগ্রামী সেই সব ছুটে চলা
ঘর থেকে বেরুলেই কত জোয়ার ভরা খাল
আকাঙ্ক্ষার নরম সাঁকোগুলো
সিঁড়িতে উঠলেই ঘর
ঘরে ঢুকলেই বাসর
দেহময় ফুল
ফুলের আড়ালে লজ্জিত পাহাড়
পাহাড় সবুজ আঁচলে আড়াল
সবুজ আঁচল কাঙালের মত অপেক্ষমান
চক্ষুলজ্জাহীন বাতাস এসে কখন তারা কেড়ে নেবে সব।

এখন কি তবে পূর্ণেন্দু-র শুধু 'মনে-পড়া'?

পরের গ্রন্থ 'হে সময় অশ্বারোহী হও'-তেও (১৯৭৯) সমাসোক্তির উপর্যুপরি ব্যবহারে এরকমই চিত্রমালা গড়েছেন তিনি—সে চিত্র কখনো অতীতগৌরববাহী গোটা বাংলার, কখনো বেদনামথিত ভাঙা বাংলার।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ'[১]-এর (১৯৭৩) জগৎ যথারীতি ব্যঞ্জনায়-ব্যঞ্জনায় ধূসর। মাঝে মাঝে এখন যেন মনে হয় তিনি একটু চেনা জমিতে নেমে এসেছেন—বহু কবিতায় তাঁকে ধরাছোঁয়াও যায়। তাঁর ভাষার বঙ্কিম নৈপুণ্য তো এখনও সমানই অক্ষুণ্ণ আছে, তার স্বাদ পাওয়াটাও সৌভাগ্যের। কিন্তু কবিতার পর কবিতায় তাঁর বিষয়, অভিজ্ঞতা, বলার ধরন মনে হয় সমানই কৃত্রিম, বিদেশী।

শান্তিকুমার ঘোষের 'থামো, সুন্দর মুহূর্ত' (১৯৭০), মানস রায়চৌধুরীর 'আবহ সময় শিখা' (১৯৭১), সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর 'ধ্যানে, ব্যবধানে' (১৯৭৪), প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি' (১৯৭৫), দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেবল দেখেছে শিয়রলতা' (১৯৭২), মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অর্ধেক শিকারী' (১৯৭৫), দিব্যেন্দু পালিতের 'আহত অর্জুন' (১৯৭৫), শান্তি লাহিড়ীর 'ইন্দ্রের অসুখ' (১৯৭৬)—এই বইগুলো সামনে মেলা আছে। এঁদের

কারো কারো হয়তো এ-দশকে আরো কোনো বই বেরিয়েছে। এঁদের কাব্য-সাফল্য আর কোনো একজন পাঠকের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে নেই। এঁদের কবিত্ব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যও তর্কাতীত। পঞ্চাশের দশকের কৃতিতে এঁদেরও নিশ্চয়ই স্থান আছে। কিন্তু নন্দনের যে সাযুজ্যে কিংবা নতুনত্বের যে অগ্রগামী ভূমিকায় কোনো কবি বা কোনো গ্রন্থ বিশেষ একজন পাঠকের মনোযোগ দাবি করতে পারে, তার স্পষ্ট চিহ্ন এঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

১০

বরং নন্দনজিজ্ঞাসার অন্তরঙ্গতায় ও কবিতার সিদ্ধিতে এ-দশকের যে তিনজন কবি আমাদের মনে গেঁথে থাকেন, তাঁরা হলেন তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্ত। যুগান্তর চক্রবর্তী বা শিবশম্ভু পালের কোনো বই তো বেরোয় নি এ-সময়ে।

তরুণ সান্যাল তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ 'যেমন উদ্ভিদ'-এ (১৯৭৯) লিখেছেন, 'কবিতা লেখার জগৎ ছেড়ে যেতে-যেতেও এই-যে বারবার ফিরে আসা, তার কারণ, সম্ভবত এই কবিতাগুলিও যে আমার এক ধরনের নিজস্ব দিনলিপির আনন্দ বেদনা ও বিষাদ, বিশেষভাবে বিষাদেরই অকৃতার্থ কেলাসিত রূপ।' সত্যিই তরুণ আজকাল কম লেখেন। কিন্তু 'রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা' থেকেই তিনি যে উচ্চারণ আয়ত্ত করেছেন তাতে তাঁর ছেড়ে-যাওয়ার সম্ভাবনাও বাংলা কবিতার ক্ষতি। পঞ্চাশের দশকে কাব্যভাষায় যে বিস্তার ও ঔদার্য তার শরিক তিনিও। এর ওপর রাজনৈতিক বিশ্বাসের আবেগ ঐ ভাষার সঙ্গে চমৎকার মিলেছে। কবিতারচনার ক্ষেত্রে অন্তত তিনি বিশ্বাসগত সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেন না। বরং তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্রমশই ব্যাপকতর পরিগ্রহণে ও আত্মবিস্তারে। তাঁর শিথিলবিন্যস্ত, বাধাবন্ধহীন, খোলামেলা কাব্যভাষায় তিনি যতখানি আত্মসমালোচক ও সমগ্রতার সন্ধানী, তথাকথিত প্রগতির শিবিরে তার তুলনা কমই আছে। তাঁর কবিতার অপেক্ষাকৃত স্বাধীন আপাত শিথিল পরিসরে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি স্থান করে নিতে পারে। বলাই বাহুল্য, সত্তরের দশকে সেই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা অনেকটাই বিষাদের রূপ নিয়ে তো আসবেই। হয়তো মাঝে-মাঝে এমনও মনে হতে পারে একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী তরুণ সান্যাল ভেতরে-ভেতরে একটু সেন্টিমেন্টাল, আবেগের অতিরেক তাঁর কবিতাকে ভাসিয়ে নিতে চায়,

বিষাদ ক্ষণে-ক্ষণেই আক্রমণ করে। মনে হয়, 'একা' বা 'বিদায়' শব্দটির প্রতি তাঁর বড় বেশি পক্ষপাত।

আগের বই 'এরই নাম অন্য বাংলাদেশ' ১৯৭২-এ বেরোয়, ২১শে ফেব্রুয়ারি। তার 'কবিতায় যুক্তফ্রন্ট'-এ তিনি লেখেন :

বাংলা দেশ
আমি সব বেদনা আনন্দগুলি
আমার মতন করে আলোকলতায় যেন বকুলহিজল
গেঁথে তুলি
হেঁটে যাই কাঁধে সাত পুরুষের স্বপ্ন ও সাধের ছেঁড়া ঝুলি
একা ধীর পায়ে
প্রথম বর্ষণ শেষে মাঠে উল্টে দেওয়া মাটি লাঙলের ফলার রেখায়,
কিংবা
জল শুষে হেসে ওঠা রুদ্রচণ্ড ডাঙায় বাষ্পের গন্ধে
স্নাত মনসার ঝোপে
কোমল বিদ্যুৎ নীল ফোটাবার জন্য রুক্ষ
ধ্যানী মমতায়…

এরকম অজস্র স্মরণীয় লাইন, স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন তরুণ সান্যাল। প্রগল্‌ভতার ঝুঁকি তো থাকেই এই বাধাবন্ধহারা আবেগের কবিতায়। শব্দব্যবহারে কিন্তু তিনি অনেক সজাগ ও আবিষ্কার-উন্মুখ। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান যতটা ভাবা হয়, তার বেশি তাঁর অধিকার।

আমি তার বড়ো কাছাকাছি আছি, সে কি তার জানা ?
এই যে নিঃশ্বাস, এই স্পর্শবহ ত্বক, একে ধরা ছোঁয়া যায় ?
কেমন বুকের মধ্যে খরা জলা হা হা করে, কে জেনেছে সে
গরঠিকানা ?
অথবা কখন নদী ভেঙে পড়েছিল ঢেউয়ে, না কী নারী, নিষ্ঠুর
ডাঙায়।
(এই স্বদেশের মতো)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি বই দেখা যাচ্ছে সত্তর দশকে বেরিয়েছে— 'কবি ছাড়া জয় বৃথা' (১৯৭২), 'কাঁটা তার' (১৯৭২) এবং 'আদম শুমারি' (১৯৭৯)। এর মধ্যে শেষ বইটিই মাত্র আমরা হাতে পেয়েছি। তরুণ সান্যালের মতোই দীর্ঘদিন তিনি কবিতা লিখছেন—সেরকমই সামাজিক-রাজ-

নৈতিক ব্যাপারে তাঁর মগ্নতা কখনই কবিতার শরীর বিষয়ে তাঁকে উদাসীন রাখে নি। সবচেয়ে দীর্ঘ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'আদম শুমারি' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭৩। কলকাতা শহরের প্রতি তীব্র মমতায় লেখা—কলকাতার জন্য দুঃখ, ভালোবাসা, উজ্জীবনের আশা সব নিয়ে। মাঝে মাঝে সমর সেনের স্মৃতিবাহী—বাংলা কবিতায় যে চাল তেমন আর চর্চিত হয় না, তাকে এখানে যেন আবার কিছুটা পাওয়া গেল—নাগরিক বাস্তবতা ও রোমান্টিক হাহাকার এক সঙ্গে। কলকাতার খিচুড়ি অস্তিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আদমশুমারি—যেখানে কেবল চোখে পড়ে 'কঙ্কাল আর পাগল আর বেকুব আর মাতাল ধড়িবাজ', যেখানে 'অধ্যাপক লেখক ডাক্তার শিল্পী ও গায়ক নাট্যকার সোনার চুম্বনে চোষে মানবসমাজ'। আর তার পরেই

দেখ দেশ জেগে আছে বনরাজিতটনীলা

ঘুমভাঙা জানা-অজানায়,

জনপদে অরণ্যে পাহাড়ে দেখ মিশে যায় শহরের সীমা

আসন্ন গর্ভের তাপে নবজন্মে টানা-দোটানায়।

কবিতাটির দীর্ঘ অবয়বে কলকাতার জীবনের নানা দুর্ভোগের সামাজিক ছবি আছে। কলকাতার সেই ভয়ঙ্কর 'লাশগুলি ফুলে ফেঁপে ভেসে-আসা', রাস্তায় ভিখিরি শিশুকে রেখে শিশু-উৎসবের পরিহাস, ছড়ার চালে কলকাতাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি। কবিতাটি শেষ হয় এক 'আপাত পাগল কবি'র বর্ণনায় যে 'অন্ধ লেনে বাইলেনে গলিতে রোয়াকে / চকখড়ি দিয়ে নক্শা আঁকে'—কলকাতা একদিন এই কবির দিকেই ফেরাবে কান, কারণ 'তিলে তিলে এই মৃত্যু তিলোত্তমা জন্মের বিকাশ'।

শুধু এ-কবিতাতেই নয়, সমগ্র গ্রন্থটির বিভিন্ন কবিতায় কলকাতা আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়কে মনে হয় যেন একান্তভাবে কলকাতারই কবি—কলকাতা নিয়ে এমন মগ্নতার কবিতা অরুণ মিত্র ছাড়া বোধহয় আর কেউ লেখেন নি।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অবশ্য অসমতা চোখে পড়ে কখনো-কখনো—সব সময়ই তিনি কবিতার শীর্ষে থাকেন না, মাঝে মাঝে তাল সুর কেটে যায়। বোধহয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কের ও তাঁর কবিস্বভাবের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান তিনি ভাষায় সব সময় আনতে পারেন নি। আসলে তো তিনি দুর্মর রোমান্টিক, হয়তো একটু প্রথাসিদ্ধভাবেই—ফুটপাতে শুয়ে চাঁদের স্বপ্ন দেখেন, প্রেমিকার সাহচর্যে 'বাঁচার পিপাসা', প্রেমিকার কাছ থেকে পাওয়া

সাহসে 'স্বপ্ন দেখি ঘুমভাঙার আনন্দে'—তার 'শরীরে লেগে-থাকা উৎসের গন্ধে / তোমার ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ-ভাঙা···/দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে যাওয়া'।

তরুণ সান্যাল বা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় দুজনেই আজকাল কম লেখেন। তবু তরুণ বা অমিতাভ কাউকেই কখনো কেউ কবিতার জগতে শৌখিন বা এ্যামেচার বলে মনে করবেন না। এটা সব-সময় কম লেখা বা বেশি লেখার ব্যাপারই নয়। যেমন যুগান্তর চক্রবর্তী একটি বা দুটি বইতেই নিজের কবিত্বের আসন স্থায়ী করে রেখেছেন। এর আরেকটি উদাহরণ অনেক পরের 'কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা'-র কবি করুণাসিন্ধু দে, যিনি এখন আর আদৌ লেখেন না। কৃত্তিবাসী কবিরা তন্ময় দত্ত সম্পর্কে যে মীথ তৈরি করেছেন, ইচ্ছে করলে তা করুণা সম্পর্কেও ভাবা যায়। এর উল্টোটাও ঘটে। অনেক লিখেও কবিতায় শৌখিন থেকে যান কেউ। আবার কম লেখার সঙ্গেও শৌখিনতার যে সম্পর্ক নেই এমন নয়। এর ভালো উদাহরণ বোধহয় ধনঞ্জয় দাশ-এর 'পালাতে পারি না' (১৯৭৮)। কবিতা লেখাটাও তাঁর কাছে তত্ত্বের ব্যাপার নাকি? না হলে কবিতা সম্পর্কে তিনি কি চিন্তা করেন ভূমিকায় তার তত্ত্ব হাজির না করলে চলত না? অবশ্য সৌভাগ্যের বিষয়, শৌখিনতার কারণেই স্বতন্ত্র কোনো চারিত্র্য অর্জনের প্রশ্ন না উঠলেও, ধনঞ্জয় দাশ বেশ কটি নিপুণ 'সমাজসচেতন' কবিতা লিখেছেন, কবিতার শরীরেও তাঁর মনোযোগ থাকে—যদিও, দেখা গেল, পছন্দের কবিতাগুলি অধিকাংশই তারকা-চিহ্নিত, অর্থাৎ ১৯৫৬-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরসন্ধান' থেকে আবার-ছাপা।

তরুণ সান্যাল বা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পঞ্চাশের যে কবি আমাদের নিত্য সঙ্গী তিনি হলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। বোধহয় কিছু পরে লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু পাঠকের মন জয় করার ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেন নি। সময়ের সঙ্গে অমিতাভ-রও নাড়ির যোগ। সমকালীন ঘটনার চাপ শুধু তাঁর ওপর এসে পড়ে তাই নয়, তিনি সেই ঘটনাস্রোতে সক্রিয় কর্মী। কবিতাকে তিনি তা থেকে কখনই আলাদা করে দেখেন না, দেখেন নি। এমনকি সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ প্রচারের কবিতা লিখতেও তাঁর শুদ্ধতায় বাধে না। বস্তুত এরকম বহু সাময়িক ঘটনার ওপর লেখা ছড়া কবিতার বিচারেও রসোত্তীর্ণ করার ক্ষমতা রাখেন অমিতাভ-ই। সত্তরের দশকের ঘটনাবলি স্বভাবতই অমিতাভকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে—কয়েকটি অবিস্মরণীয় বাক্‌প্রতিমার জন্ম হয়েছে সেই গভীরতা থেকেই।

এর পাশাপাশি অমিতাভর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দিক আছে। সেখানে কৃত্তিবাসের কবিদের সঙ্গে তাঁর মিলের কথা কারো কারো মনে হতেও পারে। তাঁদের মতোই তাঁর কবিত্বের একটা বড় উৎস প্রখর ইন্দ্রিয়বোধ। আর সে তাড়নাকে কখনই বশে আনতে চান না অমিতাভ। তাঁর ঐ রাজনৈতিক সচেতনতা একদিকে আর অন্যদিকে ঐ মৌল অন্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, এ দুয়ের সংযোগ অনেক সময়ই ফলপ্রসূ হয়েছে - সমাজসচেতন দায়বদ্ধ কবিতায় অন্য একটি মাত্রা এসেছে। আবার কখনো দেখি এ দুয়ের সংযোগ বিপত্তি ঘটিয়েছে, কবিতায় একটি স্ববিরোধী পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। যেমন, অপ্রাসঙ্গিক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে নারীশরীরের বর্ণনায় তাঁর সুস্থ স্বচ্ছ ইন্দ্রিয়বোধ কখনো কখনো বিকৃত ভাবেই আসে কবিতায়। অমিতাভ অবশ্য সেই লক্ষণ ক্রমশই ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু একটা প্রবৃত্তির টান আছেই তাঁর ঐ দিকে।

স্বভাবতই আবেগ অমিতাভ-র প্রধান অবলম্বন। এই প্রসঙ্গে রাম বসু ও তরুণ সান্যালের কথা স্বভাবতই মনে পড়বে। তাঁর মধ্যেও আছে আবেগের সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়তা, তীব্র নাটকীয়তা। কখনো-কখনো মনে হয় একটু অতিনাটকীয়। আমাদের জীবনযাপনের সুখদুঃখ, আমাদের বাঁচার লড়াই, নানা আন্দোলন-বিক্ষোভ অমিতাভকে আলোড়িত করে—সেই অভিজ্ঞতাকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। এই নাটকীয়তা, অমিতাভ যাঁর ভক্তবন্ধু সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও একটা বড় জোর—মনে হয় উভয়েই যেন এক-অর্থে কবিতাকে মঞ্চশিল্প করে ফেলতে চান মাঝে-মাঝে। বাচনের কুশলতায় পাঠকের হৃদয়কে প্রদীপ্ত করার ব্যাপারে উভয়েই দক্ষ। তবে শক্তির নাটকীয়তা অনেক গোপন, অন্তর্লীন। অমিতাভ-র নাটকীয়তা প্রকাশ্য, পরিণামমুখী।

এই নাটকীয়তার জন্যই অমিতাভ-র কবিতা পড়লেই মনে হয় কবির কণ্ঠস্বর শুনছি—তাঁর উচ্চারণের ওঠাপড়া পর্যন্ত। 'অমিতাভ দাশগুপ্তের নির্বাচিত কবিতা'য় (১৯৭৪) গোড়ার দিকে আমরা সত্তরের দশকের এরকম বেশ কিছু নাটকীয় কবিতা পেয়েছি। 'ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ', 'পাস্‌পোর্টবিহীন বাঙলা দেশ', 'ক্ষমা? কাকে ক্ষমা?'—এই সব কবিতার সাফল্য তো বহু কবিরই ঈর্ষাযোগ্য। নির্বিশেষ পাঠকই আলোড়িত হবেন যখন তিনি লেখেন

মেঘ, ঘন মেঘ

এ-মুড়ো ও-মুড়ো

আকাশের পাড়া জুড়ে
স্তবকে স্তবকে
নম্র, ভরাট-গর্ভিনী, নীলাঞ্জনা
শিয়রে ঘনিয়ে এসো
সুদূরের মায়া
ঠা-ঠা জ্বরে পুড়ে-যাওয়া আমার কপালে রাখো ছায়া।
(মেঘ, ঘন মেঘ)

রাঙা মাটি রুক্ষ রাঢ় ক্ষ্যাপাজল বিভাজিকা জড়ানো দক্ষিণ
বঙ্গহৃদি কলকাতা
উত্তরে আয়ত পৌণ্ড্রবর্ধনের পাথর-প্রতিমা
সামাল আছো হে··· (এখন গোধূলিলগ্ন, এখন বিবাহ)

এই দুটি উদ্ধৃতিতেই এবং আরো বহু কবিতায় তরুণ সান্যাল ও অমিতাভ দাশগুপ্তর-র মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় যেন। দুজনের আবেগের ধরনে সব সময় যে পার্থক্য থাকে এমনও নয়। কবিতার শরীরের দিক থেকেও উভয়ে যেভাবে পঞ্চাশের অংশীদার হয়েছেন, যে ভাবে প্রগতি সাহিত্যেরও যে একটা রক্ষণশীলতা থাকে তাকে বর্জন করেছেন, তাতে তাঁরা কবিতার আয়তনকেই বিস্তৃত করেছেন প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে। উভয়ের শুরু কিন্তু একরকম ছিল না, কিন্তু কোনো ঐক্যবদ্ধ বাচি পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়া নান্দনিক তাড়নায় কোথায় যেন মিলেও যান। অবশ্যই অমিতাভ-র ইন্দ্রিয়-তীক্ষ্ণতায় সৌষ্ঠব ও তীব্রতা অনেক বেশি সর্বগ্রাসী, তাঁর আবেগের প্রচণ্ডতা প্রায় অন্ধ—তুলনায় তরুণ সান্যাল সঞ্চরমাণ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত-র নাটকীয়তা সবচেয়ে জমে ব্যঙ্গ কবিতায়। 'মৃত্যুর অধিক খেলা'-র (১৯৭৯) বহু কবিতা—'শিবঠাকুরের আপন দেশে', 'তিনি', 'ম্যাজিশিয়ান' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। অমিতাভ নিজেও জানেন নিশ্চয়ই—তাই তাঁর একটা প্রবণতাই আছে এই দিকে।

এমনকি অমিতাভ-র কবিতাতেও কিছু-কিছু আপত্তির ব্যাপার থাকে না যে এমন নয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় উপমায় আকস্মিকতা ও অভিনবত্ব আনার ঝোঁকে তিনি রসাভাস ঘটিয়ে বসেন। তা না হলে কেন তিনি লিখবেন 'ছটা মাছি এসে ভেঙে দিয়ে গেলো / একশ চুয়াল্লিশ' বা 'কলকাতা ভীষণ জোরে বল করছে—ফরোয়ার্ড খেলুন' জাতীয় লাইন। অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি অমিতাভ-র আস্থা কখনও কি বিপদও ডেকে আনে—তাই

'ব্রেনের ভিতর তীব্র কানামাছি', 'এনেছি রক্তমাখা চাদ', 'ফায়ার-অ্যালার্ম বাজিয়ে নামে ক্ষুধা'?

অবশ্য পঞ্চাশের এই শক্তিশালী কবির ক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্য নিতান্তই সাময়িক। 'মৃত্যুর অধিক খেলা'-র গ্রন্থনামে যেমন, তেমনি বহু কবিতার, ক্রমশই যেন তিনি নাটকীয়তার অতিরেক ছেড়ে পাঠককে নিয়ে যান আরো পরিণত কাব্যোপলব্ধির জগতে। 'আড়াল', 'নিয়ে যেতে এসেছি', 'চাপ' এরকমই সব কবিতা।

> সারাটা দিন আজ বাঁশি হয়ে বাজছিল।
> বৃষ্টির ফোঁটার মতো বড়ো বড়ো পায়ে
> মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে
> এখন
> আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। (নিয়ে যেতে এসেছি)

১১.

পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে যাঁরা সোচ্চার, তাঁদের পক্ষে রোল উঠেছিল, চল্লিশের দশকের ভাঁটার পর তাঁরাই আবার জোয়ার আনলেন বাংলা কবিতায়। রটিয়েছেন তাঁরা নিজেরাই—সংঘবদ্ধ আত্মপ্রচারে যে তাঁরা খুব দড় তার প্রমাণ রেখেছেন। এখন, বেশ কিছু কাল কেটে যাওয়ার পর, বুঝতে পারা গেছে, কথাটার মধ্যে অত্যুক্তি খুব বেশি এবং পঞ্চাশের দশকে আগুন যতটা তার অধিক ধোঁয়া। কথাটার মধ্যে হয়তো এটুকুই সত্য যে, তিরিশের কবিদের তৈরি ভাষাকেই চল্লিশের কবিরা কাজে লাগিয়েছিলেন—যেমন, বিষ্ণু দে-র 'সাত ভাই চম্পা' বা 'সন্দ্বীপের চর' বা অন্বিষ্ট' একান্তভাবে চল্লিশের ভাষা—তার থেকে বেশি দূর এগোনো হয়তো সম্ভব হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাসের ছন্দে এরকমটা ঘটেও থাকে—একটা পর্বের কবিদের আবিষ্কার পরের পর্বের কবিদের নিশ্চিন্ত ও হয়তো নিশ্চেষ্টও করে রাখে। তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা সিদ্ধেশ্বর সেন ঐ ভাষাকেই অবলম্বন করে কিছুই এগোন নি, একথা বধির ব্যক্তিই বলতে পারেন। পঞ্চাশের এই কবিরা কবিতার ঝোঁকটা সরিয়ে দিলেন—সামাজিক উপলব্ধির আবেগকে নিয়ে গেলেন ব্যক্তিসর্বস্বতার ছোট জগতে। তর্ক করে অবশ্য বলা যেতে পারে, চল্লিশের কবিদের জগতে ব্যক্তি কি কিছুটা অনুপস্থিত ছিল না? কবিতার সিদ্ধি কি সমাজ ও ব্যক্তির

ডায়ালেকটিক্বেই নয়? সে হিসেবেও পঞ্চাশের ঐ কবিরা চাকাকে উল্টো দিকেই ঘোরাতে চেয়েছিলেন। অবশ্য ইতিহাসের পাকেচক্রে, সেই প্রয়াসেও 'সময়' যে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার কারণ কবিতার ভাষার ক্ষেত্রে তাঁদের কিছু বলার ছিল, করার ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপ্তি ও তীব্রতা তাঁরা আনতে পেরেছিলেন, তার পেছনে ছিল তাঁদের ঐ ব্যক্তিসর্বস্ব ইন্দ্রিয়-বোধ। পরন্তু সেই ইন্দ্রিয়বোধের বাঁকা পরিণতিতে অন্য একটা টেনশনও এসেছিল। ফলে ব্যক্তিসর্বস্বতার পিছুটান সত্ত্বেও ঐ ভাষার নবীনত্বের জোরেই তাঁরা বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ভাষার জোরেই ব্যক্তির আততি সমাজের আততিকে প্রতিফলিত করল, সচেতনভাবে সেটা না ঘটলেও।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হবে, পঞ্চাশের ঐ কবিতা ও তাঁদের নন্দনের নৈরাজ্য বাংলা কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কারণ ভাষার ঐ নবীনত্ব সৃষ্টির ক্ষমতার জন্যই তাঁরা বাঙালি পাঠক ও পরবর্তী অনেক কবিদের রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এবং সেটা খুব সুখের হয়নি। পঞ্চাশের দশকের কবিদের এই কীর্তি অবশ্য সংঘটিত হয়েছে ষাটের দশকে। এবং তখন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে—রাজনীতির, বিশেষত বামপন্থী রাজনীতির ও বিকল্প সংস্কৃতির দুরবস্থা ঘটতে শুরু করেছে—এরকম হাওয়াতেই তো পাঠকেরও সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার প্রতি আকর্ষণ এবং মানসিক ক্লান্তি ও নেতিবাদ গড়ে ওঠে। পঞ্চাশের ঐ কবিরা সেই মানসিকতাতেই প্রশ্রয় পেয়েছেন এবং সেই মানসিকতাকেই খুশি করেছেন। বা, বলা যায়, পঞ্চাশের ঐ কবিদের ও তাঁদের পাঠকদের মানস-জগৎ গড়ে ওঠে এই পরিবেশেই। বিস্ময়ের কথা, চল্লিশের দশক তো বটেই, এমনকি তার উত্তরাধিকার বা ধারাবাহিকতাও যেন কিছুটা অবান্তর হয়ে গিয়েছিল সে-সময়ে। কিন্তু আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, তরুণ সান্যাল বা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বা অমিতাভ দাশগুপ্ত বা আরো কেউ কেউ পঞ্চাশের 'বিখ্যাত' কবিদের চেয়ে কবিত্বে ন্যূন ছিলেন না। বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রশ্রয়ে গড়ে-ওঠা সংস্কৃতির বিকল্প দেওয়ার মতো সংঘবদ্ধতা ও সক্রিয়তা এদিক থেকে যে-কোনো কারণেই হোক তৈরি হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশের ঐ কবিদের ভাষার দিক থেকে যে দান তা কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সে দিক থেকে তাঁদের আধুনিকতাও।

'ষাটের দশকের কবিরা এত ম্রিয়মাণ কেন?' প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন

কবি। পঞ্চাশের মতো কোলাহল তোলার সাধ্য যেমন চল্লিশের ছিল না, তেমনি ষাটের দশকেও এই কোলাহল একটু অবান্তর হয়ে গিয়েছিল। তিরিশের নৈর্ব্যক্তিকতা ও চল্লিশের সমাজমুখিনতার প্রতিক্রিয়ায় পঞ্চাশের কবিরা যদি ব্যক্তিসর্বস্বতায় গিয়ে থাকেন, কিংবা চল্লিশের রাজনৈতিক সচেতনতা ও বিষয়-গাম্ভীর্যের প্রতিক্রিয়ায় যদি বিষয়হীনতার চর্চা করে থাকেন, তবে তাঁদের ঐ ব্যক্তিসর্বস্বতা, তাঁদের ঐ আত্মপ্রচার ও বিষয়-হীনতাই নিশ্চয় ষাটের দশকের কবিদেরও উল্টো দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফলে, দেখা গেল, ষাটের কবিরা কেউ কেউ নিজেদের দার্শনিকতা গড়ে তুলতে চান, তা গড়ে তোলার উপযুক্ত প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই। কেউ কেউ ফরাসী কবিদের অনুপ্রেরণায় শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক শব্দচেতনায় গড়ে তুলতে চাইলেন ভিন্ন জগৎ। হয়তো কবিত্বের ব্যর্থতাতেই গভীর প্রভাব কিছু রাখতে পারেন নি তাঁরা (কবিত্বের সিদ্ধি তো কোনো পরিকল্পনা করে করা যায় না)। হয়তো তাঁদের ঐ ব্যর্থতা পঞ্চাশের মীথকেই আরো জনপ্রিয় করেছে। কিন্তু যে প্রতিক্রিয়ায় কবিতার এই অনুসন্ধানগুলো ঘটছিল ষাটের দশকে, তার স্বরূপ চেনা যায় এভাবেই। এর পাশাপাশি অবশ্যই সমাজসচেতন দায়বদ্ধ কবিতার ধারা অপ্রতিহতভাবেই ছিল ঐ দশকেও।

ছদ্ম-দার্শনিকতার গাম্ভীর্য নিয়ে ষাটের দশকের যে কবি একদা সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিলেন তিনি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। সেটা অবশ্য সে-সময়ে তাঁর গ্রন্থের উপর্যুপরি প্রকাশনার জন্যও, তা ছাড়া কবিতা-বহির্ভূত সাংগঠনিক ক্ষমতায় পবিত্র পঞ্চাশের 'বিদ্রোহী' কবিদের সঙ্গেই তুলনীয়। প্রথম থেকেই পবিত্র মুখোপাধ্যায় কবিতার ভাষা ও ছন্দে খুবই দক্ষ—এরকম অনায়াস সাবলীল দক্ষতা খুব কমই দেখা যায়। এটাই হয়তো তাঁর দুর্বলতারও উৎস—নিটোল নিখুঁত কবিতার এই অবয়ব, মনে হয়, কষ্টসাধ্য অনুশীলনেরই ফল, কবির নিজের কথা নয়। তিনি যে প্রথমাবধি বিষাদ-করুণা-ঈশ্বর-শবযাত্রা-শববাহক ইত্যাদির কথা বলেন, কবিতায় প্রাজ্ঞতার একটা আবহ তৈরি করেন, তা এতই কৃত্রিম ও আরোপিত যে, মনে হয়, বিদেশী ভাষার অনুবাদ পড়ছি। মাঝে-মাঝে কবিতার গাম্ভীর্যের চূড়োয় যে পৌঁছন না এমন নয়, কিন্তু এ যেন অনুবাদকের গাম্ভীর্য। ১৯৭২-এ বেরোয় 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত', ১৯৭৬-এ 'পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তার অনেক আগেই বেরোয় তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'ইবলিসের আত্মদর্শন'। শোনা যায় সে-সময়ে পবিত্র-র দর্শন

নিয়েও নাকি বই বেরিয়েছে। তিনি লেখেন 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' প্রশ্ন নিয়ে কবিতা।

তাঁর পাশে রত্নেশ্বর হাজরা-র কবিতায় বরং মনে হয় কবির নিজের কথাই শুনছি। রত্নেশ্বরও অত্যন্ত সিরিয়স কবি—নিছক ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তাঁর কবিতা অবসিত নয়। তাঁর এই সিরিয়সনেস ও অকপটতা কবিতার শরীরের কাটাছেঁড়া দৃশ্যতায় প্রকাশ করেন। শব্দগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় না বলে বরং বলা যায় তিনিই তাঁদের ফাঁক রেখে-রেখে বসিয়েছেন। অর্থাৎ সবটাই একটা সচেতন নির্মাণ। ফাঁকের মাঝখানে রয়ে যায় অকথিত অভিজ্ঞতার শূন্যস্থান। কিংবা অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতাকে অনুচ্চারিত রেখে তিনি আভাসেই কথা বলেছেন। 'গতকাল আজ এবং আমি'-র (১৯৭০) 'মন্দির' কবিতাটিই ধরা যাক।

ভাঙা পুতুলের মূর্তি বহু সর্বনাম
আমি তুমি সে
ছড়িয়ে পড়েছে
এটা ওটা

কয়েকটা রঙিন হাত
পা চোখ
হৃদপিণ্ডের অংশ কিছু
টুকরো অতীত।

যে-কোনো একটি শব্দ বা যে-কোনো একটি প্রতিমা থেকেই শুরু করেন রত্নেশ্বর—তারপর তা থেকে উঠে আসে ভাবনা, ভাবনামালা—তিনি যেন ছেড়ে দেন ভাবনার রাশকে।

দার্শনিকতার একটা ঝোঁক তাঁর ব্যক্তিত্বেও। ফলে প্রত্ন বা অবচেতনের কথাও ওঠে। কিন্তু মৌলিকতা তো ঠিক এভাবে অর্জিত হয় না। বিশেষত আজ। বড় জোর কিউরিও গড়া যায়। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যা দেখেছি। তাই স্বায়ত্তশাসন ছাড়া, মৌলিকতা বা নিজস্বতার সঠিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া এই দার্শনিকতা টেঁকে না। তখন দেখা যায়, অত দার্শনিক হুঙ্কার সত্ত্বেও, পঞ্চাশের কবিদের মতোই বিষয়ের অভাব। জগৎ-জীবন-প্রাত্যহিকতা ছাড়া, কনক্রিট ছাড়া, লোকায়তিকতা ছাড়া দার্শনিকতার সমস্যা একই—বিষয় আর দৃশ্যস্পর্শগ্রাহ্য থাকে না—তখন বিষয়ের নামে শব্দ নিয়ে খেলা

বা আত্মকণ্ডুয়ন (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ইত্যাদিরাও তাই প্রমাণ করেছেন)। একদা রত্নেশ্বর হাজরা যে তা জানতেন এবং মানতেন, আমরা দেখেছি। কিন্তু, সত্তরের দশকে, বোধ হয় সময়েরই বিশ্বাসঘাতকতায়, তিনি সেই ছদ্ম মৌলিকতার দিকে এগোলেন। ক্রমশ বিষয়ের তাড়না থেকে ছত্রাকার বাক্‌প্রতিমা, তারপর বিচ্ছিন্ন শব্দ, তারপর অক্ষর-ব্রহ্ম—কিংবা শব্দের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে বিষয়হীনতার ঘোষণা। এই হল রত্নেশ্বরের আত্মসমর্পণের ইতিহাস। রত্নেশ্বর এর পরের বই 'এদিকে দক্ষিণ' (১৯৭২) বা 'রাজি আছি'-র (১৯৭৬) বহু কবিতায়—'কেউ বাড়ি নেই', 'এক দুইয়ের খেলা', 'মিশে থাকে', 'কথাগুলো', 'অ আ ই ঈ' ইত্যাদিতে—শব্দ নিয়েই খেলায় মাতেন। নিশ্চয়ই এটা সময়ের বিরুদ্ধেই এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু শুধু পালিয়ে গিয়ে বা আঘাত করে তো বড় কবিতা লেখা যায় না। বিষয় ও ভাষার সচেতন অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতায় নয়, রত্নেশ্বর তাঁর কবিতার অবয়বগত পরিণামের চেহারাতেই মূর্ত করেছেন সময়কে।

রত্নেশ্বর হাজরা কখনো-কখনো বাউলের উদাসীনতাকে আয়ত্ত করার কথা ভাবেন। শুধু রত্নেশ্বর নন, পবিত্র-র কবিতাতেও 'বাউল' শব্দের আসক্ত প্রয়োগ দেখেছি। রত্নেশ্বর বলেন, 'খোলা মাঠে জীর্ণ পাতা উড়ে যায়' যেমন, কিংবা 'শেষতম কৌপীন' উড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি শব্দকেও, শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবনাকেও তিনি ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসেন। এ হল বাঙালিরই রক্তের প্রবণতা। নইলে বাউল কে নয়? অলোকরঞ্জন, শক্তি সকলেই তো নিজেকে বলেন বাউল।

কালীকৃষ্ণ গুহও রত্নেশ্বর হাজরার মতোই অমোঘ জায়গায় উচ্চারণ করেন 'বাউল'। বারবার বলেন নির্বাসনের কথা, চলে যাওয়ার কথা। তাঁর গ্রন্থের নামও 'নির্বাসন নাম ডাক নাম' (১৯৭২)। জানা কথা, এ আসলে অভিমান করে উল্টো বলা। যখন চলে-যাওয়া বলেন, তখন আসলে বলতে চান ফিরে-আসা। রত্নেশ্বর যেমন বিশ্বকে ধরার বাসনাতেই অ-অক্ষরে চলে যান—মহাবিশ্বের জন্যই অণুবিশ্বে। আসলে রত্নেশ্বর ও কালীকৃষ্ণ দুজনেই সিরিয়স, আশাবাদী। কিন্তু আশা-র প্রথম আস্তরণে তাঁদের বিশ্বাস নেই—কালীকৃষ্ণ যেমন বলেন 'সূর্যোদয় দেখবো না'। ষাটের দশকের চিন্তার যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি তাঁদের অভিজ্ঞতায়। তাই আশা-কে বিষয়-কে নগ্ন করে দেখতে চান—নেতির মধ্য দিয়ে হ্যাঁ-কে পেতে চান—চান 'অন্ধকারবীজ'। হয়তো খুব একটা নতুন কথা হল না। কিন্তু ষাটের কবিরা সত্তরে এসে যখন

একথা বলেন, তখন তাঁদের সেটা শুধু মোহভঙ্গ নয়, অভিজ্ঞতারই সূচনা, যেন ইতিহাসের গোড়ার কথা নতুন করে বলা।

কতো দিন তো গেল, আজ আমাদের পরিণতি দিকে দিকে
ছড়িয়ে পড়তে চায়, পাখি ওড়ে···
আমার জন্মদিন আজও আসে, আজ কোনও জ্যোতির্ময়তা নয়, শুধু
অন্ধ তিমিরের মধ্যে একটা প্রার্থনা যেন কেঁপে ওঠে। (জন্মদিন)

রত্নেশ্বর হাজরা, কালীকৃষ্ণ গুহ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়—তাঁদের তুলনায় কবিরুল ইসলাম-এর কবিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বোধহয় কম—দার্শনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো নেইই। কবিরুলের অনুভূতি অনেক সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। চল্লিশের দশকের কবিতার অভিজ্ঞতায় বরং তাঁর কবিতা অনেক চেনা বোধ হবে—যদিও মূলত তিনি বাক্‌সংযমে বিশ্বাসী। তাঁর কবিতায় বিষাদ কখনও স্থায়ী হয় না—প্রসন্নতাসূচক বাক্‌প্রতিমা এসে তাকে গ্রাস করে নেয়। তাঁর কবিতায় থাকে জন্মোৎসবের বা বিবাহোৎসবের বর্ণনা এবং সে উৎসবে জ্যোতির্ময়তা ও 'পুনরুত্থানের পুণ্য'ই উচ্চারিত হয়। কালীকৃষ্ণ গুহ-র ঠিক বিপরীত। 'বিবাহবার্ষিকী ২০'-র (১৯৭৭) পর 'বিকল্প বাতাস'-এও (১৯৭৮) কবিরুল ইসলাম রাত্রির অন্ধকারের কথা বলেন না, ভোরের বাতাসের কথাই বলেন। অন্যেরা অকালবার্ধক্যে পীড়িত, কবিরুল সব সময়ই শুরুর কথাই বলেন, 'এই শুরু। এই ভাবে শুরু।' মাঝে-মাঝে, যেমন শেষোক্ত গ্রন্থের শেষের দিকে অসুখ-এর কথা ওঠে বটে, কিন্তু তা বেশিক্ষণ টিঁকতে পারে না।

আমার বাগানে তবু বিশ্বাসের তরু

অবিশ্বাসী হাওয়া বটে,
পাতার আঙুল
গ'লে ঝরে পড়ে জল,
পাতা নড়ে—
বিরুদ্ধ ডালপালা আর শিকড়ের সবুজ দ্বৈরথে
ভিতরে ভিতরে জ্বলে ঝলসে পুড়ে গেল
বজ্রাহত··

বিশ্বাসের তরু তবু ঊর্ধ্বশির টিঁকে রয়। (নদীর ওপারে)

মাঝে-মাঝে মনে হয়, সত্তরের দশকেও এই অনাবিল বিশ্বাস পান কোথায় কবি? পবিত্র-র রেডিমেড বিষাদ-এর মতোই কবিরুল-এর বিশ্বাস রেডিমেড নয় তো? না হলে তাঁর কবিতায় সময়ের প্রত্যক্ষ ছাপ এত ক্ষীণ কেন?

১২.

ষাটের দশকের একদল কবি একটু অন্যভাবে পাঠকদের হতভম্ব করেছিলেন। এঁদের নাম পুষ্কর দাশগুপ্ত ('শব্দ শব্দ', ১৯৭১), অশোক চট্টোপাধ্যায় ('এবং অন্যান্য কবিতা', ১৯৭২; 'মঙ্গলবার', ১৯৭৬), সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ('পিকাসোর নীল জামা', ১৯৭৯), পরেশ মণ্ডল ('৪৪৪', ১৯৭২; 'পেণ্ডুলাম', ১৯৭৯)। তা ছাড়াও তপনলাল ধর ও মৃণাল বসুচৌধুরী। এঁদের কবিতা একত্রেও প্রকাশিত হয়েছে সত্তরের দশকে—'১৯৭৭' বা '১৯৭৯' নামে।

এঁদের লেখায় যে বৈশিষ্ট্য তাকে আলোক সরকার নাম দিয়েছেন 'চিত্রস্বভাবী কবিতা'। অর্থাৎ কবিতা শুধু পড়ার বা শোনার নয়, চোখে দেখার। এরকম তো আগেও দেখা গেছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সিদ্ধেশ্বর সেন বা এমনকি শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতায়, যেখানে তাঁরা শব্দের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে বা চরণের সজ্জার বিভিন্নতায় একটু চোখে-দেখার এফেক্ট পাঠকের মনে ঢোকাতে চেয়েছেন। কবিতার এটা তো একটা প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু ষাটের এই কবিরা তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা বাহ্যত এত কৌতুককর রূপ নেয় যে দু-এক কথায় এঁদের প্রয়াসকে অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু এটা ভাবা দরকার, এতজন কবি সংঘবদ্ধভাবে এই উদ্যম চালিয়ে যাচ্ছেন কেন। এবং তাঁদের মুন্সিয়ানাও চোখে পড়ার মতো। একটা প্রতিক্রিয়াতেই এরকম ঘটা সম্ভব। আলোক সরকারও বলেন এঁদের কবিতার সংকলিত গ্রন্থের ভূমিকায়। 'পঞ্চাশের দশকের কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য বিভাগ, যা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং এখনও যার জনপ্রিয়তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-শোক-ক্রোধ-আকাঙ্ক্ষাকে চীৎকৃত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বলতে ভালোবাসত।...পঞ্চাশের কবিরা শক্তিমান এবং সেই কারণে পঞ্চাশের প্রত্যক্ষ পটভূমির অনায়াস অতিক্রমণ ষাটের কবিদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তবু ষাটের কবিতার দু-একটি বিভাগ এই আবেগ-আশ্রিত কবিতা রচনার চলতি প্রথাকে নম্রভাবে অস্বীকার করার সংকল্প গ্রহণ

করেছিল।' আলোক সরকারের এই ভূমিকা থেকে এই ইঙ্গিতই কি গ্রহণ করা যেতে পারে যে, শক্তিমান পঞ্চাশের কবিদের পাশে নতুনত্ব সৃষ্টির তাগিদই ছিল প্রধান এর পেছনে? এর বেশি কোনো নান্দনিক জিজ্ঞাসা নয়? চল্লিশের সামাজিক অন্বয়ের আবেগ ও পঞ্চাশের ব্যক্তিগত আবেগ—এই দুইয়েরই সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয়কে বর্জন করতে চাইলেন তাঁরা। আলোক সরকার আরো বলেন, 'কবিতা লিখতে বসে তাঁরা কবিতাকে সেই বিশুদ্ধ শিল্পের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাইলেন যেখানে কবিতা শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে না, একটা অভিভাব, একটা স্পন্দনের ভিতর স্থির বিদ্যুতের মতো উদ্ভাসিত হয়। সমাজ-ভাবনা তাঁদের তেমন আকর্ষণ করে নি, আকর্ষণ করে নি স্ব-ইন্দ্রিয় ভাবনা, দর্শন, এমনকি মননের চর্চাকেও তারা তেমন আমল দেয় নি।' এরকম বাদ দিতে-দিতে অবশ্য হাতে থাকে শূন্য। ভাবতে হয়, তাঁদের কবিতায় এসব কথা সত্যি কিনা। এরকমও বলা যায় নাকি, যা তাঁদের দাবি, তাঁদের 'এই বিশুদ্ধ শিল্পচেতনা'য় 'সমাজ অথবা ইন্দ্রিয় দর্শন অথবা মনন কবিতায় একটি পূর্ণ শিল্পকর্মের রূপ' নিয়েছে? তাঁদের কবিতা সত্যিই 'শেষ পর্যন্ত কিছু বলে না'? তবে কেন রত্নেশ্বর হাজরা বা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা ভাস্কর চক্রবর্তী-র মতো অন্য পথের কবিরাও মাঝে-মাঝে এই ভঙ্গির চর্চা করেন? সে কি জীবনের অর্থহীনতা ও নৈরাশ্যে আত্মসমর্পণের এটা উপযুক্ত ফর্ম বলেই নয়?

যে-সব কবিদের নাম করা হয়েছিল, তাঁরা যে সকলেই একইভাবে এই হরফ-সর্বস্ব (টাইপোগ্রাফিকাল), যাকে বলা হয়েছে 'চিত্রস্বভাবী', কবিতা লিখেছেন এমন নয়—কেউ বেশি কেউ কম, একেকজন একেকরকম। এমনকি এঁদের কারো কারো গ্রন্থে এমন বহু কবিতা আছে, যা এই আঙ্গিকে পড়ে না। যেমন, মৃণাল বসু চৌধুরী। পুষ্কর দাশগুপ্ত-র 'শব্দ শব্দ'-তে এই রীতির একটা সুষ্ঠু উদাহরণ পেয়েছিলাম—তাঁর বহু কবিতায় এই আঙ্গিকের প্রয়োগ বিষয়ানুগভাবে যথোচিত ও উপভোগ্যও। এঁদের দু-ধরণের ভঙ্গি আছে। একটি হল, হরফের ছোট-বড় সোজা-বাঁকা দিয়ে বিষয়ের আদল আনা—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃষ্টি' তার সহজতম উদাহরণ। আর অন্য ভঙ্গি হচ্ছে, হরফ নয়, শব্দের কারসাজি। যেমন, পুষ্কর লেখেন:

এই শহর
এই বাড়ি

এই রাস্তা
এই দিন
এই ট্রাম
এই বাস
এই কাজ
এই সন্ধ্যা
এই লোকজন
এই আড্ডা
এই বন্ধুরা
এই দিন
এই রাত
এই বেঁচে থাকা (এই)

বলা বাহুল্য, বেঁচে-থাকার একঘেয়েমি, অর্থহীনতা, পুনরাবৃত্তি এতে ফুটিয়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে সাবেক রীতির কবিতার পাশে প্রায় ধাক্কার মতো মুদ্রণচতুর তথাকথিত কবিতা। কিছু কবিতায় হরফ উল্টে গেছে, কিছু কবিতায় বিভিন্ন পয়েন্টের হরফে একটি শব্দই পাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে, ইত্যাদি। 'মঙ্গলবার'-এ অবশ্য বহু নিরীহ কবিতা—এত নিরীহ যে তা থেকে অন্যত্র অশোকের এই শাব্দিক উন্মত্ততার হেতু বোঝা যায় না।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় আরো নানারকম কায়দা দেখিয়েছেন, যেমন 'ফর্দ বিষয়ক আলোচনা' বা 'জন্ম : মৃত্যু : এই সব বর্ণাল্পি খেলনা'। এবং

টুথপেস্ট। সাবান। তোয়ালে। চা। টোস্ট। সিগারেট। পাইপ।
সিগার। ট্রেন। ট্রাম। বাস। ব্যাকরণ। ঠাট্টা-ইয়ারকি। টেলিফোন।
সাহিত্যের ইতিহাস। সিগারেট।··· ইত্যাদি ইত্যাদি

(ভ্রমণবৃত্তান্ত)

'৪৪৪'-এ পরেশ মণ্ডল প্রায় আপোসহীনভাবে হরফচতুর। এ নিয়ে চূড়ান্ত কিছু করায় তিনি সবচেয়ে বেশি তৎপর। ছাপাখানার কেস-এ শানায় নি, তাঁকে দু-একটি ব্লকও ব্যবহার করতে হয়েছে। 'পেণ্ডুলাম'-এ অবশ্য, আমাদের সৌভাগ্য, দু-এক পা পিছিয়ে গেছেন। ফলে এই রীতির সার্থকতর প্রয়োগ এখানেই আমরা খুঁজে নিতে পারি। আবেগ গোপনের অন্য রাস্তাও তিনি পাচ্ছেন বলে মনে হয়।

'১৯৭৭' এবং '১৯৭৯' সংকলন দুটি পড়ে মনে হয়, শুধু পরেশ মণ্ডলই নয়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় সকলেই এই রীতির অতিসর্বস্বতা থেকে উঠে আসতে চাইছেন—তথাকথিত চিত্রস্বভাবী রীতির পরিণত ব্যবহারের উপার্জনটুকুকেই নিতে চাইছেন। এবং তখন কিন্তু দেখা যায় এ-ব্যাপারে সুভাষ-সিদ্ধেশ্বর-শঙ্খের কৃতির বাইরে তাঁদের অভিনবত্ব খুবই কম। আর অতিরিক্ত যেটুকু তাতেই বা কি নতুনত্ব? ফরাসী কবিতার যে কোনো সংকলনেই এর আসলটা পাওয়া যাবে সহজেই। গীওম আপলিনেয়র প্রমুখের মধ্যেই সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল সকলকেই।

১৩

একদিকে দার্শনিকতার ভঙ্গি, অন্য দিকে শুদ্ধতার অজুহাতে চিত্রস্বভাবী কবিতা —এই আবহাওয়ায় সামাজিক দায়বদ্ধ কবিতাকে লড়াই করে টিঁকে থাকতে হয়েছে ষাটের দশকে। কারণ ইতিমধ্যেই এই ধারার রচনার ফ্যাশন আর নেই, রোমাঞ্চও নেই। সে-রোমাঞ্চ বরং রাজনৈতিক অতিবামপন্থীরা কুড়িয়ে নিয়েছেন। তাই ষাটের দায়বদ্ধ কবিরা যখন সত্তরের দশকে কবিতা লিখতে বসেন, তখন কারোর সহজ প্রশ্রয় তাঁদের প্রত্যাশায় থাকে না।

এঁদের মধ্যে দুজন আমাদের আগেই মন কেড়ে নিয়েছেন—একজন রণজিৎ সিংহ, অন্যজন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। বর্তমান আলোচক রণজিৎ-এর কবিতার দীর্ঘ দিনের অনুরাগী। এরকম সময়চেতনায় সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ, অথচ শব্দের প্রতি গভীর মমতা অল্প কবির মধ্যেই দেখা যায়। সত্তরের দশকে তাঁর যে বইটি বেরিয়েছে তার নাম 'জন্মের ভিটে' (১৯৭৭)। ষাটের দশকে 'অনুক্ষণ মনে মোর' থেকেই আমরা বিস্মিত রণজিৎ-এর কাব্যভাষার পরিচ্ছন্ন সংবেদনশীলতায়। একগুচ্ছ সনেটে প্রায় শেক্সপিয়রীয় কণ্ঠস্বরে তিনি শুনিয়েছিলেন আমাদের স্বদেশের ও স্বকালের কথা। এবার 'জন্মের ভিটে'র গদ্যের চালে তিনি তিক্ততা ঘৃণা ক্রোধ ও গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেন চারপাশের ঘটনা ও মানুষকে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে প্রচণ্ড তীব্র আবেগ, অথচ তার সংহত প্রকাশ—রণজিৎ-এর মতো এরকম সমন্বয় বিরল। তিনি যে যে বিষয় নিয়ে আবেগ প্রকাশ করেন, তা যে খুব অপরিচিত তা নয়। কিন্তু যে গুণে আলাদা হয়ে যান তিনি, তা তাঁর ঐ শব্দচেতনা। সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা তাঁর আপোসহীন, সংবাদপত্রের ঘটনাও তাঁর বিষয়—উত্তেজনা প্রকাশেও তিনি পিছপা নন—কিন্তু কথার তোড়েও দক্ষ

চেতনা হারান না, কবিতার শরীরে কোনো শৈথিল্য ঘটান না। 'অনুক্ষণ মনে মোর'-এ দেখেছি, এখানেও, নিত্যকার সুখদুঃখকে, কিরকম অনায়াসে তিনি বড় পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে যেতে পারেন, সিদ্ধেশ্বর সেনে যেমন দেখেছি, এবং গ্রামীণ ও শহুরে লোকায়ত কথ্য চালে তিনি তাঁর স্বাভাবিক স্বরগ্রামকে বজায় রাখতে পারেন। অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কারোর কাছেই শিক্ষা নিতে তিনি গররাজি নন। তাঁর সামনে শিল্পীর ইমেজ চিত্তপ্রসাদ, ঋত্বিক ঘটক। তাঁদের নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। ব্যঙ্গ বা ক্রোধে যেমন, তেমনি অন্যদিকে আবার জীবনের স্ফূর্তির উল্লাসের গানেও তাঁর তুলনা নেই।

> হাতে হাতে ধরে পায়ে পা মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে আকাশে মাথা তুলে মাটিতে মাথা ঝুঁকিয়ে সবাই নাচি। এস পড়শি। এস ভিনদেশি সুজন। সম্মিলিত গানের তালে তালে নাচি।
>
> হেই দিদা, তোর তোবড়ানো গানে লাগল আবীর গুলাল! আরে ও বাথানের ছোঁড়া, তোর পায়ে ঘুঙুরের ঝরনা! ও ছুঁড়ি, ওগো বালা, চোখ দুটো কি তোর খঞ্জনা! ও ভাই ভিনদেশি, তোমার হাঁড়িমুখ যে টসটসে মৌচাক!
>
> নাচো নাচো যেমন নাচে গরবায়। হাতে হাত ধরে পায়ে পা মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে আকাশে মাথা তুলে মাটিতে মাথা ঝুঁকিয়ে, জোয়ান বুড়ো মেয়ে মদ্দ চেনা অচেনা রবাহুত অনাহুত সবাই, নাচে ফসলের সুরে জন্মের সুরে বাঁচার সুরে। (যেমন নাচে গরবায়)

এই সম্মিলিত জীবনের আনন্দ কোনো সহজ আশাবাদ নয়, এ স্বপ্ন পৌরুষের স্বপ্ন।

রণজিৎ সিংহের কবিতা পড়তে-পড়তেই মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কথাও মনে পড়ে যাবে। ঠিক সেরকমই পরিপার্শ্ব-সচেতন, পরিবেশের দুঃখ ও অন্যায়ে ক্রোধদীপ্ত, উচ্চণ্ড আবেগেও শব্দচেতনায় সংহত। মণিভূষণের কবিতায় ব্যঙ্গের স্থান অবশ্য বেশি এবং বর্ণনাভঙ্গিও একটু নাটকীয় ও কাহিনীমুখী। অবশ্য সেটা প্রথম যুগে যতটা ছিল, এখন তা কমে এসেছে। এখন তাঁর জায়গায় মানবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অনেক বাঁকা ছবিও এসেছে—যেমন 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' (১৯৭১) গ্রন্থের 'দুপুর' কিংবা 'রাজহাঁস' সনেটগুচ্ছে।

ঐ গ্রন্থেরই শেষের দিকের 'কম্পোজিটারকে' বা 'সাহিত্যএকাডেমিকে খোলা চিঠি' বা 'এই বইয়ের কম্পোজিটারকে' ধরনের সোজাসুজি ব্যঙ্গ ও সহানুভূতির কবিতাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় রণজিৎ সিংহের 'খোলা চিঠির বয়ানে ঋত্বিক-কুমার ঘটককে' কিংবা 'বর্তমান প্রসঙ্গ' বা 'লেনিন উৎসব' বা 'কোনো কবি সম্মেলনে'। রণজিৎ সিংহ অবশ্য ব্যঙ্গ ও আবেগকে খেলান প্রায় সাংগীতিক দক্ষতায়। মণিভূষণের কবিতায় ব্যঙ্গের মিশেল একটু বেশি।

মণিভূষণের পরের বই, অর্থাৎ সত্তর-দশকের দ্বিতীয় বই 'গান্ধীনগরে রাত্রি'-তেও আমাদের চেনা মণিভূষণকেই পাওয়া যায়। সামাজিক ঘটনা ও দুর্ঘটনায় তাঁর ক্রোধ, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা, মানবিক অনুভূতির প্রায় গোটা চেহারাটা প্রকাশ পায়, কোনো শ্লোগানে নয়, প্রত্যক্ষের স্পর্শে, ভাষার স্পর্শ-গ্রাহ্যতা ও ঋজুতায়, নাটকীয়তা ও গীতিময়তার সার্থক সমন্বয়ে। মণিভূষণ যে অনায়াসে হাল্কা চালের ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে ক্রোধ কিংবা তা থেকে ইতিহাস-কথনের চূড়ায় অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তার একটি অসামান্য উদাহরণ এ-গ্রন্থের 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতাটি। দেবী সরস্বতী, যিনি মধ্যরাত্রে গভীর সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন, যিনি আজ রবিশঙ্করের হাতে পাড়ি দেন মার্কিন মুলুকে কিংবা এখন যাকে বন্দনা জানানো হয় পাড়ার প্যাণ্ডেলে শচীনদেব বর্মনের মহব্বতের গানে, সেই সরস্বতী হঠাৎ :

> হাতের পুথি নিক্ষিপ্ত হল, সমুদ্রগর্ভে, দেবী
>
> ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন উর্ধ্ব আকাশে—
>
> কেড়ে নিলেন
>
> কালপুরুষের খড়্গ…

বেরিয়ে এল কালিকার সংহার-মূর্তি—ঝুলতে লাগল উপাচার্য বা শিক্ষামন্ত্রী-দের ছিন্ন মুণ্ড। এর পর শেষ স্তবকে এই ব্যঙ্গকে মেলান সান্নাইয়ে।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকজন কবির কথা উঠতে পারে। সত্য গুহ বা গণেশ বসু-র একরোখা যৌবনের কবিতা এক সময়ে অনেকেরই নজরে পড়েছিল। তবে এ-দশকে কি তাঁদের কোনো বই বেরিয়েছে? ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য অনেক নিচু গলায় কথা বলেন, কিন্তু বলেন খুব তীব্রভাবে। তাঁর 'অদ্ভুত ধুলায়, ভুল ঘাসে' গ্রন্থে (১৯৭৪) আমরা নাগরিক লিরিসিজমের একটা আদল খুঁজতে চেয়েছিলাম সমর সেনের মতো—অন্তত যেখানে তিনি কৈশোরক স্বপ্নাচ্ছন্ন কবিতা পার হয়ে শেষপর্বে ভাষার সন্ধানে ফিরছিলেন।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য তাঁর 'পিপাসার দেয়ালে সবুজ' গ্রন্থে (১৯৭৪) লিখেছেন :

দুরন্ত স্রোতের মধ্যে ভেসে যাচ্ছি
স্থির লক্ষ্য বলতে কিছু নেই…
বিশীর্ণ নদীর মতো
সুস্থতাও পদ্মপত্রে জল… (পুরোনো বন্ধুর মত)

স্বভাবতই এরকম পরিবেশে যে-কবি শুধু ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়েই মগ্ন নন, তার মনে তিক্ততা আসবেই এবং সেই তিক্ততা থেকে গোবিন্দ ভট্টাচার্য কয়েকটি অসামান্য ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেছেন—'একটু হাসুন', 'ধাঁধা', 'বাড়ি যখন যেতে বলেন' এরকম বহু কবিতা। বলা বাহুল্য ব্যঙ্গটা এখন আর শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, ছদ্মবেশী মিত্রকে নিয়ে, নিজেকে নিয়েও। অবশ্য তাঁর মানে এই নয় যে নৈরাশ্যে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন—এখনও তাঁর এই কণ্ঠস্বর অম্লান :

স্বদেশী ও বিদেশী বন্ধুরা
বিশ্বাস করুন
নেরুদা নিহত নন—মৃত মাত্র। (বিঘোষিত শোক)

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লৌকিকের মাছ' (১৯৭৪) গ্রন্থে সময়কে বলেছেন 'দজ্জাল মাতা'। এই স্মৃতিপ্রবণ বিষণ্ণ কবির বুকের গভীরে 'ঘাই মারে লৌকিকের মাছ'। তবু এরই মধ্যে তিনি অপেক্ষা করে আছেন কবে 'ফস্ করে জ্বলে ওঠে বারুদের কাঠি!' আর অমিয় ধর তাঁর 'বিষণ্ণ কৌতুকে' (১৯৭৩) গ্রন্থে আঁকেন 'এই দেশ আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের প্রতিমা'।

'অন্তর্গত নদী'-র (১৯৭০) সুখী জগৎ ছেড়ে রবীন সুর-এর 'আনুষঙ্গিক আর্তনাদ'-এ (১৯৭২) সমকালীনতার প্রায় নিষ্ঠুর ছাপ আছে। রাজনীতির দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কলহ হঠকারিতা তাঁকেও বিমূঢ় করে, কিন্তু যে-ব্যাপারে বিমূঢ়তা নেই, আছে কেবল যন্ত্রণা, তা হল এ-দশকের রক্তপাত, মৃত্যু, হত্যা। রবীনের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই তার কথা আছে, আছে তীব্র বেদনাবোধ।

ফুলের দোকানগুলি কসাইরা কিনে নিয়েছে
কাছাকাছি ফুল নেই
মালা আনতে দেরি হবে
মৃতদেহ মর্গে সনাক্ত হতে হতে আরও দেরি……(পাহারা)

নকশাল আন্দোলনের বিপ্লবীদের এ-যুগের বিভ্রান্ত কিন্তু বীর রাজপুত্র

হিসেবে বন্দিত করাটা খুব চালু, এমনকি রাজনৈতিকভাবে অবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের মুখেও। কবিদের কাছে তো হতেই পারে। সত্তরের দশকের বন্ধ্যা জমিতে মীথ-সন্ধান চরিতার্থ হয় এই আরোপে। 'কারা এসেছিল' কবিতায় রবীন সুর-ও সেখানেই 'ফেরারী যৌবন'-এর খোঁজ পান।

মধ্যরাতের নদী পেরিয়ে কারা এসেছিল

কারা এসেছিল...

পরবর্তী 'রাবণের সিঁড়ি'-তে (১৯৭৮) অবশ্য এই অব্যবহিত অভিজ্ঞতার উত্তেজনা পার হয়ে অনেক স্বস্থ হয়েছেন তিনি। শুধু ঘটনা-বিশেষের নয়, তার মধ্য দিয়ে নির্বিশেষের দিকে তাকাতে পারছেন। ভাবতে পারছেন 'এক ধুক পিপাসার ঋতু'-র কথা। বলতে পারছেন :

যাই যাই প্রতিদিন তবু আছি অপেক্ষায়

বীজের শরীরে আমি মহামহীরুহ প্রত্যাশায়...(প্রতিদিন যাই)

রবীন সুরের মতোই তুলসী মুখোপাধ্যায়ও এই 'সময়' নিয়েই ব্যস্ত—তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থেরও নাম 'সময় আসবে'। তুলসী-র কবিতার একটা বড় সুরই হল আত্মধিক্কার ও আত্মসমালোচনা। ধিক্কার আমরা এড়াতে পারি না ঠিকই, ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর বিচারক। তুলসী যেন ইতিহাসের সেই বিবেকের কণ্ঠস্বর নিয়েই আমাদের সমস্ত মধ্যবিত্ত বিভ্রান্তি, মেকি বিপ্লবীপনা, নানাবিধ অসংগতি-র মুখোশ খুলে ফেলে আমাদের একেবারে রাস্তার মাঝখানে টেনে আনতে চাইছেন। বিবেকাচরণ হিসেবে খুবই মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই, শুধু আত্মবিলাপের পুনরুক্তিতেই কি আমাদের জ্ঞান ফিরবে? তুলসী কেবলই বলেন, 'খারাপ মানুষ অবিরাম খারাপ করে পৃথিবী', কিংবা 'জন্মাবধি এরকম পলাতক আমি / জন্মাবধি আমি এমন বিমূঢ় পাতক!' এরকমই উক্তি পাওয়া যাবে 'মিথ্যে হয়ে গেলাম', 'সেরকম মানুষ' জাতীয় কবিতায়। কথাগুলি হয়তো ঠিকই, কিন্তু কেবল দোষারোপে কি কবির দায়িত্ব শেষ হয়? অবশ্য 'অন্ধকারের প্রতিবাদে'-র (১৯৭১) পর 'সময় আসবে' (১৯৭৬) গ্রন্থে দোষারোপ ও আত্মবিলাপই সব কথা নয়, কবি তাঁর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার জগতকেও মেলে ধরেছেন। বিবেকদংশনের ঘোষণা ও আত্মধিক্কারের পাঁচালিতে নয়, এই আকাঙ্ক্ষিত জগতের চিত্রণেই তুলসীর প্রতি আমাদের ভরসা।

দেব দারুর মতো খাড়া শিরদাঁড়া

কথা বলব

স্পষ্ট
মানুষের গলায়
একদিন
বসুন্ধরা বকেয়া পাওনা মেটাবে
শীতের সূর্য দেবে প্রাপ্য উত্তাপ
নির্মল বাতাস বইবে ঘরের উঠানে।...(সময় আসবে)

শুভাশিস্ গোস্বামী-র 'সময়ের রোদে জলে' (১৯৭৯) এবং বয়ঃকনিষ্ঠ অনন্ত দাশ-এর 'সময় আমার কণ্ঠে' (১৯৭৮)—উভয়ের কবিতার নামকরণেও স্পষ্ট ব্যক্তিগত কবিতার ভ্রান্তিকে নয়, তাঁরা সময়কেই অবলম্বন করেছেন। শুভাশিস্ লেখেন 'ভিয়েতনামের জন্যে' বা 'হাতে হাত রাখো'। তিনি হাতে তুলে নিতে চান 'নীরোর মত বাঁশী নয়'—কালীয়দমনের জন্য মুরলী। নিজেকেও সমঝে দেন :

স্মৃতিভ্রষ্ট ভুলে গেছি—
কালের রথের চাকা শূদ্রের হাতেই ঘুরে যায় ?
(কালীয়দমন)

অনন্ত দাশ-ও আমাদের অসুখের দুঃখের কান্নার কথা বলেন এবং স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন এ-দুঃখ ব্যক্তিগত নয়। সত্তরের দশকে তাঁর প্রথম গ্রন্থের নামই ছিল 'আমার নিজস্ব কোন দুঃখ নেই' (১৯৭১)। যদি-বা কখনো ব্যক্তিগত দুঃখ অনুভূত হয়, বুঝতে হবে পারিপার্শ্বিকের শোকেই তা ব্যক্তিগত।

সবাইকে সুখী দেখতে চেয়ে দিনে দিনে
বেড়ে যাচ্ছে আমার অসুখ। (অসুখ)

অনন্ত দাশের 'সময় আমার কণ্ঠ'-তে সেই অসুখ ও যন্ত্রণার উৎস অন্বেষণের কথাই বারবার বলা হয়েছে।

শিবেন চট্টোপাধ্যায়ও এই ধারারই একজন কবি। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর কবিতার পরিমাণ বিপুল—ফলে বোধহয় 'শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৮) বের করতে হয়েছে। এর মধ্যে সংকলিত 'নির্বাসিত জ্যোৎস্নায়' ও 'তুমি স্মৃতি রক্তের গভীরে' গ্রন্থ দুটি সত্তর-দশকের। শিবেনের এ-সময়ের একটা বড় বৈশিষ্ট্য কবিতার পর কবিতায় তিনি বাংলাদেশের রূপকথা-ব্রতকথার জগতকে অবলম্বন করে দেশের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী শুনিয়েছেন।

পুণ্যিপুকুর শুকিয়ে গেছে
পুষ্পমালার ফুলগুলো সব ঝরে
দুপুর বেলা পূজার ঘরে
লীলাবতী তোমার মন্ত্রধ্বনি
আজকে এত নীরব কেন
ঈশান কোণের মেঘখানি ছাখ বড়ই থমথমে।

(পুণ্যিপুকুর শুকিয়ে গেছে)

এই 'স্বদেশ'-কে আবর্তন করেই শিবেনের যত কিছু আবেগ ও বিষাদ।

শুভ বসু পূর্বোক্ত কারো কারো তুলনায় একটু জটিল—তাঁর কবিতার বিষয়ও অপেক্ষাকৃত বিচিত্র। কবিতার এই বিষয়বৈচিত্র্য নিছক বাইরের দিক থেকে নয় বা তথ্যে নয়—উচ্চারণের নিজস্বতায় ও শব্দব্যবহারের সচেতনতায় তিনি কিছুটা বৃহত্তর মানস-জগতের আভাস দেন। অথচ সে জগৎ যে পূর্বোক্ত কবিদের থেকে স্বভাবে আলাদা তাও নয়। কিন্তু শব্দের নৈপুণ্যে ও নিছক উপমা-রূপকের বৈচিত্র্যে তিনি একটু আলাদা হতে পারেন। হয়তো খুব বেশি নয়—প্রথম কাব্যে ('রাত যায় পুবে', ১৯৭৭) এর চেয়ে বেশি আশা করাও যায় না সব সময়। সব চেয়ে আশঙ্কার কোনো কোনো পূর্বসূরিদের বাচনভঙ্গি, এমনকি মাঝে মাঝে একটি-দুটি বাক্যাংশ যে তিনি বেমালুম ব্যবহার করে ফেলেন, তাতে হয়তো তাঁর কাব্যবোধের অনিশ্চয়তাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাপরহীন মৌলিক ভাবণের অহমিকা বর্জন করে ইতিহাসবোধেরও প্রমাণ দেন তিনি।

'রূপকেও আরেক ইঙ্গিত' কবিতায় 'মারী, অন্ধকার, হানাহানি, ঘাতকের অভিজ্ঞতা'-কে মূর্ত দেখেছেন অমাবস্যার অন্ধকারে কালিকা মূর্তিতে। 'হাতের মুদ্রায় তবু সে দেখায় স্বস্তি, বরাভয়'—এখানেই রূপকটিকে আশ্চর্য মনে হয় কবির। 'প্রায় স্বাধীনতারই এক সমানবয়সী' কবিতায় কবির তিক্ত চেনা পরিবেশ, 'এ্যাংলোইণ্ডিয়ানমুখী কিণ্ডারগার্টেন', 'নিদ্রাতুর ভারতবর্ষ', 'বালিয়াড়ি তরঙ্গের রুক্ষ কলরোল', আচমকা-পেয়ে-যাওয়া 'অন্বয়ের অস্পষ্ট অর্থ'—সব মিলিয়ে শুভ-র কবিতার বুনট নিঃসন্দেহে উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

দীপেন রায় তাঁর 'ঘরে বড়ো বিষ' গ্রন্থে (১৯৭৮) শুভ-র মতোই স্বদেশ ও স্বকালের কথা বহুধা বৈচিত্র্যে প্রকাশ করেছেন। প্রভাত চৌধুরীর 'ব্যক্তিগত কবিতা' (১৯৭৩), এমনকি তার অন্তর্গত 'ব্যক্তিতন্ময়তার কবিতা' আসলে যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তিগত থাকা সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধিরই

কবিতা। অবশ্য দীপেন রায়ের কবিতায় সমসাময়িকতার চাপ যতটা প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ, ততটা প্রভাত চৌধুরী বা অরুণাভ দাশগুপ্ত-র কবিতায় নেই। অরুণাভ-র 'সামনে নির্জনে আমি'-তে (১৯৭১) সময়ের কথা আছে আরো অন্তর্লীন ভাবে। অরুণাভ-র কবিতায় উত্তেজনা অনেক কম। নম্র শান্ত কণ্ঠে তিনি বিশ্বাসের কথা বলেন বটে, তাতে তাঁর উচ্চারণে কিন্তু কম জোর পড়ে না।

এই সব দায়বদ্ধ কবিদের কবিতায় আমাদের যেমন স্বস্তি, তেমনি ক্ষোভও যে থাকে না এমন নয়। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের স্বীকৃত নন্দনেরই সঙ্গী। এঁরা যে যন্ত্রণা ও স্বপ্নের কথা বলেন তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও অনুভূতি-স্পন্দন আমাদের খুবই চেনা-জানা। স্বস্তি মেলে বটে, কিন্তু এই সারল্য আমাদের একটু অন্যমনস্কও করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা কোনো যান্ত্রিক ছকে নিয়ে যাচ্ছে না তো? সাহিত্যের মজাটাই এই, আমরা নন্দনের আপোস বা বিচ্যুতি চাই না, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে খুঁজি কল্পনার নতুন দিগ্বিজয়, শব্দের দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার। সবচেয়ে প্রিয় কবিরও অনুকারককে পছন্দ নয় মোটেই। এসব ভাবতে-ভাবতেই আমরা এই কবিদের আঁকড়েও ধরে থাকি, আঁকড়ে ধরার কারণও থাকে তাঁদের মধ্যেই।

১৪.

সুতরাং ষাটের এই প্রগতিবাদী কবিদের কবিতা লেখাটাই একটা লড়াই সেটা বুঝতে হবে। একদিকে উড়নচণ্ডী 'বিদ্রোহী' কবিদের খাতির বিজ্ঞাপনে বা বাজারী কাগজে, অন্যদিকে কল্পিত বিপ্লবের আঁচে আগুন পোহানোর আহ্লাদ—উভয় থেকেই তাঁরা বঞ্চিত। তাঁদের কবিতায় কিছুটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের নিষ্প্রাণতা এসে যায় সত্যি সত্যি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াইটাও দেখবার। রাজনীতিতে বিরূপ সময়ের চাপে বামমার্গী বা দক্ষিণ-মার্গী উভয় দিকেরই সহজ সমাধান এড়িয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতার বোধ ও প্রকৃত বৈপ্লবিক চেতনা যেমন টিঁকিয়ে রাখা কষ্ট—তেমনি নৈরাজ্যবাদী বা অতিবিপ্লবী আত্মতুষ্ট নন্দনের হাতছানিকে গ্রাহ্য না করে প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যসূত্রেই ভাষাশিল্পের চর্চা মনের তাগদেই সম্ভব। বিশেষত হাতে-হাতে নগদবিদায়ের ব্যবস্থা যেখানে কোথাও নেই।

পঞ্চাশের ক্লান্তিবাসী বিদ্রোহ এবং তার নানা আঁকাবাঁকা পরিণতি, যথা হাংরি জেনারেশন ইত্যাদিদের কার্যকলাপ—এসবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

প্রভাবজাত একটা ধারা স্বভাবতই অব্যাহত সত্তরের দশকেও। তাই দেখি 'বেলাল চৌধুরীর কবিতা'-র (১৯৭২) 'ট্রান্সপ্লানটেড অরণ্য, কলকাতা' কবিতাটি বা 'আঁশটে গন্ধ / শরীর দিয়েই শরীর থেকে শব্দ এবং আগুন' এরকম লাইন, কিংবা যোগব্রত চক্রবর্তী-র 'যাদুঘরে সূর্যাস্ত' (১৯৭৮) বা 'স্বজন বিদ্রোহ'-তে (১৯৭৮) 'ন লক্ষ কিশোরীর উদ্ধত স্তন ন লক্ষ প্রৌঢ়া রমণীর শান্তিময় কোল' ইত্যাদি। শম্ভু রক্ষিত-এর 'প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না' (১৯৭২) ও 'রাজনীতি' (১৯৭৬)—প্রথম গ্রন্থে যে-কবি বিচিত্র ব্যাপ্ত বিষয় নিয়ে শব্দের সমুদ্রে হাবুডুবু খান, খেলা করেন, পরের গ্রন্থে একই সঙ্গে একনায়কতন্ত্রী জরুরি ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্র নিয়েও খেলা করেন। এঁরা যে সকলে সচেতনভাবে কৃত্তিবাসী উন্মার্গগামিতার উত্তরাধিকারকে স্বীকার করেন, এমন হয়তো নয়—কিন্তু ঐ ঐতিহ্যের আবহাওয়াতেই এঁদেরকে ভালোভাবে বোঝা যায়।

কিছুটা পরিধির বাইরে, কিন্তু কাব্যচিন্তার নৈরাজ্যের দিক থেকে সমান্তরাল এরকম বহু কবি আছেন। যেমন, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেমন্তের বিষ'-এ (১৯৭৪) আবার রাজনীতি-বিরোধিতা ও ছদ্ম-দার্শনিকতা, কিংবা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র 'কফিন কিংবা সুটকেশ'-এ (১৯৭২) চূড়ান্ত বিষয়হীনতায় বিচ্ছিন্ন সংযোগবিহীন বর্তমানের ছবি। এই সব চেষ্টায় চাতুর্য বিস্তর—শব্দের বা ছন্দের ব্যবহারে তাঁদের তৎপরতার প্রমাণও আছে। কৃত্তিবাসী বিদ্রোহের বহু লক্ষণ, যেমন উৎকট যৌনতার চর্চা, শব্দের বিশৃঙ্খলা ও বিসংগতির মধ্যে নতুন সংগীত সৃষ্টি, এসব কিছু কিছু আছে। শম্ভু রক্ষিত শব্দে-শব্দে সংঘর্ষের সংগীতে কখনো উৎপলকুমার বসু-কে স্মরণ করিয়ে দেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত দেখান পুষ্কর-সজল-পরেশ-এর বিষয়হীনতা-চর্চার অন্য আঙ্গিক।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এঁর মধ্যে একটু স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করেন—তাঁর নিজের কাব্যকৃতির জন্যও বটে, পরবর্তীকালে সত্তরের দশকের কবিদের কিছু কিছু ঝোঁক তাঁর উপসর্গের মধ্য দিয়ে চেনা যায় বলেও বটে। বুদ্ধদেব তাঁর 'হিমযুগ' গ্রন্থে (১৯৭৭) প্রত্যেকটি বস্তুকে অনুষঙ্গবিহীন পরি-প্রেক্ষিতহীন ভাবে দেখেছেন। 'দিনগুলি, যখন সমস্ত কিছু হিমঘরে বসে দেখা পরীক্ষামূলক ছায়াছবির মতো।' এও নতুন কিছু নয়, ইওরোপে অস্তিবাদী দর্শন বা তার নানা শাখা-প্রশাখায় বয়স তো অনেক হল। তাই বুদ্ধদেব যখন বলেন, 'জুতোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা কালো /

বাঁকা নখের ভারি পা, যার কথা আমরা জানতামই না কখনো', তখন আমাদের খুব অচেনা লাগে না। এই অনুষঙ্গবিহীন বস্তুগুলি শব্দগুলি ক্রমশ তাঁর কবিতায় স্বাধিকার পেয়ে যায়, স্বাধীন হয়ে ওঠে, শুরু হয়ে যায় তাদের পারস্পরিক মুক্ত আচরণ, অতি-বাস্তব ধাঁচে। তখন মানুষ সার্ট পরতে গিয়ে দেখে 'সার্টের লম্বা হাত জড়িয়ে ধরলো তাকে', 'প্রেসার-কুকারের বিশাল পেটের ভিতর ঢুকে যায় মানুষ', মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে 'মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী, মেশিন মা-বাপ।' এই জীবন-বিরোধী হিমঘরই বুদ্ধদেবের জগৎ।

এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে তথাকথিত হাংরি জেনারেশন-এর কাজকর্ম—শৈলেশ্বর ঘোষের 'অপরাধীদের প্রতি' (১৯৭৪) কিংবা ফাল্গুনী রায়ের 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' (১৯৭৩) বা এমনকি বোধহয় দলছুট দেবী রায়ের 'মানুষ, মানুষ' (১৯৭১)। পূর্বোক্ত নৈরাজ্যকেই এখানে পাওয়া যাবে আরো লাগামছাড়া, আরো ব্যাকরণজ্ঞানহীন, আরো অপ্রাসঙ্গিক ও বিকৃত যৌনসর্বস্ব। অবশ্য দেবী রায় বোধহয় এখন এঁদের থেকে একটু আলাদা। 'মানুষ, মানুষ'-এই হাংরি জেনারেশনের অশিক্ষিত রূঢ়তা থেকে তিনি বোধহয় সরে আসছিলেন, 'সাম্প্রতিক তিনজন'-এ সেই রূপান্তর আরো স্পষ্ট। ঐ গ্রন্থে 'চিঠি' বা 'কাকে দোষ, কাকে বা অভিসম্পাত'-এ আমরা তাঁর চিন্তায় সামাজিক মাত্রা-যোজনাও টের পাই। কবি যখন পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আঁধার আঁধার এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যা', তখন আমরা তাঁর কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় বিচলিত হই। আরেকজন শংকর দে ছোট ছোট আকারের পুস্তিকা লিখেছেন—'কালি দিয়ে লেখা শাদা পাতা' (১৯৭৭) এবং শেষ 'সঙ্গীতে সঙ্গতে' (১৯৭৯) পুস্তিকায় বেশ কিছু ভালো লাইন নজর কাড়ে। মাণিক চক্রবর্তী-ও তাঁর 'প্রাণী ও ভিক্ষুক' গ্রন্থে (১৯৭৮) বিচিত্র, ব্যক্তিগত ও অসংলগ্ন জগৎ তৈরি করেছেন, যার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করা খুব মুশকিল। অনন্য রায়-এর 'দৃষ্টি অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু'-তে (১৯৭২) বেপরোয়া যুবকের কিছু লক্ষ্যহীন কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে।

অন্য দিকে, আরো একটা সস্তা পথ অতিবিপ্লবীপনার উত্তেজনা। অবশ্যই অনেক আত্মত্যাগ ও জীবনদান সেই উত্তেজনার পরিণতি —কিন্তু কাব্যচর্চায় অতিবিপ্লবীদের কার্যকলাপ প্রায় নৈরাজ্যবাদীদেরই সমতুল্য। এ-সময়ে প্রকাশিত বহু পত্রপত্রিকায় সেই সব কাব্যবোধহীন

উত্তেজনা-প্রচারের নমুনা আমরা দেখেছি। কিন্তু পুলক চন্দ-সম্পাদিত 'রক্তে ভাসে স্বদেশ সময়' (১৯৭৭) পড়ে আমাদের কিছুটা উল্টো অভিজ্ঞতাই হয়। সংকলনটির দ্বিতীয় শিরোনাম 'সত্তরের দশকের কবিতা'। সম্পাদক বলেছেন, নকশালবাড়ির প্রেরণায় সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের ধ্বনি বা 'জাতীয় ইতিহাসে' সম্মানিত যাবতীয় ঘটনা বা ব্যক্তির সঙ্গে সংঘাত সত্তরের দশককে বিদ্রোহের দশক করেছে এবং সেই সূত্রেই নিশ্চয় তাঁর এই সংকলন সত্তরের দশকের সংকলন। কিন্তু এখানে, দেখা যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মণিভূষণ ভট্টাচার্য বা রণজিৎ সিংহ বা নবারুণ ভট্টাচার্য-ও আছেন, যাঁদের কবিতা সম্পাদক-নিন্দিত 'মানুষের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক ভালোবাসা ও সমাজবিপ্লব সম্পর্কে তত্ত্বজাত বিশ্বাসে'র বাইরে কেন জানি না। তার বাইরেও, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রায় সকলেই কবিতার শরীরে শিল্পীর মতোই মনোযোগী, বাইরে যতটা ভাঙচুরে বিশ্বাসী কবিতার শরীরে নয়, বাইরে যতটা ক্রুদ্ধ, কবিতায় প্রায় ততটাই প্রথাসিদ্ধভাবে আবেগ-লালিত। অতনু চট্টোপাধ্যায় ('দ্বিগুন জোরে শক্ত হাতকড়ি ভেঙে ফেলছে মানুষ/ভাঙার মট্‌মট্ শব্দ এই কবিতায়'), প্রসূনকুমার মুখোপাধ্যায় ('বেনিয়ার পদলেহী মিশ্র রক্তের গর্বে গর্বিত অভিজাত শহরের...'), সনৎ দাশগুপ্ত ('কে রোখে রক্তের পথ/মারের বদলে মার'), অমিত দাশ ('দালাল ট্রামের ছোটাছুটি')—এঁরা অবশ্য তাঁদের রাজনীতির মতোই কবিতার লাইনেও হঠকারিতার পূর্ব-একটি যুগকে মনে করিয়ে দেন।

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভালবাসা আর স্বাধীনতার গান'-এ (১৯৭৩) কিছু কিছু স্মরণীয় লাইন লিখেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট আবেগ ছাড়া তাঁর কাব্যরচনার অন্য কোনো তাগিদ আছে বলে মনে হয় না—এমনকি 'অস্ত্রের মুখের দিকে অস্ত্রগুলি' পর্যায়ের ক্রুদ্ধ 'বিপ্লবী' কবিতা-গুলিতেও। বরং সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় বা সব্যসাচী দেব বা সাগর চক্রবর্তী অনেক সময়ই সত্যিকারের কবিতার স্বাদ এনে দেন। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লক্ষ চোখের সামনে' (১৯৭৩) ও 'কী আছে এই হাতের মধ্যে' (১৯৭৫) গ্রন্থ দুটিতে সত্তরের ঐ 'ভাঙচুর' দিনেরই কাব্যরূপ দেন। সাগর চক্রবর্তী 'থানার চাতালে শুয়ে ও পরবর্তী অন্যান্য কবিতা'য় (১৯৭৩) অবশ্য প্রধানত স্লোগানেই গা ভাসান। পার্থ রাহা ও সব্যসাচী দেব বোধহয় এ-সময়ের ও এই গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শিল্পের দিকে নজর দিয়েছেন। সব্যসাচী-র গ্রন্থ 'প্রতিশ্রুতি সময় স্বদেশ' বেরিয়েছে ১৯৮০-তে। তাঁর কবিতায় আবেগ—

মাঝে মাঝে ওসে ভুং, রাইফেল, জেল-গরাদ এসব শব্দ থাকলেও আসলে পুলক চন্দ-কথিত 'মানুষের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক ভালোবাসা' ও 'প্রাজ্ঞ প্রগতি-শীলদেরই' উত্তরাধিকারী কবি তিনি। শুভাশিস্‌-শুভ-শিবেন-অনন্ত থেকে নান্দনিকভাবে কোনো অর্থেই তিনি আলাদা নন। এইসব কবিরা কবিতার তত্ত্বে ও আলোচনায় যদিও কৌতুকজনকভাবে রক্তচক্ষু, সুখের বিষয়, কবিতার ভাষায় নম্র বিনীত সলাজ, কখনো কখনো আকুল রোমান্টিক।

১৫.

সত্তরের কবি, অর্থাৎ সত্তরের দশকেই যাঁরা মূলত কাব্য রচনা শুরু করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে মনস্থির করার সময় স্বভাবতই এখনও হয় নি। যত কাছে থাকি, ততই ভিড় মনে হয় এবং সে-ভিড় থেকে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা তাঁর কবিতাকে চেনা সহজ নয়। গ্রহণবর্জনের জন্য কিছু দূরত্ব তো চাই-ই। ফলে, মাত্র দশ বছর বা আরো কম সময়ের কাব্যকৃতি থেকে সত্তরের কবিদের সম্পর্কে কোনো মতামত খুবই অনির্ভরযোগ্য। তাছাড়া তাঁদের কাব্যগ্রন্থ যথেষ্ট প্রকাশিত ও প্রচারিতও হয় নি—যেটুকু হয়েছে অনেক সময়ই তা সাহিত্য-অতিরিক্ত কারণে। বন্ধুত্বের বা পরিচিতির কারণে কেউ কারোর সপক্ষে বলেন, কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে বাছাই অনেকটাই নির্ভর করে বই বা কবিতা চোখে পড়া না-পড়ার ওপরে।

তবু, এরই মধ্যে লক্ষ করা যায়, সত্তরের বেশ কজন কবির পরিপকতা, প্রায় প্রিকশাস্‌ পরিপকতা এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়। পঞ্চাশের অবসিত গৌরব এবং তাঁদের কোলাহলের পুনর্মূল্যায়ন, কিংবা ষাটের দশকের ঐ বিষণ্ণ ও বন্ধ্যা দার্শনিকমন্যতা—এই সব কিছুর পরিণামে যদি অকাল-পরিপকতা অর্জন করেই থাকেন কেউ কেউ, সাহিত্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মেই সেই ঘটনাকে বুঝতে পারা যায়।

অবশ্য, তার মানে এই নয় যে, পঞ্চাশ বা ষাটের পর সত্তরের কবিরা 'নতুন' কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন বাংলা কবিতায়। কবিব্যক্তিত্ব বা কাব্যবিষয় বা এমনকি কাব্যভাষাতেও আত্যন্ত নতুন কিছু ঘটে নি, ঘটা সম্ভবও নয়। কিন্তু তাঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের নতুন কতকগুলি চিহ্ন স্পষ্ট হতে শুরু করল। বস্তুত সত্তরের কবিদের কাব্যলক্ষণ ও কাব্য-বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি পঞ্চাশ বা ষাটের পুনরাবৃত্তি যদি নাও হয়, অন্তত

সম্প্রসারণ—কিন্তু নিশ্চয়ই ভিন্ন একটি স্তরে। এই স্তরের ভিন্নতাই সত্তরের কবিদের অবদান এবং তারই স্বরূপই কেবল আলোচ্য হতে পারে।

পঞ্চাশ বা ষাটের কোনো কোনো থিমের আবর্তন তো হবেই। কারণ ষাট বা সত্তর এই দুই দশকে আমাদের সামাজিক ও সেই সূত্রে মানবমনের কোনো মৌলিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের বাস্তবতা বা তার ইশারা পাওয়া গেছে কি? বুর্জোয়া বা তার বিকল্প সমাজবাদী উভয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই কোনো নতুন উপাদান? বুর্জোয়া ক্ষয় অবশ্যই বেড়েছে এবং তার ক্ষতিপূরণ বা আত্মরক্ষার ক্ষমতাও বেড়েছে, পেকেছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির বৈনাশিক আত্মকলহ, অতি-বামপন্থী প্ররোচনায় হত্যা ও জিঘাংসার প্রসার, বাঙলাদেশের ঘটনা নিয়ে মোহ ও মোহভঙ্গ—ইত্যাদি ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের সংবেদনশীল বামপন্থী চিত্তকে স্পর্শ করেছে—কিন্তু তা থেকে বামপন্থী সচেতনতার মৌলিক গড়ন কি পালটেছে? এই সব ঘটনা হয়তো সেই সচেতনতাকে যতটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও কেন্দ্রচ্যুত করেছে, ততটা সংগঠিত ও পুনর্গঠিত করে নি। ফলে, এই অবস্থায় বামপন্থী উপলব্ধির ভিত্তি যদি এই দুই দশকে নড়বড়ে হয়ে গিয়ে থাকে, বামপন্থী সাহিত্যকে আরো অন্তরালবর্তী করে দেয়, আর তার বুর্জোয়া প্রভাবের আঁকাবাঁকা উপসর্গগুলি পরিণত ও স্বাধীন হয়ে আরো বেশি গ্রাস করে সময়কে এবং সময়ের মুখে-ধরা সাহিত্যকে, তবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার আছে, খেদ করার নেই। সেই উপসর্গগুলিকেই বরং চিনে নেওয়া যাক স্বেচ্ছাচারী নির্বাচনে পাওয়া সত্তরের কয়েকজন কবির কাছ থেকে।

সত্তরের দশকে বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই অন্তর্ঘাতী বিস্তার ও বিকল্প সংস্কৃতির আত্মসংকোচন—এই পটভূমিতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অনন্বয় বা বিযুক্তির অভিজ্ঞতা যুবমানসে কাজ করবেই—ঠিক যেমন বিপরীত কারণে চল্লিশে বা পঞ্চাশের গোড়ায় বামপন্থী সংহতিবোধের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। কবিতায় অবশ্য এরও নানা বৈচিত্র্য আছে, তার ইতিহাস ও রূপান্তর আছে। যেমন, সুব্রত চক্রবর্তী, সত্তরের দশকেরই এক তরুণ কবি, শুরু করেন খুব গা-এলানো শব্দ-ব্যবহারের চালে এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় সহজিয়া মানবতাবাদে—কিন্তু অচিরেই দেখা যায় তাঁর কবিতায় মানব-সম্পর্কের ব্যাপারে এমন কিছু-কিছু উদাসীনতার ভঙ্গি এসে যাচ্ছে, যা কখনই শক্তির স্বধর্ম নয়। ঠিকই, সুব্রত চক্রবর্তী-র 'বালক জানে না' (১৯৭৬) গ্রন্থে

নিয়ে যতটা শক্তির কথা মনে পড়ে এমন আর কারো ক্ষেত্রে হয় নি—বইটির প্রথম কবিতা 'ঘর-গেরস্থালি'-ই ধরা যাক।

কবি তো সন্ন্যাসী নয়, ঘর-গেরস্থালি করে,
টাটকা মাছ কেনে প্রতিদিন—
আর লক্ষ পচা-শব্দ, ক্ষুদে লাল-পিঁপড়ের মতন
কবির মগজ খুঁড়ে চলে যায় অন্ধকারে, বেলা-অবেলায়।

কিন্তু সুব্রত-র নিজের কথাও আছে অনেক এবং ভাবনাটা, বলা যায় ভাবনাকে 'ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গুঁড়ো করে-করে উড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতিটাও তাঁর নিজস্ব। তাই সুব্রত যখন অনুভব করেন, 'চতুর্দিকে, দুঃখী মানুষ উঠলো হেসে', কিংবা 'একটা জীবন এলোমেলো, অন্য জীবন গুছিয়ে রাখি', 'মানুষ বাঁচে না দুঃখে, মানুষ বাঁচে না সুখে, সুখদুঃখহীন / মানুষের বেঁচে থাকা', কিংবা 'সুখী মানুষের সঙ্গে ভাঙাচোরা দুঃখিত মানুষ কথা বলে'—এই সব বাচনে শক্তির সঙ্গে অনেক মিল থাকলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু সুব্রত-র উদাসীনতার ধরনটা ভিন্ন।

তবু সুব্রত চক্রবর্তীর এই ধরনের পেছনে নিশ্চয়ই মানবপ্রীতির একটা শিকড় আছে, অনুভব করা যায় এবং মাঝে-মাঝে শক্তির মতোই উল্টো-করে বলে তিনি সময়ের সঙ্গে এক হাত নিতে চেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কিংবা ষাটের অন্যান্য কেউ কেউ কিংবা তার পরে ভাস্কর চক্রবর্তী, এঁরা সকলেই মানবিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ-ভাবনাকে স্থায়ী নান্দনিক অভিজ্ঞতা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাশের কবিদের কারো কারো মধ্যে এই মনোভাব ছিল না এমন নয়। কিন্তু তাঁদের কাছে সেটা ছিল অনেকটাই আত্মপ্রদর্শন, খানিকটা ভান। কিছু-না-বলাকে কবিতার বিষয় করার জন্য বাইরের একটা জোরও টের পাওয়া যেত। কিন্তু ভাস্কর চক্রবর্তী যখন তাঁর 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' গ্রন্থে (১৯৭১) 'ঘুমের মধ্যে', মৃত্যুর পরে, 'অনেক নিচের ঘরে' চলে যাওয়ার কথা বলেন, তখন তাঁর কথায় এমনকি কোনো উত্তেজনা বা টেনশনও থাকে না। ভাস্কর-এর সমস্ত কথাই আপাত-দৃষ্টিতে প্রগল্ভ ভাবে বলা, কিন্তু ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা ভাব আছে যেন না বললেও চলত, কিংবা কথার মধ্যেই বুঝিয়েছেন কথাগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ নয় তা তিনি নিজেও জানেন। যেন বানিয়ে-বানিয়ে বলার কিছু নেই, কথার তোড়েই কবিতার জন্ম। অন্যভাবে বাক্যগঠনের এই সারল্য বিনয় মজুমদারের মধ্যেও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সংলগ্নতার দায় বর্জন এখানে আমূল—ক্লান্তি ও আলস্য যেন শব্দের মধ্যেও সঞ্চারিত। ভাস্করের কবিতায় তাই

বারবার আসে শীত। একদা 'তোমার কথা মনে পড়তেই আমি কেঁদে ফেলেছিলাম', আর আজ?

মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেও
তড়বড়ে নিশ্বাস ফেলি এখন—যে দিক দিয়ে আসি, সে-দিকেই
দৌড় দিই

কেন এই দৌড়ে যাওয়া? আমার ভালো লাগে না
শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, আমি তিন মাস ঘুমিয়ে থাকবো…

অনন্বয়ের এই অভিজ্ঞতা কনিষ্ঠ ব্রত চক্রবর্তী-র 'গাজনের মেলা'-তেও (১৯৭৯) পাওয়া যায়। ব্রত প্রথম কবিতাতেই এই গ্রন্থের সুর ধরিয়ে দিয়েছেন, গাজনের মেলায় এক সন্ন্যাসী আরেক সন্ন্যাসীকে যে-কথা বলেছিল, 'হয় না, কিছুতেই কিছু হয় না, শেষমেষ কিছু হয় না।' সংসারী লোকেরা নানা লোভে ও টানে সে-কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ঠেকে শেখে সবাই, ঝড় এসে এখানে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তখন পৃথিবী জুড়ে 'অফুরান গাজনের মেলা'। এবং সকলের মুখেই, 'কিছুতেই কিছু হয় না।' দর্শন হিসেবে এটা খুব কিছু উচ্চ স্তরের নয়, নতুনও নয়। ব্রত অবশ্য দর্শন লিখতে বসেন নি, কিন্তু কবিতার পর কবিতায় তিনি একটা প্রায় অ্যাবসার্ড জগৎ তৈরি করেছেন, যেখানে আমাদের পরিচিত সম্পর্ক, পরিচিত অর্থ ধূলিসাৎ হয়। এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ব্যাকরণ-বই থেকে পরস্পরের সম্পর্ক খুঁজতে বের হলে তাবৎ মানুষ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে: 'কার গো? তুমি কার গো?' (উদ্দেশ্য ও বিধেয়)। সিংহদরজার দুটি পাথরের বাঘ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে, কি করা হয়? উত্তর দিতে না পেরে উভয়েই বিষণ্ণ, কিন্তু বংশমর্যাদারক্ষায় স্থির (বংশমর্যাদা)। অবশ্য কবিতাগুলি যত নিরীহ মনে হয়, ততটা নয়। 'ছুতার' কবিতায় সেই ছুতোরের কথা বলা হয়েছে যে নির্দিষ্ট সব কিছু বানানোর পরে কাঠ বেঁচে গেছে বলে 'শেষে মানুষ বানালেন'। এবং সেই মানুষ

শুধু পেরেকে পেরেকে, জোড়ে জোড়ে, খেলে বেড়াতে লাগলো
হাওয়া, খেলে বেড়াতে লাগলো শিল্প ও সাহসিকতার গান।

মানুষের, তার শিল্প ও সাহসিকতার এই পরিচয় ব্রত-র কাছে। এই তাঁর জিজ্ঞাসা, এই তাঁর উত্তর। ব্রত যেমন মানুষের জীবন ও কর্মে অবিশ্বাসী, তেমনি অবিশ্বাসী কবিত্বের কোনো গ্রাহ্য সুরারোপে। তাঁর কবিতার ভাষাও ঐ ছুতোরের শুকনো কাঠ দিয়ে বানানো।

মানবজীবনের বহিরঙ্গতার যথার্থতায় অবিশ্বাসী এই যে পর্যবেক্ষণ, তার ভিন্ন একটি পদ্ধতি জয় গোস্বামী-র কবিতায়। এ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাস্করের পদ্ধতি খুব ছড়ানো-ছিটোনো, ব্রত-র সংগীতবর্জিত গাণ্ডিকতা—এগুলো হয়েছিল জীবনের আসক্তি ও অর্থময়তা সম্পর্কে অবিশ্বাসের উপযুক্ত ভাষা। কিন্তু জয় গোস্বামী-র ভাষা ও ভঙ্গি গম্ভীর, বিষণ্ণ, দার্শনিকমন্য। তাঁর 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' (১৯৭৭) পড়ে মনে হয় একটা কাঁচের বা মূল্যবান ধাতুর শিল্পবস্তু। তিনি তাত্ত্বিকতারও দাবি করেন যেন। অবশ্য সে-তত্ত্ব খুবই পুরনো। বুদ্ধদেব বসু-র শেষ যুগের কবিতা মনে পড়ে। তাঁর মতোই, বা তাঁরই প্রভাবে, বদলেয়র-চোলা বিষণ্ণতা, ক্লেদজ কুসুমের স্বপ্ন, প্রকৃতিবিরোধী কৃত্রিম শিল্পের জগৎ। বাইরের জগতের উষ্ণতায় তাঁর আস্থা নেই, আস্থা অন্তরালের গোপন শীতলতায়। 'শীতঘুম' কবিতায় 'অদ্ভুত শীতল কুণ্ড' ঘিরে 'প্রবীণ কেউটে'—যে তার 'ছটফটে কিন্নরটিকে মধ্যে রেখে অন্ধকার বেড় / আরেকটু সংকীর্ণ, ছোটো ক'রে' আনে। এই কুণ্ডের ভিতরেই 'নিস্তব্ধ বিষ, জ্ঞান'। সাপটির নিঃশব্দ প্রেমিকা 'বিষদাঁত ফুটে' 'প্রথমে আক্রান্ত, পরে, নীল, শেষে স্তব্ধ, সৌত্রান্তিক'। এই হল জয়-এর জগৎ, তাঁর প্রত্নজগৎ—তাঁর 'প্রতীক'। শীত ভাস্কর চক্রবর্তী-র যেমন, তেমনি জয় গোস্বামীরও ঋতু—যদিও উভয়ের রূপকার্থ ভিন্ন। জয় বলেন, 'ঘিরে এসো দৃঢ় পৌরাণিক স্তম্ভের পাথরে', 'যা কিছু অর্চনা কুণ্ডের ভিতরে করো'—কারণ জ্ঞান এখানেই। বাইরের ফিচেল অভিজ্ঞতা থেকে ঘা খেয়ে এসে এই সংকীর্ণ প্রত্নজগৎ-এ পরিত্রাণ যদি নাও হয়, এতেই নাকি জ্ঞান! ভাষার স্বায়ত্তশাসনে জয়-এর কৃতিত্ব হয়তো আছে, কিন্তু জীবনকে তিনি এভাবেই ছোট করে দেখেছেন। ভাষাও শেষ যুগের বুদ্ধদেব বসু-র। অনুজ জয় গোস্বামী পবিত্র মুখোপাধ্যায়েরই দোসর।

এই সূত্রেই জয়-এর কাব্যজগতের আরেকটি বিষয় 'কাম'। তাঁর কবিতায় 'ক্ষুরধার কাম'-ই সেই আদিম জন্তু, যার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। বুদ্ধদেব বসু-র উদ্ধৃতি শিরে বহন করে লেখা 'জোঁক' পর্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতাগুলিতে ('অভিমান', অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৯) ভাষার নিপুণ দক্ষতায় এই কাম মূর্ত হয়েছে। এখানে অবশ্য ভাষা আলাদা—অনেক ছড়িয়ে পড়া—তবে শিথিল নয় মোটেই। এরকম নিরাসক্ত ভয়ংকর শীতল কামের চেহারা আঁকার দক্ষতা আছে সত্যিই। জয়-এর একটি ঘুরে-ফিরে-আসা উপমা সাপকে ঘিরে—সাপের ত্বক, সাপের বিষ। 'জোঁক' কবিতায় এই সাপ

নানা অনুষঙ্গ নিয়ে কাম-এর নিরবয়ব মূর্তিকে স্পষ্ট করেছে। এবং গোপন পাতালচারী আদিমতার দিকে জয়-এর ঝোঁককেও প্রমাণিত করেছে।

জয়-এর কবিতায় 'কাম' শেষ পর্যন্ত একটা তত্ত্বের রূপ নেয়, কিন্তু সত্তর দশকের অন্য কেউ কেউ, যেমন কমল চক্রবর্তী বা রণজিৎ দাশ যৌনতাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে দেখেন। তাঁদের কবিতায় যৌনতা আসে জীবনের বহিরঙ্গ অভিজ্ঞতা রূপেই। কমল চক্রবর্তী প্রখর ইন্দ্রিয়সজাগ কবি—তবে তাঁর ইন্দ্রিয়বোধ জয়ের মতো অন্তর্মুখী নয়, বরং বহির্জগতেই মূর্ত। সেই বিচরণের অভিজ্ঞতাতেই যৌনতা আসে, একটু নাটকীয়ভাবে আসে, অনেক সময়ই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তখন মনে হয়, কমল এ-ব্যাপারে পঞ্চাশের কবিদেরই অন্ধ অনুকারক।

সে-দিক থেকে রণজিৎ দাশ-এর কবিতায় যৌনতার স্থান অন্য। যৌনতার বাড়াবাড়ি, রণজিৎ যাকে নিজেই বলেছেন 'যৌন অবসেশন', তা অবশ্য ওঁর কবিতায় নেই কমলের মতো। জয় গোস্বামীর মতো শ্বাসরোধী প্রত্ন-অন্ধকার তো নয়ই। তাঁর জগৎ বরং অনেক সামাজিক ও যুক্তিনিষ্ঠ। তিনি ভাবেন, কৈশোরক স্বপ্নের যে-পরিণতিতে যৌবনের সাতরঙা ফুল ফোটে, তা তো আর সম্ভব নয় আজকের পরিবেশে, তাই স্বপ্ন থেকে যৌনতার দিকেই তাঁর এই ছুটে-যাওয়া।

> স্বপ্ন থেকে যৌনতার দিকে যেতে যেতে আমার ছাব্বিশ
> বছর কেটে গেলো
>
> মুখে গজালো অসংখ্য ব্রণ, ভেতরের ভাতশাদা বীজ—তাদের
> বিস্ফোরণের কালোচিহ্ন এখনো আয়নাকে আক্রমণ করে।
>
> (স্বপ্ন থেকে যৌনতার দিকে)

রণজিৎ দাশের কথা তাই একটু স্বতন্ত্র। অন্যদের অভিজ্ঞতাতেও অনিবার্যতা এবং হয়তো প্রকাশের গরিমাও আছে, কিন্তু, সন্দেহ নেই, বিভ্রান্ত একপেশে অভিজ্ঞতা। মানুষকে এইভাবে খণ্ডিত দেখা শুধু মনস্তত্ত্বে নয়, সাহিত্যেও বেশ পুরনো। পঞ্চাশের দশকের কবিদের তো একটা বড় তাড়নাই ছিল এই দিকে। যৌন চিত্র ও প্রতিমার এই উপর্যুপরি ব্যবহার—এত তীব্রভাবে যে রক্তমাংসমজ্জা অবধি খুঁড়েও যেন তৃপ্তি নেই—এও সময়েরই হস্তক্ষেপ। আমাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরিবেশে, অসংলগ্ন ও আশাহত জীবনযাপনে ও চিন্তায় এই যৌনতা শুধু যে সময়ের বিকার তা নয়, নিজেকে আঘাত করেই এ যেন প্রতিবাদ। এখানেই বোধ হয় আগের দশকগুলির,

বিশেষত শক্তি-সুনীল-চিহ্নিত যৌনতা-আক্রান্ত কবিতা থেকেও এঁদের ভিন্নতা। সাম্প্রতিকেরা যেন অতি-যৌনতার উন্মত্তত্বও জানেন, যৌন-উপভোগের বর্ণমালাই তাঁদের কাছে অপরিচিত বা অস্বীকৃত—যৌনতার মৌল রূপকে তাঁরা মোহবর্জিতভাবে আপাদমস্তক দেখে তাতে সেঁধিয়ে যান বন্য মহিষের মতো—তাঁদের সাক্ষাৎকারটা যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর। শুধু অভিমান নয়, এই প্রতিবাদী চেহারাটা বোধহয় আগের যুগে স্পষ্ট ছিল না।

ভাস্কর-ব্রত-র সামাজিক-ব্যক্তিক অনন্বয়ই হোক, কি জয়-কমলের অন্ধকার-পঙ্কিল বা উন্মত্ত যৌনতাই হোক, এ সবই কাবানন্দনে ব্যক্তিসর্বস্বতায় নির্ভরের পরিণাম। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ষাটের দশক থেকেই। পঞ্চাশের বা ষাটের বহু কবির কাছে কবিত্বের স্বরূপ ছিল এখানেই। একে কবিতার অনিবার্য রহস্য বলে চালানোর চেষ্টাও হয়েছে। অনুভূতির বা অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত বা সামাজিক 'কন্‌সেন্টে' নাকি সেই রহস্য নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ সামাজিক সাধারণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিময়তার সংযোগে ও ডায়ালেকটিকে যে রহস্যের জন্ম তা তাঁদের অজানা। ফলে, এ থেকে যদি অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয়, যদি কবি-পাঠকের সংযোগ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে, তাতেও এই কবিরা নিরুপায়। কবিদের লক্ষ্য হয়তো এক নয়, বলবার কথাও ভিন্ন, তাঁদের ব্যক্তিস্বরূপ তো আলাদা বটেই। তবু তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়ে তুলতে চান প্রাইভেট জগৎ, তৈরি করে যান প্রাইভেট উপমা-শব্দ-উচ্চারণ-ভঙ্গি। সত্তরের অনেক কবিও এই বিভ্রান্তিকর ব্যক্তিময়তা থেকেই শুরু করেছেন।

ষাট-সত্তরের সীমান্তবাসিনী দেবারতি মিত্র অবশ্য অতটা স্বেচ্ছাচারী নন। তাঁরও 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে' গ্রন্থে (১৯৭১) বোধহয় মনের যে জটগুলো রয়েছে, সেই জট যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সেই সূত্রে বর্ণিত স্বপ্ন, আলো, পিপাসা সবই ব্যক্তিগত। কবি যখন বলেন,

> অন্ধ চোখ ফেটে যায়, সজোরে স্বপ্ন ঠিকরে পড়ে
> দূরের সমুদ্রকূলে এক ডুবে মরা-জাহাজের
> প্রেতের ক্রন্দন যেন (সেই অমূল বঞ্চনা)

তখন সেই রূপকের কোনো সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত হাজির করতে চান না। তবু তো দেবারতি তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভাষার সাধারণ্যেই প্রকাশ করেন এবং তাঁর ব্যক্তিময়তাও বস্তুত একমাত্রিক—কিন্তু জয় গোস্বামী বা মৃদুল দাশগুপ্ত ক্রমশই ধাপে ধাপে তাকে নিয়ে যান অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ও

ভাষার অন্ধ জটিলতায়। ফলে অভিজ্ঞতার ও ভাষার যে অসংলগ্নতা তৈরি হয়, তাও আমরা দেখেছি পঞ্চাশের দশক থেকেই। মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'জলপাই কাঠের এসরাজ' গ্রন্থে (১৯৮০) লেখেন,

> ছড়িয়েছি, কিন্তু শিকড়হীন ; মা বলেন, শান্তি পাবি না ,
> ছড়িয়েছি, মৃদুল এই মীনরাশি ভয়ংকর জলে, স্রোতে গাঢ়
> ফসফরাস, ঢেউয়ের অপর প্রান্তে প্রভু, কেউ, তিনি কি সামন্ত রাজা
> —দূর থেকে পাণ্ডববর্জিত ভাবি, এই সব ভাবি···

কবিতাটির নাম 'সমুদ্র গুপ্ত ও তার বীণা' এবং মৃদুল যে শব্দস্রোত বইয়ে দিয়েছেন, হয়তো জানিনা অবচেতনের ব্যাখ্যানেই তার সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার সম্ভব। ব্যক্তিসর্বস্ব বা ব্যক্তিময় এই প্রাইভেট জগৎ পাঠককেও স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতায় নিয়ে যায়।

কিন্তু এই ব্যক্তিসর্বস্বতার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার দৃষ্টান্ত সত্তরের কবিদের মধ্যেই আছে। দেবারতি মিত্র বা অমিতাভ গুপ্ত, কমল চক্রবর্তী বা রণজিৎ দাশ প্রমুখ কবি, যাঁদের কাব্যোপলব্ধি সত্তরের দশকেই সংগঠিত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ব্যক্তিসর্বস্বতার এই সব উপার্জন ও ক্ষয়ক্ষতির সূত্রপাত আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছিলাম, তাঁরাই কবিতার মুক্তির অন্য ইশারা-গুলিও খুঁজে নিচ্ছিলেন। কিভাবে এই রূপান্তর ঘটছিল, তার পদ্ধতিও নিশ্চয়ই সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়।

দেবারতি মিত্র-র কথাই ধরা যাক। প্রথম গ্রন্থ 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে'-তে তিনি অভিজ্ঞতার ঐ প্রাইভেসিতেই ডুবে ছিলেন। কবির মনে তখনও অবশ্যই সঞ্চিত ছিল স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জীবনের প্রসন্নতার সব কটি উপাদানকে তিনি নিজেই ভেঙে-চিরে দেখান, তাদের মুখোমুখি হন যেন আঘাত দেবার জন্যই। এই বিকারের মধ্য দিয়েই ঘটাতে চান সচেতনতার উদ্বোধন—'অকাল সজাগ তুমি আমার বিকার'। কবি স্বস্তির বা আশ্রয়ের আহ্বান শোনেন নি এমন নয়—কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে দেখেন আসলে তা 'ধ্বংসময় উপত্যকা'। ফলে তাঁর জোটে 'শান্তি নয় পরিত্রাণও নয়'—'বৃথা সংকেতের ক্ষয়'। 'চারিদিকে অন্ধকার রোদ বৃষ্টি আলো বকুলফুলের গন্ধ শত অর্ঘ্য'-র প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও কবি যে অন্ধকারে পড়ে যান, এ কি তাঁর নিজেরই ভেতর চোরা টান, না কি সামাজিক প্রক্ষেপ ? কিন্তু কোনো ইশারাই রাখেন নি দেবারতি।

'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে'-র এই বিষাদ যেমন রহস্যময়, তেমনি 'যুবকের

স্নান' গ্রন্থে (১৯৭৮) দেবারতি মিত্র যে হঠাৎ দক্ষিণা বাতাস পেয়ে যান, 'সমস্ত গা গুঞ্জরণময় একটি বাজনা গাছ', মনে হয় 'সে যেন আরম্ভ হল এই মাত্র', তার রহস্যও গোপন, একান্তই ব্যক্তিগত। পর পর 'ঝরনা সহস্রধারা', 'মোমের ফুলকি' বা 'কিশোরীর ফুল' কবিতায় বোঝা যায় বিষাদাচ্ছন্ন কবির মনে খুশির হাওয়া বইছে—'আসমুদ্র ছাদ'-এ বলেন, 'এত হাওয়া এত যৌবন কোথায় ছিল?' উপলব্ধির কোন লড়াইয়ে তিনি এই জানা-কে পেলেন, তাকে শব্দের ইশারাতেও রাখতে চান নি। ফলে তা কখনো রূপক হল না, হয়ে রইল ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতার ফুল। তবু উচ্চারণে এমন এক গভীরতা দেবারতির আছে, এবং তাঁর শব্দ-ব্যবহারের নৈপুণ্য এত স্পষ্ট যে আমাদের সাধ হয় একে তাঁর জীবনের গভীরতর উপলব্ধির অভিজ্ঞান হিসেবেও দেখতে।

ক্রমে তারা লুপ্ত প্রায়
মেয়েটির কাঁচা সিঁথি আলো করে
ফুটে ওঠে সন্ধিলগ্ন, জলৎ সিঁদুর। (বিবাহ)

এ-সময়ের আরেক কবি অমিতাভ গুপ্ত-র 'আলো'-তে (১৯৭০) যে শব্দ-তন্ময়তা লক্ষ করা গিয়েছিল, 'এসো আমার ঘরে'-তে (১৯৭৭) তিনি যেন তাকে নিজেই ভেঙে দিলেন—শব্দের গাঢ়তার চেয়ে শব্দের বিস্তারের দিকেই মনোযোগে। অমিতাভ প্রথম থেকেই সিরিয়স কবি, দার্শনিকতা বানানোর চেষ্টাবিহীন সিরিয়স। নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার তাগিদেই সিরিয়স। দ্বিতীয় বইটিতে তাই বাস্তবের স্পর্শ বেশি—উপমায় প্রতিমায় সমকালীনতার যে ছাপ অবচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা এখন কন্‌ক্রিটভাবে এল। শুধু ব্যক্তিসর্বস্ব ভাবনা নয়, সামাজিক ভাবনাও তাঁকে আলোড়িত করল। 'আশ্রয়' কবিতায় 'শীতের শেষাশেষি প্রত্যাশা হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ', কারণ তখনই 'শিথিল ও বিকলাঙ্গ মানুষের মতো / নারী ও পুরুষ / কৃষ্ণচূড়ার কাছে সামান্য দাঁড়ালো।' কবি মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় এখনো নিশ্চিত নন, কিন্তু পুনর্জীবনে বিশ্বাসী। ভাস্কর চক্রবর্তী বা জয় গোস্বামী-র কাছে শীত সর্বব্যাপক, কিন্তু অমিতাভ বলতে পারেন, 'আবার একদিন শীত শেষ হয়ে এলো।' গ্রন্থের একেবারে শেষে অমিতাভ গুপ্ত-র সহজ অকপট উচ্চারণে আমরা খুশি এবং তাঁর কবিতার বিবর্তনে আস্থাশীল।

ভাঙা মানুষের ফাটা মানুষের
ঝরা মানুষের গানে

একদিন এই পৃথিবী মুখর হবে।
একদিন, আরো কত অস্থির
অপেক্ষা শেষ হলে
মানুষের গান পাবে অমলিন
অগ্নির ব্যাপকতা।
আজ তারা শুধু কীর্তিনাশার দিকে
অকূলের মাঝখানে। (ঝরা মানুষ)

দেবারতি মিত্র বা অমিতাভ গুপ্ত অভিজ্ঞতার রূপান্তর বা প্রগতি ঘটালেন যে রাস্তায়, কমল চক্রবর্তী বা রণজিৎ দাশ-এর রাস্তা কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু ব্যক্তিগত উপলব্ধির নির্ভরতায় নয়, তাঁরা এই মুক্তি ঘটালেন বাইরের থেকেও, এমনকি সামাজিক অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেও। সেজন্যও অন্তত এই দুই কবি সত্তরের দশকে বিশিষ্ট। জয় গোস্বামীর কৃত্রিম অনুবাদ-গন্ধী জীবনবিরোধী জগৎ ছেড়ে কমল ও রণজিৎ-এর সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা আসক্তির জগতে প্রবেশ করাও একটা সুখকর অভিজ্ঞতা।

কমল চক্রবর্তীর 'চার নম্বর ফার্নেস চার্জড' (১৯৭১) বা 'জল' (১৯৭৬) গ্রন্থ দুটিতেই সবচেয়ে বড় গুণ কবির অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির নির্দিষ্টতা। প্রথম গ্রন্থ রচনায় এই নির্দিষ্টতা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। শুনেছি, কমল জামশেদপুরের মানুষ, পরন্তু ইস্পাত কারখানার সঙ্গে যুক্ত। ফলে তাঁর কবিতায় আঞ্চলিকতা যেখানে স্পর্শ করেছে, সেখানে ঐ অঞ্চলের ভূগোলই শুধু নয়, সেখানকার আদিবাসী মানুষ, কারখানার যন্ত্রপাতি-আবহ সবেরই উল্লেখ এসেছে। কমল এক-সময় আদিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা, না কি বলব গান, লিখে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, এখনও করছেন। আর তাঁর কবিতায় ঐ আঞ্চলিক ভাষার শব্দ যে যখন-তখন প্রবেশ করে তাতে কবিতার বাস্তবতার আলাদা একটা স্বাদ এনে দেয়।

এ্যাপ্রোন দস্তানা খুলে কখন শুয়েছি
এই অড়হরের ক্ষেতে মনে নাই
আর উঠা হবে না এবার
যতই হুশিল হোক বড়বাবু কেটে দিক নাম
দুখার মায়ের বুকে এই শেষ আমি হে শুলাম
এই শেষ আর উঠা হবে না এবার (দুখার মায়ের বুকে)

কর্মক্লান্ত শ্রমিকের বিশ্রাম-সুখের আশ্লেষ এই ভাষাতে অবিকল।

কমল চক্রবর্তী-র জগতটা খোলামেলা—তিনি ভাঙনের দৃশ্যগ্রাহ্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই আত্মাকে পেতে চান, যদি অবশ্য পাওয়া যায়। কমল 'ভেঙে তছনছ' করতে চান বর্ণালি ফুলের সাজকে, আনতে চান কবিতায় 'কিছু তেজী ঘোড়া'—'যেমন ভার্জিন বাঘিনী থাকে দাঁড়িয়ে সুঠাম / যৌবন মুখিয়ে স্থির'। কমলের কবিতার এই পৌরুষ অনেক সময়ই লক্ষ্যহীন এবং লক্ষ্যহীন পৌরুষের যা পরিণতি তা-ই হয়েছে—কবিতাতে কখনো-কখনো এসে গেছে অতি-নাটকীয় আত্মপ্রদর্শন। তখন তাঁকে লিখতেই হয়

দীর্ঘদিন কবিতা লিখতে না পারলে
আমি অহেতুক শয়তান হয়ে উঠি
মনুমেণ্টের পর মনুমেণ্ট ভেঙে খোঁজ করি
কোনো আত্মা আছে কিনা।
(যখন কবিতা লিখতে পারি না-১)

পঞ্চাশের কোনো কোনো কবিদের মতো নিরর্থক যৌনাঙ্গপ্রিয়তা বাদ দিলে কমল চক্রবর্তীর কবিতায় যেখানে অর্থবহ নাটকীয় আবেগের তাড়না সেখানে তিনি অমিতাভ দাশগুপ্ত-র সঙ্গী। কমলেরও কবিত্বের বড় জোর মৌল অন্ধ আবেগে ও তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বোধে। এর বিচ্ছিন্ন প্রয়োগে যে বিপদ ও বিকৃতি ঘটার ভয় থাকে, তারও উদাহরণ কমলের বহু কবিতা। কিন্তু সুখের কথা, অধিকাংশ কবিতাতে, এবং সেখানেই কমলের স্বরূপ, তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসেন—জীবনমুখী বাসনাই তাঁকে নিয়ে যায় জীবনের ব্যাপ্তি ও সমগ্রতার দিকে।

কখনও মনে হয় স্ক্র্যাপ-রুমে দীর্ঘকাল বসে আছি
চারিদিকে নষ্ট যন্ত্রপাতি
ভাঙা লেদ জংধরা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট পড়ে
এদের এড়িয়ে গিয়ে অন্য কোনো শহরের কথা
আর ভাবা যায় না তেমন···

কিন্তু শেষ স্তবকে:

তবু আমরা কজন রোজ কালি মাটি রোড ধরে হাঁটি
পলাশের চারা ফিরি করি
এসব বৃক্ষ জানে মহীরুহ হতে
অশুভ বাতাস মুছে শীতল ছায়ায় ঢেকে দেবে···
(কালি মাটি রোড)

'চার নম্বর ফার্নেস চার্জড' গ্রন্থের শেষ কবিতা 'রাইফেল' কিংবা 'কলকাতা ১২ এপ্রিল'-এ দেখা যায় কমল অস্থির হয়ে উঠেছেন বাঙলাদেশের ঘটনায়, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের ঘটনায়। আর সে অস্থিরতার প্রচণ্ডতা তুলনাহীন। তা থেকে স্পষ্ট কোনো ছবি ফোটে না, ফোটার কথাও নয়, শুধু প্রকাশ পায় কবির অন্ধ ক্রোধ ও ভালোবাসা।

রণজিৎ দাশ-এর প্রধান ঝোঁকই ব্যঙ্গের দিকে। তাঁর 'আমাদের লাজুক কবিতা' গ্রন্থের (১৯৭৭) অনেকগুলোই ব্যঙ্গ কবিতা। যেগুলো নয়, তাতেও ব্যঙ্গের একটা চাপা সুর সব সময় থাকে। আর এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় রণজিৎ-এর প্রতিবাদী চেতনা। আমাদের ওপর চাপানো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

> জয় বাবা বজরঙ্গবলী। মুখ রেখো বাবা। বিহার বর্ডারে
> শাল জঙ্গল লিজ নিয়েছি যেন শালের ভাও তেজী থাকে।
>
> (শালজঙ্গলের কবিতা)

ঠিক এরকমই শানিত বিদ্রূপ 'ব্যাঙ্ক-সভ্যতাকে আমার উপহার' কবিতাটিতে —মধ্যবিত্ত নীতিবোধের ভড়ংকে বিদ্রূপ। একমুঠো খুচরো পয়সা কবি যখন রাস্তায় ছুঁড়ে দেন—'দু-পাঁচ পয়সা নয়, সব আধুলি আর ওয়ান-রূপি কয়েন মোশায়', তখন 'ভদ্রলোকেরা সরে দাঁড়ালেন, মাথা বাঁচালেন, পাশ কাটালেন', তারা সকলেই বজ্রাহত, জটলা করে দাঁড়িয়ে, যেমন ধর্ম-আক্রান্ত হলে সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকেরা মন্দির-মসজিদ ঘিরে দাঁড়ায়। এমন সময় অবিশ্বাসী ভিড়কে ফুঁড়ে একদল ভিখিরি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে পয়সার ওপর—তখনই ভদ্রলোকদের সম্বিত আসে :

> তখন কয়েকজন লোক 'শালা আমাদের ভিখিরি পেয়েছো' বলে
> আচমকা তেড়ে এলো

এবং কবি তখন

> তাদের রাগ আসলে আমার ওপর না ভিখিরিগুলোর ওপর
> বুঝতে না পেরে
> আমি আবার ছুটতে লাগলুম টাকশালের দিকে···

এই বুঝতে না-পারার ভাবটা বিদ্রূপকে আরো জোরালো করেছে।

কমল চক্রবর্তীর পাশে, দেখা যায়, রণজিৎ দাশ-এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি কখনই আবেগে দিশাহারা নন। তাঁর কবিতায় সব-সময়ই একটা যুক্তির গড়ন থাকে। তার সঙ্গে বিভিন্ন অনুভূতির সংমিশ্রণে গড়া সমাজ-

মন্যতা। 'ব্যালট পেপার' নামক ছোট কবিতাটিই ধরা যাক। আমাদের নির্বাচন-নির্ভর রাজনীতির ফাঁকি, তার ঠাট, বাস্তবের মানুষের সঙ্গে তার দূরত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়—সমস্তই যেমন ভাবে ফুটেছে, তেমন কোনো রাজনীতি-উগ্র কবিতাতেও ফোটে না। প্রত্যেকটি শব্দের অনিবার্যতায় যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর বর্তমানের ক্ষোভ ও বিষাদ, আত্মধিক্কার ও প্রতিবাদ।

সাঁতারু মাছের চোখে তাকালো বৃদ্ধটি
এমন ভোটের দিন নিমেষে উদ্ভিদ হয়ে গেলো।
নাম কি তোমার? বাবু, মংলু পাহান!
তার কণ্ঠস্বরে এই আদিবাসী ভোটকেন্দ্র মহুয়ার জনশ্রুতি শোনে
আমি চিত্রকর, আমি নির্বাচন-কর্মচারী, তর্জনী শনাক্ত করি তার
গভীর জলের রঙ বৃদ্ধের শরীরে, তাকে স্রোতের শাসক মনে হয়
হাতে তার শাল পাতা, ভাত, তাড়ি, টাঙ্গি আর ব্যালট পেপার

রণজিৎ দাশ-এর কৃতিত্বও কিন্তু অভিজ্ঞতার ও ভাষার নির্দিষ্টতাতেই। অন্যভাবে আমরা তাই পেয়েছি কমল চক্রবর্তীর মধ্যেও। কবিতা তো শব্দ-শিল্পই, কিন্তু শব্দের বা শব্দ-সমন্বয়ের প্রতি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মনোযোগ পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে দেখেছি, ষাটেও দেখেছি। সত্তরের কবিদের মধ্যে এই শব্দ-মনোযোগ শব্দ-তন্ময়তায় পরিণত হল। অন্তত অনেকের মধ্যেই। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল 'দেবী'-তে (১৯৭১) যে তৎসম শব্দবহুল ক্লাসিকাল ভঙ্গিতে দেবী বন্দনা করেছিলেন, তাতে চলতি ভাষার পিছল অনির্দিষ্টতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তা না হয় বোঝা যায়। প্রতিবাদের এই ধরন যদিও খানিকটা নেতিবাচক। কিন্তু অমিতাভ গুপ্ত 'আলো'-তে এই তন্ময়তাকে প্রকাশ করেছেন শব্দের চমকপ্রদ যাথার্থ্যে। তাই তো তিনি লিখতে পারেন 'বিজন জ্যোৎস্না অর্জন অসম্ভব' বা 'এখন বুঝেছি আমি সার্বভৌমতার মিথ্যা' বা 'তাৎক্ষণিকের মতো খাস্য তার শতাব্দীর মতো চলে যেতে' জাতীয় শব্দগুচ্ছ।

'চার নম্বর ফার্নেস চার্জড'-এ তো বটেই, 'জল' গ্রন্থে আরো, কমল চক্রবর্তীরও মন ভাষার কারুকার্যে। কমলের কবিতা খানিকটা চিত্রধর্মী এবং সেই চিত্রের ও তার ভাষার বিস্তারে ও বৈচিত্র্যে যে গুরুচণ্ডালী তা আমাদের বাস্তবেরই প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। 'অন্ধকারে ঘাড় চাটে লুপ্ত সরীসৃপ', 'মজদুরের স্বপ্নে ঘোরে পাগলা টারবাইন', 'ঋদ্ধি রাখার করোগেট জোব্বে

আষাঢ়ে ঝর্ণায়', 'মজদুরের ফেরা মানে আগুনের ফার্নেস থেকে / বৈদ্যুতিক বিছানায়, গাঢ় ঘুমে' প্রথম কটি পাতা থেকেই এরকম অজস্র তাৎপর্যময় লাইন পাওয়া যায়। অবশ্য এরকম ছিন্নমনা শব্দচয়নের বিপদও আছে— 'এ শুধু আমিষ হাহাকার' বা 'আষাঢ় শ্রাবণ দুই স্তন দুঃখের মতো ফোলা' বা 'যোনিতে হিক্কা তোলে' বা 'বাম স্তনে বসেছে বিকেল' জাতীয় বালকোচিত নাটকে চলে যাওয়ার ঝোঁক আসে। তবু কমলের শব্দবোধ শানিত ও আধুনিক সন্দেহ নেই।

'জলপাই কাঠের এসরাজ' গ্রন্থে (১৯৮০) মৃদুল দাশগুপ্ত-র ভাষাসংগীত আরো অন্তর্নিবিষ্ট এবং আরো অন্তঃক্রিয়—সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সে-সংগীতের ভিত্তিও এখানে আরো অসংলগ্ন। মনে হয় পূর্ববর্তী দশকের অভিজ্ঞতাকে তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছেন। একটি স্তবকের মধ্যে কিংবা হয়তো একটি লাইন বা লাইনের অংশে শব্দসমাবেশে এত নির্ভীকতা ও সুরজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তিনি যে তখন মনে হয় মীড়ের কাজ, ছোট ছোট অলঙ্কার, কখনো সুরসংগতি কখনো সচেতন সুর-অসংগতির ঢেউ, নানা মাত্রার ও ওজনের ও অনুষঙ্গের শব্দকে সাজানোর এরকম সাবলীল সাহস ও কৃতিত্ব সত্তরের দশকের কবিরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মৃদুলের কবিতায় তার বেশি চাওয়ার পাওনা এখনই বোধহয় মিটবে না। এখানেই কমল চক্রবর্তী বা রণজিৎ দাশ-এর সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল। মৃদুল দাশগুপ্ত কি নিজেই জানেন তাঁর এই ক্ষমতার ও সীমাবদ্ধতার যুগ্মতা ?

> ছড়িয়েছি কিন্তু শিকড়হীন···
> নিজেকে বিশদ করে আরো খুলে ফেলি···
> মেডুলায় এক প্রান্ত, স্নায়ুগুলি, অন্যপ্রান্তে পায়ের আঙুল বেঁধে
> নিজেকে বাজাই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বীণা, সাতা মাত্রা, সুরগুলি
> উড়ে কি ছড়িয়ে গেলে, মা আমার, ফেরাতে পারি না
>
> (সমুদ্র গুপ্ত এবং তার বীণা)

মৃদুল যখন বলেন,

> কোনো দিন কিছুই ছিলো না, কিছুই কিছুই নেই আমাদের আজ
> আমরা কি বাজাবো না জলপাই কাঠের এসরাজ ?
>
> (জলপাই কাঠের এসরাজ)

তখন বোঝা যায় সত্তরের এই কবির কাছে কিছু না থাকাটা ততটা হাহাকার নয়, যতটা তার মধ্য দিয়ে আত্মাকে খুঁজে পাওয়ারই যেন অহংকার।

ভাষাকে এই ভাবে খুঁজে-পাওয়া এবং তারই মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া যদি মৃদুল এবং এ-যুগের অন্যান্য বহু কবিরই নিয়তি হয়, তবে বুঝতে হবে পঞ্চাশের কোনো কোনো কবিদের বহু-ঘোষিত যাত্রা আজ সম্পূর্ণ হল। কিন্তু দুর্মর আশা শুধু তরুণ কবি মৃদুল দাশগুপ্ত-র পরবর্তী উত্তরণেই নয়, এ-যুগেরই অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো কোনো কবির কাব্যসিদ্ধিতেও, যদিও হয়তো সে সিদ্ধি কখনো পরিণামমুখী কখনো দিশাহারা।

সত্তরের কবিদের আলোচনার এই উপসংহারে পুনর্বার স্মরণ করানো প্রয়োজন মনে করি যে কবিদের এই নির্বাচন নিতান্তই আপতিক ও দৃষ্টান্ত-মূলক। আকস্মিকভাবে পেয়ে যাওয়া বইগুলো থেকে নির্বাচনে কোনো কোনো কবির প্রতি ব্যক্তিগত রুচির পক্ষপাত যদি ঘটেও থাকে, এ-বিষয়ে বর্তমান আলোচক সচেতন যে এর বাইরে অসংখ্য কবি আছেন, যাঁরা নিশ্চয়ই সমান গুরুত্বের অধিকারী। ভরসার কথা এটুকুই যে, সত্তরের দশকে মূলত যাঁরা লেখা শুরু করেছেন, তাঁদের সামনে সময় অন্তহীন।

১৬

তাহলে সমস্যা সেই পুরনো: বিষয় ও প্রকরণের অদ্বৈতে কাব্য-অভিজ্ঞতার সিদ্ধিতে পৌঁছনো। কিন্তু ইতিহাসের এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে সমস্যাটা একটু উল্টোভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কিভাবে কাব্যভাষার এই সময়বাহিত আধুনিকতা খুঁজে পাবে অন্তর্লীন কিন্তু দৃশ্যত উধাও বা পথহারা বিষয়কে। আজ কি তবে বিষয়ের দিক থেকে কালচেতনায় যাঁরা ঋদ্ধ, তাঁরা খুঁজে পান না ভাষার আধুনিকতাকে, যে আধুনিকতা ইতিমধ্যেই দরজায় টোকা দিয়ে গেছে? তবে কি ভাষার কালস্পন্দকে যাঁরা রক্তে চেনেন, তাঁরা জানেন না কিসের আধার সেই ভাষা? হয়তো সন্দেহ হতে পারে, ভাষা-সচেতনতা বাদ দিয়ে বিষয়ের প্রগতি সত্যিই প্রগতি কিনা কবিতার জগতে, কিংবা উল্টোটাও, বিষয়চেতনা বাদ দিয়ে কিংবা বিষয়ের প্রগতি বাদ দিয়ে ভাষার প্রগতি ঘটানো সম্ভব কিনা। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের অদ্বৈততা তো চিরকালের সত্য। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রেই সম্ভব, পরিবেশগত যে ক্ষয়ের পরিণামে বিষয় ও প্রকরণের বিচ্ছেদ, তা থেকেই ভাষার ব্যাপারে এই বিচ্ছিন্ন ও প্রায় বিকারগ্রস্ত আবেশ-এর জন্ম, এবং ভাষার এই অতি-প্রযত্নেই আবার শিল্পেরই প্রগতি। ইতিহাসের এই কৌতুকেই তো অনগ্রসর সমাজে ও মনেও সূচিত হতে পারে শিল্পের অগ্রগতি কোনো-কোনো দিক থেকে।

হয়তো এ-প্রসঙ্গ এখন একটু অবান্তর—সত্তরের কবিদের ভাষাগত কৃতিত্ব এত দূর নয় যে তার ভূমিকা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারি। তা ছাড়া বিষয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া উগ্র ভাষা-সচেতনতা, কিংবা ভাষা-সাধনার মধ্যেই অভিজ্ঞতাকে লীন করে রাখা—এ-সবই শেষপর্যন্ত বড় সময়ের বিচারে ব্যর্থতারই সাক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, বিচ্ছিন্ন ভাষা-সচেতনতার এই দিকচিহ্নগুলি বাংলা কবিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে, তাকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার বাস্তবতা গড়া যাবে না, এই উপার্জনকে বাদ দিয়ে বিষয়নিষ্ঠ-সমাজসচেতন বা দায়বদ্ধ কবিতাও সদর্থে আধুনিক হয়ে উঠবে না।

কিন্তু তার কোনো সহজ সমাধান নেই- না বিষয়বাদীদের দিক থেকে, না ভাষাবাদীদের দিক থেকে। কবিদের কাছে তার সমাধান নিশ্চয়ই কবিত্বের নিজস্বতাতেই নিহিত। পাঠকের কাছে এই সমাধানের ইঙ্গিত মেলে হয়তো ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সার্থক কবিদের কাব্য-অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে। আধুনিক বাংলা কবিতার বিভিন্ন দশকে সেই অখণ্ড অভিজ্ঞতারই বাহক হিসেবে আমাদের মনে স্বীকৃত হয়ে আছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ এবং নিশ্চয়ই আরো অনেকে। বিষ্ণু দে প্রায় পাঁচটি দশক ধরে আমাদের দেশের ও কালের বিষয়কে ভাষার নিত্যচলমানতায় যে ভাবে রূপ দিয়েছেন, সেই তো আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত। আর-একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখি, সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় কিভাবে আজ সত্তরের দশকেও ভাষার তীক্ষ্ণ সচেতনতা হয়ে উঠেছে দেশকালবিষয়ে সচেতনতারই আধার। এই সচেতনতা আজ খুব সুখের নয় তাঁর কাছেও। আরম্ভটা ছিল হয়তো সুখেরই—পূর্ণিমার ভরা জোয়ার। ভাষার তীব্রতায় সেই জোয়ারের রূপ :

> চাঁদও বেয়ে উঠেছিল মর্মের
> সোপান
>
> যেমন সে ওঠে
> হেলানো আকাশ বেয়ে, নভোতুঙ্গে
>
> প্রতিপক্ষে একবার পঞ্চদশী, কলায় পারঙ্গমা
> প্রতিপদে
> কণায় আবেগে ভরে ওঠা, ডাগর, পূর্ণমায়ায়

তেমনি সে টান দিলে
মর্মোচ্ছ্বাস ধরে দিলে
টান…

তারপর মর্মান্তিকভাবে ইতিহাসের পশ্চাদপসরণের কথাই লিখতে হয় তাঁকে, লিখতে হয় শ্মশানের কথা, অমাবস্যার কথা। সেই আপোসহীন নিরন্ধ্র অন্ধকারের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েই তিনি আজ কঠিন আশাকে পেতে চান। ভাষাতেও তারই মানচিত্র।

উল্টো পথে
চাঁদ-ই
থেমে যায়

তারার অরণ্যে পথ হারিয়ে যেনবা
চন্দ্রকলা

শুক্লেরই আশ্রয় হারিয়ে

শুধু কালো, শূন্য, কালো, শুধু শূন্য তমোনিখিলে, সীমাহীন, এক
আকাশ-জোড়া অমাবস্যার, হায় !! (পূর্ণমায়ায়)

পুস্তক-পরিচয়

নয়া ভাষাতত্ত্ব ও চোম্‌স্কির পথ

গোপাল হালদার

Reflections on Language by Noam Chomsky. Fontana/Collins 1976

নোয়াম চোমস্কি নিমন্ত্রিত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন (১৯৭২), নয়াদিল্লিতে বক্তৃতা দিলেন। তবে ভাষাতত্ত্ব নয়, 'জওহরলাল নেহরু স্মারক বক্তৃতা'র বিষয় তৎকালীন রাজনীতি—ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে বক্তৃতা (*Science and Ideology* নামে প্রকাশিত ১৯৭৩-এ ?)। তখন তাঁর দু-একটা কথা, যা আমাদের দেশে সংবাদপত্রে বেরোয়, চোমস্কির মুখে আমাদের নিকট নতুন ঠেকল—'ভাষা সামাজিক সম্পদ' এ-মর্মের কিছু উক্তি শুনি। চোমস্কির তত্ত্ব বা দর্শন কিংবা তাঁর ভাষা-তাত্ত্বিক-পদ্ধতি, কোনো বিষয়ই আমরা অনেকেই তৎপূর্বে জানবার যথার্থ সুযোগ পাই নি। পেঙ্গুইন-প্রকাশিত কিছু 'নয়া ভাষাতত্ত্ব'-র বই এ-সময়ে পেলাম ও পড়লাম। একখানাও মূল বই নয়, তবে 'নয়া ধারা'র নানা দিকের বিশেষজ্ঞদের প্রামাণিক ব্যাখ্যা—**Grammar, Syntax, Semantic** প্রভৃতি বিষয়ে। তার মধ্যে ছিল **John Lyon** রচিত ***New Horizons in Linguistics*** (১৯৭৩) এবং তাঁরই রচিত এই **Chomsky** (ফন্টানা গ্রন্থমালা ১৯৭০)। প্রকৃতপক্ষে ঐ *New Horizons in Linguistics*-ই আমাকে কিছুটা 'নয়া ভাষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে। তাতে সমগ্রভাবে এই নতুন ধারার নানামুখী গবেষণার ও কর্মের সন্ধান মেলে (বৎসর তিন পূর্বে 'পরিচয়'-এ আবদুল হাই-এর বিষয়ে বলতে গিয়ে সে-কথা পাঠকদেরও বলেছি)। সব বুঝেছি বলব না, তবে 'নয়া ভাষাতত্ত্ব'-র দৃষ্টি **Mathematical Linguistics** থেকে আরম্ভ করে কত দিকে গিয়েছে, **Symbolic Logic, Computer Linguistics** অবলম্বনে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দৌলতে গাণিতিক **Translation** পদার্থবিদ্যার রাজ্যে আকাশ-মহাকাশ রেডিও উপগ্রাহিক বেতারবার্তায় কত দিকে কার্যকর সফলতা আয়ত্ত করেছে, তার আভাস পেয়ে বুঝেছিলাম এদিকগুলিতে 'নয়া ভাষাতত্ত্ব'-র বিস্তার বাস্তবক্ষেত্রে সফল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে সত্যই অভিনব ও বিপ্লবী। কিন্তু যে-সব নতুন পদ্ধতি ভাষাতত্ত্বে এই ধারা প্রবর্তিত করছে, তার পরীক্ষা,

পরীক্ষা বা বিচার আমার পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ, এ ধারার বিকাশে আধুনিক **Mathematical** পদ্ধতি ভিত্তি, আর অঙ্কে আমার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু নয়া ভাষাতত্ত্ব কী, কী তার উপাদান, কী দৃষ্টিক্ষেত্র—সাধারণ ভাবে তার পদ্ধতি কী, তত্ত্ব কী এবং প্রতিপাদ্য কী, এ সব কিছুটা বোঝাও দরকার। আবার, কি করে নোয়াম চোমস্কি তাঁর একান্ত সীমাবদ্ধ ভাষা-তত্ত্বের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক মতবাদের সামঞ্জস্য করেছেন, সম্ভব হলে তাও জানতে হবে। জন লিয়নের মাত্র ১১৬ পৃষ্ঠার এই 'চোমস্কি' বইখানা তখনই কিনি—আর পড়েও ফেলি বার দুই—শেষবার ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর। সম্প্রতি (১৯৮০) বইমেলায় গিয়ে পেলাম 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'ও। তাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার দীর্ঘ এক প্রবন্ধে চোমস্কির ভাষাতত্ত্বের যতটা সম্ভব সরল বিবরণ দিয়েছেন। আর ঘটনাক্রমে ঠিক এ-সময়ে পাওয়া গেল (বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের হাতে পড়াতে) চোমস্কির নূতনতম একখানা বই *Reflections on Language* (ফনটানা গ্রন্থমালা, ১৯৭৬)। পাটনায় বসে এপ্রিল মাসে বাংলা ও ইংরেজি দুটি লেখাই পড়েছি; কলকাতায় এসে এই চোমস্কির সম্বন্ধে বইটি তাই আবার উল্টিয়ে দেখছি; 'চোমস্কির তত্ত্ব' কতটা বুঝেছি তা আরও একটু পরীক্ষা করছি।

অপ্রাসঙ্গিক কথা অত্যন্ত বেশি হয়ে গেল। আসল প্রসঙ্গ—লেখা তিনটি, 'চোমস্কি', তাঁর 'রিফ্লেকৃশন্‌স অন্‌ ল্যাঙ্গোয়েজ' এবং ডঃ পবিত্র সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ। আরও একটু ভূমিকাও অবশ্য দরকার—'নয়া ভাষাতত্ত্ব'-র জন্ম ১৯৩৫-এ ব্লুমফিল্‌ড্‌-এর *Language*-এর প্রকাশ থেকে, সরলতম কথ্য-ভাষার **Syntax**-ই ভাষার মূলবস্তু। ১৯৫৭ সালে চোমস্কির *Syntactic Structures*-এ তাতেও 'বিপ্লব' সংঘটিত হয়। তারপরে ১৯৬৫ থেকে চোমস্কির *Aspects of the theory of Syntax* থেকে সে বিপ্লব সর্বজয়ী। অবশ্য চোমস্কি ও অনুবর্তী গবেষকরা সেই পদ্ধতিরই বিস্তার, বিচার, সংশোধন, বিকাশ এখনো করছেন। ব্লুমফিল্‌ড্‌-এর ক্ষেত্রেই চোমস্কি আবির্ভূত হন, কিন্তু তারপরে ব্লুমফিল্‌ড্‌ও 'সেকেলে' হয়ে গেছেন—এ সব কথা শ্রীযুক্ত পবিত্র সরকার মোটামুটি বেশ বুঝিয়ে বলেছেন। এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। প্রবন্ধটি পড়াই প্রয়োজন।

তত্ত্ব ছাড়াও চোমস্কির কথাও একটু জানা যায় লিয়নের বইতে। যথা—আব্রাহাম নোয়াম চোমস্কির জন্ম আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায়, ১৯২৮ সালে

—বুদ্ধিজীবী ইহুদি গোষ্ঠীর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রধান পাঠ্য ছিল ভাষাতত্ত্ব, অঙ্ক ও দর্শন। অচিরেই দেশে-বিদেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার নাম হয়। অধীত বিষয় ছাড়া প্রথম থেকেই তাঁর আগ্রহ ছিল রাজনীতিতে—এক অর্থে তা থেকেই নাকি তাঁর ঝোঁক যায় ভাষাতত্ত্বে (আধুনিক হিব্রুভাষার গবেষণায় তার আরম্ভ)—পথ চলে সোশ্যালিজম বা বা অ্যানার্কিজম ঘেঁষে। ১৯৫৭-তে তাঁর *Syntactic Structures* যখন বেরোয় তখন চোমস্কির বয়স ৩০ বৎসরও নয়—তারপর *Aspects* বেরোয় তাঁর ৩৭ বৎসরে। তত্ত্বপ্রধান এক বই *Language and Mind* (পরিবর্ধিত) ১৯৭২-এ বেরোয়। বুঝি (হামবোলড্ট, কান্ট প্রভৃতির ধারায়) মানবমনের আজন্মলব্ধ স্বাধীনতা ও সৃষ্টিচেতনার সাক্ষ্য হিসাবে তাঁর ভাষাতত্ত্ব ও রাজনৈতিক মতবাদ একসূত্রে গ্রথিত। জৈব অভিব্যক্তির ধারাতে মানুষ পেয়েছে দেহমনে এরূপ স্বাধিকারে সৃষ্টিশীলতা। চোমস্কির মতে তা আধ্যাত্মিক 'তত্ত্ব' নয়—প্রাণবিজ্ঞানের (অভিব্যক্তিবাদের) সত্য। মার্কসও হয়ত এ সত্য মানতেন; কিন্তু চোমস্কি মনে করেন—মার্কসবাদীরা, পুঁজি-বাদীদের মতোই, অতিকায় প্রয়োগবিদ্যার দাপটে মানুষের এই সত্তার স্বাধীনতা ও সৃষ্টিসামর্থকে খর্ব করতে থাকেন। চোমস্কির রাজনীতি মানবতাবাদী—মার্কসবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ দু-এরই বিরোধী। থাক এ কথা। আমাদের লক্ষণীয় বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বে চোমস্কির দান।

লিয়ন-এর বিবরণীতে চোমস্কি-তত্ত্ব যতটা পরিষ্কার করে বলা সম্ভব তা বলা হয়েছে। আর সে বিবরণ চোমস্কিরও অনুমোদিত, অতএব তা প্রামাণিক। তথাপি তা সম্পূর্ণ সহজবোধ্য কিনা বলা সহজ নয়। তাতে বর্তমান যুগের অনেক বিদ্যার মতোই এ-তত্ত্বে অঙ্কের পদ্ধতির প্রয়োগ দেখি—তাতে আমাদের বিভীষিকা অনিবার্য। দ্বিতীয়ত, শুধু ইংরেজি ভাষা নিয়েই এ তত্ত্বের গবেষণা হচ্ছে—শত হলেও যাতে আমাদের তাই সংকোচ কাটে না। তৃতীয়ত, এদের বিশেষ পরিভাষা। নিশ্চয়ই পদ্ধতিটা মামুলি-ব্যাকরণ-পড়া আমাদের নিকট অভিনব। সত্যই মানি—ভাষার ভিত্তি বাক্য, **Syntax** সেই বাক্যের স্বাভাবিক রূপ। কিন্তু **Syntax**-এর **Subject-Predicate** প্রভৃতি ভাগের পরিবর্তে **'Phrase Structure Grammar'**, **'NP+VP'** প্রভৃতি বহু বহু সাংকেতিক নামকরণে গোল বাধে। একদিকে পদ্ধতিকে সহজবোধ্য করবার জন্য শাখাবহুল 'বৃক্ষচিত্র' আর তার মধ্যে ক্রমেই বিচিত্র বিচিত্রতর সংকেত-বর্ণ-চিহ্ন প্রভৃতির ছড়াছড়ি ও বা নাতিকঠিন তাকেও বিভ্রান্তিকর

করে তোলে। নিশ্চয় প্রয়োজনেই এ সবের প্রয়োগ, কিন্তু পদে পদে বুঝে গিয়েও চোমস্কির **Transformational Generative** (না **Creative**?) **Grammar**-এর সকল কথা আয়ত্ত হল, আমার পক্ষে এ কথা ভাবা কঠিন।

সে পদ্ধতি কতকটা বুঝে ও না-বুঝে ব্যাকরণের তত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য (মানুষের মনের রূপ—অন্তর্নিহিত যুক্তিবোধ, অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে ভাষা-বোধের বৃত্তিরও যোগাযোগে প্রকাশ ও বিকাশ), ভাষার সামাজিক তাৎপর্য (বাইরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে এই মনের ভাষা-চেতনা শক্তির ক্রম-বিস্তার, ইত্যাদি) প্রভৃতি বোঝা সম্ভব হয়। কথাটা আর একটু স্পষ্ট হয় বললে যে, এই চোমস্কীয় দর্শনের দিকটা মোটামুটি বোঝা সম্ভব—চোমস্কির শেষ বইখানা ***Reflections on Language*** তর্কবহুল, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব তাতে বরং সহজবোধ্য হয়েছে পাঠকের কাছে। অর্থাৎ **Empiricism** নামীয় মার্কিন 'ব্যবহারবাদী' চিন্তার ছায়ায় যে মার্কিন (**'Bloomfieldian'**) ভাষাতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল তা মূলত বাতিল করে (দেকার্ত, কান্ট প্রভৃতির) ভাবধারায় যুক্তিবাদী (**Rationalism**) বাস্তব পথে ভাষাতত্ত্বকে চোমস্কি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য এ তত্ত্ব দার্শনিকের মূলত বিচার্য। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ভাষায় এরূপ **Psychological** ও **Sociological** তাৎপর্যের স্বীকৃতি দেখলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

ব্লুমফিলডের মতো ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষাকে মানবজীবনের সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাষা হিসাবেই আলোচ্য সত্য বলে গ্রহণ করেন। তাঁদের কথা—বিজ্ঞানী যেমন উপাদানকে 'ল্যাবরেটরিতে' বিচ্ছিন্ন-আকারে পরীক্ষা করেন, ভাষাও হবে তেমনি উপাদান। তাকে লেখার থেকে, সাহিত্যের থেকে, ব্যক্তিসত্তার আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ধুয়ে মুছে নিতে হবে। অর্থাৎ অতি সাধারণ মানুষ যেমন মুখে উচ্চারণ করে সরলতম বাক্য, তাই একমাত্র হবে পরীক্ষার উপাদান: সেই সরলতম বাক্যের **Syntax**-ই হল ব্যাকরণের বিশ্লেষণীয়। গোঁড়ামি না করে মানি—মুখের সহজ বাক্য ও তার **Syntax** থেকে **Grammar** গড়ে তোলার মধ্যে যুক্তি আছে (মামুলি ব্যাকরণে তা করা হয় না। আর চিরায়ত ভাষাতত্ত্বও এরূপ ভাবে চলে নি)। কিন্তু ভাষা জিনিসটা কি শুধু 'পদার্থ'? পদার্থবিদ্যার উপাদান? মানব-সম্পদ নয়? মানবমন ও বুদ্ধি-প্রবৃত্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই? ব্লুমফিল্ড্‌, **Behaviorist**, তাই বলবেন—বাহ্য জগতের ঘাত-

প্রতিঘাতে মানুষের মনের যেমন সৃষ্টি, তেমনি ভাষারও সৃষ্টি—এই ব্লুমফিল্ডীয় Behaviorist দর্শনের কথা, আমাদের চরম সত্য বলে মনে হয় না। আমরা বুঝি, ভাষা 'বিজ্ঞান', 'মানব বিজ্ঞান'—'পদার্থ বিজ্ঞান' নয়। Mathematical Linguistics বা Computer Linguistics এর দান ভাষাতত্ত্বে নিশ্চয় গ্রাহ্য। কিন্তু তা Objective বস্তু বা উপাদান নিয়ে কাজ করতে পারে। ভাষার Subjective দিকও আছে, ভাবের ছোঁয়াচ থাকে। সেখানে Mathematical Linguistics প্রয়োগ করতে গেলে হাস্যকর বিভ্রাট ঘটায়, তাও সুবিদিত। এসবে সন্দেহ করবার কারণ ঘটে—ভাষাকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে দেখা, ভাষার ক্ষেত্রে একালের 'বিচ্ছিন্নতা-বাদের'ই একটা প্রতিফলন নয় কি? কিন্তু চোমস্কির তত্ত্বে সেরূপ বিচ্ছিন্নতা অগ্রাহ্য; মন ও সমাজের প্রভাব বাতিল তিনি একেবারেই করেন না।

এখনও দু-একটা মূল কথায় আসা হয়নি—ভাষা কী? ভাষা-চেতনা হোমোসেপিয়ানদেরই ধর্ম (বুদ্ধিযুক্ত নৃজাতির 'Species Character'), সাধারণ ভাষা-বুদ্ধি (অন্যান্য আরো কিছু বুদ্ধির মতো) সকল মানুষের জন্মগত। সে বুদ্ধি সৃষ্টিশীল বুদ্ধি বলেই ভাষায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মের পর প্রত্যেক মানুষের ভাষা—অবস্থার যোগবিয়োগে যত বিভিন্ন হোক এবং যে বিভিন্ন ভাষা হোক (পৃথিবীতে তাতেই হাজার হাজার বিভিন্ন ভাষা), —অন্তর্নিহিত ভাষা-চেতনা (যা সৃষ্টিশীল, যা intuitional) তা এক ও অভিন্ন। চোমস্কি বলতে চান—সত্যই প্রত্যেক ভাষার মধ্যেও একই বীজ নিহিত আছে—তার সরল বাক্যের আভ্যন্তরীণ স্তর—সর্ববিধ সরল বাক্যের Syntax কে (Transformational Generative Grammar এর পদ্ধতিতে) বিশ্লেষণ করে বাক্যের বিবিধ নিয়মাবলী আবিষ্কার করে করে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার চাবিকাঠিও পাওয়া যাবে Universal Grammar-এ, এই হল তাঁর ভাষাপদ্ধতির লক্ষ্য। এবার থমকে দাঁড়াতে হয় (Einstein-এর 'Unified Field'-এর অন্বেষণের কথা মনে পড়ে)। যদি সত্যও হয়, তার আগে তো অনেক-অনেক পথ উত্তীর্ণ হতে হবে—Transformational Generative Grammar এখনো তো ইংরেজিতেই সীমাবদ্ধ, আর তাতেও ইংরেজি মৌখিক বাক্যের উপাদান নিয়েই ব্যস্ত। ভাষারই মৌখিকরূপ ছাড়া লিখিতরূপ, অতীতরূপ এবং অন্য ভাষার সহিত তুলনীয়রূপ,—এই 'নয়া ভাষাতত্ত্বে'র কাছে প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। আমাদের কাছে তা নয়। তাই জিজ্ঞাস্য থাকে—ভাষার চর্চার লক্ষ্য কী? চোমস্কি প্রমুখদের লক্ষ্য Universal

Grammar এর উদ্দেশ্যে পদযাত্রা—'সংবর্তনী সঞ্জননী পদ্ধতি'তে পা গুণে গুণে। অন্য দিকে তো দেখছি 'নয়া ভাষাতত্ত্বে'র কোনো কোনো শাখা (যেমন Computer Linguistics) স্বর্গমর্তপাতাল পরিভ্রমণে ব্যস্ত—'নয়া ভাষাতত্ত্বে'র লক্ষ্য ও পদ্ধতি তা হলে এক নয়, একমুখী না, তা নানা দিকে দেখা দিয়েছে। তার একটি শাখায় অবশ্য চোমস্কি সর্বাগ্রগণ্য। আর সন্দেহমাত্র নেই—নোয়াম চোমস্কি একালের মানবতাবাদী একজন শ্রেষ্ঠ মেধাবী পণ্ডিত। ভাষাতত্ত্বের অপেক্ষা মানবতত্ত্ব কম জিজ্ঞাস্য নয়।

আনন্দের কথা, বাংলা ভাষায় চোমস্কির পথে কিছু কিছু গবেষক অগ্রসর হচ্ছেন, ডঃ পবিত্র সরকার তাঁদেরও সন্ধান দিয়েছেন। আরও দু-একজনের কথা শুনেছি। সকলকেই বলি 'স্বাগতম'। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি আমার মতো যাঁরা মেধায়, বয়সে ও অভ্যাসগত শিক্ষায় সে পথে অগ্রসর হতে অশক্ত (অশ্রদ্ধায় নয়), তারা ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকেও ছাড়বার কারণ দেখবে না। এবং ভাষার 'বীজ' যাই হোক, Syntactic Structure জিজ্ঞাসায় ও লেখায় ও কথায়, সাহিত্যের মধ্যে ভাষার যে ফুলফলময় অফুরন্ত ও বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখি, তাতে হয়তো Stylisticsই আমাদের আকর্ষণীয় হবে।

বজ্রের স্বরলিপি

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

নবজীবনের গান ও অন্যান্য। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন ১৯৭৮

সেই কোন যুগে, ১৯৪৫ সালে, 'নবজীবনের গান'-এর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ-কৃত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে গণনাট্য সংঘের কর্মপ্রবাহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নিজেই বহুদিন হয়ে রইলেন প্রবাসী। মৃত্যুর কিছুদিন আগে হঠাৎ আবার অবতীর্ণ হলেন কলকাতার আসরে। অবিস্মরণীয় সেই প্রত্যাবর্তন। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর রিহার্সালের লোভনীয় সন্ধ্যাগুলোর স্মৃতি এখনও প্রায়ই আমাদের বেদনার্ত করে তোলে। মনে হয় এই তো সেদিন, গতকালের ব্যাপার—এমনই উজ্জ্বল। তাঁর মৃত্যুর পর গত আড়াই বছরের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র সংগীত-প্রসঙ্গে আমরা একটিই মাত্র কাজের কাজ করতে পেরেছি। এবং সেটি হল ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তনের প্রচেষ্টায় 'নবজীবনের গান ও অন্যান্য' স্বরলিপি গ্রন্থের প্রকাশকর্ম (৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮)। তথ্য-সমৃদ্ধ উচ্চমানের এই বইটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'নবজীবনের গান'-এর মূল স্বরলিপি। তার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে 'ঝঞ্ঝার গান', 'গাজন' (স্বরলিপি : প্রসূন দাশগুপ্ত), শিশুদের গান চারটি (স্বরলিপি : সুভাষ চৌধুরী) এবং গণনাট্য সংঘের প্রতিটি অনুষ্ঠান এক সময় যে-গান দিয়ে শুরু হত, 'এসো মুক্ত করো' (স্বরলিপি : ভূপতি নন্দী)। আমাদের হাতের কাছে থাকল এক অমূল্য সংগীতসৃষ্টির নিদর্শন।

বাংলা গানের ইতিহাসে 'নবজীবনের গান' যে নতুন সংগীতাদর্শের সন্ধান দিয়েছিল, সেটা কোনো আকস্মিকতা বা আপতনের ফল নয়। সামাজিক ইতিহাসে যেমন ঘটনা-পরম্পরা, সংগীতেতিহাসে তেমন প্রবহমাণ ঐতিহ্য সুনির্দিষ্ট পথে অনিবার্যভাবে আমাদের নিয়ে যায় মোড়বদলের ক্রান্তিবিন্দুতে। এবং এই দুই ইতিহাসের সম্পৃক্ততার প্রমাণ শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ-মহাযুদ্ধের সঙ্গে 'নবজীবনের গান'-এর যোগাযোগেই শেষ হয়ে যায় না ; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র সামগ্রিক সংগীত-রচনায় এই সম্পৃক্তভাবের অমোঘ উপস্থিতি।

জানা আছে যে দুর্ভিক্ষ আমাদের দিয়েছে 'নবজীবনের গান' যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিজন ভট্টাচার্য-র 'জীয়নকন্যা'-র ইতিহাস। দুর্ভিক্ষ বা দাঙ্গার মতো সাংঘাতিক ঘটনাবলির প্রতি উদাসীন থাকা ফাসি-বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ বা গণনাট্য সংঘের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এ-ছাড়াও ছিল প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট গণসংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজ। এই পটভূমিকায় যাঁরা সংগীত রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা গানের প্রকৃত নতুন পর্যায় শুরু হল এই ভাবে।

'নবজীবনের গান' ও 'জীয়নকন্যা' এই পর্যায়ের সফলতম দুটি রচনা হলেও এদেরও মধ্যে সাংগীতিক দূরত্ব যে-কোনো শ্রোতার কানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আসলে নানা বিষয়ে অনেক কাছাকাছি থেকেও সামাজিক ইতিহাসকে জ্যোতিরিন্দ্র ও বিজন ভট্টাচার্য ভিন্ন ভিন্ন পথে ধরবার চেষ্টা করেছেন। গণ-সংস্কৃতির চরিত্রও দুজনে কল্পনা করেছেন দুভাবে। অনেক সময় প্রায় একই ধরনের সাংগীতিক উপাদান দুজনে ব্যবহার করেছেন—উদ্দেশ্যের ভিন্নতাহেতু একজনের থেকে আরেকজনের হাতে সে-সব উপাদানের স্বাদ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জ্যোতিরিন্দ্র যখন তাঁর গানে রাগরাগিণীর প্রয়োগ করেন তখন তার পেছনে কাজ করতে থাকে রবীন্দ্রসংগীতের আশৈশব অনুশীলন। অনুরূপ ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য-এর শ্রোতার মনে পড়ে যায় যাত্রা গানের কথা। 'জীয়নকন্যা'-র শুরুতেই 'নাগরাজ ফণী দংশিয়াছে শুনি' গানটিতে হিন্দোলের স্বরগুলি যখন সোহিনী-সুলভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হতে থাকে তখন আমাদের কানে আপনিই যেন বেজে ওঠে যাত্রাদলের বেহালা-ক্লারিওনেট। আবার 'লম্বকর্ণ পালা'য় জ্যোতিরিন্দ্র যখন যাত্রাগানের ঢঙ আমদানি করেন তখন তিনি শ্রোতার কাছে সফলভাবে পৌঁছে দেন অবনীন্দ্র-নাথের বিশিষ্ট মেজাজ। লোকসংগীতের সুর বিজন ভট্টাচার্য ব্যবহার করেন ব্যাপক ভাবে এবং আশ্চর্য সুখশ্রাব্য হয়ে ওঠে সেই-সব সুর তাঁর হাতে। আসলে কিন্তু লোকসংগীতকে বিজন ভট্টাচার্য ব্যবহার করেন রূপক রচনার উপাদান হিসাবে; তার কোনো সাংগীতিক রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা তিনি করেন না। এর ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত জ্যোতিরিন্দ্র-র সংগীতে দেখতে পাই। লোকসংগীত যখন সেই সংগীতে ব্যবহৃত হয়, তখন সে জীবন্ত মানুষের ভাষা—রূপকের উপাদান কখনোই নয়। 'নবজীবনের গান'-এর সেই অসাধারণ গানটি

'এখানে লেগেছে আগুন' যে প্রচণ্ড জ্বালা বহন করে, সেটা সত্যিকারের মানুষের পেটের জ্বালা। এবং জীবনের প্রয়োজনেই ভাষার রূপান্তর ঘটে বলে এই গানের সুর চিরাচরিত লোকসংগীতের সুর-মাত্র নয়। এতে এসে গেছে এক বিশিষ্টতা—গণসংগীতের লক্ষণ। এমনকি জ্যোতিরিন্দ্র-র যে রচনায় আমরা জ্যোতিরিন্দ্র আর বিজন ভট্টাচার্যকে সংগীতের দিক থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি পাই সেই 'গাজন'-এও কিন্তু এই মন্তব্য মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। 'পোড়া ভালে এই কি রে ছিল' গানটিতে পর্যন্ত রেখাবের প্রয়োগে এমন এক সূক্ষ্ম বিশিষ্টতা এসে গেছে (যা 'জীয়নকন্যা'-র অনুরূপ সুরের গানটিতে আমরা পাই না) যে একে আর লোকসংগীতের সঙ্গে একাত্ম বলে মনে হয় না। জীবন্ত মানুষের ভাষা—জীবনের প্রয়োজনেই তার রূপান্তর—রূপান্তর লোকসংস্কৃতি থেকে গণসংস্কৃতিতে।

আলোচ্য গ্রন্থে চিন্মোহন সেহানবীশ জ্যোতিরিন্দ্রর জীবনী সম্পর্কে যা লিখেছেন, সেটা প্রণিধানযোগ্য। কবি-গায়ক জ্যোতিরিন্দ্র-র ভাবনাচিন্তার পরিমণ্ডল, বিষ্ণু দে ও পরিচয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আত্মীয়তা, দেশী-বিদেশী উচ্চাঙ্গ-সংগীতের নিবিড় চর্চা—এ-সবেরই সুপরিকল্পিত সম্মেলন জ্যোতিরিন্দ্র-র সংগীতরচনায়। সুপরিকল্পিত—বাহ্যত অধিকাংশ রচনা আবেগের তাড়নায় রচিত হলেও। 'নবজীবনের গান' রচনার ইতিহাস তাঁর নিজের লেখায় আছে : 'একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে। এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—না না না! …মনে নেই কার বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম, কার কাগজ ধার করে কার কলমে লিখেছিলাম। সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার উৎস মুখ থেকে ঝরণার মতো বেরিয়ে এল।' এই উচ্ছ্বাসের আবর্তেও কিন্তু শিল্পগত একটি মৌলিক সমস্যার কথা তিনি বাস্তবে বিস্মৃত হননি। আসলে 'নবজীবনের গান' সেই সমস্যারই এক আশ্চর্য সমাধান। এবং ফলত তার এত গুরুত্ব।

সমস্যাটিকে আমি তিনটি প্রশ্নে বিভক্ত করছি, যদিও মূলত তারা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ক. তিরিশের দশকে বাংলা কবিতা এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে, মেজাজ ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যে এই কবিতাকে বলা চলে আধুনিক। বাংলা গানের

ক্ষেত্রে সমান্তরাল পর্যায়টি কীভাবে আসবে? মেজাজ ও আঙ্গিক-অবয়বের স্বাতন্ত্র্য?

খ. প্রগতিপন্থী (রাজনৈতিক-দার্শনিক) মতবাদের সঙ্গে সংগীতাদর্শের সংলগ্নীকরণ সম্ভব কী উপায়ে?

গ. যে-সংগীতধারায় সংগীতকার স্বয়ং লালিত-পালিত হয়েছেন, নতুন সংগীতাদর্শে সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, বস্তুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কীভাবে?

এবার 'নবজীবনের গান' সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্যটি রাখছি। একসঙ্গে এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর জ্যোতিরিন্দ্র খুঁজে পেয়েছেন পাশ্চাত্য সংগীতের অনুশীলনে, বিশেষ করে বেঠোভ্‌ন্‌-চর্চায়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এলিয়টের যা ভূমিকা, 'নবজীবনের গান'-এর ক্ষেত্রে বেঠোভ্‌নের ভূমিকা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং এটাই স্বাভাবিক। 'মধুবংশীর গলি'-র কবির পক্ষে উপরিউক্ত তিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আভিচারিক মন্ত্রতন্ত্র বেদে-সিদ্ধাই-এর রূপকে উপস্থিত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। শহর কলকাতায় তিরিশ/চল্লিশের দশকে শিল্পসাহিত্যের বাতাবরণে যে সঠিক সংগীতাদর্শ জন্মলাভ করতে পারে তার অনুপ্রেরণার উৎস বেঠোভ্‌ন্‌।

মানুষের দুর্দশা এবং লাঞ্ছনাকে যাঁরা শেষ কথা বলে মেনে নিতে রাজি নন, এরয়কা বা নবম সিমফনি তো তাঁদেরই অন্তরের ভাষা। মোড়ে মোড়ে যখন মৃত্যুর জয়ডঙ্কা বাজে তখন বুভুক্ষু সৈনিক মাথার ভেতরে শুনতে পায় পঞ্চম সিমফনির বিজয়তূর্য। দুর্ভিক্ষ বা দাঙ্গা বা মহাযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে যাঁদের স্নায়ুর উপরে বীভৎস নৃত্য চালিয়ে গেছে, তাঁদের যন্ত্রণা ও সান্ত্বনার পরিশীলিত সংগীতরূপ বেঠোভ্‌নেরই হাতে ছত্রে ছত্রে গাঁথা রয়েছে। অন্যপক্ষে বেঠোভ্‌নের চেয়ে একই সঙ্গে আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী সংগীত আর কী হতে পারে? দ্বান্দ্বিক চেতনায় সংগঠিত ঐক্য বেঠোভ্‌নী সংগীতের মর্মকথা—এ-বক্তব্য রোমাঁ রোলাঁ-র। যে সাংগীতিক অনিবার্যতার চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে বেঠোভ্‌ন্‌ অদ্যাবধি পাশ্চাত্যে বিস্ময়ের বস্তু, সে-অনিবার্যতা তো ভারতীয় সংগীতেরই অন্তরাত্মা—উপলব্ধ রাগরাগিণী কল্পনায়, আলাপে ধ্রুপদে, বাঢ়ত-বিস্তারের গভীর সরল গতিরেখায়। বেঠোভ্‌ন্‌ বাস্তবে অ-ভারতীয়—সে তো স্থূল সত্য। কিন্তু হার্মনি, কাউন্টারপয়েন্ট, অর্কেস্ট্রেশন, ফর্ম—এগুলোর কোনোটাই বেঠোভ্‌ন্‌ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা নয়। ভারতীয় কান যদি এ সবে

অভ্যস্ত হতে পারে, তাহলে সে অভ্রান্তভাবে চিনে নেয় ইওরোপীয় সংগীতকার-দের মধ্যে তার পরমাত্মীয়কে।

সুতরাং বেঠোভ্‌নকে বাংলা গানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দরকার হয়না বাহ্যিকভাবে অ-ভারতীয় সাংগীতিক উপাদান আমদানি করে খাপছাড়া কৃত্রিমতা সৃষ্টির। 'নবজীবনের গান'-এ কোথাও সে-প্রচেষ্টার লেশমাত্র নেই। ভারতীয় রাগরাগিণীর পরিচিত স্বরবিন্যাস—ফৈয়াজ খাঁ বা নাসিরুদ্দিন খাঁ-র দ্বারা অনুপ্রাণিত—প্রয়োগ করা হয়েছে প্রায় রবীন্দ্র-সংগীতের ভঙ্গিতে। কখনো কখনো হয়ত বাংলার ভূমিজ সংগীতের ছোঁয়াচ লেগেছে। কিন্তু সে-সবই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আশ্চর্য অভিনব, একেবারে মৌলিক। পরিকল্পনার মৌলিকত্ব, দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব।

'নবজীবনের গান'-এর গানগুলি সম্পর্কে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে—'এরা মূলতঃ গীতধর্মী হলেও গীতিনাট্যের একটা অন্তর্লীন সূত্রে গ্রথিত।' কিন্তু প্রচলিত গীতিনাট্যগুলোর দলে 'নবজীবনের গান'কে নিশ্চয়ই ফেলা যায় না। গীতিনাট্য-সদৃশ একটা প্রোগ্রামের কল্পনা এতে আছে। এমনকি প্রথম দল, দ্বিতীয় দল, তৃতীয় দল ইত্যাদিকে রচয়িতার ব্যাখ্যা অনুযায়ী এক একটা চরিত্র বলেও ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু সে-চরিত্রগুলো কখনোই ব্যক্তিতে পরিণত হয় না। তারা দল, গোষ্ঠী, শ্রেণী, সামাজিক শক্তি হিসাবেই থেকে যায়। সংগীতের দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র এই ব্যাপারটাকে এমন ভাবে দাঁড় করিয়েছেন যাতে মনে হয় যেন দলগুলো এক বিরাট অর্কেস্ট্রার এক একটা অংশ—যে-অর্কেস্ট্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের শোনানোর কোনো অবকাশ নেই; সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের উপর আরোপিত হয় না। অর্কেস্ট্রায় জ্যোতিরিন্দ্র আমাদের বাজিয়ে শোনান সমাজের ভাঙা-গড়ার সিমফনি—'নবজীবনের গান'।

অবশ্যই এই পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সিমফনি বা অনুরূপ কোনো ফর্মকে সরলভাবে অনুকরণ করার কোনো অসম্ভব প্রচেষ্টা করা হয় নি—বাংলা গানের ক্ষেত্রে যে-অনুকরণ হতো একেবারেই নিরর্থক। বিভিন্ন দলের গানগুলো একটার পর আরেকটা পৃথক পৃথক সময়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, বাহ্যত পলিফনির লেশমাত্র নেই। অথচ সামাজিক বাস্তবতায় তারা সমকালীন হয়ে বস্তুত পলিফনি-ই রচনা করে চলেছে। সংবেদনশীল শ্রোতার কল্পনায় এটাই কিন্তু হয়ে দাঁড়ায় 'নবজীবনের গান'-এর সাংগীতিক বাস্তবতা। শুরুতেই যখন তৃতীয় দলের কণ্ঠে শুনি ক্ষুধার কান্না, তখনো কিন্তু প্রথম ও

দ্বিতীয় দলের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞার রেশটুকু থেকে যায়। 'ফেন দাও প্রাণ দাও'-এর সঙ্গেই আমাদের মনে গুঞ্জরিত হতে থাকে 'মেনো না মৃত্যুর গ্লানি'। কিংবা 'রঙীন আকাশে চাঁদের সুধা' আর 'ভুলব না এ প্রেমের সুরে' যেন পলিফনিকেই ভেঙে টুকরো করে যথাযথ বাণী বসিয়ে দিয়ে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পুনর্গঠনের গানগুলোর মধ্যেও লক্ষণীয় প্রায় এই ধরনের সুরের বিন্যাস। এবং আরো বহু স্থানেই। মাঝে মাঝে যেন গতি বদলের প্রয়োজনে এসে যাচ্ছে কিছু কিছু একক গীতি। যেমন মহাযুদ্ধের ঝড় এনে দেয় 'দামামা বেজেছে'—যাতে অনিবার্যভাবে আমাদের মনে পড়ে যায় মহান নবমের দ্বিতীয় সঞ্চারের কথা—যদিচ গানটি বাঁধা হয়েছে হিন্দোলের স্বরগ্রামে। তেমনি 'পথে পথে শঙ্কা'। আবার কয়েকটা নির্বাচিত মুহূর্তে কল্পিত পলিফনির এই বিচিত্র নাটকের অবসান ঘটানো হয় সুপরিকল্পিত ভাবে, যে-সব মুহূর্তে অর্কেস্ট্রার বিভিন্ন অংশগুলো মিলে গিয়ে সমস্বরে ধ্বনিত করে তোলে কয়েকটি পুনরাবৃত্তিবঙ্কিত থিম। প্রথম পর্বে দুর্ভিক্ষ-মহাযুদ্ধের বিভীষিকাকে জয় করে বেরিয়ে আসে এমনই দুটি থিম: 'মুক্তিরণের সাথী' ও '(এসো) হাত লাগাই'। দ্বিতীয় পর্বে কালোবাজারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় 'এবার মোরা ঠিক করেছি' ও 'আমরা জনসাধারণ'। তৃতীয় পর্বে মহামারী ও শোষণের বিরুদ্ধে চরম উচ্চারণ 'অসহ্য অসহ্য অসহ্য'। 'মুক্তিরণের সাথী' কুচকাওয়াজের ভঙ্গি এনে দেয়—খানিকটা নজরুলি মেজাজে—'আগুয়ান' শব্দটির অভিক্ষেপ ঘটে যেন বিউগ্‌ল্‌-নিনাদের মতো, 'ঝঞ্ঝার গান'-এর সমাপ্তিতে 'সাবধান' শব্দটি যেমন। 'এবার মোরা ঠিক করেছি' গানটিতে সংগ্রামী অভিব্যক্তি 'অনেক দুঃখ অনেক মৃত্যু বহু লাঞ্ছনা পেরিয়ে/মহামারীর ওই চিতাবহ্নিকে এড়িয়ে/নতুন রাজ্য গড়ব' পদগুলিতে ভৈরবী রবীন্দ্রসংগীতের পথে এসেও একেবারেই অচেনা হয়ে যায় বেঠোভ্‌নি বাক্‌ভঙ্গিতে, সরল দৃপ্ত উচ্চারণে। শেষ পর্বে 'অসহ্য' শব্দটি তিনবার উচ্চারিত পুনরায় বেঠোভ্‌নের ভঙ্গিতে, নবম সিমফনির প্রথম সঞ্চারের বিশেষ একটি ছত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে এবং তারপরেই অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের ঘোষণায় মহৎ ফিনালের মতো 'ভাঙো ভাঙো ভাঙো ভেঙে ফেল এই কারাগার'। সংগ্রামের সংগীত 'নবজীবনের গান'। জনগণের সংগ্রাম।

ভবিষ্যতের সমাজ : এক কল্পকাহিনী

তরুণ সান্যাল

The Coming of Post-Industrial Society by Daniel Bell Basic Book Inc. New York, 1970 ; A Venture in Social Forecasting. Heinemann, 1974

আঠারো শতকের সত্তরের দশক থেকে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগ। এসময় উৎপাদনের হাতিয়ার রূপ নিয়েছে যন্ত্রে, বাষ্পশক্তিকে ক্রমাগত বেশি বেশি কাজে লাগানো হচ্ছে যন্ত্র চালাতে, উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে খণ্ড খণ্ড করে শ্রম-বিভাজনের উপায়ে কারখানা-ভিত্তিক করে তোলা হয়েছে। এমন কি মালিকানা সংগঠনেও নতুন রূপ এসেছে, যৌথ মূলধনী কারবার। পুঁজিবাদী অর্থনীতি-ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, বড় বড় শহর গড়ে উঠছে, এমন কি জনসংখ্যাতেও দারুণ বৃদ্ধি ঘটেছে। ঘটনার স্থল প্রথম দিকে ব্রিটেন। তারপর ফ্রান্স, কিছু পরে জার্মানি।

এই শিল্পবিকাশের যন্ত্র-পরিচালনায় এক সময় এসেছে বিদ্যুৎ। কিন্তু উৎপাদনের কায়দাকানুন ছিল একই ধরনের, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, সমাজ মালিক ও মজুরে মূলত বিভাজন। এমন ব্যবস্থায় প্রকৌশলের দাবি বিজ্ঞান-বিকাশকে কার্যকর করেছে। উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল মুনাফা, এবং যেহেতু মুনাফা পাওয়া যায় বাজারকে কেন্দ্র করে, শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে, সুতরাং শ্রম-উৎপাদিকা বাড়াবার দাবিই এনেছে প্রকৌশলের বিকাশ। এসেছে ঐ দাবির প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কাজে লাগাতে ক্রমশ সময়ের ফারাক কমেছে। যেমন ফোটোগ্রাফিতে লেগেছে ১০২ বছর (১৭২৭-১৮২৯), টেলিফোনে ৬৬ বছর (১৮২০-১৮৭৬), রেডিয়োয় ৩৫ বছর (১৮৭৬-১৯০২), পারমাণবিক বোমায় ৬ বছর (১৯৩৯-১৯৪৫), ট্রানজিস্টারে ৫ বছর (১৯৪০-১৯৫৩), লেসারে ৫ বছর (১৯৫৬-১৯৬১)। আর এখন গবেষণা ও বিকাশের (RD) কল্যাণে এই সময়-ব্যবধান প্রায় অন্তর্হিত হবার মুখে। এখন বিকশিত দেশে বিজ্ঞানই চালক, প্রকৌশল চালিত। ছবিটা বদলে গেছে প্রায় গোটাগুটি। বর্তমান সময়কে আর শিল্পবিপ্লবের পর্যায় নয়, বলা হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রকৌশল বিপ্লবের যুগ।

যে-কোনো চোখ-কান খোলা মানুষের কাছে ধরা পড়বে এযুগের তিনটি মৌল বিপ্লব। পরমাণু বিদারণ, বিপুল শক্তির উৎসার ও নিয়ন্ত্রণ, মহাকাশ অভিযান এবং সাইবারনেটিক বিপ্লব। এই সাইবারনেটিক বিপ্লব শিল্পবিপ্লব-ভিত্তিক যে উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল তাকে আগাপাশতলা বদলে দিয়েছে। তাই কারো মতে এতদিন ছিল শিল্পগত সমাজ বা ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, আর পৃথিবী বর্তমানে শিল্পোত্তর সমাজে বা **Post Industrial Society**-তে প্রবেশ করতে চলেছে অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রকৌশল বিপ্লব এই দুধরনের সমাজের মধ্যে জলবিভাজিকা। ১৯৫৮ সালে ডেভিড রিসম্যান ঐ পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি অভিধাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি এ সমাজের নাম অবসর-সমাজ বা **Leisure Society**-ও দিয়েছেন। অবশ্য কেনেথ গ্যালব্রেথ অনেকটা এমন সমাজে পদার্পণের প্রাক-সমাজকে নিউ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটও বলেছেন।

ইনডাসস্ট্রিয়াল সোসাইটিতে শ্রমিকের কাজটাই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। রিসম্যানের মতে এই নতুন ইণ্ডাস্ট্রি-উত্তর সমাজে দেখা দেবে অবসর নিয়েই একঘেয়েমি। সময় জুটবে অনেক, সময় কাটানোতেই ঘটবে দুশ্চিন্তা।

এই শিল্পোত্তর সমাজের উদ্ভব ঘটল কবে? মার্কিন বিশেষজ্ঞদের এক স্বঘোষিত 'দি অ্যাড-হক কমিটি অব ট্রিপল রেভল্যুশন' ১৯৬৪ সালে ঘোষণা করে 'উৎপাদনের নতুন যুগ এসেছে, এসেছে 'সাইবারনেশন' বিপ্লব।' ডোনাল্ড মাইকেল সাইবারনেশন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। সাইবারনেশন কি? 'কম্পিউটার ও স্বয়ংক্রিয় স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাযুজ্য'। এই সাইবার-নেশনের ফলেই সমাজে অমিত উৎপাদন-সামর্থ দেখা দেবে। আর তারই ফলে ক্রমশ শ্রম-ব্যবহার কমতে থাকবে।

এই-যে উৎপাদন-ক্ষমতার অমিত বিস্তার ঘটতে চলেছে, এর ইঙ্গিত কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ নাকি আগেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার দারুণ দুঃসময়ে জন কেইনস নতুন যুগের রথচক্রধ্বনি শুনেছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি লিখেছিলেন ঐ অর্থনৈতিক মন্দা 'বুড়ো বয়সের বাতব্যাধির প্রকাশ নয়'। বরং তা ছিল 'এক অর্থনৈতিক যুগ থেকে অন্যতর যুগে উত্তরণের জন্য অতিক্রুত পরিবর্তনজাত বর্ধমান বেদনা। ওপর ওপর দেখে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। ফল্গুধারায় তলায় বয়ে চলেছে নতুন স্রোত'।

কেইনস ভেবেছিলেন, ঐ ওপরের আপাত অনুষ্ণ, কিন্তু অন্তরালে বেগবতী

ধারায় চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছিল মূলধন-গঠন। দেখিয়েছিলেন, যদি প্রতিবছর দু-শতাংশ হারে মূলধন বৃদ্ধি ঘটে, তবে বিশ বছরে মূলধন বাড়বে অর্ধেক, অর্থাৎ সব মিলে দেড়া, শতবর্ষে বেড়ে হবে তা সাড়ে সাতগুণ। অবশ্য কেইনস ধরে নিয়েছিলেন একই ধরনের মূলধনের বিস্তৃতি বা এক্সটেনসিভ রূপ। কিন্তু শিল্পোত্তর সমাজে পদার্পণ করতে গিয়ে যা ঘটছে, তা মূলধনের নিবিড় বা ইনটেনসিভ রূপ। বরং একই ধরনের মূলধনের বিস্তৃতি মার্কসের সমাজ-বিশ্লেষণের সত্যতাই ১৯২৯ সালে প্রমাণিত করেছিল।

সে যাই হোক, এই পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজব্যবস্থার বিষয়েই নানা সমস্যার কথা পেড়েছেন ডানিয়েল বেল। তিনি বলছেন আগামী ৩০-৫০ বছরের মধ্যে শিল্পোত্তর সমাজে পৃথিবীর ইতিহাস ঢুকে পড়বে। অনেকের মনে পড়বে একদা তিনি End of Ideology বলে পঞ্চাশের দশকে হৈ-চৈ ফেলেছিলেন। কারো মতে তা ছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগে মার্কিন ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে সমর্থন জানানো। অধ্যাপক বেল হার্ভার্ড-এ সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, 'পাবলিক ইন্টারেস্ট' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

শিল্পবিপ্লবের নেতা তরুণ বুর্জোয়া শ্রেণীকে লক্ষ করে মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৪৮ সালে লিখেছিলেন, 'আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতে বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি করেছে তা অতীতের সকল যুগের সমষ্টিগত উৎপাদন-শক্তির চেয়েও বিশাল ও অতিকায়... সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল, আগেকার কোনো শতক কি তার কল্পনাটুকুও করতে পেরেছিল?' (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)। অর্থাৎ সমাজে অভাবমোচনের পূর্বশর্ত তৈরি করেছিল পুঁজিবাদ। কিন্তু উৎপাদন-সম্পর্ক বা সম্পত্তি-সম্পর্কগুলির রাশ টেনে ধরা রয়েছে এই ব্যবস্থায়, এ সমাজে উৎপাদন সমাজের জন্য অথচ উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ব্যক্তিগত, সমাজের অভাব মেটাবার সামাজিক প্রয়োজনকে মুনাফা পাবার লক্ষ্য ব্যক্তিস্বার্থানুসারী করে রেখেছে, মূল্যের নিয়মকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে পুঁজিপতিরা— এমন সমাজসম্পর্ক কাটিয়ে দিয়েই সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র আসবে। 'প্রাণহীন যান্ত্রিকতার সঙ্গে কেবলমাত্র জীবিত অঙ্গ হয়ে থাকা' থেকে শ্রমিক মুক্ত হবে সমাজতন্ত্রে, অনর্গল উৎপাদনশক্তি সেই সমসমাজে প্রাচুর্য ঢেলে দেবে, মানুষ বিকশিত সাম্যবাদে প্রয়োজনের

নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার ঘরাটে উত্তীর্ণ হবে। পণ্য-উপাসনা থেকে মুক্ত মানুষ মানুষে-মানুষে মানবিক সম্পর্ক রচনা করবে, নির্দেশিত পণ্য-উৎপাদক হিসেবে নয়, স্বেচ্ছাধীন 'স্বাধীন' স্রষ্টা হিসেবে। মার্কস তাঁর লড়াইয়ের প্রথমেই রণধ্বনিতে রেখেছিলেন আট ঘন্টার কাজ, আট ঘন্টার বিশ্রাম, আট ঘন্টার অবসর-বিনোদন—সব মিলে চব্বিশ ঘন্টার বিভাজন। অবকাশকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ভরে তোলার কাজ সম্পন্ন হতে পারে প্রাচুর্যের সম্ভাব্য সমাজে। পুঁজিবাদ সেই প্রাচুর্যের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ডানিয়েল বেল মার্কসের এমন বক্তব্যের জন্য তাঁকে ইউটোপিয়ানদের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন এক নিঃশ্বাসে মার্কসের সঙ্গে পল গুডম্যান ও মারে বুকচিনের মতো নৈরাজ্যবাদীদেরও। এঁরা ভেবেছেন, অভাবোত্তর সমাজে প্রকৌশল মানুষকে বস্তুগত সামগ্রীর অধীনতা থেকে মুক্ত করবে, প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীলতা দূর হয়ে গড়ে উঠবে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে 'মুক্ত' সম্পর্ক।

এই 'স্বাধীনতা', এই 'মুক্তি'—উভয়কেই ডানিয়েল বেল মনে করেছেন পোস্ট ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে অসম্ভবসাধ্য। তিনি সাইবারনেশনের সম্ভাব্য দুটি প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করেছেন। এক, সাইবারনেশন কি প্রাচুর্য সত্যি আনতে পারে, দুই, অবকাশের একঘেয়েমি উত্তীর্ণ হবার উপায়ও কি তেমন থাকবে এই সাইবারনেশন-অধ্যুষিত তথাকথিত পোস্ট-ইনডাস্ট্রিয়াল সমাজে?

বেল দেখাচ্ছেন, 'প্রেসিডেন্টস কমিশন অন টেকনোলজি, অটোমেশন, অ্যাণ্ড ইকনমিক প্রগ্রেস'-এর ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে তার পূর্বেকার দু-দশকে উৎপাদিকার হারের তেমন বৃদ্ধি ধরা পড়েনি, পরের দশ বছরের বিষয়েও তাঁরা এ বিষয়ে সন্দিহান। তা ছাড়া পৃথিবীর প্রকৃতির সম্পদের যোগানও তো সীমাবদ্ধ; বরং সেই প্রাকৃতিক মজুত সম্পদ অতিব্যবহারের তাড়নায় ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে, দ্রুত শুকিয়ে আসছে সেই সঞ্চয়। আকাশ-মাটি-সমুদ্র বিষাক্ত হচ্ছে উৎপাদন-উচ্ছিষ্টে, কেউ তো মনে করেন শূন্য হারে আয়বৃদ্ধিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এঁরা বিজ্ঞান-প্রকৌশল বিপ্লব নিয়ে অভিশপ্ত যুগসম্ভাবনার দুঃস্বপ্ন দেখছেন। অবশ্য বেল এতে আশাভঙ্গ হন না। তিনি মনে করেন, ব্যবহৃত সম্পদের পুনঃচক্রায়ণ সম্ভব—ভূগর্ভের ও ভূপৃষ্ঠের, সমুদ্রের ওপরের ও নীচের তাবদ্ মজুত এখনো তো হিসেবই করা হয়নি। জীবাশ্ম-জ্বালানির পরও তো রয়ে যায় সৌরশক্তি

প্রভৃতির উৎস উৎসারণ। প্রকৌশল ইতিপূর্বে পরিত্যক্ত বহু বস্তুকে সম্পদে পরিবর্তিত করেছে। পরিবেশ-বিজ্ঞানের মডেল অবশ্য সম্পদের পরিমাণকে স্থির ধরে এই পৃথিবীতে। আর যে সম্পদের যত অভাব, তার নানা বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে কাম্য ব্যবহারটা বেছে নিতে হবে। আর যত ব্যবহার বাড়বে, তত খরচ বাড়বে। এটাই অর্থনীতির আসল গূঢ় কথা। সুতরাং সম্পদ ভেবেচিন্তে খরচ করতে হবে, যাতে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি অভাব মেটে। কিন্তু ডানিয়েল বেল তুলছেন একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসাঙ্গিক প্রশ্ন। সম্পদকে বস্তুপরিমাণ দিয়েই শুধু মাপা হবে সমাজে। কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক অভিধায়। যেমন নতুন মূলধন লগ্নীতে কি পরিমাণ আপেক্ষিক খরচা হবে, সেটাই প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাসণ, অনুর্বর মরুতে জল-সেচ, জলাভূমির জল নিঃসারণ ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটাবার সময় বিবেচ্য। সুতরাং এক দলের ইউটোপীয় দিবাস্বপ্ন অন্যদলের সম্ভাব্য অভিশপ্ত সময়ের দুঃস্বপ্ন, কোনোটাই কাজের নয়। অর্থ নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে হবে সব কিছু। এবং এ বিচারে দেখা যাবে এই সম্রান্ত পোস্ট-ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে দেখা দিচ্ছে নতুন ধরনের এক অভাব, যে-অভাব উৎপাদন দিয়ে বস্তুপরিমাণে পূরণ করা যাবে না, যাকে পরিমাপ করতে হবে ক্রমবর্ধমান খরচের নিরিখে। সে খরচ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের নয়, মেধার জন্যও, সময়ের জন্যও।

আগে প্রশ্ন ছিল—তেমন পরিমাণ বস্তুগত সামগ্রী দেশে আছে তো? কেমন ভাবে আরো বেশি বেশি সে সব উৎপাদন করা যাবে? এখন প্রশ্ন, নতুন ধরনের সেবায় খরচ-খরচা কতটা, কি পরিমাণ আমরা সে জন্য ব্যয় করতে রাজি আছি?

ডানিয়েল বেল খরচ-খরচার ব্যাপারে তিনটি মূল সমস্যা তুলেছেন, তথ্য বা সংবাদ পাবার জন্য ব্যয়; যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যয়; সময়ের পিছে ব্যয়।

পোস্ট ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটি একধরনের তো সংবাদ-সমাজও। আর এই সংবাদ বা তথ্যকেন্দ্রিকতা নতুন ধরনের বিবিধ সমস্যা এনে দেয়। অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কত-যে সংবাদ ব্যক্তিকে রাখতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। এজন্য নানা সংবাদসংস্থা গড়ে উঠবে। এবং সংবাদ পাবার দায় খরচ বাড়িয়ে দেবে ঢের। আর জ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির হার এই সংবাদ পাবার ব্যয়কে বাড়িয়ে দেবে বিপুল পরিমাণে। এ ছাড়া আছে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যয়, বা কস্ট অব কো-অরডিনেশন। যে কোনো

সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বহু ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করতে হবে। নানা কনট্র্যাক্ট বাড়াবার প্রক্রিয়া যেমন খরচ বাড়াবে, তেমনি ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জগতকে সঙ্কুচিত করবে। পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের দিকটিও, যেমন গাড়ির জন্য রাস্তায় ভিড় বাড়া, যোগাযোগের জন্য ব্যয়, সব কিছু মিলে সামাজিক ব্যয় বাড়িয়ে দেবে। আর, এত সব জটিল দিককে সামঞ্জস্যে আনতে গেলে পরিকল্পনা চাই। সেজন্য খরচাও চাই। নিয়ন্ত্রণও বাড়াতে হবে। ব্যয় হবে সেজন্যও। তাছাড়া ঢের প্রাচুর্য এবং অবকাশ-যাপনের জন্য সময়ের চাপ, বহু ধরনের বাছাই ও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দায় আনবে, আর এসবের জন্য আরো ঢের বেশি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়বে। এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য বা নানা সামাজিক কনট্রাক্ট গড়ে তুলতে হবে বলে, ঐ কনট্রাকজনিত ব্যয় বেড়ে যাবে অনেক।

তা ছাড়া সময়ের জন্যও ব্যয় রয়েছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন 'টাইম ইজ মানি', ম্যাক্স ওয়েবারের মতে যা প্রোটেস্টান্ট নীতিজ্ঞান। হাতে যদি অবকাশের সময় থাকে, সে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। সময় তো আর জমিয়ে রাখা যায় না। অর্থনীতির ভাষায় সময়ের 'যোগান' সীমাবদ্ধ। অতএব, তার অভাবজনিত অবস্থার দাক্ষিণ্যে তার জন্য 'খরচা'ও আছে। যে সমাজে উৎপাদিকা কম, সময়ের জন্য খরচাও কম। যখন সময়ের উৎপাদিকা বেশি, সময়-একক পিছু খরচাও বেশি। ফলে অর্থনীতি-বিকাশের ফলে সময়ের জন্য খরচাও বেড়ে যায়।

অবকাশের সময়ের খরচার জন্য রয়েছে তিনটি এলাকা। সেবা, ভোগ ও সময়-বাঁচানো উপকরণ। টি.ভি., মোটরগাড়ি, বাড়িঘর ইত্যাদির জন্য সারাই-ঝাড়াই সব কিছুর পিছে রয়েছে খরচা। আর সময়-একক পিছু উৎপাদিকা বাড়ার অর্থ, এসব সারাই বা দেখাশোনার জন্য ব্যয় বেড়ে যেতে বাধ্য। এমন কি বইপড়া, বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারিতা, এক পেয়ালা কফি পান, বিদেশভ্রমণ—সব কিছুর জন্যই সময় দরকার। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তির মোটর, পালতোলা নৌকো, বেলাভূমিতে ভ্রমণ, কনসার্টে যোগ দেবার এক গোছা টিকিট রয়েছে, তার কাছে কোনটা ছেড়ে কোনটা সে ব্যবহার করবে, এজন্যও সময় 'রেশন' করতে হবে। এমন কি এমনভাবে সে সময় ব্যবহার করবে যাতে সব উপকরণ থেকে প্রান্তিক উপযোগ সমান পায়। মানুষ এমন কি তার অবকাশ-যাপনকালেও **homo economicus** হয়ে উঠবে।

ইউটোপিয়ান বা মার্কসবাদীরা বলবেন, মানুষ তার নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করবে অভাবমুক্ত সমাজে, কিন্তু ডানিয়েল বেলের পোস্ট ইনডাস্ট্রিয়াল সমাজে (মানুষে মানুষে সম্পর্কই যেখানে মুখ্য সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বা মানুষ ও বস্তুর মধ্যে নয়) ব্যক্তি-স্বার্থের আঘাত-প্রত্যাঘাত, যে যার যেমন ইচ্ছা চলার অভীপ্সা, গোটা সমাজে নিয়ন্ত্রণী শক্তিকে আরো জোরদার করে তুলবে। বলপ্রয়োগের শক্তিকে সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রে বসাবে।

সুতরাং বেলের মতে, বিজ্ঞান-প্রকৌশল, বিপ্লব, বা সাইবারনেশন-জনিত প্রাচুর্য যখন মানুষের হাত থেকে সময়কে ছিনিয়ে নিচ্ছে, আসল সমস্যা হবে সময়কে অর্থনৈতিক জীবনের অপরিবর্তনীয় স্পন্দন থেকে বের করে আনা। এবং সেই বের করে আনার মধ্যেই আছে মুক্তি। সমস্ত সময়ই হয়ে উঠবে নইলে সব শেষে এক ইকনমিক ক্যালকুলাস। অর্থাৎ অডেনের ভাষায় **'Time will say only, I told you so'.**

ডানিয়েল বেলের পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি কেমন হবে, জানার পরও কিছু প্রশ্ন আমাদের থেকেই যায়। ডানিয়েল বেল অনেকটা একদেশদর্শী হয়েছেন। তিনি পূর্বশর্ত হিসেবে রেখেছেন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, বিশ্লেষণ করেছেন ঐ 'অপরিবর্তনীয়' সমাজে উৎপাদন-বৃদ্ধির বিকাশ, যা সাইবারনেশনের দাক্ষিণ্যে বিপুল উৎপাদন-সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে সক্ষম। পোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ কি পুঁজিবাদী সমাজ? তিনি কি পুঁজিবাদী সমাজের আঙ্গিকেই তাঁর বক্তব্য রাখছেন? তিনি যে-সমাজের রূপরেখা দিয়েছেন, সেটি ভোগী সমাজ বা কনজিউমার্স সোসাইটি। যে সমাজে বিপুল উৎপাদনের আকর রয়েছে বৃহৎ একচেটিয়াদের হাতে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি যে-সমাজে নিয়ন্ত্রণকারী, এক প্লুটার্কি যেখানে কাজ করে। মার্কিন দেশ সেই পোস্ট ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির বিকাশভূমি।

বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিপ্লব মানুষের সামনে অর্থনীতির প্রতাপ থেকে সময়কে মুক্ত করার সমস্যাকেই মূল সমস্যা বলে তুলে ধরে না। বরং অমনভাবে ধরলে মূল সমস্যা থেকেই আমরা সরে যাব। প্রশ্নটির দুটি দিক আছে। সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার টেকনোক্রাটিক আকারে মানুষের বিযুক্তি বা অনন্বয় ঐ বিপ্লব বহন করে আনছে, নাকি মানুষের এক অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার দরজা তা খুলে ধরছে। ডানিয়েল বেল এক সর্বগ্রাসী টোটালিটারিয়ান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্ভাবনার কথাই বলছেন।

রজের গারোদি একদা এই বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিপ্লবের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞানের মধ্যে বিপ্লব-বিজ্ঞানধারা এক বিপ্লবের পথ করে দিচ্ছে। যার ফলে সাইবারনেটিকস মেকানিকসকে ছাড়িয়ে গেছে বিজ্ঞানের এক প্রাথমিক শাখা হিসাবে। আর এক সাবজেক্ট-অবজেক্ট ডায়ালেকটিক বিকশিত হচ্ছে। সব এমপিরিসিজম ও পজিটিভিজম-এর বিপ্রতীপে এই ডায়ালেকটিক রূপ পরিগ্রহ করছে। বিজ্ঞান নিজেই হয়ে উঠেছে উৎপাদনের উপকরণ।

এই শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রকৌশল প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞানকে, বর্তমানে বিজ্ঞান প্রভাবিত করছে প্রকৌশলকে। আগাপাশতলা উল্টে গেছে (inversion)। ম্যাক লুহান দেখিয়েছেন শ্রমের স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যোগাযোগ। অর্থাৎ প্রকৌশলের প্রচলিত মানেটাই বদলে গেছে। আর এই যোগাযোগ ইলেকট্রনিকস-এর দাক্ষিণ্যে মানুষের শরীর ও সংবেদের বিস্তার ঘটিয়েছে। সাইবারনেটিকস-নীতি মেকানিজ্ম-এর নীতি, বা কেন্দ্রীয় নির্দেশনার নীতিকে উল্টে দিয়েছে। শ্রমবিভাজনের সত্তার খণ্ডীভবনকে এ ব্যবস্থা ভেঙে দিচ্ছে। শিল্পায়ন শ্রমবিভাজনের তাৎপর্যে খণ্ডীকরণকেই প্রশ্রয় দেয়, প্রতিটি খণ্ডিত অংশের কাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে। সাইবারনেটিকস বিশ্লেষণ তো করেই, আবার সংশ্লেষণও (synthesis) ঘটায়। শিল্পায়নে যেমন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে তার দাস-অঙ্গে পরিণত করে, সাইবারনেশনে মানুষই হয়ে ওঠে বিষয়, যন্ত্র হয়ে যায় লক্ষ্য। যন্ত্রের ঊর্ধ্বে তার ভূমিকা, যখন সে প্রোগ্রামিং ও নির্দেশনার মালিক। একটু চোখ খুলে দেখলে বোঝা যায়, এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীন ভূমিকা অনেক বেশি। কেননা তার ফিট-ব্যাক উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। এবং কনজিউমার্স সোসাইটি নয়, সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং সেই মার্কসের কথাই আসে, উৎপাদন শক্তিকে উৎপাদন সম্পর্ক বেঁধে রাখছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। সে সম্পর্ককে না ভাঙলে ডানিয়েল বেল যে অতি-বিকশিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ছবি চিত্রিত করেন, যা নাকি তাঁর মতে ৩০-৪০ বছর পরে ঘটবে, তা পুঁজিবাদের আরও এক ভয়াল রূপই হবে, যদিও ডানিয়েল বেল বহু তত্ত্বের প্রলেপ দিয়েছেন।

ইতিপূর্বে এ খরচ-খরচার হিসাবে ঐ শিল্পোত্তর সমাজের একটা দিক ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু বেল তো ভবিষ্যৎবাণী দেবার জন্যেই তৈরি।

তিনি তত্ত্ববিশারদদের ঐ ভবিষ্যৎ সমাজের মধ্যমণি বলে ধরেন। তাঁর সমাজ ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে রয়েছে তিনটি দিক—সামাজিক গঠন (structure), রাজনীতি (polity), সংগঠন ও সংস্কৃতি। সামাজিক গঠনের মধ্যে পড়ে অর্থনীতি ব্যবস্থা, প্রকৌশল ও জীবিকা ব্যবস্থা। পলিটি **'regulates the distribution of power and adjudicates the conflicting demands of individual and groups'** এবং সংস্কৃতি তাঁর কাছে **'realm of expressive symbolism and meaning'** আর এসবের কেন্দ্রে রয়েছে **axial principles** ও **axial structures**—এই নীতি থেকে প্রবাহিত হয় ক্রিয়া এবং গঠনের **'organizing frame'**-এর **'around which other institutions are draped'**।

বেল তেমন করে পলিটি ও সংস্কৃতিকে আলোচনার মধ্যে আনছেন না, যতটা আনছেন সামাজিক গঠনকে। বলছেন, এই নতুন সমাজে তাত্ত্বিকদেরই হবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—এঁরা হবেন করুণাময়, সমাজ-দুর্যোগে সর্বরোগহর। এঁরা সমাজের **Professional scientific technical vanguards**। মার্কিনদেশে বর্তমানে শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ সেবা-উৎপাদনে রত (যানবাহন, নানা উপযোগসৃষ্টি, ঋণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আনন্দবিধান, গবেষণা, সরকারি কাজ)। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ তাদেরই অবদান। ফলে নীলকলার লোকের পরিবর্তে সাদাকলার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ এদেরও নেতাদের সংখ্যা, সেই ভ্যানগার্ডদের সংখ্যাও বাড়ছে। এঁরাই হবেন ভাবী সমাজের কর্মকর্তা, বিধায়ক। তবে সবাইকে নিয়েই গড়ে উঠবে এক কমিউন্যাল সোসাইটি। এই নেতৃবৃন্দের তাত্ত্বিকজ্ঞান সমাজে প্রায় ফিলসফার কিংদের মতো সর্বজ্ঞানী করুণাময়দের আবির্ভাব ঘটাবে। তবে জানি অধিকাংশের সঙ্গে এঁদের বিবাদও ঘটবে। কেননা সেই 'অধিকাংশ'রা অনেক সময় এঁদের বুঝতে পারবে না। সংঘাত ঘটবে থিওরিটিক্যাল নলেজের সঙ্গে পপুলিজমের। এই পপুলিজমের পপুলেসের সংস্কৃতিও হবে শিশ্নোদরপরায়ণ। বেলের মতে এই গণ-শিশ্নোদরপরায়ণতার জন্য দায়ী এই জনগণই। তিনি বলেন না কনজিউমার্স সোসাইটিতে যাদের ভিত, মনোপলির বিজ্ঞাপন লালিত যাদের মনোভঙ্গি, যাদের সাইকিক জগৎ একেবারে মুনাফা লোলুপরা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে—তাদের ঘাড়েই দোষ চাপছে কেন। আর অন্যদিকে তত্ত্ববিশারদদের থাকবে হাই কালচার। ভ্যানগার্ড ও পপুলেসের মধ্যে বিরোধ দেখা

দেবে। ডানিয়েল বেল ইণ্ডাসট্রিয়াল সোসাইটির ব্যাপারে মার্কসের শ্রেণী-সংগ্রাম কথাটা মানলেও, পোস্ট ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে মানছেন না। তবে সংঘাত ঘটবে ঐ ভ্যানগার্ডে ও পপুলেসে!

ডানিয়েল বেল কি ৫০-এর দশকের 'ম্যানেজারিয়াল বিপ্লবে'র গলাবাজি চুপসে যাবার পর, ভ্যানগার্ডদের নতুন তত্ত্ব ছাড়লেন! **The Subordination of the Corporation** বলে দীর্ঘ পরিচ্ছেদে প্রায় ঘুরিয়ে ম্যানেজারিয়াল বিপ্লবের কথাই তিনি ফিরেফিরতি বলেছেন। ম্যানেজারিয়াল বিপ্লব প্রসঙ্গে বারফাট্টাই হয়েছিল, মার্কিনদেশে 'জনগণের পুঁজিবাদে'র উদ্ভব ঘটেছে বলে, বাকি শেয়ার হোল্ডাররা কেউ কর্পোরেশনের মালিকানার আর ছড়ি ঘোরাতে পারে না! সব গণ-শেয়ার-হোল্ডাররাই নাকি রাজা সেই 'নষ্ট পুঁজিবাদে'র রাজত্বে। লক্ষ্য নাকি ছিল সর্বোচ্চ মুনাফা নয়, গ্রোথ। সে তত্ত্ব এখন ফেঁসে গেছে। দৈত্যাকার কর্পোরেশন, বহুজাতিক ব্যবসাসংস্থা শেয়ার-হোল্ডারদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফার আশায় মরণপণ করেছে, বৃহৎ প্রভাবশালী গোষ্ঠী সে মুনাফার সিংহভাগ হাতিয়ে নিচ্ছে, সরকারের নীতি ঠিক করছে, মিলিটারি-ইনডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্সের উপদেশ দিচ্ছে—ডানিয়েল বেশ এই ছবিকে নতুন বোতলে ধরে বলছেন 'এটি নূতন'। এটি থিয়োরিটিক্যাল জ্ঞানের দীপশিখা, নাকি ভ্যানগার্ডদের দীপান্বিতা!

তিনি যে 'সামাজিক ভবিষ্যকথনে একটি সাহসী অভিযান করেছেন'—সেটি না-সাহসী, না-অভিযান, ভবিষ্যকথন তো নয়ই। ভবিষ্যৎ রয়েছে অন্যতর সমাজে—যা বিজ্ঞান-প্রকৌশল বিপ্লব আরো এগিয়ে নিয়ে আসছে, যার নাম সাম্যবাদ।

আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বে বাস করি, তারা এই শিল্পোত্তর সমাজের ছবি দেখে কি ভাবব? আর শিল্পবিকাশ নয়? শিল্পবিকাশের পরিণতি তো ডানিয়েল বেল দেখিয়ে দিচ্ছেন! তবে আমাদের ভবিতব্য কি? স্যুমেকার তাঁর 'স্মল ইজ বিউটিফুল' বইতে বলছেন, না-উন্নত প্রকৌশল তৃতীয় বিশ্বের জন্যে নৈব নৈব চ। প্রয়োজন অন্তর্বর্তী প্রকৌশল বা ইনটারমিডিয়েট টেকনোলজি। বেল পড়ে আমরা গরিব দেশের হতভাগ্যরা পশ্চিমী শিল্প-বিকাশ সম্পর্কে তাহলে বীতশ্রদ্ধ হব? বলব স্যুমেকারের ভাষায় প্রায় 'দাও ফিরে সে অরণ্য'?

আমাদেরও সামনে যে পথ খোলা সেটি বেলের ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটির প্রভুদের বিরুদ্ধে যায়। তেমনি থাকে ছোট্টখাট্ট চমৎকারের বিষয়েও সংশয়ী পদক্ষেপ। অবশ্য সে প্রসঙ্গ এখন এ নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য নয়।

কবে কোন্ গান : ২

শঙ্খ ঘোষ

গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, ২য় খণ্ড। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৭৮

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁর 'আমরা ও তাঁহারা' বইটির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের গানের একটি যুগবিভাগ করেছিলেন অনেকদিন আগে। সে-বিভাগের নির্ভর ছিল সুরপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য। বলেছিলেন, প্রথম যুগে 'রাধিকাবাবুর মুখে ভালো ধ্রুপদ শুনে হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাঙলা কথা বসানোই তাঁর কাজ, যেমন—সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, মন্দিরে মম কে; এইসব গান হিন্দুস্থানী সুরের তর্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভালো ভালো সুর বসাচ্ছেন, যেমন—ঝরঝর বরিষে বারিধারা, রিম ঝিম ঘন ঘন রে প্রভৃতি গান;... তৃতীয় যুগে তিনি সংগীত রচনা করলেন—বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশল, ভৈরবীর সঙ্গে মিশল খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা।' সুরের দিক থেকে এই যুগভাগের যাথার্থ্য কতটা তা নিয়ে বিচার চলতে পারে, ভিন্নতর ভাবেও কেউ হয়তো কল্পনা করতে পারেন এই যুগগুলির, যেমন একবার করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী: 'প্রথম বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনপূর্ণ খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে; শেষ বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনাতীত অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে; মধ্য বয়সের গানে, অল্প কিছুদিনের জন্য এই দুই স্বতো-বিরুদ্ধের মধ্যে সেতুবন্ধনের সুর।'

কিন্তু যে-কোনো রকম এই বিভাগের কল্পনায় প্রথম যা দরকার, তা তো নির্ভরযোগ্য তথ্য? নিশ্চিতভাবে তো জানা চাই কোন গান প্রথম যুগের আর কোনটি বা শেষের? সেই তথ্যের একটা অস্পষ্ট আদল নিশ্চয় এঁদের কাছেও ছিল, কিন্তু আদলটা অস্পষ্ট বলেই এসব সিদ্ধান্তে দু-একটি দুর্যোগেরও অবকাশ থেকে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ যে সব যুগের কথা বলেছিলেন, সেগুলির সীমা ঠিক হবে কী ভাবে? 'মন্দিরে মম কে' গানটিকে প্রথম যুগের আর 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে' গানকে দ্বিতীয় যুগের বললে সে কি অনেকটা মনগড়া হয়ে যাবে না? একচল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মন্দিরে মম কে', পঁচিশ বছর বয়সে 'সত্যমঙ্গল', আর বিখ্যাত 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে' তো কুড়ি-একুশ বছরের গীতিনাট্যের গান। এই কয়েকটি গানে

সুরপ্রকৃতির ভিন্নতা কি তাহলে আর কালক্রম দিয়ে বিচার করা সম্ভব? ধূর্জটিপ্রসাদের মূল প্রতিপাদ্য হয়তো নাও পালটাতে পারে, কিন্তু সেজন্য দরকার ছিল উদাহরণগুলির আরো সতর্ক নির্বাচন।

দরকার ছিল, কিন্তু সহজ ছিল না। এ প্রবন্ধ যখন লিখেছিলেন ধূর্জটি-প্রসাদ, তখন হাতের সামনে সাজানো ছিল না রবীন্দ্রনাথের গানের কোনো কালানুক্রমিক সূচী, যে সূচী দেখে আজ অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বুঝে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের এগিয়ে যাবার পথটা, তাঁর পরিবর্তন আর পরি-ণতির ধরন। এ পথটা জানা না থাকলে, উৎসুক আর কৌতূহলী পাঠকদের কত-না ধাঁধা লাগে কত সময়ে। ধরা যাক, হয়তো আমরা জানি 'তুমি নব নব রূপে' গানটির সুর, জানি যে মিশ্র রামকেলিতে আজ গাওয়া হয় এ গান। হঠাৎ যদি সেই সঙ্গে মনে পড়ে যে ভৈরবীতে এর চার লাইন ফিরে ফিরে গাইছিলেন কবি পদ্মাতীরের কোনো এক সকালে, তাহলে কি ধরে নেব যে সে কথায় ভুল রইল কিছু? স্মৃতিপ্রমাদ? মুদ্রণপ্রমাদ? গানটির ইতিহাস লক্ষ্যে রাখলে বুঝতে পারি যে তেমন-কোনো প্রমাদকল্পনা অনিবার্য নয় এখানে। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে গানের প্রথম কয়েক লাইন—ঈষৎ ভিন্ন পাঠে—গাইছিলেন একদিন, কিন্তু পুরো গানটি তৈরি হলো তার একযুগ পরে ১৯০৭ সালে। সকালে দেওয়া ভৈরবী সুর বিকেলে যাঁর কাছে খাম্বাজ হয়ে আসে, বহু বছরের এপারে-ওপারে ভৈরবীকে তিনি মিশ্র রামকেলি করে নিতে পারেন সহজেই, একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে বুঝে নেবার জন্য যে গানরচনার এই বিবরণটিও আমাদের সামনে থাকা দরকার, সে কথা ঠিক।

'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী'র সম্পূর্ণ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিবরণ আজ আমাদের কাছে অনেকটা প্রত্যক্ষ। এ সূচীতে আজ আমরা পেয়ে যাব যে-কোনো গানের রচনাকাল বা প্রকাশকাল; কোথায় সে গান ছাপা হয়েছিল, পাব তার নির্দেশ; কী উপলক্ষে লেখা, অনেক সময়ে তারও হিসেব পাব এ তালিকা থেকে। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে যে-কোনো কথা উচ্চারণ করবার জন্য যাঁর সাহায্য আর নির্দেশ সব সময়ে আমাদের শিরোধার্য, পঞ্চাশ বছর জুড়ে যিনি গড়ে তুলছেন রবীন্দ্রজীবন আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত রকম তথ্যের সম্ভার, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ কাজটিও সম্পন্ন করলেন তাঁর এই সাতাশি বছর বয়সে, তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দু বছর আগে, ভুবনডাঙায় তাঁর বাড়ির বারান্দায়

বসেছেন সকালবেলার নিয়মিত পড়াশোনার কাজে, এই দৃশ্য দেখে অভিভূত শিবনারায়ণ রায় প্রশ্ন তুলেছিলেন কারো কারো কাছে, কী করে এটা সম্ভব আমাদের দেশে। হতাশা আর নিষ্ক্রিয়তা যেখানে ব্যাধির মতো, অল্প শ্রমে বিরাট ফলের আকাঙ্ক্ষা যেখানে মজ্জাগত, সেই দেশের আবহাওয়ায় কী-ভাবে আজও দেখতে পাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন বা সুকুমার সেনের মতো মানুষদের, অশীতিপর এই বয়সেও যাঁরা ছাত্রের চেয়েও ছাত্র? স্বাভাবিক এ বিস্ময়, বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে 'গীত-বিতান'-এর এই কালনির্দেশ সম্পূর্ণ করবার পরেও প্রভাতকুমার থেমে যাননি তাঁর রবীন্দ্রচর্চায়, আজও তিনি ব্যস্ত আছেন রবীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জীর প্রস্তুতিতে—এমন কি—তাঁর দিনপঞ্জী রচনারও এক অবিশ্বাস্য পরিকল্পনায়।

তবে, এ ধরনের কাজ গুছিয়ে তোলার অনেকগুলি স্তর থাকে নিশ্চয়ই। এটা বোঝা যায় যে এর সবকটি স্তর সম্পাদন করে তুলতে কারো কারো সাহায্যেরও দরকার হবে সব সময়ে। সাহায্যের সেই ব্যবস্থায় সুবিধেও যেমন আছে, তেমনি অসুবিধেও হলো এই যে গোটা পঞ্জীর কেন্দ্রীয় বিন্যাসে কখনো কখনো দেখা দিতে পারে কিছু অসংগতি বা স্খলন। আমাদের মনে হয়, জীবনতথ্য বা রচনাতথ্য সংকলনের কাজ হলো এক ধরনের বিরতিহীন সম্পাদনার কাজ, অনেকদিন ধরে অনেকের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সেটা। প্রভাতকুমার তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, বিপুল এই কাজের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। পাঠকদের আজ দায়িত্ব এই যে, এর ভবিষ্যৎ পরিমার্জনার সম্ভাব্য ইঙ্গিতগুলি তিনি তুলে দেবেন সম্পাদকের হাতে। সূচীর প্রথম খণ্ডটি নিয়ে একদিন কথা বলতে হয়েছিল তাই, এই দ্বিতীয়টির কিছু অসংগতি নিয়েও তেমনি জানাতে চাই দু-একটি ভাবনা।

২

১৯১২ সালে বিলেতে যাবার আগে পর্যন্ত লেখা গানের হিসেব ছিল প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে আছে অল্প কয়েকটি (১৭) গানের কথা, যা 'ভ্রমবশতঃ ১ম খণ্ড মুদ্রণকালে বাদ পড়িয়াছে'। এই তালিকার 'যাবই আমি যাবই' গানটির বিবরণ প্রসঙ্গে শুনছি : 'গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণে নাই'। কিন্তু, কবি যে 'তাসের দেশ' নাটকটির জন্য পুরোনো এক কবিতার সুর দিলেন ১৩৪০ সালে, সেকথা বলবার পরে কি কেউ আশা করবেন যে ১৩৩৮ সালের গীতবিতানে কোনোভাবে এর থাকা সম্ভব? তারও চেয়ে বড়ো

সমস্যা হয়, যখন বইটির ১৪৪ পৃষ্ঠায় এ তথ্যের উল্লেখ দেখি : 'হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'ও নেই গীতবিতানে। এখানে আর ১৩৩৮ নয়, এ হলো আধুনিক গীতবিতানেরই কথা। এটা ঠিক যে ও-বইয়ের সূচীতে কোথাও আমরা পাব না 'হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া', কিন্তু শ্রোতারা কি জানবেন না যে 'যাবই আমি যাবই' গানের এক অংশমাত্র ওটা ? রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই গানকে ব্যবহার করা হয়েছে সংলাপের মাঝখানে ভেঙে ভেঙে, এরও বিন্যাস যে সেই ভাবেই, তা লক্ষ না করলে তো 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা'কেও স্বতন্ত্র গান বলে কল্পনা করতে হয়, আর সেও তো পাওয়া যায় না মূল গীতবিতানের সূচীতে। 'হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'-কে ভিন্ন একটি রচনা বলে দেখানো কি তাহলে সংগত হবে ?

প্রথম খণ্ডের সঙ্গে জড়ানো আরো একটি গানের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন'-এর বিষয়ে বলা হয়েছিল এর নানা রূপান্তরের ইতিহাস, বলা হয়েছিল 'শান্তিমন্দির পুণ্য-অঙ্গন' অথবা 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ'-এর কথা। এ গানের সবচেয়ে খ্যাত রূপ যে 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন', তার কোনো উল্লেখ ছিল না তখন। দ্বিতীয় এই খণ্ডে সে-অপূর্ণতার মোচন হলো বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে উঠে এল নূতন কয়েকটি অসংগতি। 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ'-র সূত্রে বলা হলো এবার : 'মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন (১৩১১) গানের রূপান্তর।' হয়তো বলা উচিত ছিল যে 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন'-এর ভিন্ন রূপ এটি, প্রথম খণ্ডের বিবরণের সঙ্গে মিলতও তাহলে, কিন্তু সেইটেই এখানে একমাত্র বিভ্রম নয়। আরো একটি ভুল দেখা দিল 'মাতৃমন্দির'-এর কালনির্দেশে। ১৩১১ সালে যেটি লেখা হয়েছিল সেটিই 'বঙ্গজননী', 'মাতৃমন্দির' তৈরি হলো ১৩২৪ সালে, আর ১৩৪৭ সালে 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ'-র সৃষ্টি। ১৩২৪-এর এই তথ্যটি কোথাও যে পাব না এ বইতে, তা অবশ্য নয়। ৩৮ পৃষ্ঠায় বলা আছে ওই সময়েরই কথা, কিন্তু ১৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছে সেটি হয়ে ওঠে ১৩১১ !

পাঠান্তরিত গান সূচীতে স্বতন্ত্র গানেরই মর্যাদা পাবে কি না, সেই নীতিটি প্রথম থেকে ঠিক করে নেওয়া হয়নি বলেও মনে হয়। এর ফলে, 'মাতৃমন্দির' আর 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ'কে পাচ্ছি বটে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন ভাবে পাচ্ছি 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' আর 'আমার নয়ন তব নয়নতলে', পাচ্ছি 'আমার কী বেদনা সে কি জানো' আর 'কী বেদনা মোর জানো', কিন্তু পাব না এখানে 'জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে' বা 'মনে হলো পেরিয়ে এলেম'-এর রূপান্তর। আর, মাত্র একটিরই উল্লেখ যদি রাখতে হয়

তাহলে—এই শেষ গানটির ক্ষেত্রে—'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম'-এর অন্তর্ভুক্তিই কি সংগত হতো না? এটিই তো এ গানের পরিচিত রূপ? 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে'র দুই ভিন্ন পাঠের কথা বলতে গিয়ে তৈরি হলো আরেক রকম বিপর্যয়। মুদ্রণপ্রমাদে 'ফাল্গুনী' শব্দটা রইল না স্বতন্ত্র রূপটিতে, কিন্তু রইল এই তথ্য যে 'ফাল্গুনী ঢেউ'-এর রচনাকাল ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ! গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে বলা ছিল: 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে (রচনা: জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) গানের এই অভিনব পাঠ ১৩৩৭ ফাল্গুনে নবীন-এর অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হয়।' এর থেকে বুঝতে অসুবিধে নেই যে 'বৈশাখী ঝড়'-এরই রচনাকাল ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ, আর 'ফাল্গুনী ঢেউ' এল ১৩৩৭ সালে। আমাদের এই সূচীতে উলটে গেল ইতিহাসটা, 'ফাল্গুনী ঢেউ' এখানে এল ১৩২৯-এর তালিকায় আর 'বৈশাখী ঝড়'কে পিছোতে হলো ওই বছরের শ্রাবণে।

আবার, অন্যদিকে, একই গানের দুই ভিন্ন উল্লেখে অনেক সময়ে বিব্রত হই আমরা। 'হে বিরহী, হায়' কি তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সেরও, আবার চুয়াত্তর বছরেরও? ১৩৪০ সালে এর রচনা, ১৩৪২-এ ছাপা হয়েছে এর স্বরলিপি, এই তো মাত্র ব্যাপার। আরো বছর চারেক পর 'শ্যামা'য় গানটি গৃহীত হলো যখন, তখনকার সূত্রে এলেও একটা হয়তো মানে পাওয়া যেত এর, কিন্তু ১৩৪০ আর ১৩৪২ দুই তালিকাতেই এর আবির্ভাবের কারণ দেখি না কোনো। এমন উদাহরণ যে এই একটিই মাত্র, তা নয়। 'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে' গানটিকেও পাচ্ছি ১৩৪৪ আর ১৩৪৫ দুবছরেরই তালিকায়। ১৭৮ পৃষ্ঠায় জানছি যে এর রচনার সময় সুনির্দিষ্ট নয়, তবে সংকলক অনুমান করেন ১৩৪৫-এর বর্ষাকাল। তাই যদি, তবে ১৬৯ পৃষ্ঠায় আমরা যে শুনে এসেছিলাম ১৩৪৪-এর বর্ষামঙ্গলে এটি গীত হয়ে গেছে, আর ছাপাও হয়ে গেছে সে-বছরের 'প্রবাসী'তে কার্তিক সংখ্যায়, এ খবর কি ভুল? কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল?

সময় জানানোই এ সূচীর সবচেয়ে বড়ো কাজ, কিন্তু সে কাজেই বেশ কয়েকটি অসতর্কতা থেকে-থেকে চোখে পড়ে। ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসে কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে প্রথম মঞ্চস্থ হলো 'নবীন', আর রচিত হয়েছে সেটা ফাল্গুনে, এই খবরের পরের নিশ্বাসেই আমাদের জানতে হলো যে, 'নবীন প্রথম কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ৩০ ফাল্গুন।' অথবা ধরা যাক আরেকটি গান, 'বুঝি ওই সুদূরে'। এর রচনাকাল বলে অনুমান করা হচ্ছে ১৩৩০

সালের ভাদ্র, কিন্তু দুটি বাক্য পরেই আমরা জানব যে '১৩২৯ বসন্তোৎসবের জন্য হিন্দিগান ভাঙিয়া' এটি তৈরি। তাহলে আর ১৩৩০-এর অনুমানটি রইল কেন এখানে? কেনই বা ১৩২৯-এর তালিকায় জায়গা হবে না এর? 'ওগো বধূ সুন্দরী'র রচনা ২৭ ফাল্গুন ১৩৩০, ১০ মার্চ ১৯২৪। এত স্পষ্ট আর নিশ্চিত ভাবে কথাটা জানাবার পর শান্তিদেব ঘোষের বই থেকে এই 'প্রামাণিক' উল্লেখের কী তাৎপর্য যে '১৩৩১ সালে একটি বিবাহের উপহারোপযোগী কবিতা [ওগো বধূ সুন্দরী / নব মধুমঞ্জরী] লেখেন'? এর মধ্যে কোনো একটি তথ্য নিশ্চয় ভুল? শান্তিদেবকে যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে বরং এখানে জরুরি হতে পারত এই খবর যে গানটি লেখা হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের একটি ছবিকে অবলম্বন করে, 'সাত ভাই চম্পা' নামে। 'এসো শরতের অমল মহিমা' বিষয়ে এই সূচী থেকে আমরা জানলাম: 'স্বরবিতান ২য় খণ্ড তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আছে ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৯।' তাহলে এ গান কেন আসবে ১৩৩২ সালের হিসেবে? সে কি এইজন্যে যে ওই সময়ে সুর দেওয়া হলো রচনাটিতে? এর একটা যুক্তি থাকতে পারে বটে, কিন্তু সেই যুক্তিতে তো 'ওগো বধূ সুন্দরী'রও জায়গা হবে প্রায় দশ বছর পর ১৩৪০ সালের চৈত্রে পৌঁছে? সেই সময়েই তো 'নব মধুমঞ্জরী' পালটে গিয়ে হলো 'তুমি মধুমঞ্জরী', সাত ভাই চম্পার অভিনন্দন হয়ে দাঁড়াল পুলকিত চম্পার অভিনন্দন?

আরেক সংকট তৈরি করছে 'রক্তকরবী' নাটকটি। এই নাটকের পাণ্ডুলিপিতে এমন কয়েকটি গান আছে যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি মুদ্রিত রচনায়। 'এতদিন পরে মোরে' 'নূতন পথের পথিক হয়ে' 'কাজ ভোলাবার কে গো তোরা'—এমনি কয়েকটি গান। তালিকায় এদের জায়গা হবে কোথায়? এই সূচীতে আমরা দেখছি ১৩৩৩ সাল। কেন? 'রক্তকরবী' বইটির প্রকাশকাল ওই বছর, এই জন্যেই কি? কিন্তু পত্রিকায় যে নাটক ছাপা হয়ে গেছে ১৩৩১ সালেই আর তারপর যে অন্য কোনো বদলও হয়নি এর, এ কথা কি আমরা জানি না? 'রক্তকরবী'র ন-দশটি পাণ্ডুলিপির কোনোটিই কি ১৩৩১-এর পরের? এ সংকলনেরই ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: '১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি রক্তকরবী নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাই আমরা এখানে রক্তকরবীর গানগুলিকে ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের মধ্যেই রচনাকাল ধরিয়া সন্নিবেশিত করিলাম।' বেশ। কিন্তু এ গানগুলি কেন তবে পিছিয়ে আসবে আরো

দুবছর, কেবল বইপ্রকাশের তারিখ লক্ষ করে ? আর, তা যদি আসবেই, তাহলে একেবারে ও-রকমই আরেকটি গান 'আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে' কেন রয়ে গেল ১৩৩১ সালেই ? 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো'টিও যে 'রক্তকরবী'রই পাণ্ডুলিপিতে ছিল একসময়ে, সে তথ্যের উল্লেখও কি এখানে প্রাসঙ্গিক হতো না ?

কালপরিচয় ছাড়াও এ-বইতে অনেক সময়ে পাওয়া যাবে গানগুলির উপলক্ষনির্দেশ। কী পরিবেশে কোন অভিপ্রায়ে লেখা হয়েছে কোনো গান, এর যদি নিশ্চিত হদিশ থাকে তো সেটা জেনে নেওয়াই ভালো। প্রভাতকুমারের মতো অভিজ্ঞ মানুষ এ-বিষয়ে কখনো কখনো তাঁর অনুমানও জানাতে পারেন অবশ্য, তবে সে-অনুমানের যুক্তিক্রম একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ কথা তো বুঝতেই হবে যে তাঁর মতো বিশেষজ্ঞের অনুমান জনসমাজে নিপাট তথ্যের মূল্য পেয়ে যেতে পারে। 'দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে' গানটি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত বলে তাঁর অনুমান ছিল একদিন, আপাতত এই 'অনুমান' অংশটি বাদ দিয়ে একে সুনিশ্চিত তথ্য বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে দেখতে পাই। বিশেষ এই গানটিকে নিয়ে সেজন্য কোনো অসুবিধে হয়তো নেই, কিন্তু অনুমানের প্রসার একটু বেশিদূর পৌঁছলে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে বলে আশঙ্কা হয়। পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষেই লেখা হয়েছিল 'আমায় থাকতে দে না আপন মনে', অতুলপ্রসাদ সেনের গৃহবাসের 'স্মৃতি-রোমন্থনে' রচিত হলো 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে', অথবা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর ঠিক কুড়ি বছর পূর্ণ বলেই লেখা হলো 'অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে', এসব অনুমান গানগুলির পথে খুব জরুরি হয়তো নয়। কিন্তু, যখন অনুমান করা হয় যে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণে রচিত 'সার্থক করো সাধন' হয়তো-বা 'নটীর পূজা'র জন্য রচিত, তখন কেবল বিপদই বাড়ে, কেননা ও-নাটক তো লেখাই হলো ১৩৩৩ সালে। এই 'নটীর পূজা' বিষয়ে আরো একটি খবর বলা হয়েছে ২৬ পৃষ্ঠায়, ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে না কি কলকাতায় এর অভিনয়ে গাওয়া হয়েছিল 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়'। ১৩৩১ সালেই অভিনয় ?

'মরণসাগর পারে তোমরা অমর' কোন্ ভাবনা নিয়ে লেখা ? 'কলিকাতায় এই সময়ে চন্দ্রকান্ত সুর ও যতীন্দ্রনাথ সুর হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা রোধ করিতে গিয়া নিহত হন। তাঁহাদের স্মরণে গানটি রচিত।' এখানে অবশ্য

অনুমানের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু সূত্র হিসেবে আমাদের দেখতে বলা হচ্ছে 'প্রবাসী' পত্রিকা আর শান্তিদেব ঘোষের বই। শান্তিদেবের বই খুললে দেখা যাবে এ-গানের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিচয়, তিনি জানাচ্ছেন যে এটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা, রবীন্দ্রনাথ না কি এ-গানের কথা মনে করতে গেলে বলতেন প্রায়ই, 'দাদার মৃত্যুর পর লেখা গানটি'। এই দুই ধারণার মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য করব কেমন ভাবে? লেখায় দুঃখ বা মৃত্যুর কথা থাকলে বাস্তব কোনো মৃত্যুর অভিজ্ঞতা খুঁজে দেখা আমাদের অনেকের অভ্যাস, 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে' গানের সঙ্গে সেইজন্যেই বোধ হয় দেওয়া আছে Winternitz-এর মৃত্যুসংবাদ। কিন্তু খবরটি আসছে এইভাবে: রচনা ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৭, আর 'জানুয়ারির শেষদিনে কবি খবর পান ১লা জানুয়ারিতে Winternitz-এর মৃত্যু হয়েছে। Winternitz-এর মৃত্যুর খবর পাবার আগেই গানটি রচিত।' তাহলে কি গানটি গাওয়া হয়েছে তাঁর স্মরণে? না, তাও নয়, মাঘোৎসবেই হয়ে গেছে সে-গান গাওয়া। তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই গানের পাশে এত বিস্তারিত ভাবে Winternitz-এর মৃত্যুসংবাদ জেনে কী সুবিধে হবে আমাদের? কোনো টেলিপ্যাথির কথা কি বলতে চান সংকলক?

ওই বছরেই লেখা 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী'র পাশে মন্তব্য দেখি 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মরণে রচিত বলে অনুমিত'। হঠাৎ এ অনুমানের কারণ? 'বিদেশিনী' শব্দের প্রয়োগ থাকলেই ওকাম্পোকে ভাববার এক প্রলোভন হতে শুরু করেছিল কদিন আগে, এখন কি তবে 'পরদেশী' দেখলেও সেই ফাঁদে পা দেব আমরা? যে গানের সঞ্চারীতে আছে 'প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা / ছিল পড়ে তৃণদলে অশোকবনে', যে গান শেষ হয় এই দীর্ঘশ্বাসে 'তুমিও কোথা গেছ চলে / বেলা গেল, হলো না আর দেখা', তাকে সরাসরি ভিক্টোরিয়ার স্মরণ হিসেবে অনুমান করতে গেলে কেবলমাত্র সদিচ্ছা ছাড়া আরো কোনো প্রত্যক্ষ তথ্যের কি প্রয়োজন নেই?

৩.

ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদাহরণ মাত্র বলা হলো এখানে, সমস্যার ধরনটা বোঝাবার জন্য। এ ছাড়া আরো কয়েকটি কথা উঠে আসে নীতির বা তত্ত্বের প্রশ্নে, যা নিয়ে মতভেদ সম্ভব। গানের এই তালিকা তৈরি করবার সময়ে 'গান' শব্দটিকে কতদূর নিয়ে যাব আমরা? রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে

বা নৃত্যনাট্যে যে রচনা আছে, এই তালিকায় তার বিন্যাস হবে ঠিক কেমন ভাবে?

গদ্যনাট্য বা পদ্যনাট্যে যেমন, তেমনি গানের ব্যবহার আছে গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যেও। ভারি সহজ এই কথাটার মানে হলো, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যে সুরবাহিত সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে পাওয়া যায় পুরো একটি গানেরও প্রয়োগ। 'নব বসন্তের দানের ডালি'র মতো গান দিয়েই শুরু হয় 'চণ্ডালিকা', কিন্তু তার অল্প পর থেকেই দেখা দেয় চরিত্রগুলির সুরসংলাপ, আবার তারও পর মাঝে মাঝে চলে আসে গান, 'যে আমারে পাঠাল এই' 'ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না' অথবা 'ফুল বলে ধন্য আমি' যেমন। 'শ্যামা'য় আছে 'হে বিরহী, হায়' 'ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও', আছে 'মায়াবনবিহারিণী'র মতো কোনো গান যা হয়তো গাওয়া হয়েছে টুকরো টুকরো করে। এসব গানের সঙ্গে নিশ্চয় এক প্রকৃতিগত প্রভেদ করতে হবে 'শ্যামা'র 'থাম রে থাম রে তোরা ছেড়ে দে ছেড়ে দে' বা 'ক্ষমা করো নাথ ক্ষমা করো'র মতো টুকরোর, 'চণ্ডালিকা'র 'ওরে বাছা দেখতে পারি নে তোর দুঃখ' কিংবা 'লজ্জা! ছি ছি লজ্জা'র মতো উচ্চারণের? বিধিমতো গানের তুলনায় এই সুরসংলাপের প্রাধান্যের জন্য নৃত্যনাট্যের নাটকীয়তা বেড়ে যায় কতটা, এদিক থেকে বেশ-একটা তুলনা হতে পারে কি না 'চণ্ডালিকা' আর 'শ্যামা'র, সে অবশ্য ভিন্ন এক সমস্যা। এখানে আমাদের প্রশ্ন এই, গানের তালিকায় এই ছিন্ন টুকরোগুলিকেও কি স্বতন্ত্র গান হিসেবেই গণ্য করব আমরা, না কি এর জন্য ভিন্ন কোনো সূচী করে দেওয়াই ভালো? প্রভাতকুমার একই তালিকায় এদের সাজাতে চেয়েছেন বলে এই দাঁড়াচ্ছে যে 'হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে'র লাইনটিকে বলতে হলো একটি গান, আর তার পরের গান হয়ে এল 'তোর সাধনা কাহার জন্যে'। ঠিক এইভাবেই এক লাইনের গান হিসেবে সংখ্যাত হচ্ছে এ-সূচীতে 'চণ্ডালিকা'র 'কেন গো কী চাই' 'উড়ো পাখি আসবে ফিরে এমন কী গুণ জানি' 'কী অসীম সাহস তোর মেয়ে' 'ওরা কে যায় পীতবসনপরা সন্ন্যাসী', অথবা 'শ্যামা'র 'কী আছে তোমার পেটিকায়' 'আছে মোর প্রাণ আছে মোর শ্বাস' কিংবা শেষ পর্যন্ত 'ধর ধর, ওই চোর, ওই চোর'। প্রভাতকুমারের যুক্তি এই যে স্বরবিতানেও এদের ভিন্ন ভিন্ন করে দেখানো আছে। কিন্তু সুর পালটে যাচ্ছে বলে স্বরবিতানে তো ভিন্ন করে দেখাতেই হবে এদের। সেক্ষেত্রেও শুধু লক্ষ করবার যে সেখানে এগুলি ছাপা হয়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় একটানা, অন্যান্য

স্বরবিতানের ধরনে স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের চেহারায় নয়।

গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের এই নীতিটি স্পষ্ট না করে নিলে পরিসংখ্যানেরও একটি অসুবিধে দেখা দিতে পারে হয়তো। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বেশ বিস্তারিত হিসেব দিয়েই বলা হয়েছিল যে গীতিবিতানের মোট গানের সংখ্যা ২২৩২। কিন্তু 'শ্যামা'-'চণ্ডালিকা'র যে সাতটি টুকরোর উল্লেখ করেছি এই মাত্র, তার তিনটিকে পাওয়া যাবে গীতবিতানের সূচীতে, পাওয়া যাবে না বাকি চারটিকে। এই কারণে এবং নিশ্চয় আরো নানা কারণে, প্রভাতকুমারের সূচীতে গানের সংখ্যা এখন দাঁড়াল ২১৭৭। খুঁজে পাওয়া শক্ত এখানে 'অসুন্দরের পরম বেদনায়' বা 'আমার মনের কোণের' মতো কোনো কোনো গান, কিন্তু সংখ্যাগত গরমিলের সেইটেই একমাত্র কারণ নয়। পাঠান্তরিত রচনাগুলিকে একই গান বলে ধরা হবে, না ভিন্ন গান, নৃত্যনাট্য-গীতিনাট্যের হিসেবটাও হবে ঠিক কীভাবে, এসবেরও ওপর হয় তো নির্ভর করছে এই সংখ্যার যাথার্থ্য।

বইটিতে সংগত ভাবেই নির্দেশ করা আছে নানা প্রমাণিক উৎসের। এরই মধ্যে একবার বলেছি যে, উৎসের সঙ্গে উল্লেখের ঠিক সামঞ্জস্য হয়নি অনেক সময়ে। অন্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না যখন, তখন সমস্যা একরকমের। কিন্তু 'রবীন্দ্রজীবনী'রই সঙ্গে মেলে না যখন এই সূচীর তথ্য, তখন আমরা ধরে উঠতে পারি না কোনটির ওপর ভর করব। এমন অনেক উদাহরণের দু-একটি হলো, 'হাটের ধুলা সয় না যে আর'-এর রচনাকাল একটিতে বলা আছে ২৯ ফাল্গুন অন্যটিতে ২ চৈত্র, আর ঠিক পরেই 'পাখি বলে, চাঁপা আমারে কও' একটিতে ২ চৈত্র অন্যটিতে ১৫ চৈত্র। গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের অথবা কোনো কোনো সময়ে বিশ্বভারতী রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় থেকে বিস্তারিত সাহায্য নেওয়া হয়েছে অনেক তথ্যের, একটু অসতর্কভাবে প্রায়ই সেখানে থেকে গেছে উদ্ধৃতিচিহ্নহীন অবিকল তার বাক্যাবলীর ব্যবহার। অবিরাম এ অসতর্কতার সবচেয়ে সংকটময় চেহারাটি আছে ১৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় 'তাসের দেশ' প্রসঙ্গে। এই নাটকের পরিচয় হিসেবে প্রায় ষোলো লাইন যে-কথা বলা আছে এই সূচীতে, তার সবটাই রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে গৃহীত বলে এ-লাইনও এখানে রয়ে গেল যে 'প্রহসনটির[১] বর্তমানে প্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠ মুদ্রিত হইল'। বলা বাহুল্য, ওই প্রহসনের কোনো পাঠই মুদ্রিত হয়নি

১ রচনাবলীতে অবশ্য 'প্রহসন' শব্দটি নেই, আছে 'নাটিকা'।

এখানে, হবার কথাও নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বলা হচ্ছে যে আরো তথ্যের জন্য 'দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩/৫৪৩-৪৪, এখানে নাটকটির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে', তখন পাঠক একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, কেননা এ-বইতে গৃহীত ওই ষোলোটি লাইন ছাড়া রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে আর যে 'বিস্তারিত আলোচনা' আছে, সে তো কেবল এর গানগুলির তালিকা। সে-তালিকার জন্য রচনাবলী কেন খুলতে হবে আর, তারই জন্য তো আমরা খুলেছিলাম এই সূচী।

৪

ছোটোবেলা থেকে পড়া 'কণিকা'র সেই বহুখ্যাত লাইনটি ভুলে যাচ্ছি না; সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হয় এই কথা : 'কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।' অভ্রান্ত চুল হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভুলের সম্ভাবনা নিয়েও অক্লান্ত কাজ করছেন যিনি, তিনি শ্রদ্ধেয়। আর সে-মানুষ যদি হন প্রভাতকুমারের মতো এক প্রতিষ্ঠান, তাহলে আমাদের সব সমালোচনাকেই রুদ্ধ করে নিতে হয় কোনো এক প্রণতিতে। তবু যে এ কথাগুলি লিখতে হলো, তা কেবল এইজন্যে যে অন্য যে-কোনো বইয়ের তুলনায় তাঁর এই কীর্তিগুলিকে আমাদের অনেক বেশি প্রাত্যহিক সঙ্গী বলে মনে হয়, প্রায় অভিধানের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের কাজে লাগে তাঁর বই। এ-বইয়ের ছোটোখাটো বিচ্যুতিগুলি যদি সরিয়ে নেওয়া যায় দ্রুত এর পরবর্তী কোনো সংস্করণে, আমাদের ভবিষ্যৎ পাঠকদের পক্ষে তাহলে এই 'কালানুক্রমিক সূচী' হতে পারবে রবীন্দ্রনাথকে জানবার এক নিশ্চিত নির্ভর, স্পষ্ট আদলে তিনি জানতে পারবেন কীভাবে রবীন্দ্রসংগীতের এক যুগ থেকে আরেক যুগে 'নূতন ভাবনা রূপ নিচ্ছে নূতন ভাষায়', সে-নূতনত্ব ধূর্জটিপ্রসাদের বলা সুরের ভিন্নতাতেই হোক, কিংবা প্রমথনাথ বিশীর নির্দেশিত জীবন-আর সৌন্দর্য-লোকের কল্পিত দোলাচলের মধ্যেই হোক।

গানের রবীন্দ্রনাথ

পূর্ণেন্দু পত্রী

এ আমির আচরণ। শঙ্খ ঘোষ। প্যাপিরাস ১৯৮০

গায়ক নয়, গীতিকার নয়, গীতশাস্ত্রবিদ্ নয়, একজন কবির কাছে যখন আকর্ষণ, অধ্যয়ন এবং আলোচনার বিষয় হয় রবীন্দ্রনাথের গান, স্বভাবতই দৈর্ঘে-প্রস্থে দ্বিগুণ আকার নেয় আমাদের কৌতূহল। আমরা যেন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে উঠি এমন এক ভ্রমণের জন্যে যা গানের মতই গহন আর স্থানকালাতীত যার ব্যাপ্তি। অনুমান করে নিই, গানের ছন্দ শুধু, গানের ভাষা, ভাষাও নয় শুধু, গানের ভিতরে লুকিয়ে থাকা এক ভিন্নতর ভুবনও উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়ে যাবো অনেকখানি। আর এই রকম সময়েই হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে যায়, সত্যিই তো, যে-গান আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয়ের মত অপরিহার্য, আমাদের অজস্র দুঃখ-রাত্রির যা সবচেয়ে নির্ভরশীল সঙ্গী, আনন্দিত মুহূর্তের সবচেয়ে প্রিয় সহচর, বিষাদের বন্ধু, গোপন কান্নার নিমগ্ন শ্রোতা, ঝড়ের রাতে যার মন্দিরে সবার আগে পূজো, সংকটে ত্রাণের প্রার্থনা, সংগ্রামের দিনে যা হাতে তুলে দেয় সবচেয়ে তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্র, সেই গানকে আমরা কি শুধু শুনেই যাই, শুধু দেখি তার বাইরের আবরণ-আভরণ, শিহরিত হই তার উদ্ভাসিত লাবণ্যে, কিন্তু ভিতরপানে তাকাই কম। যে বৃক্ষের কুসুম এরা, তাদের উভয়ের সম্পর্ক-সম্বন্ধের চেহারাটা কি রকম, তাও যেন তত ভাবা হয় না আমাদের। যিনি এই অপর্যাপ্ত নানা রঙের ফুলগুলোকে ফোটান, কেন ফোটান, কেমন করে ফোটান, ফুটিয়ে তোলার আনন্দ এবং যন্ত্রণার যুগ্ম তাল তাঁকে ফিরিয়ে দেয় ঠিক কি ধরনের প্রেরণা বা সৃষ্টি-স্বাদ, আর শেষ পর্যন্ত এই ক্রমান্বয় ফুটিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি পালন করে যান নিজের কোন ধরনের দায়, পেয়ে যান কোন ধরনের মুক্তি, আমাদের অনুসন্ধিৎসা ক্রমেই মুখ বাড়ায় সেদিকে।

গভীর অনিচ্ছার পর মাইকেলএঞ্জেলো যখন সম্মতি জানালেন সিস্‌টিন চ্যাপেলের সিলিং-জোড়া ফ্রেসকো আঁকতে, তখনই বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। আর আঁকার সময় সে কাহিনী ভাগ হয়ে গেল দুটো। ঈশ্বর আর মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের গানের ফ্রেসকোও এমনি ঈশ্বরে মানুষে ভাগাভাগি, আবার একসঙ্গে জোড়া। মানুষের আদলেই ঈশ্বরকে এঁকেছিলেন মাইকেল-এঞ্জেলো। রবীন্দ্রনাথের গানে মানুষের প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর পোশাক পরে ঈশ্বরকে নেমে আসতে হল নীচে, নইলে ত্রিভুবনেশ্বরের মিছে হয়ে যায় সব প্রেম। মাইকেলএঞ্জেলো তাঁর ফ্রেসকোর ঈশ্বর-অধ্যায়কে করেছিলেন তিনটে ভাগ। ১. ঈশ্বর আলো এবং আঁধারকে স্বতন্ত্র করছেন। ২. ঈশ্বর সৃষ্টি করছেন এক জ্যোতির্মণ্ডল। ৩. ঈশ্বর আশীর্বাদ করছেন পৃথিবীকে।

রবীন্দ্রনাথের আগে আর কবে গানের ভিতরে জ্বলে উঠেছে এত আলো, নেমে এসেছে এত অন্ধকার? আর কেই-বা শুনিয়েছে এমন অন্ধকারের কথা, যা আরেক রকমের আলো? এ-যুগের কবিতার অন্ধকারে আমরা শিউরে উঠি। মুখোমুখি হই এক নিঃশব্দ পতনের অথবা শোকাবহ সব উচ্ছেদের। অথচ তাঁর গানে যখন প্রবল তিমির, ঘন অন্ধকার, যখন ঝড়ের রাত, যখন বজ্রধ্বনি, যখন সঘন বর্ষণ, নৌকো ডুবুডুবু, দুর্দিনের প্রচণ্ড গর্জন—তখনই, সেই মুহূর্তেই, ফুটে ওঠে সোনার রেখার আলো, এসে দাঁড়ায় জ্যোতির্ময়। মাইকেলএঞ্জেলোর ঈশ্বরের মতোই তিনি গড়ে দেন এক জ্যোতির্মণ্ডল। আর সেই সঙ্গে আশীর্বাদ জানানোও হয়ে যায় তাঁর পৃথিবীকে।

মাইকেলএঞ্জেলোর উল্লেখ করেছেন শঙ্খবাবুও, ভিন্ন প্রসঙ্গে। 'একই সঙ্গে নানা শিল্পের চর্চা করেন যাঁরা, তাঁরা কি তাঁদের সেই বিচিত্র শিল্পরূপের মধ্যে একই মনকে প্রকাশ করেন? না কি মনের ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী দিকের প্রকাশ সেটা? মাইকেলেঞ্জেলোর বহুমুখী শিল্পকীর্তির বিষয়ে ভাবতে গিয়ে রোমাঁ রঁলাকে বলতে হয়েছিল এর কেন্দ্রীয় ঐক্যের কথা। ন-টি মিউজকে যেমন একসময়ে ভাবা হতো মিউজিকের মতো মহত্তর এক শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র, তেমনি এক সামগ্রিকতার দিক থেকে দেখা যায় এই শিল্পীর ভিন্ন ভিন্ন কাজ, যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় এক 'ডিজাইন', সমস্ত শিল্পের অন্তর্গত মৌলিক যে ডিজাইনটির কথা মাইকেলেঞ্জেলো নিজেই বলতেন তাঁর বন্ধু ভিত্তোরিয়া কলোনকে।'

'গানের ভিতর দিয়ে যখন' নামের যে-প্রবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি, সেখানে এই উক্তির একটু পরেই দেখতে পাই শুরু হয়ে যায় এক বিতর্ক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে, যাঁর ধারণায় 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গীতিকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ সময়ের গদ্য-নাট্যকারের চেয়ে যেন 'একটু কাঁচা বয়সের, একটু নবযুবতী-স্বভাবের মানুষ'। অর্থাৎ গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ অন্য অনেক কিছুর থেকে

স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আলোচনার উথাল-পাথাল ঢেউ ঠেলে শঙ্খবাবু আমাদের পৌঁছে দেন ঠিক এর উল্টো দিকের কিনারে। 'গানের ভিতর দিয়ে যদি আমরা বুঝতে চাই তাঁকে, তাহলে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন তা নয়, তাহলে আমরা কেবল দেখতে পাব তাঁর সম্পূর্ণতর এবং গভীরতর এক অবয়ব, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সরল সাদৃশ্য আছে যার অনেক, আপাতবিরোধও আছে কখনো কখনো।'

এর থেকেই বুঝতে পারি সমগ্র রবীন্দ্রনাথ যেমন নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা, আবার সেই মালার কোনও একটি ফুলেও সমগ্র রবীন্দ্রনাথের সৌরভ। 'জীবনের ছন্দকে কবির চেয়ে সংগীতশিল্পীরাই বোঝেন ভালো' শঙ্খবাবুর মারফৎ যখন প্রবীণ ইয়েটসের কাছে লেখা তাঁর কবিবান্ধবী ডরোথি ওয়েলসলির এই মন্তব্য শুনি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে—ভাগ্যিস সংগীতশিল্পী ছিলেন তিনি, নইলে জীবন-ছন্দের কত ঐশ্বর্য থেকেই কাঙাল হয়ে থাকতুম আমরা। আবার আলডুস হাক্সলি যখন বলেন 'সূক্ষ্ম, ঘন, আঙ্গিকে সমৃদ্ধ 'পিওর মিউজিক' যদি কেউ রচনা করতে চান, তাঁকে মুখ ঘোরাতে হবে কবির দিকে', তখনও আমাদের মনের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে—ভাগ্যিস কবি ছিলেন তিনি, তাই তো গানগুলো হয়ে উঠেছে এমন লক্ষ-মাণিক জ্বালা।

আবার যখন অন্য সব শিল্পকে সরিয়ে শুধু গানের দিকেই তাকাই, তখন দেখি গানের মধ্যেও কত ভাগ-বাটোয়ারা। পূজার গান শুনে ভাবছি তিনি ধার্মিক। প্রেমের গানে দেখছি তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ। প্রকৃতির গানে মনে হচ্ছে উদাসী ভাবুক। দেশপ্রেমের গানে যেন অগ্নিবস্ত্র যোদ্ধা। অথচ এর কোনোটাই যে শেষ সত্যি নয় সেটাও জানতে বাকি থাকে না আমাদের যখন একই আগুনকে তিনি একবার জ্বালান প্রদীপে আরেকবার মশালে। একই বাঁশি একবার অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়ে দেয় কামনার ঘোর, আরেকবার প্রণাম বা প্রার্থনার মতো নীরব হয়ে যায় অন্য কেউ এসে তাকে বাজাবে বলে।

তাঁর গানকে পূজা, প্রকৃতি, প্রেম, ঋতু, দেশপ্রেম—এমনি যত ভাগেই ভাগ করিনা কেন, তাদের সব টুকরোকে জোড়া লাগালে একটাই বিশ্বলোক, এক মহান কাহিনী যেন মাইকেলএঞ্জেলোর ফ্রেস্কোর মতোই—পৃথিবীর নর-নারীদের জন্ম, স্বর্গ থেকে পতন, মহাপ্লাবন, আবার সৃষ্টির পুনর্জন্ম—সব কিছুকেই আত্মসাৎ বা অঙ্গীকৃত করে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা, ধ্যান-ধারণায় পৌঁছনোর সংকট, ধ্যান-ধারণাকে সমকালের সীমায় কুড়িয়ে চিরকালের সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার এক জীবনব্যাপী উদ্যম-উৎকণ্ঠা, অন্যান্য মাধ্যমের মতো তাঁর গানের বেলায়ও সত্যি। আবার একদিকে যেমন তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রিয় মাধ্যম গান, তেমনি গানের আত্মপ্রকাশকেও সম্ভ্রান্ত, সভ্য এবং সংস্কৃত করে তুলে তাকে বিশ্বনাগরিকতার মর্যাদায় পৌঁছে দেওয়ার সমস্যাতেও জড়িয়ে ছিলেন তিনি। এক প্রবন্ধে লিখেও ছিলেন সে-কথা।

'আজ নতুন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁয়েছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নেই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পেয়েছি। আমাদের নূতন নাগরিক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কেটে আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাইরে এলেম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্‌ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলব। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়েছে। এখন আমাদের সংগীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রেখে না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নেই।'

এরপর তাঁর সমগ্র জীবনের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে তিনি আর তাঁর গান দুয়ে মিলে একাকার। গানের উদ্ধারের জন্যে তিনি, আর তাঁর উদ্ধারের জন্যে গান। তাঁর মনের ইতিহাসের গভীর-গোপন অভ্যন্তরে পৌঁছবার কত চোরা-দরজাই না লুকিয়ে আছে তাঁর গানে আর গানের সাতমহলের দরজা খুলবার কত চাবিকাঠিই না লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনে। হয়তো সেই কারণেই অমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে যেতে পারলেন, 'আমার সব গেলেও গান থাকবে।'

২

নানা সময়ে এবং বিশেষ করে কিছু সংগীত-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটাতেই এই বইয়ের মোট ন-টি প্রবন্ধের জন্ম। কিন্তু এর মধ্যে ভিড় করে থাকা প্রশ্নের সংখ্যা নয়-এর বহুগুণ। আমাদেরই প্রশ্ন সে-সব। আমরা যারা রবীন্দ্রসংগীতের নিছক শ্রোতা, যাদের কান ছাড়া আর সব কিছুই কানা, যারা বিশ্লেষণ করতে পারি না নিজেদের মুগ্ধতার কার্য-কারণ, এমন কি সঠিক বুঝতে পারি না কি কারণে তাঁর গানের দুয়ারে ছুটে আসি বারবার, তাঁর সুরের [illegible]

কেনই বা পেয়ে যাই শক্তি এবং শান্তি, পূজার গানে কেনই বা মনের ভিতরে বইতে থাকে হাহাকারের হু হু হাওয়া, বুঝতে পারি না প্রেমের গানের কোনটিতে কথা বললাম ঈশ্বর-সদৃশ কোন পরম-পুরুষের সঙ্গে আর কোনটিতে যার কাছে আমাদের সর্বাঙ্গীণ ভালোবাসার প্রত্যক্ষ দাবি-দাওয়া সেই নারীর সঙ্গে, এমনকি আমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই, আধ্যাত্মিক আরাধনায় মজি নি এখনো, তাঁরাই বা এত অনায়াসে 'পরাণ-সখা', 'নাথ', 'প্রভু', 'দেবতা', 'জীবনস্বামী' ইত্যাদির উচ্চারণে আড়ষ্ট হইনা কেন এতটুকু।

পিকাসো একবার তুলেছিলেন এক কৌতূহলী প্রশ্ন, 'আমরা জলে ডুবলে গলে যাইনা কেন?' এ প্রশ্নটাকেই এখানে বলতে ইচ্ছে করছে একটু উল্টে নিয়ে—'যাদের মানসিকতা তাঁর ধ্যান-ধারণার বিপরীত, এমনকি কখনো হয়তো বা বিরোধী, তারাও তাঁর গানের জলে গা ডোবালে গলে যায় কেন?'

প্রশ্ন অনেক। অনেক দিন ধরেই বকেয়া-পাওনা হয়েছিল এসবের উত্তর। এখন, শঙ্খ ঘোষ রচিত এই প্রবন্ধ-সংকলনটা হাতে পেয়ে বোঝা গেল, যথার্থভাবে একজন কবিকেই প্রয়োজন ছিল এতদিন এর উত্তরদাতারূপে। কারণ প্রশ্নগুলো সংগীতের ব্যাকরণের নয় ততখানি, ততখানি নয় ছন্দ-তাল-তান-লয়ের, যতখানি জীবনবোধের, যতখানি আত্ম-জাগরণের। একজন কবি ছাড়া আর কার পক্ষেই এমন উত্তর সম্ভব—

'নিজের অস্তিত্বের মধ্যে যখন মানুষ অনুভব করতে পারে সমস্ত বিশ্বের অভিঘাত, তখন সে হয়ে ওঠে গভীরতর অন্য এক মানুষ। অভিঘাতের এই সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ দেখেন সুরের উপমায়। এ অভিঘাত কখনো তীব্র, কখনো মৃদু, আনন্দের কখনো, কখনো ব্যথার। ...কিন্তু সব সময়েই সে সুর যোগ করেছে একের সঙ্গে অন্যকে, আমির সঙ্গে এক তুমিকে।'

ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতো প্রশ্নের গায়ে গায়ে উত্তর জড়িয়ে নিয়ে এ বইয়ের পাতায় পাতায় বয়ে চলেছে এক বাঁধন-খুলে-দেওয়ার খোলা হাওয়া। এখনও সে-হাওয়ার উতলতায় স্পর্শ পায়নি যে-সব জিজ্ঞাসু পাঠক, শুধু তাদের কথা মনে রেখেই এখন উত্থাপন করতে চাইছি লেখকের সেই সব উক্তি, সঙ্গে আমাদের সকলেরই একাধিক আর্ত-জিজ্ঞাসার উত্তর।

১. 'রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিয়ে যায় প্রতিদিনের বাইরে এক অচীন ভুবনে, আমাদের নিবিড়তম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় রবীন্দ্র-নাথের গান। ...তার সামনে দাঁড়ালে বস্তুর সব ভার হাল্‌কা হয়ে যায় হঠাৎ, সরে যায় আমাদের সমস্ত মিথ্যে, সরে যায় সাজিয়ে কথা-বলার সংসার।

…পরস্পরং হানাহানিতে মত্ত কানাকানিতে কুটিল উচ্চাশার গ্লানিতে ভরা এই অপজীবন থেকে অনায়াসে উঠে দাঁড়াতে পারে সে, কেননা হঠাৎ সে টের পায় বিশ্ববিষয়ের অন্তঃসার, নিজেকে সে বলতে পারে তাই সৃষ্টিছাড়া।'

২. 'সমস্ত শিল্পই…নিজেকে জানার শিল্প। কেননা, এক হিসেবে, নিজেকে জানার সম্পূর্ণতাই সকলকে জানারও পাথেয়। এ ধারণার মধ্যে কেবল প্রাচীন উপনিষদকে খুঁজতে গেলে ভুল করব আমরা, এ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় অর্জিত বোধ। …আধুনিকেরাও কেবলই লড়াই করছেন এই আত্মবোধের সংকট নিয়ে। টমাস মানের মতো শ্রেষ্ঠ একজন আধুনিককেও বলতে হয় তাই: জীবনের প্রধান তিনটে বাণীর একটি হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন সত্যি সত্যি নিজেকে জানে তখনই সে হয়ে ওঠে আরেকজন মানুষ।'

৩. 'রবীন্দ্রনাথের গান নিজেকে রচনা করে তুলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান…। দীক্ষার এই বেদী থেকে প্রতিদিনের আত্মচরিতের দিকে তাকিয়ে দেখি। দেখি, এমন কোনো পদ্ম গড়ে ওঠেনি আমার স্বভাবের মাঝখানে যেখানে এসে পা রাখবে শ্রী, সৌন্দর্য। এই বোধ থেকে শুরু হলো কান্না, অপচয়ের অক্ষমতার অপূর্ণতার কান্না। হঠাৎ এক মস্ত গহ্বরের সামনে এসে পড়ি আমরা, উত্তরহীন সমাধানহীন এক প্রশ্নব্যাকুলতার, তীব্র স্বাদ তাঁর গানে এসে লাগে কখনো। অন্ধকার পথে একলা পাগলের মুখে আর্তনাদ শুনি তখন: 'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'।… এই পাগলটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাই মথিত হয়ে ওঠে আমাদের সমস্ত আধুনিক কাতরতা।'

৪. '…রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুঃখের ভুবনকে এমন সন্তর্পণেই গড়ে তোলেন যে আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো ধীমান্ ভাবুকেরও মনে হয় যে দুঃখের চেয়ে আনন্দের গানই তাঁর বেশি। নিছক তথ্যের দিক থেকে কথাটা সত্যি নয় অবশ্য। সমগ্র গীত-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ দুঃখেরই কথা বলতে চেয়েছেন বারবার, সেইটেই স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে, কেননা দুঃখই তাঁর নিজেকে রচনা করে তুলবার পথ। কিন্তু সেই দুঃখের বোধ কোথাও দমিয়ে দেয় না আমাদের।'

এখান-ওখান থেকে উপড়ে নেওয়া উক্তি তুলে বইয়ের স্বাদ-গন্ধ অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। গানের ভাষা যেমন সুরের উঁচু-নিচু ঢেউগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যায় এক চূড়ান্ত উন্মোচনের দিকে, এ বইয়ের

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভাষা সেইভাবেই এগিয়ে গেছে অজস্র উদ্‌গত ভাবনার দ্যুতি-কণা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পাতায় পাতায় এখানে জেগে উঠছে এমন এক গভীর গভীরতর পর্যবেক্ষণ, যেন মনে হবে ধাপে ধাপে গাঁথা হচ্ছে একটা অন্বয়ের সিঁড়ি যা আমাদের উত্তীর্ণ করে দেবে এক আলোক-তীর্থে। রবীন্দ্রনাথেরই এক গানে আমরা শুনেছিলাম—'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো।' শঙ্খ ঘোষ তাঁর এই গান-সংক্রান্ত ভাবনার পরিমণ্ডলকেও জুড়ে দিতে চেয়েছেন বিশ্ব-সাথে। তার ফলে, গানে যিনি শুনতে চেয়েছিলেন বিশ্বযাত্রার তাল, এখানে, এই বইয়ে, আমরা শুনতে পাচ্ছি তাঁর গানের সম্পর্কেও এক বিশ্বতান। আর এই বিশ্বতানের সূত্রেই মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছি এমন সব চেতনাজীবী মানুষের, রবীন্দ্রনাথের মতোই যাঁদের ধ্যান—আত্ম-বোধের জাগরণ। যেমন—

১. 'পুরনো দিনের নাটকে মেটারলিঙ্ক তৈরি করেছিলেন অপেক্ষাতুর কয়েকটি অন্ধের চরিত্র, তারা বসে আছে তাদের ভাবী নিয়তির জন্য। অথবা তুলনায় আধুনিক কাফ্‌কার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের গানের অপেক্ষমান ছবিটির প্রসঙ্গে বা অমলের প্রতীক্ষার পাশাপাশি তাঁর মনে পড়েছিল কাফ্‌কার কোনো কোনো চরিত্রের কথা। কিংবা যেমন রিল্‌কে লিখেছিলেন একসময়ে : অনন্তকাল ধরে নেমে আসছে এক ভাবী সত্তা।'

২. 'নীটশে বলেছিলেন, মানুষ এক সেতুর মতো, অবমানব আর অতি-মানবের মাঝখানে এক সেতু যেন সে। সে যে নিজে কোনো পরিণাম নয়, তার মধ্য দিয়েই অর্জিত হচ্ছে মস্ত কোনো পরিণাম, এইটেই নীটশের মনে হয়েছিল মানবিক সাধনা। দুস্তর ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের গান আর নীটশের জগতে, কিন্তু এইখানে যেন দুজনে বলতে পারেন একই রকম কথা।'

৩. 'মালার্মে বা প্রতীকবাদীরা যেভাবে শব্দের ব্যবহার করতে চাইতেন, যেভাবে ধ্বনিত করতে চাইতেন শব্দমধ্যগত নীরবতার সুর, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক মিল হবে না বটে, কিন্তু তবু রোমান্টিক ভাষা-বিলাস থেকে সরে আসার আবেগ যে 'গীতাঞ্জলি'র কবির কতটাই ছিল, কবিতার মধ্যে 'নীরব' শব্দটির নিরন্তর আবর্তনেও তার একটা বাইরের পরিচয় ধরা পড়ে। এখানে তার বীণা নীরব, বাণী নীরব, নীরব রবিশশী, রাত্রি, অন্ধকার আকাশ হৃদয় বা মর্ত্যলোক, সবই কেবল নীরবতায় ভরা।'

৪. 'একেবারে ভিন্ন দেশের আধুনিক এক কবি জঁ। কক্‌তো, তাঁর সৃষ্টি-

প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে কবি আছেন তাঁর রাত্রির অধিকারে, কোন এক গহন আবির্ভাবের জন্যে তাঁকে ধুয়ে মুছে রাখতে হয় ঘর। অমলেরও সামনে এসে রাজকবিরাজ বলেছিলেন: 'এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো।'

৫. 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে গিয়ে যে তেইয়ার-দ্য-শার্দ্যাঁর কথা মনে পড়েছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর, সেই শার্দ্যাঁ বলেছিলেন: নিজেকে যদি বিশ্বপরিধিতে বাড়িয়ে না নেয় মানুষ, তবে সে আলিঙ্গন করতে পারে না তার প্রিয়াকে।...নারীর মধ্য দিয়েই পুরুষ তার ছিন্নতার গণ্ডী থেকে মুক্তি পায়, বলেছিলেন তিনি, ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন তাঁর 'পার্সোনালিটি' প্রবন্ধগুলিতে।'

এইভাবেই বিশ্বসাহিত্যের কিনারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে আলোচনা। লেখক আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কালে কালে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিশীল মনীষার ভিতরেই আত্মনির্মাণের যে দ্বন্দ্বময় আকুতি, রবীন্দ্রনাথের গানের উৎস সেইখানেই—যদিও তাঁর অভিযান আরও বিস্তৃত এবং ব্যাপক।

৩

হ্যাঁ, ব্যাপক তো বটেই। কেননা শুধু তো, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ভাবনাকে নয়, তাঁর সাহিত্যের নরনারীদের জীবন-ভাবনাকে চিনবার জন্যেও তাঁর গানের কাছে এসে বলতে হয়—'লইনু শরণ'। তাঁর অনেক কবিতা, অনেক নাটক, অনেক উপন্যাসের তলা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, যখন দেখি গানের ভিতর দিয়ে। 'গীতাঞ্জলি'-র কোনো কোনো গানের চরণ-ছাপ ধরে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছে যাই 'রাজা' নাটকের রাজা এবং সুদর্শনার কাছে অথবা 'ঘরে বাইরে'-র নিখিলেশ-বিমলার মুখোমুখি। তাদের মর্মস্থলের অলুনি-পুড়ুনিকে চিনিয়ে দেয় গান। এই সব দুঃখিত, আহত, অবরুদ্ধ প্রাণের সবচেয়ে গভীরতর সংলাপকে নিংড়ে নিয়েই গানগুলো যেন গড়ে নের নিজেদের আত্মা এবং শরীর।

'জীবনের আঘাত আছে, কিন্তু তার ঔদাসীন্য নেই তবু তার সঙ্গে মিলিত হবার এক অস্তিময় তাৎপর্যময় আনন্দ আছে—এ বোধ নিশ্চয় জেগে ওঠে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলিতে। কিন্তু সে বোধ তো 'রাজা'-রও? ঐ নাটকের রাজা যিনি, তিনি নিষ্ঠুর বটে, তবু উদাসীন তো নন? যদি উদাসীনই হবেন, তবে সুদর্শনার [illegible] চাইবেন কেন তিনি?' যদি উদাসীনই

হবেন, তবে আগুন থেকে বাঁচবার জন্যে, রাজন্যদের লিপ্সাময় আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে, বারেবারেই ফিরে আসতে হবে কেন তাঁকে? কেন তাঁকে বসে থাকতে হবে সুদর্শনার মনের সেই গড়ে উঠবার প্রতীক্ষায় যেখানে 'মন যদি তার মতো হয় তবে সে মনের মতো হবে?'...প্রেমের স্বরূপকে জানেনি যে, জীবনকে জানেনি যে, প্রথম যুগের সুদর্শনার মতো সে একে ভাবতে পারে ঔদাসীন্য, 'ঘরে বাইরে'-র নিখিলেশকে অনেক সময়ে যা মনে হতে পারত বিমলার, কিন্তু আপাত এই উদাসীনতার মধ্য দিয়ে প্রেমিক কি তার দয়িতাকে গড়ে নিচ্ছেন না তাঁর মর্মমূল পর্যন্ত? ঈপ্সিত এক বিরহানলে অল্পে অল্পে জ্বালিয়ে তুলছেন না তার ভিতরকার এক আলো?'

এইখানে এসে হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে যায় এক আশ্চর্য সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন কয়েক হাজার। উপন্যাস লিখেছেন বারোটি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের কোনো চরিত্রের মুখে তিনি তুলে দেন নি রবীন্দ্রসংগীত, যদিও কার্পণ্য ঘটেনি গান তুলে দিতে। তাঁর এই বারোটি উপন্যাসে গানের প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ, উপমা, উপক্রমণিকা সবই আছে। ঐ সব উপন্যাসের অনেক চরিত্রই গান জানে। গান গেয়েছেও। কিন্তু সে গান অপরের কাছ থেকে ধার করা। আর যদি বা হয় কবির স্বহস্ত-রচিত, তিনি তাকে মনে করেন না নিজের গলার সুর বসিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্য। সম্ভবত গীত-বিতানের পাতায় ঠাঁই-ও এখনো জোটেনি তাদের। তাঁর বারোটি উপন্যাস ঘেঁটে আমরা খুঁজে পাই অমন তিনটি মাত্র গান। 'ঘরে বাইরে'-য় দুই, আর 'চতুরঙ্গে' এক।

জেঠামশায়ের মৃত্যুর পর থেকে 'চতুরঙ্গে'র পাতা জুড়ে অষ্টপ্রহর কেবল গান আর গান আর খোল-করতালের অবিরাম ঝনৎকার। অথচ গান নেই কোনোখানে। না শচীশ, না শ্রীবিলাস, না দামিনীর মুখে। গানের সঙ্গে এই উপন্যাসে আমাদের সাক্ষাৎ শুধু একবারই। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে আসন্ন অন্ধকারের সামনে সূর্যাস্ত যখন দিনের শেষ প্রণামের ভঙ্গিতে নত, 'চতুরঙ্গে'র লীলানন্দস্বামী তখন, ঐ একবারই মাত্র, গেয়ে উঠলেন কবির লেখা আনকোরা একটা নতুন গান। অনায়াসেই যার মুখে তিনি তুলে দিতে পারতেন পূর্বাহ্নে রচনা-করা কোনো একটা রুদ্র আলোর গান, তা না দিয়ে কেন যে নিতান্তই ঐশ্বর্যহীন ক্ষুদ্র একটিকে তুলে দিলেন, ধাঁধার মতো লাগে ভাবতে গিয়ে। যেমন লাগে সন্দীপের জন্য লেখা গান দুটোর দিকে তাকিয়ে। এই দুটো চরিত্রের কোনো

ভোঁতামির দিকে কটাক্ষপাতের জন্যেই কি সোনার বদলে অমন গিল্টি-করা গান ?

অমন যে বৃহদায়তন 'গোরা', বাঙালি জীবনের এক সংঘাত-মুখর ঐতিহাসিক লগ্নের মহাকাব্য বলে মনে হয় যাকে, যার রচনাতেই বাউল-কণ্ঠের উদাসী গান, সেখানেও, উপন্যাসের বাকি পাতাগুলোর গানের আসন সব সময়েই ফাঁকা। পরেশবাবুর গলায় ললিতার প্রতি অনুরোধই শুধু শোনা গেছে একবার, গান শোনা যায় নি। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের গায়ক-গায়িকা হতেই হবে, অথবা উপন্যাসের উঠোনে গানকে বিছিয়ে বসতেই হবে রাজ্য-পাট, এমন কোনো জরুরি পরোয়ানা যে ঔপন্যাসিকদের মাথার উপরে টাঙানো নেই তা আমরা জানি। সেই সঙ্গে এ-তথ্যও অজানা নয় যে, একাধিক স্মরণীয় উপন্যাসে রয়েছে সংগীতময় পরিবেশের এমন উপস্থাপনা যেখানে গান হয়তো উপলক্ষ্য মাত্র, লেখকের আসল অভিপ্রায় জীবন বা মানুষের চেতন-অবচেতনের রহস্য সম্পর্কে আমাদের ভিন্নভাবে অভিজ্ঞ করে তোলা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গান উপস্থিত হয়েছে বারংবার। সেই গানের মুহূর্তে, গানকে ঘিরে কখনো কখনো সমবেত হয়েছে একটা গোটা অন্দরমহল। আর সেই সুযোগে, পর্দানশিন পরিবারের অন্ধকার আড়াল থেকে একাধিক চরিত্রকে তিনি টেনে এনেছেন পাঠকদের সামনে, তাদের শারীরিক এবং মানসিক গড়ন-গঠনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে। বঙ্কিমের উপন্যাসে গান শুধু ভালোবাসার দূতী নয়, অনেক ছল-চাতুরি, অনেক গোপন ষড়যন্ত্রেরও অগ্রদূত।

গানের আসর মানিক বন্দোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই। কখনো তা উন্মোচিত করছে গোষ্ঠীজীবনের খোলামেলা আবেগ, কখনো ব্যক্তিজীবনের রাখা-ঢাকা সংগোপন আকাঙ্ক্ষা।

মনে এসে যায় দুটো বিদেশী উপন্যাসের নামও। হাকসলির 'পয়েন্ট কাউন্টারপয়েন্ট', টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন'। 'পয়েন্ট কাউন্টার-পয়েন্ট'-এ বাখ্ শুনতে শুনতে ফ্যানি লোগান-এর মনে হচ্ছে, কি করুণ, অথচ সুন্দর আর হৃদয়-জুড়নো এই সুর, যার অপ্রতিরোধ্য স্রোত বয়ে চলেছে তার অস্তিত্বের জটিল-জটিলতর তন্তুজাল ভেদ করে। এই সুর তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে দু-বছর আগের মৃত স্বামীকে। মনে পড়ছে স্বামীর যৌবন-কালের সমস্ত সচল স্মৃতিচিত্র। স্বামীর অকাল মৃত্যু, অসুস্থতার যন্ত্রণা,

তার জীবনের প্রতি আসক্তির দৃশ্য ছবি হয়ে উঠছে এর সুরের পরশ পেয়ে, ফ্যানির চোখে জল, মনে বিষণ্ণতা। তার মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীটাই কী করুণ আর বেদনার্ত। কিন্তু তারপর—

'and from the depths of that sadness it was able to affirm—deliberately, quietly, without protesting too much—that everything is in some way right, acceptable.'

বাথ, ফ্যানি লোগানকে জানিয়ে দিল—'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানিগো জানি তাও হয়নি হারা'।

মানের তেমন কোনো গল্প-উপন্যাস খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে কোনও না কোনও ভাবে উত্থাপিত হয়নি সংগীতের প্রসঙ্গ। আর তাঁর রচনাভঙ্গি সম্পর্কে যখন বলা হয় যেন ভাগনারের ভরাট ভারি অর্কেস্ট্রা, তার কারণও আমরা বুঝি। তাঁর 'ম্যাজিক মাউন্টেনে' সম্পূর্ণ দুটো অধ্যায় রয়েছে সংগীত-বিষয়ে। 'পলিটিক্যাল সাস্পেক্ট'-এ রয়েছে সংগীতের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক। 'ফুলনেস অফ হারমনি'-তে রয়েছে সংগীতের সারমর্ম। ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন লেখেন—

'সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কি-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পারস্পেকটিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না··· সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ-নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।'

মানও সেইভাবে জানেন সংগীতকে। আর এই জানাটাকেই আরও ঝালিয়ে শক্ত করে নেবার তাগিদেই খুঁচিয়ে প্রশ্ন তোলেন নানাবিধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ফুলনেস অফ হারমনি'-তে এসে তাঁর নায়ক জড়িয়ে পড়ে সংগীতে, আগে পায়নি এমন এক মুক্তির স্বাদে আলোড়িত হয়ে ওঠে তার দিন-রাত্রি।

নিজের নাটকে, গীতিনাট্যে দয়ালু সম্রাটের মতো গানের শেষ পারানির কড়িটি পর্যন্ত নিঃশেষে দান করতে পারেন যিনি, উপন্যাসের বেলায় তাঁর উদাসীন ভঙ্গি দেখে আমাদের যে খেদোক্তি, তাকেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে পারিনা বেশিক্ষণ, যখন দেখি সুর-বসানো নিজের গানের ঘাটতি তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন কোনো কোনো উপন্যাসে গান এবং সুরের

প্রসঙ্গের আশা-যাওয়াকে অবারিত করে দিয়ে। তখনই আমাদের মনে পড়ে যায় 'ঘরে বাইরে'-র নিখিলেশের আর্তি—'আমি কেন গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিলমিল করছে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্‌ করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিকচিকিয়ে উঠছে—এই শরতের প্রভাত-সংগীতে আমিই কেবল বোবা। আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ...'

অথবা

'প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহের বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম।...আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়। জীবনে মিলন-সংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে।'

মনে পড়ে যায় শ্রীবিলাসের অভিজ্ঞতা—

'অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে; 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।'

অথবা

'বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে। এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন।'

কিংবা

'কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই।'

আর এই 'চতুরঙ্গ'-ই শচীন যখন তোলে গানের প্রসঙ্গ, তখন তা মিশে যায় এক বৃহৎ সত্য-সন্ধানের আকুতিতে।

'গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবেই তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।'

এ-বইয়ের চতুর্থ প্রবন্ধ 'আপনা হতে বাহির হয়ে'-র আলোচনা-সূত্র 'চতুরঙ্গ'-কে কেন্দ্র করেই। প্রবন্ধের আরম্ভেই শঙ্খবাবু উদ্ধৃত বা উপস্থিত করেছেন রিল্‌কে-র এমন এক উক্তি যার সঙ্গে শচীশের কথার মিল যেন যমজ ভায়ের মতো। রিল্‌কে তাঁর এক চিঠিতে লিখছেন—

'আমাদের মুখ আর দেবতাদের মুখ যেন তাকিয়ে আছে একই দিকে; হয়ে আছে এক। আর তাই যদি হলো, ঈশ্বরের সামনে ছড়ানো এই মহাশূন্য থেকে কি ভাবে তবে আমরা এগোব তাঁর দিকে?'

আর শচীন বলছে—

'যে মুখে তিনি আমাদের দিকে আসিতেছেন, অমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি উল্টা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।'

শঙ্খবাবুর এই প্রবন্ধের যেটুকু অংশ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই শুধু, সেখানে যেন খুঁজে পাই এক নতুন দরজা, যার ভিতর দিয়ে মানুষের সবচেয়ে নিবিড়তর এবং জটিলতর আত্মানুসন্ধানের যজ্ঞের আগুনের কাছাকাছি এসে যাই আমরা, বাইরে থেকে টাঙানো কুয়াশার, বোঝা-না-বোঝার ধূসর আস্তরণ ঠেলে।

অভুক্ত দামিনী যখন খাবারের থালা হাতে শচীশের খোঁজে হাঁটুজল ভেঙে নদী পার হয়ে এপারে এসে পৌঁছয়, যেখানে—

'চারিদিক ধু ধু করিতেছে; জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই।...যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন এক সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদা...। পায়ের তলায় পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।'

'চতুরঙ্গে'-র শেষ পর্বে শচীশকেও মনে হয় এমনি ফ্যাকাশে। তাকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন আমাদের। তারও শুষ্ক জিহ্বা ঠিক কার দিকে মেলে ধরেছে মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত—জানতে পারি না। আমাদের প্রশ্নমালাকেই শঙ্খবাবু তাঁর প্রবন্ধে সাজিয়েছেন এইভাবে—

'যদি আমরা ধরে নিই যে 'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' বলতে বলতে শচীশ যে অন্ধকার নদীর পাড়ির দিকে চলে গেল, এ যাওয়া এক সংসারবিহীন শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ারই মতো, যদি 'অরূপের মধ্যে ডুব' দেবার এইটুকু অর্থই আমাদের মনে থাকে, তাহলে এতো লীলানন্দ স্বামীর আখড়ার শচীশের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়।'

এর চেয়ে 'যোগাযোগে'র কুমু-মধুসূদনকে বুঝে ওঠা অনেক সহজ।

৪.

'যোগাযোগ'-কে নিয়েই এ বইয়ের নাম-প্রবন্ধ। 'যোগাযোগ' রবীন্দ্রনাথের সেই উপন্যাস, যেখানে গান হয়ে উঠেছে জীবনের সংকট আর জীবনের মুক্তির মাঝখানে পারাপারের এক সেতু। কুমু-বিপ্রদাসের মধ্যে এসরাজের সরু তারের মতো টান-টান ভালোবাসা, কুমু-মধুসূদনের মধ্যে বিরোধ-ব্যবধানের টান-টান উত্তেজনা, কুমুর নিজের বাইরের সঙ্গে ভিতরের সত্তার মধ্যে আত্ম-সম্মান বনাম আত্মসমর্পনের যে টান-টান দ্বন্দ্ব, সব কিছুকেই উত্তরণের পথে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় গান। কীভাবে দেখায়, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শঙ্খবাবু অবশ্যই যোগ করেছেন এমন এক মাত্রা, যা আমাদের এতকালের ধরা-বাঁধা চিন্তার কাছে প্রায় নতুনের মতো।

১. 'ভালোবাসার সমস্যা নিয়েই গড়ে উঠেছে 'যোগাযোগ', কিন্তু চরিত্র-গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে—ঘটনার গুরুতর মুহূর্তগুলিতে—সুরের প্রসঙ্গই যেন জায়গা নিয়ে থাকে অনেকখানি। একদিকে মধুসূদনের স্লিগ্ধ আবেষ্টন, আর অন্যদিকে সেই সংকীর্ণ বন্ধন থেকে কুমুর বেরিয়ে আসবার তাড়না, দুই চরিত্রের এই বিপরীত ধর্ম প্রতিষ্ঠার একটা বড় উপায় এখানে হয়ে ওঠে তাঁর গান বা সুর।'

২. 'কিন্তু এ-সুর কোথায় পৌঁছে দেবার জন্য? শেষ দিনের এই ভৈরোঁ আলাপের পর বিপ্রদাস বলেছিল তার ধর্মের কথা, বলতে গেলে যা ফুরিয়ে যায়, তবু যা আজ সে বলে কুমুকে : 'তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই, আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে ; তার নাম দিতে পারি নে।' তখন আমাদের মনে পড়ে যে কেবল এই শেষ দিনেই নয়, এ উপন্যাসে যখনই সুরের কথা গানের কথা আসে, তখনই তার সঙ্গে আতত হয়ে আসে এক ধর্মেরও কথা।'

৩. 'ভালোবাসতে পারা-না-পারার এই সমস্যাই 'যোগাযোগে'র কেন্দ্রীয় সমস্যা, কিন্তু সে কথা বলবার জন্য এখানে কেবলই আসে ধর্মের কথা আর গানের কথা। সমীকরণের এই ধারণাটা স্পষ্টই পেয়ে যাই তেতাল্লিশ পরিচ্ছেদের এই লাইনটিতে যখন কবি জানান : 'প্রথম যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে।' পূজা আর প্রেমের মধ্যে সেতু তৈরি করতে চায় তার গান, তবু পারে না যে শেষ পর্যন্ত, এই নিয়েই 'যোগাযোগে'র কুমু।'

এই সূত্রেই শঙ্খবাবু চলে আসেন রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' আর 'প্রেমে'র গানের তুলনামূলক আলোচনায়, যার নানা স্তর পার হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত—

'পূজা আর প্রেম এই দুই শ্রেণীর বাইরে যেন কল্পনা করে নেওয়া যায় তৃতীয় আরেকটি শ্রেণী, যাকে বলি ভালোবাসার গান। আত্ম-আবরণ মোচনের প্রবল বেদনায় মথিত হয়ে উঠে এই গানগুলি দাবি করে আমাদের সমস্ত সত্তা, আর তখন মনে হয় এর চেয়ে বড়ো মন্থন, এর চেয়ে বড়ো প্যাশন বা বাসনার তাপ আর যেন নেই আমাদের অভিজ্ঞতায়। পুরুষ ও নারী পরস্পরকে নিয়েই এই তাপ ; কিন্তু কেবলই পুরুষ আর নারী নয়। আমি আর আমার ভিতরে-বাইরে ব্যাপ্ত এক না-আমি, অর্থাৎ তুমি, এ দুয়ের মধ্যে এক নিবিড় বেদনা-সম্পর্ক জাগিয়ে তোলে গানের সেতু।'

যদি গানের ভিতর দিয়ে তাকাই তাহলে কুমু-মধুসূদনের সংকটকে যে কিছুটা সহজেই বুঝতে পারি, তার কারণ ঐ উপন্যাসেই অজস্র ইঙ্গিত-ইসারা ছড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—গানের সূত্রেই। কিন্তু 'চতুরঙ্গে' গান নেই, গানের উপমায় কিছু সংলাপ আছে মাত্র। শচীশের মতো দিশেহারা চরিত্র শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামছে তা বুঝতে গেলে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস থেকে আমরা খুঁজে পাইনা কোনো নির্দেশ বা সংকেত। আমাদের বোবা করে রাখে এই রকম একটা উজ্জ্বল চরিত্রের এমন বিপথগামিতা এবং ধোঁয়াটে আচরণ। এইভাবে যখন মনে হয়েছিল আর কোনোদিন অজ্ঞাতবাস থেকে শচীশ ফিরে আসবে না আমাদের উদ্দীপ্ত ভাবনায়, তখনই শঙ্খবাবু যেন এগিয়ে দিলেন একটা চাবিকাঠি, শচীশকে ফিরে পাওয়ার জন্যে খুলতে হবে যে-দরজা, তারই। আর সেই চাবিকাঠির নামও, রবীন্দ্রনাথের গান।

'চতুরঙ্গের প্রায় সমকালে লেখা চলছিল 'গীতালি'-র গানগুলি। মনে প্রশ্ন জাগে, 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত কবির যে-আত্মসন্ধান আর আত্মপ্রতিষ্ঠা চলেছে, তার সঙ্গে শচীশের এই ইতিহাসের কোনো সমধর্ম কি নেই ?'

এই প্রশ্ন নিয়ে এগোতে গিয়ে শঙ্খবাবু পেয়ে যান অনেক উত্তর।

১. 'দূরবর্তী কোনো তুমির সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে শচীশ যেমন বুঝে নিচ্ছিল অস্তিত্বের মানে, সেইরকমই এক সংলাপে ভরে আছে 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি'।'

২. 'গীতাঞ্জলি'-তে ছিল আমির দিকে তুমির চলা, 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে', আর 'গীতালি'-তে তুমির দিকে আমি, কেননা

এখানে এসে 'আমি নিত্য পথের পথী'। তা যে হতে পারল তার কারণ, এদের মাঝখানে 'গীতিমাল্যে' দুয়ার গিয়েছিল ভেঙে, তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে আমির ঘরে, আমিরই মধ্যে তাই, 'সবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি / সেই তো আমার তুমি' এই বোধের পূর্ণতায় এসে পৌঁছল 'গীতালি', যেমন লুকানো এক ঐশ্বরিক বোধকে বুকে নিয়ে একদিন কাজের জগতে পৌঁছে গিয়েছিল 'চতুরঙ্গে'র শচীশ।'

এই প্রবন্ধেই শঙ্খবাবু আমাদের নজরে এনে দিলেন যে, শচীশ হারিয়ে যায়নি হতাশায়, শেষ পর্যন্ত সে পৌঁছে যেতে পেরেছে এক সংগত চৈতন্যে, আর তারই নাম কাজ। আর সেই সঙ্গে এও নতুন করে জানিয়ে দিলেন তিনি, কীভাবে পড়তে হবে 'চতুরঙ্গ'কে, যদি বুঝতে চাই—শচীশের জীবনের শেষ পরিণতি।

'অনেক সময়ে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় যে এ-উপন্যাসের আছে এক শঙ্খিল (spiral) গড়ন, একবার পিছনে এসে একবার সামনে এগিয়ে চলেছে এর গল্প। 'দামিনী খণ্ডের পরিশিষ্টে আভাসে বলা আছে ঘটনার পরিণতিপর্ব, পরে 'শ্রীবিলাস' খণ্ডে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ফেলে-আসা পুরনো কথা।... ঔপন্যাসিক গড়নের এই বৈশিষ্ট্যের মাঝখানে, 'দামিনী' খণ্ডেই, জরুরি একটি কথা বলা ছিল সন্তর্পণে: 'সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের ঝাঁজ আর নাই।'... শচীশের 'অরূপের মধ্যে ডুব' তার কাজের সংসারের ডুব।'

যদিও শচীশের কাজ কার সঙ্গে, কোথায় এবং কোন ধরনের তার উত্তর 'চতুরঙ্গে' অনুক্ত, তবুও অনেক মৃত্যু-অভিজ্ঞতায় পূর্ণ, অনেক ধর্মীয়-সংঘাতে দীর্ণ শচীশ যে শেষ পর্যন্ত কাজকেই করে নিল তার জীবন-সন্ধানের সার্থক গবেষণাগার, শঙ্খবাবুর বিশ্লেষণ এই বলিষ্ঠ প্রত্যয়টুকুকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন নতুন করে। রবীন্দ্রনাথ এবং শচীশ দুজনেই আলোকিত হয়ে ওঠে, আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যের ধোঁয়াশা ঠেলে।

৫

পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, এ-বইটির আত্মাটুকুই শুধু গান, শরীর নয়। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, মূল কাণ্ডটা গান, ডালপালা

ফুলফল জুড়ে অন্য বিষয়। গানকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতা, নাটক, উপন্যাস, চিঠিপত্র অর্থাৎ সমগ্র সাহিত্য, আবার সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তাঁর সমগ্র জীবনপর্ব, এইভাবে এ-বইয়ে চলেছে এক বৃত্তাকার প্রদক্ষিণ। ভিন্ন এক ভ্রমণ-কাহিনী যেন, কবির ভুবনে। এ-বইয়ের আভাসটুকুই দেওয়া যায় কেবল, সর্বস্বকে উন্মোচন করে দেখানো অসম্ভব। কেননা এর প্রত্যেকটি পাতাই যেন এক একটি মোহানা, যেখানে এসে মিশে যাচ্ছে দেশ-দেশান্তরের নানা রঙের, নানা ভাবনার নদীস্রোত, মিশে গিয়ে ভরে উঠছে পরিপূর্ণ এক কল্লোলে। আবার এ-বই এমনও নয় যে, অন্য সব কিছুকে বাদ দিয়ে যিনি উপভোগ করতে চান শুধু গানেরই শিল্পস্বাদ, উপবাসী থেকে যাবেন তিনি।

মধ্যযুগে গ্রন্থকে ভাবা হত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ডিভাইন কমেডির প্যারাডিসো বা পারাদিজো খণ্ডের শেষে তাই লিখেছিলেন দান্তে—

'আমি তার অন্তরতম গভীরে দেখলুম বিশ্বের সব
ছড়ানো পাতা জড়ো, প্রেমের মধ্যে বাঁধা একটি বইয়ে।'

(অনুবাদ : চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়)

আমরা যদি এই স্তব থেকে 'প্রেমের মধ্যে' শব্দটিকে বদলে দিয়ে লিখি 'গানের মধ্যে', তাহলে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে জানানো হয়ে যায় আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, আর শঙ্খবাবুর এই অসামান্য বইটির প্রতি আমাদের নমস্কার।

তিলোত্তমার রসায়ন

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তিলোত্তমাশিল্প। কুমার রায়। প্যাপিরাস, কলকাতা ৪। ১১৮০

আমাদের ভাষায় সামান্য কিছু পাঠযোগ্য ও গাদা গাদা অপাঠ্য নাটক লেখা হলেও নিছক নাট্য ও অভিনয় শিল্পের ওপর লেখা বই-এর সংখ্যা দুটো আঙ্‌লের কর গুনতেই ফুরিয়ে যায়। ফলে সম্বল হয়ে ওঠে বিদিশি বই-পত্তর। তাই কুমার রায়ের মতো বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য-পরিচালককেও আরিস্ততল, প্লাতো থেকে স্তানিস্লাভস্কি, ককর্ল্যা ঘুরে লেভি, উইলেট পর্যন্ত উজিয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

মঞ্চাভিনয়ের আধুনিক ক্ষেত্রে জাপানি, ফরাশি, রুশ, জর্মন বা ইংরেজদের মতো আমাদের কোনো ঐতিহ্য নেই। বাংলা থিয়েটারের বয়স সবে একশো পেরিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানে আমাদের নাট্যকারের সংখ্যা এই একশো বছরে একজনই, রবীন্দ্রনাথ; নাট্য-নির্দেশক বা পরিচালক, জনাদুই, শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শম্ভু মিত্র; প্রয়োগবিদ, সতু সেন ও খানিকটা তাপস সেন (পটলবাবু বা দিনশা ইরানির মতো মঞ্চ-'ঐন্দ্রজালিক'-কে নিশ্চয় প্রয়োগবিদ বলা যাবে না)। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দানীবাবু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদিনী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, প্রভা দেবী, সরযূ দেবী ও তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ শ্রুতকীর্তি ও মহৎ অভিনেতা-অভিনেত্রী আমাদের শোনা, সামান্যই দেখা। অনেকে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারেন। তাতে ওপরের তালিকাটিকে বরং আরো হ্রস্ব বা ছিমছাম করার সুযোগ এসে যেতে পারে।

এমনই অর্বাচীন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কুমার রায় তাঁর 'তিলোত্তমাশিল্প' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে গত [illegible] বছর নাট্যশিল্প ও অভিনয়শিল্প নিয়ে যেসব প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন সেগুলির কয়েকটি ও কিছু নতুন লেখার সংকলন এই বইটি। [illegible] গুলিকে তিনি সাজিয়েছেন এভাবে—তিলোত্তমা শিল্প, নাট্য / শিল্প / [illegible] / সত্তা, [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] অভিনেতার [illegible]

একজন 'প্রডিউসার ইনস্ট্রাকটার'-এ। বাস্তবনিষ্ঠ স্বাভাবিকতা নিয়ে কাজ করতে করতে সেই স্বাভাবিক সত্যের সীমাবদ্ধতা কেমন করে তাঁকে ক্লান্ত করে তোলে। মরিয়া হয়ে নতুন পথের আঙ্গিকের সন্ধান করতে করতে কিভাবে আর-এক বাস্তবতার কাছে অধিকতর প্রেরণা পেতে চলে আসেন তিনি—যে-বাস্তবতাকে তিনি আখ্যা দেন **'refined and deeper realism'** বলে। আর এখান থেকেই স্তানিস্লাভস্কি-র পরিণত সাধনার সৃজনশীল বিকাশ ঘটাতে থাকেন ব্রেখট। অন্তর্দানে অসমর্থ এক্সপ্রেশনিজম ও ক্লাসিসিজমের বদলে নতুন নাট্য-দুনিয়ার হাতে চলে আসে ব্রেখট-এর বিখ্যাত বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব। অবশ্য এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েও লেখক বস্তুত ব্রেখট-এর বক্তব্যকেই অনুবাদ করে দিয়েছেন।

'নাট্যনির্দেশনার বিবর্তন' প্রবন্ধটি আরও বিস্তারিত হলে সাধারণ পাঠক বেশি উপকৃত হতেন। কুমার রায় এখানে আঁতোয়া, স্তানিস্লাভস্কি, আপ্পিয়া, ক্রেগ, রাইনহার্ট, মায়ারহোল্ড, জাক কোপো ইত্যাদি বিখ্যাত পরিচালকের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্তানিস্লাভস্কি ও ক্রেগ ছাড়া অন্যান্য নির্দেশকদের প্রযোজনা-স্বাতন্ত্র্য কোথায় ছিল, তা নিয়ে উপযুক্ত আলোচনা করেন নি। আমেরিকায় নব্যনাট্য আন্দোলনের অবিসংবাদিত জনক রিচার্ড বলিস্লাভস্কি সম্পর্কে লেখকের সম্পূর্ণ নীরবতার কারণ আমার বোধগম্য হল না। ইউজিন ওনিলের নাটকগুলির পরিচালক রুবেন মেমোলিয়ন-ও লেখকের কলমে আসেন নি। তাছাড়া ম্যাক্স রাইনহার্ট-এর 'সামরিকবাদ', জাক কোপোর 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' আন্দোলন এবং গর্ডন ক্রেগের 'ব্লক থিয়েট্রিক্যাল' রীতি নিয়েও এই অধ্যায়টিতে তাত্ত্বিক আলোচনার সুযোগ ও কারণ ছিল। যে সমষ্টি-অভিনয় সমাজতান্ত্রিক ধারায় নাট্য-প্রযোজনার সম্পদ, মায়ারহোল্ড তাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন 'তিলোত্তমাশিল্প'-পাঠকদের কাছে তার বিবরণও দুর্ভাগ্যবশত অজানা রয়ে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূল্যবান উক্তিকে 'আবেগ ও বোধি' প্রবন্ধের একেবারে অন্তিমে উদ্ধার করেছেন লেখক। সেটি হল, 'শিল্পের মূলে রয়েছে নিছক প্রবৃত্তি নয়, বুদ্ধির দ্বারা ও রসবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি।' শিল্পচর্চায় এই সার কথাটিকেই প্রতিটি প্রবন্ধে তুলে ধরতে চেয়েছেন কুমার রায়, এবং এ-ব্যাপারে তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। প্রধানত এই কারণেই 'তিলোত্তমাশিল্প' প্রত্যেক নাট্যামোদীর অবশ্যপাঠ্য হওয়া

উচিত। দিদেরো-র অনুসরণে একান্ত সঠিকভাবে তিনি আমাদের যুগিয়েছেন একালের অভিনয় শিল্পের দিগদর্শনটিকে—

'একজন আবেগাপ্লুত অভিনেতা তার মঞ্চক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কখনই লক্ষ্য করতে পারে না।···কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে অভিনয় করে তবে সে হয়তো আমাদের নেশা ধরাবে, হয়তো সে একটি কি দুটি কিংবা তিনটি সুন্দর মুহূর্ত রচনা করতে পারবে, কিন্তু সেটাই কি সব! সুন্দর এক-আধটা মুহূর্ত অথবা সর্বাঙ্গসুন্দর একটি ভূমিকা—কোনটা শ্রেয়। ক্ষণিক উদ্ভাসন নয়, সমগ্র অনুভূতির অটুট আসন; একটি চরিত্রের আলো-আঁধারি, তার শক্তি ও তার দুর্বলতা, শান্ত এবং ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে সমতা রাখা, সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং দর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এসবই ঠাণ্ডা মাথার কাজ, গভীর বিচারবোধের কাজ, রুচির প্রয়োজন—প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের আর প্রচুর অভিজ্ঞতার।'

একান্ত বিতর্কিত Paradox গ্রন্থের ফরাশি রচয়িতা দেনি দিদেরো-র অষ্টাদশ শতকীয় এই উক্তি কিন্তু বহু জল-ঝড়ের ভেতর দিয়ে অভিনয়-শিল্পে রসনিষ্পত্তির চূড়ান্ত কথা বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে। এই সত্যটিকেই যে যার মতো পোশাক পরিয়ে উপস্থিত করেছেন—তা তিনি রবীন্দ্রনাথ, ব্রেখট বা আয়োনেস্কো-ই হোন, অথবা 'তিলোত্তমাশিল্প' গ্রন্থের লেখক কুমার রায়-ই হোন।

অভিন্নের খোঁজে

রাম বসু

সত্যজিৎ রায় : ভিন্ন চোখে। সম্পাদনা শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায়।
অজন্তা পাব্লিশার্স, কলকাতা ৫। ১৯৭৯

সিনেমা যেখানে বিশেষজ্ঞের বিষয় সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। যেখানে দর্শকের বস্তু সেখানেও আমি কুণ্ঠিত অতিথি। এ জেনেও 'সত্যজিৎ রায় : ভিন্ন চোখে' আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। বুঝেছি বলব না। কারণ বেশ কয়েকটি লেখা আছে যা ঐ বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে। তবু দু কথা লিখছি। কেন?

একটা বড় কৈফিয়ৎ আমার আছে, সেই-ই আমার ছাড়পত্র। কথাটা এই 'পথের পাঁচালী'র পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। সেই পঁচিশ বছর আগের স্মৃতি।

কফি হাউসে এক কাপ কফি প্লেট আর দুধের পাত্রে ভাগ করে খেয়ে কতক্ষণ বা আড্ডা দেওয়া যায়। তাই আমাদের আড্ডাখানার স্থান পরিবর্তন হল। তখন সিগনেটের পাশে গ্যারাজের মতো তিন দিক আঁটা একখণ্ড জায়গা ছিল। সেখানে হয়েছিল এক চায়ের দোকান। ঐ দোকানের লম্বা বেঞ্চে আমাদের নিয়মিত আড্ডা।

'পথের পাঁচালী' দেখানো হচ্ছে সবেমাত্র। কাগজে সমালোচনাও হয়েছে ভালমন্দ মিলিয়ে। ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা আসরের ধারে-কাছেও নেই। সাধারণ দর্শকদের মধ্যে হুলস্থুলও পড়ে যায় নি। প্রাজ্ঞজন, বেশ হয়েছে, নতুন কিছু একটা, কয়েকটা শট্ খুব ভাল ইত্যাদি বলে দায় সারছেন। এই অবস্থায়, আমার যতদূর মনে আছে, সম্ভবত সন্দীপন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বেমক্কা বলে বসল, আমরা সত্যজিৎ রায়কে সংবর্ধনা দেব। যতদূর মনে আছে, সন্দীপনরা তখনও ইউনিভারসিটি ছাড়ে নি। ফলে সেনেট হল পাওয়া, ইউনিয়ন অফিসে চা-খাওয়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি করা খুব সহজেই সম্ভব হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন উঠল কারা সংবর্ধনা দেবে? একটা সংগঠন তো চাই। ওখানেই সংগঠন হয়ে গেল। নতুন লেখকদের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা

জানানো হবে। সেই সংগঠনের সভাপতি আমাকে করা হল। কারণ আমি ছিলাম ওদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

বিনা দ্বিধায় বলা যায় যখন পশ্চিমবাংলা পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে শিরোপা দেয় নি, তখন কয়েকটা বাউণ্ডুলে তরুণ যাদের অনেকেই বড় বড় এস্টাবলিসমেন্টের কাছে তখনো মাথা বিক্রি করেনি, সাধ্যমত বিদ্রোহী ও নন-কনফরমিস্ট থাকতে চেষ্টা করছে, তারা, হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ নিয়ে, নিজেদের সব সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা জেনেও সত্যজিৎ রায়কে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছিল। আমি বলব না, তারা সিনেমার ভাষা বুঝে, সিনেমার ভাষায় সত্যজিৎ রায়ের অনন্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে ঐ আয়োজন করেছিল। তারা প্রাণের দাম দিয়ে তখন সাহিত্য-শিল্পকে ভালবাসতে চেষ্টা করছে। 'পথের পাঁচালী' তারা দেখেছিল, মুগ্ধ হয়েছিল। সেলুলয়েডের ওপর একটা নিটোল কবিতা স্পর্শ করেছিল। এই ভালো লাগা তাই অতি সত্য, অতি আন্তরিক, তাৎক্ষণিক। ইনটেলেকচুয়াল রেশনালাইজেশন নয়। যাক গে, 'সত্যজিৎ রায় : ভিন্ন চোখে' সম্পর্কে লেখার অধিকার আমার ঐটুকুমাত্র। তাই যে কথা বলব তা বিশেষজ্ঞের কথা নয়, নিতান্তই একজন মামুলি পাঠকের কথা। এবং যেহেতু বইটা সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তাই পাঠকজনেরও মতামত থাকতে পারে।

প্রথম প্রবন্ধটি প্রথমেই মুগ্ধ করে। 'শিল্পী সত্যজিৎ রায় ও নান্দনিক মুদ্রণ'। লিখেছেন পরিতোষ সেন। চমৎকার ঝরঝরে গদ্য। কোথাও আড়ষ্টতা নেই। বাজে ও ধোঁয়াটে তত্ত্বের অশোভন আস্ফালন নেই। দরকার হয়নি। কারণ যা বলতে চান তা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। সুতরাং ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের অনন্যতা কোথায় তা সাধারণ পাঠককে অতি সহজেই বোঝাতে পারেন এবং তাদের সম্মতিও আদায় করে নেন। তখনই যেন চোখের ওপর আবার ভেসে ওঠে ক-বছর আগে আমাদের বই-এর নোংরা চেহারা।

ঐ রকম আর একটি প্রবন্ধ হল অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালীতে দুর্গার মৃত্যু সিকোয়েন্স : একটি বিশ্লেষণ'। ফিল্মের ভাষায় ফিল্মের বিশ্লেষণের চেষ্টা। পাঠককে নিশ্চয়ই প্রস্তুত করে আরও গভীর ভাবে মেঘ বৃষ্টি ঝড় ও গণেশের তাৎপর্য বুঝতে। অতি-পরিচিত ছবিকেও নতুন ভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। লেখকের সঙ্গে সায় দিয়ে, অবশ্য জিজ্ঞাসার চিহ্ন বাদ দিয়ে বলা যায় যে গণেশের মূর্তি নিতান্তই 'পারিবেশিক

ডিটেল'। শ্রীচট্টোপাধ্যায় গণেশের মূর্তি এবং হাতীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা পরিচালকের মনে যদি নাও থাকে, ক্ষতি নেই। ঐ ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে ছবি দেখতে ভালই লাগবে। দর্শক সমৃদ্ধ হবেন।

এই জাতের আর একটি প্রবন্ধ অরুণকুমার রায়ের 'সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য'। এই সঙ্গে তিনি জানান সত্যজিৎ রায় ছাড়া 'ভারতবর্ষ কেন সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রে একই সঙ্গে এত বিভিন্ন ভাবনার চলচ্চিত্র কেউ নির্মাণ করেন নি।' এই দাবি যদি সত্যি হয় তবে নিশ্চয়ই আমরা গর্বিত।

প্রমথেশ বড়ুয়া এবং এই রকম দু-চার নমস্য ব্যক্তি ছাড়া সত্যিকারের আগ্রহী ও মেধাবী পরিচালক আমাদের ছিলেন না। তাই অকস্মাৎ সত্যজিৎ রায়ের আগমন আমাদের কাছে সঙ্গত কারণেই মনে হয়েছিল আবির্ভাব। এবং সেই কারণে লেখাগুলিতে ভক্তির প্রাবল্য থাকাও স্বাভাবিক। নই-পুলের কর্কশ কথা যখন বাইরে প্রায় দাগ কেটে বসছে যে আমরা হলাম 'ফিফথ রেট ইনটেলেকচুয়ালস ডিলিং উইথ থার্ড রেট মেটিরিয়ালস্' তখন সত্যজিৎ রায় ইয়োরোপে অন্তত একটা ক্ষেত্রে আমাদের উজ্জ্বল পরিচয় দিলেন। এইক্ষেত্রে নিতান্তই নিরাসক্ত বিচার অপ্রত্যাশিত। তাই ওটুকু উচ্ছ্বাস সঙ্গত বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। তবু অরুণকুমার রায় যখন বলেন, 'কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সংলাপের ভাষা অতি সাধারণ, অথচ বিভিন্ন অর্থের' তখনই মন বলে—যথা?

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আগে অধ্যাপক ছিলেন। এখন নন। তবু অভ্যাস যায় নি। জাত-অধ্যাপকরা যা করেন—ক্লাস আরম্ভ হবার বহু পরে ঢুকে ঘণ্টা বাজার আগেই চলে যান। ঐ পনেরো কুড়ি মিনিটে যা দেন তাই-ই অনেক। 'সত্যজিৎ রায়: তথ্য চিত্র' শমীকের প্রবন্ধ। খুব ছোট। কিন্তু খুব ভালো। তথ্য চিত্র তো আর ফিচার ফিল্ম নয়। তাই লেখাও ছোট।—হেসে এই উত্তরও কেউ দিতে পারেন। 'বালা' সম্পর্কে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন, এখন মনে হচ্ছে তা খুবই সঙ্গত।

সংকলনের আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হল শুভেন্দু দাশগুপ্তের 'সত্যজিৎ রায়: নিজের কথায়'। বিভিন্ন কয়েকটা সাক্ষাৎকার-এর মধ্য দিয়ে মানুষটির ভাবনা-চিন্তা-চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকে এক জায়গায় রাখার একটা চেষ্টা; এই হল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপজ্জনক। নির্বাচন সঠিক ও প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে 'মানুষটার' চেহারা যা নয় তাই-ই হয়ে যেতে পারে আংশিক নির্বাচনের ফলে। আমার আশা তা হয় নি।

রজত রায়ের 'ধর্মীয় সংস্কার ও সত্যজিৎ-মানস' অতি কথনের দায়ভাগে পীড়িত। মানানসই বীরপনা। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য, সত্যজিৎ রায় সুযোগ পেলেই হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (যাকে বলা হয় ধর্মীয়) কুসংস্কারকে আক্রমণ করে দর্শককে মোহমুক্ত করার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করেছেন।

এই বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি আরম্ভ করলেন ধর্মের উৎপত্তি থেকে। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির এনথ্রপলজিক্যাল ব্যাখ্যা তো একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। এঙ্গেলস থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ধর্ম শোষণ ও শ্রেণী শাসনকে আচ্ছাদিত করে। এঙ্গেলস এই কথা বলেছেন। আবার এঙ্গেলসই তো বলেছেন ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিরল-সৌভাগ্য হল এই যে প্রায়শই তাদের নিজস্ব চিন্তার ঝুঁকি নিতে হয় না। তাদের চিন্তার সিংহভাগটা সাধারণত করে দেয় সাহেবরা বিদেশী জার্নাল আর বই-এর আমদানিকাররা। ধর্ম বলতে মার্কস-এঙ্গেলসের সামনে ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম। হিন্দু ধর্ম আর খ্রীষ্টধর্ম সম-গোত্রীয় নয়। ওদের সাংগঠনিক রীতি আর আমাদের সাংগঠনিক রীতি এক নয়। এই সব বিভিন্নতা তার গুরুত্ব ও সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া আমাদের চোখে পড়ে না। যাকে 'ধর্মীয় কুসংস্কার' বলছি তার সঙ্গে ধর্ম কতটুকু যুক্ত, কেন ও কবে থেকে যুক্ত হল এই সব নানা রকম প্রশ্ন থাকে।

আবার যাকে কুসংস্কার বলে আক্রমণ করছি, তা অনেকের কাছে, বিশেষ করে অরক্ষিত মানুষের কাছে, রক্ষা কবচ ও তার আশ্রয়। মার্কস-এ এই উক্তিরও সমর্থন পাওয়া যাবে। অতিকায় দৈত্যের মতো ক্ষমতা রাষ্ট্রের। অর্থনৈতিক শক্তির নাগপাশ গোপন ও প্রচ্ছন্ন। এই মারাত্মক শক্তির কাছে ভিন্ন মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে অরক্ষিত, অসংগঠিত, মানুষ নিঃসঙ্গ ধূলিকণা। এই কুসংস্কার তখন তার কাছে সেফটিভালব্। মনের এই বাঁধ ভেঙে গেলে এবং অন্য বিজ্ঞানসম্মত বাঁধ তৈরি না হলে, সে মানুষ মনের রোগে মরবে। আজকে যে মনোরোগীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে, তার অন্যতম বড় কারণ হল এই আত্মিক শূন্যতা। এক বিশ্বাস নষ্ট করেছি, কিন্তু অন্য বিশ্বাস গড়ি নি। সেকালের মিশনারিরা যা করত তা একালের মিশনারিরা করে না, অবশ্য ভিন্ন কারণে। যাই হোক উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত না করে অসহিষ্ণু আক্রমণ কুসংস্কারকে দূর করে না। হয় তার শিকড় আরও দৃঢ় করে; না-হয় মানুষ নেমে আসে

সিনিসিজম বা হেডনিজম-এ। একটু নিবিড়ভাবে 'সত্যজিৎ রায়ঃ নিজের কথায়' পড়লে দেখতে পাবো যে সত্যজিৎ রায় নিজেই এই রকম অযৌক্তিক হয়তো বা পরস্পরবিরোধী ধারণার আড়ালে নিজের সেফটি ভালব তৈরি করে নিয়েছেন। এবং এ সেই সত্যজিৎ রায় যিনি 'ক' 'খ' নন, সংখ্যা-গণিতের অঙ্ক নন, আমাদের গণতন্ত্রে শুধুমাত্র ভোটার নন। এই সত্যজিৎ রায় ক্ষমতার উৎসের এবং বামপন্থী এসট্যাবলিশমেন্টের খুব কাছের মানুষ। মানুষ হিসাবে তিনি কোনমতে 'ইন-এডিকোয়েট' নন। তবু তাঁকেই সেফটি ভালব তৈরি করতে হয়েছে। কম বেশি সব মানুষকে তৈরি করতে হয় বাঁচার জন্য। তার মানে এই নয় যে আমি কুসংস্কার বজায় রাখার পক্ষপাতি। আমি শুধু বলতে চাই কুসংস্কার যাওয়া আর নতুন মানুষ হওয়া একটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চলে একই সঙ্গে। যাই হোক, মনে হয় প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে তিন পাতার ভূমিকার অঙ্গাঙ্গী যোগ খুবই সুদূর।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সত্যজিৎ রায় হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত কুসংস্কারকে আক্রমণ করেছেন—এই সাদাসিধে ও অনিবার্য সত্য রজত রায় মেনে নিতে অক্ষম। কেন? কারণ মারি সেটন জানিয়েছেন যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম বলতে যা বোঝায় সত্যজিৎ রায় তা কোনদিন নন। যেন, আচার আচরণে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম না হলে, পরিবেশগত সমাজগত, গোষ্ঠীগত ও পরিবারগত জন্মগত প্রভাব মনের তলায় ছাপ রেখে কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। প্রভাব কি এতই যান্ত্রিক ও বাহ্যিক?

সত্যজিৎ রায় কুসংস্কারকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি নিজে আত্মা, পরজন্ম, প্ল্যানচেট, প্যারাসাইকলজিতে বিশ্বাসী। কেন? রজত রায় উত্তর দেন না। শুধু বিস্ময় ও বেদনা বোধ করেন। আবার, সত্যজিৎ রায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। কিন্তু আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্ম-বাদকে জড়িয়ে না-ফেলার দর্শন আমাদের দেশে আছে, বিদেশেও আছে। তাই তিনি 'অটোনোমাস ম্যান' নন। এইসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মনে রেখে মারি সেটনের উক্তি এবং এঙ্গেলস-এর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে অনেক প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া দরকার যা এই প্রবন্ধে নেই। তবে আমি নিজে মানি, ছবির ক্ষেত্রে অন্তত সত্যজিৎ রায় রেশনালিস্ট। কিন্তু রেশনালিস্ট হলেই এথেইস্ট হতে হবে এমন কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। বাঁচতে গেলে মানুষকে কিছুটা ইররেশনালিটি পুঁজি করতে হয়, হবেও।

অরুণকুমার রায় সত্যজিৎ রায়ের সমালোচকদের তিনভাগে ভাগ

করেছেন্। একদল বলেন, সত্যজিৎ রায় যা করেন তাই-ই মহৎ। অন্যদল বলেন, সত্যজিৎ রায় যা করেন তাই-ই খারাপ। আর-একদল হলেন মার্কসবাদী। তাঁরা সত্যজিৎ রায়কে প্রগতিশীল প্রমাণ করার জন্য মরিয়া। ঐ দলের আর এক অংশ বলেন, সত্যজিৎ প্রগতিশীল, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, দ্বিধাগ্রস্ত ইত্যাদি। তবে আমি অরুণকুমার রায়ের সঙ্গে একমত—সত্যজিৎ রায় যা নন তাই প্রমাণ করার জন্যই এত বিপত্তি।

যাই হোক এই জাতের কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। লিখেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেশ্বর ভৌমিক, শীতলচন্দ্র ঘোষ। এই প্রবন্ধগুলির পটভূমি খুবই ব্যাপক। প্রাসঙ্গিক উক্তি ও উল্লেখের পরিসর বিরাট। আমাদের সমগ্র সংস্কৃতির দৃশ্যপটে সত্যজিৎ রায়ের অনন্যতা ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এঁরা। সংস্কৃতির সামগ্রিক অবস্থা, প্রসঙ্গস্থলে কার্যকারণ এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর কমিটমেন্ট ইত্যাদি বহু কথা এসেছে। বহু 'কনসেপ্ট' ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ অস্পষ্ট, অনেক সময় বিপরীতধর্মী বলেও মনে হয়েছে। আধুনিকতা, দু-রকমের সামন্ততন্ত্রের চরিত্র, উনিশ শতকের প্রসঙ্গ এবং তার মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে উক্তিগুলো বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া অন্তত আমার পক্ষে কঠিন। তাই এই প্রবন্ধগুলি আমি উল্লেখ করলাম শুধু। আবার ক্লাসিক পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে যে-সব উপন্যাস বা গল্প তার ওপর হাত চালিয়ে হেরফের করে দেওয়ার অধিকার পরিচালকের আছে কি না—সেই বিষয়েও সংশয় আছে। অনেক লেখক 'পরিচালকের ছবি' বলে ঢালাও স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাই হোক নানাবিধ প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে একথা বলা যায় সম্পাদকদ্বয় ভিন্নমতের প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে পাঠকদের কাছে এনে উপকারই করেছেন। পাঠকরা আশা করি চঞ্চল হবেন। আরও জানার জন্যে উৎসাহিত হবেন এবং এইভাবে নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই আসবেন। তাই অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যায় এই সংকলন মনোজ্ঞ।

ব্যক্তির স্বরলিপি

অজয় সিংহরায়

আমার কথা। আলাউদ্দিন খাঁ। অনুলেখক : শুভময় ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি।
রাগ অনুরাগ। রবিশঙ্কর। অনুলেখক : শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি।

'আমার কথা'—ভারতীয় সংগীতের প্রবাদপুরুষ স্বরোদিয়া ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র জীবন কাহিনী। তিনি যখন 'বিশ্বভারতী'-তে 'দিনেন্দ্র অধ্যাপক' হয়ে কাজ করছিলেন তখন তাঁর মুখনিঃসৃত এ-আত্মকাহিনী শুভময় ঘোষ ধরে রেখেছিলেন।

সর্বজনবিদিত এ-কাহিনীর ভেতর নতুনত্ব তেমন কিছু নেই। এ পুস্তক প্রকাশের পূর্বেই বহু লেখক খণ্ড খণ্ড কাহিনী হিসেবে, কিংবা সম্পূর্ণ কাহিনী হিসেবে, খাঁ সাহেবের জীবনী সর্বসাধারণ্যে পেশ করেছেন। তবুও এ পুস্তকটির বিশেষত্ব, খাঁ সাহেব যে-ভাবে যে-ভাষায় কথা বলেছেন তাকে ঠিক সেইভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনুলেখক শুভময় ঘোষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে সক্ষম হওয়ায় সাধারণ পাঠকের কাছে একটি মহৎ সংগীতজ্ঞের অনাড়ম্বর, উদার ও শিশুসুলভ সরল হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

পরিপূর্ণ সাধারণ বঙ্গসন্তান (যাঁরা তৎকালীন কুলীন ঘরানা-ওস্তাদদের কাছে শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়), 'নাগারচি' বংশসম্ভূত আলাউদ্দিন সংগীতপেশার জন্য মুসলমানদের মধ্যেও 'জলচল' ছিলেন না—শুধু নিষ্ঠা ও সাধনাবলে রাজগুরু এবং পরবর্তীকালে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তাঁর চরিত্রে মলিনতা লাগেনি। তিনি ছিলেন সেই মাটির কাছাকাছি মানুষ যিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্তর্নিহিত বাণীর মূর্ত প্রতীক। তিনি নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারতেন যে 'আমার জীবনই আমার বাণী'।

এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আলাউদ্দিন খাঁর ভারতীয় সংগীতক্ষেত্রে অবদানের কথা ওঠে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মীদের রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁদের ওপর পড়বে তেমনিই ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের

ক্ষেত্রে কোনো শিল্পীর বর্তমানে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা খাঁ সাহেব তাঁর সমসাময়িক যন্ত্রসংগীতশৈলীর বদ্ধ জলাশয়ে বহু নতুন আঙ্গিক ও রূপরীতির প্রাণসঞ্চার করে তাকে নানা প্রবাহে ব্যাপ্ত হবার সুযোগ দিয়েছেন।

এ হেন পুরুষের জীবনকথা শুধু সংগীতের ছাত্র কিংবা সংগীতপ্রেমিক কেন, মনে হয়, সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। তাছাড়া ভারতীয় সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী খাঁ সাহেবের শিষ্য ও জামাতা রবিশঙ্করের লেখা ভূমিকা এ পুস্তকের একটি মূল্যবান সংযোজন। স্বভাব নম্র ও বিনয়ী খাঁ সাহেব তাঁর আত্মকথা বর্ণনে বহু ঘটনা বাদ দিয়েছেন। রবিশঙ্করের ভূমিকায় তার অভাব অন্তত আংশিকভাবে হলেও পূরণ হয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা সাধক আলাউদ্দিন, সংগীত সম্রাট আলাউদ্দিন, সার্থক বঙ্গসন্তান আলাউদ্দিন ও সর্বোপরি মানুষ আলাউদ্দিনকে জানতে পেরেছি—যে পরিচয়ে তিনি জাতি, ধর্ম, ভাষার উর্ধ্বের আলাউদ্দিন।

পুস্তকটির সুন্দর প্রচ্ছদ সম্বন্ধে উল্লেখ না করলে প্রকাশকের প্রতি অন্যায় করা হবে। যে কটি চিত্র এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তা অত্যন্ত শিল্পবোধ-সম্পন্ন। প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ-এর ব্রোঞ্জ বাস্ট-এর প্রতিকৃতি অনবদ্য।

'রাগ-অনুরাগ' সেতারিয়া রবিশঙ্করের জীবনকথা। দেশে-বিদেশে সদা ভ্রমণরত রবিশঙ্করের আত্মকথা লেখার সময়-অভাবে তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্পাকারে যা বলেছেন তাকে রূপায়িত করেছেন অনুলেখক। এ লেখা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে বহু পঠিত, বহু আলোচিত, বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত হয়েছে। এতে সমসাময়িক কালের বহু সংগীতজ্ঞের কলাবৈশিষ্ট্যের কথা রবিশঙ্কর স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। এ হল 'রাগ'-এর অংশ। অনুরাগ অংশে তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু একান্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনে সুখ-দুঃখ, প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে জড়ানো সংগীতসাধনার কথা বলেছেন।

এদেশে বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন পর্যালোচনা সাধারণত যুক্তিনির্ভর হয় না। মনুষ্যজীবন ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ, সদাপতনোন্মুখ, প্রবৃত্তিনির্ভর। প্রলোভন ও ভীতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কে কতটা ভূমি আঁকড়ে থাকতে পারে তাতে তার চরিত্রের পরিচয়। এই হয়তো সুনীতি। কিন্তু, দুর্বলতা কোনো কোনো সময়

গ্রাস করতে সক্ষম হলে তাকে বড় করে দেখতে হবে এ চিন্তা ভুল। তাছাড়া শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞরা সাধারণ লোকের চাইতে অনেক তীক্ষ্ণতর অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। এবং নানাভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রায়শই তাঁরা বলি হয়ে যান। এ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে দহন-জ্বালা শিল্পী-সাহিত্যিকদের একান্ত নিজস্ব, দুর্লভ হলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জ্বালা উর্ধ্বমুখী হয়ে 'সাবলাইম'-এ গিয়ে পৌঁছয়, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে পৌঁছনোর মতো কারণ প্যাসন ও ইনটেলেকট্ সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রমাণ খুঁজতে বেশিদূর যাবার প্রয়োজন হয় না। বহু মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবন এ-কথার প্রমাণ দেবে। ভিনসেন্ট ভ্যানগগ পল গগ্যাঁ, লিও টলস্টয়, অস্কার ওয়াইল্ড, বেটোফেন, ফ্রিডারিক সোঁপা এমন আরো কত জীবন এর ব্যতিক্রম নয়।

জীবনের পথ চলতে চলতে একটা সময় আসে যখন 'চরৈবেতি'র মনোভাব ফুরিয়ে যায়। সবাই তখন পশ্চাৎমুখী হতে ভালবাসেন। অনেকের 'মেমোয়ার' বা আত্মজীবনীতে লক্ষ্য করা যায় যে লেখক তাঁদের পূর্বজীবনের কর্মকৃতি ও সাধনার সঙ্গে উত্তর-জীবনে প্রতিষ্ঠা ও 'সিদ্ধাই'-এর সঙ্গে একটা নিবিড় যোগাযোগ দেখাতে গিয়ে শুধু মহৎ দিকটাই আতসকাচের মধ্য দিয়ে দেখানোর মতো করে দেখিয়েছেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি, দোষ-গুণের কথা চেপে গিয়েছেন। সে কারণেই হয়তো অনেক আত্মজীবনী উঁচুদরের সাহিত্য হয়ে ওঠে নি—সুখপাঠ্য তো নয়ই। রবিশঙ্কর তাঁর এ-গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহু মহিলার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের কথা বর্ণনা করেছেন। এদেশের রীতি অনুযায়ী খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা নিন্দিত হয়েছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল এ-কাহিনী কখনই স্থূলতায় পর্যবসিত হয়নি। বরং, মনে হয়েছে এ যেন শিল্পীর জীবনচর্চায় স্বাভাবিকভাবে ভেসে আসা ফুল। তাঁদের কথা বলতে গিয়ে রবিশঙ্কর কোনো কথাই চেপে যাননি, এমন কি, স্ত্রী অন্নপূর্ণা শঙ্করের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর মতানৈক্যের কথাও। তবে, এ মতানৈক্যজনিত যে-সমস্যা তার আলোচনা তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে করেছেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা কোথাও প্রকাশ পায় নি। এ গ্রন্থটি শুধু এ কারণেই চার্লি চ্যাপলিন, ইসাডোরা ডানকান-এর আত্মজীবনী ও রুসোর 'কনফেসান্স'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

'রাগ'-এর অংশে তিনি সমসাময়িককালের কিছু বিশিষ্ট সংগীত-কলাকারের কথা, বিভিন্ন যন্ত্রের বাদনশৈলী, গায়ক ও যন্ত্রী 'ঘরানা' সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। মনে হয় গ্রন্থটিকে টেকনিক্যাল আলোচনা

থেকে বাইরে রাখতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। কেননা, এতে কিছু গুরুগম্ভীর আলোচনা প্রসঙ্গেও তিনি গল্পেরই মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর এই বিভিন্ন কলাকারের উৎকটতা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা নিয়েও প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত। একে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন ধরা যাক্‌, 'আমীর খুসরো' প্রসঙ্গে তাঁর যে মতামত তা মোটেই ইতিহাস-নির্ভর নয়—অনেকটাই কল্পিত। তাঁর মতে মুসলমান রাজা বাদশাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকার দরুন তাঁরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খুসরোর মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক কালের নথিপত্রে এবং মুঘল আমলের কিছু পুঁথিপত্রে যে-নজির প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে 'সেতার' ও 'তবলা'র আবিষ্কারের কৃতিত্ব অনেকটাই যে আমীর খুসরোর সে বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকে না। অন্তত তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো আছে এবং থাকবেই। তাছাড়া এ কথা সত্য যে তিনি কিছু নতুন রূপরীতিরও সৃষ্টি করে গিয়েছেন। 'মুঘল যুগের সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থে রাজ্যেশ্বর মিত্র মশায় আমীর খুসরোকে ভারতীয় সংস্কৃতি-বিদ্বেষী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিছু নতুন রূপরীতি ও আঙ্গিক, বিশেষ করে বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নেই একথা বলেন নি। রবিশঙ্করও এমন কিছু তথ্য উপস্থাপিত করতে পারেন নি যাতে করে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ হয়।

এছাড়া সমসাময়িককালের অনেক সংগীত-শিল্পীর কলাবৈশিষ্ট্যের কথা তিনি আলোচনা করেছেন যা প্রশ্নাতীত নয়। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য-সংগীতের 'ফাইভ গ্রেটস'-এর মতো ভারতের তিন মহৎ খেয়ালীয়া—ওস্তাদ ফৈয়াজ হুসেন খাঁ, ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ—সম্বন্ধে তার মতামত অনেকেরই অপছন্দ হয়েছে। আব্দুল করিম খাঁ সম্পর্কে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, করিম খাঁ শুধু কেঁদেই গিয়েছেন। তাঁর খেয়ালের আঙ্গিক সম্বন্ধে কিন্তু রবিশঙ্কর কিছু বলেন নি। যে প্রাণস্পর্শ করিম খাঁর গানে ছিল তা কি তাঁর ব্যক্তিগত কান্না না জীবনের অন্তর্নিহিত বেদনার উৎসমুখ সন্ধান। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর বাজখাঁই কণ্ঠস্বর ছিল যাকে উঁচুদরের bass বলা যেতে পারে। এ ধরনের গায়করা উচ্চগ্রামে চেঁচামেচি স্বভাবতই করেন না। গানের সমস্ত স্তরে তাঁর [illegible]

অনবদ্য শুধু নয়—অবিসংবাদিতও বটে। রবিশঙ্কর তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন তাঁর বিলম্বিত বড় খেয়াল তাঁর ভাল লাগেনি। আমরা তাঁর কয়েকটি আসরে বিলম্বিত খেয়াল শুনেছি যা সারা জীবন মনে রাখবার মত। তাঁর গৌড়মল্লার-এর বড় খেয়াল 'রোহে হো হমসে...' যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই উপরোক্ত কথা সমর্থন করবেন। তবে একথাও ঠিক যে তিনি মধ্যলয়ের খেয়াল গাইতেই ভালবাসতেন। তাঁর রচিত বন্দিশ-এর মধ্যে লয় ও সুরের যে-অন্তরঙ্গতা তা ভারতীয় সংগীতে একটি অমূল্য সংযোজন। গোলাম আলি খাঁর প্রসঙ্গে রবিশঙ্কর বলেছেন যে খাঁ সাহেব ঠুমরি গাইতেই বেশি পারদর্শী ছিলেন—একথাও ঠিক নয়। কোনো আসরে ভারি রাগই হোক, আর যে-রাগই হোক, শ্রোতাদের তরফ থেকে সব সময়ই এমন প্রবল দাবি আসতে থাকত যে, তাঁকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠুমরি ধরতে হত। অনেক আসরে তিনি অনুরোধ করেছেন, ধমক দিয়েছেন, শ্রোতাদের তাও বাগ মানাতে পারেন নি। এও শুনেছি যে 'আপলোগ রসগুল্লা ছোড়কে মুড়ি মাংতে হ্যায়?' তবুও তাঁর কথা কেউ শোনেনি। খেয়াল গানের একটি বড় অঙ্গ সুরের 'প্যাটার্ন উইভিং' বা নক্সিকাটা, যাকে তান বলা হয়। তাতে গোলাম আলি খাঁ যে প্রচণ্ড দক্ষ ছিলেন এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেতারিয়া ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁকে যেহেতু একদল লোক রবিশঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন, তাই কি তিনি বিলায়েৎ প্রসঙ্গে সন্তের মত উদার হয়ে গিয়েছেন। সেতার যন্ত্রের ওপর অসাধারণ দখল নিয়েও খাঁসাহেবের বাজনায় যে 'ধারী-মিরাশীপনা' ঘোচেনি অর্থাৎ বিলায়েৎ যে পিওরিস্ট নন এবং রূপরীতি ও আঙ্গিকের দিকে থেকে তাঁর বাজনায় প্রথাবদ্ধতার অভাব প্রচুর, সেকথা তিনি সাহস করে বলতে পারেন নি। এছাড়া, সেতার যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা অকিঞ্চিৎকর হয়েছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এ যন্ত্রটির আবয়বিক গঠন ও স্বরপট 'টোনাল' কম্পাস কি রূপ নেয় যাতে করে বর্তমানের বাদনশৈলী মূলত গায়কিধর্মী হয়ে উঠেছে এ সম্বন্ধে তাঁর মতো দিকপাল সংগীতজ্ঞের কাছে আমরা আরো আশা করেছিলাম।

গল্পাকারে বৈঠকি মেজাজের সৃষ্টি হয়ত এ পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু অনুলেখক এতে আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন মাত্র, কেমন যেন একটা তরলপনার ভাব রয়ে গিয়েছে লেখার সমগ্র ভঙ্গিতে। অথচ এই ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং শিল্পীজীবনটা শুধু কাঁচাহাতের লেখার জন্যই

রুসোর কন্‌ফেশনস্‌ বা রাসেল কিংবা চ্যাপলিনের আত্মজীবনীর সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে নি। এ লেখার পেছনে কতটা বাণিজ্যিক মনোভাব কাজ করেছে তাও বলা মুশকিল। কোনো ভারতীয় প্রকাশক ইতিপূর্বে বোধহয় বই লেখানোর জন্য এত অর্থ ও সময় ব্যয় করেন নি। তরলতার চূড়ান্ত করা হয়েছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলাউদ্দীন খাঁর প্যারিস ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে। সেই সময় 'ফোলিস বার্জারের' নগ্ন মহিলাদের সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে যে-গল্প ফাঁদা হয়েছে, তা এ পুস্তকে স্থান না পেলে ভালো হত।

ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বল্‌তে হবে যে, এ পুস্তক বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রবিশঙ্কর বিদেশের দরবারে ভারতীয় সংগীতকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে-ভূমিকা নিয়েছেন তাতে তিনি চিরকাল সৎভারতীয়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন সন্দেহ নেই। কারণ সেদিনও ভারতীয় সংগীতকে 'ক্যাকোফোনি'র ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পাশ্চাত্য সংগীতজ্ঞরা নারাজ ছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত পাশ্চাত্য-সংগীতের সম্মুখে কোনো এশীয় দেশের সংগীত দাঁড়াতে পারছে না। উন্নত এশীয় দেশগুলোতেও পাশ্চাত্য-সংগীত ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছে। এ হেন সময়ে যে ভারতীয় সংগীতজ্ঞ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রতিষ্ঠা দিলেন, তাঁর জীবনকাহিনী সাধারণ পাঠক অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়বেন সন্দেহ নেই।

সাংবাদিকতার ওপর একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

সাংবাদিক হতে গেলে…

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ টাকা

প্রকাশক :

বইপত্র

চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা-৯

পরিচয়

পরিচয়

জুলাই ১৯৮০

৪৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা

ছাপার ভুল

৭৯ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটির নাম হবে 'আত্মহনন থেকে আত্মতরণ'

প্রচ্ছদচিত্র: সান্ত্বনাকুমার গোস্বামী

পরিচয়-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬·০০

মস্তক বিনিময় (Thomas Mann-এর Transposed Heads-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—ক্ষিতীশ রায় ৪·০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫·০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—নৃপেন ভট্টাচার্য ৪·০০

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪·০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০·০০

গোবিন্দ সামন্ত (লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants' Life'-এর বঙ্গানুবাদ) সাধারণ ৪·৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪·৫০

সম্পাদকীয়

'পরিচয়'-এর ঊনপঞ্চাশী

এই সংখ্যায় 'পরিচয়'-এর ঊনপঞ্চাশ পুরলো। এর পরের সংখ্যাটিতেই পঞ্চাশে পা দেবে।

বাংলা কাগজের পক্ষে এই মুহূর্তটির অভিজ্ঞতা খুব-একটা জোটে না। অকালমৃত্যুর শোকের প্রতিক্রিয়ায় বরং আমাদের অভ্যাস আছে—পরিণতি ও বয়স্কতার অভিজ্ঞতা তেমন নেই। আমরা, 'পরিচয়'-এর বর্তমান কর্মীরা, এই মুহূর্তটিতে কিছুটা আন্দোলিত তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিছু দ্বিধাগ্রস্তও। ঠিক যেন জানি না, আমাদের কাছে কোন ব্যবহার প্রত্যাশিত।

তবে এটাই ভালো—কোনো উচ্চকিত নাটকীয়তা ছাড়াই এই ঊনপঞ্চাশ শেষ হয়ে পঞ্চাশে পা ফেলে দেয়া। ঘটনাচক্রে একই সময়ে একই সঙ্গে প্রেসে দুটি সংখ্যা ছাপা চলছে—এই ঊনপঞ্চাশের শেষ আর পঞ্চাশের প্রথম সংখ্যা—শারদীয়। যেন, ঊনপঞ্চাশ আর পঞ্চাশের মধ্যে কোনো দম ফেলার সময় নেই। আবার, ঘটনার ক্রমে একই সঙ্গে একই পৃষ্ঠায় 'পরিচয়'-এ নাম ছাপা হচ্ছে অশীতিপর আদি-উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এখনো বিশে পৌঁছয় নি এমন নেহাতই তরুণ লেখকের। যেন, আশি আর বিশের মাঝখানে কোনো আড়াল নেই।

পঞ্চাশে পৌঁছে যাওয়ার আসল মানেটা তাই বার্ধক্য নয়—তারুণ্য, পরিণতি নয়—শুরু। পঞ্চাশে পৌঁছে যাওয়া মানে প্রবাহ, পরম্পরা, ধারাবাহিকতা। গত ঊনপঞ্চাশ বছরে 'পরিচয়'-এর সেই ধারা এত অব্যাহত যে পঞ্চাশের গোড়াতে 'পরিচয়'-কে সেই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের গতিই মেনে নিতে হয়। আর তা মেনে নেয়ার অর্থ তরুণতম আর নবীনতম থাকার বাধ্যতা। অর্বাচীন কোনো কাগজের পক্ষে প্রবীণতার গাম্ভীর্য অনেক সময়ই দরকারি—নইলে লোকে না-মানতেও পারে। কিন্তু কোনো ঊনপঞ্চাশী কাগজের পক্ষে যৌবনই একমাত্র নিয়তি—নইলে লোকে বাতিল করে দিতে পারে।

গত ঊনপঞ্চাশ বছর ধরেই 'পরিচয়' যেমন বেরিয়েছে, তেমনি তরুণও

চলেছে তুমুল—'পরিচয়' কি, 'পরিচয়' কেন। এই আত্মজিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেই যেতে হয়েছে—কোনো উত্তরই পাকাপাকি টেঁকে নি। সকলের পছন্দমতো কোনো উত্তরও জোটে নি। হয়তো এই অমীমাংসিত আত্ম-জিজ্ঞাসার কারণেই 'পরিচয়' থিতু হয়ে যেতেও পারে নি। তর্ক আর তর্ক আর লেখা আর লেখা, তর্ক করতে-করতে লেখা আর লিখতে-লিখতে তর্ক, লেখা নিয়ে তর্ক আর তর্ক নিয়ে লেখা—এই দ্বান্দ্বিকেই 'পরিচয়' পঞ্চাশের গোড়ায় এল। তাতে তো আরো কত তর্ক আর কত লেখার দায় 'পরিচয়'-এর ওপর বর্তায়।

এত তর্ক আর এত লেখার একটা কারণ নিশ্চয়ই গত উনপঞ্চাশ বছর ধরে তৈরি হয়ে উঠেছে। 'পরিচয়'-এর লেখক-পাঠক-গ্রাহক সকলের মনেই সেই একটা নিরিখ গড়া আছে—শিল্পসৃষ্টি ও মননকর্মের দুরূহতম আদর্শের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের কর্ম ও কল্পনার অন্বয়।

এই মাপকাঠি একবার যার হাতে উঠেছে সে আর কোনো মাপকাঠিতে কাজ চালায় না, চালাতে পারে না। তাই শিল্প-সাহিত্য-মননকর্মের বিচারে 'পরিচয়' তার দৃষ্টি পাখির চোখ থেকে সরাতে পারে না। অথচ সেই পাখির চোখটিকে বিদ্ধ করতে তার দুই পায়ের দশ আঙুল মাটিকেই আঁকড়ে থাকে। কখনো-কখনো তীর পিছলে যায়, কখনো-কখনো পাও পিছলে যায়—তাতে ধনুকের ছিলা আর মাটির ওপরের পা দুটোই আরো টানটান হয়ে ওঠে।

সম্পাদক

মতামত : বিশেষ সংখ্যা

'গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা'

১

দেবমিত্র বসু

'পরিচয়'-এর 'গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা'য় (জানু-ফেব্রু ১৯৮০) গোপাল হালদারের 'প্রকাশিত গ্রন্থে'র যে তালিকা দেওয়া হয়েছে (পৃ ৭৮-৮০), তাতে দুটি গ্রন্থের নাম দেখছি নেই। একটু বিলম্বিত হলেও এই সংযোজনটুকু প্রকাশ করতে পারেন।

সম্পাদনা

সোনার বাঙলা ১
(প্রথম খণ্ড : জল মাটি পাহাড়) বেঙ্গল পাবলিশার্স আগস্ট ১৯৫৬
সোনার বাঙলা ২
(দ্বিতীয় খণ্ড : জনসঙ্গম) ঐ জুন ১৯৫৭

যদিও সম্পাদক হিসেবেই গোপাল হালদারের নাম আছে, কিন্তু ভেতরে অন্য কোনো লেখকের কথা নেই। আমার ধারণা, গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণতই গোপাল হালদারেরই লেখা। এ-বিষয়ে অবশ্য তিনিই আলোকপাত করতে পারেন।

২

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

'গোপাল হালদার সম্মান-সংখ্যা'য় বেশ কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ছাড়াও যে কয়েকটি তথ্যগত ভুল একবার পাঠে চোখে পড়ল, তা জানাচ্ছি।

১. ১৩৪ পৃষ্ঠায় 'প্রবাসীতে প্রকাশিত গোপাল হালদারের রচনার পঞ্জি'র সূচনায় গোপাল হালদারের যে উদ্ধৃতিটি আছে, তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭২-এর 'পরিচয়'-এর 'বৈশাখ' সংখ্যায় নয়, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়।

২. শেষাংশের ৭৫ পৃষ্ঠায় 'জীবনীপঞ্জির রূপরেখা'য় আছে, ১৯৪০ সালে

গোপাল হালদার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সেটা বোধহয় হবে ১৯৪১-এর ১লা জানুয়ারি।

৩. শেষাংশের ৮০ পৃষ্ঠায় 'সম্পাদনা' অংশে যে 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী', 'বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী' ইত্যাদির উল্লেখ আছে, সেগুলোর গ্রন্থনাম ভুল দেওয়া হয়েছে। হবে যথাক্রমে 'বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ', 'বঙ্কিমচন্দ্র রচনাসংগ্রহ', ইত্যাদি। ওখানে কিন্তু 'দ্বিজেন্দ্র রচনাসংগ্রহে'র নাম নেই। এই পর্যায়ের প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রকাশক 'সাক্ষরতা প্রকাশন'।

৪. ৭৬ পৃষ্ঠায় 'গবেষণা'-অংশে যে **Department of Letters** ছাপা আছে, আশা করি তা হবে ***Journal of Deptt. of Letters.***

দু-একটি প্রশ্ন ও সংযোজনের কথাও মনে আসছে।

১. 'জীবনীপঞ্জির রূপরেখা'য় গোপাল হালদারের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির যোগাযোগের উল্লেখ নেই।

২. ৭৭ পৃষ্ঠার 'ভাষণ-সম্মেলনে'র সূত্রে বলা যায় কিনা ১৯৬৪ সালে তিনি ইওরোপ ভ্রমণে যান। 'কর্মজীবনে' তার উল্লেখ নেই।

৩. 'ভাষণ-সম্মেলনে'-এ বোধহয় উল্লিখিত হতে পারে **Slavic Languages** সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা, যা সাহিত্য অকাদেমি-র *Indian Literature*-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্ষুদিরাম বসু বক্তৃতা'র বিষয় কি?

৫. ৭৯ পৃষ্ঠায় 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' প্রভৃতি গ্রন্থের বাঙলাদেশের 'মুক্তধারা সংস্করণ'-এর উল্লেখ করা উচিত ছিল—উপন্যাসের ক্ষেত্রে যখন তার উল্লেখ আছে।

৬. 'প্রবন্ধ'-অংশে সংযোজিত হবে: **Vidyasagar/A Reassessment, PPH,** জুলাই ১৯৭২।

৭. 'সম্পাদনা'-অংশে সংযোজিত হবে

(ক) **Revolutionary Art : A Symposium. Progressive Forum.** সাল? (দ্র. ১৮৮ পৃ)

(খ) দ্বিজেন্দ্র রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড), সাক্ষরতা প্রকাশন, অক্টোবর ১৯৭৩ ও এপ্রিল ১৯৭৫ যথাক্রমে।

৮. 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত রচনাবলির পঞ্জি-সূত্রে জিজ্ঞাসা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে কি গোপাল হালদারের লেখা বেরিয়েছিল? যাচাই করার সুযোগ আপাতত পাচ্ছি না।

সমালোচনা সংখ্যা

'কবিতার দশবছর'

১

সিদ্ধার্থ রায়

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এ (মোমা) পিকাসোর শিল্পনিদর্শনের প্রদর্শনী সাজাবার সময় একটি বিশেষ সমস্যায় পড়েছিলেন উইলিয়ম রবিন, মোমা-র রেখাচিত্র ও ভাস্কর্য বিভাগের অধিকর্তা, এবং পিকাসো-বিশেষজ্ঞ ডমিনিক বোজো, -প্যারিসে প্রস্তাবিত পিকাসো-সংগ্রহশালার ভবিষ্যত-প্রধান।

পিকাসোর এক হাজারটি শিল্পনিদর্শন নিয়ে বিংশ শতাব্দীর এই বিরাট —ও সম্ভবত শেষ—প্রদর্শনীতে কী ক্রমে ও কোন মানে সাজানো হবে তাঁর ক্যানভাস, ভাস্কর্য ও নানান টুকিটাকি, বোজো ও রবিনের কাছে এইটেই ছিল প্রধান সমস্যা।

কারণ, তাঁরা জানতেন 'TUT LAW'-এর কথা, টুটানখামনের প্রদর্শনীর পর অন্য ভাষায় যাকে 'মমির অভিশাপ'-ও বলা হয়। একটি শিল্পকর্ম—প্রদর্শনী বা সংগ্রহশালার ক্রমবর্ধমান ভিড়ে সমগ্রের সাথে হারিয়ে ফেলে তার সাযুজ্য, স্বতন্ত্র নিদর্শন হিসেবে দৃশ্য হলেও গোটা পরিপ্রেক্ষিতে তা 'অদৃশ্য' হয়ে যায়, আর এই 'অদৃশ্য'-হবার প্রক্রিয়া অচেতন করে তোলে দর্শকের সংবেদনকে, সমগ্রকে উপলব্ধি করবার বোধ ঘুমিয়ে পড়ে।

শ্রীযুক্ত অরুণ সেনকে 'কবিতার দশবছর' লিখবার জন্য যে 'বিপুল, আতঙ্কজনক' কাব্যগ্রন্থ ব্যবহার করতে হয়েছে, তা নিশ্চিতই পিকাসোর চাইতে বেশি নয়। শুরু করবার আগে তাঁকেও নিশ্চয়ই বোজো ও রবিনের মতো ভাবতে হয়েছে প্রবন্ধটির কাঠামো, মূল্যায়নের পরম্পরা।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই 'মমির অভিশাপ' তাঁকেও লেগেছে। 'TUT LAW'-এর অচেতন প্রবল অনিবার্যতায় তাঁর কাছে 'অদৃশ্য' হয়ে গেছে দশবছরের কবিতার সামান্য লক্ষণ, আবছা হয়ে গেছে বিষয়েরও ধারণা, সমগ্রকে বিচার করবার সংবেদন ঘুমিয়ে পড়ে জায়গা করে দিয়েছে খণ্ড-বিচারের। ফলে, রচনায় যে-সংশ্লেষ আমরা আশা করে থাকি, তার বদলে কাঠামো ও বক্তব্যের অতিবিস্তার আমাদের দুঃখ দেয়।

রচনাটি সম্পর্কে কোনো আপত্তিই থাকত না, যদি নামটি 'কবিতার দশবছর' না হয়ে 'কবিদের দশবছর' হত ; যদি না সম্পাদকীয়তে বলা হত

'গত দশ বছরে প্রকাশিত বই-এর, বা যাঁরা এই সময়ে লিখছেন তাঁদের, নামের তালিকা এই সমীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য নয়। সমীক্ষায় খোঁজার চেষ্টা হয়েছে—বিষয় ও আঙ্গিকের নতুন গঠন, গত দশ বছরের প্রধান ঝোঁক, সময় ও শিল্পের দায় মেটাতে শিল্পীদের চেষ্টা।'

সম্পাদকীয়ের এই ঘোষণা আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। আশা হয়, সময়ের দায়—সত্তরের সময়ের দায়—কি ভাবে শিল্পের দায় তৈরি করে আর সেই দায়কে নিষ্ঠ শিল্পীরা কীভাবে এনেছেন তাঁদের রচনায়—বাংলা কাব্যসমালোচনায় এই অনাবিষ্কৃত দিকটি শ্রীসেনের দক্ষতায় নতুন মাত্রা পাবে। কিন্তু, সময়ের এক-একটি জটিল ক্রান্তি কী করে তৈরি করছে শিল্পনন্দনের এক-একটি উজ্জ্বল বিন্দু, সত্তরের সামাজিক-রাজনৈতিক সামান্য লক্ষণ, শিল্পে প্রতিফলিত সামাজিক বাস্তবতার চেহারা ও তার সামান্য লক্ষণ, শ্রীসেনের প্রবন্ধে আমরা পাই না।

প্রবন্ধ-রচনার যে-আরোহী পদ্ধতি উনি বেছে নিয়েছেন, তাতে মূলত প্রবন্ধটি গত দশবছরের উদ্যোগী কবিদের নামের তালিকাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্তর দশকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রবণতা বাংলা কবিতাতে কী প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, যদি কোনো নতুন আঙ্গিক তৈরি হয়ে থাকে, তার চেহারাটা কেমন, আরোহী পদ্ধতিতে তা ধরা যায় না। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক প্রধান ও অপ্রধান কবি কিভাবে তাঁদের স্বতন্ত্র মণ্ডলে বদলেছেন, শ্রীসেনের এই বিশ্লেষণ থেকে গত দশ বছরের বাংলা কবিদের প্রধান ঝোঁক আমরা বুঝতে পারি না।

যেহেতু তিনি বিশেষ থেকে সামান্যে যাবার চেষ্টা করেছেন, প্রত্যেক কবিকে তিনি আলাদাভাবে বিচার করেছেন তাঁর নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার চাপে বিবর্তিত শিল্পনন্দনের মাপকাঠিতে নয়।

ঠিক উল্টোভাবে যদি সাজাতেন তাঁর প্রবন্ধকে শ্রীসেন, যদি দেখবার চেষ্টা করতেন সত্তর দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা কোন পুরাণ-আবহকে প্রাধান্য দিয়েছে, শব্দ-ব্যবহারের নতুন কোন তল যোগ করেছে, কিভাবে মহাকাব্যিক উত্তরাধিকারকে কাজে লাগানো হয়েছে, কবিতার এপিক উচ্ছ্রিতি কতখানি কার কবিতায় আসছে আর সেই দিক থেকে কে গড়ে তুলতে পারছেন 'সেকেণ্ডারি এপিক' নির্মাণ—তাহলে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন মান সংযোজিত হত।

শ্রীসেনের ব্যাপক অধ্যয়নে নিশ্চিতই চোখ এড়ায় নি কীটস্-এর 'ওড টু এ নাইটিংগেল' ও ম্যাথু আরনল্ড-এর 'ডোভার বিচ' কবিতা-দুটি। আরোহী পদ্ধতিতে বিস্তৃত আলোচনা করা যায় সারা জীবনে কীটস্ ও আরনল্ড আলাদা-আলাদাভাবে কেমন কতখানি বদলেছেন। অথচ সেই পদ্ধতিতে হয়তো ধরাই পড়বে না এই কবিতা দুটির একটি প্রধান বিন্দু—যা থেকে, সময়ের চাপে শিল্পের অনিবার্য দায় কি করে তৈরি করায় নতুন ঝোঁক, তার প্রক্রিয়া, বোঝা যেতে পারে। যখন কবিতার সামান্য লক্ষণের প্রেক্ষায় দেখা হবে ব্যক্তির কাব্যপ্রয়াস, সমাজের প্রভাবে একই পুরাণমুদ্রা বা বাক্‌প্রতিমার আপেক্ষিক পরিবর্তন, তখনই বিশেষ ব্যক্তিগত বিচারে সমালোচকের নিজস্ব রুচি গৌন হয়ে প্রকৃত সত্যটা বেরিয়ে আসবে।

'ওড টু এ নাইটিংগেল' কবিতায় কীট্‌স্ লিখছেন—

Darkling I listen ; and for many a time

I have been half in love with easeful death...

কীট্‌স্ এই **'darkling'** শব্দটির ব্যবহারে তাকে এত বেশি রোমান্টিক যুগের প্রতিনিধি করে তুলেছিলেন যে অন্ধকারের এক বিশেষ সামাজিক আবহের গভীর প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শব্দটি।

অথচ ভিক্‌টোরিয়ান ইংলণ্ডের অনিশ্চিত সমাজ, পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও বিপর্যস্ত সময়ের দায় এমন এক শিল্পনন্দনের অনিবার্যতা তৈরি করল—যখন সেই চাপেই শিল্পীর সামাজিক দায়ে আরনল্ড-কে থুকুদিদিসের যুদ্ধের বর্ণনার প্রতিতুলনা এনে ছিঁড়ে ফেলতে হয় সেই বিখ্যাত রোমান্টিক অন্ধকারের প্রতীক **'darkling'**-এর সমস্ত আবহ নতুন অন্ধকারের চারিত্র্য বোঝাতে—

And we are as on a darkling plain

Swept with confused alarms of struggle and flight,

Where ignorant armies clash by night.

একই অন্ধকারের এই দুই ভিন্ন পরিণাম ও সাহিত্যিক ঝোঁকের পরিবর্তনের এমন অতি-নির্দিষ্ট প্রমাণ হয়তো খুব সুলভ নয়, তবুও এটা কাব্য-আলোচনায় একটা নিরিখ তৈরি করে দিয়েছে। খুব সাধারণ একটা শব্দ নেওয়া যায়—'জল'—বাংলা কবিতায় গত দশকে তার কাছাকাছি সময়েও বহু প্রধান কবি ব্যবহার করেছেন। দেখা যেতে পারে, সত্তর দশকের বাস্তবিক জলের বিপর্যয়ের চেহারায় অনিবার্য চাপ কীভাবে বাধ্য করেছে সচেতন কবিদের জলের সমস্ত পূর্ব-আবহ ছিঁড়ে ফেলে নতুন মাত্রা যোগ করতে। সত্তর

দশকের এক-একটি জটিল রাজনৈতিক অবস্থার চাপ বদলে দিয়েছে এইরকম নানা আবহ। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তা নিশ্চিতই সাবালকত্বের লক্ষণ। শ্রীসেন বাংলা কবিতাকে সাবালক বললেও তার এই প্রধান লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি।

আসলে শ্রীসেনের প্রবন্ধের কাঠামো-বিন্যাসের গলদ অনেকটা সেই আদিম মানুষের বিশ্বাসের মতো, যারা ভাবত যে গাছের আন্দোলনের জন্যই বাতাস তৈরি হয়। ভুলটা কিন্তু প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কারণটাকে গুলিয়ে ফেলা। আর এই ভুল অনুষঙ্গ থেকেই বোধে একধরণের আবরণ তৈরি হয়, যখন, গাছ বা বাতাস, কোনোটারই প্রকৃত সত্য ধরা দেয় না। শ্রীসেন কেবল কবিতার ফর্মের ধরণটা স্বতন্ত্র কবিদের প্রসঙ্গে আলাদা করে বুঝতে চেয়েছেন। কিন্তু, কবিতার ফর্মের মতো সাহিত্যিক বাস্তবতা তো সামাজিক বাস্তবতারই প্রকাশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতের বিচার বাদ দিয়ে সাহিত্যিক বাস্তবতার চারিত্র্য বুঝতে যাওয়াটা তো ঐ আদিম মানুষদেরই মতো অনুষঙ্গকে সত্য বলে বোঝবার ভুল।

শ্রীসেনকে নিশ্চয়ই বলাটা অবান্তর, যে, সামাজিক বাস্তবতার ধরণ আর সাহিত্যিক বাস্তবতার ধরণ এক না-ও হতে পারে। শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে সামাজিক বাস্তবতা ও সাহিত্যিক বাস্তবতার বিচিত্র জটিল রসায়ন শ্রীসেন ধরতে চান নি। আর ঠিক কারণেই তাঁর বিচারের নিরিখ হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃত্রিম—এবং কোনো কোনো কবি সম্পর্কে তাঁর মত দেখে এটাও মনে হয়—যে, একধরণের 'পেডেস্ট্রিয়ান রিয়ালিজম'-কে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রবন্ধের মূল বিষয়। বাস্তবতার অর্থ তো প্রতিভার অভাব নয়; করণ-কৌশলের অদক্ষতা ঢাকবার ছলা নয়; বাস্তবতা মানে কল্পনাবিহীন সস্তা শ্লোগান, অন্ধ বিশ্বাস, বা অন্তর্দৃষ্টির অভাব দিয়ে সৃষ্টিপ্রয়াসের ব্যাপ্তির প্রতিকল্পনা নয়। অথচ শ্রীসেনের কৃত্রিম নিরিখে তিনি অনেককেই 'সংকট'-হীন বলেন, প্রায় অবিকল যেমন প্রাক্-পঞ্চাশের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বা তারাশঙ্করকে বলা হয়েছিল সংকটহীন, বা বিষ্ণু দে-কেও দায়ী করা হয়েছিল একই অভিযোগে।

শ্রীসেন যে তাঁর প্রবন্ধকে প্রায় ভিক্টোরীয় সমালোচকের প্রিয় আদর্শ—**A place for everything and everything in its place**—মেনে নিয়ে সমস্ত সৃষ্টিপ্রয়াসকে খণ্ড খণ্ড করে এক একটি গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী ও নানা লেবেলে ছড়ানো ক্ষুদ্রতায় নামিয়ে এনেছেন, তার কারণ, তিনি বাস্তবতার প্রবহমানতার

চেহারাটা কীভাবে এই দশকে প্রতিফলিত, তার বিচার এড়িয়ে গেছেন।

কোনো বিশেষ মিথ, ক্ল্যাসিকের কোনো নির্বাচিত আবহ, বা মহাকাব্যেরই কোনো নির্দিষ্ট অংশ, এক-একটা যুগের বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় সাহিত্যিক প্রকাশের অব্যবহিত প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের মহাকাব্যের নানা আবহ পূর্ব দশকের প্রখ্যাত-অখ্যাত কবিদের রচনায় নবমূল্যায়নে নতুন মাত্রা পেয়েছে। এইভাবে আজকের বাস্তবতার সঙ্গে যোগ ঘটে যায় হাজার বছর আগের বাস্তবতার, যে প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই নিহিত থাকে আগামীকালের বাস্তবতার নিহিত আদল। বাস্তবতার এই বহমানতা একটি বিশেষ দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে অতীতের—হতে পারে অব্যবহিত বা হাজার বছর—এক একটি মিথ বা আবহ বা সাহিত্যিক সৃষ্টিকে নিরুপায় প্রাসঙ্গিক করে তোলে। সেই পুরাণমুদ্রায় কবি নিজের বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আমেরিকায় নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মীরা—যাঁদের **Suffragettes** বলা হত—নিজেদের বক্তৃতায়, আলোচনায়, কবিতায় ইউরিপিদেসের উদ্ধৃতি দিতেন। সেই সূত্রে এডিথ হ্যামিলটন লিখলেন—প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি আমাদের পুরোধা সৈনিক…সেই মনীষার প্রাখর্য, আধুনিকতা, অনুসন্ধিৎসা, মগ্ন তোলপাড় করা বিপ্লব, শক্তি আর কোনো কবির ভেতর এমন করে প্রকাশ পায় নি। তিনি বিদ্রোহী, হার না-মানা নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত।

কিন্তু কেন আমেরিকার নারীমুক্তি আন্দোলনের শরিকরা তাঁদের অধিকার আদায় করবার সংগ্রামে, প্রচারে, কবিতায় ইউরিপিদেসকে মনে করছিলেন? সমসাময়িক বাস্তবতার চাপ তাঁদের আবিষ্কার করিয়েছিল সেই বাস্তবতার প্রতিতুলনা।

কি ভাবে?

ইউরিপিদেসের সময় অ্যাটমিজম-এর নতুন আবিষ্কারে মানুষ ও সমাজের সম্পর্কে যে মাত্রা যোগ হয়, যেভাবে মানুষ প্রকৃতির সামনে যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়ায়, ঝেড়ে ফেলে এ্যানিমিজম-এর সংস্কার ও গোঁড়ামি, কার্যকারণ আবিষ্কারে যেমন সচেতন হয়ে ওঠে, মানুষের সেই নতুন উত্থান, নিজেকে নিজেরই ভেতর থেকে উদ্ঘাটনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইউরিপিদেস এথেন্সীয় গণতন্ত্রের কাছে তাঁর কোরাসের মাধ্যমে শুনিয়েছেন, ভাবিয়েছেন—যুক্তি ও

ব্যাখ্যার শানিত ধারা মানবপ্রজাতির কাছে কত মূল্যবান। তাই, আমেরিকার নারীমুক্তি আন্দোলনের অব্যবহিত সাহিত্যিক প্রতিতুলনা হিসেবে তাঁরা আবিষ্কার করেন ইউরিপিদেসকেই। বাস্তবতার এই নিরবিচ্ছিন্ন স্রোত ও তার অদ্ভুত রসায়নে মিশে যায় হাজার বছরের অতীত আর সমসাময়িক ইতিহাসের কোনো সীমিত পর্ব বা তারও টুকরো। এই রসায়নের নিরিখে সময়ে জারিত সাহিত্যিক বাস্তবতার ধরণ বিচার করবার কথা রীডেরও মনে হয়েছিল। শিল্পের অর্থবিচারের সময় তিনি বলেছিলেন—**the art of a period is a standard only so long as we learn to distinguish between the elements of form, which are universal, and the elements of expression, which are temporal.**

অতীত, পুরাণ, উপকথা, মহাকাব্যিক আবহ কতখানি, কেমন করে এই দশকের কবিতায় এসেছে, কোন প্রসঙ্গ বেশি ব্যবহৃত, কোন মহাকাব্য বেশি জারিত করেছে কবিদের, এবং কেন—শ্রীসেন কবিতার আলোচনায় এই দিকটি একেবারে এড়িয়ে গেছেন।

শ্রীসেন যদি মনে করেন, অন্যান্য শাখার তুলনায় বাংলা কবিতাই যা-একটু সাবালক, তাহলে, এই দশবছরের কাব্য-প্রয়াসে এপিক উচ্ছ্রিতির ধরণ নিশ্চয়ই খোঁজা উচিত ছিল। পাঠকের নীরব চর্চাতেই সেই এপিক উচ্ছ্রিতি ধরা পড়ে যায়। এক এক সময়ের এক এক নিষ্ঠ কবি এক এক ভাবে ধরবার চেষ্টা করেন এই উচ্ছ্রিতিকে। সত্তরের দশকে কবিদের প্রয়াসে এই উচ্ছ্রিতি এসেছে কী না, এলে তা কেমন, এই আপাত অপ্রধান ও কবিতার মূল শেকড়টাকে বুঝতেই চাওয়া হয় নি প্রবন্ধে।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলোর নিরিখে বিচার করে শ্রীসেন যদি বলতেন—কোন কবি কতখানি সফল, বা কার চাইতে বেশি সফল—সেই ব্যক্তি মূল্যায়নের একটা সামাজিক-ঐতিহাসিক ব্যপ্তি থাকত।

কিন্তু, প্রবন্ধে যেভাবে কবি, অ-কবি, নিম-কবিকে মার্কা মারা হয়েছে—উপরিউক্ত লক্ষণগুলোর অভাবে তা কেবল ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের পূর্বনির্দিষ্ট মানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যিক ঝোঁক আবিষ্কারের বদলে হয়ে গেছে নামের তালিকা।

আসলে, বিষ্ণু-দে চর্চার যে আরোহী পদ্ধতিতে তিনি এতকাল লালিত এবং তর্কাতীত ভাবে বিষ্ণু দে-চর্চায় বাংলা সমালোচনায় যে নতুন ধারা তিনি

তৈরি করেছেন, সেই পদ্ধতিই কবিতার দশবছর আলোচনায় তাঁর প্রধান বাধা।

আরও অসুবিধে হয়, যখন এই প্রবন্ধ সম্পাদনার অভাবে ছড়িয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রথম সাড়ে তিন পাতার কোনো গুণগত অনিবার্যতা নেই সারা লেখাটায়। ওটাকে বাদ দিলে প্রবন্ধটি আঁটো হত। তাছাড়াও, অনেক জায়গায় যেন বড় বেশি বলা।

গোলমাল তো হয়েইছে। তা না হলে, বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে—সেই অর্থে বিশ্বসাহিত্যেও—কবি অ-কবি সিদ্ধান্তের সমাজপ্রেক্ষা হারানো নানা লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতন হয়েও, তাঁর প্রবন্ধে সমাজ-মাত্রার নিরিখবিহীন কবি অ-কবির অস্বস্তিকর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত শ্রীসেন কী করে দিতে পারলেন!

শ্রীসেনের সেই রকম কোনো অস্বস্তি আমাদের কাছে যে ঐতিহাসিক লজ্জার ব্যাপার হয়ে থাকবে!

২

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

'পরিচয়' সমালোচনা-সংখ্যায় প্রকাশিত অরুণ সেনের 'কবিতার দশ বছর' যে একটি দুরন্ত পরিশ্রমের সৃষ্টি তা উক্ত প্রবন্ধের ভিতরে না ঢুকেও শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যা গুনেই বোধহয় বলে দেওয়া যায়। সম্প্রতি-প্রকাশিত বাংলা কবিতার উপর এমন ব্যাপক ও গভীর কাজ ইদানীং আর হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। বাংলা কবিতা-পাঠকদের পক্ষ থেকে লেখককে অজস্র সাধুবাদ তাঁর এই প্রভূত পরিমাণ শ্রমস্বীকারের জন্যে। যদিও লেখকের অধিকাংশ বক্তব্য-বিষয়ের সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকই একমত হবেন, তবুও খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবেই তাঁর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত সত্যসন্ধ পাঠককে প্ররোচিত করবে বিতর্কে এবং কিছু অন্যতর সিদ্ধান্ত ও জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে তাদের। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাল-আমলের কবিতা সম্বন্ধে লেখক যা মন্তব্য করেন তাতে যদিও তিনি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেন স্থূল অতি-সরলীকরণের বিপদ, তবুও বুঝতে অসুবিধে হয় না, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবির কাছ থেকে এ-জাতীয় কবিতা তাঁর আদপেই পছন্দসই নয়।

আপনি মশাই গেছেন বদলে
বদলে গেছেন ছি ছি
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ।

এই পংক্তি কটিতে বস্তুত খুবই হাল্কা সুরে নিজের প্রতি কৌতুকের একটা আমেজ প্রচ্ছন্ন থাকলেও, ব্যঙ্গটা কি মুখ্যত তাঁদের প্রতিই নয়, যাঁরা আশা করেন যে একজন কবিকে উপকারকের ভূমিকায় সারাজীবন কেবল বাজের আওয়াজ নকল করেই ডেকে যেতে হবে—একজন পূর্ণ মানুষের বিচিত্র জীবনানুভূতির কথা নিরাপদে এড়িয়ে গিয়ে? অথচ প্রায় এই জাতীয় ইচ্ছাই প্রকারান্তরে বিষ্ণু দে যখন প্রকাশ করেন একটু অন্য সুরে, একটু ক্লাসিকাল ঢংয়ে—সারাদিনের পরিশ্রমের পর ফিরে এসে তিনি যখন সব উদ্দেশ্য থেকে ছুটি নিয়ে নির্ভেজাল ক্লান্ত অবসরের প্রার্থনা করেন এই ভাষায়, 'আমরা সবাই ওরে ভাই চাই সেই ক্লান্ত অবসর' এবং 'বারান্দায় বসে কিংবা শুয়ে, খাটে, তক্তাপোশে' স্বপ্ন দেখেন চাঁদের বিকাশ দেখার দিকচক্রবাল থেকে আকাশের বুকে, তখন পলায়নবাদী বলে মনে করতে পারি না আমরা তাঁকে, বরং পূর্ণ জীবন-রসের রসিক বলেই বোধহয় কবি হিসেবে তিনি অধিকতর মহৎ হয়ে ওঠেন আমাদের চোখে।

আসলে কথাটা নতুনও কিছু নয়। প্রবন্ধকার নিজেও তা অন্যভাবে স্বীকারও করেন অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে। তিনি যথার্থই সিদ্ধান্ত টানেন যে অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিত্বের একটি বড় উৎস যে প্রখর ইন্দ্রিয়বোধ তাই তাঁর সমাজ-সচেতন দায়বদ্ধ কবিতায় অন্য মাত্রা সংযোজন করে। কথাটা আরো একটু জোর দিয়েই হয়তো বলা যায় যে প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রখর ইন্দ্রিয়বোধই কবি হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রাথমিক শর্ত। ইন্দ্রিয়বোধহীন মানুষ সাধুসন্ত হতে পারে, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ কিংবা মহৎ সমাজসেবী হতেও কোনো বাধা নেই তার, কিন্তু কবি হওয়ার সম্ভাবনা তার পক্ষে নিতান্তই সুদূর-পরাহত। বিমূর্ত অভিজ্ঞতাকে একটি স্পষ্ট আকার দেওয়া কি করেই বা সম্ভব ঐ ইন্দ্রিয়বোধের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষতা ছাড়া? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এই কারণেই যে ষাট-সত্তর দশকের যে-সব বামপন্থী কবিদের কথা আলোচিত হয়

এই প্রবন্ধে, দুএকজনকে বাদ দিলে তাঁদের অধিকাংশের কবিতাই শোচনীয়ভাবেই ইন্দ্রিয়ানুভূতিহীন, প্রায় সন্ন্যাসীসন্তসুলভ পবিত্র নিষ্পাপ ও নীরক্ত, জীবন-দ্বারা অনাক্রান্ত ও অস্পষ্ট এবং সেই একই 'এরকম-লেখা-উচিত-কবিতা'র ধাঁচে বানানো ক্লান্তিকর একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। সেই একই ধরনের মামুলি আশাবাদ, সেই ফর্মুলা-মাফিক উপমার প্রাদুর্ভাব ও সরল সিদ্ধান্ত টানার ঝোঁক, সেই একই শিথিল অপটু ছন্দের ব্যবহার, যা কবিতাকে করে তোলে আরো রক্তহীন, আরো নিরবয়ব। সব সময়ে যে এঁরা উচ্চনাদে বিপ্লবের কথা বলেন তাও নয়, বিষ্ণু দে-র মতো কবিদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু নান্দনিক ধ্রুপদী শব্দও প্রায়ই এসে ভিড় করে তাঁদের কবিতায়, কিন্তু তাও যেন কবিতার গায়ে এঁটে বসে না, ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বোধের অভাবে তাও হয়ে পড়ে এলোমেলো, পরিপ্রেক্ষিতহীন। তাছাড়া সবসময়ই তো এঁদের কবিতায় থাকে সেই যাদুকরী কৌতুকের অভাব যা সমস্ত অনড়তা ভেঙেচুরে তার মধ্যে এনে দিতে পারে ডায়ালেকটিকসের ব্যাপ্ত আবেগ।

সত্তরের বামপন্থী কবিদের এই সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে শুচিতা রক্ষা করে চলা, চিন্তায় ভাষায় বা ভঙ্গিতে কোনোরকম অভিনবত্বের ঝুঁকি না নেওয়া—এ কি পঞ্চাশের সেই আসর-মাত-করা কিংবদন্তি-প্রায় কবিদের সেই বিস্ময়কর বিষয়হীনতারই প্রতিক্রিয়া? পঞ্চাশের প্রধান কবিদের এই উৎকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারিতা—প্রবন্ধকার সঠিকই অনুমান করেন—চল্লিশের অধিকাংশ কবিতারই গড়ানো একমাত্রিকতার প্রতি বিদ্রোহ হয়তো বা। ফলে, আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে টোমাস মানের গল্পের সেই আত্মসংকটে দীর্ণ শিল্পী টোনিও ক্রোগার-এর পরম শিল্প-অভিজ্ঞতার কথা। একদিকে গতানুগতিকতার গড্ডলিকা সহবাস, অন্যদিকে উৎকেন্দ্রিকতার ঝোঁক—এই দুই বিপদ থেকেই নিজেকে বাঁচানো একজন শিল্পীর প্রধান সমস্যা বলে মনে হয় তাঁর। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় সামগ্রিক জীবন-সত্যের উপর শিল্পকে দাঁড় করানোর প্রশ্ন। আর এজন্যই বোধহয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লিখতে হয় এরকম কিছু পংক্তি যা মূলত জীবন-বিরোধী না হলেও আমাদের বামপন্থী-সংস্কারে আঘাত করে। আর এখানেও আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকেন শঙ্খ ঘোষের মতো একজন গভীর কবি যিনি তাঁর সমস্ত দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও শিল্পকে করে তোলেন না সংকীর্ণ একদেশদর্শী। এর মূল কারণ ভাষা, আঙ্গিক, ছন্দ

অর্থাৎ সমস্ত কিছু জড়িয়ে শিল্পের প্রতিই তাঁর দায়বদ্ধতা। সিদ্ধেশ্বর সেনও থাকেন অন্যতর দৃষ্টান্ত হিসেবে। তাঁর মিতভাষণ যেন সমস্ত বামপন্থী বাচালতা এবং চিন্তাহীন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে শান্ত প্রতিবাদ। তিনিও বর্জন করেন বামপন্থী ক্লিশে ও সমস্ত সুলভ ম্যানারিজম। পূর্ণেন্দু পত্রীও এ-প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। স্পষ্টতই তাঁর কবিতা মানুষের জন্মই এবং তার কবিতাও বুদ্ধি বোধ ও স্বপ্নের যোগফল।

•

জনৈক পাঠক

'পরিচয়' সমালোচনা সংখ্যার (মে-জুন ১৯৮০) জন্য মুগ্ধ পাঠকের কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিটি প্রবন্ধ ও পুস্তক-আলোচনায় লেখকরা যে-গভীরতা ও লিখন-শৈলীর প্রমাণ রেখেছেন তা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের বহুকথিত দুর্বলতার প্রামাণিক প্রতিবাদ। একমাত্র এই সংখ্যাটির জোরেই হাজির করা যায় যে বাংলা ভাষায় সমালোচনা আজ কত লায়েক হয়ে উঠেছে। আমরা এখান থেকে [বাঙলাদেশ—স. প.] পশ্চিমবাংলার এই ধরনের সব লেখা পাই না। তেমনি পশ্চিমবাংলার পাঠকরাও নিশ্চয়ই এখানকার সব লেখা পান না। কিছু কিছু বিনিময় যে তাও ঘটে যায়—আপনাদের গত সংখ্যায় সুফিয়া কামাল-এর আত্মজীবনীর পুনর্মুদ্রণে তার আভাস মেলে। আপাতত আমরা যদিও পরস্পরকে জানা থেকে বঞ্চিত তবু এগুলো তো লেখা হচ্ছে এটাই আনন্দের ও বিশ্বাসের কথা। 'পরিচয়' তো নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলায় একটা চরম ব্যতিক্রম নয়। এ-রকম আরো কিছু পত্র-পত্রিকায়ও এই ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিশ্চয় প্রকাশিত হয়।

যদিও সব লেখাই আমার ভালো লেগেছে, তবু, এই চিঠিটি লিখতে প্ররোচিত হয়েছি অরুণ সেন-এর গত দশ বছরের বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়ে। তার প্রধান কারণ অবশ্য ব্যক্তিগত। আজ থেকে বছর পঁয়ত্রিশ আগে কলকাতার কলেজের ছাত্র হিসেবে আমরাও বাংলা কবিতার চর্চায় ব্যস্ত ছিলাম। সে-ব্যস্ততা অবশ্য ছাত্রজীবন পার হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই মিটে গেছে। তবু কবিতার পাঠক হিসেবে আজও যেন ছাত্রজীবনের সেই দিনগুলোতেই থেকে যাই। সেখানে যেন কবিতা-চর্চার কর্মী

হিসেবেই কবিতা পড়ি, কবিতা নিয়ে ভাবি। আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সুভাষদা, মঙ্গলাচরণ, সিদ্ধেশ্বর, চিত্ত ঘোষ ও আমাদের প্রায়-সমকালীন শঙ্খ-র তরুণ বয়সের কবিতাগুলি বেঁচে আছে। যৌবনস্মৃতি বড় দুর্মর। আমি তাই বাঙলাদেশের অধিবাসী ও নাগরিক হয়েও কবিতার নাগরিকত্ব আমার জন্মদেশের। প্রায়-পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়ের অবস্থান ও আবেগের এই দ্বিধা যেমন আমার ব্যক্তিগত লজ্জার কারণ, তেমনি হয়তো এদেশে ওদেশে কিছু ভুল-বোঝাবুঝিরও হেতু হতে পারে। আমি তাই আমার নাম ও পরিচয় ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখলাম। এর অন্য প্রয়োজনও হয়তো আপনারা অনুমান করতে পারেন। আশা করি এতে আপনারা কোনো অপরাধ নেবেন না।

কিন্তু কবিতা-চর্চার সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই যে এই চিঠিটি লিখছি তা একেবারেই নয়। অরুণ সেন তাঁর রচনায় আমার গত প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের সংযোগ-বিচ্ছেদ দূর করে আমাকে যুক্ত করে দিলেন পশ্চিমবাংলার কাব্যচর্চার সঙ্গে। গত দশ বৎসরের বাংলা কবিতা তাঁর বিষয় হলেও, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের অতীতকে যে ভাবে তুলনায় স্থাপন করেছেন তাঁদের বর্তমানের সঙ্গে এবং চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় কাব্যভাষার নানা বদল ও কাব্য-আঙ্গিকের নিরলস ও ক্রমবর্ধমান চর্চাকে পরিবর্তমান ঐতিহাসিক সময়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাতে তাঁর এই রচনা প্রায় একটি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে—এখন আমাদের মতো কোনো পাঠকের পক্ষে সুলভ হয়ে থাকল পশ্চিমবাংলার কবিতার ও কবিদের গত চল্লিশ বছরেরই নানা বিবর্তন।

হয়তো যাঁরা কলকাতায় ও পশ্চিমবাংলায় থাকেন ও তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতে প্রতিদিনই প্রবীণ থেকে তরুণতম কবিদের কবিতার পরিচয় পান, অনেকে তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেনও হয়তো, এবং কবিতা-সম্পর্কে কবিদের ভাবনা-চিন্তা কবিদের বয়ানেই জানতে পারেন—তাঁরা হয়তো আমার মতো দূরবর্তী অজ্ঞতার শিকার নন। তাঁরা হয়তো আমার এ-উচ্ছ্বাসের অর্থও খুঁজে পাবেন না। কিন্তু আমাদের মতো পাঠকের পক্ষে এই সমীক্ষাটি প্রায় একটি পাঠনির্দেশের মতো অপরিহার্য হয়ে থাকবে।

কলকাতায় আমি বাঙলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ও যাই নি। কিন্তু তার

আগে, তখন ও তার পরেও কলকাতার কবিদের কাব্যগ্রন্থ মেহনত করে জোগাড় করেছি, কবিতা বিষয়ে তাঁদের বক্তব্যও কিছু কিছু পড়েছি।

এই কাব্য-আলোচনাগুলি পড়ে আমার দীর্ঘদিন ধরে মনে হয়ে আসছিল যে বাংলা কবিতা-চর্চা পশ্চিমবাংলায় ব্যাপকতার সঙ্গে-সঙ্গেই সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে না, গোষ্ঠীতন্ত্রে পর্যবসিত হচ্ছে না? ব্যাপক প্রচারের কাগজে কবিতা প্রকাশের সুযোগ অল্প। তাই তার বেড়া ভাঙতে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকায় কবিরা কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাতে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত অনেক সময়ই হারিয়ে গিয়েছে ও কবিতা তার ঐতিহাসিক সার্বভৌমত্বের বদলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তরিত হয়েছে।

শঙ্খ ঘোষ-এর 'নিঃশব্দের তর্জনী' বইটি পড়ে আমি প্রথম একটা আঁচ পেয়েছিলাম আধুনিকদের নানা চেষ্টার নিহিত উদ্দেশ্যের। কিন্তু শঙ্খের বিচার প্রধানত কবিতার অন্তরঙ্গ নির্মাণ নিয়ে—কাব্যচর্চার ইতিহাস নিয়ে নয়। ঐ বইটিতে সমকালীন কবিতা বোঝার সাহায্য যতটা হয়, বাংলা কবিতায় ঐ সমকালীন-বিবর্তনের যুক্তিটা তত প্রতিষ্ঠিত হয় না। শঙ্খ-র ঐ বইটির কথা এত বলছি এই কারণে যে আমার কেমন মনে হয়েছিল শঙ্খও বোধহয় কবি ও কবিতার একটা বাছাই পছন্দের গোষ্ঠীতে আটকা পড়ছেন এবং তাঁকে তখন ভেতরে-ভেতরে টানছে কৃত্তিবাসী-আধুনিকতার ভাষাগত চোরাটান। শঙ্খ-র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়' ও 'বাবরের প্রার্থনা'-য় তাঁর নিজের কবিতার তর্জনী আর নিঃশব্দ থাকতে পারল না। তাঁর মতো কবি তো এভাবেই নিজেকে নিজে ছাড়বেন।

অরুণ সেন সেদিক থেকে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তাঁর এই রচনাটিতে গত দশ বৎসরের বাংলা কবিতাকে যেমন তার ইতিহাসধৃত বিন্যাসে চিনে নেওয়া গেল, তেমনি গোষ্ঠীচর্চার সঙ্কীর্ণতার বাইরে পশ্চিমবাংলার কবিদের একটা পরম্পরাগত গ্রন্থন সম্ভব হল। অরুণ সেন সেই গ্রন্থন সম্ভব করলেন সময়-লাঞ্ছিত কাব্য-আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাসের সূত্রে। বিচ্ছিন্ন এই স্বদেশে সব খবর হয়তো আমি পাই না—কিন্তু এমন চেষ্টা কি খুব বেশি হয়েছে সম্প্রতিকালে?

অনুমান করতে পারি এর জন্য অরুণ সেনকে বেশ কিছু সহজ লোভ ছাড়তে হয়েছে। নইলে, তিনি কয়েকজন প্রধান কবিকে বেছে নিয়ে, তাঁদের কাব্যচর্চার আলোচনা করে, তার থেকে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে

পৌঁছতে পারতেন। এমন তো হামেশাই করা হয় আমাদের একাডেমিক সাহিত্য-আলোচনায়। অথবা তিনি কয়েকটি প্রধান লক্ষণ বেছে নিয়ে, সেই লক্ষণগুলি কবিতায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা করে, তা থেকে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন। এমন তো হামেশাই করা হয় মার্কসবাদী-নিরিখের সাহিত্য-বিচারে।

কিন্তু তার বদলে তিনি বেছে নিলেন বা তৈরিই করলেন হয়তো তাঁর নিজের প্রয়োজনীয় চাবিকাঠি—'ঐতিহাসিক বোধ এবং রুচির গ্রাহ্য সমকালীনতার মধ্য দিয়েই এই বাস্তবকে ধরা'। তাঁর এই প্রণালীটি যে তাঁর অধ্যবসায় ও কবিতার ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ অন্তরীণবাসের ফল তার প্রমাণ তিনি নিজেই রেখেছেন তাঁর সুচিন্তিত প্রথমাংশে। এই অংশের শেষে তিনি স্পষ্ট সূত্র নির্ণয় করেন, 'সত্তরের দশকেই কিভাবে নিরন্ধ্র নৈরাশ্য স্পর্শ করেছে ভিন্ন ভিন্ন দশকের ভিন্ন ভিন্ন কবি-ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে—এ-দশকে সাম্যবাদী আন্দোলনের বিচ্ছেদ, অতি-বামপন্থী হঠকারিতার বিস্তার, এ-সময়ের 'নিশি-পাওয়া' যৌবনের নানা বিচ্যুতি ও গৌরব, আর এর মাঝখানে অ-নাটকীয় বাস্তববাদী অথচ ধ্যানী বামপন্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যর্থতা-সাফল্য-সমস্যা, এ-সবই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কি ভাবে স্পর্শ করেছে কবিদের, অন্তত ভাষার অবচেতন সংবেদ্যতায়, তার অনুসন্ধানই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।' তাঁর অনুসন্ধানের দৃষ্টি এত নির্দিষ্ট ও স্থির বলেই তাঁর অন্বেষণের ফলও বায়বীয় কিছু নয়, অতি স্পষ্ট দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

সময়ের এই নির্দিষ্টতা কিভাবে প্রভাবিত করেছে কাব্যভঙ্গিকে সেই তালাশে অরুণ মিত্র-এর মতো প্রবীণ কবির কবিতা যে 'কখনও-কখনও ...দানা বাঁধছে না' তার কারণ খোঁজা হয়, 'সময়ের চরিত্রবিহীন ভঙ্গুরতা' বা মণীন্দ্র রায়-এর দীর্ঘ কবিতার ফর্মে 'সময়ের বিরুদ্ধতা'। সুভাষদার বাগ্‌ভঙ্গির নিজস্বতা ও মৌলিকতা সত্ত্বেও 'সময়ের চক্রান্তে' তার বলার কথা কেমন বদলে যাচ্ছে 'বিস্ময়করভাবে আত্মজৈবনিক মান-অভিমানে' কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর 'ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতা'-র কারণে ব্যক্তিগতই হয়ে থাকছে না 'সময়ের স্বরলিপি'। সুভাষদার সেই পরাক্রান্ত ব্যঙ্গেরও যেন অর্থ বদলে গেছে—'এ কি নিজেকে ব্যঙ্গ? না কি সময়কে? না কি নিজের কৃতকে?' রাম বসুর চিত্রকল্প আর প্রকৃতির বদলও দেখা যায়, 'এবার যেন একটু প্রশান্তভাবেই তিনি প্রকৃতিকে সরল রূপকার্থে দেখেন, কারণ প্রকৃতির মেজাজ আর যেমন সাড়া দেয় না।' সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র

চক্রবর্তীর ভাষাভঙ্গির আপাত ঐক্য ব্যবহৃত হচ্ছে কোন বিপরীত উদ্দেশ্যে তাও অরুণ সেন আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন।

তাঁর প্রণালীর এই নির্ভুল প্রয়োগেই সিদ্ধেশ্বরকে এমনভাবে ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। 'শব্দকে, বাক্যকে, উক্তিকে আলগা করে দিয়ে আমাদের অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের স্বরূপকে যেন তিনি আরো প্রত্যক্ষগোচর করেন। তাঁর কবিতার ছেদচিহ্ন পর্যন্ত যেন অস্তিত্বের দ্বিধাকেই স্পষ্ট করে। এই দ্বিধা, এই শ্লথগতি, নিজেকে টান টান করে ছড়িয়ে দেওয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় ধৈর্যর উপমান…বিপ্লবীর…দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য।'

আবার এই একই পরিস্থিতি, 'আমাদের দলীয় রাজনীতির বিভেদ, আত্মকলহ, অর্থহীন মারা এবং মরা' শঙ্খের কবিতায় কীভাবে 'অনিবার্যভাবেই ভেতর থেকে বাইরে এল ব্যঙ্গের চেহারায়…সংহত…মিতভাষণে, প্রায় নিঃশব্দ চরণে—কিন্তু সেখানেও লেগে থাকে যন্ত্রণার রক্তচিহ্ন।'

বিশ্বের, ভারতের ও বাংলার নানা মহাকাব্যিক অনুষঙ্গ এঁরা আধুনিক তাৎপর্যে ব্যবহার করে বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা কি ভাবে যোগ করেছেন অরুণবাবু তার উদাহরণ নিবিড়ভাবে জোগাড় করেছেন।

কিন্তু অরুণ সেন-এর প্রবন্ধটির এই সাফল্যগুলিকেও বাহ্য মনে হয় তাঁর প্রধানতম সাফল্যের তুলনায়। 'ভাষার অবচেতন সংবেদ্যতায়' কিভাবে অনুপ্রবেশ, সংক্রমণ বা আক্রমণ ঘটেছে সময়ের,—সমকালীন ও ঐতিহাসিক সময়ের—এই আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় কবিতাগুলি পরীক্ষিত হওয়ার ফলে যেমন নানা কবির বিখ্যাত বৈশিষ্ট্যগুলির বিবর্তন ও সাম্প্রতিকতম অবস্থা ধরা পড়ে তেমনি বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক নানা গুজবও ধরা পড়ে যায় ও তার ফলে বাংলা কবিতার ইতিহাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অরুণ সেন-এর দৌলতে কত দিন পরে এই ঐতিহাসিক সত্যটি আবার উচ্চারিত হল—'সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, রাম বসু বা সিদ্ধেশ্বর সেনকে দিয়েই সকলের মনে চল্লিশের দশক।' আর এই সূত্রেই তিনি আরো এগিয়ে আসেন, 'শঙ্খ ঘোষের শুরুও কিন্তু ঐ চল্লিশের দশকের ঐতিহ্য-ধারায়।' মনে পড়ছে, শান্তিনিকেতনের 'সাহিত্য মেলা'-য় পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে, সুভাষদা তাঁর ছোট বক্তৃতার মধ্যেও শঙ্খের 'যমুনাবতী' কবিতাটি উদ্ধৃত করে তাঁর সংবর্ধনা করেছিলেন। অরুণ সেন ইতিহাসের সেই ধারাটিকেই আর-একবার প্রত্যক্ষ করালেন যে

পশ্চিমবাংলার কবিরা সেই ইতিহাসের দায়কে বহন করে নিয়ে চলেছে সার্থকতা-ব্যর্থতা সহ—মাঝখানে 'চল্লিশের ঐতিহ্যকে ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নন্দনে কবিতা লেখা শুরু করলেন, যাঁরা নিজেদের কৃত্তিবাসগোষ্ঠী বলে ঘোষণা করতেন, সেই পঞ্চাশের দশকের বহু কবি।...কৃত্তিবাসগোষ্ঠী সংঘবদ্ধতা ও প্রচারের জোরে যতটা ঐ দশককে অধিকার করে আছেন, ততটা তা তাঁদের প্রাপ্য কিনা।' তাঁর প্রবন্ধের ৬, ৭ ও ৮ অংশে অরুণ সেন এই জীবন্ততম উপকথাটি উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর সেই উদ্ঘাটনের শেষে দেখা গেল এই সব কোনো রাজারই পরনে কাপড় নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসী-বিদ্রোহের এই গুজবটি এত দূর সফল হল কি করে তার কারণও তিনি দেখিয়েছেন, 'পঞ্চাশের এই কবিরা কবিতার ঝোঁকটা সরিয়ে দিলেন—সামাজিক উপলব্ধির আবেগকে নিয়ে গেলেন ব্যক্তিসর্বস্বতার ছোট জগতে।...অবশ্য ইতিহাসের পাকেচক্রে, সেই প্রয়াসেও "সময়" যে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার কারণ কবিতার ভাষার ক্ষেত্রে তাঁদের কিছু বলার ছিল, করার ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপ্তি ও তীব্রতা তাঁরা আনতে পেরেছিলেন, তার পেছনে ছিল ঐ ব্যক্তিসর্বস্ব ইন্দ্রিয়বোধ। পরন্তু ঐ ইন্দ্রিয়বোধের বাঁকা পরিণতিতে অন্য একটা টেনশনও এসেছিল। ফলে ব্যক্তিসর্বস্বতার পিছুটান সত্ত্বেও ঐ ভাষার নবীনত্বের জোরেই তাঁরা বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ...সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মানতে হবে, পঞ্চাশের ঐ কবিতা ও তাঁদের নন্দনের নৈরাজ্য বাংলা কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।'

'ভাষার অবচেতন সংবেদ্যতা'র নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় অরুণবাবু অনায়াসে পৌঁছে গেছেন এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে। এর বিপরীতে অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পুনর্বিচার, ষাট ও সত্তরের কবিদের নানা প্রয়াস সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্য পায় ও এই প্রবন্ধটিতে ষাট ও সত্তরের তরুণ ও তরুণতর কবিদের বিস্তৃত আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানেও অরুণ সেন তথাকথিত স্বাধীন ও বামপন্থী কবিতার ভাষার সীমাবদ্ধতা ও অনাধুনিকতাকে, সংকটের অভাবকে কবিতার ভাষার উদাহরণেই প্রমাণিত করেছেন। আমার কাছে এই পরবর্তী কবিরা এতদিন একটা সমষ্টিরই অংশ ছিলেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না এঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যও যে খুব স্পষ্ট ধরা পড়ত আমার কাছে, তা-ও নয়। সে হয়তো আমার অবস্থান জন্যই ও ক্ষমতার অভাবেই ঘটত।

কিন্তু অরুণবাবু আমাকে চিনিয়ে দিলেন এঁদের সমষ্টিগত দায় ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের নানা চেহারা।

আমাদের এখানকার, বাঙলাদেশের পক্ষে, এটা কত যে জরুরি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শামসুর বাদে আমাদের আর-সব কবিই তো স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বড় হয়েছে। তাঁদের কাছে বাংলা কবিতার আধুনিকতা ত্রিশ-চল্লিশ থেকে শুরু নয়। তাঁদের কাছে আধুনিকতা মানেই কলকাতার পঞ্চাশের দশকের তথাকথিত কৃত্তিবাসগোষ্ঠির আধুনিকতা। ফলে বাংলাদেশের কবিতায় তরুণদের লেখায় ভাষার একটা কৃত্রিম স্মার্টনেসই হয়ে পড়েছে লক্ষ্য। অরুণ সেন বাংলা কবিতার আধুনিকতার ইতিহাসকে অন্তত আমাদের জন্য পুনর্গঠন করলেন—তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

অনুমান করি, এর প্রয়োজন পশ্চিম বাংলায় ও কলকাতা শহরেও বোধহয় নেহাত কম নয়। আধুনিকতার একটা ঐতিহাসিক পরম্পরাহীন ধারণা তৈরি হচ্ছিল। তার ফলে কবিত্বের সংকটের অনেক সহজ সমাধানের পথও অনেকের সামনে খুলে যাচ্ছিল। হয়তো এই ধরনের এক দীর্ঘ সমীক্ষাতেই সম্ভব সময়ের এই বাঁকচোর, সরলতা-বক্রতা, আবর্ত-ঘূর্ণনকে প্রমাণ-সাক্ষ্যসহ অভিজ্ঞতার বিষয় করে তোলা। তাকেই বলে ইতিহাসের পুনর্পাঠ। এই পুনর্পাঠের অভাবে অনেক ইতিহাসই লুপ্ত হয়ে যায়। অরুণ সেন বাংলা কবিতার ইতিহাসের সেই পুনর্পাঠ সাধন করলেন।

হালের আলোচনা-সাহিত্যে এই ধরনের পরিশ্রমী পুনর্পাঠ সুলভ নয়। বরং যেন ইতিহাসের পারম্পর্য থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকবির বিশ্লেষণই হয়ে ওঠে কাব্য-আলোচনার প্রণালী, বা কোনো কোনো ফর্মগত উপাদানের কাব্যপ্রমাণের সংগ্রহই হয়ে ওঠে কবিতার ঐতিহাসিকের দায়। ফলে, এই প্রবন্ধটিতে হঠাৎ এক বৃহত্তর পটভূমিতে, ক্রমবর্ধমান ভিড়ে ও পাশাপাশি অনেক সমতুলনায় নিজেদের আকস্মিক আবিষ্কার করে কবিরা একটু দিশেহারা বোধ করবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারবেন না হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের খতিয়ান কিন্তু ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই প্রবন্ধটি বারবার পড়ে এই কবিরাই বাংলা কবিতার মানচিত্রে তাঁদের অবস্থানবিন্দুটি নির্ণয় করতে পারবেন। এবং সুতরাং তাঁদের কক্ষপথটিও।

হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার ছোট-খাট ব্যক্তিগত মতভেদ আছে। অলোকরঞ্জনের কাব্যকৃতির প্রভাব আরো ব্যাপক ছিল। কেন তা স্থায়ী হল না তার কারণ অরুণবাবু খোঁজেন নি। বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর কবিতার

প্রথম দিকের 'বিষয়' কি ধারাবাহিক এগিয়ে আসতে পেরেছে? কোথাও কি ছেদ ঘটে যায় নি—যেখানে কবিকে একটা ভঙ্গির আনুগত্য মেনে নিতে হয়েছে আর সরে যেতে হয়েছে বিষয়হীনতায়? এই রকম আরো কিছু প্রশ্ন হয়তো তোলা যায়। কিন্তু সে-সব প্রশ্নই অরুণবাবুর প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সম্পূর্ণ সাযুজ্য থেকেই উত্থিত। হয়তো অরুণবাবুর মনেও এই ধরনের প্রশ্ন আরো আছে। আমরা অপেক্ষা করব তিনি সেই সব প্রশ্নের নিরসনে আধুনিক-সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান-বিন্যাস এ-রকম করে যাবেন।

'সত্তরের দশকের বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতি'

অনিরুদ্ধ পাল

'পরিচয়'-এর সমালোচনা সংখ্যায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনাটি পড়ে উপকৃত হলাম। এই সংখ্যার কবিতা ও প্রবন্ধের আলোচনায় লেখকগণ যে পরিমাণ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সরোজবাবুর প্রবন্ধে তথ্যের প্রমাণ ততটা নেই। থাকলে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণতর হতো। কিন্তু তাঁর এই লেখাটিতে কয়েকটি সমালোচনাসূত্র আমরা পেয়ে যাই। যেমন, বেল্টসেলারকে উপন্যাসের একটা লক্ষণ হিসেবে ধরা। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র সমালোচনায়ও তিনি একটি সাহিত্যিক সূত্র ধরিয়ে দেন, "স্বপ্ন আর রিয়্যালিটির সংঘাতে কে হারল, কে জিতল দেখাতে গেলে তুটোর উপরেই জোর দিতে হবে। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো মন্তব্য শুধু মন্তব্যই থেকে গেছে। সেই মন্তব্য কোনো সাহিত্যসূত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় না। সেই মন্তব্য প্রমাণের দায়ও তিনি নেন নি।

যেমন তিনি লিখেছেন, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সমরেশ বসু, এঁদের মধ্যে সমরেশ বসুই একমাত্র যিনি বাংলা উপন্যাসের 'তিরিশের তিন প্রধানের' ঐতিহ্য বোঝার চেষ্টা করেছেন। 'বিমল কর এবং রমাপদ চৌধুরী…যে জীবন আঁকেন তা যেন বড় বিবর্ণ, তাঁদের অভিজ্ঞতার জগতটা বড় ছোট। অথচ এঁরা দুজনই আগের দশকে "এখনই" এবং "যদুবংশ" লিখেছেন। এই অংশটিতেও সরোজবাবু, রমাপদ চৌধুরী ও বিমল করের অনেকগুলি উপন্যাসের নাম করেন, যা তাঁর মতে ভালো।

একাধিক ভালো উপন্যাস লিখেও এঁরা কেন একটু তুলনামূলক কম গুরুত্ব পাবেন? 'অভিজ্ঞতার জগত ছোট' হওয়ার সঙ্গে কি উপন্যাসের সার্থকতা-ব্যর্থতার কোনো সম্বন্ধ আছে? বিমল কর হয়তো অনেক লেখার ফলে তাঁর বিষয়ের নির্দিষ্টতা নষ্ট করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার জগত ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিমল কর তাঁর অসুস্থ, স্নায়ুপ্রধান, স্মৃতিনির্ভর জগতকে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন। তাঁর এত সব লেখার মধ্য দিয়ে আমরা লেখকের জীবনদৃষ্টির একটা ধারণা অন্তত করতে পারি। বা রমাপদ চৌধুরী জীবনের নৈতিকতাকে উপন্যাসের বিষয় করেছেন। সমরেশ বসুর বহুবৈচিত্র্য কি তাঁর জীবনদৃষ্টিকেই বহুখণ্ডিত করে দেয় নি? তাঁর জীবনদৃষ্টি কি?

সমরেশ বসু ও মহাশ্বেতা দেবী প্রসঙ্গে সরোজবাবু প্রবন্ধের শেষাংশে যে আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তাতেও এ-রকম অসঙ্গতি আছে। অসঙ্গতিটা সেখানে আরো বেশি। কারণ আলোচনায় সরোজবাবু প্রায় কিছু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'অদম্য আন্তরিকতা', 'অবিচল দায়বদ্ধতা ও ক্রোধের অকৃত্রিমতা'-য় সরোজবাবুর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এইগুলি একসঙ্গে থাকলেই কি উপন্যাস বা অন্য কোনো শিল্পের সার্থকতা এসে যায়? বরং অনেক সময় দেখা যায় অদম্যতা, অবিচলতা ও অকৃত্রিমতা শিল্পীকে তাঁর ভূমিকার প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য, কখনো বা এমনকি আত্ম-বৈপরীত্য, সম্পর্কে অচেতন করে ফেলে। সরোজবাবু মহাশ্বেতা দেবীর কোনো উপন্যাসের শিল্পগত আলোচনা না করেই মন্তব্য করেছেন 'তারাশঙ্করের থেকে তাঁর দৃষ্টি অবিকম্পিত'—কোন দৃষ্টি? শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি? তা হতে পারে, হওয়া উচিতও হয়তো। কিন্তু হয়েছে কিনা সেটা বিবেচ্য। তাহলে তো সরোজবাবুর উচিত ছিল চরিত্র-কল্পনায় তারাশঙ্কর ও মহাশ্বেতার তুলনা করা। কিন্তু শিল্পদৃষ্টি? বা শিল্পসৃষ্টি? ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির চাইতেও তাঁর কলম বোধহয় বেশি অবিকম্পিত থাকা উচিত। কারণ লেখার ভেতর দিয়েই তো তাঁর দৃষ্টির পরীক্ষা।

মহাশ্বেতা দেবী এক অতি সরল ও তৎপর গদ্যে কিছু অতি অকৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে, পশ্চিমবাংলার কিছু সীমান্ত অঞ্চল ও বিহারের কিছু অঞ্চলের জমির লড়াইয়ের কাহিনী লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো উপন্যাসে স্থানের বর্ণনা ও বিবরণ থেকে, চরিত্রদের ভেতরের সংলাপ থেকে বা এমন-কি ভূমিসমস্যাদির বিবরণ থেকেও আমরা জানতে পারি না জায়গাটির ইতিহাস-ভূগোল ও মানুষগুলির বৈশিষ্ট্য কি কি? সব জায়গাতেই অত্যাচার হচ্ছে,

ক্ষেতমজুররা খুব লড়াই করেছে। কিন্তু এসব তো ব্যক্তিগত চরিত্রের কাহিনী হয়ে উঠতে হবে। উপন্যাসের ভেতরে সেই ব্যক্তি হয়ে উঠবে শ্রেণী বা সমাজের প্রতিনিধি। মহাশ্বেতা দেবীর যে-কোনো উপন্যাসের যে-কোনো চরিত্র ও যে-কোনো ঘটনা ভারতবর্ষের যে-কোনো রাজ্যের যে-কোনো জায়গায় ঘটতে পারে, থাকতে পারে। মহাশ্বেতা দেবীর যে-কোনো উপন্যাস বিশ্লেষণ করেই একথা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু আলোচনার আলোচনায় সে সুযোগ নিতে চাই না। সরোজবাবু লিখেছেন—'মৃত্তিকার বদ্ধাবস্থা থেকে মহাশ্বেতার চরিত্র যেদিন ডাইনামিক হয়ে উঠবে…।' মহাশ্বেতার কোন চরিত্রটি বা ঘটনাটি 'মৃত্তিকার গ্রথিত ?' তারা কি তাদের 'মৃত্তিকার ভাষা'য় কথা বলে ? তারা কি তাদের মৃত্তিকাটিকে নির্দিষ্ট ভাবে চেনে ? কোন দেশে গেলে আমাদের পা ফেলেই মনে হবে—মহাশ্বেতার দেশ ? কিন্তু এখনো রাঢ় দেশে পা দিয়েই তো আমরা তারাশঙ্করকে মনে করি। কোন বাস্তবতাবোধ বা ভালোবাসার ফলে এমন সাফল্য তারাশঙ্করের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ?

তেমনি, বিষয়-বৈচিত্র্য যদি অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে দোষ হয়, তবে তা কেন সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে গুণ ? 'টানা-পোড়েন' হয়তো ভালো উপন্যাস। এরকম উপন্যাস লেখায় সমরেশ বসুর দক্ষতাও আছে। কিন্তু তাতে 'আঁকাড়া জীবন' কোথায় পেলেন সরোজবাবু ! লেখক তাঁর আহরিত তথ্যগুলোকে কাহিনীতে গুঁজে দিয়ে শুরুতেই এক অবসরপ্রাপ্ত ও অন্ধ বৃদ্ধের দীর্ঘ ও অলস স্মৃতি চর্চার সুযোগ নিয়েছেন।

'আবেগের মেল বন্ধন'-এর অভাবে এ উপন্যাসের বিলাসকল্প চরিত্রের অনুপস্থিতি ঘটে নি,—ঘটেছে ঐ জীবনের প্রত্যক্ষ স্পর্শের অভাবেই। কিন্তু কোনো বিলাসকল্প চরিত্র এনেই কি এ উপন্যাস তার দোষ কাটাতে পারত ? তাহলে বিলাসের সীমাবদ্ধতা কার্যত কিসে ? সরোজবাবুর এই ফর্মুলাতেই তো 'গঙ্গা'-তে বিলাস এসেছিল—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র করালীকল্প চরিত্র হয়ে। তাতে কি 'গঙ্গা'র সমস্যা মিটেছিল ?

আমার বিনীত অনুরোধ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সমালোচক এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করে ভবিষ্যতে 'পরিচয়'-এ একটি প্রবন্ধ লিখুন।

'যন্ত্রের স্বরলিপি'
দিলীপ বসু

বন্ধুবর পদ্মনাভ দাশগুপ্তকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, আমার অগ্রজপ্রতিম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের (বটুকদার) নবজীবনের গানে পাশ্চাত্য সংগীতের, বিশেষ করে বেঠোভন্‌-এর প্রভাবের দিকটি তুলে ধরার জন্য। বটুকদা সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই এত মধুর স্মৃতি ভিড় করে আসে যে, ভারাক্রান্ত হৃদয়েও ও শিথিল কলমে রাশ টানতেই হবে।

ইদানীং বিশেষ করে বটুকদা মাঝে-মাঝে সকালে এসে হাজির হতেন, অবশ্যই আগে থেকে কোনো খবর না দিয়ে। যে কোনো কাজ মুলতুবি রেখে বা বাতিল করে দিয়ে সারা সকালটা কাটত চমৎকার প্রশান্ত পরিবেশে সংগীত-আলোচনা করে আর আমার দুষ্টুমি থাকত মাঝে-মাঝে আলোচনাটাকে এমন অবস্থায় নিয়ে ফেলতে যেখানে বটুকদাকে গলাতে গান তুলতে হবে। এই সৈকালিক আসরে তাঁর 'নবজীবনের গান' সম্পর্কে কেবলমাত্র আমাদের দুজনের মধ্যে যে টুকরো টুকরো আলোচনা হয়েছে, সেটাই যথাসম্ভব স্মরণ করে বলার চেষ্টা করব।

গোড়াতেই বলে রাখি, বেঠোভন্‌-এর তৃতীয়, পঞ্চম ও নবম সিম্‌ফনি (সংধ্বনি)-র মাধ্যমে যে দুর্জয় সংকল্প প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে, বটুকদা সে সম্পর্কে ছিলেন একেবারে উচ্ছ্বসিত এবং তিনটি সিম্‌ফনি লেখার পটভূমি নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল।

তৃতীয় সিম্‌ফনিতে ষড়জের প্রয়োগ, নেপোলিয়নকে উৎসর্গ করে পরে বেঠোভন্‌-এর সেটা প্রত্যাখ্যান আর পঞ্চমে এসে একেবারে শুরুতেই নিজের বধিরতার বিরুদ্ধে বেঠোভন্‌-এর প্রতিবাদ—ডা-ডা-ডাঃ—যেটি আজ আন্তর্জাতিক ভাবে মর্স কোডের অন্তর্ভুক্ত, এ তো আমরা জানি।

কিন্তু ১৯ বছরের তরুণ বেঠোভন্‌-এর জীবনে যেমন ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, এবং ব্যক্তি-মানুষের জয়গান তাঁর সমগ্র সত্তা ধরে নাড়া দিয়েছিল, তেমনি তরুণ কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিসত্তাকে আপ্লুত করেছিল ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের গণমুক্তির বাণী। তাই দেখি আজন্ম ভোগবিলাসে লালিত ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় পালিত কবির নব-দ্বিজত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী বিভীষিকা এবং ভীষণ বুভুক্ষা তাঁর স্পর্শকাতর সংবেদনশীল কবি-মানসকে উত্তরিত করেছে

নতুন চেতনাতে, উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করছেন,

স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে
স্টালিনগ্রাদে, মস্‌কোভায়
টিউনিসিয়ায়, মহাচীনে।

আর মুখরিত জনতার ঐক্য ও সখ্যে, কামার কুমোর ছুতোর মজুর কৃষক সবাইকে নিয়ে হাত লাগিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে নবজীবন গড়তে তিনি ব্রতী।

কবি ও সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের এই মানস-চেতনার বিবর্তনটি চোখের সামনে না রাখলে আমরা 'নবজীবনের গানে'র প্রধান উৎস ও প্রেরণাকেই হারিয়ে ফেলব।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত গোড়াতেই এটা বলে নিয়েছেন যেভাবে সেটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'বাংলা গানের ইতিহাসে "নবজীবনের গান" যে নতুন সংগীতাদর্শের সন্ধান দিয়েছিল, সেটা কোনো আকস্মিকতা বা আপতনের ফল নয়। সামাজিক ইতিহাসে যেমন ঘটনা-পরম্পরা, সংগীতেতিহাসে তেমন প্রবহমাণ ঐতিহ্য সুনির্দিষ্ট পথে অনিবার্যভাবে আমাদের নিয়ে যায় মোড়বদলের ক্রান্তিবিন্দুতে। এবং এই দুই ইতিহাসের সম্পৃক্ততার প্রমাণ শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ মহাযুদ্ধের সঙ্গে "নবজীবনের গান"-এর যোগাযোগেই শেষ হয়ে যায় না; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র সামগ্রিক সংগীত-রচনার এই সম্পৃক্তভাবের অমোঘ পরিস্থিতি।'

নবম সিমফনি তো নিয়মের বাইরে বেঠোভন্-এর সৃষ্ট নিজস্ব নিয়ম—একেবারে বধির মানুষটি শিলারের *Ode to Freedom*-কে *Ode to Joy* নামে সেন্সারকে এড়িয়ে যেভাবে সিম্‌ফনি রচনা করলেন ইউরোপীয় সংগীতের ইতিহাসে সেটা একটা দিকচিহ্ন, একটা নতুন পথের শুরু।

এ সবই ঠিক, কিন্তু আমার মনে হয় বেঠোভন্ থেকে রোমান্টিক আবহাওয়াতে জারিত হয়েও বটুকদার আসল মেজাজ কিন্তু একেবারে খাঁটি ধ্রুপদী—একদিকে বাখ, অন্যদিকে তানসেনের শুদ্ধবাণী ধ্রুপদের ভাবধারাতে রবীন্দ্রপ্রভাবে যার জন্ম, লালন ও বেড়ে-ওঠা। অবশ্যই বেঠোভন্ যেমন বাখ এবং মোৎসার্টে'রও উত্তরসূরি, সেদিক থেকে কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সহজাত সাংগীতিক প্রতিভাতে নিশ্চয়ই ধ্রুপদী ও রোমান্টিকতাতে কোনো বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব নেই, থাকলে বৈপরীত্যের ঐক্যই আছে।

আর সেজন্যই সবচেয়ে যেটা প্রায় বিস্ময়ের কথা—'নবজীবনের গানে'র সুরারোপে স্বাভাবিক প্রায় সরল পথে লোকসংগীত চলে আসে ধ্রুপদী সংগীতের কাঠামোতে।

পদ্মনাভের সঙ্গে কাজেই আমি একেবারে একমত, যখন তিনি বলেন : 'অবশ্যই এই পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সিমফনি বা অনুরূপ কোনো ফর্মকে সরলভাবে অনুকরণ করার কোনো অসম্ভব প্রচেষ্টা হয় নি—বাংলা গানের ক্ষেত্রে যে-অনুকরণ হতো একেবারেই নিরর্থক।' সঠিক ভাবেই তিনি বটুকদার পলিফনিক এফেক্ট তৈরি করার কথা বলেছেন, যেটি মেলডিকে ব্যাহত করে নয়, তারই সার্থক রূপায়ণ। শেষোক্ত কথাটি অনেক সময়েই আধুনিক সুরকারদের প্রচণ্ড চমক লাগাবার চেষ্টার দিকেই নজর টেনে বলার প্রয়াস করছি।

দ্বিতীয়ত, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত 'দামামা বেজেছে' বা 'পথে পথে শঙ্কা'-তে যথাক্রমে হিন্দোল ও মালকোশের স্বরগ্রামের কথা যা বলেছেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে একটা মজার ব্যাপার নিবেদন করি। একদিন সকালে যখন বটুকদাকে বলি, 'আপনি তো হিন্দোলে "দামামা বেজেছে" গান বেঁধেছেন?' তিনি যেন প্রায় চমকে উঠলেন। বুঝলাম সহজাত সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় এটি। তখন দুষ্টুমি করে বেসুরো গা-গা-সা-সা, গা-গা-গা, র্ম-র্ম-র্ম (কড়ি) ধ-ধ-ধা-সা-সা-সা ইত্যাদি বলা মাত্র, বলা বাহুল্য, তার কণ্ঠে সুর ভর করে দারুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। বড মধুর সে স্মৃতি।

তারপর আলোচনাটা যে-খাতে গেল তাতে প্রধান বক্তব্য ছিল, ধ্রুপদী সংগীতের উৎস যেমন দেশি বা লোকসংগীত থেকে এসেছে, তেমনি পল রোবসনের মতো বিখ্যাত লোকসংগীত গায়কেরও মতে (***Here I Stand***-নামে রোবসনের আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য) লোকসংগীত সাধারণত পাঁচ পর্দা অর্থাৎ ঔড়ব জাতের কাঠামোতেই রচিত।

আর বটুকদা যখন হিন্দোল, মালকোশ, দুর্গা ('হিংসা হেনেছে কতো অস্ত্র' ইত্যাদি) রচনা করেন, তখন পাঁচ পর্দাতেই মূর্ছনার বদলে নতুন রাগের সৃষ্টি হয়, এ তো সহজেই প্রমাণ করা যায়। প্রসঙ্গত ভূপালীর গান্ধারের মূর্ছনাতে বেজে উঠবে মালকোশ, তার পঞ্চমের মূর্ছনাতে দুর্গা, হিন্দোলের ষড়জ ভেদে আসবে সাধারণত ভৈঁরোর কাছাকাছি রাগের আভাস।

সেই সূত্রে বটুকদা তখন শুরু করলেন গাইতে :

সাগর শুকায়ে গেল
[illegible] কোন্ আগুনে রে……

দেখালেন জারি গানের খাঁটি লোকসংগীতের কাঠামোতে ধ্রুপদী সংগীতের সাজ।

'সমাজ, ইতিহাস, আর্থিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গে'

১

গমীলা মেহ্‌তা

উনিশ শতকের বাংলা ও ভারতবর্ষের 'নবজাগরণ' অভ্র ঘোষ একটি বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাকে মূল্যও দিয়েছেন প্রায় সবচেয়ে বেশি। রামমোহন-বিতর্ক, বিদ্যাসাগর-বিতর্ক ও রিনাসান্স-বিতর্ক—এই তিনটি বিষয়ে, যা মূলত একটি বিষয়, নানা মতামতের জটিলতাকে তিনি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। তিনি যে জটিলতাকে অতিসরল করে নেন নি, বরং প্রধান ইস্যু-গুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এতে তাঁর সন্ধানের সততাই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু এখানেই বোধহয় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে ফেলেছেন। তাই তাঁর বের করা ইস্যুগুলিতে প্রাধান্য পায়—রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন কিনা, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রথম ছিলেন কিনা, বিদ্যাসাগর জনমুখী শিক্ষানীতির পক্ষে ছিলেন কিনা, সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন কিনা—এই সব তথ্য-বিতর্ক। কোনো গবেষকের বক্তব্যের তথ্যভিত্তির দুর্বলতা দেখাতে তাঁকে অনেকটা জায়গা দিতে হয় সেই গবেষক কোন উদ্ধৃতি আংশিক গোপন করেছেন তা প্রমাণ করতে।

কিন্তু বিষয়ের বিচারে এগুলো তো বাইরের প্রশ্ন। উনিশ শতক সম্পর্কিত এই বিতর্ক তখনই প্রবল হয়ে উঠেছে যখন ভারতীয় জাতীয় পরিস্থিতির ব্যাখ্যা নিয়ে কমিউনিস্ট রাজনীতি ও মার্কসবাদী মতাদর্শ সঙ্কটে পড়েছে। ৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী বিচ্যুতির যুগে উনিশ শতকের বাঙালি জাগরণকেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করা হয়েছিল। আবার ৬৯ থেকে কমিউনিস্ট-আন্দোলনে নকশালপন্থী চিন্তা ও কর্মের বিচ্ছিন্নতাতে উনিশ শতককেই আক্রমণ করা হল। এই দুই আক্রমণেরই ঐতিহাসিক সূত্র, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা, এমন-কি ভাষা পর্যন্ত এক।

এই পুনরাবৃত্তি ঘটা যে সম্ভব হল তার একটি কারণ বোধহয় এই যে ৪৮-৪৯-এর ঐ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট আন্দোলন গ্রহণ করে নি। ৫২ থেকে ৬৯ পর্যন্ত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক চিন্তায় ভারতীয় ইতিহাসের এই পর্ব সবচেয়ে উপেক্ষিত [illegible] ৬৯-এর পর থেকে এই পর্বই যেন সবচেয়ে বেশি আলোচিত। কিন্তু এবারের এই বিতর্কের একটি ভালো ফল হয়েছে। আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক প্রয়োজন না

থাকলেও এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা-গবেষণা চলছে। ফলে, এমন একটি আশা হয়তো অসংগত নয় যে এতদিনে আমাদের উনিশ শতক সম্পর্কিত প্রশ্ন গভীরতর তাৎপর্যে বিচার করা হচ্ছে। এই বিচারে স্বভাবতই কলকাতার ও পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণী।

অভ্র ঘোষ-এর প্রবন্ধে এই আধুনিক গবেষণার কোনো পরিচয় দেয়া হয় নি—এগুলো অধিকাংশ ইংরেজিতে লেখা বলেই হয়তো; যদিও রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি ইংরেজি বই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু লেখক নিজে এগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকলে হয়তো তাঁর উত্থাপিত ইস্যুগুলিকে, আরো যে-সব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে তার সন্নিবেশে, সম্পূর্ণতা দিতে পারতেন।

আমি এ-প্রসঙ্গে মাত্র কয়েকটি রচনার উল্লেখ করছি।

১৯৭২-এ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নীহাররঞ্জন রায় 'ন্যাশন্যালইজম ইন ইণ্ডিয়া'-র ওপর তিনটি বক্তৃতা করেন। ১৯৭৩-এ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ই ঐ বক্তৃতা-গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই তিনটি বক্তৃতাতে নীহাররঞ্জন রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের আধুনিক কালের কয়েকটি সংঘাত-সূত্রকে—হিন্দু-মুসলমান, বর্ণহিন্দু-তপশিলিহিন্দু, গ্রাম ও নগর—ইতিহাসের ধারায় বিচার করতে গিয়ে গত দেড়শ বৎসরের অব্যবহিত কার্যকারণের চাইতেও প্রাধান্য দিয়েছেন ভারতের দীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাসেরই কার্যকারণ প্রক্রিয়ার। তিনি বরং শুধু কলোনিয়াল পর্বের ইতিহাস-বিচারে বিভ্রান্তির আশঙ্কা করেন।

আবার, প্রায় যেন বিপরীত রীতিতে বরুণ দে তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে যাচাই করতে চেয়েছেন ভারতীয় পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের ক্ষেত্রে রিনাসান্সের প্রতিতুলনার ন্যায্যতাকেই। তাঁর এই বিচারে—সাম্রাজ্যবাদের আওতায় ভারতীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে রিফর্মেশন আর রিনাসান্সের তর্ক কত তুচ্ছ হয়ে যায় দুই ইতিহাসের অনিবার্য ভিত্ উপাদানের জন্যই—এটাই তিনি প্রমাণ করেন। অভ্র ঘোষ-এর প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃত বদরুদ্দিন উমরের রিফর্মেশন-রিনাসান্সের তুলনাটির আপাত যুক্তিগ্রাহ্যতা স্থাপিত হতে পারত এই বক্তব্যের পাশাপাশি। তাতে আমরা একটা নতুন পরীক্ষা পেতাম।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিচারে দুটি খুব জরুরি বই—'রামমোহন রায় এ্যাণ্ড প্রবলেমস অব মডার্নিটি ইন ইণ্ডিয়া' (সংকলন) ও অশোক সেন-এর 'বিদ্যাসাগর এ্যাণ্ড হিজ এলুইসিভ মাইলস্টোনস' বই দুটি। রামমোহন-বিতর্কের এক তথ্য-ফাঁদ তৈরি করেন রমেশচন্দ্র

মজুমদার মশাই, যিনি নিজেই এই বিতর্কে তথ্যকে ব্যবহার করেন তাঁর পছন্দ-মতো তত্ত্ব-প্রমাণের কাজে—যদিও তাঁর ইতিহাস-দর্শনের প্রধান কথাই নাকি তথ্যের অভ্রান্ততা। আমাদের উল্লিখিত বইটিতে রামমোহনকে বিচার করা হয়েছে তাঁর কর্মের তৎকালীন প্রয়োজন ও পরবর্তী ফলের ভিত্তিতে।

বোধহয় এই পদ্ধতিতেই ব্যক্তির ভূমিকার নতুন বিচার সম্ভব হয়। অশোক সেন বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন এখানেই যে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ তাঁকে প্রাণিত করেছিল সামাজিক কর্মে—সাহেবদের মতো জীবনযাত্রায় নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সামাজিক কর্মের সীমাও তো সংকীর্ণ ছিল এক কলোনির জীবনের নষ্ট অর্থনীতি ও বিধ্বস্ত সমাজে। আবার, ব্রিটিশ-কলোনির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার জন্যই সাম্রাজ্যের সমর্থক ও বিরোধী, মাত্র এই দুটি ভাগে ভাগ করে কোনো বিচারও অসঙ্গত। তাঁর মতে, কলোনির প্রয়োজনে তৈরি এক মধ্যবিত্তের অপরিণত শ্রেণী-বিকাশে বিদ্যাসাগরের সামাজিক কর্মপ্রয়াসের ট্র্যাজেডি ছিল অবধারিত।

অর্থাৎ উনিশ শতকের ও তার ব্যক্তিনায়কদের বিচারে 'হয় নবজাগরণ নয় মুৎসুদ্দি জাগরণ' এই ভাবে বিষয়টিকে উত্থাপন আবশ্যিক নয়। বাঙালি-ভারতীয় নিয়তির একটা ট্র্যাজেডিও ছিল।

আবার, এই সব রচনার বিপরীতে, আমেরিকার ভারতচর্চায় ডেভিড কফ-এর গবেষণাগুলিতে মারাত্মক সব ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালি সমাজের রক্ষণশীলদের ভেতর প্রোটো-ন্যাশনালইজমের সন্ধান চলছে।

অভ্র ঘোষের উত্থাপিত বিষয়গুলির সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের এই রচনাগুলি এত বেশি জড়িত যে মনে হয় এই আলোচনাগুলি গ্রথিত হলে তাঁর আলোচনা-বিচার সম্পূর্ণতর হত।

২

কমলা মুখোপাধ্যায়

আপনাদের পত্রিকার (সমালোচনা সংখ্যা ১৩৮৭) এই বিশেষ সংখ্যাটি নানা কারণে মূল্যবান হয়েছে। এর মধ্যে আমার ও আমার সমগোত্রীয়দের বিশেষ ভাবে ভালো লেগেছে, শ্রীঅভ্রঘোষের 'সমাজ ইতিহাস, আর্থিক ও

অন্যান্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি। তাঁর প্রবন্ধটির canvas বা পটভূমিকা অতি বিস্তৃত—সব বিষয়ে মতামত দেবার মত পাণ্ডিত্যও আমার নাই। শুধু ৭৬-পৃষ্ঠায় বিংশ শতাব্দীর ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে সুপ্রকাশ রায় প্রভৃতিদের লেখার আলোচনায় তিনি শ্রীকালীচরণ ঘোষ'-এর 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' ও তার পরে অরবিন্দ ও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সব মতামত প্রকাশ করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর উক্তি—'এসব কারণে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের উপর ইতিহাস তো নয়ই, সত্য কিছু লেখা অসম্ভব' ও পরের প্যারাগ্রাফটি লেখার জন্য তাঁকে আবার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। কারণ শ্রীসুপ্রকাশ রায় বা অন্যান্য রাজনৈতিক গবেষকরা বিশেষ করে বামপন্থী গবেষকরা বিপ্লবী আন্দোলনের উপর—ততখানি মন দিয়ে প্রকৃত গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন বা চেয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের মতে কয়েকজন সরকারি বা ইউরোপীয় অফিসার খুন—অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের জন্য ডাকাতি ও ফাঁসি যাওয়া—এইটুকুই মাত্র তারা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে জনগণ বা শ্রমিক কৃষকদের থেকে তাঁরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। অভ্রবাবু অরবিন্দের যে-সব লেখার উল্লেখ করেছেন—তার উপর অধ্যাপক হরিদাস ও উমা মুখার্জির লেখা দুটি গ্রন্থ উল্লেখনীয়—সে দুটি হল ১. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ। ২. **Sri Aurobinda & New Thought in Indian Politics**—তাতে রাজনৈতিক চিন্তাধারা, দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্য—মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করার জন্য অরবিন্দের অবদান খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। অরবিন্দ ও তখনকার চিন্তাশীল নেতারা চেয়েছিলেন—মানুষ তৈরি করতে, ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে, রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির করতে।

বঙ্গভঙ্গের আগেই যে ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ সিপাহী বিদ্রোহের পর পুঞ্জীভূত হচ্ছিল—উনবিংশ শতাব্দীতে তারই বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে। জমি অধিকার করে অন্যায় ও নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও কৃষক সমাজ বিদ্রোহ করেছে—সফল হয় নি—কিন্তু তা কি বিফল হয়েছে পরবর্তী কালের পরিপ্রেক্ষিতে? তেমনি শিক্ষিত সমাজের একাংশ যখন ব্রিটিশ রাজত্বকে আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন সেই সময় বিদেশী শাসককে হটিয়ে দেশ স্বাধীন করার কথা

তো শিক্ষিত সমাজই তুলে ধরতে পারেন—বিপ্লবীদের তাই প্রচেষ্টা ছিল কারণ তাঁরাই তখন সচেতন বেশি—তাদের আন্দোলনের সঙ্গে সেটা ঠিক কিন্তু আইরিশ, ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর কাভুরের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে ছিল—দেশকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী (ব্রিটিশের শত্রু) শক্তির সাহায্য নেওয়া ও দেশীয় সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটাবার প্রচেষ্টাই তাঁরা প্রথম করেন—সেই প্রচেষ্টা কোনে কোনা জায়গায় কিছুদিন সফল হলেও শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয় নি। কিন্তু শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মনে বিপুল আলোড়ন ও উদ্দীপনা, ত্যাগের মন্ত্র, সাহসিকতার বীজ তাঁরা বপন করতে পেরেছিলেন—পরবর্তী কালে গান্ধীজির গণ-আন্দোলনগুলিতে এই সব বাংলার বিপ্লবীরাই প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে, সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এঁরাই ছিলেন অগ্রণী যখন অন্যান্য নতুন গজিয়ে ওঠা ধনিক শ্রেণী বিলাসে ও ইংরেজ তোষণে ব্যস্ত। শিক্ষিত সংস্কারক শ্রেণী ব্রাহ্মদেরও কাজকর্ম অনেক দিকে প্রশংসনীয় হলেও তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন কল্পনাও করতে পারেন নি। তাছাড়া একটা আদর্শবাদ বিপ্লবীরা লোকের সামনে রাখতে পেরেছিলেন—যা আজকের দিনে একেবারেই অনুপস্থিত। তখনকার রাজনৈতিক কর্মী বা বিপ্লবী—ঘরবাড়ি সর্বস্ব ছেড়ে ব্যক্তিগত সুখের আশা না করে জীবন বলিদান করতে প্রস্তুত। আর আজ। রাজনৈতিক কর্মী ভাবে কিছু লাভের আশায় যারা কাজ করেন—কোনও আদর্শের জন্য নয়। তখনকার দিনে ভালো ছেলেরাই আসতেন আন্দোলনে, আজকের অবস্থা তা নয়। তাছাড়া বিপ্লবীরা বুঝেছিলেন তাঁরা হয়তো এই ভাবে দেশকে বিদেশী শাসক মুক্ত করতে পারবেন না, তার জন্য ২।৩ প্রজন্ম লাগবে। বাঘা যতীন তো বলেছিলেন 'একবারেই স্বাধীনতা আসবে ভাবি না—কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে বাঙালি মরতে ভয় পায় না তাই দেখিয়ে যাব।' দেশের জনচিত্তকে যদি স্বদেশ প্রেম ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন—তাও যথেষ্ট। এ ভাবই মাস্টারদা সূর্য্যসেনের ডায়েরিগুলিতে দেখি রবীন্দ্রনাথের 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ' এই ভাবটি ১৯২০ সালে বিদেশা শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা ব্যর্থ হলে বিপ্লবীদের মনোগত ভাব ছিল। গবেষক এমন কি বামপন্থী বা প্রগতিশীল গবেষকদের মধ্যে বিপ্লবী যুগের মূল্যায়ন করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই নেই। বোধহয় এই যুগের সমালোচকদের মধ্যে অভ্রবাবুই এই দিকটা এমন স্পষ্ট ভাবে

তুলে ধরলেন।

আজ তো সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে, কৃষক আন্দোলনও কম হয়নি কিন্তু নেতৃত্ব কে দিচ্ছে। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই। তারা যে শ্রেণীস্বার্থ চ্যুত (declassed হয়ে শ্রমিক কৃষক শ্রেণীভুক্ত হয়ে গেছেন এমন তো এখনও হয়নি এবং আজও কৃষক শ্রেণী কত জমি পেয়েছে, বা তাদের পাশে নিরলস ভাবে রাজনৈতিক পার্টির কর্মীরা দাঁড়িয়েছেন তাও শুনি নাই। সুতরাং সেই ৫০।৬০ বছর আগের বিপ্লবী কর্মীদের বর্তমান শ্রেণী-সংগ্রামের নিরিখে পর্যালোচনা করা সঠিক নয়। সর্বোপরি দেশপ্রেম কি অন্যায়? আজকাল দেশকে ভালোবাসাটা সেকেলে বলে মনে হয়—বিপ্লবীরা অন্তত নিজের দেশকে ভালোবাসতেন ও ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন—আজ তো দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের বা দলের স্বার্থ বড় হয়ে গেছে। অভ্রবাবুর লেখায় গত শতকগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করার একটা চেষ্টা দেখা গেল যা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই অসংগঠিত, সংগঠিত বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে, অসন্তোষ ও চেতনা ব্যাপক হতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত **INA, Naval Mutinity** প্রভৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। খণ্ডিত হলেও স্বাধীনতা এসেছে। বামপন্থী পার্টি এসব আন্দোলনে দর্শক ও সমালোচক, অংশীদার নয়—লেনিনের 'ঔপনিবেশিক তত্ত্ব' সত্ত্বেও।

দীর্ঘ লিখে লাভ নাই—এ বিষয়ে বহু আলোচনার অবকাশ আছে। অভ্রবাবুর লেখায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই আমাদের পক্ষ থেকে। এখন অনেক কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে, অনেকে এখনও বেঁচে, নতুন ভাবে কাজও হচ্ছে। যদি গবেষকরা এগিয়ে এসে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের মূল্যায়ণ করেন ও বর্তমানের যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন—আদর্শবাদকে দেশের সেবার জন্য জাগ্রত করে তুলতে পারেন তাহলে সবদিক থেকেই কল্যাণ। জানি না আমার বক্তব্য সঠিক ভাবে বোঝাতে পেরেছি কিনা।

গল্পসল্প

'নামে বাঁধিবারে চাই না নামে নামের পরিচয়'

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

'গল্পসল্প' [প্রকাশ ১৩৪৮ বৈশাখ বা ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ] রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প-সঙ্কলন। এজন্য এর তাৎপর্য আলাদা ধরনের। এর রূপেও একটু বিশিষ্টতা আছে, স্বাদও ভিন্ন ধরনের। অথচ গ্রন্থটির অ-সাধারণ বিশিষ্টতা অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে।

দৌহিত্রী নন্দিতাকে তিনি এটি উৎসর্গ করেছেন ১২ই মার্চ, ১৯৪১। এর পর আর চারমাস বেঁচেছিলেন তিনি। ৩০ শে জুলাই অস্ত্রোপচারের পর ৭ই আগস্ট তাঁর দেহাবসান ঘটল। মাঝখানে অচেতন অবস্থা।

'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' [১৩৪৭ সন বা ১৯৪০-৪১ খ্রী.] এবং 'জন্মদিনে' [সন ১৩৪৮ বা ১৯৪১ খ্রী.]-এর পর 'গল্পসল্প' প্রকাশিত হলেও এর গদ্যপদ্যগুলি লেখা চলতে থাকে ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ অর্থাৎ ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

'দুই তিনটি রচনা ছাড়া সবগুলিই প্রায় ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই মার্চের মধ্যে লিখিত হয়।'

'জন্মদিনে' রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শেষ ছাপানো কাব্য আর 'গল্পসল্প'-ই শেষ গল্পের বই।

যে পর্বে 'গল্পসল্প' লেখা চলছে সেই শেষপর্বে কবির মানসিক অবস্থা এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তনের ছায়াপাত হয়েছে। ১৯৪০-এর শেষার্ধ থেকেই কবির শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ছিল, সেপ্টেম্বরে অসুস্থ শরীর নিয়েই কালিম্পং-এ প্রতিমা দেবীর কাছে যান। কিন্তু সেখান থেকেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফিরে আসতে হল কলকাতায়। ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন তিনি। দুঃসহ রোগযন্ত্রণার পর্বে তিনি 'রোগশয্যায়' কাব্যখণ্ডটির কবিতাগুলি লিখলেন। মনে আসছে 'সোনার তরী'র সেই ভাবটি :

> নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন তটে
> পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বহিতেছে খেয়া

চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে

পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে

তফাৎ এই যে 'সোনার তরী'তে যে রূপচিত্র তাতে তিনি তাঁর ফসল নিয়ে বসেছিলেন নদীকূলে, আর সেই তরীর নেয়ে তাঁর ফসলগুলি নিয়ে চলে গিয়েছিল, তাঁর ঠাঁই হয় নি—আর এখন তিনি নিজেই জীবনতরীর নেয়ে, যে পরবর্তীকাল তাঁর নৌকার পণ্যগুলির উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে তারাও যে কিছুকাল পরে আর থাকবে না এই নৈরাশ্যময় উপলব্ধি তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। এই নৈরাশ্যের উপলব্ধি যে 'অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা' তাঁকে থেকে থেকে অমিত আশাবাদের মধ্যেও বিষণ্ণ করে তুলছে।

নিদারুণ রোগযন্ত্রণাতে মহাবিশ্বতলে কখনও অকল্পিতপূর্ব যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন। এ জাতীয় রূপকল্প রবীন্দ্রনাথ আগে ব্যবহারই করেন নি। এখন তিনি প্রশ্ন করছেন :

বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন

এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া

রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোত করে বিপ্লাবিত।

রোগ যন্ত্রণায় জর্জরিত বলেই কি এ-হেন অলংকৃত প্রশ্ন আমাদের বিচার থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে? অন্যত্র কবির সেই প্রশান্তি তো বিচলিত হয় নি। যেমন ২৫ সংখ্যক কবিতা :

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে

ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হতেছে উজ্জ্বল

আনন্দে-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।

যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর মানসিক শক্তির প্রাচুর্য নষ্ট হয়নি বলেই আগের অলঙ্কার মনকে সন্দেহাকুল করে তোলে। দেহের সঙ্গে বহ্নিরসপাত্রের উপমা রোগ-জর্জর দেহের দান হতে পারে, এমন কি রক্তবর্ণ অশ্রুস্রোতও অলঙ্কৃতি বলে পরিত্যক্ত হতে পারে, কিন্তু 'প্রলাপ' শব্দটি কি এই ধারণাই সমর্থন করে না যে কিছুকাল আগে থেকেই কবির মনে সৃষ্টির অর্থময়তা নিছক প্রলাপ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সৃষ্টির সার্থকতার প্রতি বিশ্বাস চিড় খেয়ে গিয়েছিল, সেই বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা থেকেই শব্দটি উৎসারিত। আর সেই কারণেই বিধাতার মত্ততার অর্থ তিনি খুঁজে পান না—অথচ তিনি তো জানেন :

প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ- হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।

[রোগশয্যায়-৫]

রোগযন্ত্রণার এই স্তরেও অসম্পূর্ণ বিশ্বের একটি সুনিশ্চিত পরিণতির আশা ত্যাগ করতে পারেন না :

অচেতন তোমার অঙ্গুলি
অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে ;
আদি মহার্ণব গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ

[রোগশয্যায়-৯]

আর তাছাড়া আবাল্য-লালিত প্রত্যয় ত্যাগ করা কি সহজ? তাই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এই ঔপনিষদিক বাণীকে যে এখনও তিনি প্রত্যক্ষ করেন তার প্রমাণ স্বরূপ ২৫ সংখ্যক কবিতাটি আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আসলে এক ধরনের বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের, ইতি-নেতির, প্রত্যয়-সংশয়ের দোদুল্যমানতা এই পর্বের কাব্যের মধ্যে ছাপ রেখেছে—কিন্তু একটু কষ্ট করে চেয়ে দেখলে লক্ষ করা যাবে যুধ্যমান পৃথিবীতে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর বেদনা, সংশয়ের বেদনা ও নতুন উপলব্ধির কঠোরতাই এই যুগের কাব্য-চিন্তার অধিক অংশ জুড়ে আছে এবং এটাই হচ্ছে 'গল্পসল্প'র পশ্চাৎভূমিতে যে মানসিক অবস্থা তার বিশেষ দিক।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন ১৮ই নভেম্বর (১৯৪০)। কিন্তু রোগ-শয্যার যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা এবং অস্তিত্বের অবসানকালে জীবনের চরম সত্যকে

অননুভবের বেদনা—এর প্রকাশ চলতেই থাকল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী কবি নন কখনই—তাই কখনও বেদনা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই 'দুর্বল প্রাণের দৈন্য' দূর করার প্রার্থনা জানান। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার আগেই লিখছেন :

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা
অগোচরে কোনখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।

[রোগশয্যায়-১১]

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে প্রার্থনা জানাচ্ছেন :

হে প্রভাতসূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত ;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও
পরাভূত রজনীর অপমান সহ।

[রোগশয্যায়-১৫]

বিশ্বপ্রকৃতির অক্ষমা, অপূর্ণ-পরিণত সৃষ্টির বিকলাঙ্গ রূপ, বিশ্বব্যাপ্ত প্রলাপের এই নতুন উপলব্ধির দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা পান তিনি, কীর্তির মধ্যে নয়, আপন ভালবাসার মধ্যে :

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস
জানি কাল সিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
... ...
আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে

এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি।
এ ভালবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার

[রোগশয্যায়-২৬]

'রোগশয্যা'-র পর 'আরোগ্য'। এবারে কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করলেন সুরেন্দ্রনাথ কর-কে। মহাপ্রয়াণ যে সন্নিকট সে সম্বন্ধে মনে কোনও সংশয় নেই। সেবা করেছেন যাঁরা তাঁদের বলছেন পথিকবন্ধু। জীবনাবসানে ওপারের খেয়ায় অন্ধকারে পাড়ি দিতে হবে, পথিকবন্ধু দীপ হাতে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে এসেছে যেন। অন্তিমপর্বের এই কবিতাগুলিতেও আগের কাব্যটির মতো পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা জানান। 'মধুময় পার্থিব রজঃ' এই সুরে বলেন: 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি—অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি' [আরোগ্য-১]। আর মনে জাগে সেই তরুণ বয়সের, যৌবনের, দূর অতীতকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস মাখানো উদাস মুহূর্তগুলির ছবি [আরোগ্য-৩] অথবা চেতনায় প্রত্যন্ত প্রদোষে উৎক্ষেপিত নানা ছবি [আরোগ্য-৫]; কখনও বা প্রত্যক্ষ করেন বিরাট কালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন-রঙ্গশালার দ্বারের বাইরে সুখদুঃখের নাট্যসজ্জা, বহুযুগের নটনটীর পরিত্যক্ত শতশত নানারঙা বেশবাস ও নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে নিস্তব্ধ একাকী নটরাজের মূর্তি। [আরোগ্য-৯]।

চলমান জীবনযাত্রার দূর অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ অনুভব করেন যে জীবনের চলমানতার মধ্যে চিরকালের সাধারণ মানুষেরও স্থান রয়েছে। 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে' যারা কাজ করে চলে দিবসরজনী জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্দ্রিত করে তোলে, সেই বিপুল জনতার কথাও তাঁর শূন্যপানে চাওয়া অলস মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। [আরোগ্য-১০]

কখনও তরুণ বয়সে নির্ঝরের প্রলাপ কল্লোলে যে-ভালবাসা এসেছিল তার স্মৃতি [আরোগ্য-১৩] অথবা প্রাণের স্পর্শে আনন্দিত মূক জীবও তাঁর কাব্যের বিষয় হয়। কখনও চলে স্বপ্নের পাগলামি দিয়ে গড়া মনের দায়শূন্য খেলা। বিশ্ববিধানেও কি একই জিনিস চলে?

স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান
তাঁহারে দমনে রাখে, ক্রুর করে সৃষ্টির প্রণালী,
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।

শিল্পীর নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা
অধরাকে ধরা।

[আরোগ্য-২৬]

'আরোগ্য' কাব্যখণ্ডটির ৩১, ৩২ ও ৩৩ সংখ্যক কবিতায় সেই চিরকালীন সর্বমানুষের মাঝে সত্যের অমৃতরূপ দেখার এবং এ-জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে নেওয়ার কামনা ব্যক্ত হয়েছে।

'গল্পসল্প'র রচনাগুলি ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ ১৯৪১-এর মধ্যে লেখা। এই পর্বের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি হচ্ছে ১০, ১১, ১২ ও ৩০ সংখ্যক কবিতা, এগুলি রচনার তারিখ যথাক্রমে ১০।২।৪১ ; ১৩।২।৪১ ; ১৪।২।৪১ ও ১৬।২।৪১। ১০ সংখ্যক কবিতাটির [ওরা কাজ করে] কথা আগেই বলা হয়েছে। ১১ সংখ্যক কবিতাটি সম্পূর্ণ আত্মগত। জীবনের শেষ বেলায় ফাল্গুনের পলাশের আনন্দমূর্তির প্রতি বেদনামিশ্র স-কৃতজ্ঞ স্বীকৃতিই কবিতাটিকে মূল্য দিয়েছে। ১২ সংখ্যক কবিতায় তিনি জানাচ্ছেন : দুঃখের আঘাতে জীবনের মর্মতলে যে প্রচ্ছন্ন বল নিহিত, সেই সম্বলটুকুও যখন হারিয়ে যায় তখন উর্ধ্ব থেকে জয়ধ্বনি নেমে এসে অন্তরের দিগন্তপথকে উদ্ভাসিত করে তোলে। এমন অভিজ্ঞতা আজীবন কবির হয়েছে। 'পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে' গানটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।

তফাৎ হল এ-গান আরও আগের রচনা এবং এখন ঈশ্বর ও তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আদানপ্রদান আর নেই।

২৭ সংখ্যক কবিতাটি ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪১-তারিখে রচনা। কিন্তু এর সত্য-স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের এ-পর্বের শিল্পকৃতির পরিচয় বহন করে।

বাক্যের যে ছন্দোজালে শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে
নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।

এই অদ্ভুত স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের অনেক শিল্পকীর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'গল্পসল্প', 'বা' 'সে' তাদের মধ্যেই পড়ে। কোনও বিশেষ শিল্পরূপের নাম দিয়ে তাদের ধরা যাবে না।

৩০ সংখ্যক কবিতায় প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যু পারের প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা, অন্য কবিতাগুলি ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে। সব কবিতাতেই যে একই সুর পাই তা নয়। নানান ভাবনাচিন্তা জড়ো হয় মনে—সেই ভাবনাগুলিই এই সব কবিতায় রূপ পেয়েছে।

এর পরে 'জন্মদিনে' কাব্য। এর প্রথম কবিতাটি ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে রচিত। এতে যে সুর ধরা পড়েছে তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব সুপরিচিত না হলেও এই পর্বে নেহাৎ অপরিচিত নয়। যে পরপারবর্তী জীবনের আধ্যাত্মিক সত্য তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, আজ বলছেন সেই জীবনের পরিণাম তাঁর অজানা :

যে মহা দূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা

সেটা কি রকম :

ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন
পথহীন মহারণ্য মাঝে

আর নিজে ?

অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

ঐ তারিখে বিকেলে যে কবিতা লিখছেন তাতে নানা বন্ধুর, নানা দেশের স্বীকৃতি আছে [জন্মদিনে-৩], কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪১)-এর কবিতায় এ কি স্বীকৃতি :

চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আচরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়েছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।

জীবনের শেষতম প্রহরেও আজীবন সাধনা সত্ত্বেও আপনার চরম পরিচয় অজানা থেকেই গেল।

২

মানসিক অবস্থার এই পটভূমিকাতে রচিত হয়েছে 'গল্পসল্প'। জন্মশত বার্ষিক সংস্করণে 'গল্পসল্প' স্থান পেয়েছে সপ্তম খণ্ড বা গল্পের খণ্ডে, অথচ বিষয়ে ও রূপে আর যাই হোক এগুলিকে ছোটগল্প বলা যাবে না। কেননা এতে আছে স্মৃতির অতল থেকে কুড়িয়ে আনা রত্নসম্ভার, চরিত্রসৃষ্টি, নির্মল হাসি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত নক্‌শা এবং প্রতিটি নক্‌শার শেষে একটি করে ছড়া। আমাদের মতে, নক্‌শা ও ছড়া কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—প্রতিটি গল্প বা কাহিনীর শেষে ছড়ায় লেখা যে অংশগুলি আছে সেই অংশগুলিকে কোন মতেই অন্য অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা যায় না। গদ্যে, পদ্যে, সম্ভবে-অসম্ভবে, কথার অজস্র ফোয়ারাতে, রূপকথাতে, রূপক কথাতে মিলে এ এমন এক শিল্পরূপ, যাকে :

'নামে বাঁধিবারে চাই না মানে নামের পরিচয়।'

তাই বলে নতুন কোন পরিচয় যে দেওয়া যায় না তা নয়। বস্তুত 'গল্পসল্প' কথাটিতেই যে বিশেষ শ্রেণীর আভাস পাওয়া যায়, যা বেশির ভাগ সময়েই শিথিল, কখনও অশিথিল বন্ধ, আঁটসাট—একে বড়জোর সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষে মানুষে নানান গল্পসল্পই হতে পারে—অলস মনের দায়শূন্য কথাবার্তাও চলতে পারে। কিন্তু 'গল্পসল্প' শিল্প-ই। 'শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা, অধরাকে ধরা।'

'গল্পসল্প'-র বলার চালটি সহজ, বিষয়ও দৃশ্যত ভারি কিছু নয়, বৃদ্ধের স্নেহ-মিশ্রিত সকৌতুক হাসির সঙ্গে দৌহিত্রীকে বলা কথাবার্তা 'গল্পসল্প'রই বিষয়। কিন্তু ফুটে উঠেছে এক একটা চমৎকার চরিত্র। চরিত্রের জাত বিচারে এদের অনেকগুলিই শ্রেণী চরিত্র বা type। 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের তিনটি গল্পের আশ্চর্য চরিত্রগুলি রহস্যময় মানুষের চরিত্র সন্দেহ নেই, তারাও রবীন্দ্রনাথের অন্তিমপর্বের সৃষ্টি। কিন্তু অচিরা, বিভা ও সোহিনীরা পাথরে কাটা মূর্তি আর 'গল্পসল্প'-র চরিত্রগুলি নরম কাদা দিয়ে অনায়াসে তৈরি করে ফেলা কুমোরের মূর্তি। মূর্তিগুলি সবই অসাধারণ ও অপরিচিত নয়। কেননা অনেকগুলিই বাল্যস্মৃতি মন্থনে উদ্ভূত, কিন্তু স্নেহ আর প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে সেগুলি নতুন স্বাদ পেয়েছে।

বৈজ্ঞানিক নীলমণিবাবুর ভুলোমনের চেহারা অসাধারণ নয়,—কিন্তু

আসল কথা তাঁর প্রতি দাদামশাই ও নীলমণিবাবুর স্ত্রীর প্রশ্রয়। এই প্রশ্রয়ের স্পর্শেই আমরা চরিত্রটিকে ভালবেসে ফেলি।

'গল্পসল্প'-র দুটি চরিত্র গল্পসল্প করছে: একটি দাদা মশাই অপরটি কুসমী। 'সে' বইটিতে যেমন পুপে এবং দাদামশাই, এখানেও তেমনি। কিন্তু সেখানে উদ্ভটত্ব বেশি, কথার চেয়ে বকুনির ঝাড় মশলা বেশি—এখানে দুইই কম। কিন্তু ব্যঞ্জনায় স্নেহ পদার্থ দুইয়েরই সমান। ওখানে নামহীন 'সে' নায়ক, পরে তাকে সরিয়ে দিয়ে সামনে চলে আসে পুপুদিদি। তার মধ্যে অলক্ষে কখন যে সুকুমারের ট্র্যাজিডি চলে আসে টেরও পাওয়া যায় না।

'সে' বইতে আর আছে গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। গল্পের সঙ্গে ছবিগুলি তৃতীয় **dimension** জুড়ে দেওয়ার মত। কিন্তু 'গল্পসল্প'-য় সেই **dimension** এনেছে প্রতি গল্পের শেষে জুড়ে দেওয়া ছড়াগুলি। আরও মিল আছে, কিন্তু সেগুলি ছোটোখাটো। যেমন 'রাজার বাড়ি' গল্পের অবুদ্ধির বালকটি কি 'সে' বইয়ের সুকুমার নয়।

৩

অন্য চরিত্রগুলি 'চণ্ডী' চমৎকার নিন্দুকের নক্‌সা। 'রাজারাণী'তে চিরকালীন ইচ্ছাপূরণ। 'মুনশী' চরিত্রটি বাল্যস্মৃতিচারণ। 'ম্যাজিসিয়ান'-ও তাই, তবে এতে যুক্ত হয়েছে 'সে'-তুল্য আশ্চর্য কথার মালা। এতে দ্রব্যগুণের ব্যাপারে কথাগুলি অচলায়তনের প্রায়শ্চিত্তের কথাগুলি মনে পড়িয়ে দেয়। 'পরী' প্রসঙ্গই যথার্থ গল্পসল্প। 'ডাকঘর' নাটকে ব্যবহৃত ভাষার ছাঁদে আরও সত্যর কারবারি দাদামশাই কুসমীকে পরী বানিয়ে দিলেন। ভূগোলের বিবরণ পড়তে গিয়ে আরও সত্য কাহিনী এবং সত্য দেশের ছবি কে দেখেছে? এই কাহিনীতেই উদ্ভটত্ব বা **fantasy**-কে 'সে'-র মতো প্রশ্রয় দিয়েছেন লেখক। ম্যানেজারবাবু চরিত্রটি নিশ্চয়ই শিলাইদহ-পর্বের জমিদারির কাজে লেগে থাকার সময় সংগ্রহ করে আনা। চরের ফসল দখল করার কথা, জমি খাজের উল্লেখ, ফসল দখল নিয়ে জমিদারদের কাজিয়া-দাঙ্গা, জমিদারি সেরেস্তার পুণ্যাহের ও সর্বশেষে মিশির সর্দারের প্রভুভক্তি ও নিমক-হারামির কথা এই সবই একই সত্যের ইঙ্গিত দেয়। সত্যই নিমক খেয়ে প্রাণ দেওয়াটা অসাধারণ না হয়ে চান করাটাই অসাধারণ?

কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বাচস্পতি মশাই। তাঁহাকে অভিধানের

অর্থের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ধ্বন্যাত্মক ও স্বতই অর্থবাহী করতে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার ক্লাসিক উদাহরণ দিয়ে গেছেন :

> শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম বনে গিয়েছিলেন ; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুসকায়িত। হেড পেডেগোর টিকির চারধারে ভেরেগুম লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুম্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঙ্কুসের একেবারে চিকচাকস আমদানী। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

কী শুনে এহেন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তুলে দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব' তুলে দেবার লোভ তাতে বেড়েই চলবে মনে করে সে লোভ সংবরণ করা গেল।

পাগল দলের পান্নালালের বাড়ি খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটির পিছনে সত্যটা কি বুদ্ধিমান পাঠক বোঝেন না—কিন্তু তাঁদের সেই বুদ্ধিটাকে তাঁরা চাপা দিয়ে পান্নালালের ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেন, সেও দাদামশাইয়ের স্নেহ-প্রশ্রয়ের জন্যই।

'চন্দনী' কি গল্প না গল্পের মশলা পুরে আত্মজৈবনিক বর্ণনা? রূপকথা-অংশ নয়, তার আগের পরের বর্ণনার কথা বলছি। যেখানে যমদূতগুলির গোপন আলোচনা, শেষজীবনের সঙ্গী সুধাকান্তের উল্লেখ ও ষাটঘন্টার অচেতন অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

'ধ্বংস' গল্পের ট্রাজিডিটা বানানো নয়। মহাযুদ্ধের যে আগুনে সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে এসেছিল তার কথা এতে আছে। 'মুক্তকুন্তলা'-র ট্রাজিডি ছেলেমানুষি স্বর্গ থেকে বড়দের সংসারে অনুপ্রবেশের ট্রাজিডি। 'ভালমানুষ'ও গল্প নয়, গল্পসল্প।

কিন্তু শুধুই কি সহজ সরল গল্পসল্প এগুলি? নিছক স্মৃতিসমুদ্র মন্থনে উত্থিত চরিত্র-রত্নরাশি, অথবা গল্প-কবিতার মিশ্রণে এক অপরূপ সৃষ্টি। যা বলা হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি অর্থবাহী। এই আলোচনা শুরু করার সময় 'গল্পসল্প' রচনাকালীন রবীন্দ্রনাথের যে মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার পটভূমিকায় এই গল্পসল্পগুলি স্থাপন করলেই এই অর্থ ধরা পড়বে।

নাতনি কুসমীকে বলা দাদামশাইয়ের 'গল্পসল্প' তাই লঘু চালে বলা।

মনের সব বেদনাকে এবং সব অবস্থাকে বুঝতে দেয় না কিন্তু চাপাও থাকে না।

'অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া' এমন বহু কল্পনাও বাক্যজালে ধরা পড়ে এই সব ছড়ার মধ্যে। রূপকথার জগৎ তৈরি করা ছড়া, উদ্ভট ছড়া বা fantasy-র জগৎ তৈরি করা ছাড়া বা গল্প-রূপকথা, এগুলির মধ্যে আবাল্য ভাবনা চিন্তার সঙ্গে গড়ে তোলা ধারণাকে বাস্তবিকতার জগতে না মেলাতে পারার দরুন বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা, বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত নতুন অপরিচয় কিংবা মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় আচরণে যে তীব্র নৈরাশ্য এই সবই ধরা পড়ে। কখনো রূপকথা কখনো চরিত্রসৃষ্টি এই দুই প্রকারের সঙ্গেই তাঁর এই মানসিকতা মিলে নতুন এক স্বাদ তৈরি করে।

'গল্পসল্প'র বিভিন্ন গল্প ও ছড়া রচনার সময় কিন্তু এক নয়। অথবা বলা যায় একই সঙ্গে গদ্যাংশ লেখা শেষ করে তারপর ছড়া দিয়ে শেষ করেন নি এক-একটি 'গল্পসল্প'। বিভিন্ন সময়ে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ লিখে ছাপাবার সময় একটি পরিকল্পনামত সাজিয়ে নিয়েছেন ব্যাপারগুলি। এই পরিকল্পনাটিই নতুন।

আগে তাই কোন কোন তারিখে গদ্যাংশ ও কোন কোন তারিখে পদ্যাংশগুলি রচিত হয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। তালিকাটি দেখলেই ব্যাপারটি স্বতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

	গদ্যাংশ	তারিখ	ছড়া	তারিখ
			ভূমিকার ছড়া	১৩৪৭ বৈশাখ [১৯৪০]
১	বিজ্ঞানী	৬।২।৪১	পাঁচটা না বাজতেই	১।৩।৪১
২	রাজার বাড়ি	৯।২।৪১	খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে	২।৩।৪১
৩	বড়ো খবর	১২।২।৪১	পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ [১৯৩৭]
৪	চণ্ডী	১০।৩।৪১	যেমন পাজি তেমনি বোকা	১৫।২।৪০
৫	রাজরাণী	১৫।২।৪১	আসিল দিয়াড়ি	৩।৩।৪১
৬	মুনশি	১৬।১২।৪১	ভীষণ লড়াই তার	৮।৩।৪১
৭	ম্যাজিসিয়ান	১৬।২।৫১	যেটা যা হয়েই থাকে	১১।৩।৪১
৮	পরী	২০।২।৪১	যেটা তোমার লুকিয়ে জানা	১১।৩।৪১
৯	আরও সত্য	২২।২।৪১	আমি যখন ছোটো ছিলুম	২।৩।৪১
১০	ম্যানেজারবাবু	২৪।২।৪১	তুমি ভাবো এই যে বোঁচা	৩।১২।৪০

	গদ্যাংশ	তারিখ	ছড়া	তারিখ
১১	বাচস্পতি	২৫।২।৪১	যার যত নাম আছে	৯।৩।৪১
১২	পান্নালাল	২৮।২।৪১	মাটি থেকে গড়া হয়	১১।৩।৪১
১৩	চন্দনী	২।৩।৪১	দিন খাটুনির শেষে	১০।৩।৪১
১৪	ধ্বংস	৬।৩।৪১	মানুষ সবার বড়ো	৫।৩।৪১
১৫	ভালো মানুষ	৭।৩।৪১	মণিরাম সত্যিই স্যায়না	২৩।১।৪১
১৬	মুক্তকুন্তলা	২৭।২।৪১	দাদা হব ছিল বিষম শখ	১২।৩।৪১

লক্ষ করলে বোঝা যাবে 'ধ্বংস' গদ্যাংশ (১৩ সংখ্যক) ও 'খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে' ছড়াটি (২য় সংখ্যক) একই দিনে (৬।৩।৪১) রচিত, কিন্তু ছড়াটি সেদিনের গদ্যাংশের সঙ্গে না জুড়ে ৯।২।৪১ তারিখে রচিত 'রাজার বাড়ি' শীর্ষক গদ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ৩য় সংখ্যক (বড়ো খবর) গদ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চার বছর আগের রচিত আর একটি ছড়া। ৪র্থ গদ্যাংশের রচনার তারিখ ১০।৩।৪১, কিন্তু ঐদিনে রচিত 'দিন খাটুনির শেষে' ছড়াটি ১৩ সংখ্যক গদ্যাংশের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনি করে দেখা যাবে প্রতিটি গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে রচিত হয়ে সমভাবের বা সমবিষয়ের গদ্যাংশের সঙ্গে পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আবার একই তারিখে রচিত গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ একই ঠাঁই না পেয়ে সমভাবের বা বিষয়ের ভিন্ন তারিখে রচিত গদ্যাংশের সঙ্গে তার আসন খুঁজে নিয়েছে। এই ব্যাপারটিই অনুধাবনের যোগ্য।

ভিন্ন তারিখে রচিত অথচ একসাথে জুড়ে দেওয়া গদ্যাংশ ও ছড়ার বিষয় বিশ্লেষণে নানান ব্যাপার চোখে পড়ে।

কিছু কাহিনী এবং ছড়া নিছক রূপসৃষ্টির প্রয়াসী। যেমন বৈজ্ঞানিক নীলমণিবাবুর ভুলো মনের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে ভুলো মনের ভুলুরাম শর্মার কাণ্ড-কারখানা জানিয়ে দেওয়া ছড়াটি একে অপরকে অনেক বেশি খাড়া করে তুলেছে। 'পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে' ছড়াটি 'খাপছাড়া'-র মধ্যে চলে যেত ভালোভাবেই।

'রাজার বাড়ি'তে ঘরের কাছের রাজ-বাড়ি দেখতে পেল না যে বালক, তাকে যেভাবে ঈশ্বমাসি ভোলাতেন, মা তার খোকনকে সেই ভাবেই ভোলান, সেই একই উপায়ে। ছড়া ও 'রাজার বাড়ি' নামক গদ্যাংশ দুইই তো এক। 'রাজার বাড়ি'তে আপন শিশুমন [জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক

সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩] ও সেই মনটি দিয়ে এক আশ্চর্য ছড়া একে অন্যের স্বাদ বাড়ায়। 'রাজার বাড়ি'তে বলছেন :

> 'সকলের মধ্যেই এক জায়গায় বাসা করে থাকে একটা বোকা, সেই খানে ভালো করে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়।

এরই উদাহরণ :

> 'খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো।
> মা বলে দেখ ঐ আকাশে আছে লুকানো।'...

নিন্দুক চণ্ডীয় নক্সার মধ্যে দুটি ছড়া আছে। একটিতে নিন্দুক চণ্ডীর খ্যাঁকশিয়ালির মত চরিত্র বর্ণন ('আলো যার মিটমিটে') অপরটিতে চণ্ডীর মানসিকতা বোঝায় এমন আর একটি ('যেমন পাজি তেমনি বোকা') ছড়া। দুটিই 'চণ্ডী' গল্পাংশের পরিপূরক।

মুনশিজীকে 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা' পড়া পাঠক মাত্রই চেনেন [রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ৯০।৩৩]। সেই একই লোকটির একই কথা বলা হয়েছে কিন্তু 'গল্পসল্প' বইটিতে, এবার যুক্ত হল একটা নতুন মন্তব্য :

> 'এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনো হার হয় না। আর একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি', তাহলে সেই জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না।'

ছড়ায় সেই মন্তব্যই উদাহৃত হল :

> 'ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের
> সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।
> ... ...
> বাহিরে ব্যবহারে হারে সে সদাই
> ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

'ম্যাজিসিয়ান'কেও 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক চেনেন (র. র-জ. শ. সং ১০।৩৩, ৩৪)। 'জীবনস্মৃতি'তে সেই ম্যাজিশিয়ান ছিল ছাত্র, ছাত্র হয়েও ম্যাজিক সম্বন্ধে চটি বই বার করে সে 'আপনাকে প্রোফেসর উপাধি দিয়া প্রচার করিয়াছিল'—আর এখানে প্রোফেসর হরীশচন্দ্র হালদার—'নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো'। কিন্তু ইনি এসেছেন 'একমাথা টাক নিয়ে'। এই পরিবর্তনটি 'দ্রব্যগুণে'র জন্য কি না বলা যাচ্ছে না।

কিন্তু ম্যাজিক প্রসঙ্গে, জগতের 'আরও সত্য' প্রসঙ্গে এবং নিছক ছড়া সৃষ্টিতে শেষের ছড়াটি না থাকলে হ. চ. হ-র টাইপটি স্বাদু হত না, সে কথা নিঃসন্দেহে সত্য :

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।

একালের ছেলেদের চেয়ে সেকালের ছেলেদের খাঁটি ছেলেমানুষি বোঝাতে 'মুকুকুন্তলা' অংশের 'গোলাবাড়ি'র কথাও 'জীবনস্মৃতি' পড়া পাঠক স্মরণ করতে পারেন [র. র.-জ. শ. সং ১০।১৩, ১৪]। 'ছেলেবেলা'-তেও বলা বাহুল্য এর উল্লেখ আছে [র. র.-জ. শ. সং ১০।১৪৪]। এখানে তৈরি হয়েছিল ছেলেমানুষি স্টেজ, স্কুলের সময়ের আগে অভিনয়ও হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাবে এই ছেলেবেলার দৃশ্যগুলি উদ্ঘাটিত করতে করতে যে ধ্রুবপদ গুনগুনিয়ে উঠছে মনে তা হল :

সাঙ্গ হয়ে এল পালা
নাট্য শেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে
রঙীন ছবির দৃশ্য রেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
সময় হয়ে এল এবার
ষ্টেজের বাঁধন খুলে দেবার
নেমে আসছে আঁধার যবনিকা।
... ...
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

'অসীম দূরের প্রেক্ষণী'তে যা ধরা পড়বে সেই শেষ গণিত এখনও না-কষা আঁক ?

কিন্তু জিত হওয়া বা হার হওয়ার উপমাটা মনে আসছে কেন ? মৃত্যুর পরেই কি তবে ধরা যাবে বার্থসৃষ্টি জগতে কোথাও সত্যতা আছে কিনা— তার পরেই কেবল ধরা যাবে বিশ্বাস করে জিতেছেন না হেরেছেন ? তাহলে এতদিনের এত সাধনা ?

ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ থেকে মুহূর্তে পরিপূরক ছড়ায় এবং সেখানে হঠাৎ হালকা চালের পদ্যের মধ্যে গভীর সুর এসে লাগা এই ব্যাপারটিই 'গল্পসল্প'-য় লক্ষ করা যায়।

সে-সুর কখনও অসম্ভব নৈরাশ্যেরও। যেমন 'ধ্বংস' গল্পটির শেষের ছড়ায়। গল্পটি তখনকার হালখবর হলেও ছড়াটি মোটেই হালকা নয়, এমন কি হালকা চালে বলা হলেও :

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হত মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা
তখন এ জীবনকে পবিত্র জেনেছি।

কিন্তু এখন ?

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।

'পান্থজনের সখা' বইটিতে আবু সয়ীদ আইয়ুব 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'পক্ষীমানব' কবিতাটির উদ্ধৃতি তুলে বলেছেন : ['পক্ষীমানব' রচনার তারিখ ২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮ :

দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

'শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতন কবির মনের গভীরে হতাশ ও নৈরাশ্য কতখানি তীব্র হলে তিনি মনুষ্যজাতির ও মাতা বসুন্ধরার সমূহ প্রলয় কামনা করতে পারেন তা ভাবতে গেলে আমার মতন অভক্ত পাঠকের মনেও ব্যথা লাগে' [পান্থজনের সখা, পৃ. ২২৮]

আমাদের উদ্ধৃত ছড়াটিতে 'পক্ষী-মানব' কবিতাটির তুল্য অসম্ভব সিরিয়াস ভঙ্গি এখানে নেই বটে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে দিনান্তবেলায়, কবির

এই ছড়াটিও কি মানুষ সম্পর্কে কবির এক প্রচণ্ড মোহমুক্তি প্রকাশ করে না? হতাশা ও নৈরাশ্য তীব্রতম বলেই কবির লেখনীতে বেরিয়ে আসে:

মানুষের সাজে যে কে সাজিয়েছে অসুরে
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশার রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রম সংশোধনে।
আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

এত শক্ত কথা রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ভাবা কঠিন। এ ছড়াতে নাতনিকে কোন অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছেন দাদামশায়? এ কি শুধুই গল্পসল্প? যে অভিজ্ঞতা শেষ পর্বের কবিতাগুলিতে ধরা পড়লো কিংবা ইঙ্গিত জানিয়ে গেল, শেষতম পর্বের এই অপরূপ সৃষ্টিতেও কি সে ভাবনার ছাপ রেখে গেল না?

মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাব পালটানোর আর একটা অন্য দিকও এ সময়কার কাব্য-কবিতায় এবং 'গল্পসল্প'-য় ধরা পড়ল। সেটা হল সাধারণ মানুষের দিকে নজর ফিরে আসা। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শ্রমজীবী বা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। ব্যাপারটা মোটা শোনায়, কিন্তু সত্য। সব মানুষই কি সব মানুষের ধ্বংসে নিয়োজিত? ভেবে দেখলে 'সিভিলাইজড' মানুষ যা-ই করুক একদল মানুষ 'সিভিলাইজেশন'-এর দাঁড় বেয়েই চলেছে। যদি তর্ক করা যায় কার দান বেশি—দাঁড়ের না পালের, তাহলে?

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।

এ ছড়াটিতে তর্কের কোনও সমাধান নেই, কবিত্বের হাওয়ায় তর্কটিকে হারিয়ে ফেলা আছে। কিন্তু 'বড়ো খবর'-এ?

'কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশাই, এখনকার কালের খুব একটা বড়ো খবর দাও দেখি ছোটো করে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।'

দাদামশায় মহাজনি নৌকায় পাল আর দাঁড়ের ঘোরতর ঝগড়ার গল্প শোনাতে বসলেন। মাঝি দাঁড়গুলিকে সান্ত্বনা দিল পরে পালকেও বলল:

"ঐ দাঁড়গুলির ইংরাজিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি

কষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপঝপানি থাক না, কাজ না করে উপায় নেই।

কিন্তু অনুভব করছে :

কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলির মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকো—

খুব পরিহাসের মতো লাগছে কি পরের কথাগুলি ?

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয় ?

তুমি ঠাট্টা করছ।

দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে।

দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে ?

তখন ?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্বগুলির পাঠকদের কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। পরিহাস বলে মনে নিতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু আরও যে আছে।

'জন্মদিনে' কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতাটি যার রচনাকাল ২১শে জানুয়ারি, ১৯৪১ সকাল—তার সঙ্গে 'গল্পসল্পে'র সময়ের তফাৎ খুব বেশি নয়। কারণ 'গল্পসল্পে'র বেশি অংশই ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ, ১৯৪১-এর মধ্যে লেখা। কবিতাটি খুবই পরিচিত। এবার 'গল্পসল্পে'র 'বড়ো খবর'-এর গল্পটার সঙ্গে একসাথে পড়লে ধরা পড়বে এ ধরনের চিন্তাটা আকস্মিক নয়, এই পর্বেই নতুন দেখা দিচ্ছে :

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

'ঐকতান' নামে প্রসিদ্ধ এই কবিতাটির বক্তব্য অন্য যে দিকে এগিয়েছে—পাঠকগণ সবাই তা অবহিত আছেন। নির্মোহ আত্মসমালোচনা :

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী

আপনার অক্ষমতার অকপট স্বীকৃতি :

মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

সেখানে 'সত্য মূল্য না দিয়েই' সাহিত্য রচনার শৌখিন মজদুরিকে সোজা সরল ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে তিনি অখ্যাত জনের নির্বাক মনের মর্মের বেদনা উদ্ধারকারী কবির প্রতীক্ষায় থাকার কথা ঘোষণা করেছেন।

এছাড়া 'আরোগ্য'-র ১০ সংখ্যক কবিতাটি যার রচনাকাল ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ সকাল—সেটা তো 'গল্পসল্পে'র পর্বের মধ্যেই লেখা। এটিও বহুপঠিত এবং বহুপরিচিত ('ওরা কাজ করে' নামক কবিতাটি)। কিন্তু 'গল্পসল্পে'র পটভূমিকায় কবিতাটি বা কবিতাটির পটভূমিকায় গল্পসল্প পড়লে তাৎপর্যই আলাদা বলে মনে হয়:

মাটির পৃথিবীপানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে

'বড়োখবর' (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪১) আর 'ওরা কাজ করে' নামক এই কবিতাটির মধ্যে ভাবসাদৃশ্য আছে এমন কি 'বড়োখবর'-এ ভাবনার দিক থেকে একটু এগিয়ে যাওয়ার চিহ্নও আছে।

এ হেতু ভাবনার সুতো ধরেই কি 'ম্যানেজারবাবু' চরিত্রটি সৃষ্টি হয়? এটা কিন্তু বাল্যস্মৃতি নয়। এটা বোধহয় শিলাইদহ পর্বের স্মৃতিচারণ। অতীত স্মৃতিচারণ তবে নিছক nostalgia মাত্র নয়। জলিধানের ফসল কাটবার সময়ের উল্লেখ, চরের ফসলের উল্লেখে পাঠকের 'শাস্তি' নামক বিখ্যাত গল্পটির কথা [র.র জ. শ. সং ১০।১৮২] মনে পড়বে। 'শাস্তি'-তে 'কোর্ফা' প্রজা 'কুরি' দুখিরামের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দু-একটি মাত্র তুলির টানে ফুটে ওঠে [যেমন বেগার খাটার জন্য জমিদারের কাছারি-ঘরে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া, বাকি টাকার জন্য চক্রবর্তীর আগমন ইত্যাদি]। 'কোর্ফা' এবং 'কুরি' শব্দ দুটিতে যারা ধাক্কা খেয়েছেন তারা এক নিমেষেই মানসিক অবস্থার অন্তরালবর্তী সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকাটি বুঝে নেন [কোর্ফা-জমিদারি পরিভাষা; ফারসী শব্দ, যে প্রজা অন্য প্রজার অধীনে ভূমি চাষ ও ভোগ করে, রাইয়তের অধীন রাইয়ত। আর কুরী বা কুরি, মূল হিন্দী 'কোরি' অর্থ হিন্দু জোলা। দ্র. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ']।

ম্যানেজারবাবু চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলবার পর যে ছড়াটি আছে তাতে ক্রোধ নেই, কিন্তু যাদের শ্রম ও আত্মদানে ম্যানেজারবাবুরা রয়েছেন [নৌকার পালের মতো, যেমন 'বড়ো খবর'-এ দেখলাম] তাদের গুমোর যে বৃথা সে কথা বলে দেওয়া হয়েছে :

তুমি ভাব এই যে বোঁটা
কিছুই বুঝি নয়কো ওটা
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও
আলগ করে বাঁধন স্বীয়
তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।
বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়
অপমানের থেকে বাঁচায়
ধরে থাকে সূর্যালোকের ভোজে
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা
গোপনে রয় একা একা
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।

বলা বাহুল্য এ ছড়াটি মূল গদ্যাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পড়লে বড় জোর নীতিমূলক বা didactic কবিতা বলে গণনার বাইরে রেখে দিতাম। মূলের সঙ্গে জড়িয়ে তার আলাদা ব্যঞ্জনাটি আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হত না, আর মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিতটাও পেতাম না। আরও পরে বেঁচে থাকলে কী হতেন বা হতে পারতেন কবি সে নিয়ে গবেষণা বৃথা। কিন্তু তার ইশারাটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। নিজের এই পরিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও কি কিছু টের পাচ্ছিলেন তাঁর সচেতন মনে? এই পরিবর্তন নিয়ে নিজেও কি তিনি নিজেকে নিয়ে পরিহাস করেছেন এবং পরিচিত গোষ্ঠীর কাছে প্রশ্রয় চেয়েছেন? তা না হলে 'গল্পসল্প'র ভূমিকা-রূপী ছড়াটিতে এমনভাবে কৈফিয়ৎদান ও আত্ম-পরিহাস করবেন কেন?

গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান;
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।

আমাদের কাল থেকে ভাই
এ কালটা আছে বহুদূরে—

মোটা মোটা কথাগুলি তাই
বলে থাকি খুব মোটা সুরে।
পিছনেতে লাগে নাকো কেউ
বৃদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ
কথা যদি নাও লয় কানে।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদমুনির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

তবে শোনো মন্দ সে মন্দই
হোক-না সে গুপিনাথ, হোক-না সে নন্দই।

৪.

'গল্পসল্পে' মোট ১৬টি গদ্যাংশ এবং ১৭টি পদ্যাংশ আছে। গদ্য ও পদ্যাংশগুলি একসঙ্গে রচিত হয় নি—দুয়েকটি বরং বেশ আগেই রচনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে একটির সঙ্গে অন্যটি জুড়ে সাজিয়ে দেওয়ার মূলেই একটা সচেতন শিল্পকীর্তি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে একমাত্র 'রাজরাণী' নামক গদ্যাংশের শেষে যে ছড়াটি আছে 'আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি' সেইটেই কেবল অন্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে ['চিত্রবিচিত্র'-র. র.—জস. সং ৪।৯৬৭], কিন্তু অন্য কোনটিই স্থান পায় নি। এর কারণ একটাই। এই পদ্যাংশগুলির একটিও স্বতন্ত্র মর্যাদা পেতে পারে না। পেতে হলে সমগ্রতার তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হবে। প্রত্যেকটি ছড়াই পূর্ববর্তী গদ্যাংশের ভূমিকার অপেক্ষা রাখে—এবং প্রত্যেকটি গদ্যাংশেরই পরিশিষ্ট এই ছড়াগুলিতে। সব মিলিয়েই 'গল্পসল্প'।

'সব পেয়েছির দেশে' বইতে বুদ্ধদেব বসু শেষতম পর্বের রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত মনীষার সাক্ষ্য দিয়েছেন :

> সেদিন একঘন্টার উপরে প্রায় অনর্গল কথা বললেন, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, জীবনদর্শন, হাস্যপরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য ঝরণায় নেয়ে উঠলুম। ওঁর অসুখ! ভাবা যায় না! এই প্রদীপ্ত

মনীষা, জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত ব্যাপারে এই অনন্ত উৎসাহ…
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এতটুকু বিকৃতি কোথাও হয় নি।

বুদ্ধদেব বসু 'গল্পসল্প' রচনার অনেক পরে, সে বছরের গ্রীষ্মাবকাশে অর্থাৎ যে মাসে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সুতরাং শেষ দিবসাবধি তাঁর 'প্রদীপ্ত মনীষা' নিয়ে অন্তহীন অনুসন্ধানে তিনি কী যে পেলেন তা জানতে আমাদের আগ্রহ হয়।

এ কথা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-বিশ্বাস দ্বিধাদীর্ণ হয়েছিল। সংশয়ের দোলা, আবার আঁকড়ে ধরা, প্রশ্নহীন বিশ্বাস, আবার সংশয়—এইভাবে একটির পর একটি স্তর পেরিয়ে এসেছেন। এর পরিচয় আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'পান্থ জনের সখা' বইতে বিস্তারিত দিয়েছেন। [আর একটি প্রবন্ধও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা'—মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রকাশ: পূর্বাশা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩; 'সাময়িক' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত]। আমাদের বক্তব্য, এই দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতা, চরম পরিচয় না জানার বেদনা, আবার রূপময় বিশ্ব যদি ব্যর্থতাতেই শেষ হয় তবে কেন বারবার নতুন করে গড়া—এই সব সংশয়, প্রশ্ন 'গল্পসল্প'-তে আশ্চর্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চরম নিরাশার মধ্যে অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায় সেটা খুঁজবার অবকাশ এই শেষপর্বের কথাসাহিত্যে নেই—কিন্তু তবু 'ম্যাজিশিয়ান'-এর শেষে যে লিখছেন:

> মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনো খানে,
> কবিরা শুনেছি তার রাস্তাটা জানে—
> তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের
> দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

সান্ত্বনা পাবার আশা কি ম্যাজিশিয়ানের মতো ক্ষণিক সত্য রচনায় বা আরও সত্যের মধ্যে। ছেলেমানুষির কথায় 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে'র কবি এখন 'আরও সত্যে'র কারবারি। সান্ত্বনা সেখানেই—সমীকে পরি বানিয়ে কিংবা রূপকথার রূপসৃষ্টি করে—অথবা বাচস্পতি মশাইয়ের কথা বলে বা বহুকাল আগে লেখা [১২৯৮ বা ১৮৯১ (?)] 'গিন্নী' গল্পের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো নতুন নামে মানুষকে ডেকে বিব্রত করার ব্যাপার নিয়ে লেখা ছড়া কিংবা চরিত্র-সৃজনেও এক ধরনের ভুলে থাকার সান্ত্বনা।

দুঃখসুখময় বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তিনি মোটামুটি ধরে নিয়েছিলেন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা উদাসীন এবং মানুষের সুখদুঃখে তাঁর করুণা দয়া ইত্যাদি ব্যাপারটাই ভ্রান্তিমূলক। তবু সেই মোহন ভ্রান্তিতেই আমাদের বারংবার নিরর্থক আসক্তি! আগে লিখেছিলেন :

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি
এই কথাটিই নিলেম মনে মানি
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়
দেখার জিনিস এটা

[ইস্টেশন : নবজাতক-৩।৭০২]

কিংবা :

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।

[ঐ]

পান্নালাল নামক আশ্চর্য গল্পের শেষে যে ছড়া বলছেন তা আপাতদৃষ্টিতে মজার—কিন্তু পূর্বের উদ্ধৃতির পটভূমিকায় ছড়াটির অর্থ পালটে যাবে। 'নবজাতক' কাব্যে মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে স্মৃতির অনিত্যতায় নিতান্ত বেদনায় লিখেছিলেন :

সেই কথা স্মরি বারবার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে?

[রচনাকাল ৮ জুলাই, ১৯৩৮]

যে কবি 'গীতাঞ্জলি'র পর্বে 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে—যে নদী মরুপথে হারাল ধারা'—তার জন্য সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন 'জানি হে জানি তাও হয় নি হারা' ইত্যাদি প্রত্যয়ের উচ্চারণের মধ্যে, তিনি আজ 'পরম মূল্যের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ।

'মংপু পাহাড়ে' কবিতাটি মনে পড়বে এই সূত্রে।

বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দুর

দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।

আবার আশ্চর্য, খেলার শেষে

অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি

অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি

অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ

কিন্তু তখনও চলবে এই খেলা :

তখনো চলিবে খেলা নাই যার মুক্তি

বার বার ঢাকা দেওয়া, বার বার মুক্তি।

তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি

উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি।

[রচনাকাল : ১০ জুন, ১৯৩৮]

কাজেই আশ্চর্য এই যে 'অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি' উত্তীর্ণ হওয়া, যুক্তিহীন এই যে জীবনে সৃষ্টি ও অকস্মাৎ তার মৃত্যুর খেলা, মৃত্যুর ক্ষতি এসবই মানুষ ভুলে যায়। এর পটভূমিকায় পান্নালালের বাড়ি ফিরে পাওয়ার মজার গল্পটির শেষের ছড়াটিকে মিলিয়ে পড়া যাক :

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,

আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি

একই মশলায় তারে ভাঙে আর গড়ে

পুরোনোটা বারবার নূতনেতে চড়ে।

বুদ্ধির সান্ত্বনা নেই। কিন্তু মনের ট্রাজিডি এই বচনে যে :

গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে

ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে।

দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর বৎসরেও তিনি শেষ পর্বের সংশয়ের উত্তর পান নি, নতুন কোনো সান্ত্বনাও খুঁজে পান নি।

মজার গল্প মজা করে বলতে গিয়ে অকস্মাৎ সুর লেগে যায় অনেক বেশি গভীর চিন্তার। মজার ছড়ার অন্তরালে অকস্মাৎ বেদনার অশ্রু ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

এই জন্যই 'গল্পসল্প' আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথের শেষতম পর্বের এক অপরূপ সৃষ্টি। উপযুক্ত পটভূমিকায় স্থাপন করলে এর স্বাদ অন্যরকম মনে হবে।

'রোগশয্যা'য় যে ক্ষীণ আশার বাণী বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ একদিন কালের

দক্ষিণ হস্তে সম্পূর্ণতা পাবে [৯ সংখ্যক কবিতা], আবার জগতের মাঝখানে যে সুতীব্র অক্ষমা [১১ সংখ্যক কবিতা] দেখেছিলেন, শেষতম পর্বে তাকে আশ্চর্য লঘুভাবে গ্রহণ করার একটা চেষ্টাও করেছিলেন—তার প্রমাণ 'পান্নালাল'-এর গল্পটির শেষের ছড়াটি। কিন্তু সম্পূর্ণ হালকাভাবেও যে নিতে পারেন নি সেটা স্পষ্ট হয়েছে 'ধ্বংস' গল্পের শেষে—আগেই উদ্ধৃত করা কবিতাটি মধ্যে।

আবার 'রোগশয্যায়'-এর ২৬ সংখ্যক কবিতায় 'এ ভালবাসাই সত্য, এ জন্মের দান' তার পরিচয় 'আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি' ছড়াটিতে স্নিগ্ধ মাধুর্যে ধরা পড়েছে।

অর্থাৎ যা ছিল কবিতার মননে, প্রবন্ধের যুক্তিতে, তা-ই শেষপর্বের এই অপরূপ কথাসাহিত্যে নতুন দীপ্তি নিয়ে, হাসির ঝকমকানি এবং অশ্রুকণার ঝিলিকে, স্নেহে ও শান্তিতে নতুন স্বাদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এ শুধুই স্মৃতিসমুদ্রমন্থনে পাওয়া রত্নসমষ্টি নয়।

ব্লাডপ্রেসর

শ্রীগুণময় মান্না

১.

মতিলাল খাঁ, পিতা স্বর্গত বনমালী খাঁ, সাকিম ক্ষীরপাই, জেলা মেদিনীপুর। বনমালী লোকটা ছিল বেশ আমুদে প্রকৃতির। সে কালকে কী খাবে আজ চিন্তা করত না। তার জমি ছিল বিঘা পাঁচেক, বাপের আমল থেকে পাওয়া। সে জমির খাজনা ছিল মাত্র এক টাকা, বছরে। অবশ্য তখনকার দিনে, যখন ধানের দাম ছিল টাকায় দুমণ। জমিদারের পেয়াদা সেই খাজনার রসিদ যখন নিয়ে আসত, তখন সে নিতই না, 'ওরে বাপ, এ্যাক টাকা খাজনা! উ জমি আমার চাই নি···'। পেয়াদা চালের বাতায় খাজনার রসিদ গুঁজে দিয়ে যেত, আর বনমালী তা টিনের 'লম্ফ' জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলত। উঠন্তী ছোকরা এই মতি তখন কালো মুখ লাল করে সে ঘটনা দেখত, কিন্তু মুখখানা যতই থমথমে হয়ে উঠুক, বাপকে কিছু বলার সাহস ছিল না, তা ছাড়া এসব বৈষয়িক ব্যাপার সে ঠিক বুঝতও না। কখনো সখনো মাকে সে কথাটা বলেছে, যখন 'পুখুর' ঘাট থেকে কাঁখে পেতলের কলসিতে জল আনত, বা, তুলসী-মনসা-লাগানো থানে সাঁঝ দিত—তখন মা কেবল বলত, 'ধুর্ খেপা, তোর বাপের বিষয়, আমি মেয়ামানুষ, উ সব কী বুঝি···'। এবং কাজেও তাই, মায়ের সেই জল-আনা রান্না-করা গরুবাছুরের বাগালি করা চলত নিজের ছাঁদে, তার এতটুকু এদিক-ওদিক হত না।

বনমালী ছেলের গঁসা-টসা ভাব-সাব দেখে কখনো মুখটিপে কখনো হা-হা করে হাসত, 'জমির শোকাতাপা লাগাত নেগেছে না কি রে, লয়? জমিদারি 'বাউ' (বায়ু) লাগছে, লয়? আ রে, জমি লয় রে, যম···এই দেখ না, এই তাঁতের 'ললি' আর 'সানা', যত দিন থাকবে, তত দিন তোর প্যাটে ভাতজল ঠিক পড়বে, দেখে লিস···কাজকম্ম ঠিক শিখে লে দিকি···'

হ্যাঁ, তখন তাঁতের রেওয়াজ ছিল খুব: চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ঘাটাল-নিমতলা থেকে 'মহাজন'রা এসে সুতো দিয়ে যেত, রেশম দিয়ে যেত, আর সেসব বুনে দিয়ে 'বানি' পেত বনমালী। ভালো কারিগর ছিল, পেত ভাল, বউ-ছেলে কুটুম্ব-স্বজনকে খাওয়াত ভাল, নিজেও বেশ খেতে পারত। বিয়ে-সাদি নিমন্ত্রণে যাবার সময় হাঁটুর নিচে নামে কালা চওড়া পাড়ের ধুতি পরবে,

গায়ে পিরান, তখন বোতাম ছিল না, দড়ি দিয়ে বাঁধা হত, কোমরে বাঁধত উড়ুনি, সেটা কখনও জড়াত গায়ে।

কিন্তু অত শৌখিন হলে কী হবে, পাঁচ বিঘে জমির এক টাকা খাজনা দিতে সে চাইত না কিছুতেই, 'ওরে বাপ, এ্যা-ক টাকা খাজনা!'

মতি একদিন সাহস করে বলেছিল, 'জমি খালে রেখে লাভ কী, জমিদারের ন্যায্য খাজনা বাকি রইল পাঁচ দশ সন...'

বনমালীর মুখ গম্ভীর, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকালের জন্য স্থিরচক্ষু, তারপর দু-তিন বার ঘাড় নাড়ল, 'হুঁ্যা, তুই ঠিক বলছু বটে...'

তার ক-দিন পরেই মতি জানতে পারল, ঘরে আরো দুটো তাঁত বসছে, একজন কারিগর আসবে, কী, না বনমালী সেই পাঁচ বিঘে জমি পঁচিশ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। ওদের পরিবারের জীবনযাত্রায় কোনো ঢেউ উঠল না, ভাঙল না।

সেসব যে কত দিন আগেকার কথা, তা মতিলাল খাঁ ঠিক মনে করতে পারে না। এখন মতির বয়স তিন কুড়ি পেরিয়ে আরো আধ কুড়ি ছুঁই ছুঁই করছে—মানে, ঠিক সনতারিখের হিসেব ওদের নেই, তার ধার ধারে না, তবে ওই রকম মনে হয় আর কি! এখন সে ছুট সময়ে উঠোনের শেষ প্রান্তে ঝাঁকড়া নিমগাছটার তলায় বসে থাকে, ভিজে গামছা 'পাট' করে মাথায় চাপিয়ে। তার ছেলে ছিপতি—শ্রীপতি—তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার বলেছে তার 'বেলাড-পেসার' হয়েছে, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে বাংলায় ও যতটুকু বুঝেছে, সেটা অন্যদের বুঝিয়ে বলে, 'হ্যা-হ্যা, শুনে যাও কথা, আমার রক্ত চেপে গেছে...ধুর্‌ধুর্‌, মাথায় রক্ত উঠেচে বল্‌... 'উধ্ব ক' (উধ্বর্গ) হইচে, ইটা আর তমাদের রায় ডাক্তার ধরতে পারল নি গা...'। একেবারেই সে ডাক্তারের ওষুধ খায় না, নিজেই নিজের চিকিৎসা করে। বলে, 'ই যে দেখছ, লিম পাতার 'বাউ' (বায়ু), মাথার শিরে ভিজানা গামছা, আর পহর বেলাকে ছুটি পান্তার সঙ্গে ঘটিটাক আমানি... হারামজাদা উধ্ব ক কোথা থাকে দিকি...শালাঃ, ই যা মন্তর ঝেড়েছি নি, শালা উধ্ব ক ত উধ্ব ক, তার বাপ পালাতে পথ পাবে নি, খি-খি...'

এই নিমতলার অদূরে সামনে মেদিনিপুর-ঘাটাল পাকা সড়ক, ক-মিনিট ছাড়া-ছাড়া ছাদে-গায়ে বাদুড়-লাগা ভর্তি বাস এদিকে আসছে ওদিকে যাচ্ছে। আর সকালে বিকালে সেই সড়ক দিয়ে 'বেড়া-কীর্তনের দল নাম-গান' (মতির ভাষায়) করতে করতে যাচ্ছে আর আসছে, এদের পাড়ি দূরযানীর নয়, সড়ক

থেকে ঢুকছে পাড়ায়, এ পাড়া থেকে ও মহল্লায়, এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে করতে হবে', 'ক্ষেতমজুরের নিম্নতম বেতন মানতে হবে', 'অমুক নেতা যুগ যুগ জীও', 'অমুক পার্টি জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও এক হও', 'শ্রেণীশত্রু নিপাত যাও নিপাত যাও'…।

তমরা নিপাত যাও, বাবা কান ঝালাপালা…' নিমগাছটার তলায় বসে মতি খানিকটা জোরেই বলে ওঠে, টেনেটুনে ভিজে গামছাটা আরো খানিকটা নিচে নামিয়ে দেয়, যেন কানে আড়াল দেবার জন্য। রাস্তার দিক থেকে চোখও ফিরিয়ে নেয়।

ওর ছেলে শ্রীপতি কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল, হাঁ-হাঁ করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, 'কী করছ, বাবা, তুমি, উসব কথা অরা যদি শুনতে পায়…' শ্রীপতির মাথায় টাক, যদিও বয়েস তিরিশ পেরোয় নি, বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারা—মতির বা তার বাপ বনমালীর সঙ্গে মেলে না—তবে শৌখিন, হাতে কুঁড়ো-খড়-ফেণের দাগ, স্পষ্টত, জাবনা দিচ্ছিল গরুকে, কিন্তু পরনে বাহারে গেঞ্জি আর ছাপা লুঙ্গি, এটা কিন্তু বংশের ধারার সঙ্গে মেলে। রাগে ওর মুখখানা টানটান, চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে, 'জান, আজকাল অদের রাজত্ব, আর তুমি অদের গাল পাড়তে লেগেছ!'

একটু আচমকার মতো লাগল মতির, প্রথম আক্রমণে একটু থতমত খেয়ে গেল, শুকনো মুখে বললে, 'কেনে রে, তুইও কি নাম লিখাবি নাকি, ভাগ-রেকড্?' স্পষ্টত, ওরা বাপে-বেটায় রায়বাবু আর হালদারবাবুদের যে কয়েক বিঘা জমি ভাগে চাষ করে, তার কথাই খোঁচা দিয়ে বলল মতিলাল।

হ্যাঁ, মতিলাল অনিচ্ছুক হলে কী হবে, ছেলে শ্রীপতি মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে উঠছে আজকাল। পার্টির লোক—আর সব পার্টির লোকই—ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বলে যাচ্ছে, 'চাষী ভাইরা, তোমরা যারা ভাগ চাষ কর, তারা আমাদের অফিসে এস, তোমাদের ভাগ-রেকর্ড করিয়ে দেব।' তখন শ্রীপতির মাথা গরম হয়ে ওঠে আর লোভে কখনো কখনো ছোট ছোট গোল চোখ দুটো চকচক করে। মতিলাল আমল দেয় না।

এখন রাগের মাথায় সমান তেজের সঙ্গে শ্রীপতি বলে উঠল, 'হুঁ, তা লিখবে, সবাই যদি লিখাচ্ছে, আমরাও লিখাব…'

'সবাই যদি মদ খায়, সবাই যদি মরে, তুইও মরবি, এঁ্যা?' এবার

মতিলাল ফোকলা দাঁতে খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। যেন এই অকাট্য যুক্তি বেটা আর খণ্ডন করতে পারবে না।

শ্রীপতি চোখ নিচু করে এ-হাতের ফেণ কুঁড়ো ও-হাতে মুছতে লাগল, টেনে টেনে বললে, 'সবাই মরবে, ত আমরাও মরব, মরতে ত হবেই এক দিন…।'

'ও রে, থালেই দেখ, ই দেহ মাটিএ মিলাবে, ত ই সব অধম্ম করে কী হবে, বল থালে…'

শ্রীপতি সাধারণত বাপের মুখের ওপর ঝাপট দেয় না, কিন্তু এবারে সে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'তমার ধম্ম লিয়ে তুমি থাক, আর অদের মিনা দোষে গাল দাও, আমার ঢের কাজ আছে…'

'আ রে, শুন শুন, চলে যাচ্ছু কেনে…তুই যে বললি আমি গাল পাড়ছি, আর অরা যে গাল দি গেল, দিল নি? অরা ত দিন রাত গাল দিচ্ছে… শত্তুর-শত্তুর, শুধু ই সব বলছে…'

শ্রীপতির মুখটা ফাঁক হয়ে গেল, ঠোঁট নড়ে উঠল, স্পষ্টত এক রাশ কথা ওর মুখে ছুটে এসেছিল—আজকাল ও অনেক কথা, রাজনীতি, শ্রেণীসংগ্রাম, ক্ষমতদখল, লড়াই—এই সব কথা অনেকের কাছে শুনছে—কিন্তু বাঁ হাতটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে কেবল ঝিনকে দিল, কিছু না বলে চলে গেল।

২.

মাথার মধ্যে চিনচিন করছে, না কি, কী রকম একটা হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছে না মতিলাল। মাথায় পাট-করা গামছাটার ওপর দুই হাতের তেলোর বেড় দিয়ে চেপে ধরল মতি, রইল সেইভাবে কিছুক্ষণ, তারপর মত বদলে গামছাটা মাথা থেকে টেনে নিলে, আরও একটা ভাঁজ করল, তারপর সেটা মাটির ওপর রেখে তাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। খালি গা, যে মাটির উপর শুল, সেটার খানিকটা ঘাস খানিকটা আলগা, ধুলো, ডালের কাঠি-ভাঙা, শুকনো পাতার সঙ্গে গা লাগল, সেটা ওর কাছে অভ্যাসের জিনিস। গায়ে মাটি মাখলে দেহ সতেজ হয়, মতির মনে পড়ে ছেলেবেলায় কোথাও কেটে গেলে, বা হোঁচট খেয়ে আঙুলের ডগা উড়ে গেলে সে এক খাবলা ধুলো রক্তের ওপর চেপে দিত। এখন লোকে বলে, শ্রীপতিও তাদের মধ্যে পড়েছে, ওতে নাকি ঘা বিষিয়ে যায়, ধুলো দিলে। টংকার রোগ হয়। এত সব জানে আজকাল। মতিলাল বাপের

মতো হা-হা করে হাসতে পারে না, ছোট ছোট দুলুনিতে সে খি-খি করে হাঁসে, 'তাই আবার হয়, মাটি কি বিষায়? মাটিএ বিষ নাই রে, আছে মনিষ্যির মনে, হ্যাঁ…'

সে যাক, এখন ওর চোখ আকাশের দিকে, 'পরিষ্কারি' আকাশ, কাল বিকেলেই বৃষ্টি হয়েছিল, আর আলোয় নিমগাছের হালি পাতাগুলো ঝিকঝিক করছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফলে ফলে ভর্তি ছিল গাছটা. ছোট ছোট সবুজ লম্বাটে জিনিসগুলো, পেকে এখানে-ওখানে ঝরে পড়ছিল, দু-চারটে চারাগাছও জন্মেছে, ওই তো।

একটা ছোট্ট কাঠবিড়ালি গাছের গা বেয়ে অতি সতর্ক অথচ ত্বরিত গতিতে নেমে এল, মতিলালের অদূরে মাটি থেকে কিছু খুঁটে তুলে নিল দুই হাতে, লেজের ওপর বসে কুটকুট করে খেতে লাগল। তারপরই হাওয়া, একেবারে গাছের টঙে।

গাছটা মতিলালের খুব পরিচিত। কত দিন থেকে ওই একই রকম আছে, যত দূর মনে পড়ে সেই বাচ্চাকাল পর্যন্ত, গাছটা ওই রকমই আছে। না, তা ঠিক নয়, কিছু পরিবর্তন হয়েছে। গাছ থেকে এ পর্যন্ত চার-চারটে মোটা ডাল কাটা হয়েছে, এক একটা মৃত্যুর সময়। দাহ করার সময় অন্য কাঠ থাকে না তা নয়, কিন্তু নিমকাঠ খুব পবিত্র, দরকার। মতিলালদের বংশ পুরুষের বংশ, আর এক ছেলের বংশ, মেয়ে জন্মায় না, বউরাই আগে মরে, স্বামীর আগে।

মতিলাল স্পষ্ট মনে করতে পারে। সবার নিচে ওই ডালটা, ওটাই সবচেয়ে মোটা, ওটা কাটা হয়েছিল মায়ের মৃত্যুর সময়, সর্বপ্রথম ওই একটা ডালেই তিন বোঝা কাঠ হয়েছিল। তারপরও অনেকদিন বাবা বেঁচে ছিল। ওপরের ডালটা কাটা হয়েছিল তার মৃত্যুর সময়। মতির স্ত্রী—শ্রীপতির মা মারা গেছে, তা আজ বছর দশেক হল, সে জন্যে একটা। তারপর এই দু-বছর আগে বৌমা, শ্রীপতির স্ত্রী মারা গেছে। বড় অকালে গেল বউমা—তখন একমাত্র নাতি নয়ানচাঁদের বয়স মাত্র চার বছর। বৌরা আগে মরে মরুক, কিন্তু কেন যে বৌমা এক কুড়ি বয়স হতে না হতেই চলে গেল—মাঝে মাঝে মতিলালের বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে, ভয়ে কুঁকড়ে যায়, ঘরে কিছু পাপ ঢুকল নাকি?

'নয়ান, অনয়ানে…' হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল মতিলাল এবং নাতিকে ডাকতে লাগল। কেউ সাড়া দিল না। আরো কয়েকবার

ডাকল। লয়ানচাঁদ তো নয়ই, কিন্তু ঘরে কি কেউ নেই, শ্রীপতিও কি সাড়া দিতে পারে না? এই তো একটু আগে বেটা রেগে-মেগে বেরিয়ে এসেছিল। সে আবার গেল কোথায়, অফিসেই চলে গেল নাকি?—সে এক অফিসে আর্দালির কাজ করে।

একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল মতিলাল, আবার শুয়ে পড়বে কিনা এই ভেবে মাটির ওপর তাকাতে লাগল। একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর চোখে—এই মাটি, এই মাটিতে মিলাতে হবে। হ্যাঁ, শ্রীপতি কথাটা ঠিক বলেছিল, তার দিন হয়ে এসেছে। আর ক-দিন, ক-দিন বাঁচবে সে?

উঠে পড়ল, এদিক ওদিক তাকাল সন্ধানী দৃষ্টিতে। তারপর ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল, উঁকি মেরে দেখলে কেউ কোথাও নেই। পিছন ফিরে আবার নিমগাছটার দিকে মুখ করে দাঁড়াল মতিলাল, কোমরে দু-হাত রেখে। একটা সিরসিরে বাতাস উঠেছে।

হঠাৎ নিমগাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লয়ানচাঁদ। খালি গা, খালি পা, ধুলো লেগেছে, একটা হাফ-প্যান্ট পরনে, কোমরের নিচে অনেকটা নেমে এসেছে যেন এখনই খুলে পড়ে যাবে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মতিলালের কাছে, 'দাদু, আমাকে ডাকছিলে?' অনিশ্চিত চোখে তাকাল ছেলেটা, রোগা পাতলা চেহারা, কটা চুল, কিন্তু বেশ ডাগর ডাগর চোখ, দেখলেই মায়া হয়।

'হুঁ, শালা, কোথা গেছলি? ইদিকে আমি ডেকে ডেকে হাল্লাক হয়ে গেলম...' মাথায় রক্ত উঠে মতিলালের, লাফ দিয়ে (ঐ বুড়ো বয়সেও) সামনে এগিয়ে কষাল এক চড়। ছেলেটা ছিট্‌কে গেল, কিন্তু পড়ে না গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল। আবার হাত তুলে থমকে গেল মতি, আস্তে আস্তে হাতখানা নেমে এল, দু-জনেরই চোখ দু-জনের দিকে।

'না না, আয় দাদু আমার, চাঁদ আমার, লয়ানচাঁদ, চাঁদু সনা...' হঠাৎ কোলে তুলে নিল নাতিকে, চোখের জল কর্কশ হাতের তেলোয় মুছে দিল, চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে চুমু খেল, 'দাদু...'

ছেলেটা ধরা দিল, আদর নিতে লাগল, যদিও কর্কশ হাত বুলোনতে যাচ্ছিল কুঁচকে। এক সময়ে বললে, 'কী বলছিলে বল না...'

'দেখ, দাদু, ঐ দেখ...' নিমগাছের ওপর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল মতি, খাঁজ রেখে রেখে গাছটা উঠে গেছে, চারটে ডাল কাটা হয়ে গেছে, তার ওপরের ডালটাও বেশ মোটা, 'দাদু, আমি মরলে কুন ডালটা কাটবি বল

দিকি···একটাতে হবে নি রে, তুটা কাটবি, উইটা আর উব্রেয়রটা, বুঝলি···'

'ধুর্, উকথা বলতে নাই, ধুর্···' বলে কোল থেকে নেমে পড়ল লয়ানচাঁদ, 'ধুর্···।' মাটিতে পড়ে থাকা একটা পরিত্যক্ত কঞ্চির কাঠি তুলে নিল ও, সেইটে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার চলে গেল।

৩

সেদিন সন্ধ্যেবেলা উঠোনে বসে শণ কাটছে মতি, 'ত্যারা' দিয়ে। খুঁটিতে এক গোছা শণের গোড়ায় দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে দিয়েছে, ঝুলে আছে যেন মেয়েদের চুলের রাশ, তার এক একটা গুছি ধরে ঢ্যারাতে পাক দিচ্ছে, তৈরি হচ্ছে এক-সুতোর দড়ি, জড়িয়ে রাখছে চার-মুখো ঢ্যারাতেই, পরে কয়েক সুতোর পাক দিয়ে গরুর দড়ি তৈরি হবে। এখন অবশ্য গরু বাঁধার জন্য নাইলনের দড়ি পাওয়া যায়, মতি এখনও ঘরে তোলে নি।

'কে যায়··?

'আমি পসাদ···' প্রসাদ অবশ্য চলে যাচ্ছিল না, তার কাছেই এগিয়ে এল। বললে, 'শুনেছ মতিদাদা, ই মাসের বিশ তারিখে গবর্মেন্টর সাহেব আসছে ই তল্লাটে···'

'কেনে বল দিকি···গবর্মেন্টর সাহেব কে গো···' মতির হাত থামেনি, কথা শুনছে, আর বলছে।

'সেটেলমেনের বাবু গো, মাঠে মাঠে 'ক্যাম্প' (অ-কারান্ত) হবে, যেয়ে বলবে, ই জমি কার, মালিক বলবে আমার, বেশ, ই জমি কে চাষ করে, না, আমি করি, ই কথা বলবে চাষী, বাস, চাষীর নামে রেকড্···ভাগ্-রেকড্···'

'অ···' বলল মতি, 'ও রে লয়ানে, লম্ফটা দি যা ত, ই শালা আঁধারে আর দেখতে পাইনি, ভাই, পেসাদ, তমাকেও ঠাওর করতে পারছিলম নি, সাড়া দিলে তাই···'

'ইটা খুম ভাল হল, নাকি বল, মতিদা?'

'ভাল-মন্দ কী জানি, ভাই, বলে নিজের দেহ নিজের লয়, তায় আবার ভালমন্দর বিচার···তা, তুমি যাচ্ছ কোথা?'

'এই যাচ্ছি এগ্‌বার শিবমাড়য়, পাঁচ জনা যাচ্ছে, পার্টির বাবুরা মীটিন্ ডেকেছে, শুনে এসি পাঁচটা ভাল-মন্দ কথা···'

'তা যাও, ভাই, যাও···'

বস্তুত মতি একটা বেশ আমেজের মধ্যে ছিল, মাথাটাও বেশ ঠাণ্ডা আছে, মনে হচ্ছে, যে যা বলছে করছে সব ঠাণ্ডাটি হয়ে আছে, শণের দড়িটাও কাটছে ভালো।

লয়ানচাঁদ লম্ফ জেলে এনে দিয়ে গেল, তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে কালীদাসী বেয়ান, শ্রীপতির বিধবা পিসশাশুড়ী, তার কুলে কেউ নাই, মতিদের ঘরেও কোনো স্ত্রীলোক নাই, আর ঘরকন্নায় তো মেয়েছেলের দরকার, তাই আছে।

'ছিপাত কইরে, তোর বাপ?…'

'শিবমাড়য় মীটিনে গেছে, বিকালবেলা…'

'এ্যা, সে শালার বেটা আবার মীটিনে গেছে কেনে…' মতির ত্যারা ঘোরানো হাত থেমে গেল।

'জানিনি…' বলে লয়ানচাঁদ চলে গেল।

মতি যার খোঁজ করছিল, সেই শ্রীপতি একটু পরেই এসে গেল। আজ বেশ পোশাকের বাহার, প্রিন্টের লুঙ্গির ওপর ডোরা-কাটা হাফ-শার্ট, হঠাৎ 'ভদ্দবাবু' বলে মনে হয়। বাপের সঙ্গে কথা না বলে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল, মতি থামাল তাকে, 'তুই মীটিনে কেন গেছলি রে, কী হচ্ছে সেথা…'

ঘাড় বাঁকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল শ্রীপতি, চাপা গজরানো স্বরে বললে, 'তুমি কথাটি কইবেনি, নাম লিখি এলম…'

'কী বললি, নাম লিখালি, খানকি খাতায় নাম লিখালি…'

'মুখ খারাপ কোরনি বলছি, ভাল হবেনি…' মনে হচ্ছে, মিটিংএ যে গরম আবহাওয়া, তার আঁচটা এখনও শ্রীপতির চোখে-মুখে।

'মুখ খারাপ করছি! আরে উ ত শুধু মুখের কথা, আর তরা যে সবাই মিলে কাজটা খারাপ করছু—কুনটা ওজনে ভারি হল বল্ দিকি—শুন্, মাথা গরম করিস নি, ঠিক বল দিকি, কার নাম লিখলি?'

'তমার নাম, আবার কার—'

'আমার নাম, কুন্ জমিএ লিখালি?'

'জমি কি কাগজ, যে তার নাম লিখবে—কেনে, তুমি জাননি? বিশু রায়ের আড়াই বিঘা, আর চরণ হালদারের চার বিঘা আমরা যে ভাগে চাষ করি সেটা পার্টি বাবুদের খাতায় লিখালম, তমার নাম যাবে সেটলমেন্টের অফিসে, সেথেন থেকে কানুনগো সাহেব আসবে—'

ই তুই কি করলি রে, ই যে আমার মাথায় বজ্রপাত করলি, মাথা যে জলেপুড়ে গেলরে—'

হেঁচকা টানে শনের গুছি থেকে চ্যারাটা ছিঁড়ে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে মতি, কেরোসিনের টিন-ল্যাম্পের কাঁপা কাঁপা আলোয় তার বুড়ো দেহটা অদ্ভুত প্রেতের মতো দেখাচ্ছিল, কাছা খুলে গেছে, ফোকলা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, পাঁজরের হাড়ের মধ্যে বুকটা ওঠা-নামা করছে, ডান হাতে চ্যারাটা।

'আমি এখুনি যাব, দেখি শালার ব্যাটা কুন বাপের কাছে আমার নাম লিখিছু—' দুম করে উঠোনে নেমে পড়ল মতি। দু-এক পা এগোতে গিয়ে টলে গেল, 'ওরে লয়ানে, লয়ানে রে ই যে পা কাঁপতে লাগল, লাঠিটা দেনা শালা—'

শ্রীপতি একটু ভ্যাবাচাকা। বুঝল, বাবার অসুখ আছে। সে এগিয়ে এসে বলল, 'চল, সেখেনেই চল—লাঠি নাই, আমি ধরে লি যাচ্ছি—' বলে মতির বাম বাহু জড়িয়ে ধরল, 'তুমি নিজের দোষেই মরবে—'

'আমি মরব! তুই আমাকে মারলি…'

শিবমাড়য় তখন মিটিং-এর শেষবেশ, অনেকেই চলে গেছে। পার্টির স্থানীয় কর্তা এবং তার ছোকরা অনুচরেরা আছে। তাদের সামনে দু-চারখানা গ্রামের নক্‌সা, রেকর্ডের নকল, চাষীর নাম, আরো কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। নানা বয়সের দু-চার চাষী, আবার মুনিষ খাটে। ছোট দোকানিও আছে।

একটা হ্যাজাকের আলো ঠিক মাঝখানটাতে রাখা, তার ফলে অতি উজ্জ্বল আলোতে দেখারও ব্যাঘাত ঘটে। কথাবার্তা কম, আগে কী হয়েছে জানা নেই, এখন ঐ আলোতে মুখগুলো কঠিন দেখাচ্ছে সবার।

এখন বাড়ি থেকে যে রকম ভাবেই বেরোক মতি, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার রকম বদলে গেল। সে হাঁটু মুড়ে বসে মাটির ওপর মাথা ঠেকাল, 'পেন্নাম হই গো আপুনিরা পঞ্চজনা…আমি শ্রীমতিলাল খাঁ, জাতে বাগদী…'

তার পিছনে শ্রীপতি, পিতার এই দীনতায় মর্মাহত, কোন কথা বলছে না। যারা কাজ করছিল তারাও অবাক।

স্থানীয় নেতা সুবোধ পোদ্দার। তিনি গ্রামেরই লোক, তবে এখন ঘাটাল হয়ে মাস্টারি করেন। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, মতিদা?'

মতি উঠে বসেছে যাকে বলে 'ঠাকুরমন্তা' হয়ে, দু-হাঁটু আড়াআড়ি করে। আগেকার বসার রীতি। তার হাত দুটি তখনও জোড় করা, 'বাবু-সব আপুনিরা আমার নাম কেটে দেন…ঐ যে গো, বিভু রায় আর চরণ হালদারের জমিতে

আমার ব্যাটা আমার নাম লিখিছে…' বলে ঘাড় ঘুরিয়ে শ্রীপতির দিকে একবার রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল।

'কেন, ওদের জমি তুমি ভাগচাষ কর না ?'

'করি বাবু, আজ তা রকমে পন্‌র-ষোল বছর করছি, তবে আমার কথা খেলাপ হবে বাবু। কথা দিইছি, মুখের কথা, বলে মাতৃদিলাসার সমান, সে কথা খেলাপ করব, ছি-ছি…' নিজের ভুকান ছুঁল ও।

'কী কথা দিয়েছিলে ?'

'অরা ভুই মালিক আমাকে শুধাইছিল, কী মতিলাল, ভাগ-রেকড্ করাবেনি ত ? ত আমি বলেছিলম, পরের বাপকে বাপ বলব ! থালেই দেখুন, বিচার করুন, মায়ের দিলাসা হল কিনা…'

নেতার পাশের এক ছোকরা বললে, 'ওসব কথার কথা, ও-সবের কোনো ভ্যালু আছে নাকি।'

'তুমি বুঝ না কেন দাদা, গরিবের রক্ত শোষণ করে তারা বড়লোক হচ্ছে…'

'তারা বড়লোক হচ্ছে ত কি আমার মুণ্ডুটা কাটা যাচ্ছে…' বলে ডান হাতটা নিতোর গলার চারপাশে একবার ঘুরিয়ে আনল। তারপর সেই একই ঝোঁকে পিছনে ছেলেকে উদ্দেশ করে বললে, 'না কি, আমার 'অমুক' ছিঁড়ে যাচ্ছে…'

এখন যারা এতক্ষণ মতির কথা শুনছিল, তারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করল, বুড়ো সহজ লোক নয়। সেই ছোকরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'মুখ সামলে কথা বলুন, আপনি এই না পঞ্চজনাকে পেন্নাম জানালেন…'

'আমি আবার মুখ খারাপ করলাম কখন…ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা সে ত আমার বেটাকে বলেছি, না কি রে…আচ্ছা, আমার ঘাট হইছে। ত বাবুসব, আমাকে বুঝি বলুন দিকি, ই যে ভাগ-রেকড্ আপুনিরা করছেন, আপুনিরা নতুন পার্টি, ত ইতে গরিবের কী হবে…'

সেই ছোকরার মুখে রাগ চলে গিয়ে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'এটা খুব সোজা কথা, ভাগচাষী এখন জমির মালিক হয়ে যাবে—লাঙল যার জমি তার…'

'কী রকম ! ধরুন, বিশু রায়ের জমি আমি চাষ করি, আমি নাম লিখালে আমি জমির মালিক হয়ে যাব ? বিনুলে কাহার ভুমি পালকি

বয়, কনে বউ লি এসে লি যায়, ত বলেন কেনে যে ডুলি যায় কনে বউ তার…’

সবাই একটু খি-খি করে হেসে ফেলল।

সুবোধবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘কথাটা তা নয়, ভাগচাষ আইন যা হয়েছে তাতে বলছে, চাষীর তিন ভাগ, মালিকের একভাগ। আরো সুবিধে আছে, ভাগচাষীর কাছ থেকে মালিক কোনো দিন জমি ছাড়াতে পারবে না, পুরুষানুক্রমে চাষী দখল করবে…’

‘উ কথা আমি শুনেছি বটে, বাবু। পাঁচজনের মুখে শুনেছি। ত উটি আপুনিদের ল্যায্য বিচার লয়…’ বলে ও গুম খেয়ে বসল, খানিকটা জ'াকিয়ে। ‘মালিকের আট আনা, আমার আট আনা, এই চলে এসছে, ইটাই ভালো। ল্যায্য হল। তার জমি সে ছাড়াবে কি বিক্রি করবে তায় আমার কি…তার ছাগল সে মাথায় কাটবে, না ল্যাজে কাটবে আমি বলার কে, বলুন আপুনি…’

‘মালিকের জুলুম আর কতদিন সহ্য করবে, মতিদা ?’

‘রাম-রাম, মিথ্যে কথা, বাবু, মিথ্যে কথা। কুনুদিন মালিকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নাই, তুই-তোকারি নাই, বাবু বাড়ি যাই, গিন্নীমা নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ায় বাবু…তবে হ্যাঁ মালিক খারাপ আছে বটে, শালা পারুলের চংদার বাবুরা, চামার-চামার…তবে হক কথা কইব বাবু, চাষীগুলাও ধুয়া তুলসী পাতা লয়…’

‘গিন্নীমার রান্না খেয়েই ভুলে গেলে, মতিদা। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দুধের সরটি খেয়ে খাটের উপর আরামে ঘুমাচ্ছে, দেখতো…’

‘আ গো বাবু, চাটাই পেতে আমরাও ঘুমাই আরামে, আমাদের লিমতলায় শুয়ে থাকি। শুনেন বাবু, গরিব হওয়া ভালো। বলে, ইহ দিন যাবে যে খড় দিয়ে মাথা বাঁধে সেও ভাতার পাবে…’

আবার হেসে উঠল কেউ কেউ। সেই ছোকরা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, ‘সুবোধদা, মিছে সময় নষ্ট করবেন না। গরিবের উপকার হবে এই কথাটা উনি বুঝছেন না, বুড়ো-হাবড়া লোকগুলো অমনি হয়।’

‘বুড়ো-হাবড়া! তুমি ছোকরা পট্‌লা লয়? শরৎবাবুর বেটা? অমন মাটির মানুষ লোক, আর বেটা এমন কেনে। গরিবের উপকার বলছ, গরিবের সব্বনাশ করছ তমরা…’

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল।

'তা লয়! দশ বিশ বছর আগে এই দুটা গাঁ মিলে কতঘর ভাগচাষী ছিল জান, ছকরা? আমি জানি, রকমে হাজার ঘর। ত এখন কটি? না আঙুলে গুনা যায়। কেনে এমন হল, ত, তমাদের ভয়ে সব মালিক জমি নিজের হালবলদে চাষ করছে। আর যার পয়সা আছে গরিবের কাছ থিকে জমি কিনে লিচ্ছে। থালেই ভেবে দেখ, এক হাজার ঘরে তবু ত দুমুঠো মা লক্ষ্মী উঠত। এখন তারা করছে কি, না, দুয়ারে দুয়ারে মুনিষ খেটে খাচ্ছে, লক্ষ্মীর মুখটি দেখতে পায়নি, হ্যাঁ…'

সুবোধবাবু বললেন, 'ধনী কৃষকও আমরা রাখব না, জমি কারও হাতে থাকবে না…'

উত্তেজনায় হেসে কেঁদে হাতজোড় করে উঠে পড়ল মতি। জোড় হাত এদিক-ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে বলে গেল, 'দোহাই বাবু, আপুনিদের বাপমায়ের পায়ে ধরি, উইটা করে দিতে পারেন?…আহা, জমি কারও লয়, ভূমাটি ভূমাটির, সবাই মায়ের দুধ খাবে কিন্তু দুধ একলায় লয়, চাষীরও লয়, মালিকেরও লয়…শুনেন বাবু, ই কথা আমার বাপ বলত। তার পাঁচ বিঘা জমি ছেড়ে দিয়েছিল, বলত, জমি লয়রে যম। সত্যি বাবু, ভাববার কথা, ই দেহ আজ আমার আছে, ডাক্তার বলে আমার বেলাড্ পেসার হইছে…' ছেলে শ্রীপতিকে কাছে টেনে নিলে, 'আমার বেটা আপুনিদের আশীব্বাদে ভালো, বাপকে ভালবাসে, অর ভয় বাপ মরে যাবে, তাই ওষুদ আনে, কিন্তু আমি হেসে মরি, বুঝাই, ই দেহ আজ আমার আছে বলছি, কিন্তু কাল ই দেহ থাকবে নি… থালে দেহ কার' লয়…বলেন?'

'সুবোধদা, ধর্মকথা শুনুন তাহলে…'

মনে হল সুবোধবাবু কথাটা মেনে নিলেন না, আস্তে আস্তে বললেন, 'হবে, মতিদা হবে। জমি সব হবে স্টেটের, ব্যক্তিগত মালিকানা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এটা একটা সিঁড়ির ধাপ। এ আইন আমাদের আগেকার দরকার করে গেছে, তারা ভাঁওতা দিয়েছে, আমরা সেটা কাজে রূপ দিচ্ছি…'

খি-খি করে এবার হেসে উঠল মতি, 'থালে বাবু আপুনিরাই যে ভাঁওতার পায়ে পড়ে গেলেন গো। উ হচ্ছে ভাঁওতার আইন; দুটা চারটা ভাগচাষীর হাতে ভাগের মা দিচ্ছেন। সব চাষী সব মানুষ কোথা গেল…বলেন তাই। আর মানুষগুলা অসৎ হচ্ছে মিছা কইছে, মানুষগুলাকে খারাপ করে দিলেন বাবু। লাভ দেখালেন, জমির লোভ ছুঁড়ি মাগীর লোভ। উ করবেন কি বাবু।

আপুনি সিঁড়ির ধাপ বলছিলেন নি, আপুনিদের নিজের সিঁড়ি করুন বাবু। উই যে বললেন তখন, জমি কারো নয়…কথায় বলে, পরের সনা না দিবে কানে, টেনে লিবে হেঁচকা টানে…'

'আপনি থামবেন ? আমাদের ওসব তত্ত্বকথা শুনবার সময় নাই…'

থতমত খেয়ে গেল মতি। ওর সামনের লোকগুলোর দিকে এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল, সবার মুখই বিরস।

মতির হাত দুটি এখন জোড় করা নয়, দুপাশে ঝুলে পড়েছে, মাথাটিও। ও আস্তে আস্তে বললে, 'আমি যাই বাবু, আপুনিদের কথা আমি বুঝতে পারছি নি, আপুনিরাও আমার কথা বুঝতে পারছেন নি…ত উই একটি সোজা কথা ত বাবু আপনাদের বলছি, আমি ভাগচাষী বটে, তবে আমি নাম লিখাব নি…' বলে ও নমস্কার করে চলে গেল।

সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ বসে আছে। কিছু একটা অন্যরকম হয়ে গেছে যেন।

'বুর্জোয়া এথিক্স্…' সেই ছোকরা বললে।

'না হে সবটাই তা নয়…এরাই জাতচাষী, এদের বোঝাতে হবে, আমাদের ভিউপয়েন্ট সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। ধৈর্য থাকা চাই। ক্যাডারদের অধৈর্য হলে চলবে না। যাক্ তাহলে কি মতিলাল খাঁর নাম বাদ যাবে? আমরা অনিচ্ছুক চাষীর ওপর জোর করব না, অন প্রিন্সিপল্…'

'সুবোধদা, কি বলছেন আপনি! ওর ছেলে শ্রীপতির নাম দিয়ে দিন, সে তো গররাজি নয়।

৪

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার লক্ষ্মীকান্ত রায়ের ডিসপেনসারির দিকে যাচ্ছিল মতি। পাকা সড়ক ধরে। পড়ে গেল আওয়াজ-তোলা মিছিলের মধ্যে। সে যেদিকে যাচ্ছে, মিছিলও সেদিকে যাচ্ছে। হনহন করে হাঁটতে লাগল মতি, রাস্তার অপর প্রান্ত দিয়ে। কিন্তু কিছুতেই আর পেরোতে পারছে না। অনেক লোক, অনেক লম্বা লাইন। 'যাস্ শালা, মেয়াগুলান শুদ্ধা জুটেছে দেখছি…' মনে মনে উচ্চারণ করল। মুখটা উল্টো দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও, যাতে মিছিলে কে আছে, কারা আছে দেখতে না হয়। তবে আওয়াজগুলো ওর মাথায় খুব লাগে, যুগ যুগ জিও, চলবে না চলবে না, এক হও এক হও—এই সব। মাথায় যেন চিরে চিরে দাগ কাটে। ও

শুনতে চায় না। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি করছে, কিছুতেই আর মিছিল শেষ হচ্ছে না। শেষে একটা গলিপথে ঢুকে গেল ও। একটু ঘুরপথে রায় ডাক্তারের কাছে যাবে।

মফঃস্বলের ডাক্তার লক্ষ্মীকান্ত রায়। গ্রামের লোকজন নিয়ে কারবার। সকালেই সব রোগীর ভিড়। দুপুরে বিকেলে ডাক সারতে যান। সন্ধ্যাবেলায় শহরের মত রোগী থাকে না, কচিৎ কল আসে। এই সময়টা একটু গল্প-গুজব, আড্ডা চলে। তাসও পড়ে মাঝে মাঝে।

এখন কারেন্ট অফ। দুটো হারিকেন জ্বলছে। নিজের চেয়ারে বসে তালপাতার পাখা নাড়ছেন ডাক্তার রায়। পোস্টমাস্টার নিবারণবাবু একটা হারিকেনের সামনে খবরের কাগজ মেলে পড়ছেন। মতি গিয়ে হাজির হল।

'আরে মতিলাল যে, তোমার কথাই হচ্ছিল, এস...'

'আমার কথা কী, ডাক্তারবাবু···' মতি অবাক হল।

'তুমি না কি কাল বলেছ, তুমি নাম লেখাবে না? বিপদে পড়বে হে···'

'ছাড়ান দেন, ছাড়ান দেন উসব কথা। উসব আবার কথা না কি··· ডাক্তারবাবু, শুনেন, আমার নাড়িটা দেখেন ত...আপনার যে সেই মোটা ফিতায় নাড়ি মাপেন বেলাড্ পেসারের, সেইটা দিয়ে দেখেন ত...'

'কেন তাতে কি হবে? শ্রীপতি বলছিল তুমি নাকি আমার ওষুধ খাওনা, তাহলে প্রেসার দেখে কি হবে—'

'দেখলম তবু—আমার মন লেয় আমার উধ্বুক বেড়ে গেছে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বেলাড্ পেসার রোগটা কী জিনিস বলেন দিকি। তাতে কী হয়...'

'রাগ খুব বাড়ে, মাথা গরম হয়ে যায়···কাল তুমি যে খুব রেগেছিলে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবু, ঠিক। কাল আমার মাথা গরম হইছিল বটে। কী সব বললুম বাবু, তার মাথামুণ্ডু নাই। খুব রাগ হইছিল বটে, খুব রেগে গেছলম···' বলতে বলতে ভাবান্তর হল মতির, খিকখিক করে হাসতে লাগল।

'মতিলালবাবু, হাসছ কেন···' পোস্টমাস্টার কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে কৌতূহলী হলেন।

মতি একবার তাকায় ডাক্তারের দিকে। আবার তাকায় নিবারণবাবুর দিকে। বলে, 'বাবু বেলাড্ পেসার শুধু আমার হয়নি গো, উই সব লোকগুলার হইছে। উই যে গো, নামগানের দল, খুব রাগ। যেমন এই মারে ত এই মারে··মাথায় কম রক্ত চড়েছে মনে করেন··'

ওরা বুঝলেন ব্যাপারটা। হেসেও উঠলেন।

'তাহলে তোমার প্রেসারটা দেখেই দি, কী বল…' ডাক্তার বললেন।

'হ্যাঁ বাবু, দেখেন…' বলে হাত বাড়িয়ে দিল মতি।

দেখা শেষ করে ডাক্তার বললেন 'কই, তেমন তো কিছু বাড়ে নি। একই রকম আছে। ওষুদ না খাচ্ছ না খাও, তবে মাথাগরম করো না, আর সাত-পাঁচ ভেবো না। ছেলের সঙ্গে রাগারাগি হয় শুনলাম। তার দরকার কী। ছেলে এখন বড় হয়েছে, সে যা করছে করুক না…'

'ছিপতি বুঝি আপনাকে সব বলেছে, রাগারাগি হয়!…'

'আবার মাথা গরম করছ?'

'তা বটে, বাবু…আচ্ছা মাথাগরম করবনি। এসি বাবু, আমাকে আবার বাজার যেতে হবে…' কিন্তু মতি চলে গেল না, মাটির দিকে চোখ রেখে একরকম গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

'কিছু বলবে মতিলাল?

'একটুন বসে যাই ডাক্তারবাবু, মাথাটা ঘুরা ঘুরা লাগছে…' বলে সত্যিই ও মেঝের উপর বসল। হাঁটুর ওপর দুই কনুই, দুই তেলোতে মাথা চেপে ধরেছে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ই সব ভালো লয় বাবু, ছেলেটার মাথা আমিই খেলম। কাল হল কি…সে অনেক বিত্তান্ত…তখন তাঁতের কাজে মন্দা হল, সংসার চলে নি। ত করলম কি, দুটা বলদ কিনলম। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে—তাই হল আর কি। গরুর গাড়ি কিনলম একটা। এদের মাল বয়ে দি যাই, ত আয় হয় ভাল। ধানের মরশুমে বীজ বই, সার বই, ধান কাটা হলে ধান বয়ে দিই। ই পয্যন্ত ভালো। একদিন উই হালদার বাবুরা বলল, তুমি লোক খুব ভালো, মতি, আমাদের জমি চাষ করবে? বলদ আমার আছে, লাঙল কিনে ফেললম। ত ওই কাল হল। বাবা যে বলত জমি লয় যম…ত ভুলে গেছলম, বাবু। সেই জমি ছুঁলাম কি কাল হল। এখন বেটাকে আমি সামলাই কি করে বলেন ত, বলেন…'

'যাক গে, ওসব কথা ছেড়ে দাও, যেমন দিনকাল, মানিয়ে নাও খানিকটা।'

মতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল, ওদের নমস্কার করে চলে গেল। কী করে ছেলেকে মানিয়ে নেবে বুঝতে পারছিল না।

৫.

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। সেদিন বিকেল থেকে খুব গুমোট। গাছের পাতাটি নড়ে না। ঘাম হচ্ছে খুব। মতি গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস করে, তারপর গামছা ভিজিয়ে নিংড়ে মাথায় চাপায়। নিমগাছটার তলায় বসে, ঘোরাফেরা করে। গাছটার ডগা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে। একটা পাখি, কি কাঠবিড়ালি কিছু নেই। 'ধ্যেত্তুরি, তোর গুষ্টিকে লি…' বিড়বিড় করে মতি, 'লয়ানে, অ লয়ানে…বলি অ কালী বেয়ান…' কেউ সাড়া দেয় না।

সমস্ত বিকেলটা কাটল, সন্ধে গেল, রাত এক প্রহর হল। মতি বিছানায় শুল, কিন্তু শুধু এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। দরদর করে ঘাম দেয়, ঘুম আসে না।

তারপর চারদিকে একটা অস্পষ্ট নড়ন-চড়ন, আর চাপা গোঙানির মত শব্দ, অনেক দূর থেকে ছুটে আসছে। তারপর ঝড়। ঝাপটার পর ঝাপটা আসছে। তারপর বৃষ্টি। ওঃ সে কী দাপট, ঝড়ের আর বৃষ্টির। মতি স্থির হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঘরের চাল মড়মড় করছে। 'শালাঃ পৃথিবীটাকে রসাতলে দিবে নাকি…দেউ দেউ…'

সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম কিছুই বুঝতে পারল না মতি, তারপর একটা বিস্ময়ের চিৎকার শুনতে পেল, বিস্ময় আর মজার, শিশুকণ্ঠের। লয়ান চেঁচাচ্ছে। হল কি।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, যাঃ, নিমগাছটা ভেঙে পড়ে গেছে। তার ডালপালা বেরোবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে যেন। লয়ানে গাছটার চারদিকে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে।

'এই শালাঃ, অমন করছু কেনে, চুপ মার…' থমকে গেল লয়ানে। মতি এসে তার হাতটা ধরল। গাছটার দিকে একরকম করে চোখ মট্‌কে তাকিয়েছিল ও, 'যাস্‌ শালা, ই কী হল বল দিকি, গাছটা চলে গেল…শালা, ই থালে আমাকে পুড়াবি কি দিয়ে রে, লিমের ডাল কোথা পাবি আর…কী হল বল দিকি—'

লয়ানে সেদিনকার মতো কিছু বলল না, ও একটু অস্থির। ছাড়া পেলেই গাছটার কোনো একটা ডালে ওঠে।

সকালবেলার কাজ সেরে এসে মতি একখানা বাতাসা দিয়ে এক গ্লাস

জল খেল, ওই গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে। লয়ানে পড়ে যাওয়া গাছটার এডাল ওডাল করছে।

'লয়ানে, তোর বাপ কোথারে…'

'মাঠে গেছে, আজ বিশ তারিখ জাননি, মাঠে কী সব হবে…'

'ওস্ শালা, তাইত, শালাঃ তোদের ঐ বিশ তারিখ বিষ হবে রে—' লয়ানের দিকেই কটমট করে তাকাল মতি।

'বংশে, ও বংশে—' প্রতিবেশী এক মুনিষখাটা লোককে হেঁকে হেঁকে ডাকতে লাগল মতি। ভেতর থেকে মেয়ে কণ্ঠ বললে, 'ঘরে নাই, মাঠে গেছে—'

'মাঠে! সে আবার মাঠে কেনে…কার মুনিষ লেগেছে, সার বইতে গেছে?'

বংশীর স্ত্রী কাপড় সামলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, 'না বাবু, আজ মাঠে সেটেলমেনের মাপ হবেনি, তাই গেছে…'

'সে আবার গেল কেনে, সে মালিক না চাষী?'

'তা জানিনি বাবু, সবাই ভোর থিকে যাচ্ছে, উও গেল…'

'অ…' কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মতি, তারপর হেঁকে উঠল, 'লয়ানে, লেমে আয়ত, আমিও যাব। চল শালাঃ, তুই আর আমি যাই চল…'

মতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না লয়ানে, তাই মতি তাকে কাঁধের ওপর তুলে নিল।

তা বটে। সবাই গাঁ ভেঙে মাঠে চলে এসেছে। এখনো মাঠে নামেনি। জামতলায় ডাকাতে পুকুরের পাড়ে অপেক্ষা করছে সব। তারই মধ্যে কেউ একলা, কোথাও দু-তিনজন, ছোট বড় জটলা। সবাই উত্তেজিত, কিন্তু কেউ বেশি কথা বলছে না। কিসের প্রতীক্ষা করছে। মানে, সেটলমেন্ট ক্যাম্পের কানুনগো বাবু এখনো এসে পৌঁছন নি, তবে এই এলেন বলে।

'আগো, তমরা সব হরির লুট কুড়াতে এস্‌ছ নাকি। হেই দেখ, ফিঁকে দিবে আর তমরা সব চেটে লিবে, এঁ্যা…'

'আরে, মতিদাদা, এস এস, তমার নাম লিখাবে ত জমি-এ, তুমি ত চাষ কর…'

'হ্যাঁ, তা লিখাব বই কি, তমরা পঞ্চজনা সব লিখাইছ!… তা হ্যাঁ গো, তমরা সব এখেনে কেনে, মাঠে যাবে নি?'

'সেটেলমেন বাবু এসবে, তবে ত যাব—'

'ওঃ আমাদের রাজা এসবে, বল—' লয়ানে সম্বন্ধে এতক্ষণে খেয়াল হল মতির। তাকে আর কাঁধে বইবার দরকার নেই, নামিয়ে দিল। 'তা-ই ভাল হইচে, এই রাজা যদি মাঠে না এসৃবে, পেরজার কথা না শুনবে তালে আর কিসের রাজা? হঁ্যা...'

মতির কথাগুলোই ওই রকম, সবাই একটু আমোদ পায়। একজন কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠল, 'রাজা-রাজা কী বলছ, সরকারের অফিসার আসবেন সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্প থেকে...'

'উ ত একই কথা হল বাবা, যারা দেশ শাসন করে, তারাই ত রাজা, বল তাই...'

হঠাৎ ওর চোখ পড়ল একটা জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে চরণ হালদার। নাতির হাত ধরে তাড়াতাড়ি গিয়ে চিরদিন যা করে গলায় গামছা দিয়ে নত হয়ে নমস্কার করল, 'বাবু, আপুনিও এসেছেন? ...সব্বাই এসৃছে, ত আপুনিও...' (মতি দেখল না, তার ছেলে শ্রীপতিও এসেছে। তাকে দেখে আপাতত লুকিয়েছে একটা গাছের আড়ালে)।

চরণ হালদার দীর্ঘকায় লোক, বেঁটে বুড়োটার দিকে একরকম করে তাকাল, 'তুমি কেন এসেছ, মতিলাল, তুমিও কি মাপাবে নাকি...'

'মাপানো কি বাবু?...'

চরণ বিভ্রান্ত, আরও পাঁচজন মালিকের মতো ক্রুদ্ধ। কী ভাবে গায়ের জোর, বা কুটকচালে নীতিতে কাজ উদ্ধার করা যায়, মুখে তাই ভ্রুকুটি। কিন্তু এখন রাগ করার সময় নয়। বললে, 'তুমি কি কানুনগোকে বলবে যে আমার জমি চাষ কর?'

'তা জিগাসলে বলব...'

চরণ বাক্যহীন, 'এমন অধর্ম্ম করবে, তাহলে?'

মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় বোধ করল মতি, ঠিক বুঝতে পারল না, ম্লান কণ্ঠে বললে, 'অধর্ম্ম কী বাবু, বুঝতে পারছি নি। আমি আপুনির জমি চাষ করি ইটা ত সত্যি...'

'তুমি তাহলে কী কথা দিছ্‌লে!' বাধা পড়ল। চরণ উৎকণ্ঠিত হয়ে দূরের দিকে তাকাল, একটা জীপের শব্দ আসছে।

চরণের ভাবান্তর দেখে মতি কিন্তু বিমর্ষ। মালিকের মুখের দিকে সে তখনও চেয়ে আছে। বললে, 'বাবু আপুনি কেনে এলেন,...জমি কী হবে বাবু, দেখছেন নি সব হরির লুট কুড়াতে এসেছে। অরা মানুষ আছে, না, অদের

মানুষ রেখেছে। লোকটি ষোল আনা···আমার দিব্যি বাবু, আপুনিরা মানী লোক, তুচ্ছ জমির লেগে মান খুয়াবেন। জমি কার বাবু, বলে নিজের দেহ নিজের লয়···চলে যান কেনে···'

সব হুড়মুড় করে ছুটে গেছে, চরণবাবুও এগোল। মতিকে কেউ খেয়াল করল না। মতি সবার পিছু পিছু নাতির হাত ধরে যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

হ্যাঁ রাজার মতই চেহারা বটে। তা লম্বায় হাত চারেক হবে, বিলিতি পোশাক, চোখ কালো চস্‌মায় ঢাকা, ফর্সা টকটকে রঙ। মতি সবার পিছন থেকে নত হয়ে নমস্কার করল, সেটা কেউ দেখল না, রাজাও না।

তাঁর সঙ্গে আরও দু-জন নামল, জীপ থেকে। একজন অফিসের লোক, অন্যজন—ও হরি, সেই পট্‌লা, পার্টির লোক। সেও জুটেছে তাহলে।

কানুনগো মাঠে নামলেন, একটা আলপথ ধরে এগোতে লাগলেন। তাঁর ফোলিও ব্যাগের মুখ খোলা, কাগজপত্র সব রেডি, কলম হাতে নিয়েছেন। তাঁর সহকারী সেটলমেণ্ট নক্সা ম্যাপ খুলে দেখে, আবার গোল পাকিয়ে রেখেছে।

মতি ভিড়ের মধ্যে যতটা পারে রাজাবাবুর কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করছে, ভিড়ের চাপে পারছে না। তা ছাড়া হাতে-ধরা লয়ানে মাঝে মাঝে চ্যাঁ চ্যাঁ করছে, 'দাদু ঘরকে চল, দাদু···' মতি ধমক দিল ওকে। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'রাজাবাবু, মাটির গড়া থিকে ধরেন কেনে, ই সব জমি দেখলেন নি?'

মতির খুব গর্ব হল, হাসিতে ওর ফোক্‌লা মুখ ভরে উঠল। রাজাবাবু তার কথা শুনেছে। শুধু তাই নয়, কথাও বলছে, 'যে সব দাগ নম্বরের জন্য আমাদের কাছে আবেদন গেছে, সেই সব জমি তদন্ত করে দেখব আমরা, তার বাইরে নয়।'

'ইটা কী রকম হল বাবু, বুঝতে পারছি নি। ইসব রাজার জমি লয়?···

কানুনগো এগিয়ে যাচ্ছেন। একটা জায়গায় থামলেন তিনি। এক গোছা কাগজ থেকে একটা বের করে, সহকারীর হাত থেকে ম্যাপে দাগ নম্বর মিলিয়ে বললেন, 'এ জমির মালিক কে?'

'আজ্ঞে, আমি, সুরেন্দ্র দাস।'

'কে এই জমি চাষ করে?'

'আমিই করি, আমারই জমি...'

একটি স্বল্পবাস লোক এগিয়ে এসে একেবারে মাঠের ওপর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, 'হুজুর, আপুনি গরিবের মা-বাপ, ই জমি আমি ভাগচাষ করি, আমার নাম নগেন বেরা, পিতার নাম···' শিখানো বুলি গড়বড় করে বলে গেল।

কালো চশমাটা চোখ থেকে নামালেন কানুনগো, 'এ ডিস্‌প্যুট। তোমার কেউ সাক্ষী আছে, পাশের জমির চাষী কে?'

মালিকের একজন, চাষীর পক্ষে তিনজন সাক্ষ্য দিল। কানুনগো পার্টির লোক পটলার দিকে তাকালেন।

পটলা সম্মতিতে মাথা নাড়ল, 'এ জমি নগেন্দ্র বেরার নামে রেকর্ড হবে।'

হল। লিখলেন কানুনগো। তারপর তিনি সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। তাঁর ওপর এই রকমই নির্দেশ, কর্মচারীরা সরকারী নীতি জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলবেন।

'তুমি পুরুষানুক্রমে এই জমিতে ভাগচাষী থাকবে। মালিক যদি চাষের খরচ দেন তাহলে অর্ধেক ভাগ পাবেন, তা না হলে সিকি···' মালিককে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি বুঝলেন তো। যদি আপনার আপত্তি থাকে, পরে এ্যাটেস্টেশনের সময় তা জানাতে পারবেন।'

মালিক সুরেন্দ্র দাসের মুখ পাঁশুটে হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে। মাথায় হাত দিয়ে আলের ওপর বসে পড়ল সে।

মতি এগিয়ে এসেছে, 'থালে জমির মালিক কে হল রাজাবাবু, দু-জন মালিক হল যে···'

'তা এক রকম বটে।'

'ই যে ঘরের বউকে রাঁড় করে দিলেন আপুনি! বিয়াও স্বীকার যাচ্ছেন, আবার তার ঘরে পরপুরুষ ঢুকি দিচ্ছেন···'

ওই অবস্থাতেও হাসল কেউ কেউ। কানুনগো এ-কথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এ-জমিটা হল, ওটা হল। অধিকাংশই বাদ পড়ে রইল। শেষে একটা খেজুর গাছের পাশে চরণ হালদারের জমি এল, খাসা জমিটা, এক প্লটে চার বিঘা। সেই একই রকম প্রশ্ন এবং উত্তর। যেই চাষীর নাম উঠল, ভিড়ের থেকে শ্রীপতি বেরিয়ে এল। এমন একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়েছে যে কানুনগো এবং মতি, দুজনেরই মুখোমুখি হয়েছে। শ্রীপতির দেহ কঠিন, ক্রুদ্ধ। সে দাবি করল যে ভাগ চাষ করে।

মালিক চরণ হালদার বলল, 'মিথ্যে কথা, ওকে আমি চিনি না।'

'কেউ আপনার সাক্ষী আছে?'

মতি নাতির হাত ছেড়ে দিয়েছে, কাঁপছে, লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে এল, 'আমি আছি। কুন্ শালার বেটা বলে, ই জমি সে চাষ করে। ই জমি আমি চাষ করি...'

এটা কি কমি-ট্রাজেডি? কেউ কিন্তু হাসল না এবার।

কানুনগো একটু চুপ করে গেছেন, দেখছেন ওকে। লোকটা প্রথম থেকেই এটা-ওটা বলছে। বললেন, 'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে শ্রীমতিলাল খাঁ, পিতা ঈশ্বর বনমালী খাঁ, জাতে বাগদী...'

'বেশ, তাহলে এ জমির দাবিদার দু-জন, মতিলাল খাঁ, শ্রীপতি খাঁ, শুনানি হবে...'

'রাজাবাবু, আমি মিনতি করছি, উটি করবেন নি। ছিপতি, উ শালার বেটা, আমার বেটা মিছা কইছে। উ আমার সঙ্গে এসে, চাষে হাত লাগায়...বেটা বাপের সুসার করবেনি বলেন!...আর সত্যি বলছি বাবু, মাকালীর দিব্যি, আমি ই জমি ভাগচাষ করি, মালিকের ভাগ দি, আমার ভাগ করে লি, আট আনা-আট আনা, মালিকের সঙ্গে আমার কুনু বিরোধ নাই...'

'তাহলে তোমার কথা হচ্ছে, ভাগচাষী হিসাবে তোমার নাম লেখা হবে?'

সবেগে মাথা নাড়ল মতি, 'নাম লিখা না...আরে ছি-ছি, উ খানকিরা করে...এ্যাঁ, মুখ খারাপ করলুম, ক্ষেমা-ঘেন্না করে লেন বাবু, ছোটলোক চাষা বইত লয়...আর দেখেন আপনার চারদিকে, মুখগুলা দেখেন, যারা সব নাম লিখাতে এসছে, সব বেইমান, চোর, মালিকের হাতে-পায়ে ধরে তখন জমি চেয়ে লিছে, আর এখন বেইমানি করছে, ছ্যা-ছ্যা...'

কানুনগো কিন্তু কারো মুখের দিকে তাকালেন না। পটলার দিকেও না। ভাবছিলেন।

'রাজাবাবু আমার কথা রাখলেন নি, মুখগুলা দেখলেন নি...অপরাধ লিবেন নি। হালদারবাবু—উনির মুখটা দেখুন, আপনার পাশে পটলাবাবুর মুখটা দেখুন। উই পেসাদ, উই শালার বেটা ছিপতি—উসব আবার মানুষের মুখ গো—লোভ, স্বাথ। শুকুন, শুকুন, ভাগাড়ে গরু পড়েছে, শুকুন জুটেছে কুড়ি কুড়ি...বেইমানি করছে, মিছা বলছে...'

'ইর‍্‌রেলিভ্যাণ্ট। শুনুন, ওসব কথা থাক, একজনের বা দুজনের নাম থাকবে। সরকারের যা নিয়ম…'

'বাবুগো হাত জোড় করছি। আপুনিরা রাজা-সরকার, আপুনিরা আইন করেন কেনে, জমি কারও লয়…দেখবেন লোভ থাকবেনি, চোখগুলা শকুন হবে নি'…বলতে বলতে ওর মাথা ঘুরতে লাগল, কিন্তু ও বলে গেল, 'সব মানুষের চোখ হবে, খাঁটি মানুষ, বাবু…'

কথায় কথা ওঠে। 'ইর‍্‌রেলিভ্যাণ্ট' হলেও কানুনগো সকৌতুকে বলেন, 'তোমার কথা একরকম ঠিক, কিন্তু তাহলে লড়াই বাধবে, রক্তপাত হবে… বুকে সাহস আছে তো? দাবি ছাড়বে কেন কেউ…'

মতির চোখ পাকিয়ে উঠল। ঘাড় কাত হয়েছে। গামছাটা উত্তেজনায় লাঠির মতো মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে, 'সাহস আছে? বলেন কি…জমির আগাছা, বেনা, কাঁটা-ঝোপ সব শালা লাঙলের ফালায় তুলে ফেলিনি আমরা? তেড়ে তুলে ফেলি, তেড়ে তুলি…আমার মাথাটা গেল বাবু, উধ্ব্‌ক উঠছে, রক্ত বার করে দুব…শালা, জমি-এ কেউ এসে বলুক দিকি ঐ জমি আমার, তেড়ে দুব, লাঙলের ফালা…'

মতি টলতে টলতে মাঠের ওপর বসে পড়ল, হাঁপাচ্ছে ও। কয়েকজন তাকে এসে ধরে তুলবার চেষ্টা করল, মতি উঠতে পারল না, তখন তারা তাকে তুলে নিয়ে ভিড়ের বাইরে চলে গেল, বোধহয় ঘরে পৌঁছে দেবে। লয়ান ডুকরে কেঁদে উঠল, 'দাদুর কী হল, দাদু মরে গেল, ও দাদু—' সে ছুটতে লাগল ওদের পিছন পিছন।

একটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত, কেউ কোন কথা বলছে না।

প্রথম কথা বললেন কানুনগো, কালো চশমা খুলে তাকিয়ে রয়েছেন অপসৃয়মান লোকগুলোর দিকে। 'বাই জোভ, হিজ টকিং অব রেভোল্যুশন, নট ইভেন অ্যাফ্রেড অব ব্লাড্‌সেড…অফারিং হিমসেল্‌ফ এ্যাজ এ সোলজার, স্ট্রেঞ্জ!'

তাঁর ইংরেজি কথাগুলো কেউ বুঝল না। শ্রীপতি কেমন শুকিয়ে গেছে, ভাবল মতির সম্বন্ধেই উনি কিছু জানতে চাইছেন। বললে, 'স্যর, আপনি কিছু মনে করবেন না, বাবার বেলাড-পেসার আছে, খুব রাগ হয়…'

'আই সী, হী নিড্‌স সাম সিডেটিব।' হাতে ধরা কাগজের গোছাটার ওপর চোখ রাখলেন তিনি।

আলোচনা

আত্মহনন থেকে আত্মোত্তরণ

সুতপা ভট্টাচার্য

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো / সেই তো তোমার আলো'—এ বাণী যাঁর, তাঁকে আমরা আলোর দ্রষ্টা হিসেবেই জানি। কিন্তু অন্ধকারের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেই যে তাঁকে পেতে হয় আলোর প্রসাদ—সে কথা আমরা তত মনে রাখি না। আশি বছরের বিস্তৃত জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অন্ধকার আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে বারেবারেই, বারেবারেই তমসাত্তীর্ণের তপস্যা চলেছে তাঁর ভিতরে ভিতরে—তারই তো ইতিহাস লুকিয়ে থাকে তাঁর কবিতায়, গানে। এ-ধরনের কবিতা গানের একটি সংকলনের নাম 'গীতালি'।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় অবশ্য এ-রকম মনে করেন না। কবি 'যে মনের অন্ধকারের কথা পত্র-মধ্যে বারে বারে ব্যক্ত' করেছেন, 'গীতালি'র মধ্যে তিনি তার সমর্থন পান নি। বরং তাঁর মনে হয়েছে 'যে মানুষ আত্মখণ্ডন করিয়া মৃত্যু কামনা করিতেছেন, সমস্তকে অন্ধকার দেখিতেছেন, তিনি যখন সুরের সন্ধান পান, তখন দেখি তাঁর অন্যপ্রকার রূপ।' কিন্তু কেমন করে তা হবে। যে-অন্ধকারের কথা কবি বলছেন চিঠিতে, সে যে নিতান্তই আত্মিক, আর কবিতাই তো আত্মার ইতিহাস। তাই কবিতাগুলির দিকে আরেকবার ফিরে তাকানোর দরকার আছে বলে মনে হয়।

'Letters to a friend'-এর প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকাতেই এনড্রুজ জানিয়েছেন কবির এই অবসাদগ্রস্ত সময়ের কথা, যার সূচনা হয় ১৯১৪-র মে মাসে, রামগড় পাহাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই এ-অবস্থা কাটিয়ে ওঠেন কবি (এ-সময়ে লিখেছেন 'বলাকা' আর 'গীতিমাল্য'-র কবিতা), জুন মাসটা ভালোই যায়, কিন্তু জুলাই-এর শুরু থেকে আবার নেমে আসে অন্ধকার, অভিভূত করে রাখে কবিকে প্রায় তিনমাস। বাইরের দিকে এর উৎস ছিল না কোনো, কবির স্বাস্থ্য ভালো, ইসকুলের কাজকর্মও চলছিল

ভালোই। কিন্তু এন্‌ড্রুজকে জানিয়েছিলেন কবি ভিতরকার এক গভীর অবসাদের কথা, এন্‌ড্রুজের হিসাব অনুসারে যা স্থায়ী ছিল তিনমাস। এই সময়টায় এন্‌ড্রুজকে চিঠি তিনি প্রায় লেখেনই নি। লিখেছেন আবার যখন কুয়াশা কাটিয়ে উঠছেন। লিখছেন, 'আমার যন্ত্রণাপ্রদ বোঝাগুলো ঘাড় থেকে নামাবার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি। মনটা কিছুটা হাল্কা লাগছে বলেই আশা করছি আমার মুক্তি এবার সত্যিসত্যিই অর্জন করব।' এই চিঠি লিখছেন তিনি ১৩২১-এর ১৭ই আশ্বিন সুরুলের কুঠিবাড়ি থেকে। ঠিক এই সময়ই রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে এই অবসাদের এক মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন কবি, এমনকি তাঁকে লিখতে হয়েছে 'আমি **deliberately suicide** করতেই বসেছিলুম।' রথীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি, এ শুধু একটা ওষুধের প্রতিক্রিয়া, মেটিরিয়া মেডিকা থেকে তুলেও দিয়েছেন **Aurum** নামে সে ওষুধটির প্রতিক্রিয়ার বিবরণ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? একথা ঠিক, রামগড় থেকে এন্‌ড্রুজকে লেখা চিঠিতে যে **'death-pang'**-এর কথা বলেছেন কবি, তার সঙ্গে হয়তো সর্বাংশে এক নয় ক-মাস পরের এ আত্মহনন-অভীপ্সা; রামগড়ে যা ছিল শুধুই আত্মিক, শান্তিনিকেতনে তাকে হয়তো আরো মর্মঘাতী করে তুলেছে সংসারের হলাহল। তাই দেখা যায়, 'গীতালি'র উৎসর্গ পত্রের 'আশীর্বাণী'টি রচনার পর থেকে কবি যেন অবসাদ কাটিয়ে উঠছেন। ১৬ই আশ্বিন রাত্রে ঐ কবিতা লেখার পরই যেন পর্বান্তর ঘটে যাচ্ছে। মূল কবিতাটির প্রথমাংশে ব্যক্তিগত দিক আরো প্রকট:

"আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তাঁরে
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
জেগেছি অনেক রাত্রি ভেবেছি অনেক
ক্ষণেক বা আশা হয় আশঙ্কা ক্ষণেক।
হৃদয়ের তোলাপাড়া তুফানের ঢেউ—
মনে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।

---

* রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত মূল চিঠিতে তারিখ নেই। 'চিঠিপত্র' ২ নম্বরে লেখা আছে ১৯১৫। কিন্তু রামগড়-এর উল্লেখ থাকায় এর তারিখ ১৯১৪ ভাবাই সঙ্গত। চিঠিটি যে সুরুল থেকে লেখা, সে-কথা চিঠি পড়ে জানা যায়। প্রভাত মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এসব কারণেই চিঠিটি ১৯১৪-র বলে ধরে নিয়েছেন।

এমনি করিয়া বল কাটে কত কাল
মাঝি যে তাঁহারি হাতে ছেড়ে দিনু হাল।

এই সমর্পণের পরের দিনই তিনি এনড্রুজকে লিখতে পারছেন অনেক দিনের পর, যে-চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে আগেই। সম্ভবত এই সঙ্গেই রথীন্দ্রনাথ আর প্রতিমা দেবীকেও লিখেছেন তিনি। রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন: 'মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোনো সন্দেহ নেই।' প্রতিমা দেবীকে: 'আমার মনের মধ্যে কোথা থেকে একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাকবে না।... এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের টানে তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয় ত আমি তোমাদের কাজে লাগব।' 'গীতালি' গ্রন্থটি রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবীকেই উৎসর্গ করা ঐ আশীর্বাণী দিয়ে। ১৬ই আশ্বিন—এই দিনটির সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি মিলিয়ে সবশুদ্ধ নয়টি গান রচনা করেছিলেন কবি। একই দিনে এতগুলি গান রবীন্দ্রনাথও আর কখনো রচনা করেছেন কিনা জানা নেই। বোঝা যায় কী বিপুল আলোড়নে বিক্ষুব্ধ তখন তাঁর অন্তর্জগৎ।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো দুর্যোগের প্রভাবেই কি 'গীতালি'র গানে এত অবিরল ঝড়ের ছবি?

১. ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইছে আজি তোমার পানে

২. তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে

৩. ঝড় এসেছে, ওরে এবার ঝড়কে পেলেম সাথি

৪. ঝড়কে আমি করব মিতে

৫. ঝড় এনেছ এলোচুলে

৬. বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে

৭. ঐ যে নীরব বজ্রবাণী / আঘাত বুকে দিচ্ছে হানি

৮. খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় / ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে

৯. এই যে ঝঞ্ঝা তড়িৎজ্বালা

১০. উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক / জাগবে হাহাকার।

১১. ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুলবাতি / আগুন দিয়ে জ্বালব বারে বারে।

শেষ দৃষ্টান্তটি বাদ দিলে সবই ১৬ই আশ্বিনের আগের রচনা। ঐ দিনটির

কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায় গভীর এক ক্লান্তিনিবিড় শান্তি সেদিন নিজের ভিতরে অর্জন করছেন কবি। কিন্তু অর্জনের পথ তো সহজ নয়। একথা ঠিক ঝড়ের এই ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে ঝড় এখানে নঙর্থক নয়, তাঁর অন্তরতমর আবির্ভাব বলেই তিনি ঝড়কে বরণ করে নিচ্ছেন। তবু কি ঝড়ের ছবির আঘাতের দিক, ভীষণের দিক উপেক্ষা করা যায়? 'দুঃখের বরষা' 'বন্ধুর রথ' যদিবা পৌঁছে দেয় বুকে, তাই বলে তো চোখের জল-নাবা মিথ্যা হয়ে যায় না। 'হাহারবে' কবি হয়তো তাঁর পূজাই সমাপ্ত করছেন। কিন্তু লক্ষ করা উচিত—'ও নিঠুর আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে?' 'তোমার প্রেম তোমারে এমন করে করেছে নিষ্ঠুর' 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা' 'না বাঁচাবে আমায় যদি / মারবে কেন তবে?'—দিনের পর দিন এমন বুকচেরা হাহারব রবীন্দ্রকাব্যে আর কখনো শুনতে পাইনি আমরা।[১]

এইভাবে দেখি, নিবিড় এই গানের উৎসারার[২] মধ্যে নিবিড়তম এক নাটকও লুকিয়ে আছে। 'গীতালি'র সূচনা থেকে যে-আর্তস্বর শোনা যায়, তা যেন সংকট-উত্তরণের পথে শম খুঁজে পায় ১৬ই আশ্বিন তারিখে, তার পরেই শুধু কবি বলতে পারবেন 'আপন হতে বাহির' হয়ে বাইরে দাঁড়াবার কথা, বলতে পারবেন 'পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া'। পথে চলার বাণী 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে'র তুলনায় 'গীতালি'তে বেশি তো বটেই, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় তার অধিকাংশই ১৬ই আশ্বিনের পরের কবিতা। এন্ড্রুজ লিখেছিলেন আসন্ন যুদ্ধের পূর্ব-সংকেতই কবির এই প্রচণ্ড যন্ত্রণাবোধের কারণ, এছাড়া আর কিছুই তিনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু নিজের ভিতর থেকে বাইরে আসতে যদি না পারেন কবি, তবে সমগ্র পৃথিবীর বেদনাবোধ তাঁর নিজের মধ্যে বেজে উঠবে কী করে। ১৬ই আশ্বিনের পরেই এমন কবিতা মেলে, যেখানে 'ধরার কান্না' ডাক দিয়েছে কবিকে, নিশীথরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেছে 'দুঃস্বপ্নের আর্তবাণী'।

---

১. 'গীতাঞ্জলি'তে একদিনে রচিত দুটি গানে মাত্র 'আরো আঘাত সইবে আমার' আর 'এই করেছ ভালো নিঠুর'—'গীতালি'র অনুরূপ বেদনার্ত স্বর শোনা যায়।

২. 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'র তুলনায় 'গীতালি'র গানগুলি খুব কম সময়ের ব্যবধানে রচিত। 'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ লেখা এক বছরের মধ্যে, 'গীতিমাল্য'র দু-তিন বছর ধরে লেখা, সে জায়গায় 'গীতালি'র সামনের-পিছনের কয়েকটি বাদে অধিকাংশ গান রচিত হয়েছে মাত্র দু-মাসে। 'গীতালি'র স্বরের একাগ্রতা তাই 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে' অনুপস্থিত।

তাই মনে হয়, 'বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'—এই পংক্তির ভবিষ্যৎকাল অলঙ্কার মাত্র। সমস্ত গানটির সুর আর স্বর যেরকম আনন্দধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তাতে স্পষ্ট হয় 'বিশ্বের বাতায়ন' এবার খুলে গেছে। ১৬ই আশ্বিনের আগে-পরে এইভাবে 'তুই' সম্বোধনের প্রয়োগও বদলে যায়। অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার, আত্ম-সংগঠন করবার এই দুই মুখ—একদিকে 'তুমি' আর অন্যদিকে 'তুই', একদিকে প্রার্থনা, অন্যদিকে ধিক্কার, একদিকে সংকল্প, অন্যদিকে নির্দেশ। প্রার্থনা যে 'আমি'র কাছে, সংকল্প যে 'আমি'র কাছে তাকে ডাকতে হয় 'তুমি' বলে, আর ধিক্কার যে 'আমি'কে তাকে 'তুই' সম্বোধনই সাজে। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' আত্মবিষয়ক বলেই আধ্যাত্মিক। এই তিনটি বই জুড়ে আছে 'তুমি' কিংবা 'তুই'। 'গীতালি'তে তুই-এর ব্যবহার সবচেয়ে যে বেশি, তার কারণ এই সময়ই তাঁর আত্মধিক্কার সবচেয়ে তীব্র; রথীন্দ্রনাথকে লেখা সেই চিঠিটিতে নিজের স্বভাবের বিশেষণ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন 'ব্যাধিগ্রস্ত' 'অপ্রকৃতিস্থ'র মতো শব্দাবলি। এই তীব্র আত্মধিক্কার কবিতায় রূপ নেয় এই ভাবে :

১. নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী?
কেবলি কি ঢেউ আছে তোর?
হায় রে লাজে মরি।

২. লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই—
দেখরে চেয়ে আপন-পানে—
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।

নির্লিপ্তিতে পৌঁছনোর প্রাণপণ প্রয়াসে আত্ম-নির্দেশনার প্রয়োজনও 'গীতালি'তে সবচেয়ে বেশি। 'মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে' 'না রে, না-রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন', 'এই কথাটা ধরে রাখিস / মুক্তি তোরে পেতেই হবে', 'খুশি হ তুই আপন মনে' 'সহজ হবি সহজ হবি / ওরে মন সহজ হবি' 'চোখে দেখিস প্রাণে কানা / হিয়ার মাঝে দেখ না ধরে ভুবনখানা'—ইত্যাদি বিবিধ নির্দেশনায় নিজেকে তিনি অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। ১৬ই আশ্বিনের পর যেন ফুরিয়ে আসে এ-ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন। এরই মধ্যে যখন তিনি 'তোরা' ব্যবহার করেন, তখন এই বহুবচনের সীমা কতদূর, সে প্রশ্ন সহজেই ওঠে। 'তোরা

শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি / সে যে আসে আসে আসে'—'গীতাঞ্জলি'র এই 'তোরা'র প্রয়োগ থেকে অনেকটাই ভিন্ন 'গীতালি'র প্রয়োগ : 'নায়ে তোদের ফিরতে দেব না রে…'। এই 'তোর' তো তারাই যাদের উপর জোর আছে বক্তার, আছে অধিকার। তাদেরই কথা ভেবে ১৬ই আশ্বিন রাত্রে তাঁকে লিখতে হয়েছে : 'এদের পানে তাকাই আমি, বক্ষে কাঁপে ভয়'। লিখতে হয়েছে সেই কবিতাতেই 'ছোটো আমার বড়ো হয় যে যখন টানি কাছে / বড়ো তখন কেমন করে লুকায় তারি পাছে।' বোঝা যায় 'এরা' তাঁর 'কাছের', এদেরই তিনি সমর্পণ করতে পারলেন সে রাত্রে, আর তাই, পরবর্তী কবিতাগুলিতে 'তুই' বা 'তোরা'-র প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে, থাকলেও তার স্বর ভিন্ন। কাছের ঐ তাদেরকে নিজের পথে চালাতে গিয়েই কি ঘনিয়ে উঠেছিল অশান্তির ঝড়? তাই কি এনড্রুজকে লিখেছিলেন কবি দীক্ষার পথে তিনি আর নেই?—**'Preaching I must give up, and also trying to take up the role of a beneficent angel to others, I am praying to be lighted from within, and not simply to hold a light in my hand.'** ঠিক আগের দিনে লেখা 'গীতালি'র ৭৬ নম্বর কবিতাটি এরই বাণীরূপ :

পথের আঁধার পথে রেখে
এলেম ফিরে,
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো
ছেড়েছি রে।
এবার বলি 'ওগো আলো
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধূলায়
দিলেম ফেলে।

এক নতুন জন্মের প্রয়াসবেদনার কথা জানিয়েছিলেন কবি এনড্রুজকে রামগড় থেকে, জানিয়েছিলেন—'শিখরে নির্মল আলো, কিন্তু উপত্যকার চড়াই ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার।' তাঁর সে সময়কার প্রার্থনা—'সন্ধ্যা হল, ওমা এবার বুকে ধরো'—'গীতিমাল্য'র গান। কিন্তু প্রগাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলোর আকুল তৃষ্ণা 'গীতালি'রই বিশেষ বিষয়, তিনটি গীতগ্রন্থের সাধারণ বিষয় হয়েও। যে-আত্মিক অগ্নিস্নানের কথা লিখেছিলেন তিনি

রামগড় থেকে, তারই রূপায়ণ যেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'— সেও 'গীতালির'ই গান। তবে কি বলা যায় সে জন্মান্তর তাঁর সম্ভব হল 'গীতালি'-রই শেষে, পথে দাঁড়িয়ে পথের সাথিকে পাশে পেলেন যখন কবি? ১৬ই আশ্বিনের আগে একটিবার মাত্র কবি পথের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন—'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে / ডাক দিয়ে সে যায়'। কিন্তু আশ্বিনের শেষাশেষি থেকে পথের ছবি ঘুরে ঘুরে এল, শোনা গেল 'বলাকা'-র আগমনী।

'গীতালি' রচনার প্রায় সমসময়ে, ১৯১৪-র জুন মাসে অনেক দূর দেশের কবি রিলকে তাঁর বান্ধবী লু-কে চিঠিতে এরকমই এক মৃত্যুযন্ত্রণার কথা জানাচ্ছিলেন: 'বেঁচে আছি সমর্থভাবে নয়, মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর...'। আর তার কয়েকদিন পরের একটি চিঠিতে লু-কে একটি কবিতা পাঠাচ্ছেন রিলকে, যার উপরে Karner-এর উদ্ধৃতিটি লেখা: **'The road from inwardness to greatness goes through sacrifice'**। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'-র অন্তর্মুখিনতা থেকে 'বলাকা'র বিশ্বজীবনের মহত্ত্বে প্রবেশ করার মধ্যে যে অহং-ত্যাগের বেদনা লুকিয়ে আছে 'গীতালি' তারই রূপায়ণ। 'বলাকা'র পথের গান কোনো বাইরে থেকে পাওয়া তত্ত্বমাত্র নয়।

ইতিহাস জিজ্ঞাসা

উজ্জ্বল রায়

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত এই শতকের গোড়া থেকেই। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইংরেজ শাসন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ভূমিকার একটি মূল্যায়নের চেষ্টা দেখা যায়। যদিচ সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চবিত্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনোভাব এই প্রচেষ্টার সাফল্যের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিল।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের বিকাশের ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিকেরা কখনও একমত হতে পারেন নি এবং

তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই তাদের কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীতে ভাগ করেছে যদিচ তা সব সময় পরস্পর সম্পর্কবিহীন নয়। খুব সাধারণ ভাবে একটা গণ্ডি টানলে দেখা যাবে—একদলে রয়েছেন সে দিনের এম. এন. রায়, আর. পি. দত্ত থেকে শুরু করে বিপন চন্দ্র, সুমিত সরকার প্রভৃতি অতি-সাম্প্রতিক কালের এই ঐতিহাসিকেরা, যাঁদের সাধারণভাবে মার্কসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অপরদিকে রয়েছেন সেইসব ঐতিহাসিক যাঁদের সাথে অনেকে এঁটে দেন বা দিতে চান নিও-ট্র্যাডিশনালিস্ট ইম্পিরিয়্যালিস্ট ও কেমব্রিজ স্কুল বা ঐ জাতীয় কোনো লেবেল। এঁদের মধ্যে জন গ্যালাঘার, অনিল শীল, ব্রুমফিল্ড, জুডিথ ব্রাউন ও আরো পরে ওয়াশব্রুক, ফ্রাইকেনবার্গ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা ভারতের জাতীয়তাবাদ তথা ভারতের ইতিহাসকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন যা তাঁদের পৃথক করেছে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের থেকে।

মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশ যুগের ভারতের ইতিহাস আলোচনায় প্রথমেই গুরুত্ব দেন কতগুলি মূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ওপর যা কেবলমাত্র ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ও প্রভাবের জন্যেই সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের মতে ভারতে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পশ্চাতে ছিল এক নতুন অর্থনৈতিক শক্তি। অপর পক্ষে তথাকথিত নিও-ট্র্যাডিশনবাদী ঐতিহাসিকগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে কোনোপ্রকার ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করেন, বরঞ্চ তারা গুরুত্ব আরোপ করেন কতগুলি সাংগঠনিক পরিবর্তনের (institutional changes) ওপর—যেমন ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা যা ভারতের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ভিতরকার ভারসাম্যকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

'পরিচয়'-এর 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে এই বিতর্কের বা বিসংবাদের ছায়া পড়েছে। নরহরি কবিরাজ ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'পরিচয়'-এ ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক কিছু বই-এর সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখাগুলির একটি তালিকা দিচ্ছি। নরহরি কবিরাজ-এর দুটি লেখা, 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিকৃত ভাষ্য' (শারদীয়, ১৯৭৬) ও 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন ব্যাখ্যা' (সমালোচনা সংখ্যা, মার্চ-মে ১৯৭৭)। আর, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দুটি লেখা, প্রদীপ সিংহ-এর 'ক্যালকাটা

ইন আরব্যান হিস্টরি'-র সমালোচনা (এপ্রিল ১৯৭৯) ও এরিক স্টোকস-এর 'দি পেজাণ্ট এ্যাণ্ড দি রাজ'-এর সমালোচনা (মার্চ ১৯৮০)।

উপরিউক্ত প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি প্রায় একই সুর ও ছন্দে বাঁধা, পার্থক্য এই শ্রীনরহরি কবিরাজ অনেক বেশি আক্রমণাত্মক যেখানে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা সংযত। আর অন্য বই-এর আলোচনা প্রসঙ্গেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এঁরা দুজনেই মূলত আক্রমণ করেছেন দুটি বইকে। অনিল শীল-এর 'ইমারজেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম' এবং জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড-এর 'এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি'।

শ্রীকবিরাজ একে একে ব্লেয়ার কিং, ডেভিড কফ প্রভৃতিকে অসাধারণ বিদ্রূপাত্মক বিশেষণে বিশেষিত করে এদের সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ-পূর্বক মন্তব্য করেছেন—'নতুবা নয়া-উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকেরা নিঃশব্দে ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজেদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হবে।' এবং তিনি ভেবে অবাক হচ্ছেন কেন এই ঐতিহাসিকেরা আজ এত সমাদৃত? তাঁর মতে বোধহয় সাম্রাজ্যবাদের নয়া ব্যাখ্যাকারী এই ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে একধরনের জেহাদ ঘোষণা করা সচেতন বুদ্ধিজীবী মহলের আশু কর্তব্য।

অন্যদিকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শীল ও ব্রুমফিল্ড-এর এলিট-সর্বস্ব ব্যাখ্যায় ফাঁক খোঁজেন মার্কসবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে তার তুলনা করে।

এত আলোচনার পরেও সমস্যার সমাধান কিন্তু হয় না। আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না কি দোষ করেছে এই ঐতিহাসিকরা—যাঁরা কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল বেছে নিয়ে সেখানকার জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমাজের উঁচু শ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদ, গোলযোগ ও স্বার্থান্বেষিতা—তার ভিত্তিতে সমাজের আর-একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে অর্থনৈতিক কারণই প্রধান চালিকা শক্তি ছিল না।

সমালোচকরা এই পদ্ধতি সম্পর্কে নীরব। তাই বোধহয় রবীন্দ্রকুমার যখন ১৯১৯-এর লাহোর অঞ্চলের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেন—**'the loyalties of the individual and his sense of identity were shaped by community and religion, rather than by class and occupation,'** অন্য কোনো মহল থেকে কোনো বিরূপ মন্তব্য শোনা যায় না।

আরও একধাপ এগিয়ে ফ্রাইকেনবার্গ-এর গুণ্টুর জেলার ওপর লিখিত

অসাধারণ গবেষণামূলক নিবন্ধ অথবা ওয়াশব্রুক-এর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি নিয়ে আলোচনা যার শুধুমাত্র কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই পরিচয় পুস্তক-সমালোচক তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন—বুঝিয়ে দেয় এদের সম্পর্কে খোলা মনে কোনো যুক্তিবহুল আলোচনায় তাঁর অনিচ্ছা।

তাই দেখতে পাই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্পর্কে গর্ডন জনসন-এর উক্তি—'The most obvious characteristic of every Indian politician was that each acted for many interests at all levels of Indian society and in doing so cut across the horizontal ties of class, caste, region and religion'.

এ-জাতীয় বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের কোনো চেষ্টা দেখিনি 'পরিচয়'-এর কোনো আলোচনায়।

পরিশেষে একথা বলার সময় হয়তো এসেছে যে ভারতের জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় আন্দোলন শীর্ষক আলোচনা আজ এক অতি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তর্কবিতর্কের বেড়াজাল ভেদ করে কয়েকটি সত্য বোধহয় খুব স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত। কয়েকটি বিষয়গত পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন যেমন অর্থনৈতিক ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সত্যিকারের স্বার্থের পরিমাণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয়দের স্বার্থ— যাঁরা ব্রিটিশস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

এক্ষেত্রে এটাই একান্ত নিবেদন, শুধু কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণাত্মক আলোচনা পাঠকের ইতিহাসজিজ্ঞাসা মেটাতে পারেনা। আরও খোলামনে যথেষ্ট যুক্তির সাহায্যেই অপর মতকে খণ্ডিত করা—এটাই একান্তভাবে কাম্য। অধিকন্তু 'পরিচয়'-এর কাছে আমাদের দাবি—আরও বিস্তৃত আলোচনা হোক বিষয়টির ওপর—যেখানে শুধুমাত্র নস্যাৎ করা ছাড়াও একটি সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা থাকবে। আমার মনে হয় 'পরিচয়'-এর কাছে এ দাবি খুব একটা অযৌক্তিক নয়।

দুটি কবিতা

সিদ্ধেশ্বর সেন

সাঁঝ, আরশিনগর

সূর্যাস্তের গুঁড়ো অসহ্য, তীব্র,
আসক্তির মতো
গাঢ় রঙ চড়িয়েছে

এ-সবই বৃষ্টির পর
এক-আকাশ
জলমোছা প্রতিফলনের মস্ত কাচে

বাড়ির কাছেই
আরশিনগরে এই

চেরা-সিঁথি নদী তাই সিঁদুরে-টকটকে

জলকণা এখনও জড়ানো গায়
শেষরশ্মি মসৃণ চেলি

একদিন ছিলে তুমি বিবাহবাসরে

শুনেছিলে গোধূলিতে
লগ্নের সানাই

গিয়েছিলে জোড়ে

উপ্‌চানো দুধের মতো
পাত্র থেকে
বরণের আলোর সংসারে

বেজেছিল শাঁখ, উলু

তোমাকেই পড়ে গেছে মনে
গোত্রান্তর তোমারও
শ্রাবণে

বাড়ির কাছেই
আরশিনগরে এই

আজ কিন্তু সাঁঝ লাগল ব'লে ॥

গান

কোথায় গান,   কেমন গানের রীতি
এই গান যাবে থেমে ?

যেমন ভরাট গলার জোয়ারি
লেগেছিল
সে তো লোকায়তে-বাঁধা প্রাণের-ই প্রীতি

তাতেই ধরেছে
সুরকল্পের সূর্য-তারা

মাটি ঘাসে-ঘাসে
সেই রোমাঞ্চে
পা ফেলে কারা

কান পেতে রাখে

চোখ মেলে দেয়
মানুষী মেলায়

অগাধ,
দরাজ হৃদয়ের মতো, প্রেমে

কণ্ঠে অমর রবীন্দ্র সঙ্গীত-ই ॥

শ্মশান থেকে আসছি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমার
গলার গান
হাতে তুলি ছেনি-বাটালিতে পাথর
পায়ে ফুটবল—
আমি শ্মশান থেকে আসছি।

চারপাশে
বলিবাদ্য জয়জোকার
আকাশভরা সূর্যতারা
ঘাসে ঘাসে পা জড়িয়ে ধরে
লাল হলুদ মেরুন সবুজ
সেক্সি থাই-কামড়ানো হটপ্যান্ট
গো-গো
নূপুর-ত্রিশূলে ঝাঁকালো বাঁক
বাবার ভুঁড়ি
মারো ছুরি
আমার হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
পায়ে ফুটবল—
আমি শ্মশান থেকে আসছি।

কে যেন বলেছিল : শ্মশানে দেখা হবে।
তাই শুলুক-সুযোগে
সব স্মৃতি আশা ভবিষ্যতের
পথগুলো
এখন খরস্রোতা নদীর মতো
ঝাঁপ দিচ্ছে শ্মশানে
তারপর ক'দিন এক নাগাড়ে চড়ুইভাতি
এক নাগাড়ে
চন্দনকাঠের ফ্রাইংপ্যানে ঝলসে নেয়া
ভাস্কর চিত্রী গাইয়ে
লাল হলুদ সবুজ মেরুনের
বুড়োটে আর তরতাজা
কিলো কিলো মাংস
বাগাপ্ হর্‌রে
মার কাঠারি ভোঁতা ছুরি
চারপাশে বলিবাদ্য আর জয়জোকার
আমার হাতে ছাই গলায় বিষ
মুখে আগুন
চুল্লু আর গাঁজায় স্বপ্নে আর স্মৃতিতে
টপ্‌ভুজঙ্গ
হেলতে দুলতে টলতে টলতে
আমি শ্মশান থেকে আসছি।

ভারতীয় সঙ্গীত-চিন্তা

গীতবাদ্যম্ (১ম খণ্ড)। লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ। প্রকাশক: প্রতাপ নারায়ণ ঘোষ, বি. কম., ১২৩/১-এ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলি-৬। মূল্য পঁচিশ টাকা।

সঙ্গীত প্রধানত ক্রিয়াত্মক হলেও তার ঔপপত্তিক অংশ নেহাৎ তুচ্ছ নয়; প্রাচীনকালে আমাদের সঙ্গীতজ্ঞরা এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন, তাই আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে পরবর্তী বহু শতাব্দী সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনার ধারা বহমান থাকতে দেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও গূঢ় কারণে সঙ্গীতের এই অঙ্গটি উপেক্ষিত হতে থাকে, এবং আমাদের গায়ক ও বাদকগণ কেবল গান ও বাজনার মধ্যে তাঁদের গণ্ডি ক্রমাগত শীর্ণ করে আনেন, ফলে প্রকৃত তত্ত্ব ও জ্ঞানের অভাবে এক ধরনের গোঁড়ামি উস্তাদদের দুর্গ হয়ে উঠতে থাকে, সেই দুর্গে জিজ্ঞাসার পরিসর কমে আসে সঙ্গত ভাবে, আর প্রশ্নের উত্তরে কেবল খান-দানের দোহাই পাড়া যে সচলতা বা এগিয়ে যাওয়ার চিহ্ন নয়—তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইদানীং অবশ্য পরীক্ষার কল্যাণে ও উপাধি লাভের চেষ্টায় কিছু কিছু জিজ্ঞাসা মুখর হয়ে উঠছে। অন্যদিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করার ফলে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কিছু বই রচিত হচ্ছে, এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ পাশ দিয়ে গবেষণা-কাজেও নিযুক্ত হচ্ছেন। তাই গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বই-এর অনটন ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে, যদিও ভারতীয় সংগাতের ব্যাপ্তি বিস্তার ও গভীরতার তুলনায় তা যথেষ্ট নয় নিশ্চিত ভাবে, তাই সংগীত সম্পর্কে কোনও বই হাতে এলে তাতে আনন্দ জাগা স্বাভাবিক, উপরন্তু সেই বই যদি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও পরীক্ষা বিষয়ক জিজ্ঞাসা মিটিয়ে আরও কিছু পরিবেশন করে তবে গ্রন্থকার আমাদের অশেষ সাধুবাদের পাত্র হয়ে ওঠেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ প্রণীত 'গীত-বাদ্যম' তেমন একটি বই, যাতে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করা হলেও লেখক কোথাওই

আলোচনার দাঁড়ি টেনে দেন না; সঙ্গীত-প্রেমী, অনুসন্ধিৎসু ও অগ্রবর্তী অনুশীলকদের যে-জিজ্ঞাসা জাগে বা জাগার সম্ভাবনা—তেমন সব জ্ঞাতব্য বিষয় 'গীত-বাদ্যম্'-এ আলোচ্য সূচি হয়, সেজন্য গ্রন্থটি মামুলি পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি অতিক্রম করে অনায়াসে, ফলে তা সমালোচকের দৃষ্টি কাড়ে, কেননা বাংলা ভাষায় ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থের এখনও অনেক দরকার।

আমাদের সঙ্গীত তৌর্যত্রিক, কারণ সঙ্গীত বলতে আমরা বুঝি গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যম্। কিন্তু এখন গীত ও বাদ্য—এই দুই কাণ্ড সচরাচর সঙ্গীত রূপে আখ্যাত হয়, আধুনিক এই পরিবর্তন সম্পর্কে লক্ষীনারায়ণবাবু যে ওয়াকিবহাল তার প্রমাণ মেলে বইটির নামের মধ্যে এবং তিনি সঙ্গতভাবে আলোচ্য বিষয় করেন গীত ও বাদ্য, যদিও নৃত্য সঙ্গীতের মধ্যে গণ্য, তবু নৃত্যের জন্য পৃথক 'তালিম'-এর প্রয়োজন হয়, তাই নৃত্যের জন্য অন্য বই লেখাই সমীচীন, কারণ নৃত্য কেবল শ্রাব্য নয়, দৃশ্য শিল্পও বটে।

'গীত-বাদ্যম্' গ্রন্থটি দুই কাণ্ডে বিভক্ত, এবং অনিবার্যভাবে প্রথমে স্থান পেয়েছে গীতকাণ্ড, এই কাণ্ডে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয় নানাভাবে নানা আলোকে আলোচিত হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান মুখ্য—এ-বিষয়ে দ্বিমত হওয়া বোধহয় অসম্ভব, কেননা আমাদের যন্ত্রসঙ্গীত তো কণ্ঠকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে স্বকীয়ত্ব লাভ করেছে, ফলে কণ্ঠও যন্ত্রসঙ্গীতের নান্দনিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে না, যদিও উভয়ের করণ-কৌশলগত (টেকনিক) অমিল আছে, কিন্তু কোনও কোনও সময় দক্ষ শিল্পীর কাছে সে পার্থক্য ঘুচে যায়, তখন উভয় প্রকার সঙ্গীতের দারুণ সমৃদ্ধি ঘটে—কণ্ঠ ধার নেয় যন্ত্রের কৌশল, যন্ত্রও ঋণী হতে কসুর করে না কণ্ঠের কাছে, এভাবেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না।

শ্রাব্য বলেই সঙ্গীতে ধ্বনির এত মাহাত্ম্য, তাই সঙ্গীত আলোচনায় ধ্বনি, নাদ ইত্যাদি বিশেষ অনুধাবনের বিষয় হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীবাবু প্রাথমিক দু-একটি কথা বলেই শব্দ, ধ্বনি নাদ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন, আর কান টানলে মাথা যেমন আসে তেমনি নাদ প্রসঙ্গর সঙ্গে এসে পড়ে শ্রুতি, স্বর, সুর, আন্দোলন, বর্ণ প্রভৃতির আলোচনা—একটু বিস্তৃতভাবে নিশ্চয়ই, কারণ ভারত সঙ্গীতবিদ্‌দের কাছে স্বর ও শ্রুতির সামান্য পার্থক্যই দারুণ অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কিন্তু স্বর বা সুর শূন্যে ঝুলে থাকলেও সাঙ্গীতিক ধ্বনি হচ্ছে নিয়মিত ধ্বনি অর্থাৎ তা সময়কে কখনো এড়িয়ে যায় না বা যেতে পারে না, সময়কে সঠিক ভাবে কেটে কেটে কালের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তাতে লয় রক্ষা পায়, ধ্বনি একদিকে নিয়মিত ও অন্যদিকে মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে সাঙ্গীতিক হয়ে ওঠে। তাই সংগীতে মাত্রা, ছন্দ, তাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে· এমন কি সংগীতের অনিবদ্ধ অংশে কিংবা আলাপে এগুলো বিস্মৃত হওয়া যায় না। 'গীত-বাদ্যম্'-এ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে, এবং সেখানে এমন কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় যা অন্য বইতে পাওয়া যায় না, কেবল আকর গ্রন্থে অনেক হদিশের পর তার সন্ধান পাওয়া যায় কখনো কখনো।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে রাগের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তাই রাগের লক্ষণ, বাদী-বিবাদী স্বর, রাগ পরিবেশনের সময়, রাগের রসরূপ, অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ গানের প্রাচীন ও নবীন রীতি জানা যে-কোনও সংগীত-শিক্ষার্থীর পক্ষে আবশ্যিক—এই প্রসঙ্গগুলির বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে সংগীতের বিভিন্ন রূপের যেমন ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি নানা ঘরাণার বৈশিষ্ট্য-সমেত আলোচিত হয়, তবু লেখক সেই সঙ্গে লোক-সংগীত, কীর্তন, শ্যামা সংগীত এমন কি রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্র ও নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তর গান সম্পর্কে ভোলেন না।

কিন্তু সংগীত সংরক্ষিত হয় উন্নত ও বৈজ্ঞানিক সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে, যা আমাদের কাছে স্বরলিপি নামে পরিচিত। ভারতীয় সংগীতের অমূল্য সম্পদের অনেকখানি আমরা প্রকৃত স্বরলিপির অভাবে হারিয়ে বসেছি, তাই এ সম্বন্ধে সংগীতবিদ্‌গণ যথেষ্ট ভাবিত হয়েছেন, কারণ সংগীত সংরক্ষিত হওয়ার পরই সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার প্রশ্ন ওঠে। লক্ষ্মীবাবু সঙ্গতভাবে স্বরলিপি অধ্যায়টি বিস্তৃতভাবে লেখেন, তাতে স্বরলিপিচর্চার ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস ও প্রতিটি স্বরলিপি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখা হয়, কিন্তু হালফিল এ-বিষয়ে আদৌ চর্চা হচ্ছে কিনা—লক্ষ্মীবাবু সে-কথা আমাদের জানান না বলে আক্ষেপ থাকে। ভারতীয় সঙ্গীতকে স্বরলিপির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া যায় না—সে কথা মান্য, তবু কি ভাবে তা সংরক্ষিত করা যায়—সে কথা ভাবনার বিষয় বটে! লক্ষ্মীবাবু সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশ প্রায় সম্পূর্ণ করেন গায়ন ও বাদনের বিভিন্ন অলঙ্কার ও কলা-কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পরিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে।

কিন্তু 'গীত-বাদ্যম্'-এর বাস্তুকাণ্ডটি নিঃসন্দেহে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করবে। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, যার পরিচয় মেলে মন্দির ও দেউলের শরীরে স্ফুট অর্ধ-স্ফুট ভাস্কর্যে কিংবা রেলিঙের কারুকাজে, আর কণ্ঠ সংগীতের অনুগামী হিসেবে কেবল নয় স্বাধীন স্বতন্ত্র যন্ত্রচর্চার ধারা কম বেগবান ছিল না—তা ঐসব অলঙ্করণের সাক্ষ্যে বোঝা যায়। কিন্তু ক্রিয়াত্মক চর্চার অনুপাতে লিখিত পুঁথি ও গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্যই বলতে হয়, এবং বাংলায় তেমন গ্রন্থের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় তা বলা বোধহয় অতিরঞ্জন নয়। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখযোগ্য, লক্ষ্মীবাবু সেই পথ ধরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন।

তত, আনদ্ধ, শুষির, ঘন প্রভৃতি যন্ত্রের বিবরণ দিয়েই লেখক ক্ষান্ত হন নি, ঐ যন্ত্রের অনেকগুলি সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা ও সংশয় নানাভাবে যুক্তি ও মান্য উদ্ধৃতি দিয়ে নিরসনের চেষ্টা করেছেন, এবং প্রায় প্রতিটি যন্ত্রের বেলায় তার আদিরূপ থেকে বর্তমান বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট করে তোলেন। বইটির আকর্ষণ আরও বাড়ে প্রচলিত অ-চলিত যন্ত্রের চিত্র সংযুক্ত হওয়ায়, এর ফলে সকলের পক্ষে যন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া সহজ হয়। এ-ছাড়া লেখক অতি সংক্ষেপে যন্ত্র বাজানোর রীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন ও বিভিন্ন ঘরাণার পরিচয় দেন, অবশ্য কোন কোন ঘরাণার গুণীদের উল্লেখে হয়ত অসতর্কে কয়েকটি উল্লেখ্য নাম বাদ পড়ে যায়।

'গীত-বাদ্যম্' রচনার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, কারণ বহু অপ্রচলিত যন্ত্রের বিবরণ ও তার চিত্র যোজনা করতে গিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত মত ও যুক্তিকে অপ্রমাণিত করতে হয়েছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। লক্ষ্মীবাবু নানা জায়গায় ঘুরে নানা গুণীর কাছ থেকে অজস্র 'চীজ' সংগ্রহ করেছেন, অথচ এই গ্রন্থে তার কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। আমরা জানি কোনও সংগীত গ্রন্থ তার ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না—'গীত-বাদ্যম্' এক্ষেত্রে আমাদের আশা পূরণ করে নি। আশা করি লক্ষ্মীবাবু ভবিষ্যতে এই অসম্পূর্ণতা দূর করবেন, এবং এই অনবদ্য কোষগ্রন্থ সদৃশ পুস্তকটির একটি ইংরেজি রূপান্তর প্রকাশ করে অন্য ভাষাভাষী সংগীত জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসা মেটাবেন।

কার্তিক লাহিড়ী

স্বাচ্ছন্দ্যের দর্শন

কবিতার জন্ম ও অন্যান্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্যাপিরাস। ১৯৭৯

ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন যে, 'এগুলি সবই আমার অতিশয় ব্যক্তিগত দৃষ্টি ও চিন্তার প্রতিফলন। জীবনের অন্যান্য অনেক কিছুর মতন সাহিত্য সম্পর্কেও আমি লঘুভাবে কথা বলা পছন্দ করি।' প্রায় সব রচনাতেই অবশ্য ঐ লঘুভাবে কথা বলার ব্যাপারটা বিদ্যমান, কারণ 'আমাদের দেশে সাহিত্য-আলোচনায় যে-একটা দাঁতে দাঁত চেপে অতি সীরিয়াস ভঙ্গি থাকে'—সেটা তাঁর খুবই অপছন্দ। তাই তিনি জানান, খুব লঘুভাবে অবশ্য,—মার্কসবাদের মূলতত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী, মার্কসকে তিনি শ্রদ্ধাও করেন। কিন্তু লেনিনকে তাঁর অপছন্দ—লেনিনের সাহিত্য-রুচি ছিল না। জানিয়েছেন, বঙ্কিমের সব উপন্যাস পড়ে তাঁর মনে হয়েছে 'যেন মানসচক্ষে তিনি হিন্দী সিনেমা নামক একটা জিনিসের কথা জানতে পেরে তারই কাহিনী বানিয়ে গেছেন।' আরও জানা যায় যে, তিনি তাঁর কবিতায় আমুল মাখনের খালি কৌটো দেখে এবং তারপরই পেচ্ছাপ করতে গিয়ে 'আমুল নশ্বর' কথাটা লিঙ্গ বোঝাতে লেখেন। —এইসব।

কিন্তু সর্বত্রই যে এই লঘুপদসঞ্চার এমন নয়—যেমন 'হে সমালোচক' রচনাটায় তাঁকে বেশ ক্ষিপ্ত দেখা গেল। কারণ বোধহয় এটা লেখা হয়েছে তাঁর রচনার বিরূপ সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায়। এখানে তিনি বাংলা সমালোচনার দুরবস্থা সম্পর্কে বেশ সিরিয়সলি রাগান্বিত, অসহিষ্ণু এবং ক্ষুব্ধ। বিশেষত মার্কসবাদী বলে যাঁরা আত্মবিজ্ঞাপন জাহির করেন তাঁরা এবং 'বামপন্থী সমালোচক' বলে পরিচিত সাহিত্য-সমালোচকগণ তাঁর ক্রোধের আক্রমণস্থল। কারণ? কারণ মার্কসবাদীরা 'অধিকাংশই ভণ্ড এবং মূর্খ'। আর যারা বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত তাদের 'প্রতি বোধহয় একটা লিখিত বা অলিখিত নির্দেশ আছে যে নিজেদের দলের বাইরে যে কোনো লেখককেই নস্যাৎ করতে হবে। লেখার মধ্যে কী আছে না আছে তার বিচার করার দরকার নেই; লেখক নিজের দলের কিনা এটাই আসল ব্যাপার।'

সুনীলবাবু অবশ্য তাঁর অভিযোগগুলো তথ্য-প্রমাণ সহযোগে হাজির করেন না, শুধুই ঘোষণা করেন। তবে কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় লেখকের প্রতিও কোনো অলিখিত বা লিখিত নির্দেশ?

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত একজন লেখকও 'প্রকৃত ভালো লেখা' লিখতে পারেন নি। 'প্রকৃত মার্কসবাদী' সমালোচক এ পর্যন্ত তিনি একজনও দেখেন নি। 'প্রকৃত' কী কী তিনি দেখেছেন তা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু জানা যায়, দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের লেখা তাঁর পছন্দ 'বেশ রসিয়ে রসিয়ে পড়া যেত' 'তাঁর কাছে গভীর সুরের কোনো কথা আশা করা যায় না' বলেই। সুরেশ সমাজপতি ও সজনীকান্তও তাঁর প্রিয়--সেও কি ঐ একই কারণেই? মার্কসবাদীদের মধ্যে অবশ্য তিনি দেখেন 'অক্ষমের ঈর্ষা', বামপন্থী দলের মধ্যে একজনও লেখক নেই এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। এমন সব অনেক কিছু উল্লেখ করেন, করে বলেন 'এসব উল্লেখ করতে আমার লজ্জা করে।' কারো সম্পর্কে বলেন 'ভণ্ড এবং মূর্খ', কারো সম্পর্কে বলেছেন 'বড় কাগজে অর্থাৎ তথাকথিত এসটাব্লিশমেন্টে লেখার চেষ্টা করে সুযোগ না পেয়ে হঠাৎ ঐগুলি শুরু করে দেয় প্রগতিবাদী সেজে কেউ কেউ'—লেখেন 'বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এখন ভাদ্রমাস, এই সময় কোকিল ডাকে না, কারণ এই সময় অন্য একটি প্রাণী বড় গোলমাল করে।'

কিন্তু তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গালাগালমন্দ, আক্রমণ, কুৎসিত ইঙ্গিত এসব পছন্দ করেন সমালোচনার নামে। তিনি তো লিখে দিয়েছেন 'ছাপার হরফে ব্যর্থ বিদ্রূপ, গালাগালমন্দ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ভেতরে ভেতরে কিছু পোড়ে। কারণ আমার গালমন্দ করার অভ্যেস নেই।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে একটি রচনা 'দেশ'-এ আরম্ভ করেছিলেন। সে-আলোচনার মতামতের প্রতিক্রিয়ায় 'পাঠকসমাজে তুমুল সোরগোল ওঠে, অসংখ্য পত্রদাতা অভিশাপ বর্ষণ করেন আমার উদ্দেশ্যে, পত্রিকাটির প্রতিও রাশি রাশি কটূক্তি ছুটে আসে জ্বলন্ত গোলার আকারে।' সর্বোপরি 'পত্রিকাটির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও একেবারেই পছন্দ করেন নি আমার মতামত।...সুতরাং আমার রচনাটির প্রকাশ মধ্যপথে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

'বঙ্কিমচন্দ্র' রচনাটিতে সুনীলবাবু যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে—বঙ্কিমের উপন্যাসের কাহিনীগুলোতে অবাস্তবতা আছে, অনাধুনিকতা আছে, তাঁর মতবাদপ্রবণতা শিল্পকে নষ্ট করেছে। বঙ্কিমের মতামতও সে-যুগের তুলনাতেও পশ্চাদমুখী—তৎকালীন প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের তিনি বিরোধিতা করেছেন, উপন্যাসগুলোতে সৌন্দর্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা

দেখালেও মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন করতে গিয়ে নানা বিভ্রম ঘটিয়েছেন। তবে 'দেশ'-এ ঠিক যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল, রচনাটা 'কৃত্তিবাস'-এ ঠিক সেভাবে শেষ হয় নি। যে-কোনো মনোযোগী পাঠকই লক্ষ করবেন যে, এ-রচনার প্রথম ও শেষাংশ ঠিক একই স্বরগ্রামে বাঁধা নয়। মনে হয়, কৃত্তিবাসের শেষাংশের ওপর কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার একটা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া খুবই এলোমেলো লেখা—'উপন্যাসের বিচার তার শিল্পরূপের বিচার' ন্যায্যতই একথা বলে ঠিক 'শিল্পরূপের বিচার' একটার ক্ষেত্রেও করলেন না—'কপালকুণ্ডলা'র বিষয়ে হয়তো অর্ধমনস্কভাবে করলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমকে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লেখক বললেন, কিন্তু শেষদিকে লেখক হিসাবে বঙ্কিম যে 'মহৎ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই' এ-রকম বললেন। 'সৌন্দর্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তিনি'—এটা সুনীলবাবু জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, আবার এ গ্রন্থের অন্যত্র তিনিই তো বলেছেন 'আমি সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য খুঁজি। বাকি জীবন তাই খুঁজে যাব।' তাহলে বঙ্কিমের ওপর খড়্গহস্ত হলেন কেন খামোখা? 'উপন্যাসের ব্যাপারটাই আলোচ্য' বললেন, কিন্তু দেখা গেল, ব্যক্তিগত জীবনে ইংরেজের চাকরি করা, সনাতনপন্থা, ধর্মের আফিম, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলনা, সাম্প্রদায়িকতা এসবও এসে গেছে। ঠিক বোঝা গেল না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে যে-স্ববিরোধিতা এবং যে-পশ্চাদমুখিনতার কথা তিনি উত্থাপন করেছেন, যার প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের শিল্পরূপ খণ্ডিত—বুদ্ধিজীবী হিসাবে শুধু বঙ্কিম কেন সে সময়ের অনেকের ভূমিকাই দ্বিধাগ্রস্ত—সে-সব প্রসঙ্গ নিয়ে, ক্লাসিকস সাহিত্যের পুনর্বিচারের জন্য যোগ্য গভীরতা ও নিবিষ্ট মনোযোগ নিয়ে এই 'পরিচয়' পত্রিকার পাতাতেই 'মার্কসবাদী বঙ্কিম বিচার' এই শিরোনামে দীর্ঘদিন আলোচনা চলেছিল। সেই রচনাগুলি খুঁজে পড়লে হয়তো প্রবন্ধটি রচনার দায় কিছু কমত।

নানা পশ্চাদমুখিনতা সত্ত্বেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে অর্থনৈতিক চিন্তার যে প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র রেখেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল আলোচনায়—সে তো বিস্ময়কর! কিংবা সমাজ-সংস্কারের যুক্তি হিসাবে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়ায় তিনিই তো আপত্তি করেন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে, অথচ 'ধর্মের ভোজ' উপন্যাসে বাড়িয়েই চলেন। সচেতনভাবে এদেশের সেকালের মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব বিষয়ে মননকে ব্যবহার করলেন অথচ উপন্যাসে

কেন চলে গেলেন সমকালীন জীবনকে এড়িয়ে অতীতে—সেসব প্রশ্নের মীমাংসায় পথসংক্ষেপ চলে না। সকলেই জানেন, উনিশ শতক খুব সহজবোধ্য নয়, এবং বঙ্কিমচন্দ্রও সেকালের দুরূহতম ব্যক্তিত্বের একজন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতা ও উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে যে সব কথা বলেন সেসব থেকে তাঁর এবং তাঁর সময়ের অন্যান্য কবি-ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়, যেমন 'সাহিত্যরীতি তৈরি করে তোলার বদলে সাহিত্যের কতকগুলি প্রচলিত অতি পুরনো রীতি ও সংস্কার ভাঙতে চেয়েছিলাম।' 'কবিতাকে আমরা জীবনের সঙ্গেই মিলিয়ে দিয়েছিলাম।' 'আমার কবিতা স্বীকারোক্তিমূলক'—আবার কখনও কখনও এ প্রশ্নও তাঁকে ভাবিয়েছে 'এই যে আমার নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি লিখে যাচ্ছি, অন্য কারোর কাছে কি এর কোনো মূল্য আছে?'

কয়েকবছর আগে 'কবিতা-পরিচয়' নামক পত্রিকায় কবিতা-আলোচনার প্রশংসার্হ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। কবিতা কিভাবে পড়া উচিত, কবিতা কি ধরনের অভিনিবেশ দাবি করে তার আভাস ও শিক্ষা মিলত খানিকটা। তাছাড়া কবিরাই অনেক সময় আলোচক হওয়ায়, বিভিন্ন কবি অন্য কবিদের কবিতা কি ভাবে পড়েন তারও আকর্ষণীয় পরিচয় মিলত। একই কবিতার বহু তল ও মাত্রা উদ্ভাসিত হতো, ভিন্ন ভিন্ন রচনায়, মতান্তরে-মতৈক্যে। জীবনানন্দের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' প্রসঙ্গে সুনীলবাবুর আলোচনা এবং সে প্রসঙ্গে অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহের বক্তব্য, শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতা নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জনের মতান্তর—কবিতা-আলোচনার মৌল সমস্যার সামনে হাজির করে, সৎ কাব্যজিজ্ঞাসায় প্ররোচিত করে। এসব রচনা হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়, এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে দেখে কবিতা-পাঠকেরা খুশি হবেন। অবশ্য কোনো কোনো আলোচনায় এতই ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জানানো হচ্ছিল যে, আলোচনার অবজেকটিভ ভিত্তিই থাকছিল না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে অলোকরঞ্জন সে-অভিযোগই তুলেছিলেন। সুনীলবাবু উত্তরে বলেন যে, সেটা তিনি ন্যায্যতই, সচেতনভাবেই করেছেন।

সুনীলবাবুর তর্ক করার পদ্ধতি হচ্ছে, কিছু দুর্বল যুক্তি অনুল্লিখিত প্রতিপক্ষের মুখে বসিয়ে দিয়ে তাকে আক্রমণ করা। 'শুধু গরীবের জয়গান আর বড়লোকগুলোকে লম্পট আর খল দেখিয়ে একঘেয়ে রচনা লিখে গেলেই দেশের উপকার হবে এমন আমার কখনও মনে হয় না।' তেমন

মনে করতে তাঁকে কে বলল ?

আসলে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে কুরুচিসম্পন্ন, কুতার্কিক, শিল্পজ্ঞানহীন সমালোচকদের (যারা হয় মার্কসবাদী নয়, বামপন্থী) মাঝখানে অসহায় নিরীহ ভাব করেন, সেটা ভঙ্গিমাত্র। অকারণ গালমন্দ, যুক্তিহীন মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া, কাল্পনিক মনগড়া মার্কসবাদী-বামপন্থী-সমালোচক-লেখক বানিয়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া—এসবের চর্চায় তিনি বেশ দক্ষ। কাব্যতত্ত্ব গড়ে তুলছি না তুলছি না ভাব করে আলগোছে বলে যান কবিতায় চাই কল্পনার 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা', বাল্মীকিতেই নাকি সেই 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা'র সূত্রপাত। কবিরা নাকি সবাই এখন 'ভেতরের দিকে ফিরে এসেছেন'—ফলে তাদের বাহিররূপ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, অন্তরঙ্গ স্বাধীনতায় তাঁরা সব বিলীন। তাই সমালোচকদেরও নাকি ঐ 'ভেতরে' চলে যাওয়াই উচিত। বোঝাই যায়, এক বেলোয়ারি মায়ার খেলাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পতত্ত্ব, সমালোচনার পুরুষার্থ।

আশীষ মজুমদার

কবিতার নানা ফর্ম

বাংলা দীর্ঘ কবিতা। সম্পাদক দেবকুমার বসু। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। দাম তিরিশ টাকা

যে কোনো কারণেই হোক, বাংলা ভাষায় রচিত দীর্ঘ কবিতা খুব একটা জনপ্রিয় নয়। যদিও দীর্ঘ কবিতা লেখার ইতিহাস বা প্রবণতা আমাদের কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হয়ে কখনো দূরে দাঁড়িয়ে থাকে নি। প্রচুর ভালো ভালো দীর্ঘ কবিতা লেখা হয়েছে, এবং প্রত্যেক সময়ে প্রায় সব কবিই কম-বেশি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। কখনো-কখনো তা নিয়ে আলাদা একটা কাব্যগ্রন্থ হয়েছে, কখনো বা একটি কাব্যগ্রন্থের মূল কবিতা হিসেবে তা সংকলিত হয়েছে। মোট কথা, দীর্ঘ কবিতার প্রয়োজনে দীর্ঘ কবিতা লেখা না হয়ে, তা সাধারণভাবে কবিতা লেখার মতোই খুব নিস্তরঙ্গ একটা প্রবাহ—যা নিয়ে আলাদা কোনো শিল্পকর্ম করার কথা আমার জ্ঞানমতো খুবই কম কবি আজ অবধি করেছেন বলে

আমার বিশ্বাস। তবুও দীর্ঘ কবিতায় আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব আনতে পেরেছেন সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু কবি। যে কারণে আমার মতো এক অতি অমনোযোগী ও অলস পাঠকেরও কিশোর-স্মৃতিতে জলজল করছে গোলাম কুদ্দুসের তদানীন্তন বারো আনা দামের 'ইলা মিত্র' নামে চটি বইটি এবং 'ইলা মিত্র' কবিতাটি, খুব একটা অন্য কারণ না থাকলে সাম্প্রতিক-কালের ঐ সব দীর্ঘ কবিতা এবং সেই ব্যক্তিত্বমণ্ডিত প্রক্ষেপ আজকের অনেক পাঠকের মধ্যেও দীর্ঘদিন ধরে লালিত হওয়া সম্ভব।

স্পষ্টতই নিছক দীর্ঘ কবিতা গ্রহণ করার মধ্যে পাঠকের কিছু কিছু অসুবিধে আছে। যতক্ষণ না তাকে অন্য একটি মাধ্যমের আধারে, সামান্য কিছুক্ষণ হলেও, রেখে দেওয়া যায়। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি স্বীয় পঠনের মাধ্যমে যতটা না উত্তোলিত করে, তার চেয়ে অনেক বেশি বোধ করি, তা আবৃত্তিযোগ্য হয়ে ওঠায় এবং সুললিত কণ্ঠের সেই আবৃত্তি-শ্রবণে। 'ইলা মিত্র' বা 'মধুবংশীর গলি' কবিতার প্রতিটি শব্দ ও সেই স্বরক্ষেপণের মুন্সিয়ানা (শম্ভু মিত্র কৃত) আমাদের ধরে রাখাটাকে অনেক বেশি সাহায্য করে। দীর্ঘ কবিতায় সমস্তক্ষণের জন্য কবিতাটির মধ্যে একটা টানটান ভাব যদি না রাখা যায়, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে ক্লান্তিকর, বিষয়বস্তুহীন একটা জড়পিণ্ড, এবং পরিহারযোগ্য। এলিয়টি দীর্ঘ কবিতার স্বাদ, অথবা বিষ্ণু দে-র বিস্তার সাম্প্রতিক যুগে বিরল, এ সত্ত্বেও বলছি, দীর্ঘ কবিতার সাম্প্রতিকতম ধারাটি বেশির ভাগ চল্লিশ দশকের কবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং দু-একজন পঞ্চাশের কবির মধ্যে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু ও সিদ্ধেশ্বর সেন ঐ ধারার বর্তমানে প্রধানতম ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশ দশকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দীর্ঘ কবিতায় তাঁর ক্ষমতা (দ্র. 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে') দেখানো সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলনে তা সংকলিত করেন না এবং পঞ্চাশের কবিদের নানারকম সংকলন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ কবিতার কোনো সংকলন নেই। এই উদাহরণগুলোই দীর্ঘ কবিতা-চর্চার সমস্যা প্রকট করে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, এই সময়ে বাংলা দীর্ঘ কবিতার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশিত হওয়া খুব জরুরি ছিল। ছোট-বড় প্রায় সমস্ত কবির ব্যক্তিগত বন্ধু দেবকুমার বসু তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে 'বাংলা দীর্ঘ কবিতা' নামে একটি চিত্রিত সংকলন প্রকাশ করতে পেরেছেন প্রায় দুই শতাধিক পৃষ্ঠার, বলা বাহুল্য যার সম্পাদক দেবকুমার বসু নিজেই।

এই সংকলনটিতে মোট আটচল্লিশ জন কবির দীর্ঘ কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ছবির অলংকরণ, যেগুলো করেছেন গণেশ পাইন, চারু খান, পূর্ণেন্দু পত্রী, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, অসিত পালের মতো নামী শিল্পীরা। এক কথায় বইটার আঙ্গিক অতি উচ্চমানের হয়েছে এবং এটিকে ঐ দিক থেকে প্রায় বিরল একটি সংকলন বলা যেতে পারে অনায়াসে।

অথচ বইয়ের ভূমিকার শিরোনাম দেবকুমার বসু করেছেন এইভাবে—'আমি মনে করি এই সংকলনই শ্রেষ্ঠ।' এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এর মানে কি? এটাকে কী হিসেবে শ্রেষ্ঠ বলতে চাইছেন সম্পাদক? দীর্ঘ কবিতার সংকলন হিসেবে—না, কবিতার সংকলন হিসেবে! ভূমিকায় তিনি দীর্ঘ কবিতা বিষয়ে কোনো বিতর্কে যান নি। এমন কি, বাংলা দীর্ঘ কবিতার ভূগোল বা ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর কোনো মন্তব্য নেই; কিছু চিনিয়েই দেন নি! তিনি ঐ দু-পাতা-আড়াই পাতা দীর্ঘ ভূমিকায় শুধু কোন কবিকে রাখতে পেরেছেন, কাকে রাখতে পারেন নি, তা নিয়ে একটি সংশয়-সংকুল স্বগতোক্তি ফেঁদেছেন এবং পরে চট্ করে বলে ফেলেছেন, কোনো সম্পাদকেরই নাকি 'স' পর্যন্ত কাণ্ডজ্ঞান নেই! কিন্তু তাঁর আছে। ফলে এটি শ্রেষ্ঠ সংকলন। তাছাড়াও, মহিলা কবি নিয়ে একটা পুরো প্যারাগ্রাফ এমন লিখেছেন, যা এই একটি অভিনব সংকলনের ভূমিকার বিষয়বস্তু কিছুতেই হয়ে উঠতে পারে না। ভূমিকাটিকে সম্পাদক একটু পরিশীলিত করলে বোধ করি ভালো করতেন।

মোট আটচল্লিশ জন কবির দীর্ঘ কবিতা, ফলে এর মধ্যে কিছু ভালো কবিতা এবং কিছু খারাপ কবিতা মিলেমিশে থাকতে বাধ্য। তা আছেও। তবু বলা যায় বেশ কিছু ভালো কবির ভালো কবিতা আমরা এ সংকলনে পেয়েছি। অসংখ্য ভালো ভালো লাইন পেয়েছি নানা জায়গায়, বহু পুরনো কবিকে নতুন করে আবিষ্কারও করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে একদম অচেনা কিছু কবিরও কবিতা পড়লাম। সব মিলিয়ে সংকলনটি হয়তো ত্রুটিমুক্ত নয়। আবার নানা জায়গায় কিছু উজ্জ্বল দিক প্রকাশিত করতে হয়েছে, শেষ অবধি যার ফলে একটা তৃপ্তির আবেশই মনের মধ্যে থেকে যায়। কোনো কবিতারই উৎকর্ষগত মানকে খাটো না করে বলছি, এই সংকলনটির পরিবেশনে অনেকটা সাহায্য করেছে শিল্পীদের ছবিগুলো, যাতে সম্পাদকেরও চিন্তাধারার একটি সুরুচি প্রতিভাত

হয়েছে। আসলে কবিতাগুলোর সঙ্গে ছবিগুলো এমন একটা মেলবন্ধন এনে দিয়েছে, এতো সঠিক বা অনিবার্য ভাবে তা করা হয়েছে, যাতে করে, 'কবিতার জন্যেই ছবিগুলো', একথা কখনো মনে হয় না। বরং মনে হয়, লাইনগুলো যেন আপনি-আপনি এই ছবিগুলোর সঙ্গে বসে গেছে এবং স্থির হয়ে রয়েছে। যে কোনো পাঠকেরই এ অভিজ্ঞতা হবে, আমি নিশ্চিতভাবে তা বলতে পারি।

আগে যা বলেছি, দীর্ঘ কবিতা হয়তো অন্য একটা মাধ্যমের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল—এই আটচল্লিশটি কবিতার ওপর নজর করলে কতগুলো সূত্র মেলে। যেমন, দীর্ঘ কবিতা লেখার একটা প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে বোধহয় 'ভ্রমণ'। ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা, ভ্রমণের আলাদা মুগ্ধবোধ একটা দীর্ঘ কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা সহজেই কবিকে দিয়ে দিতে পারে। সেটা ঠিক ভ্রমণ-কাহিনী নয়, অথচ ভ্রমণের মধ্যে কবির দর্শনতত্ত্ব, কবির দেশাত্মবোধ, কখনো-কখনো তাঁর অনেক না-জানা বক্তব্যও নিছক গদ্য-সীমানা ছাড়িয়ে অন্য আর একটা ফর্মে অবয়ব ধারণ করতে পারে এবং তা সঠিকভাবে দীর্ঘ কবিতাতেই। আলোচ্য বইটির মধ্যে এরকম অনেক কবিতার উদাহরণ মিলেছে।

যেমন, 'ভূ-পর্যটক' / তারাপদ রায় (পৃ ৩৫); 'যাওয়া আসা' / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (পৃ ৮৮); 'যমুনায় চিতাভস্ম' / অর্ধেন্দু চক্রবর্তী (পৃ ১৬১); 'ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে' / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (পৃ ১৭৩); 'তুলকীর বাঁধে' / শান্তনু দাস (পৃ ১৮৬)।

কবিতার মান হিসেবে হয়তো এই কবিতাগুলি সম-পর্যায়ের নয়। যেমন, তারাপদ রায় ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা খুব বেশিরকম সাংবাদিকতার দোষে দুষ্ট; যেমন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও শান্তনু দাসের কবিতা বড় বেশি ব্যক্তিগত ম্যানারিজমে আক্রান্ত; তাহলেও দীর্ঘ কবিতা-গঠনে অথবা দীর্ঘ কবিতার সমারোহ আনার মধ্যে উপরোক্ত কবিতাগুলো অনেকখানি সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে।

১. আসলে এই মুহূর্তে ভূ-পর্যটক জানেন না,
নিজের কাছে ঠিক কতখানি রইলো। (তারাপদ রায়, পৃ ৩৮)

২. যে দেশে একশো মাইল অর্থই হলো বদলে যাওয়া
ভাষা, খাদ্য, এমনকি যৌন অভ্যাস (সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ ৯০)

৩. এলাহাবাদ জংশনে নির্বেদ দুপুর, দুর্গ ঘেঁষে ত্রিবেণী সংগম

বুড়ির হাতের নিচে পেয়ারার পাকা ঝুড়ি
পারাপার উলঙ্গতা নিসর্গের অঙ্কুরে ও নীলে। (অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, পৃ ১৬২)

৪. এখন প্রান্তর যেন পাড়ভাঙ্গা সমুদ্রের মতো। (শান্তনু দাস, পৃ ১৮৭)

ভ্রমণজনিত সার্থক দীর্ঘ কবিতা আমরা একমাত্র পেলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাটিতে। সেখানে বিষয়বস্তু ছাড়িয়েও কবিতার মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন কবি, কবিতাটির শুরুই হয়েছে এ লাইনটা দিয়ে, 'ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম'।

দীর্ঘ কবিতার আর একটি প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে, স্মৃতি। ঠিক স্মৃতি বললে ভুল হবে। এমন একটা স্মৃতি, যা দীর্ঘদিন ধরে লালিত হয়েছে এবং যা কবির ব্যক্তিগত চেতনায় জারিত হয়ে অমোঘ, অনিবার্য এবং অপরের গ্রহণযোগ্য একটি যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে। কবির ঐ চেতনা নানা রকমের হতে পারে। কখনো তা ব্যক্তিগত জীবনবোধ, কখনো জাতিগত, সমষ্টিগত, কখনো বা রাজনৈতিক। এই সংকলনে ঐরকম ধারার কবিতা চার-পাঁচটি আছে, যা এখানে উল্লেখযোগ্য। যেমন, 'সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার' / শক্তি চট্টোপাধ্যায় (পৃ ১) ; 'উষা এবং পনিগণ' / রত্নেশ্বর হাজরা (পৃ ১২) ; 'কাকে বলে নৈশাহার, কাকে বলে প্রেম' / অমিতাভ দাশগুপ্ত (পৃ ১৮) ; 'ভাবনা' / রাম বসু (পৃ ৫৬) ; 'পল এলুয়ার'/ পূর্ণেন্দু পত্রী (পৃ ২১৩)।

দিনগুলো সেই স্মৃতির ঘোড়ায় ছুটছিলো আর ছুটছিলো না
কখন কোথায় থামছিলো তার নিজের ঘোরে
থামছিলো আজ মাঝ-সড়কে, কাল থেমেছে গাছের নিচে
আগামী কাল থামবে, নাকি থামবে না—তা তার অজানা।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১)

একই আলোকিত অশ্ব ধাবমান সাতটি বিভিন্ন নামে ওই
অশ্বরাও আমাদের চেনা। (রত্নেশ্বর হাজরা, পৃ ১৩)
পাহাড়তলিতে কিংবা রবিশস্য জনারে শোভিত কোনো গ্রামে
পা দিয়ে স্বর্গকে পাবো
এরকম রাখিনি প্রত্যাশা (অমিতাভ দাশগুপ্ত, পৃ ২০)

ঠিক যেন ঝাউপুকুরের ধারে রাজনগরের কামারশালার
তিরিশ বছর আগের আগের শব্দ
কে জানত জোড়া অশ্বত্থতলার ছায়া, জলপাই পাতা ইছামতী হয়ে
দুলবে রক্তে,

(রাম বসু, পৃ ৫৭)

কাল সারা রাত এইভাবে ভোর হয়ে গেলো তোমার সঙ্গে।
উৎপীড়ন এবং উজ্জীবনের মাঝামাঝি
প্রচণ্ড প্রেম এবং প্রবল ঘৃণার মাঝামাঝি
দূর নেপথ্যে এবং নিকটবর্তী প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি
সজ্জিত মঞ্চের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমশ উপরে ওঠা।

(পূর্ণেন্দু পত্রী, পৃ ২১৫)

দীর্ঘ কবিতা লেখার আরো নানারকম সূত্র হয়তো আছে। কিন্তু কবিতা হচ্ছে এমন একটি শিল্পের কথা, যা শুধু বিষয়বস্তু-নির্ভর হয়ে পড়লে সর্বনাশ। তা আর কবিতা হল না। কবিতা হয়ে ওঠার ব্যাপার; শুধু আকারে দীর্ঘ হলে আমরা তাকে দীর্ঘ কবিতা বলতে পারব না; একমাত্র শর্তই হচ্ছে, সাদা কাগজের ওপর লেখাটি কবিতা হয়ে উঠতে হবে। এই পরম সূত্রটি মানার সপক্ষে আমি এমন একজন কবি এবং তাঁর দীর্ঘ কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, যাঁকে কোনোরকম সূত্রের মধ্যে এনে, তাঁর কবিতা বোঝানো একেবারেই অসম্ভব। তিনি হচ্ছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর যে কবিতাটির কথা আমি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করব, তা হচ্ছে 'কাল মধুমাস'। এখানে বলে রাখি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্য একটি কবিতা ('দেয়ালচিত্র : ৪৭ বাই ৭৯') এই সংকলনে রাখা হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি এটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো দীর্ঘ কবিতা নয়। জানি না, সম্পাদক নিজে এটি নির্বাচিত করেছেন, না কবির এটি নিজস্ব নির্বাচন! 'কাল মধুমাস' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম প্রধান কবিতা। এমনই এই কবিতায় তত্ত্ব আছে, অথচ অগম্ভীর। আলংকারিক অথচ সাদামাটা, রাজনৈতিক অথচ বিস্ময়কর। এতে দেশ বিভাগের কথা আছে অথচ এ সম্পর্কে নেই কোনো অসামর্থ্যের কথা। এতে জননীর কথা আছে, তা দেশজননী; এতে প্রেমের কথা আছে, যে প্রেম নির্দিষ্ট নয় ব্যক্তিতে—এবং শেষ পর্যন্ত যা রহস্যময়, রহস্যময়ই হয়ে থাকে।

তবু যখন আমরা দেখি, দীর্ঘ কবিতাকে একটি আলাদা আর্টের ফর্ম হিসেবে ধরে সাম্প্রতিক একজন অন্তত কবি দীর্ঘদিন ধরে সেই ফর্মের মধ্য দিয়ে নিজস্ব একটি আলাদা ব্যক্তিত্ব ক্রমশ আমাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারছেন, তখন দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় নিষ্ক্রিয়তা, যাবতীয় আলস্যবোধ, হয়তো মুহূর্তের মধ্যে উবে যেতে পারে। শুধুমাত্র দীর্ঘ কবিতার মানসিকতা সম্প্রতি ঐ একজন যে কবির মধ্যে অহরহ কাজ করে, তিনি সিদ্ধেশ্বর সেন। সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রায় সব কবিতাই দীর্ঘ কবিতার ফর্মে লেখা। কবিতা ছোট কি বড় সেটা প্রশ্ন নয়। এবং বলা যেতে পারে, শুরু থেকে এই ফর্ম নিয়েই তিনি কাব্যচর্চা করে যাচ্ছেন। ফলে সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার মধ্যে সবসময়ই একটা অভিযান কাজ করে, একটি যাত্রা, হয়তো বিমূর্তের দিকে যাত্রা (হয়তো বা তা নয়-ও), যা তাঁর প্রতিটি কবিতায় প্রায় নির্ভুলভাবে আছে। শুধুমাত্র আলোচ্য সংকলনের কবিতাটি ('তুমিই নওবা কেন' / সিদ্ধেশ্বর সেন. পৃ ১৮২) উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা, সেই হিসেবে নিরর্থক।

বাংলাদেশের তিনজন কবি, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ ও বেলাল চৌধুরীর কবিতা এখানে আছে, যা তাঁদের সুনামের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি রক্ষা করেছে বলা যায় ঐ দীর্ঘ কবিতাগুলোর ভেতরে। এ ছাড়া, কয়েকজন তরুণতম কবির কবিতাও তাৎক্ষণিকভাবে চোখে পড়ল। যেমন, অশোককুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্যামল পুরকায়স্থ, মতি মুখোপাধ্যায় বা আনন্দ ঘোষ হাজরা। তবে তরুণ বা তরুণতম কবিদের দীর্ঘ কবিতা সম্বন্ধে সেই কবিকে অনেকদিন লক্ষ করার পরেই শুধুমাত্র মন্তব্য করা উচিত। কেননা দীর্ঘ কবিতার একটা বড় গুণ হচ্ছে অভিজ্ঞতা, মননশীলতা এবং বাচনভঙ্গি। কিছুটা স্থির না হতে পারলে (দীর্ঘ প্রয়াসের পরে যা হয়তো সম্ভব) যথার্থ দীর্ঘ কবিতার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, এই সংকলনটিকে একটা প্রামাণ্য সংকলন হিসেবে ধরতে গেলে, মণীন্দ্র রায় প্রমুখ বহু প্রতিনিধিমূলক কবি ও তাঁদের কবিতা বাদ থেকে গেছে। অবশ্য সম্পাদক ও প্রকাশক দেবকুমার বসু তাঁর ভূমিকাতেই সেরকম আভাস আমাদের দিয়ে রেখেছেন। তবু সম্পাদক হিসেবে অন্তত কয়েকজনের কবিতা না রাখার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না কিছুতেই।

বইটার দামও বড় বেশি ; তিরিশ টাকা। সাধারণ-আয়সম্পন্ন পাঠকের

ক্রয়ক্ষমতার বেশ অনেকখানি বাইরে। তবু এরকম একটি অভিনব সংকলন প্রকাশ ও সম্পাদনার জন্য শ্রীযুক্ত বসু ধন্যবাদার্হ হবেন।

মানিক চক্রবর্তী

সমাজদৃষ্টি : লেখকদৃষ্টি

বাবলুর জন্মদিন ও অন্যান্য গল্প। কালিদাস রক্ষিত। অগ্রণী বুক ক্লাব, আট টাকা

এ বইতে চোদ্দটি গল্প ও লেখকের একটি বেশ বড় ভূমিকা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বেশ স্পষ্টই লিখেছিলেন গল্প-উপন্যাসের ভূমিকা লিখতে তিনি চান না কারণ তাতে লেখার কাজটি ভূমিকায় সারার চেষ্টা হয়। কিন্তু এমন ভূমিকায় অনেক সময় লাভও জুটে যায়। বর্তমান বই-এর লেখাটিতে তেমন কিছু লাভ জুটল না বলে মনে হল—এর জায়গায় আর-একটি গল্পই মানাতো ভালো।

সাহিত্যের আলোচনায় সমাজ-সচেতন ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনেক সময় কোনো অর্থ বহন করে না। কালিদাস রক্ষিতের বেলায় তা নয়। তিনি তাঁর সব গল্পগুলোই স্থাপন করেছেন সমাজের কার্য-কারণক্রিয়ায়। বা, সেই কার্য-কারণক্রিয়া থেকেই তাঁর গল্পগুলি উঠে আসে। আর গল্পগুলির শিল্প-মূল্যও সেখান থেকেই অর্জিত হয়। যদি কোনো ব্যর্থতা থাকে তাও বোধহয় ব্যক্তিজীবনের রহস্যময়তার প্রতি লেখকের আপাত অন্যমনস্কতায়। কিন্তু গল্পে যা নেই তা নিয়ে অভিযোগ না করে, যা আছে সেটাই দেখা যাক।

প্রথম দুটি গল্প 'বেকার' ও 'মাটির স্বাদ' মূলত বেকারত্ব নিয়ে। লেখকের সংকলন-অন্তর্গত প্রথম গল্পটি সমসাময়িক পরিস্থিতিতে (গল্পের নীচে সাল দেওয়া আছে) একটা মুডকে ধরার চেষ্টা। এবং তাকে ঘিরে কিছু জটিলতা। চাকরি-দেওয়ার নামে ধোঁকাবাজি। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাবলা। ফলত মার খায় নিজের দলের লোকজনের কাছে। এক ঝলকে আস্থা ফেরে বাবলার একদা বিরোধী শিবিরের রবিদার প্রতি। লেখক সতর্কভাবে বলতে চেয়েছেন—সেটা আয়নার মতো বিম্বিত। 'মাটির স্বাদ' গল্পে চাষি বাড়ির ছেলে লেখাপড়া শিখে বেকার। এম. এল. এ-র চামচার ধোঁকায় পাক খায়। জোতদার কৃষক-বাবাকে চাষ থেকে উচ্ছেদ করছে, সি. আর. পি—এই নিয়ে গল্প। তবে গল্পের

মধ্যে কিছু সামাজিক বিশ্লেষণ আছে—সেটা চরিত্রের অন্তরীণ ভাবনার সঙ্গে আরও ভালো করে মিশিয়ে দিলে স্বাদ হতো। 'ভাত' গল্পটির কাঠামোয় শক্ত দড়াদড়ির বাঁধন। ভাত বস্তুটি দানা বেঁধেছে গল্পের গোটা শরীর জুড়ে। মিটিং-মিছিলে গেলে তবে ভাত জুটবে, রিলিফ মিলবে। ভাত মিলেছিল রক্ত ঝরিয়ে মিনিস্টারের গেস্ট হাউসে। বিনিময়ে দিতে হয়েছে সি. আর. পি-র পেটাই-খেদাইয়ের সময় কোলের সন্তান। লেখক মর্মান্তিক ভাবে চিত্রিত করেছেন। জওহরলালের বাণী 'কোট' করে গল্প শুরু। চরিত্র জীবন্ত হয়ে রূঢ় ভাবে বাণীর মর্ম নস্যাৎ করে দিয়েছে। প্রথমে বেখাপ্পা লাগলেও মাননসই মতো শেষ করেছেন লেখক। 'সূর্যমুখী', 'পটভূমি' গল্প দুটির মধ্যে 'সূর্যমুখী' গল্পটিতে। 'বিপ্লব সম্পর্কে দাদার ধারণা খুব ছোট আর খারাপ হয়ে যাবে' এই মর্মার্থটুকু রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা এক ব্যর্থ উগ্র বিপ্লবীর। বউদি গোপনে বিপ্লবীর সেবিকা। অনেক টানা-পোড়েনে জটিল। এটি একটি প্রশংসনীয় গল্প। তবে মাঝখানে প্রয়োজনে ফ্ল্যাশ-ব্যাকের গিঁট কোথাও কোথাও আলগা বলে মনে হয়। 'পটভূমি' গল্পটি নিবিড় যত্ন এবং দক্ষতায় লেখা। নিখুঁত জ্যোৎস্নায় বিচ্ছিন্নতা-তাড়িত তিন বন্ধু নিজেদের সম্পূর্ণ খুলে মেলে মৌলিক প্রশ্ন রেখেছেন শেষাংশে। বিচ্ছিন্নতার নির্বাসন পীড়ন থেকে মুক্তির উপায় বাতলেছেন অধ্যাপক বন্ধু অমলেন্দু সমষ্টিগত পরিপূর্ণতার প্রচেষ্টার মধ্যে। লেখাটি সচেতন পাঠককে নাড়া দেবে। 'বাবলুর জন্মদিন' গল্পটিতে বাবলু যে এখন নেই, মানে কারারুদ্ধ, তার জন্মদিন সেলিব্রেট করতে ছোটবেলার ছবির সামনে বসে মা তার সহ্য-শক্তি, বোন তার উজ্জ্বল এবং গভীর হাসি, বাবা তাঁর সাহস দান করলেন। এইভাবেই গড়ে উঠেছে গল্পটি। টুকরো টুকরো নির্মাণ। ঝলকানি নেই, বরং দীর্ঘস্থায়ী আলো আছে। তবে গল্পটির মূল ঘটনা জন্মদিন পালন, সেখানে আসতে লেখক একটু বেশি সময় নিয়েছেন মনে হয়।

জীবন সরকারের গল্প। বাংলা ছোটগল্প প্রকাশনী, ১৮ পদ্মপুকুর, কলিকাতা-২০। দুই টাকা

জীবন সরকারের গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। জীবন সরকার পরিচিত নাম। তাঁর আটখানা গল্প এক সঙ্গে ছোটগল্প গ্রন্থমালা সিরিজে প্রকাশিত। একটানা পড়ে মনে হয়েছে জীবন সরকার নিম্নবিত্ত মানুষ ও

তাদের জীবনযাপন নিয়ে গল্প লেখেন। চরিত্রগুলি আমাদের আশেপাশে মুখোমুখি ঘুরে বেড়ায়। তবে বিশ্লেষণে কিছুটা অপূর্ণতা আছে। অনেক সময় শিল্পরহস্য আগাম ফাঁস হয়ে গেছে। আন্তরিকতায় ও সততায় লেখা গল্পগুলি এক নিঃশ্বাসে পড়ে নেওয়া যায়।

সংকলনের প্রথম গল্প 'জলের মধ্যে'। আমাদের শোনা কিংবা অনেকের দেখা জলঢাকা নদী ও তার আশপাশ ঘিরে ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিত গল্পটায় উঠে আসে। 'ভাঙন' গল্পটিতে জীবনযাপনের সব দিক থেকে ভাঙন ফুটে উঠেছে গল্পের স্তরে স্তরে। ওপার বাংলা থেকে চলে আসা যোগেশ শাঁখারি এক ছিন্নমূল মানুষ। তার দেখা ও উপলব্ধিতে গল্পটির গাঁথনি। 'নয়ামিছিল' গল্পে নড়বড়ে পুরনোকে ভেঙেচুরে যথাযথ নতুন কিছু হল এবং সেই নতুন পথে মানুষের যে সমবেত যাত্রা তার অগ্রগামী ভবিষ্যৎ প্রসবাসন্ন স্ত্রীর সন্তান। তার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জটেশ্বর হাসপাতালের দিকে। 'নিজের আয়না' গল্পে কিছুটা সচেতন গল্পকারকে দেখতে পাওয়া যায়। সেলুনে ক্ষৌরকার হরকুমার নিজের বৃত্তিগত বিশ্লেষণে ব্যস্ত। পরক্ষণে আত্মগত বিশ্লেষণ। গল্পটি তুলনায় অনেক নির্মেদ। 'নিহত গোলাপ' গল্পটিতে একই বক্তব্য বারবার পাক খেয়েছে। কিছু মানসিক ব্যবচ্ছেদ যা নাকি রহস্যঘন হতে পারত খোসা ছাড়িয়ে কেমন উলঙ্গ করে ফেলেছেন লেখক। 'পরবাস' গল্পে এপার বাংলা ওপার বাংলাকে বিষয় করে একটা করুণ সুর কানে বাজে। ভিসা-পাসপোর্ট নিয়ে মাকে দেখতে যাওয়া এবং ফেলে আসা ঘরবাড়ি ঘিরে স্মৃতি, নাড়ীর টান ইত্যাদি চিত্রিত। লেখক বেশি বলাটা সামলাতে পারেন নি। একটি ভালো গল্প হতে গিয়ে খুঁত রয়ে গেছে। এরপরের গল্প 'গ্রহণ'। 'আলোর মৃত্যু' গল্পটি সংকলিত কয়েকটি গল্পের তুলনায় ভিন্ন ফর্মের। ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে কিছু দিতে অপারগ মায়ের অসহায় আর্তি। অন্ধকারের কাছে আকুল প্রার্থনা, আলো এসে একবার অন্তত সন্তানের মুখ দেখতে দিক। আলো আসে না। এখন চারদিক অন্ধকার।

যখন প্রকাশক পাওয়া কঠিন, সেই মুহূর্তে বাংলা ছোটগল্প প্রকাশনীর এমন উদ্যোগ নিঃসংশয়ে তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেবে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাসে নতুন কল্পনা

শিলায় শিলায় আগুন। রিজিয়া রহমান। মুক্তধারা, ঢাকা। বারো টাকা

ব্রিটিশ শাসনে পাকিস্তান সহ অবিভক্ত ভারত ইংরাজের করতলগত হলেও, বেলুচিস্তানের ব্রোহী, পাঠান, বালুচ সম্প্রদায়ের 'নোম্যাড' মানুষরা ইংরাজ হুকুমতকে মেনে নেয় নি—এমনই এরা দুর্ধর্ষ স্বাধীনতাপ্রিয়। দেশভাগের পর বেলুচিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। কিন্তু তখনও তারা ইসলামাবাদের হুকুমতকে মেনে না-নিয়ে খান-ই-আজমকেই বেলুচিস্তানের বৈধ প্রশাসক বলে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৫৮ সালে কালাতের যুদ্ধে পাকিস্তান সমরবাহিনীর বিরুদ্ধে খান-ই-আজম ইয়ার খান পরাজিত হন। পাকিস্তান প্রশাসনের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান, তারই পটভূমিতে রিজিয়া রহমানের এই উপন্যাসটি রচিত।

বেলুচিস্তানের ছোট একটি শহর বুলান। এখানকার সুবিধাভোগী শ্রেণী হল সিন্ধি আর পাঞ্জাবি। বড় বড় ব্যবসাপত্তর এদেরই কব্জায়, যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা এদের সন্তানরাই ভোগ করে। এদের বিবেচনায় ব্রোহী, পাঠান ও বালুচিরা হল 'কমজাত মূর্খ জংলী'।

রিজিয়া রহমানের উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র হল লালু, যার বয়স উনিশ-পঁচিশ-তিরিশ অথবা কত বোঝার উপায় নেই, যার নিয়মিত রাত্রিযাপন ঘোড়ার আস্তাবলে, যাকে সারা বছর অভিজাত পাঞ্জাবি সিন্ধি আর বহিরাগত টুরিস্টদের ঘরে জল বয়ে দিয়ে জীবিকার্জন করতে হয়, সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা-মহলে যার সচ্ছন্দ যাতায়াত—যেহেতু অন্তঃপুরের নকরানি-চাকরানিরা তাকে মরদ বলেই মনে করে না, যাকে খবরের কাগজ থেকে কাটা মেয়ের ছবি দেখিয়ে সহজে বোকা বানানো যায়, 'এই যে তোর দুলহানের ছবি, এর সঙ্গেই তোর শাদির কথাবার্তা চলছে'—আর লালু সারাক্ষণ সেই ছবি পকেটে রেখে ভাবী দুলহানের চিন্তায় মশগুল থাকে। এমনই এক অদ্ভুত 'পাগলা ছাটের, বোকা সাধাসিধে' চরিত্র লালু, যাকে নিয়ে রিজিয়া রহমানের উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তি। এর মাঝে এসেছে নানা চরিত্র—বিধবা বুড়ি, লোম্মা জারো, যাঁর স্বামী ব্রিটিশ হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে শহিদ হয়েছেন, যাঁর পুত্র জান মহম্মদ গোলামির জিঞ্জির উপেক্ষা করে রাইফেল কাঁধে ফেরার। এসেছে জান মহম্মদের বাগদত্তা মাহবুবা, যার 'বেলাশেষের রৌদ্রের মতো বিদায়ী অভিবাদনে পিছিয়ে পড়ছে যৌবন', তবু যার অবিচল ত্যাগ, প্রেম ও বিশ্বাস, একদিন তার প্রেমিক 'বুটের সগর্ব ধ্বনি তুলে এসে

সামনে দাঁড়িয়ে মাহবুবার হস্তচুম্বন করে বলবে—জানে মন। আমি এসেছি।' এসেছে বাবু সুমার—মুখে যার দীর্ঘ সাদা দাড়ি, পরনে আলখাল্লা, আর 'আশির কাছাকাছি বয়স', তবু তমাম বেলুচিস্তানই যার বাড়ি ঘর—এমন এক ভবঘুরে দরবেশ বাবু সুমারের হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব হয় বুলান শহরে। বাবু সুমার বেলুচিস্তানের ইতিহাস-ভূগোল বিধৃত নানা কাহিনী শোনায়, আর রুবাবের তারে টুং-টাং শব্দ তুলে গান গায়, 'সম্পদ প্রাচুর্য / বাগিচার আনন্দে / আমার মোহ নেই। / আমি চাই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা··'

ইত্যাদি যে আনুষঙ্গিক চরিত্র, যদিও প্রত্যেকটি বেলুচিস্তানের সমাজ-সংস্কৃতির ভাবধারায় রূপায়িত, তবু এগুলো পাঠকের মনে একেবারে আনকোরা ছাপ ফেলে না। যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন বিষয়ক আখ্যানেই তো লোম্মা জারোর মতো মায়েরা থাকেন, যাঁরা কী এক আশ্চর্য ক্ষমতায় স্ত্রীর প্রেম, মাতৃত্বের স্নেহ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ হয়ে বেঁচে থাকেন। জান মহম্মদ ও মাহবুবার প্রেম, যা ত্যাগ ও তিতিক্ষায় মহিমান্বিত, এবং যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা দুটি নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা-আস্থার ওপর তো বটেই, পরন্তু সার্বজনীন এক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এমন চরিত্রও তো আমাদের অজানা নয়। বাবু সুমারের মতো চারণদল, যাঁরা দেশ-মাটি-মানুষের গান গেয়ে গণ-মনে জাতীয় চেতনার বীজ বোনেন, এমন মানুষের সঙ্গেও আমরা পরিচিত। তবে এইসব আনুষঙ্গিক চরিত্র, কাহিনীতে বিবৃত ঘটনায় বিশিষ্ট ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, লালুর মতো সাধারণ চরিত্রের কেন্দ্রিকতায় বেশ ঔপন্যাসিক তাৎপর্য পেয়ে যায়। পাঠান রমণী মাহবুবা, সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরনায় লালিত হয়েও স্বজাতির প্রতি তার প্রেম, জান মহম্মদের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদির বর্ণনায় বেশ নতুনত্ব আছে।

উপন্যাসের শেষ পর্বে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর সেনা বাহিনীর আক্রমণে পাখতুনরা পরাজিত হয়। সে খবর বুলান শহরে পৌঁছালে ব্রোহী, পাঠান বেলুচরা বিমর্ষ; পাঞ্জাবি সিন্ধিরা রাস্তায় নেমে পড়ে। পাঞ্জাবী যুবক আফজল, যার বাড়িতে লালু জল দেয়, যাকে স্বজাতির রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য ডামাডোলের দিনগুলোতে লালু জীবন তুচ্ছ করে দিনরাত পাহারা দিয়েছে, হঠাৎ সেই পাঞ্জাবি যুবক লালুর জাতকে বেইমান আখ্যায়িত করায়, লালু উদ্‌ভ্রান্তের মতো কুড়াল তুলে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে। বিচারে লালুর ফাঁসি হয়।

এভাবে লেখিকা যে সাদামাটা ছেলেটিকে সাক্ষী রেখে একটি জাতির জীবন, ইতিহাস, আকাঙ্ক্ষা বিবৃত করেন, সেই ছেলেটিই কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসে ইতিহাস হয়ে যায়। এখানেই কি লেখিকার কৃতিত্ব!

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে, আজকের তেহরান বা প্যালেস্টাইনের জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারের যে সংগ্রামে শামিল, এ উপন্যাস তো তাদের নিয়েও হতে পারত। শুধু নাম-স্থান-কাল পাল্টে দেওয়া। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সংগ্রামী জনগণের আকাঙ্ক্ষা, স্পন্দন, আবেগের ভাষা তো একই।

লেখিকা নদীমাতৃক বাঙলাদেশের জলবায়ুতে মানুষ হয়েও, মরুপার্বত্যময় বেলুচিস্তানের যে প্রাকৃতিক বর্ণনা উপস্থিত করেছেন, তা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রসঙ্গত, ১৯৫৮ সালে উক্ত ঘটনার সময় এবং দীর্ঘকাল তিনি বেলুচিস্তানেই ছিলেন।

তাঁর ইতিহাসবোধ ও কল্পনাশক্তিতে ঔপন্যাসিকের উপাদান নিঃসংশয়ে আছে। আমরা তাঁর কাছ থেকে এ-রকম আরো লেখার প্রত্যাশী।

কেশব দাশ

চারটি জাপানি 'নো' নাটক : সুরজিৎ বসু। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ পাঁচ টাকা

জাপানি সাহিত্য বিশেষ করে নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সামান্য। তুলনায় ইংরাজি, ফরাসী, রাশিয়ান প্রভৃতি ইয়োরোপীয় সাহিত্যে আমাদের অনেক বেশি আনাগোনা। অথচ আশ্চর্য, জাপান ও ভারত একই মহাদেশের দুই পৃথক ভূখণ্ড। নানাবিধ কারণ ছাড়াও প্রধানত দূর-প্রাচ্য বলেই বোধ হয় জাপান তার মহিমা ও গর্ব নিয়ে আমাদের কাছে খানিকটা ঢাকা পড়ে আছে। সুতরাং সে ঢাকনা সরিয়ে দিয়ে যদি কেউ এই দু-দেশের দূরত্ব ঘুচিয়ে প্রীতির মেলবন্ধনে কাছাকাছি পাশাপাশি নিয়ে আসতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

'নো' জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত নাটক। যুগোত্তীর্ণ কালজয়ী নাট্যপ্রাণ। জাতির ভাঙাগড়া, ওঠানামার মধ্য দিয়ে 'নো' বদলেছে। নতুন নতুন ভাবধারা নিয়ে এগিয়েছে সমসাময়িক জাতীয় চেতনাকে রূপ দিতে।

এর ক্ল্যাসিকী মেজাজ, চিরন্তন মানবিক বিশ্বাস ও আবেদনের মূল ধারাটি অপরিবর্তিত রেখে শুধু আধার বদলেছে মাত্র। সেদিক থেকে এই চারটি জাপানি 'নো' নাটকই আধুনিক। নতুন যুগচেতনায় বিধৃত নিষ্কলুষ ধারক। কিন্তু বিস্ময় এখানেই, প্রাচীন দর্শনকেও নস্যাৎ করে দেয় নি। বরং সর্বাধুনিক পটভূমিকায় 'নো'-কে চিত্তগ্রাহী ও রসোত্তীর্ণ করতে নবসাজে সজ্জিত করে নেয়া হয়েছে।

লেখকের ভূমিকা থেকে জানছি, 'নো' হচ্ছে নাচ-গান-বাজনা সহযোগে অভিনীত জাপানের এক ধরনের প্রাচীন মঞ্চ-শিল্প। কিন্তু এই চারটি 'নো' নাটকে 'নাচ-গান বাজনা' প্রায় সবই অনুপস্থিত। নিতান্তই দার্শনিক তত্ত্ব সংবলিত গাম্ভিক ব্যাপার। 'ইংরেজী ভাষানুসরণে রচিত বাংলা নাটকেও আমরা…স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি'—লেখকের এই বক্তব্যের মধ্যেই তার জবাব রয়েছে অনুমান করি।

হৈমন্তী, কামরূপা, শিখরিণী ও ইরাবতী মোট এই চারটি একাঙ্ক নাটিকা রয়েছে। বাংলা নাট্য-মঞ্চে এ-ধরনের 'ভাবানুসরণ'-এর অভাব নেই। বরং, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি, জাপানি নাট্য-সাহিত্য থেকে বাংলা দেশের নাট্য-চিন্তায় 'নো'-এর ভাবধারা বইয়ে দেবার ঘটনাটি বিরল এবং সম্ভবত এই প্রথম। এ নাটকগুলো বাংলা নাট্য-মঞ্চে অভিনীত হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত। বিদেশি মঞ্চরীতি এদেশের মঞ্চে প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যারা ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে এ-অভিনব প্রয়াসটিও সাদরে গৃহীত হবে।

চারটি নাটকই বাঙালি পরিবেশে মানানসই। বাংলা নাটক বলে গ্রহণ করে নিতে অসুবিধা হয় না। এখানেই লেখকের প্রধান কৃতিত্ব। ভিন্ন চারটি পরিবেশে বিভিন্ন চরিত্রের সাহায্যে নাটকগুলো বাঙালি মেজাজে অনায়াসে বরণীয় হয়ে উঠতে পারবে। সবকটি নাটকেই প্রধান চরিত্র নারী। বাসবী (হৈমন্তী), শোভা (কামরূপা), সুতনুকা (শিখরিণী) ও বুড়ি (ইরাবতী) একই নারীর যেন চার ভিন্নরূপ। নাম-ভূমিকায় হৈমন্তী একটু আলাদা ধরনের। প্রেমে পাগল হয়েও প্রেমিকের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্লাতোনিক লাভেরই শিকার হতে বাধ্য হয়। শুধু অপেক্ষা করেই জীবন কাটাতে চায়। এ যদি নিছক পাগলামি হয় ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তা না হলে? অপর দিকে বিনয়কে পেয়ে শোভার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়। 'ঝর্ণাধারার মতো নিজের

প্রেমকে বইয়ে নিয়ে যেতে চায় একজন পুরুষের মধ্যে। কামরূপের জাদু-বালিশ বিনয়কে এগিয়ে দেয়। বিনয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শোভার স্বামীর মতো আত্ম-বিস্মৃত হয় না। এই বিনয় সেই পুরুষ নির্বাচিত হয়। এখানে শোভা সুন্দর, অনেক মালিন্য কাটিয়ে উঠে সুন্দর। বয়সের অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও বিনয়েরই সামনে মনের গোপন দরজা একটির পর একটি খুলতে থাকে। একই সৌন্দর্যের ডালি হাতে নিয়ে সুতনুকা সুদর্শনের সামনে হাজির হতে গিয়েও বিফল। স্ত্রী শিখরিণীর সামনে সুদর্শনকে জয় করে নেবার মধ্যে যেন এক নিষ্ঠুরতারই ছবি ফুটে ওঠে। প্রায় নির্বাক শিখরিণীর হতাশায় রিক্ততায় দর্শকমন ভারি হয়ে ওঠে। সুতনুকার লোভী হাতকে ব্যভিচার বলে ভুল হওার সম্ভাবনা থাকে। বুড়ি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের বুড়ি। শাশ্বত প্রেমের প্রবহমাণ ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছে নিজস্ব জরা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও। বুড়ি 'লাখ লাখ যুগে হিয়া হিয়া রাখনু'-এর মতোই এক অনাস্বাদিত কল্পলোকের মাধুর্য প্রেমের জয়গানে দর্শককে মুগ্ধ করে।

একমাত্র বিনয় (কামরূপা) ছাড়া সব কটি নাটকে পুরুষ চরিত্র গৌণ বলে মনে হয়েছে। 'লোটাস-ইটারসে'র পুরুষদের মতোই ভাবুক ও উদাসী দার্শনিক বলে মনে হতে পারে। তুলনায় বিনয় নিজস্ব ব্যক্তিত্বে ও পৌরুষে মজবুত চরিত্র। আওনেস্কোর 'রাইনোসেরাসে'র নায়কের মতোই সমাজের বিষপান করে অন্যায়ের সঙ্গে রফা করে বাঁচতে চায় না। জাদু-বালিশের জাল ছিন্ন করে বাইরে এসে সূর্যালোকিত উঠোনে অজস্র ফুলের হাসি দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। তারই উক্তি, 'যা ভেবেছি, জীবন ঠিক তাই'—তারই চরিত্রের দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে।

বাইরের সৌন্দর্য তো সব নয়, বরং প্রকৃত মানবায় সৌন্দর্যের আড়ালে ত্বক এবং ত্বকের পিছনে মাংস, আরও গভীরে রয়েছে হাড়। স্থূল হাড়ই সব সৌন্দর্যকে ধরে রেখেছে। এ সত্য মোটামুটি সব নাটকেই কম-বেশি রয়েছে। এবং কামরূপা ও ইরাবতীতে এই দার্শনিক ভাবনা দর্শকচিত্তকে জোর ধাক্কা দিয়েছে। সত্যি আমরা সব সময় কি সে কথা ভাবতে পারি? মোনালিসার হাসির পিছনে, তার সকল সৌন্দর্যের অন্তরালে আমাদেরই চোখের সামনে বসে আছে একটি ছোট্ট কংকাল। এ-দৃশ্য জাপানি নাট্যকারদের মতো করে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠি। আসলে এ-সত্য তো আমরা ভাবতে চাই নে। না, নাটকেও না। না ভেবেই আমরা সুখী থাকতে চাই। আমরা আরও জানি ঐ হাড়ও সব নয়। তারও পিছনে রয়েছে কতগুলো অণু বা পরমাণুর

সমষ্টি। জাপানি ভাবধারার এই নেতিবাদ-দর্শনে আমাদের আপত্তি। বরং 'হৈমন্তী' নাটকের শেষে ঝর্ণার শব্দ, জীবনের মাঝখানে প্রবহমাণতার এমনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের উৎসাহিত করে। সকল খিন্নতা ও অবসাদকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এ প্রবল টান 'নো' নাটকের অনাবিল সৌন্দর্যসৃষ্টির একটি প্রয়াস বলে মেনে নিতে ভালোই লাগে।

প্রতীকের ব্যবহার যথার্থই সুন্দর। চারটি নাটকেই যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতীকই জীবন থেকে নেয়া বলে কোনো অলীক ফ্যানটাসি রচনা করে নি। 'নো' নাটকের সমৃদ্ধিকেই আমাদের আকর্ষণের লক্ষ করে রেখেছে। একটি ছোট্ট উদাহরণ। ইরাবতী নাটকে একজন প্রায় একশ বছরের বৃদ্ধাকে দেখে যুবক কবি বলে উঠছে, 'তোমার চোখে গহীন কালো দিঘির শান্তি…কী মধুর সৌরভ তোমার শরীরে, তোমার দামি সিল্কের শাড়িতে (যদিচ ছালার চট পরে আছে) আশ্চর্য তুমি…নিরুপমা…তুমি আবার যৌবন ফিরে পেয়েছ।' এভাবে একমাত্র কবিই দেখতে পারে। আর তাই কবি ও বুড়ি, প্রেমের দুই প্রতীক, স্বপ্ন ও বাস্তবের দুই প্রতীক, এক অনবদ্য রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

রিক্ত-চরিত্রের দুই রূপ—বাসবী (হৈমন্তী) ও শিখরিণী। বাসবী কিছু না পেয়ে রিক্তা। আর শিখরিণী পেয়েও হারিয়ে ফেলে রিক্তা। একই মেরুর দুই ভিন্ন অবস্থান। বুঝতে কষ্ট হয়, নাটকে এই দুই চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? হয়তো জাপানি নাট্যকাররা এমনি করে প্রাচুর্যের পাশে রিক্ততাকে রেখে, সনাতন পদ্ধতিতে আলোর পাশে অন্ধকার রেখে, প্রাচুর্য ও আলোরই জয়গান করতে চেয়েছেন।

নাট্য-প্রয়োগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গেলে মনে হয় সুরজিৎবাবু পুরোপুরি নাট্যকারের দায়িত্ব পালন করতে চান নি। এক্ষেত্রে তিনি নাট্য-সাহিত্যের মুগ্ধ পাঠক ও অনুবাদক হতে চেয়েছেন। সে কারণেই মনে হয় চারটি নাটকই মঞ্চ-সফল করতে পরিচালকের কিছু অসুবিধা হতে পারে। নাটক-গুলো এডিটিং করে মঞ্চোপযোগী করে নিতে হবে। আর সে চেষ্টা যারা করবেন তারা জনচিত্ত জয় করতে কখনই বিফল হবেন না। কারণ নাটক চারটি এমনি ভাবসমৃদ্ধ, যা বাঙালি দর্শকমাত্রকেই আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে।

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

'একদিন প্রতিদিন'। মৃণাল সেন

এক অস্বস্তিকর 'অবাস্তব' সত্য নিয়েই মৃণালবাবু ছবি করলেন। এবং এই ছবি দিয়েই তিনি ভেঙে দেন বাংলা চলচ্চিত্র-ইতিহাসের সমস্ত নান্দনিক লিরিসিজম। একটি মেয়ের রাত করে বাড়ি ফেরার মতো আপাতসামান্য ঘটনার সূত্র ধরে মৃণালবাবু এই ছবিতে বাস্তবতার যে প্রামাণিক উন্মোচন করতে পারেন, মিলিয়ে দিতে পারেন কলকাতার স্থাপত্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার অবক্ষয়, মিশিয়ে দিতে পারেন প্রকৃত মর্গ আর প্রতিদিনকার সাংসারিক পচন, ধরিয়ে দিতে পারেন নারী ও রাত্রির সমস্ত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত—বাংলা চলচ্চিত্রে আলেখ্যর এই রূঢ় প্রামাণিকতা আগে কখনও তেমন করে আসে নি।

বহু ডি সিকা ছবির চিত্রনাট্যকার সেসারে জাভাত্তিনি যেমন বলেছিলেন, একটি মেয়ের জুতো কিনতে যাওয়া নিয়েও ছবি হয়, তেমনি বাংলাদেশে একটি মেয়ের রাত করে বাড়ি ফেরা নিয়েও ছবি হল। এই উপলক্ষের ভিত্তিতে মৃণালবাবু আবিষ্কার করে দেখালেন, এর নিহিত নগ্ন প্রাত্যহিকতার ভেতর, ঘটনার স্বাভাবিক লজিকের ভেতর, জীবনযাপনের অবসাদজাত উদাসীনতায় লুকিয়ে আছে কী ভয়ানক সত্য, আধুনিক বহুতল ইমারতে মোড়া নতুন দিগন্তের নীচে কী বিপজ্জনক ভেঙে পড়ছে কলকাতার প্রকৃত নির্মাণ।

'একদিন প্রতিদিন' বাস্তবতার এই নতুন মাত্রা যে যোগ করতে পারে, মৃণালবাবুর ছবিতে তা আসে জরাজীর্ণ নবীন মল্লিক লেনে সিপাহী বিদ্রোহের আমলে তৈরি বাড়ির লোনা-ধরা স্থাপত্যে। মৃণালবাবু ক্যামেরা নামিয়ে আনেন প্রায় অন্ধকূপের মতো বাড়িটার উঠোনে যেখানে আরও দশটি পরিবারের সঙ্গে হৃষিকেশবাবু একপাল ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে থাকেন। নাগরিক জীবনে লালিত চিনুর বাড়ি না-ফেরা ও নানা সম্ভাব্য পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় মানবস্বভাবের পারিবেশিক স্খলন, সামাজিক মূল্যবোধের বিচ্যুতি। 'একদিন প্রতিদিন'-এ শহরের, এই শহরের শিশু, বালিকা, যুবক, যুবতী, হৃষিকেশ-বাবুর সন্তানেরা—তপু, মিনু, চিনুদের ক্ষেত্রে—বিষাদময় বাস্তবতার উপলব্ধির পরিণতি পেয়ে যায়, যেখানে নোংরা কটাক্ষ আর কুৎসিৎ বচসা, হীন ইঙ্গিত,

পরিবারের সদস্যদের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা সেই অভিজ্ঞতার নানা উপাদান। বাঙালি বৃদ্ধা বিধবার যে ভাগ্যহত চেহারা সামাজিক লায়াবিলিটির মতোই আমাদের চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে থাকে, তা ছিঁড়ে 'একদিন প্রতিদিন'-এ দুটি শটে নবীন মল্লিক লেনের সেই বাড়িরই অন্য এক ভাড়াটে বৃদ্ধা তার সচেতন সামাজিক ভূমিকায় নেমে আসে। চিনুর রাতে বাড়ি ফিরে আসার প্রেক্ষিত হয়ে দাঁড়ায় তীক্ষ্ণ বিচারের বিষয়—হৃষিকেশবাবু, স্ত্রী ও সমবেত পরিবার তাদের সন্দেহে ও হাজার বছরের নারী-অন্ধকারের সহজাত অনিবার্য ইঙ্গিতপূর্ণ যৌথ আঘাতে খুন করে চিনুর নিষ্পাপ সরলতা। তপু-মিনু-ঝুনুদের দিদি চিনুর, এতদিন ধরে গড়ে-তোলা বিশ্বাস, ভেঙে যায়। দিদি আর দিদি থাকে না।

লিরিসিজমকে না-ভাঙলে 'একদিন প্রতিদিন'-এর এই কঠিন বাস্তবতার মাত্রা আসত না। আর এই ভেঙে-ভেঙে গড়ে তোলার জন্য মৃণালবাবু যে-নতুন ভাষা আবিষ্কার করলেন, বাংলা ছবিতে তা নিঃসন্দেহে এক নতুন ভাষা।

হৃষিকেশবাবুর মেয়ে চিনুর রাত করে বাড়ি-ফেরা নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া মৃণালবাবু ধরতে চেয়েছেন, তা আরও ব্যাপ্তি পেয়ে যায় নারী ও রাত্রির যোগাযোগের প্রায় হাজার-হাজার বছরের লালিত অনুষঙ্গে।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, মেয়েদের মন চঞ্চল ও সংযমহীন। সৎপথ ব্রাহ্মণে মেয়েদের অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ হিসেবে বিচার করা হয়েছে। কোনো বন্ধুতা জানে না মেয়েরা, হিংস্র হৃদয় নিয়ে তারা ঘোরে ফেরে। মহাভারতের দুই সম্মাননীয় চরিত্র, মহাযোদ্ধা ভীষ্ম ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মেয়েরা ইতর প্রাণীবিশেষ ও সমস্ত পাপকাজের মূলে। মহাভারতে আরও বলা হচ্ছে যে, একটি শতবর্ষ পরমায়ুর মানুষ যদি একশটা জিহ্বা নিয়ে সারাজীবন আবৃত্তি করে যায়, তবুও মেয়েদের পাপ ও দোষের কথা শেষ হবে না। রামায়ণে অগস্ত্যর মুখে শোনা যাচ্ছে যে মেয়েরা সম্পদবান পুরুষ চায়, দারিদ্র্যলগ্ন স্বামীকে পরিহার করে ; তাদের স্বভাব বিদ্যুতের মতো চঞ্চল, বায়ুর মতো চকিত, অস্ত্রের মতো ধারালো। ধর্মশাস্ত্রগুলোর মতে, পুরুষদের চাইতে মেয়েদের কাম আট গুণ বেশি এবং সেই সূত্রে মনু মনে করতেন, মেয়েদের শয্যাবিলাস, অশুদ্ধ কামনা আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের কোনোরকম স্বাধীনতা না দিয়ে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বদ্ধ করে রাখা উচিত।

এই যার পৌরাণিক ও মহাকাব্যিক ট্র্যাডিশন, সে সমাজ যে মেয়েদের সব দিক থেকে মারবে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির বা মনুর মতো মেয়েদের ভাববে নষ্টচরিত্র—মৃণাল সেন সেই সত্যকেই যাচাই করতে চান। যদিও আধুনিক সময়ের চাপ বাধ্য করেছে হৃষিকেশবাবুকে তাঁর মেয়েকে চাকরি করবার জন্য বাইরে পাঠাতে, তাঁর ও পড়শিদের পারিবারিক বদ্ধমূল সংস্কার তো ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ায় তাকে চাইবে মারতে। একদিকে বেঁচে থাকবার দায় অন্যদিকে ব্যবহার, আচার, সামাজিকতা ও মূল্যবোধের মগ্নচৈতন্যে বয়ে আনা আর্কিটাইপ রক্ষার দায়—'একদিন প্রতিদিন'-এর এইটেই সবচাইতে বড় সত্য।

কতখানি সত্য, তা বোঝা যাবে, বর্তমানে মেয়েদের চাকরিতে অংশগ্রহণের হার দেখলে। ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যার মাত্র সাত-আট শতাংশ মেয়ে। এবং এই হার ক্রমশ কমতির দিকে। তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে রাত্রিবেলায় মেয়েদের কাজ করা নিষিদ্ধ। ১৮৯১ সালে যখন মেয়ে চাকুরিজীবীর হার ছিল ১৩৬ শতাংশ—তখনই আইন করে মেয়েদের কাজের সময় কমিয়ে তাদের গৃহবন্দী করে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আইনে বলা হয়—যাতে তারা বাড়ির কাজ ভালো করে করতে পারে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা। তারপর দেশের শিল্প-অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাইট শিফট অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন ১৯৩০-এর নতুন আইনে মেয়েদের নাইট ডিউটি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কারণ দেখানো হল সেই ১৮৯১-র ধাঁচেই। কিন্তু, এই আইনের ফলে কর্মক্ষেত্রের একটা প্রধান অংশ থেকে মেয়েদের যে বাদ দেওয়া হল—তার প্রকৃত কারণ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। রাত্রিবেলা কাজের ক্ষেত্র মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ নয়, রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, পারিবারিক শান্তির দিক থেকে সঙ্গত নয়। আর এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ নিহিত আমাদের সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী লালিত নারীর প্রতি সন্দেহে, অবিশ্বাসে।

এই অবদমনের সামাজিক চক্রান্তে বীতশ্রদ্ধ মৃণালবাবু প্রায় অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'নারীর যে ত্রুটির কথা তোমরা বল, তার কোনটা পুরুষদের নেই, আমায় দেখিয়ে দাও।' 'একদিন প্রতিদিন'-এর বৃদ্ধা তাই বলে ওঠেন যেন প্রায় স্বগতস্বরে—মেয়েটা রাত্রে ফিরছে না, তাই নিয়ে কত কানাকানি, ফিসফাস; একটা ছেলে করলেই কত নাম হত। মেয়ে জন্ম বড় কষ্টের রে।

চিনুর ঠিক সময়ে বাড়ি না-ফেরার ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়াকে মৃণালবাবু এত সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করেছেন যে, কোথাও এতটুকু বাড়তি অংশ নেই—না চরিত্রের উপস্থাপনায়, না কথোপকথনে, না শট ডিভিশনে। চিনুর না-ফেরার ঘটনা প্রাথমিক উৎকণ্ঠা থেকে, লোকনিন্দার ভয়ে চুপচাপ উদ্বেগ পেরিয়ে, না-ফেরার সমাজ-অনুমোদিত কারণ—মৃত্যু বা দুর্ঘটনা—প্রমাণ করতে হাসপাতালে অনির্দিষ্ট রোগিনীর অপেক্ষা ও মর্গে লাশ চেনার চেষ্টারও পর, পারিবারিক সদস্যদের পারস্পরিক দোষারোপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিনুর ফিরে আসায় শেষ হয়। কিন্তু চিনুর ফিরে আসার বাস্তবতায় অনিবার্য পারস্পরিক সন্দেহ ও সংস্কারবদ্ধ মূল্যবোধ বিদ্ধ করে চিনুকেই। তার চূড়ান্ত প্রকাশ বাড়ির উঠোনে এক কুৎসিৎ যৌথ ঝগড়া-বচসা।

এই আপাত সরল কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলা চলচ্চিত্র-অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও নতুন এই ভূমিকায় প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী অসাধারণ মগ্নতা নিয়ে কাজ করেছেন। হৃষিকেশবাবুর ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় গীতা সেন, মিনু-র ভূমিকায় শ্রীলা মজুমদার অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে এই নতুন বাস্তবতাকে পর্দায় তুলে এনেছেন। মমতাশংকর না-ফেরা চিনুর অসহায়তা ব্যক্ত করেন দুর্লভ নৈপুণ্যে। কে কে মহাজনের রঙিন ফটোগ্রাফি রাত্রির কলকাতাকে চলচ্চিত্রে আনল।

মৃণালবাবু যেখানে প্রায় দুঃসাহসী, তা হল, শেষ শটে, বাইরে ট্যাক্সির শব্দ শোনা যায়, চিনু ঢোকে। কিন্তু, কে তাকে দিয়ে গেল বা কেন তার দেরি হল, এসব কথা ছবিতে কখনোই বলা নেই। চিনুর দেরি করে ফেরার কোনো যে অজুহাত নেই—এটা ছবিতে প্রতিষ্ঠা করা মৃণালবাবুর সাহসের ও সভ্যতার পরিচয়।

এই ছবির সাফল্যে মূল গল্পটির প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অবিরত চেনামুখ'-এর মতো একটি দৃঢ় নৈতিক ভিত্তির গল্পের কাঠামোর জন্যই ফিল্মটির নৈতিক আবহ ফিল্মের গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত হয়েছে। সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনা ফিল্মের একটা বড় অবলম্বন—তা যেন এমন প্রমাণিত হওয়ার দরকার ছিল। সামাজিক অসত্য-সাহিত্যের সাহায্যে সমাজ ও ব্যক্তির সত্যের গভীরতায় পৌঁছনো যায় না। সেই পৌঁছনোর জন্য সবগুলি উপকরণকেই সত্য হতে হয়।

মৃণালবাবুকে আবারও অভিনন্দন। আবারও।

সিদ্ধার্থ রায়

বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ১৯৮০। ফটোগ্রাফিক এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। কলকাতা তথ্য কেন্দ্র

১৬ থেকে ২৩ আগস্ট এক ফটোগ্রাফি ও কলার স্লাইড প্রক্ষেপণ-প্রদর্শন-এর আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। প্রত্যেক বারের মতো এবারেও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সদস্যরা। যদিও প্রদর্শনীর সব ছবিগুলিই সর্বভারতীয় পর্যায়ে পড়ে না, তবু সদস্যদের পারদর্শিতা ক্রমবর্ধমান এবং ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা আশা করা যায়। এই ধরনের প্রদর্শনীগুলি যেমন হয়, অর্থাৎ পাঁচ-মিশেলি ছবির সমন্বয়—এ প্রদর্শনীটিও তার ব্যতিক্রম নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোকচিত্রশিল্পীরা যা সামনে ও সহজে পেয়েছেন, তারই ছবি তুলেছেন। কম্পোজিশনে জ্ঞানের কিছু অভাব বোধ হল কয়েকজন শিল্পীর ছবিতে—যেমন, মানস মিত্রের 'স্টিল লাইফ' ও 'ট্রেইলিং ফুট স্টেপস'। ছবিগুলি মার খেয়েছে নিছক কম্পোজিশন দোষে, যদিও বোঝা যায়, শিল্পীর ফটোগ্রাফিক পারদর্শিতা আছে। বর্ষিয়ান শ্রদ্ধেয় বি. কে. সিনহা-র 'জোড়া ফ্রেমিংগ' চিত্রটি ফটোগ্রাফিক পারদর্শিতার নিদর্শন; কিন্তু ওঁর পোর্ট্রেট চিত্রগুলি অতি সাধারণ পর্যায়ে পড়ে। মুকুল দে-র 'মাছের বাজার' ছবিতে বাজারের আবহাওয়াটাই নেই। এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় শিল্পী বোধ হয় একজন খ্যাতনামা আলোকচিত্র-শিল্পীকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করছেন। সুনীল দত্ত-র ছবিগুলো লক্ষ করলেই মনে হয় উনি একমাত্র এডিটরদের কথা মনে রেখেই ছবি তোলেন। সোমনাথ দত্ত-র হরেকৃষ্ণ-প্রীতি এখনো সমানে চলেছে। প্রদর্শনীর আহ্বায়ক হিসাবে ওঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে সোমনাথবাবুর কাছে অন্য ছবি আশা করব। অরুণ গাঙ্গুলির সুন্দর কয়েকটি ছবি খুবই আশা করেছিলাম। এবারের প্রদর্শনীতে উনি আমাদের নিরাশ করলেন।

৮৫ নম্বর ছবিটি 'নুড স্টাডি' হিসাবে ঝোলানো হয়েছে। এখানে দৈহিক

সৌন্দর্য ও কমনীয়তা একদম ফোটে নি। আমরা ভুলে যাই, দৈহিক সৌন্দর্যের স্বর্গীয় সুষমা সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা খুবই দুরূহ কাজ। এবং একমাত্র উচ্চস্তরের শিল্পীরাই এটা পারেন। না হলে উপস্থিত হয় কুশ্রী নগ্নতা। উৎপল গুহ এই ছবিতে যতটা ব্যর্থ হয়েছেন, ঠিক ততটাই কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন ওঁর 'স্টাডি' ছবিটিতে। এটা একটা অনবদ্য মৌলিক ছবি। অতি সাধারণ কংক্রিট স্ট্রাকচার-এ এই আলো-ছায়া ও টেক্সচার ফোটানো না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তদ্রূপ দেবনাথের ছবি 'চিড়িয়াখানার সার্পেন্টাইন হল' স্থাপত্য-চিত্র অসাধারণ হয়েছে। হাই কি-তে এত মনোরম ও সাবলীল ছবি এই প্রদর্শনীতে একটিই ছিল। কলার স্লাইডেও ছিল ডি এস নাহারের স্থাপত্যের ছবি। কিন্তু এটা মনকে তত নাড়া দেয় না। তুষার দত্ত-র পোর্ট্রেট খুবই ভালো। একই শিল্পীর ব্যাঙ ও পেঁচার ক্লোজ-আপ ছবিগুলি দেখবার মতো। ওঁর কলার স্লাইড—জলমগ্ন কলকাতায় শববাহকের ছবি—একই সঙ্গে করুণ ও কৌতুককর। আমাদের জীবনের এই দিকগুলি সচরাচর শিল্পীদের চোখে পড়ে না, যে রূপটা আমরা বিদেশী শিল্পীদের ছবিতে হামেশা দেখি। দিলীপ চ্যাটার্জির একটি মাত্র ছবি 'ফায়ার ফাইটার' ভালো লাগল। ছবির দৃষ্টিকোণ সত্যি সুন্দর। ভাস্কর চ্যাটার্জির 'রেল লাইন' সুদূরের পথে টেনে নেয়। কত সামান্য বস্তু নিয়ে কি সুন্দর ছবি করা যায়! এস. বি মণ্ডল তাঁর ছবিতে আমাদের প্রতিদিনের অসুবিধা ও নোংরা বাস্তবের চিত্র তুলে ধরেছেন। এটা কি ওঁর সমাজ-চেতনা, না আকস্মিকতার অভিব্যক্তি? কলার স্লাইডগুলির মধ্যে 'ইনসেক্ট' ও 'প্ল্যান্ট স্টাডি'-গুলো ভালো লাগল। প্রকৃতি খুবই সুন্দর মনোরম রঙিন চিত্রে আরো সুন্দর দেখায়। অলোকনাথ মজুমদারের 'সুপ্রভাত' স্লাইড খুবই সুন্দর। অজিত দাসের 'আর্থলি প্যারাডাইজ'ও ভালো লাগল। অজিত মণ্ডলের 'লাল সূর্য' একটু বেসুরো। সাধারণ জীবনের কলার স্লাইডগুলিতেও কম্পোজিশন ও রঙের বোধ-এর কিছু অভাব টের পাওয়া যায়।

অজয় দে

শিল্পী রামকিঙ্কর

ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও মহান চিত্রকর রামকিঙ্কর গত পয়লা অগাস্ট রাত্রে পরলোক গমন করেছেন কলকাতার শেঠ সুখলাল কারনানি স্মারক হাসপাতালে।

শিল্পী রামকিঙ্করের সমস্ত শিল্পকর্ম একত্রিত করে কোনও প্রদর্শনী করা অসম্ভব। শুধু তাই নয় তাঁর সমস্ত কাজের হদিশ পাওয়াও আজ অত্যন্ত কঠিন হবে। রামকিঙ্কর সৃষ্টির আনন্দে কাজ করে গেছেন। সৃষ্টির পর তাঁর শিল্প-সম্পদের কি হল সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁকে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন তাঁরা দেখেছেন কিভাবে তিনি হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই দিয়েই ছবি মূর্তি তৈরি করে গেছেন। বাজারের রং, সামান্য সিমেন্ট-মেশানো কাঁকর-বালি এই রকম ছিল তাঁর শিল্পকর্মের উপকরণ। ক্যানভাস না থাকলে একটা ছবির উপরই নতুন ছবি করেছেন—অসাধারণ সব ছবি এইভাবে হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। প্রথম থেকেই তাঁর অনন্যসাধারণ কাজ শিল্পরসিকদের কাছে তাঁকে মহৎ শিল্পীরূপে চিহ্নিত করেছিল। শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে আসবার পর প্রথম ৮/১০ বছর তিনি ভারতীয় ধারা টেম্পারা বা ওয়াশ পদ্ধতিতে রং রূপ ও রেখায় অসাধারণ বলিষ্ঠ যে সব ছবি এঁকেছিলেন, খ্যাতির সহজপথ সেখানেই তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি খ্যাতি-কবলিত হয়ে বাঁধা রাস্তায় চলেন নি। সারা জীবন তাঁর শিল্পোপলব্ধি ও শিল্প-বক্তব্য প্রকাশের উপযুক্ত আধার ও করণকৌশল নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন যে প্রচণ্ড সাহস নিয়ে আজকের শিল্প-পরিস্থিতিতে তা বোঝা কঠিন।

রামকিঙ্কর বেইজ এসেছিলেন বাঁকুড়ার গ্রামের শ্রমজীবী পরিবার থেকে এবং তাঁর জীবনে, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পে গ্রামের সরল অনাড়ম্বর ও বলিষ্ঠ চরিত্রটি সর্বদা প্রতীয়মান ছিল।

তাঁর সমস্ত শিল্পজীবন তিনি শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে। বীরভূমের উষর প্রকৃতি তাঁকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ করেছে।

শান্তিনিকেতনে গাছপালার সমারোহ, চারদিকে বিস্তৃত খোয়াই, শালবন, প্রতিটি ঋতুর উচ্ছ্বসিত রূপ আর এই পরিবেশের সঙ্গে ছন্দে গাঁথা সাঁওতালদের জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে এবং এদেরই কথা বলে গেছেন তিনি মূর্তিতে ছবিতে ড্রয়িংয়ে। দুঃখ-দারিদ্র্য-মৃত্যু বা সংগ্রামের কথাও তিনি বলেছেন কিন্তু নৈরাশ্য তাঁর কোনও কাজে আমি দেখিনি। ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর শিল্পী-সত্তার বিকাশের পরিণতির যুগ ১৯৪০/৪১ সাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সস্নেহ উৎসাহ পেয়েছেন। মনে আছে ১৯৪০/৪১ সালে যখন কলাভবনের একটি স্টুডিয়োর দেয়ালের গায়ে ঔরঙ্গাবাদ গুহার বিখ্যাত ভাস্কর্য গ্রুপ টিকে বড় করে গড়া হচ্ছিল—কিঙ্করদা মাঝের নর্তকী মূর্তিটি গড়ছিলেন। মাস্টারমশাই নন্দলাল একটু দূরে বসে। দুজন অধ্যাপক (কলাভবনের নয়) মূর্তিটি দেখে খুশি হয়ে নন্দলালকে বলেন—কিঙ্কর তো সুন্দর মূর্তি গড়তে পারে, সাঁওতাল-টাওতাল ঐসব ছাই ভস্ম করতে দেন কেন? নন্দলাল হেসে বললেন, 'কিঙ্কর সিদ্ধাই পেয়ে গেছে—ও যা করবে তাই আর্ট। আমরা শুধু চাই এখানে আর্ট হোক।' অধুনা বিখ্যাত তাঁর 'সাঁওতাল পরিবার' সে যুগের বেশির ভাগ দর্শকের কাছে এই রকমই অভ্যর্থনা লাভ করত। সেটি গড়বার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে দুপুর-রৌদ্রে নন্দলাল প্রতিদিন পাশের ছোট তাঁবুটিতে বসে ছাত্রকে সঙ্গ দিতেন। শান্তিনিকেতন বাড়ির সামনে গড়া কিঙ্করদার অ্যাবস্ট্রাকট্ মূর্তিটি তৈরির সময় সারা শান্তিনিকেতনে গেল গেল রব—ভারতবর্ষে সেটি প্রথম উন্মুক্ত জায়গায় অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তি হচ্ছে। শঙ্খ চৌধুরী, রবি চট্টোপাধ্যায় আর আমি শিল্পীকে সাহায্য করছি। প্রতিদিন দুবেলা দেখতে আসতেন নন্দলাল আর বিনোদ-বিহারী—রামকিঙ্করের 'ফ্রেণ্ড, ফিলসফার ও গাইড'—আর একজন মহান শিল্পী। আর আসতেন সবাইকে খুশি করে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায়ই। একজন আসতেন কলকাতা থেকে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রামকিঙ্কর-বিনোদবিহারীর বন্ধু। মাত্র মাস কয়েক পূর্বে দিল্লিতে বর্ষীয়ান শিল্পী বিনোদবিহারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনিও অসুস্থ, রামকিঙ্করের অসুস্থতা নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, 'প্রভাস, রামকিঙ্করবাবু শুধু একটি গ্রেট ট্যালেন্ট নন। মনে রেখ, তিনি একটি মেজর জিনিয়াস। ঐ রকম একজন শিল্পী একটি দেশে রোজ জন্মাবে না।'

কিঙ্করদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যোগীনের চায়ের দোকানে ১৯৩৭ সালের পূজার ছুটিতে। সে যুগের শান্তিনিকেতনে যোগীনের চায়ের

দোকান অনেকটা সেকালের কলকাতার কফি হাউসের স্থান দখল করেছিল। অবশ্য আমাদের দেশের শহর আর গ্রামের মতো এই দুয়ের মধ্যে ফারাকও ছিল দুস্তর। যোগীনের দোকান ছিল বর্তমান সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ও স্টেট ব্যাঙ্কের বাড়ি পান্থনিবাসের মাঝামাঝি রাস্তার ধারে, ভাঙাচোরা একটি খড়ের দোচালা, মহুয়া আর তালগাছের নিচে। আর ভাঙাচোরা যোগীন ছিল তার একমাত্র স্বত্বাধিকারী, বয়-কুক একত্রে সব। সে যুগের কিঙ্করদা সহ বহু শিল্পীর ছবিতে, স্কেচে, কার্টুনে যোগীন আর তার দোকান অমর হয়ে আছে।

আমি তখন কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র। ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে দিদির খালি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। সুন্দর একটি সকালে বর্তমানে প্রায় অন্তর্হিত খোয়াই আর তালবনের কয়েকটি তেল রং-এর স্কেচ করে চায়ের আশায় যোগীনের দোকানে হাজির হয়েছিলাম। সেখানেই কিঙ্করদা আর বিনোদদার (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে পরিচয়। ছুটির শান্তিনিকেতনে দুপুর ও রাত্রের খাবার অসুবিধার প্রসঙ্গে কিঙ্করদা আমাকে তাঁদের যোগীনের 'মেসে' নাম লেখাতে আহ্বান করলেন। রোজ দুবেলা সজনে-পোস্ত আর ভাত খেতে খেতে তিন সপ্তাহে তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় গভীর হল। এর ভেতর তাঁদের কাজ দেখলাম। রামকিঙ্কর ও বিনোদ-বিহারীর ছবি ও মূর্তি দেখা—আমার ১৮ বছরের জীবনের সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আর্ট স্কুলের ছাত্র দু-বছর কিছু প্রদর্শনী দেখেছি, নানা ধরনের কিছু দেশী-বিদেশী আর্টের বইও দেখেছিলাম।

কিঙ্করদার কাজ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বলিষ্ঠ রূপ, রেখা আর রং-এ বাঁধা অপূর্ব ছন্দময় সব ছবি আর তাঁর মূর্তিগুলি সবই তাঁর চারপাশের জীবনের প্রতিফলন—যেন শিল্পীর শক্তি আর আনন্দের এক-একটি বিস্ফোরণের দ্যোতক।

তার এইসব কাজ এবং অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত রং-রেখায় তৈরি বিনোদদার ছবির গভীর সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করেছিল। এবং সেই পূজার ছুটির পর আমি শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগ দিই কলকাতা আর্ট স্কুল ছেড়ে দিয়ে।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত যে সময়টা আমি কলাভবনে কাটিয়েছি ঐ সময়েই কিঙ্করদা শান্তিনিকেতনে কাঁকর-বালি-সিমেন্টের বড়মূর্তিগুলির ভেতর 'সাঁওতাল পরিবার' আর শান্তিনিকেতন-গৃহের সামনের

অ্যাকস্ট্র্যাক্ট মূর্তিটি করেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে করেন কলাভবন ছাত্রাবাসের কালোবাড়ির বাইরের দেয়ালের মূর্তিগুলি, চীনাভবনের সামনের রিলিফ প্যানেলগুলি আর কলাভবন-এর দেয়ালে ঔরঙ্গাবাদের নাচের দলের মূর্তির অনুসরণে করা বড় রিলিফের কাজটি। এবং এই সময়ই ছবিতেও তিনি তেল রং-এর ব্যবহার শুরু করেন। তেল রং-এ তৈরি তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিরও বেশ কয়েকটি তিনি এই সময়েই করেছেন। তেল রং এবং মাটিতে চিত্র ও ভাস্কর্য মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক শিল্পবক্তব্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে, এই সময়ই তিনি করেছেন কালিকলমে অসংখ্য ড্রইং, জলরং ও কালিকলম বা কালিতুলির কাজ মেশানো অপূর্ব সব দৃশ্যচিত্র, যার তুলনা চলে বোধহয় শুধু গোপাল ঘোষের কাজের। সাদা-কালোয় তুলির কাজে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এচিং, উডকাট এবং ড্রাই পয়েন্টের কাজও এই সময়ে প্রচুর করেন।

এতসব সৃষ্টিশীল কাজকর্মে সারা সময় নিযুক্ত থাকলেও কিন্তু কিঙ্করদার উৎসাহ আর জীবনীশক্তিতে কখনও ভাঁটা পড়তে দেখিনি। এর পরও থাকত গান, নাচ আর অভিনয়ের মহড়া প্রায়ই রাত্রি দশটার পর। নাটকে ছিল তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ।

কলাভবনের প্রাঙ্গণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিঙ্করদার জোরালো গলার গান আর হাসিতে বমবম করত। ছাত্রছাত্রীরাও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মহা-উৎসাহে গানে যোগ দিত। এবং হঠাৎ কখনও ক্লাশ চলাকালীন কিঙ্করদার উৎসাহে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলাভবন-প্রাঙ্গণে নাচ-গান-বাজনার বন্যা বইয়ে দেওয়া মোটেই একটি বিরল ঘটনা ছিল না।

কিঙ্করদার সঙ্গে স্কেচ করতে যাওয়া ছাত্রদের আর-একটি খুব আনন্দের ব্যাপার ছিল। স্কেচের ভিতর দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে তাঁর শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গি বোঝবার সুযোগ পেত। আর পেত কিঙ্করদার আঁকা একটি করে অনবদ্য স্কেচ। এইসব স্কেচিং এক্সপিডিসনে কিঙ্করদার কাছ থেকে অনেক গানও আমরা শিখেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের গান—কিন্তু কিঙ্করদার বিশেষ ঢং-এ গাওয়া।

কিঙ্করদা ছাত্রজীবনের পর দিল্লিতে বছরখানেক মডার্ণ স্কুলে শিল্প-শিক্ষকের কাজ করেছিলেন এবং সেখানে দেয়ালের গায়ে সরস্বতীর একটি রিলিফের কাজ করেছিলেন। এ ছাড়া বাইরে করা বড় কাজের ভেতর নেপালে-গড়া 'ওয়ার মেমোরিয়াল' ও দিল্লিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে রাখা 'যক্ষ-যক্ষিনী'র

মূর্তির কথা মনে পড়ছে। যক্ষ-যক্ষিনীর ২৪ ফুট দীর্ঘ পাথরের মূর্তি এ যুগে তৈরি সবচেয়ে বড় মূর্তি। শান্তিনিকেতনে গড়া বড় মূর্তিগুলি সবই কাঁকর-বালি, সিমেন্টের তৈরি। সিমেন্টের ভাগ খুব কম থাকায় এই অপূর্ব শিল্প-নিদর্শনগুলি এখনই খুব কমজোরি হয়ে পড়েছে এবং এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে এগুলি আর ১৫/২০ বছরের ভেতর নষ্ট হয়ে যাবে। কিঙ্করদা দীর্ঘস্থায়ী উপকরণে খুব কম কাজই করেছেন। তিনি যখন কাজের নেশায় মত্ত ছিলেন তখনকার বিশ্বভারতীর পক্ষে তাঁকে উপযুক্ত উপকরণ যোগান সম্ভবও ছিল না। রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম বিংশশতাব্দীর ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আজ তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত জাতির উপর তাঁর শিল্পকর্ম সংরক্ষণের দায়িত্ব এসে গেল।

প্রভাস সেন

গোপাল ঘোষ

গোপাল ঘোষ চিত্রশিক্ষা শুরু করেন জয়পুর স্কুল অব আর্টস-এর অধ্যাপক গঙ্গাবক্স-এর কাছে। তখন ওখানে অধ্যক্ষ সূর্যনারায়ণ এবং সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পী শৈলেন দে। জয়পুরে রাজস্থানী স্কুলের মিনিয়েচার ছবির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন বেশি, কিন্তু গুরু গঙ্গাবক্স অতীব কঠিন গুরু, প্রথমেই কড়ার করে নিলেন যে তিনি না বলা পর্যন্ত কোনো ছবি আঁকতে পারবেন না। ছবি-আঁকার আগে রং তৈরিই আসল কাজ, সেটাই শিখতে হবে। রং তৈরি বলতে আগের দিনের আদিম পদ্ধতিতে—দেশীয় গাছ-গাছড়ার শেকড়-ফল থেকে, কখনও মাটি থেকে রং-এর উপাদান সংগ্রহ করে শিল-নোড়া দিয়ে মাড়িয়ে রং প্রস্তুত করতে হতো। অতীব কষ্টসাধ্য হলেও প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গোপাল ঘোষের কাছে এটা খুবই উৎসাহের ছিল —বিলিতি রং তো ব্যবহার করতে হবে না! ছবি-আঁকার প্রেরণা চরিতার্থ করলেন অনেক মিনিয়েচার পদ্ধতিতে ছবি এঁকে। তার মধ্য থেকে নির্বাচিত একটি ছবি কোনো এক প্রতিযোগিতায়ও পাঠিয়েছেন গুরুকে না জানিয়ে। সেই ছবিটি ওখানে পুরস্কৃত হয়। এবার আর তো গোপন রাখা যায় না। তখন গঙ্গাবক্স রং তৈরির কাজের সময় কমিয়ে দিলেন এবং ছবি আঁকার কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিলেন। জয়পুরের শিক্ষা-

পদ্ধতি ছিল রক্ষণশীল। ওখানে তখনও লাইফ বা নুড স্টাডির প্রচলন ছিল না। প্রবল ইচ্ছা মানবদেহের গঠনভঙ্গি বা অ্যানাটমি শেখার। সোজা চলে গেলেন মাদ্রাজ।

মাদ্রাজের আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ তখন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দেবীবাবু ওঁকে ভর্তি করিয়ে নিলেন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। এখানে আর এক জীবন—মেসজীবন। মেসে থাকতে-থাকতে বরাবরের অভ্যাসমতো ছোট্ট একটি থলি আর দু-চারখানা স্কেচ খাতা নিয়ে অবাধ গতিতে চলে যেতেন যেখানে-সেখানে—কালি-কলম তো নিত্যসঙ্গী—সৃষ্টি করতেন অসংখ্য রেখাচিত্র।

গোপাল ঘোষ বহু গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েছেন আর চিত্রশিল্পী হিসেবে পুষ্ট হয়েছেন তাঁদেরই অকৃপণ ভালোবাসা আর সহযোগিতায়। তাঁদের মধ্যে ভেরিয়ের এলউইন, আর্চার, ধীরেন্দ্রমোহন সেন, পুলিনবিহারী সেন, পৃথ্বীশ নিয়োগী, রমেন চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র কথাই মনে পড়ে।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতা। কলকাতা তো নতুন নয়—তাই অসুবিধেয় পড়তে হয় নি, কিন্তু বিপদে পড়তে হল বাবার মৃত্যুতে—একমাত্র বড় এবং নির্ভরযোগ্য অবলম্বন, তাও রইল না। তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন চরমে—১৯৪২—এই সালেই বাবার মৃত্যু। কলকাতা এসে এখানে-ওখানে কাটাচ্ছেন—বেকার অবস্থায় ছবি বিক্রি আর বাণিজ্যিক শিল্প করে দিন চলে। ছবি-আঁকার সুযোগ নেই মনমতো। এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর বদান্যতায় ছবি আঁকার সুযোগ পেলেন ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ছবি-আঁকার জন্য একটি বড় হলঘর। একটি শোবার ঘর, রান্নার জাগা ইত্যাদি। আংশিক বন্ধন এল বাড়ি পেয়ে—কুকুর এবং কাজের জন্য 'দোকড়ি'কে নিয়ে মোটামুটি বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। দিন যায় রাত যায়, ১১নং হয়ে উঠল সমসাময়িক শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডার তীর্থক্ষেত্র। তাহলেও গোপাল ঘোষের সময় কাটত কখনও কুকুরের সাথে ধর্মতলার ওপর স্কেচ করে, আবার কখনও বৃক্ষবহুল ওয়েলিংটন-এর উদ্যানে—আড়ালে গাছপাতার সাথে। এর মধ্যে নেমে এল ভয়াবহ দাঙ্গা। গোপাল ঘোষ বিচলিত নন। থমথমে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ওঁর গতিবিধি ছিল স্বচ্ছন্দ, সঙ্গে দেহরক্ষী বা অস্ত্র হিসেবে থাকত স্কেচ-খাতা আর কালি-কলম। অনেকেই আতঙ্কিত হতেন, বাধা দিতেন, গোপালবাবু কিন্তু নির্বিকার।

এর মধ্যে কলকাতার মতো সাঁওতাল পরগনায় তুমকারও প্রবাদ-পুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন—দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জল রং আর স্কেচ করে সাঁওতালদের খুবই আপনজন। তাঁর আঁকা বাঁশবনের মধ্যে লাল ফুল মাথায় সাঁওতাল রমণী দেখে কে না মুগ্ধ হয়েছেন পরবর্তীকালে? ছাত্ররা যখন পরে ছবি আঁকত ওখানে গিয়ে, মহুয়ার জঙ্গলে, কৈফিয়ত দিতে হতো, গোপাল ঘোষ কোথায় কেমন আছেন।

শিল্পী হিসেবে এতই সম্পূর্ণ ছিলেন তিনি—কোনো কিছুরই আঁচ লাগত না তাঁকে।

১৯৪৬—স্বাধীনতার এক বছর আগে—তখনও তিনি ছবি বেচে কাল কাটান—এমন সময় কবি বিষ্ণু দে ও কবিপত্নী প্রণতি দে-র অদম্য চেষ্টায় বিয়ে হল জজ-সাহেব উপেন্দ্রমোহন বসুর বড় মেয়ে রেণুর সঙ্গে।

ইতিমধ্যে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যাপনা পান। তখন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অধ্যক্ষ। তাঁর পরামর্শে তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ডি. এম. সেন-এর ঐকান্তিক চেষ্টায় গোপাল ঘোষ গ্রহণ করলেন সেই পদ।

সরকারি কলেজের পাঠক্রম অনুযায়ী জল রং, মিউজিয়াম ও জু স্টাডির জন্য নির্দিষ্ট হলেন। আর মাঝে-মধ্যে আউটডোর আর স্টিল লাইফ তো ছিলই। মনের মতো বিষয় পেলেন শেখানোর জন্য, শিক্ষাপদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের করে নিয়েছিলেন—এক সাথে ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক মিলেমিশে কাজ। শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই ছোট্ট একটু জায়গাও করে নিলেন ছবি-আঁকার জন্য। গোপাল ঘোষকে বহু সময়ই আর্ট কলেজের বাগানে দেখা যেত, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কথা বলছেন ফুলের সাথে পাতার সাথে, তাদের জিজ্ঞেসও করতেন, কি রং দেব তোমার, 'ক্যাডমিয়ম' না 'লেমন'? প্রতিকূল সূর্যের আলো ধরে এনে দিতেন তাদের, আর এক চোখে দেখতেন, আলো-আঁধারির খেলাটা ঠিকমতো হল কিনা।

শুদ্ধ চিত্রকর-এর সারল্যের সুযোগ নিয়ে বঞ্চনাও করেছেন কেউ কেউ জীবনভোর, কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল।

ছবি-আঁকার প্রথাগত পদ্ধতি তিনি কোনোদিনই মেনে চলেন নি। তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, যার জন্য অনেকেই তাঁর ছবিতে কী কী মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধাবোধ করেন। প্যাস্টেলে জল রং বা জলরঙে প্যাস্টেল—এ তো ছিল তাঁর নিত্য অভিযান।

যে দুটো রং আজও অনেক শিল্পী ব্যবহার করতে ভয় পান—সাদা-কালো—সেই দুটোই ছিল তাঁর চিত্রসাথী। কথায় কথায় বলতেন, চাইনিজ হোয়াইট এনেছ? চাইনিজ ব্ল্যাক?

গোপাল ঘোষ নানা গল্পকথার বিষয় হয়েছেন—শিল্পীরা যেমন হয়ে থাকেন। কিন্তু দুঃখ হবে যদি তিনি এই গল্পকথারই নায়ক হয়ে থাকেন। তাঁর অসামান্য চিত্রমালা এই গল্পকথাকে ছাপিয়ে উঠুক।

বিষ্ণু দাশ

বিনয় ঘোষ

বিনয় ঘোষের মৃত্যু বাংলা দেশের সংস্কৃতির জগতে একটা অপূরণীয় ক্ষতির ঘটনা। কেননা, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লেখক ও মননকর্মী হিসেবে তিনি সক্রিয় ছিলেন। 'পরিচয়'-এর পক্ষে এই মৃত্যু আত্মীয়-বিয়োগের তুল্য—পত্রিকার বিভিন্ন সময়ে লেখক হিসেবে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শুধু 'পরিচয়'-এর লেখক ছিলেন বললে কম বলা হয়, মার্কসবাদী চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে দীর্ঘকাল ধরেই বিনয় ঘোষের একটা বড় ভূমিকা ছিল। হয়তো তাঁর মতামত সব-সময় তর্কাতীত নয়, 'পরিচয়'-এর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক সব-সময় মতৈক্যের ছিল না—কিন্তু তাঁর অনলস পরিশ্রম, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিরন্তর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মতামত নিরপেক্ষভাবেই সকলের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে।

বিনয় ঘোষের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধহয় এখানেই যে, তথাকথিত বিশেষজ্ঞতার নামে তিনি তাঁর চর্চার বিষয়কে সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে রাখেন নি কখনো। তাঁর চর্চার বিষয় ছিল বহু, ক্রমশই বহুতর। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ অবিশেষজ্ঞ পাঠক। একটা বিষয়ের চর্চা থেকে অনিবার্যভাবেই চলে যেতেন অন্য বিষয়ের চর্চায়। জ্ঞানের সংলগ্নতা ও সমগ্রতা তাঁর বহুমুখী আগ্রহে ও সন্ধানে স্বভাবতই দানা বাঁধতে চাইত। শুধু শুকনো জ্ঞানে নয়, সৃজনধর্মী রচনাতেও হাত পড়ে—শুধু লাইব্রেরিতে নয়, গ্রামে-গঞ্জে মানুষের ও ভূগোলের সাহচর্যে তার যাচাই হয়।

তাই অ্যান্টি-ফ্যাশিস্ট যুগে যিনি নাটক লেখেন, গল্প লেখেন—তিনিই, অতি তরুণ বয়স থেকেই, শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ নিয়ে মার্কসবাদী ধারণা

প্রচারে তৎপর। সোভিয়েত সভ্যতা বা সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার সমর্থনে উঁচুগলা। বাংলার উনিশশতকী নবজাগরণ নিয়ে বই লেখা শুরু হয় বোধহয় ১৯৪৮-এ। তারপর এই সূত্রে কত তথ্যসংগ্রহ, কত আলোচনা। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' বা 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' বা শেষ জীবনে ইংরেজি পত্রপত্রিকার সংকলন-এর মতো বৃহৎ কাজগুলি তারই পরিণতি। এরই ফাঁকে-ফাঁকে 'বাদশাহী আমল' বা 'সুতানুটি সমাচার'-এ সাধারণ পাঠকের জন্য প্রাঞ্জল অনুবাদ। জনরুচি ও পেট্রনের সম্পর্ক নিয়ে 'জনসভার সাহিত্য'। কলকাতা নিয়ে কালপেঁচার রম্য রচনাগুচ্ছ। বিষয়ের যেন শেষ নেই। বিনয় ঘোষ যখন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'-র লেখাগুলি শুরু করেন, তখনও গ্রাম-প্রদক্ষিণ বা লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের হিড়িক পড়ে নি ঠিক আজকের মতো। আর আজ যখন লোকসংস্কৃতির গবেষণার ব্যাপারটা প্রায় তত্ত্ববোধহীন গৌণ তথ্যচর্চাতেই নিঃশেষ হতে বসেছে, তখন বেরোয় তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব'। এই হলেন বিনয় ঘোষ। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল কত নতুন নতুন কাজের পরিকল্পনা, কত অসমাপ্ত লেখার খসড়া।

কোনো কোনো পাঠকের মনে হয়তো সঙ্গতভাবেই বিনয় ঘোষের মতামত ও ঝোঁকের বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠবে। তিনি ভাববেন, কেন তিনি সব-সময়ই একটা বৈদেশিক মডেল ধরে কাজ করেন, তার বাইরে যান না। তরুণ বয়সে কডওয়েল, উনিশ শতকের আলোচনার গোড়ায় বুর্কহার্ড, সিমণ্ডস, তারপর ম্যানহাইম, ভন মার্টিন বা মামফোর্ড, বিদ্যাসাগরের আলোচনায় র‍্যালফ লিন্টন, লোকসংস্কৃতির আলোচনায় ফ্রেজার থেকে লেভি-স্ট্রাউস—একটা না একটা মডেল তাঁর চাই-ই। ফলে মতামতের দিক থেকে সব সময়ই তিনি প্রায় চরমপন্থী। প্রথম জীবনে শিল্পসাহিত্যের তত্ত্বে চূড়ান্ত গোঁড়া—উনিশ শতকের আলোচনায় কলকাতাকে মনে হয় কখনও ইতালির ফ্লোরেন্স, কখনও মনে হয় পুরো রেনেসাঁস ব্যাপারটাই ধোঁকা। শেষজীবনেও এরই সূত্র ধরে রাজনীতি-সমাজনীতি বিষয়ে অতিবিপ্লবী সারল্য ও অসম্বদ্ধতাও হয়তো হানা দেয় তাঁর লেখায়।

কিন্তু, তখনও তথ্য-সংগ্রহে, তথ্য-উপস্থাপনায় তাঁর নৈপুণ্য অচঞ্চল, লক্ষ্য স্থির। মতামতের অস্থিরতা ও সংকীর্ণতার জন্য বিনয় ঘোষ যদি কখনও সমালোচিত হনও, উত্তরপুরুষের জন্য তিনি তথ্যবিন্যাসের যে কাজ করে গেলেন এবং জ্ঞানের অখণ্ডতার যে ধারণা দিয়ে গেলেন, তাতে স্বীকৃত গৌরব থেকে এক চুলও বিচ্যুত করা যাবে না তাঁকে। তাঁর এই মূল্যবান কর্মময় জীবনের ফসলের উত্তরাধিকারী আমরাই।

অরুণ সেন

দেবব্রত বিশ্বাস

গত মাস-দুই আমাদের ওপর যেন মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের এই সংখ্যায় তার ছাপও দেখা যাবে কিছু লেখায়। সিদ্ধেশ্বর সেন-এর দুটি কবিতা আর অমিতাভ দাশগুপ্ত এর কবিতাতে—গোপাল ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস আর ফুটবলের সেই চতুর্দশ-শহিদের মৃত্যুর কষ্ট।

শ্মশানের দিকে একটু দূর থেকে তাকালে দেখি, বাংলার গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের শিল্প-সংস্কৃতির পুরাকথাই যেন সারি-সারি। একদিকে রাবীন্দ্রিক-লোকায়তের আবেগে সংবদ্ধ রামকিঙ্কর, আর-একদিকে দাঙ্গা-যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের মহানাগরিক বাস্তবতা থেকে গোপাল ঘোষ সাঁওতাল পরগনাকে যে তুলে এনেছিলেন আধুনিক শিল্পের বিষয়ে-প্রতীকে, সেই পুরাকথার নায়করা পাশাপাশিই চলে গেলেন। আবার, চল্লিশের দশকের গণনাট্য আন্দোলনের যে-অভিঘাত অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চর্চায় জন-অংশ-গ্রহণের মাত্রা যোগ করতে—দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন তার অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

তাঁর পৌরুষনাদিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হতো মিছিলে মিটিঙে, গ্রামে-গঞ্জে, কৃষক সম্মিলনে আর শ্রমিক সমাবেশে। আর সে-গান গাওয়া হতো—সারা পৃথিবীর নানা ভাষার প্রতিরোধের আর সংগ্রামের গানগুলির সঙ্গেই, আমাদের সুকান্ত-নজরুল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-হারীন্দ্রনাথ-ওমর শেখের গানের সঙ্গেই। রাবীন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতা ভেঙে খানখান হয়ে যেত বিশ্বজনীন জনসংস্কৃতির প্রবল আঘাতে।

জর্জদার অবশ্য ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—পারিবারিক কারণেই। তিনি লিখেছেন, 'পরিচয়' এই, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গেও তাঁর ছিল কিছু সংযোগ। কিন্তু এইসব সূত্রে জর্জদার রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য-সন্ধান তো আমাদের আরো বড় পরাজয়। তিনি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যসৃষ্টির প্রধান কর্মীদের একজন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-এর সঙ্গেই। সেই ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েই রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চাও, আধুনিক তাৎপর্য পেতে পারে—সেই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়।

জর্জদার কিছু অসামান্য গাওয়া শুনতে-শুনতে দুঃখ হয়—তাঁর গলার গণ-সংগীত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গান, ওমর শেখ-সুকান্তের গান, আই-পি-টি-এ-র কিছু গান—কেউ আর শুনতে পাবে না। অথচ সেখানেই তো ছিল তাঁর গান গাইবার স্টাইলের মূল।

তবু, যে গান ধরা থাকল রেকর্ডে আমাদের জন্য, আমাদের পরবর্তীদের জন্য, তাতেই তিনি তো থেকে যাবেন আমাদের অতি-অল্প দিনের বাংলাগান ও বাঙালি গাওয়ার অবিস্মরণীয় প্রতিনিধি।

দেবেশ রায়